সংস্কৃতির বিশ্বরূপ

সংস্কৃতির বিশ্বরূপ

গোপাল হালদার

সম্পাদনা

ড দেবীপদ ভট্টাচার্য

ড অরুণা হালদার

অমিয় ধর
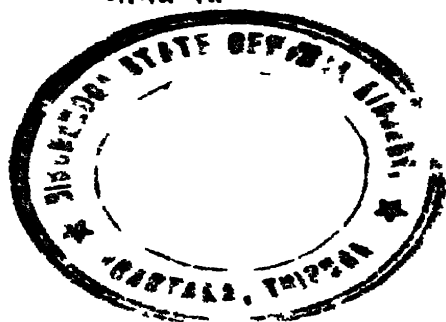
মনীষা

নিবেদন

সংস্কৃতি বিষয়ে আমার মনে কিছু জিজ্ঞাসা প্রায় শিক্ষা শেষেই জেগেছিল ;—পড়াশোনা, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট ধারনা কিছুটা পরিচ্ছন্ন হতে থাকে, ক্রমে তা দানা বেঁধে ওঠে। সাহস করে তখন লিখতে বসি "সংস্কৃতির রূপান্তর"—ও বিষয়ে আমার প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা। মানব-কীর্তির অফুরন্ত আয়োজন কত ধারায় বয়ে, প্রায় সহায়হীন আদিম মানুষের জীবন যাত্রাকে ঐশ্বর্যময়, গৌরবময় করে তুলেছে। মানুষের চিত্ত ভূমিকে জীবন রসে, আনন্দ রসে সঞ্জীবিত করে মানুষকে করেছে অমৃতের অধিকারী। ইতিহাসের সামগ্রিক যাত্রায় খণ্ডদেশে, খণ্ডকালে কতবার এই সংস্কৃতির ঘটেছে আপাত পতন-অভ্যুদয়।

ঘাত-প্রতিঘাতের শেষ নেই, আর্ত-উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই—মানুষের আত্ম-বিকাশের সাধনা সকল মানবগোষ্ঠীকে আত্মীয় করে—বিশ্ব-সংস্কৃতি রূপে উজ্জীবিত হবার পথে। পৃথিবীর সব দেশ এখনো জীবনযাত্রার সমস্তরে নেই—ইতিহাসে কেউ এগিয়ে, কেউ পিছিয়ে, কিন্তু মানুষের সৃষ্টি-শক্তি আজ আত্মসচেতন, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা অভিযানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির মহোৎসবে সে বিশ্বসংস্কৃতিকে পরিপূর্ণ করবার জন্য এগিয়ে চলেছে—সেহ নহে, নহে দূর।

'মহামানবের সাগর তীরের' ভারতবর্ষ এখনো আধুনিক জীবনের প্রবাহে যোগদান করতে এগিয়ে আসছে না কেন? আর তার খণ্ডাংশ পূর্ব উপকূলের বাঙলাদেশ, যার বাণী না কি বিশ্বসভায় চাপা দেওয়া যায় না? অথচ কেন তার এই দুর্বিপাক। পরাধীনতায় খর্বিত কর্মোদ্যমের শক্তি আমাদের; পৃথিবীর কর্মোদ্যানে স্বস্থান অধিকার করতেই হবে, আপনার সৃষ্টি শক্তিতে পুনরুজ্জীবিত হয়ে। পৃথিবী জোড়া মানুষের কণ্ঠে শোনা যায় 'দিন আগত ঐ'। সংক্ষেপে 'সংস্কৃতির রূপান্তরে' এই ছিল আমার বলার কথা। মানুষের মূল সৃষ্টিধারা ও বিকাশের নীতিনিয়ম, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষের অগ্রগতি, আর তারই সঙ্গে দেশের, জাতির ইতিহাস ও গতিধারা বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরা। মোটা দাগে 'সংস্কৃতির রূপান্তরে' আগামীর আভাস ফুটিয়ে তোলা।

কিন্তু প্রতিদিনকার জীবন যাত্রার সাক্ষ্যে সেই আভাস কতটা ফুটছে,-না, কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে? 'সংস্কৃতির রূপান্তরে'র লেখা শেষ করার আগেই নাৎসিজার্মানি সোভিয়েত ভূমির উপর অতর্কিত বিদ্যুৎসক্রীগে ঝাঁপিয়ে পড়ে—আমার লেখার পূর্বে-পরে সাম্রাজ্যবাদী চক্র বাঙলাকে জুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে বলি দিতে থাকে। সেই সব বিকৃতির দাপটে আমি, তাই পৃথক করে লিখতে বাধ্য, এই সম্মুখস্থ প্রাণ বিপর্যের কথা—'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ', 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ'। কালের দারুণ প্রয়োজনে গ্রন্থাকারে গ্রথিত হবার পূর্বে সাময়িক পত্রে নিবন্ধাকারে সে সব প্রকাশিত হয়—এবং সেই কালের কুটিল চক্রান্তেই আমার দুই তৃতীয়াংশ বাঙলায় গঠনের ও আত্মসচেতনার কাহিনী এপারে বসে আমার সঠিক জানবার অবকাশ থাকেনি। সে অধ্যায় নতুন করে আলোচনার দায়িত্ব তাই শুধু বাঙলাদেশী বাঙালীর নয় সমস্ত বাঙালীর। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' প্রতি সংস্করণে আমি যথোচিত সংযোজন করে সংস্কৃতির নতুন নতুন রেখার আভাস দিতে চেষ্টা করেছি। তবে বাঙালী জীবনের খণ্ডতার জন্য তার আভাস অনেক সময় খণ্ডিত।

বন্ধু বান্ধবদের বিচারে তিন খণ্ড একত্রে গ্রথিত হলে যে কোনো প্রান্তের আধুনিক বাঙালী পাঠকেরা সেই প্রেক্ষাপটে সমকালীন ঘাত-প্রতিঘাতের মূল্য বুঝতে পারবেন এবং পাবেন এক সুস্থির প্রেক্ষাপট, যাতে দৈনিক জীবনযাত্রার তাপমাত্রার ওঠানামা অনেকটা গৌণ অনিশ্চিত। তবু প্রেক্ষাপটরূপে সেদিনের ও এদিনের সাক্ষ্য, বিচারে নিরর্থক হবে না।

এই তিন গ্রন্থের একত্রিত প্রকাশ—সংস্কৃতি জিজ্ঞাসার ভূমিকা। এ প্রয়াস যদি কিছু মাত্র সার্থক হয় তবে তার কৃতিত্ব প্রথমত আমার সহৃদয় সম্পাদক বন্ধুদের ও আশাবাদী প্রকাশক বন্ধুদের। তাঁরা এবং পরিচিত অপরিচিত সমস্ত বাঙালী পাঠকের কাছে আমার শেষ জীবনের একান্ত প্রার্থনা চরৈবেতি চরৈবেতি॥

বিনীত

গোপাল হালদার

গ্রন্থ প্রসঙ্গ

"সমস্ত বিবর্তনের মধ্যদিয়া মানুষ ক্রমেই বেশি করিয়া 'মানুষ' হইতেছে,
প্রাচীন সংস্কৃতিও হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্ব-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত।"

১. সর্বজনমান্য শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয়ের সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসা তাঁর রচিত 'সংস্কৃতির রূপান্তর' 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' ও 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থত্রয়ে বিধৃত হয়ে আছে। এবার সেই তিনখানি গ্রন্থকে 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' নামে একখণ্ডে প্রকাশ করা হল। বিদগ্ধ বাঙালী পাঠক সমাজ এই সৎ-উদ্‌যোগকে অবশ্যই স্বাগত জানাবেন। এই রচনাটি তার পরিচিতি প্রদান মূলক মাত্র।

২. লেখক সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী রূপে সুপরিচিত। রাজনৈতিক কর্ম প্রবাহে নিজেকে কোনো ভাবে জড়িত না করে, নিছক সমাজতান্ত্রিক গ্রন্থ পাঠে তথা সমালোচনায় কালযাপনকে লেনিন তীব্রকটাক্ষ করেছেন। গোপাল হালদার এই দিক থেকে আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি। বঙ্গের বিপ্লবীগোষ্ঠীর প্রবাদ-পুরুষ কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন, কিন্তু তিনি তাঁদের নির্দেশিত 'রুদ্রপন্থা' বা গান্ধীজির প্রদর্শিত 'সত্যাগ্রহ' পন্থা উভয় থেকে সরে এসেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও সক্রিয় কর্মপন্থাকে। তাঁর পরিপ্রশ্নবৃত্তি তাঁকে নতুন চিন্তা ও চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসা সেই রূপান্তরিত মনের ফসল। 'ভাববাদী' দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন থেকে 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী' দর্শনকে গ্রহণ।

৩. ১৯১৭র মহান অক্টোবর বিপ্লব, ১৯২১এর বলশেভিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি সপ্তরথীর মতো সদ্যঃ প্রতিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক রুশ-রাষ্ট্রকে ঘিরেছিল। কিন্তু মহাভারতের অভিমন্যুর মতো রুশ রাষ্ট্রের মৃত্যু হয়নি। সে জয়ী হয়েছিল তার জনগণের অপরাজেয় শক্তিতে। তারপর থেকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও কর্মপন্থা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে 'কানপুর'-ও 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা' বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী রুজু করে। কিন্তু সে স্রোতকে রুদ্ধ করতে পারে না। এই সূত্রে বিশেষ করে ১৯৩০এ রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণ, 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশ খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তারপর ১৯৩৬এ প্রগতিলেখক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, তার ফ্যাসিজম্ বিরোধী ভূমিকার কথাও স্মরণীয়। গোপাল হালদার অন্যান্য প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গে এই আন্দোলন জোরদার করেন।

৪. যে-নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তিনি অর্জন করেছিলেন তা কোনো অর্থেই 'বিশুদ্ধ' ঐতিহাসিক বা পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নয়, সে হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন (ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্)। অনেকে ইতিহাসে ঘটে-যাওয়া বিগত ঘটনাগুলিকে ছক বেঁধে সাজিয়ে দেন, কিন্তু সে দাঁড়ায় অনেকটা থিয়েটারের মঞ্চে দৃশ্যপট সাজানোর মতো। সেই ইতিহাসের রূপান্তর কেন ঘটছে, কী ভাবে ঘটল তার পিছনের অর্থনৈতিক সূত্রটি, তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত অথবা তার শ্রেণী চরিত্র (ক্লাস ক্যারাকটার) প্রভৃতি সম্বন্ধে অচেতন থাকায় অনেক ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত যথার্থ সম্পূর্ণতা পায় না। ইতিহাসে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার প্রয়োগ মার্কসবাদের কালজয়ী বরণীয় কীর্তি। সেই ব্যাখ্যা বলে মানুষ 'By thus acting on the external world and changing it, he at the same time changes his nature' (ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ)।

৫. লেখক অবশ্য মার্কসবাদের যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল) প্রয়োগের বিপক্ষে এবং সেখানেই তাঁর বিচার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। 'সংস্কৃতি' শব্দটি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বর্তমান কালের বঙ্গ ভাষায় আনেন তাঁর মারাঠী বন্ধুর সূত্রে। রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি'কে বিদ্রূপ করে 'সংস্কৃতি'কে বরণ করেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন 'ঐতরেয় আরণ্যক' থেকে দেখান 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' সূত্রটি। ঐ গ্রন্থে শিল্পের উদার ক্ষেত্র নির্দেশিত হয়েছে, চারুকলা ও কারুকলা সম-মর্যাদা লাভ

করছে। কিন্তু সমাজ তখনো শ্রেণী বিভক্ত ছিল 'ঐতরেয়' অর্থাৎ 'ইতরা নারীর পুত্র' এই অনামী বিচয় প্রদানের আড়ালে সে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রয়েছে। যেমন প্রচ্ছন্ন রয়েছে 'সত্যকাম জাবাল' সংবাদে। লেখক ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাই বলেন "শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সেই মূলত প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য শ্রেণী বিরোধের কাহিনী, দ্বন্দ্বমূলক প্রগতির কাহিনী।" (পৃঃ ২৪)
কিন্তু লেখক সংস্কৃতির বিচার ও ব্যাখ্যায় গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নি। তিনি সুস্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন "সংস্কৃতির বনিয়াদ তাহার আর্থিক অবস্থায়। কিন্তু কেহ যেন মনে না করি আর্থিক অবস্থাই সংস্কৃতির একমাত্র ব্যাখ্যা। মূলতঃ তাহা প্রধান বস্তু কিন্তু একমাত্র বস্তু নয়। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক আরও অনেক শক্তি আছে।"

মূল, শাখা প্রশাখা, ফুল-ফল সব নিয়েই যেমন গাছের পরিচয়, লেখক মনে করেন বাস্তব উপকরণ, সামাজিক রূপ ও মানস সম্পদ পরস্পর অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ তাই "সংস্কৃতি সমাজদেহের শুধু লাবণ্য ছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ।" এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রবহমান মানব-ইতিহাসের ধারাকে ব্যাখ্যা করেন সেই প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমানের পারমাণবিক শক্তি যুগ; আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রী সমাজ। তিনি 'সংস্কৃতি'কে সামগ্রিক ভাবে দেখেন বলেই সকল যুগের মানুষের সৃষ্ট বিচিত্র শিল্পবস্তুকে গ্রহণ করেন। বাস্তবে সামন্তযুগে তাদের বিকাশ ঘটেছিল বলেই বর্জনীয় মনে করেন না।

'সংস্কৃতির রূপান্তর' বইটির বড়ো অংশ ধরা রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পর্বের সংস্কৃতির ব্যাখ্যায়। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কোশাম্বী প্রভৃতি মনীষীরা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারত ইতিহাসের নানা পর্বের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন। লেখক তাঁদের অনুসন্ধানের সূত্রগুলিকে গ্রহণ করেও (যা সকল গবেষণা কর্মীর কর্তব্য) নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণের নিরিখে তাঁর পথে অগ্রসর হয়েছেন। লেখক ভারতে আদিম পূর্ব যুগ থেকে শুরু করে বঙ্গে বিদেশী ব্যবসায়ী বৃটিশ শক্তির বিকাশের ফলে সামন্তযুগের ধ্বংস সূচিত হওয়ায়—'সেই বণিক রাজের যুগে বাস্তব ও ভাবগত পোষণ ও গ্রহণ প্রমাণ নিদর্শন জাতীয় সংস্কৃতির আধুনিক আত্মপ্রকাশের তাগিদে রূপান্তরের ও পরিবর্তনশীলতার।' (পৃঃ ১২০)

এজন্যই ভারত সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্বের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বিচারের পর লেখক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে। সেখানেও তিনি দেখিয়েছেন বৃটিশ অধিকার পূর্ব যুগে "শ্রেণী বিপ্লব না ঘটিলেও শ্রেণী সংঘাত ছিল তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ পরিবর্তিত হইয়াছে তাহারই মধ্য দিয়া সংস্কৃতির রূপ নিয়াছে।" (পৃঃ ১২৬) তবু দিনে উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টন ব্যবস্থায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না ঘটায় সমাজ মন্থরতায় স্থবির হয়ে পড়েছিল। তবু তার মধ্যে চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন সীমাবদ্ধ অর্থে নতুন সাড়া জাগিয়েছিল সন্দেহ নেই। আঠারোর শেষ ভাগে বঙ্গদেশ বৃটিশ বণিকরাজের উপনিবেশে পরিণত হতে শুরু করে। ১৭৯৩-এর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ভূমিব্যবস্থায় যে শ্রেণী স্বার্থ রচনা করে তার ফল হয় বঙ্গে সুদূর প্রসারী। দেশজ শিল্পের ধ্বংস সাধন, বিদেশী শিল্পজাত পণ্যের অবাধ বাণিজ্য শিল্প ক্ষেত্রে করে তাকে অনগ্রসর। শিক্ষা-ব্যবস্থায় জনশিক্ষার পথ রুদ্ধ করে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয় পাশ্চাত্য শিক্ষা। ফলে রেনেসাঁস বা বিদ্যা ও চিন্তার জাগরণ অনিবার্য ভাবে হয় খণ্ডিত ও গণ্ডীবদ্ধ। তবু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সকল অসম্পূর্ণতা মেনে নিয়েও লেখক মনে করেন—বাঙালী তার সাহিত্য সাধনায়, ধর্মান্দোলনে, চিত্রকলা ও সংগীতে, বিজ্ঞান ও ইতিহাস চর্চায় এবং রাজনীতিতে বিপ্লবী আন্দোলনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রচনা করেছে। মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির রূপ নির্ণয়ে তিনি নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ধর্ম-বিশ্বাস, অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিন্যাস তথা সাহিত্যের ও লোক সংস্কৃতির সাক্ষ্য সব কিছুকে নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করেছেন।

'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থের শেষ অংশ 'বিজ্ঞানের বিপ্লব'। বিজ্ঞানের বিচিত্রমুখী বিকাশ যে সমাজ নিরপেক্ষ নয়, বরঞ্চ সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত তার পরিচ্ছন্ন ঐতিহাসিক পরিচয় দিয়েছেন বিজ্ঞানী বার্নাল। তাছাড়া মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করেছেন হলডেনরা। আরো

গ্রন্থের লেখক বিজ্ঞানের সেই সামাজিক ভূমিকা প্রদর্শন করেছেন যার ফলে মানব সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে। 'ধাতু', 'তাপ', 'প্রাণী', 'মন' প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলি ক্রমাগত ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক এবং শোষণলুপ্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে রয়েছে মৌলিক দুস্তর পার্থক্য। কাজেই বিজ্ঞানের প্রকৃত মুক্তি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘটবে, কেন না, ধনতন্ত্র মারণাস্ত্রের সাহায্যে ঘটাতে চায় 'নব ঔপনিবেশিক শাসন', মানব ধ্বংসের যজ্ঞ। তার ফলে সমগ্র মানব সংস্কৃতি আজ বিপন্ন।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ' (১৩৫১—১৩৫৩)। অধ্যাপক সুকুমার সেন 'প্রাচীন যুগের বাংলা ও বাঙালী' 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' নামক 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের ছোট দুটি পুস্তিকায় এবং তাঁর সুবৃহৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গ সংস্কৃতির আলোচনায় সহায়ক প্রচুর তথ্য দিয়েছেন, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্যের দিক থেকে মূল্যবান উপাদান যুগিয়েছেন। এই উপাদান পুঞ্জকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক। পাল সেন যুগ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল পর্যন্ত বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাস চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া দিয়েছেন। এই গ্রন্থের গুরুত্বগর্ভ আলোচনা হল 'বাঙালী মুসলমান ও মুসলিম কালচার' নিয়ে। মনে রাখতে হবে এই প্রবন্ধ যখন রচিত হয়েছে তখনো 'পূর্ব পাকিস্তান' হয়নি। লেখক যে বিষয়টিকে প্রথম নির্দ্বিধায় জানাতে চান সে হল "কালচার ও রিলিজিয়ন এক নয়; বরং সম্পর্কিত হলেও দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস।" কেননা, যাকে কালচার বা সংস্কৃতি বলা হয় তার স্বরূপ হল রূপান্তরশীলতা ও সৃষ্টি-শীলতা। 'রিলিজিয়ন' কালচারের একাংশ। তার কিছুটা তত্ত্ব ও ভাবগত বাকিটা আচারগত। লেখকের মতে 'রিলিজিয়নের লক্ষ্য হল তাই সৃষ্টি নয়, স্থায়িত্ব (conservation)'; তাই সে হল স্থিতিধর্মী। কিন্তু 'কালচার' তো গতিধর্মী। তাই 'রিলিজিয়ন দিয়ে কোনো কালচারের নামকরণ ঠিক বিজ্ঞান সম্মত নয়।'—(পৃঃ ২২৭)। 'আরবী কালচারের বিকাশের ধারা' 'মুসলিম জগতে আরবী সভ্যতার প্রভাব' কিভাবে দেখা দিয়েছিল তা যেমন লেখক দেখান তেমনি এই কথাটি বেশ জোর দিয়েই বলেন—

> "সেই তথাকথিত 'মুসলিম কালচার' স্থান ও কালভেদে নানা দেশে নানারূপে বিকাশ পেয়েছে। আরব জাতিদের মধ্যেও তা পেয়েছে, ভারতীয় জাতিদের মধ্যেও পেয়েছে। আরব জাতিদের মধ্যেও বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে আরবী ভাষার বন্ধনে তাদের একটা সুদৃঢ় বন্ধন ছিল।" (পৃঃ ২২৯)

কিন্তু 'আরবী কালচার' থেকে 'ইরানী কালচারে'র পার্থক্য যে রয়েছে এ তথ্য সর্বথা স্বীকার্য। সে পার্থক্য কাব্যরচনায় ললিত কলাচর্চায়, সুফীয়ানায়। ভারতবর্ষের মুঘলযুগে ইরানী সংস্কৃতির প্রভাব সুপ্রত্যক্ষ। যবদ্বীপে, চীনে বা রুশিয়ার মুসলিম কালচার স্ববৈশিষ্ট্য চিহ্নিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কেমাল আতাতুর্ক তুর্কিকে মধ্যযুগীয়তা থেকে মুক্ত করেন। তেমনি সফল রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার মুসলিম 'জাতি'গুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার কল্যাণে সহসা শতাব্দীসঞ্চিত অন্ধকুসংস্কার, অশিক্ষা, দারিদ্র্যের নাগপাশ ছিন্ন করে নূতন উষার স্বর্ণদ্বারে পৌঁছে যায়। এই বিস্ময়কর রূপান্তর রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল। মধ্যযুগে বাঙালী সংস্কৃতি বহুলাংশে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সৃষ্টি। উদার ধর্ম বিশ্বাসে (লালন শাহ থেকে মদন বাউল) গীতি ও গীতিকা রচনায়, লোক শিল্পের ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও লেখক স্বীকার করেছেন স্বতন্ত্র 'মুসলিম ঐতিহ্যের ধারা' ও 'হিন্দু ঐতিহ্যের ধারা'কে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে হিন্দুসমাজ সাগ্রহে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করল, মুসলমান সমাজ নিজেকে রাখল সরিয়ে। ওহাবি-আন্দোলনকে লেখক সংস্কৃতির বিকাশের দিক থেকে পশ্চাদ্মুখী বলে মনে করেন। অন্যদিকে তাঁর মতে "রামমোহন রায় থেকে রাজনারায়ণ [বসু] বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই সর্বভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের প্রবল ধারাকে বাঙালী হিন্দু ঐতিহ্যের খাতে বহাতে সাহায্য করেছেন।"—(পৃঃ ২৩৮) বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজকেও

তিনি কটাক্ষ করেন এই বলে "মুসলিম ঐতিহ্যের" কাঠামোতে আরবী-ফার্সির ধারায় নতুন সংস্কৃতি গড়বারও কল্পনা করছেন।" এ প্রবন্ধ লেখা হয় ১৯৩৬ সালে ২রা মার্চ। কিন্তু মুখ্যতঃ ১৯৫২ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে 'ভাষা আন্দোলনের' সূচনা থেকে বাঙালী মুসলমান সমাজ তাঁদের সত্তা সন্ধানে ব্যাপৃত হন। তারই পূর্ণতা বর্তমান 'বাংলাদেশ'। প্রসঙ্গতঃ বলি উনিশের শতকে বাঙালী মুসলমানের ভূমিকা, তার নঙর্থক ও সদর্থক দিক নিয়ে ডক্টর ওয়াকিল আমেদ দুখণ্ডে অতি মূল্যবান্ আলোচনা প্রকাশ করেছেন।

এ গ্রন্থের আরেকটি চিন্তনীয় প্রসঙ্গ সংস্কৃতির সংকট নিয়ে। বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে শাসক-শাসিতে ভেদ থাকলেও বঙ্গদেশের পল্লীপ্রধান সমাজে 'দরবারী আর্ট' বিশেষ বিকাশ লাভ করেনি, ভূস্বামী পোষিত শিল্পী আর লোক শিল্পীর মধ্যে ভেদরেখা ছিল ক্ষীণ। কিন্তু বৃটিশ শাসনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রদ বদলে, নব্য ভূস্বামীতন্ত্রের প্রবর্তনে, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনে, নতুন স্তরের 'সংস্কৃতি' দেখা দিল যার থেকে লোক সংস্কৃতি রইল পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে লোক শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটে, যার শ্রেষ্ঠ বাহক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ লেখক সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করেছেন লোক শিল্পকে নিয়ে মুনাফা সৃষ্টির জন্য তাকে ক্রমাগত বিকৃত করা অর্থাৎ 'ভালগারাইজ' করার চেষ্টা চলেছে, এখানেই সংকট। এই সংকট সমাধানের উপায় তিনি মনে করেন 'সংস্কৃতির প্রশস্ত গণবনিয়াদ রচনা করা, এবং লোক সংস্কৃতির বাঁচাব পথ হল নতুন সভ্যতার সত্যকে গ্রহণ আর পুরোনো পদ্ধতির কালোপযোগী রূপ ধারণ। এই পথে 'ভদ্র সংস্কৃতি'ও 'লোক সংস্কৃতি'র বিচ্ছেদ ও দ্বন্দ্ব ঘুচে যেতে পারে।

তৃতীয় গ্রন্থটি 'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ'। ভাষা সমস্যা ও লিপি সমস্যা নিয়ে বিতর্ক এখনো থামেনি। এ গ্রন্থের রচনাগুলি ত্রিশ বৎসর আগের হলেও তাদের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ বজায় আছে। ভারতবর্ষের মতো বহু ভাষা ও বিভিন্ন লিপির দেশে জোর করে এক ভাষা ও এক লিপি প্রবর্তনের তিনি ঘোর বিরোধী। শাসকগোষ্ঠী ও ধনিকশ্রেণীর 'এক ভাষা' ও 'এক লিপি' সারা দেশের উপর চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি যুক্তিবহ বক্তব্য খাড়া করেছেন। এই প্রসঙ্গে বহুভাষী সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিন নির্দেশিত পথে ভাষা সমস্যার যে সমাধান করা হয়েছে তিনি তার দিকে আমাদের তাকাতে বলেছেন। লিপিসমস্যার সমাধানে লেখক বরং রোমক লিপির পক্ষপাতী আচার্য সুনীতিকুমারের অনুগামী।

ধরে ধরে দেখাতে গেলে পরিচিতি প্রসঙ্গ দীর্ঘতর হবে, তাতে পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই এখানেই থামা শ্রেয়।

পরিশেষে বলি, এই রচনাবলীর মধ্যে লেখকের বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বোধ, পরিচ্ছন্ন মনন, গোঁড়ামিহীন দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও শোষণ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক আদর্শনিষ্ঠার উজ্জ্বল পরিচয় স্বয়ংপ্রভ হয়ে আছে। এই গ্রন্থ যে সংস্কৃতি-চিন্তায় বাঙালী পাঠকবর্গকে উদ্‌বুদ্ধ ও উদ্‌বেজিত করবে এ সম্পর্কে আমরা চিরআশাবাদী।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

১. সংস্কৃতির রূপান্তর

৩. বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

সংস্কৃতির রূপান্তর

বাঙলা দেশের যে যুগ আজ শেষ হইয়াছে
তাহার সংস্কৃতির
শুভ্র ও আনন্দ প্রকাশ যাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম,
আমার সেই
পরলোকগত পিতৃদেব সীতাকান্ত হালদার মহাশয়ের
চরণোদ্দেশে—

প্রথম অধ্যায়

কথামুখ

স্থান লেনিনগ্রাদ, কাল ১৯৬০ সালের অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ। হেমন্তের অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তাকে সপ্তাহের প্রারম্ভে অপ্রত্যাশিত তুষারপাতে আবৃত করিয়া দিয়া প্রকৃতি তখন আবার সদয় হইয়াছেন। বরফ গলিয়া গিয়াছে। লেনিনগ্রাদের শীশায়-মোড়া আকাশ ও বায়ুতাড়িত বৃষ্টিকণার মধ্যে অভ্যস্ত মানুষের মতো পথ চলিতেছি—এখানে-ওখানে 'প্রাভদা', 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' বা 'সোভিয়েত রুশ্‌কি'র সম্মুখে পথযাত্রীরা দাঁড়াইয়া সংবাদ পড়িতেছে। পড়িয়াও দাঁড়াইয়া আছে কিছুক্ষণ; বিশেষ কোনো সংবাদ আছে বুঝিতেছি। অন্যদিনের অপেক্ষা আজ প্রত্যেক পত্রের সম্মুখেই পাঠকের সংখ্যাও একটু বেশি, অন্যদিনের অপেক্ষা বেশি তাহাদের উদ্‌গ্রীবতা। বেশি তাহাদের গাম্ভীর্য, বেশি উন্মনস্কতা পাঠশেষে পথে পুনর্যাত্রার সময়ে। সম্ভবতঃ আলুর উৎপাদনের সম্বন্ধে বা ডিমের দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়ে নৈরাশ্যজনক সংবাদ আছে। অন্য কোনো কারণে ইহারা চিন্তিত হইত না। আর্থিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা বা অব্যবস্থাই রুশদের নিকট বড় খবর। যে ভাষা জানি না সে ভাষার সংবাদপত্রের মর্মগ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়া কি লাভ? স্বাভাবিক পদেই গৃহে ফিরিলাম। একটু পরেই টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল। এখনি বলিতে হইবে 'ক্ষমা করবেন—রুশ ভাষা জানি না'। সঙ্কুচিত চিত্তে যন্ত্র তুলিয়া লইলাম।

'অ্যালো' বলিতেই ইংরেজিতে নাম শুনিলাম, তারপর বাঙলায় "নমস্কার"। পরিচিত অধ্যাপকের কণ্ঠঃ "খবর দেখেছেন?"

"কী করে দেখ্‌ব? ভাষা যে আমার অজ্ঞাত।"

"কুবার দিকে মার্কিন রণতরী প্রেরিত হয়েছে—সমুদ্রে অবরোধ রচনা চলেছে। বাইরের কোনো জাহাজ কুবা যেতে পারবে না। বিশেষ করে সোভিয়েত সহায়তা বন্ধ করা হবে।"

চমকিত হইলাম। চিন্তা মাথায় চাপিয়া আসিল। চুপ করিয়া থাকিয়া শান্ত স্বরে বলিলাম ইংরেজিতে, 'ব্যাড্ নিউজ'।

"হাঁ, ব্যাড্ নিউজ।"—ওপার হইতেও শান্ত স্বরে উত্তর হইল।

দুইজনেই মানিলাম পৃথিবীর পক্ষেই দুঃসংবাদ।

টেলিফোন্ ছাড়িয়া দিতে গৃহিণী পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখনো আমরা ভারতীয়রা ২০শে অক্টোবরের চীনা আক্রমণের কথা জানিতে পারি নাই। কোনিব্বিয়ান্ সাগরের এই ঘনঘটার সংবাদে দুইজনাই ভাবিত হইলাম—হয়তো পৃথিবীর দুঃসময়। 'কী হবে?' সত্যই, কী হইবে আমরা কেহ কি জানি?

পথের দিকে জানালায় গিয়া দুইজনা দাঁড়াইলাম। কীরভ্‌স্কি প্রস্‌পেক্‌টের প্রশস্ত পথে তেমনি লোকজন যানবাহন চলিয়াছে। প্রাতরাশ শেষে নর-নারী কার্যস্থলে ছুটিয়াছে। ওপারে বরফ-মুক্ত পার্কের বেঞ্চে দুই-একটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। কয়েকটি ক্রীড়ারত শিশু বালি লইয়া ঘর তৈরি করিতেছে, খেলনার মোটর বালিতে বোঝাই করিতেছে—দুইটি তরুণী শিক্ষিকা অদূরে। সবই স্বাভাবিক। কোথাও উত্তেজনা নাই, কাহারও গতিতে নাই ত্রস্ত অস্বচ্ছন্দতা। এই সেদিন মহাকাশযাত্রীদের তথ্য যোগাইতেই পথের উপরে রেডিওর ঘোষণা মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজ কেন বিশেষ ঘোষণা নাই? ঘরের রেডিও খুলিলাম। সুনির্ধারিত কর্মসূচী তেমনি চলিয়াছে। বেলা বাড়িল। আহারান্তে পথে বাহির হইলাম। লাইব্রেরিতে পড়িতে গেলাম। প্রতিদিনকার মতো নমস্কার জ্ঞাপন করিলাম, সস্মিত প্রতি-সম্ভাষণ শুনিলাম। ইংরেজি জানা যিনি আছেন তিনিও মাথা নাড়িয়া সম্ভাষণ জানাইয়া নিজের গবেষণার লেখায় ডুবিয়া গেলেন। আমিই বা কতক্ষণ তবে ভাবিব? —লেনিনগ্রাদে

পথে-ঘাটে, দোকানে, বাসে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, গ্রন্থশালায়, খাদ্যশালায়, ভোজনশালায় কোথাও সমস্ত দিনে কোনো উত্তেজনা দেখিলাম না। শুধু একটু গাম্ভীর্যের ছায়া, একবারের মতো দুই-একটি মন্তব্য, 'ভালো কথা নয়', তারপর, 'অপেক্ষা করো।' দিন দুই পরে চীনা আক্রমণের সংবাদে আমরা ভারত-চীনের বিরোধে চিন্তিত, উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। অন্যদিকে রুশদের মুখের সেই গাম্ভীর্য ২০শে অক্টোবরের পরে আবার স্বচ্ছন্দ নির্ভাবনায় মিলাইয়া গেল। "খ্রুশ্চফ্ ক্ষেপণাস্ত্র ফিরিয়ে আনছেন—কেনেডিও কুবার অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" মানুষের ইতিহাস বিপদমুক্ত হইল।

লণ্ডন যখন উৎকণ্ঠায় নিদ্রাহীন, পৃথিবীতে যখন ত্রাসে দুশ্চিন্তায় মানুষের মুখ অন্ধকার, তখনো মস্কো-লেনিনগ্রাদের অধিবাসীদের চক্ষে ত্রাসের চিহ্ন দেখি নাই। কথায় শান্ত স্থিরতা মুখে শান্ত ভাবনার গভীর ছাপ, মনে ধ্রুব বিশ্বাস—"শান্তি অব্যাহত রাখিতে হইবে—পৃথিবীর দুঃসময় আমরা রোধ করিব।" সমস্ত সোভিয়েত নব-নারী, শিশু-বৃদ্ধের মুখে দেখিয়াছি এই অবিচলিত সংকল্প—শান্তি চাই। আমার ইহাও বিশ্বাস, যদি যুদ্ধ বাধিত, নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁহারা আবার আত্মবিসর্জন করিতে দ্বিধা করিতেন না। তাহাও করিতেন এই শান্তির সংকল্প লইয়া।

একবারের মতো মানুষের ইতিহাস নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। পৃথিবীতে আজ কাহারও সন্দেহ নাই, ১৯৬০ সালের সেই সময়টিতে একটি বৃহৎ সত্যের স্বাক্ষর দেখা গেল—কমিউনিজম্ এযুগের মানবতার নাম। 'সবার উপরে মানুষ সত্য', এই মানব সত্যের বাস্তব রূপায়ণই এই যুগের সংস্কৃতির, তাহার অধ্যাত্মচেতনার প্রাণ-সম্পদ। সোভিয়েত সেই মানব সত্যকেই পরম মূল্য দেয়—এই কথাই কুবার সংকট-উপলক্ষে বিশ্বের মানুষের সম্মুখে প্রকটিত হইয়া গেল। সমস্ত ছোট ও সফলতা-নিষ্ফলতা সত্ত্বেও যদি এই মানব সত্যকে সোভিয়েত রূপায়িত করিতে পারে, তাহা হইলে মানুষের ইতিহাসে তাহার দান—তাহার সমস্ত সফলতা-নিষ্ফলতার উপর—জয়ী হইবে, কমিউনিজম্ও 'মানবতার ধর্ম' বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

ধ্বংস নয়—'Not to Destroy But to Fulfil'

সত্যই তো, সোভিয়েতের এই ৪৫ বৎসরের উদ্যোগ-উৎসাহ ও ভুলভ্রান্তিতে ভরা জীবন তো নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণের কাহিনী নয়; স্তালিন-বিদায়ের পরে সেই সত্য এখন স্বীকৃত। আমিই কি এখনো সঠিক বলিতে পারি 'সমাজতন্ত্র হইতে সাম্যবাদ' সৃষ্টির পথে সোভিয়েত-তন্ত্র সত্যই অগ্রসর হইতেছে কিনা? ১৯১৭ হইতে ভিতরে-বাহিরে পূর্বাপর শত্রু-পরিবৃত জীবনযাত্রায় বর্ধিত হইয়া সোভিয়েত নর-নারী একনায়কত্ববাদী নেতৃগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলিতে এখনো পর্যন্ত যেরূপ সহজে অভ্যস্ত, তাহাতে একদিকে স্বাধীন সমালোচনা ও অন্যদিকে সামাজিক দায়িত্ব, এই দুই নীতির সমন্বয় সাধন করিয়া তাঁহারা সচেতনভাবে সাম্যবাদ গঠনে এখন প্রস্তুত হইতেছে,—অভাবমুক্ত তরুণ-তরুণী নিশ্চিন্ত জীবনোল্লাসে—মার্কিন বেশভূষার মতো মার্কিন-মার্কা বেপরোয়া উদ্দামতা আরাম ও ভোগের নেশায় না মাতিয়া,—দৃঢ় সংকল্পে, উজ্জ্বল চৈতন্যে কমিউনিজম্ গড়িতে পারিবে,—আমার এই ধারণাও কি ভুল হইতে পারে না?—বিপুলা সোভিয়েত ভূমির কতটুকু আমি জানি?—সত্য কথা। তথাপি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও আজ কম নয়। সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে আজ বহু তথ্যই সুবিদিত। ভারতবাসী আজ সোভিয়েত নর-নারীকে প্রত্যক্ষ দেখে, ভিলাই সুরতগড় প্রভৃতি বহু কর্মক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করে। অনেক ভারতবাসী সেই দেশ, সেই জীবনযাত্রারও সঙ্গে সুপরিচিত। সেই পরিচয়ের ফলে কাহারও সম্বন্ধে কাহারও মোহ পোষণ করিবার অবকাশ নাই। অন্তত সোভিয়েত দেশ বিষয়ে খ্রুশ্চভ্ রিপোর্ট ও মার্কিন 'ব্রেন্ ইনস্পেক্টর'দের রিপোর্ট ভারতবর্ষে দুইই সুলভ। বাইশ বৎসর পূর্বে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) ভারতবাসীকে বুঝাইতে হইত—সোভিয়েতের বিপ্লবী জীবন একটা কালাপাহাড়ী জীবন নয়; অতীতের রুশ্ অতীতের উজবেগ্ প্রভৃতি জাতিদের সকল জাতীয় ঐতিহ্যের ধ্বংস নয়; সেই অতীতের মাত্র পুনরাবৃত্তিও নয়। বরং প্রত্যেক ইতিহাসের সচেতন

পরিণতি, মানব-সংস্কৃতির রূপান্তরের ইঙ্গিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নি-পরীক্ষায় অগ্নিশুদ্ধ 'সোভিয়েত দেশপ্রীতি' এই সত্যও প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, যে-সমাজে শোষক ও শোষিত নাই সে-সমাজের প্রত্যেক মানুষই জানে দেশ তাহার আপনার, উহা কোনো মালিকশ্রেণীর সম্পত্তি মাত্র নয়। তাই, এই সমাজে রুশ-উক্রেইনী হইতে উজবেগী কাজাক-বুরিয়েত মঙ্গোল পর্যন্ত প্রায় দেড়শতটি ছোট বড় জাতি ও গোষ্ঠীর সমান অধিকার, সমরূপ সামাজিক বিকাশ, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব। আর রুশ উজবেগ প্রভৃতি প্রত্যেকেই 'স্বদেশী' হইয়াও সেখানে আবার একই 'সোভিয়েত দেশীয়'—প্রত্যেকেই যেমন আমরা 'বাঙালী', 'তামিল' প্রভৃতি হইয়াও আরও গভীররূপে 'ভারতীয়' হইতে পারি—যদি শোষণ-শাসন-জাত বৈষম্যের সন্দেহের অবকাশ না থাকে। তৃতীয় সত্যও আজ স্বীকৃত—শিক্ষাও সংস্কৃতি সার্বজনীন সম্পদে পরিণত করিয়া সোভিয়েত-সংঘ "শতকরা ৯৮টি মানুষকে দিয়াছে স্বরাজ", দিয়াছে 'মানুষের অধিকার', ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ব্যাপক সুযোগ। চতুর্থ সত্য তো এখন সর্বত্র পরিজ্ঞাত—সোভিয়েত সংঘই আর্থিক পরিকল্পনা দ্বারা মানুষকে আপন ভাগ্য গড়িবার অধিকার ও দায়িত্বের পথ প্রদর্শন করিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে ইহার তাৎপর্যও কি সামান্য? পঞ্চম কথাটিও সেই সঙ্গে এখন সর্বমান্য: শোষণমুক্ত সোভিয়েত সমাজ বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগে একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদের সুপ্রযুক্তি সম্ভব করিতেছে, অন্যদিকে বিজ্ঞানসম্মত সমাজ-বিন্যাসে মানবশক্তিকে সার্থক করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। তাই, বাইশ বৎসর পূর্বে যাহা বলা প্রয়োজন হইত আজ তাহার অনেক কথা ভারতবর্ষে বলা নিষ্প্রয়োজন। স্পুৎনিক ভোস্তকের পরে ভারতবাসী ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ৪৫ বৎসরের মধ্যে—গৃহযুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ, অনিবার্য অর্থসংকট, ধনিকতন্ত্রের দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ, এবং শেষে ফ্যাশিজম্-এর পৈশাচিক ধ্বংসলীলা আর আপনাদের ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও—, সোভিয়েত দেশে মানুষের সৃষ্টিপ্রতিভা আত্মপ্রকাশের যেরূপ সুযোগ আয়ত্ত করিয়াছে, ইতিহাসের তাহা এক অভিনব শিক্ষা, পশ্চাৎপদ জাতিদের পক্ষে তাহা আত্ম-উন্নয়নের দিগ্‌দর্শনী। ৪৫ বৎসরে একটি পশ্চাৎপদ সমাজ পৃথিবীর অগ্রগণ্য সমাজে উন্নীত হইয়াছে, অনেক অগ্রগামী সমাজকে সে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে, কোন্ বিশেষ জ্ঞানকর্মের উদ্যোগে? বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রে পরিচালিত শোষণমুক্ত সমাজেই বিকাশের এই ব্যাপক অবকাশ পাওয়া যায়—সোভিয়েত নেতৃত্বের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি মানিয়া লইয়াও শেষ পর্যন্ত ইহা স্বীকার করিতে হয়। ইহাই এই যুগের ইতিহাসের মূল শিক্ষা।

এই সত্যটা অবশ্য এখনো আমাদের অনেকের চক্ষে স্পষ্ট নয়। কারণ, আমেরিকা ও জার্মানী প্রভৃতি ধনিকতন্ত্রী দেশেও তো প্রকৃতির দানকে দুই হাত পাতিয়া লইতে বিজ্ঞানপূর্বেই শিক্ষা দিয়াছে, মানুষকে করিয়াছে প্রকৃতির সহযোগী। সত্য কথা, ইহাই বিজ্ঞানের ধর্ম। তথাপি সেই সব ধনিকতন্ত্রী দেশে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সংকুচিত। প্রধানতঃ মুনাফার প্রয়োজনেই সেই সব দেশে বিজ্ঞানের সমাদর। আর, সেই মুনাফাকে জয়ী করিবার জন্য সামরিক উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ এখন সেই সব দেশে বিজ্ঞান প্রযুক্ত। অন্ততঃ সামাজিক সেবায়, সার্বজনীন কল্যাণে তাহার স্থান সেসব দেশে গৌণ। বিজ্ঞান-সম্মত সমাজবিন্যাস তো মুনাফাতন্ত্রী সমাজে মুনাফার দেবতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। ইহাই তাই বুঝিবার মতো সত্য, বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক সাধনা সোভিয়েত সংস্কৃতির অঙ্গ। একদিকে **সর্বাঙ্গীণ বিজ্ঞানের** সাধনা অন্যদিকে **সার্বজনীন মানবতার** সাধনা,—একদিকে মহাকাশে রকেট পরিচালনা অন্যদিকে কুবা হইতে ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার,—দুয়েরই সম্মেলনে এইরূপে সায়েণ্টিফিক্ সোস্যালিজম আর সায়েণ্টিফিক হিউম্যানিজম্ একত্রিত;—তাহাতেই সোভিয়েত সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয়। একই কালে তাহা মানুষের অফুরন্ত সম্ভাব্যতার প্রমাণ, মানবিক মূল্যবোধের সমুন্নত প্রকাশেরও অভিব্যক্তি,— সকল কালের বিপ্লবের এই মর্মবাণী: I come to fulfil, not to destroy.

বিজ্ঞান ও বিশ্ববিপ্লব

'বিশ্ববিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে', দুই বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে এই কথা শুনিয়াছিলাম। কথাটা ভারতীয় এক তরুণ বৈজ্ঞানিক বন্ধুর, কথাটা এখন মনে পড়িল। চমকিত হইবার কারণ নাই, ইহাও

তিনি জানাইলেন।—যে তারকা আজ আমরা চোখে দেখিতেছি লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে হয়তো তাহার দীপ্তিরেখা মহাশূন্য পাড়ি দিয়া পৃথিবীর দিকে রওয়ানা হইয়াছিল। আজ যখন পৃথিবী মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইতেছে, হইতে পারে, তৎক্ষণে সেই তারাটি আর নাই—ইতিমধ্যে তাহা নিবিয়া মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে সত্য মহাবিশ্বে ইতিপূর্বেই মিথ্যা হইয়া গিয়াছে আমাদের পৃথিবীতে তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য উপস্থিত থাকিলেও তাহা শুধু অতীতেরই সাক্ষ্য—ভবিষ্যতের আভাস নয়,—ইহাও বুঝিয়া রাখা ভালো। 'বিশ্ববিপ্লবও' যে সেইরূপ এই মানব-সমাজের আপাতদৃশ্যমান্ জীবনাকাশের প্রান্তে প্রান্তে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে আজ চারিদিকের অতি-প্রত্যক্ষ নিওন্ রশ্মির উদ্দাম ছটার মধ্যে সেই সুদূরের রশ্মি-রেখা হারাইয়া গেলেও তাহার প্রমাণ সমাজ বিজ্ঞানীর অগোচর নয়। দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকের দূরবীক্ষণই শুধু ইহা ঘোষণা করে না, আমাদের সাধারণ বুদ্ধির সমীক্ষা ও নিরীক্ষার সহায়েও আজ তাহার বার্তা আমরা লাভ করিতে পারি।

বন্ধু বুঝাইয়া বলিলেন, "শতাব্দীর প্রথম পর্বে ঠিক যেই ভাবে বিশ্ববিপ্লব সমাগত হইবে বলিয়া তোমাদের সমাজবিপ্লবীরা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাই শুধু ভ্রান্ত হইয়াছে। রুশিয়ার পরে গণবিপ্লব ১৯১৮তে জার্মানিতে পাড়ি দিয়া পশ্চিম ইয়ুরোপ ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে আবর্তন ঘটায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি রুশিয়াতেও তাহার আবির্ভাবটা মিথ্যা? অথবা, ১৯১৭-এর 'অক্টোবর বিপ্লবকেই' বা বিশ্ববিপ্লবের প্রধান পরিচয় বলিয়া তোমরা ধরিয়া লইতেছ কেন? বরং, যদি তাহার আগমনী লক্ষ্য করিতে চাও তাহা হইলে তাহা লক্ষ্য করিতে পারিবে ঊনবিংশ শতকে। না, মার্কস্ এঙ্গেলস্-এর সমাজ-দর্শনেও ততটা নয়, বরং বিজলী শক্তির মানবীয় কর্মে বিনিয়োগে তাহার সূচনা। তাহাতেই লেখা হইয়া গিয়াছে মানব-সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বারুদ যেমন পৃথিবীতে মধ্যযুগের তলোয়ার-বর্শার, শৌর্যবীর্যের ও ক্ষাত্র-আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়াছে, বিজলী ও পেট্রলে তেমনি করিয়া বিদ্যুল্লেখায় পৃথিবীতে শিল্পোন্নত সমাজের গৌরব-বার্তা লিখিতে লিখিতে তাহারই শেষ অধ্যায়ে তাহাকে বিংশ শতকের প্রারম্ভে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। আর, সেই অগ্রগতির নিয়মেই ধনিক-সমাজের সভ্যতারও অবসান ঘোষণা করিয়া বিশ্ববিপ্লবের এই নূতন বার্তা বজ্র-নির্ঘোষে ধ্বনিত হইয়াছে ১৯৪৫ এর ৬ই মে। কাজটা সোভিয়েত বিপ্লবীরা করে নাই। না, না, শুধু মার্কিন সামরিক রাজনৈতিক চক্রও করে নাই। করিয়াছে নানা দেশের বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভা,—মার্কিন দেশ উহার ভাগ্যবান্ উদ্যোগ-ক্ষেত্র, আর হিরোশিমা উহার হতভাগ্য বিজ্ঞাপনী।

"সত্য কথা, হিরোশিমা একই কালে 'হোমো সেপিয়ানের' সংস্কৃতির অসামান্য স্ফূর্তির ও উহার নিকৃষ্ট বিকৃতির প্রমাণ। নিঃসন্দেহ, ইয়ুরোপে ফ্যাশিজমের পরাজয়ে যুদ্ধ তখন শেষ হইতেছিল, এই বিভীষিকা সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই বিধ্বংস-বৃষ্টি ব্যতীতও পৃথিবীতে আণবিক শক্তির সুপ্রয়োগে ফ্যাশিস্ত ইতরতামুক্ত মানব-সভ্যতার অপরূপ বিকাশ সম্ভব হইত। কিন্তু রাষ্ট্রনায়ক ও যুদ্ধনায়কেরা তাহা হইতে দেয় নাই। এখনো দিতেছে না। তাই বলিয়া বিজ্ঞানের জয়যাত্রা কে রুদ্ধ করিবে? সেই বিশ্ববিপ্লব ঠেকাইতে গেলে সভ্যতার বিপর্যয় অনিবার্য। মানুষের অস্তিত্বই হইবে বিপন্ন। হোমো সেপিয়ান-এর বুদ্ধি যেমন অমেয়, তাহার দুর্বুদ্ধিও তেমনি নিতান্ত কম নয়। তবু বুদ্ধি উহার কাছে কোনো দিনই নিঃশেষে হার মানে নাই। তাই আশা করা যাইতে পারে—রাষ্ট্রনায়করা স্বার্থে জড়াইয়া পড়িয়া বিজ্ঞানকে বিকৃতির মধ্য দিয়া পথ করিয়া দিতে দিতে সুবুদ্ধিরও পথ করিয়া দিতেছে;—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিপ্লবের পথে বাধা দিতে দিতেও বিশ্ববিপ্লবকেই আগাইয়া আনিতেছে। ১৯৪৬-এর ৮ বৎসর মধ্যে আণবিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার ভাঙিয়া সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করিয়া দিলেন—বৈজ্ঞানিক বিপ্লব জাতিগত একাধিপত্যকে চূর্ণ করিয়া দিবে। কোনো একটি বিশেষ জাতির স্বার্থে মানব জাতি বলি যাইবে না। অপরদিকে পৃথিবীর মানুষ জাতিতে জাতিতে ব্যবধান রচনা করিয়া নিজেদের বেড়ার আড়ালে পরস্পরের হইতে যুগ-যুগান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল। তবু তো পুঁজিবাদের যুগেই জাতীয় স্বার্থের ও শোষণ স্বার্থের তাড়নায় জাতিতে জাতিতে সেই অপরিচয় ঘুচিয়া গিয়াছিল। এখন আণবিক শক্তির আয়োজনে পৃথিবীর সকল জাতির সেই পরিচয়-সূত্র নিকট বন্ধনে পরিণত হইতে থাকিবে। সংকীর্ণ জাত্যাভিমানের আর স্থান নাই।

আণবিক বোমার 'মনোপলি' যখন বিজ্ঞান টিকিতে দিল না তখন স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও একচ্ছত্র পুঁজিবাদের বা মনোপলি ক্যাপিটালিজম্‌-এর সর্বাধিপত্যই বা আর কিরূপে টিকিবে ?

বলিতে পার, ১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবেই তো সোভিয়েত বিজ্ঞানের জন্ম। আর এই আণবিক শক্তির মনোপলি ভাঙিবার মতো সামাজিক বৈজ্ঞানিক আয়োজনও তো তাহা হইলে সেই অক্টোবর বিপ্লবেই আয়োজিত। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, পৃথিবীর সামাজিক-রাষ্ট্রিক, বৈজ্ঞানিক-উদ্যোগিক বহুবিধ ও অগণিত সংখ্যক প্রচেষ্টার ও অপচেষ্টার মধ্য দিয়া যে যুগসন্ধি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই 'অক্টোবর বিপ্লব' একটা বিশিষ্ট বিরাট মহাফলপ্রসূ আয়োজন, বিশ্ববিপ্লবের স্বপক্ষে উহাই সুস্পষ্ট পদক্ষেপ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লবও অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তির আয়োজনেই প্রয়োজনীয়; পৃথিবীব্যাপী শিল্পবিজ্ঞানের বিকাশে ও প্রয়োজনেই তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্ভব। এক অনুন্নত সমাজের দুর্বল ব্যবস্থাকে চূর্ণ করিয়া 'অক্টোবর বিপ্লব' রূপে যাহা প্রকাশিত হইল তাহাও আসলে বিজ্ঞানোন্নত দেশের মুনাফা-বন্ধন পীড়িত বিজ্ঞানের মুক্তি প্রয়োজনে আরব্ধ। এই হিসাবেই ১৯১৭ এর অক্টোবর বিপ্লব ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক ও কারুকৃতিগত বিপ্লবের পাদপূরণ এবং অনারব্ধ বিশ্ববিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ। সেই বিশ্ববিপ্লবই সুনিশ্চিত হইয়া গেল ১৯৪৬-এ মানুষের আণবিক শক্তির অধিকার অর্জনে। বলিতে চাও বলিতে পার—সেই বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ১৯৫৭ এর ৪ঠা অক্টোবরের 'স্পুৎনিক' যাত্রা হইতে ১৯৬১-এর ১২ই এপ্রিলের প্রথম ভোস্তক-এর মহাকাশ পরিক্রমা সূত্রে ইতিমধ্যেই বিশ্ববিপ্লবের নবতর রূপটিকেও আমাদের চেতন-লোকে আনিয়া স্থাপন করিতেছে। এই মহাবিশ্বের মধ্যে এই পৃথিবীর বাসগৃহটিতে বিশ্বমানবের আত্মীয়তাবোধ ইহার মধ্য দিয়া একটা সত্য হইয়া উঠিতেও বাধ্য। বিশ্বের পরিচয়ই কি মানুষের মনে কম বিস্ময়ের বা কম প্রজ্ঞাদৃষ্টির সঞ্চার করিবে ? শুধু বিজ্ঞানের বিপ্লবের নয়, মানুষের মানবিক বোধের, জীবন-বোধের ও বিশ্ববোধের এক নবতর অভিব্যক্তি এইরূপে অনিবার্য। বিজ্ঞানের বিস্তারের ফল চৈতন্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইলেই তৎক্ষণাৎ চৈতন্যের বিস্তার ঘটে না। অনেক ধীরে, অনেক সূক্ষ্মতর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খলের মধ্য দিয়া চৈতন্যের সে বিস্তার ও পরিবর্তন ঘটে—তাহা দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও দুর্জ্ঞেয় নয়। সংস্কৃতির যে রূপান্তর এই চৈতন্যের আলোড়নে অবশ্যম্ভাবী, নিশ্চয়ই আজও তাহা আমাদের কল্পলোকের বিষয়। কিন্তু সংস্কৃতির যে রূপান্তর-সম্ভাবনা এখনি আমাদের নিকট স্পষ্ট তাহার প্রধান বাহন বিজ্ঞান; বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান দুইই। হয়তো বিশুদ্ধ বিজ্ঞান অপেক্ষাও ফলিত বিজ্ঞানরূপেই আমরা তাহার সহিত বেশি পরিচিত হই। কারণ, আপেক্ষিকতা-বাদের গণিত বুঝি বা না বুঝি, আণবিক বিজ্ঞানের সূত্রসমূহ একবর্ণও না জানিতে পারি, কিন্তু আণবিক শক্তির ফলিত দান তো প্রত্যক্ষ; প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়াই চেতনায় তাহা স্বীকৃত হইতেছে। 'অটোমেশন' বা স্বয়ংচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা, সিবারনিটিক্‌স্‌ বা 'সম্বার্তিক বিদ্যা' এবং আণবিক বিজ্ঞান,—আধুনিক বিজ্ঞানের এই তিন প্রধান দানে মানুষের জীবনযাত্রায় বিপ্লব যে ঘটিতেছে তাহাদের কোনোটিকে না চিনিয়া আমরা পারি না। এই সব বিজ্ঞানই আজ জীবনযাত্রার রূপদান করিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপায়ণ চলিতেছে। আণবিক বিজ্ঞানের বিপ্লব অপরাজেয় বলিয়াই বলিতেছি বিশ্ববিপ্লবও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।''

পৃথিবীর রূপান্তর

বিশ্ববিপ্লব জিনিসটা সত্যই বাস্তবে যখন আসিয়াছে তখন ঠিক মার্কস্‌-লেনিনের পূর্বানুমিত ছকে-বাঁধা পথে আসে নাই,—সেই গতিতেও নয়, সেই রূপেও নয়। তাই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে আমরা বিপ্লবের যুগ বলিয়া মানিলেও, এ যুগের পৃথিবীকে বিশ্ববিপ্লবে আবর্তিত ও বিবর্তিত পৃথিবী বলিয়া চিনিতে পারি না। সাধারণতঃ আমরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রূপ দিয়াই পৃথিবীর রূপ নির্ণয়

করি। মূলতঃ ভুলও করি না। কারণ, রাষ্ট্রশক্তিই শম দম দণ্ড ভেদের মালিক, সমাজ পরিচালনার জন্য দায়ী। এই রাষ্ট্রশক্তি অধিকৃত না হইলে বিপ্লবও সার্থক হয় না। বৈপ্লবিক শক্তি কিন্তু তাই বলিয়া কখনো অবরুদ্ধ হইয়া থাকে না। কোথাও তাহা থাকে আবর্তনের অভ্যুত্থানের অপেক্ষায়, কোথাও বিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিণতির প্রতীক্ষায়। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক নানা বাস্তব ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবেরও বিভিন্ন স্তর থাকিতে পারে, এই কথাটিও বুঝা প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, চারিদিকের পরিবর্তমান ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে জীবনধারণ করিতে করিতে বিপ্লবের বাতাস আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়া রক্তে নবশক্তি সঞ্চার করিয়া চলে। বৈপ্লবিক পরিবর্তনকেও অনেকাংশে তাই ক্রমেই সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। 'কনট্রোল', 'পাবলিক্ ওনারশিপ্' এসব কি বিংশ শতকের পূর্বে সহজ সাধ্য ছিল? এই সব কথা মনে রাখিলে পৃথিবীর বর্তমান রূপান্তরকে কি না চিনিয়া পারা যায়?

সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তি

প্রথমেই তো চক্ষে পড়ে প্রধান সত্যটা—১৯১৭তে বিশ্ববিপ্লবের পাদপীঠ মাত্র একটি দেশে—পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে—রচিত হইয়াছিল। তখন মাত্র বারো (পরে আঠারো) কোটি মানুষের জীবনকে নবরূপদানের অধিকার সোভিয়েত পাইয়াছিল। এখন তো যুগোশ্লাভিয়া ও পূর্বজার্মানির জার্মান গণরাষ্ট্র শুদ্ধ সমস্ত পূর্ব ইয়ুরোপের আটটি রাষ্ট্রে সেই বিপ্লবী শক্তিই রাষ্ট্রশক্তি—তাহা সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। এশিয়াতে মঙ্গোলিয়া ও সোভিয়েত-এশিয়া বাদ দিলেও মহাচীনশুদ্ধ তিনটি নতুন রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সার্থক। এমন কি আমেরিকাতেও তাহার একটি আশ্রয় কুবায় স্থাপিত হইয়াছে—যতই হউক তাহা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চক্ষে ক্ষুদ্রের স্পর্ধা, দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষে একটা 'কুদৃষ্টান্ত'। সমাজতন্ত্রী পৃথিবীর এই শক্তিবৃদ্ধি এই যুগের প্রধান সত্য। এই সত্যের দ্বারাই পৃথিবীর রূপ মৌলিকভাবে প্রভাবিত হইতেছে কি হইতেছে না, তাহা অবশ্য তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু এই পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষের জীবন যে আজ এই বৈপ্লবিক আদর্শে রূপান্তরিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যথা, এই এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবীতে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ এখনই প্রায় অতীতের বস্তু; কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় আর্থিক জীবন বিন্যস্ত; বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগপথ সেখানে উন্মুক্ত; শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে মোটের উপর সমাজমঙ্গলের আদর্শে বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রাণিত। ব্যতিক্রম ঘটিলেও ইহাই সাধারণ সত্য।

নিশ্চয়ই এই বৈপ্লবিক রূপান্তরের অর্থ সকলের রূপহীনতা বা কাহারও বৈশিষ্ট্যহীনতা নয়। বরং একটি দেশ যখন আর কমিউনিজম-এর কাণ্ডারী নয়, তখন যতই অনুধ্যেয় ও অনুকরণীয় হোক তাহার প্রদর্শিত সমাজতন্ত্রী সাধন-পদ্ধতি, যতই দুশ্ছেদ্য হোক কমিউনিস্ট মৈত্রীবন্ধন, নানা ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক প্রভাবে এই সব দেশের প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে, কর্মকাণ্ডে, কৌশলে ও পদ্ধতিতে ছোট বড় নানা পার্থক্যও থাকা অবশ্যম্ভাবী। আর তাহাই স্বাভাবিক। বিচিত্র পৃথিবী সমাজতন্ত্রের নিয়মে বৈচিত্র্যহীন হইলে তো নিদারুণ ভয়ের কথা,—'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' আনিয়াই তো সমাজতন্ত্র সার্থক হইবার কথা।

সোভিয়েত ও চীনের সমাজতন্ত্রী দলের মতপার্থক্য প্রকাশ্যে আলোচিত হইয়া বহুদিন অমীমাংসিত থাকাও আশ্চর্য নয়। কারণ, বাস্তব জগৎ সহস্র জটিলতায় সমাচ্ছন্ন। বর্তমান পৃথিবীর মূলগতি সম্বন্ধে তাহারা সকলেই একমত, যথা, বৈপ্লবিক শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু আপেক্ষিক কার্যক্ষেত্রে কোন্ মুহূর্তে কী যে মূল অবস্থা এবং তাই কৌশলও যে কখন্ কী, তাহা বুঝিয়া উঠা তত সুসাধ্য নয়। সুসাধ্য হইলে অবশ্য কাজটি জ্যামিতির সমস্যার মতো স্কেল মাপিয়া দাগ টানিয়াই শেষ করিয়া দেওয়া যাইত। নানা দৃষ্টিভঙ্গির ও নানা মতের পারস্পরিক আদান-প্রদানে পৃথিবীর প্রগতির রূপ নির্ণয় না করিয়া কোনো এক নেতৃত্বের কথাকে বিনা প্রশ্নে মাথা পাতিয়া

লইলেই বরং ভুলের অবকাশ বেশি, ক্ষতির কারণও অধিক। কারণ, বিপ্লবীরাও সকল বিষয়ে অভ্রান্ত নয়—লেনিনও ভুল করিয়াছেন, অন্যেরাও নিশ্চয়ই করেন। তবে যত শীঘ্র ভুল বুঝিয়া সে ভুল যত শীঘ্র শুধরানো যায়, তাহাতেই বিপ্লবী বুদ্ধির সার্থকতা। নব-নব রাষ্ট্রে বিপ্লবের প্রকাশ সশস্ত্র, নিরস্ত্র বা অল্পাধিক সশস্ত্র, অল্পাধিক নিরস্ত্র প্রভৃতি নানা পদ্ধতিতেই হইতে পারে। বিপ্লব রূপায়ণেও নানা বৈশিষ্ট্যের, নানা বৈচিত্র্যের উদ্ভব সম্ভব। শুধু স্মরণীয় এই যে, সমাজতন্ত্রী সৌভ্রাত্র অপরিহার্য, সায়েণ্টিফিক্ সোশ্যালিজম্-এর আদর্শ ও মূলনীতিগত ঐক্য অত্যাজ্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রে চাই শ্রমিক ও সাধারণ মেহনতী মানুষের পূর্ণাধিপত্য; আর্থিক বিন্যাসে চাই উন্নততর উৎপাদন ও ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজের সাধারণ মালিকানা; শিক্ষায় সংস্কৃতিতে বুদ্ধিজীবীদের সমাজবাদী দায়িত্ব পালন; মানবিক বোধের প্রসার। এই মূলনীতিও কার্যক্ষেত্রে বিশেষ দেশের বিশেষ আধারে যে প্রয়োজন মতো বিশিষ্ট হইবে—খর্বিত না হইয়াও বিশেষ অবস্থানুরূপে রূপায়িত হইবে, —তাহাও জানা কথা। এই বৈশিষ্ট্য কোথাও ঘটে অসমান অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য; কিম্বা অপরাপর পারিপার্শ্বিক কারণে। যেমন, চেকোস্লোভাকিয়া শ্রমশিল্পে উন্নত দেশ হইলেও সেখানকার কৃষিতে পূর্বে ভূম্যধিকারী ধনিকের প্রাধান্য ছিল। বুলগেরিয়া শিল্পোন্নত দেশ নয়, কিন্তু বুলগেরিয়ার সামন্ত জমিদাররা বহু পূর্বেই (১৮৭৭-৭৮) দেশত্যাগ করিয়াছিল, তাই সেখানে ভূমিব্যবস্থায় চেকোস্লোভাকিয়ার মতো জমিদার-সমস্যা ছিল না। অতএব, দুই দেশে বিপ্লব রূপায়ণ-পদ্ধতিতেও এদিকে কিছু পার্থক্য থাকিবে। এইরূপে অসমানতা ছাড়া, পারিপার্শ্বিক বা তৎকালিক বিশেষ পরিস্থিতিতেও এরূপ পার্থক্য দেশে দেশে ঘটিতে পারে। অনেক দেশেই বিপ্লব উদ্ভূত হইয়াছে যুদ্ধের রক্তস্নানের পরে—বিপ্লব অন্য অবস্থায় উদ্ভূত হইলে সেখানে অত রক্তাক্তরূপ গ্রহণ নাও করিতে পারিত। প্রথম বিপ্লবে বহির্বিশ্বের যত দৌরাত্ম্য রুশদের সহিতে হইয়াছে অন্যদের তাহা সহিতে হয় নাই; গৃহবিরোধও তত নির্মম হয় নাই। কাজেই রক্তপাতও তত বেশি হয় নাই। অবশ্য যতই সমাজতন্ত্রী রূপায়ণ সুসম্পন্ন হয় ততই এরূপ দেশে দেশে পার্থক্য বিলুপ্ত হয়, তখন থাকে শুধু বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বা জাতীয় নিজস্বতার ছাপ। উহাকে প্রাধান্য দিলে তাই ভুল হয়, আবার উড়াইয়া দিলেও চলে না। কিন্তু নিশ্চয়ই কখনো কখনো কেহ প্রাধান্য দিয়া বসে, কেহ বা আবার উড়াইয়া দিতেও চাহে। সমাজতন্ত্রীদের পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়া কোনো বিষয়ে মতভেদের সমাধান না হইলে কালের বাস্তব প্রমাণে ভুল কোথায়, তাহা ধরা পড়িতে বাধ্য। সমাজতন্ত্রী হইলেই কোনো দেশ ভুল করিতে পারে না, তাহা নয়। কিন্তু মূল কথাটা এই—সাধারণ নীতি এক হইলেও অসমান বিকাশের জন্য বা বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য বিপ্লবের রূপ ও রূপায়ণের পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইতে পারে। ব্রিটেনের মতো পার্লেয়ামেণ্টারি গণতন্ত্রের দেশে সত্যই যদি শান্তিপূর্ণ পথে শ্রমিক-বিপ্লব ঘটে, শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য সেস্থলে তবে কী রূপ গ্রহণ করিবে তাহা কে বলিতে পারে? কারণ, দেখা যাইতেছে যেখানে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য সুদৃঢ় সেখানে তো জনসাধারণ এখনো এরূপ বিপ্লবের অনুষ্ঠান করে নাই।

আফ্রেশীয়ায় জাতীয় বিপ্লবের জয়

সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তি যদি পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হইয়া থাকে, ধনিকতন্ত্রীরা কিন্তু পৃথিবীর বাকী দুই-তৃতীয়াংশেরও আর নিঃসংশয়ে অধিকারী নাই। প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যবাদের শাসন কাটাইয়া এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পৃথিবীর বিরাট অংশ স্বাধীন হইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন হইতে হইতে মুক্ত হইয়াছে। বহু নতুন জাতি ও নতুন শক্তি জন্ম লইয়াছে। এশিয়ায় ভারতবর্ষ ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতির জানা নাম না করিলেও চলে। কিন্তু এই কথা বলিতেই হইবে—বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম বিস্ময় আফ্রিকার আত্মপ্রকাশ। শুধু মিশরের মতো পুরাতন জাতি নয়, অথবা আরবমণ্ডলের তুনিসিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতির স্বাধীনতাও নয়। কৃষ্ণ আফ্রিকার

অভ্যুদয়ই জগতের রাজনৈতিক রূপান্তরের দিক হইতে এখন এক প্রধান ঘটনা। এখনো অবশ্য সমস্ত কৃষ্ণ আফ্রিকা স্বাধীন নয়; কঙ্গো মুক্ত নয়; পর্তুগাল-স্পেনের রক্ত-পায়ী সাম্রাজ্যবাদ আফ্রিকায় এখনও পরাভূত নয়; দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র ফ্যাশিজম্ নিরঙ্কুশ; রোডেশিয়ার নামাবলী-পরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও শেষ আশা ছাড়িতেছে না। কিন্তু এশিয়ার প্রায় শতকরা ৯৭ ভাগ ও আফ্রিকার শতকরা ৭৫ ভাগ এখন স্বাধীন। মোটের উপর সাম্রাজ্যবাদের শক্তি এশিয়া-আফ্রিকায় ক্ষয় পাইয়াছে। দুই মহাদেশে এখনো মাত্র ৭·৬ শতাংশ এলাকা ও ১·৫ শতাংশ মানুষ উপনিবেশ-বাদের নিগড়ে আবদ্ধ। অবশ্য পৃথিবীতে ধনিকতন্ত্রের উগ্র আধিপত্য প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রূপেই টিঁকিয়া থাকিতে চাহিতেছে—সাম্রাজ্যবাদী ইয়ুরোপীয়রা টিঁকিলে টিঁকিবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীরূপে, তাহারই আনুগত্যে।

এই নবজাত রাজ্যসমূহের দিকে তাকাইলেই বুঝিব এযুগের বিপ্লব কত বিভিন্ন পথে রূপ লাভ করিতেছে। যেমন, ঘানা, মালি প্রভৃতি রাষ্ট্র ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব পরিহার করিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানা বৃদ্ধি করিয়া সমাজতন্ত্রের দিকেই মুখ রাখিয়াছে। জাতীয় বিপ্লবই এরূপে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবে পরিণত হওয়া আজ অসম্ভব নয়। আবার মিশরের কথা বুঝিলে বুঝিব এই ধারারও কত বিচিত্র রূপ—কোথাও তাহা কতকটা গণতন্ত্রী (ঘানা, এশিয়ার ভারত, সিংহল ও কতকাংশে ইন্দোনেশিয়ায়), কোথাও সামরিক একনায়কতন্ত্রী (মিশর, এশিয়ার ব্রহ্মে)। আবার কোথাও কোনো দেশ বিভ্রান্ত, কখনো পূর্ব ঔপনিবেশিক (ফরাসী বা ব্রিটিশ) প্রভুদের আওতায় একটা দেশীয় মালিকশ্রেণী গড়িতে সচেষ্ট (যেমন, এশিয়ায় পাকিস্তান)। কোথাও বা তাহা এত বিভ্রান্ত যে স্বাধীনতাকে রূপায়ণ করিবার পথও বাছিয়া লইতে অক্ষম। এই সব রাজ্যের মধ্যে অসমানতা বহুদিকে। কেহ ঔপজাতিক (tribal) স্তর সর্বাংশে ছাড়াইয়া জাতীয়তার স্তরে আজও পৌঁছায় নাই (ঘানাও প্রায় সেরূপ দেশ), অথচ অসীম সাহসে কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়া একেবারে ধনিকতন্ত্রের স্তর এড়াইয়া শিল্পায়ন করিতে চাহে, ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজবিকাশের স্তর ছাড়াইয়া লইয়া একেবারেই সমাজতন্ত্রের দিকে চলিতে দৃঢ়সংকল্প; সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনেই গণতন্ত্রকে সীমিত, নিয়ন্ত্রিত করিতেও দ্বিধা করে না। কেহ বা সাম্রাজ্যবাদের আওতাতেই আধা-সামন্ততন্ত্রী জীবন যাপনে স্বীকৃত। মোটের উপর ইহাদের প্রবণতা দেখিয়া এই নতুন স্বাধীন দেশগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রথম, জাতীয় বিপ্লব যেখানে ধনিকতন্ত্র এড়াইয়া সমাজতন্ত্রে পরিণত হইতে যত্নপর। বলাবাহুল্য, তাহাদের বিবেচনায় অনুন্নত দেশের দ্রুত উন্নয়নের পথ নির্দেশ করিয়াছে সোভিয়েত রাষ্ট্র; আর পর-শাসনের ও শোষণের বিরোধ সোভিয়েতের মূলনীতি বলিয়া সোভিয়েত দেশই তাহাদের চোখে তাহাদের নিঃস্বার্থ সহায়ক, অকৃত্রিম বন্ধু। তথাপি ইহারা অনেকেই উত্তর-কোরিয়া, উত্তর-ভিয়েৎনাম বা কুবার তুলনায় জাতীয় বিপ্লবকে দ্রুত সমাজতন্ত্রী বিপ্লবে পরিণত করিতে সংকুচিত। মিশর, ঘানা, গিনি, মালি, ইন্দোনেশিয়া, [illegible] প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিতে এরূপ লক্ষণ দেখা যায়। দ্বিতীয় ভাগ, ধনিকতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া গণতন্ত্রী পথে বিপ্লবে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয়করণের (state capitalism) দ্বারা সমাজতন্ত্রী ধাঁচে জাতীয় জীবন রূপায়ণ করিতে চায়। ভারত রাষ্ট্রই এই পথের প্রধান উদ্যোক্তা। এই ধরনের রাজ্যের মধ্যে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের প্রতি বিরোধিতা স্পষ্ট। রাষ্ট্রীয়করণ অনেক সময়ে এসব দেশে সাধারণের আয়ত্তীকরণ নয়, যথার্থ সমাজতন্ত্রও নয়। তৃতীয় ভাগে মালয় পাকিস্তান হইতে পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি রাজ্যও পড়ে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কিংবা তাইওয়ানের চাংকে ধরাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। উহারা পশ্চিমী গণতন্ত্রের বিচিত্র 'গণতন্ত্রী' পোষ্যপুত্র, অর্থাৎ খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদেরই বেনামী জমিদারী।

প্রতিক্রিয়ার বিকৃতি

সাম্রাজ্যবাদেরও তাই আধুনিক রূপটা বুঝিবার মতো। তাহার নীতি—যেখানে সম্ভব শাসিতদের মধ্যে বিভাগ-সৃষ্টি; ভারতবর্ষ, কোরিয়া, চীন, ভিয়েৎনাম হইতে জার্মানী পর্যন্ত সর্বত্র

ইহার প্রমাণ দেখা যায়। কিংবা, যেখানে সম্ভব রাজনৈতিক শাসন প্রকাশ্যে গুটাইয়া আনিয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখা—সেই উদ্দেশ্যে একদিকে 'সাহায্য' দান করা ও পুঁজি লগ্নি করা। অন্যদিকে, ঘাটি বাঁধা, যুদ্ধায়োজন করা, যুদ্ধের উৎপাদনে ও আতঙ্কে মুনাফাবাদী অর্থনীতি ও ধনিকতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ সংকটকে ঠেকাইয়া রাখা। নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদেরও ধনিকতন্ত্রের অধিকার রাজনৈতিক ব্যাপ্তির হিসাবে অনেক সংকুচিত। কিন্তু তাই বলিয়া অস্ত্রশক্তিতে, ও সামরিক শক্তিতে, শিল্প-শক্তিতে, এমন কি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের শক্তিতেও মার্কিন নেতৃত্বে চালিত ধনিকতন্ত্রীরা একেবারেই হৃতবল নয়। বাজার মন্দা না হইলে বহুশোষণপুষ্ট জীবনমানও কাহারও কাহারও যথেষ্ট উচ্চে থাকিবে। অভ্যন্তরে যতই ক্ষয়িত হোক, রাজনৈতিক হিসাবে এখনো যে ধনিকতন্ত্র বাহ্যতঃ প্রবল তাহার প্রমাণ সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনেই পাওয়া যায়। সামরিক হিসাবে যে সে বরং অধিকতর অস্ত্রশক্তি, সৈন্যবল ও মারণ-সংকল্প আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর, ইহাও সত্য। নাটো, সিয়াটো, মেদো (বাগদাদ চুক্তি) প্রভৃতির দ্বারা বিশ্বজোড়া সামরিক ঘাঁটি বাঁধিয়া বিশ্বযুদ্ধের এমন ব্যূহ রচনা পূর্বে কেহ করে নাই—হিটলার মুসোলিনি তোজোও না। এমন মারণাস্ত্রের সজ্জা তো তখন অকল্পিতই ছিল। কিন্তু শক্তির অপেক্ষাও বড় সত্য—তাহার দৌর্বল্য। তাইওয়ানে, কোরিয়ায়, ভিয়েৎনামে যেরূপ দেখা গিয়াছে, কঙ্গোতে যাহা বুঝা গিয়াছে, এখনো ইন্দোচীনে লাওসে যাহা দেখা যায়, তাহাতে ধনিকতন্ত্রের অধঃপতন বুঝা যায়। স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী চেতনাকে গণতন্ত্রী বিপ্লবী চেতনায় সুস্থির হইতে না দিয়া স্বৈরতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ায় বিকৃত করাই পৃথিবীর ধনিকতন্ত্রী নেতৃত্বের বর্তমানের অন্যতম কৌশল। অর্থাৎ, যে গণতন্ত্র ধনিকতন্ত্রের একদিনকার প্রধান মন্ত্র ছিল, আজ ধনিকতন্ত্র তাহাই বাতিল করিতে ব্যস্ত। আবার, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র ছাড়াইয়া ইহাদের বিভীষিকাবাদী সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি যে ধনিকতন্ত্রের এককালের সমস্ত অধ্যাত্ম-চেতনাকেই বিকৃত করিতেছে তাহাও সুস্পষ্ট। এখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে সর্বাগ্রগণ্য। বিপুল তাহার বিজ্ঞান সাধনা। কিন্তু সেই বিজ্ঞান, সেই বিদ্যা অধিকাংশই উৎসর্গীকৃত সামরিক উদ্দেশ্যে। অপ্রতিহত তাহার প্রচার ক্ষমতা; যুদ্ধের প্রচারে, আণবিক ধ্বংস সম্বন্ধে মানুষকে অজ্ঞ বা উদাসীন ও ভ্রান্ত রাখিতে তাহা প্রযুক্ত। শিল্পে সাহিত্যেও তাহাদের যে যুগ-যুগ আয়ত্ত কলানৈপুণ্য তাহাও প্রায়শঃ প্রযুক্ত হইতেছে রিরংসার চিত্রণে, অপরাধ-প্রবণ মানসিকতার ব্যাখ্যানে, পাশবিকতাকে পৌরুষ বলিয়া প্রশংসায়, মানবতার প্রতি (কোথাও রাষ্ট্রীয় পাপ বোধের নামে, কোথাও জৈববিজ্ঞানের নামে) অবিশ্বাস সৃষ্টিতে। ইহাই ক্ষয়িষ্ণু ধনিকতন্ত্রী সংস্কৃতির সর্বাধুনিক রূপ।

মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা

অবশ্য নিছক কলাকৃতিত্বের বা বিশুদ্ধ শিল্প-নৈপুণ্যের দিক হইতে পাশ্চাত্য ধনিকতন্ত্রী বা জাপানের মতো এশিয়ার ধনিকতন্ত্রী সংস্কৃতিকে বিচার করিলেও মানিতে হইবে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, কিংবা সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাট্য ও নৃত্যে ধনিকতন্ত্রী জাতিরা এখনো দীন নয়। বরং কোনো কোনো দিকে, অর্থের প্রাচুর্যের ফলে ও গতানুগতিক ঐতিহ্যের নিয়মে তাহাদের সাংস্কৃতিক রূপবিলাস, আঙ্গিক বিভ্রম, উদ্ভাবনার প্রয়াস এখন আরও বেশি চমকপ্রদ। কিন্তু 'নিছক কলাকৃতিত্ব' ও 'বিশুদ্ধ শিল্পনৈপুণ্য' কথাদুটিই শিল্পসৃষ্টির দিক হইতে চরম কথা নয়, বরং তাহা ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক এক অর্ধসত্যের মায়াজাল। অনেক সময়েই ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ও ক্ষয়িষ্ণু জীবন-বোধের বিষপুষ্প এইরূপ কলা-কৃতিত্ব।

শিল্পের নিজস্ব মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কেবল মাত্র বাহিরের উপযোগিতা দিয়া শিল্পবস্তুর মূল্য স্থির হয় না,—এই পুরাতন সত্য চিরদিনই সত্য। কিন্তু জীবনের সাধনাতেই শিল্পের আসল মূল্য, জীবনবোধের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব দিয়াই তাহার চরম বিচার। আর ঠিক সেইখানেই ধনিকতন্ত্রের শিল্প-সাহিত্য দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে। জীবনভ্রষ্ট হইয়া সে শিল্প প্রায়ই আত্মভ্রষ্ট।

অথবা বিকৃত জীবনবোধের চক্রে ধনিকতন্ত্রের অতিনিপুণ কলা-কৃতিত্ব আজ বিকৃত, বিষাক্ত। এইখানেই আবার সোভিয়েত শিল্পকলার উৎকর্ষ—তাহার আদর্শ বিকৃত নয়। অবশ্য, জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে, সমাজ-প্রগতির উদ্দেশ্যে, 'নতুন মানুষ' গড়িবার আদর্শে, সোভিয়েত শিল্পকলা সেই কলা-কাণ্ড ('সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা') এত উগ্রভাবে অনুসরণে তৎপর যে, তাহা অনেক সময়ে রসোত্তীর্ণ হয় না। তাহাতে যে অভাব সে অভাব, আসলে জীবনচেতনার। ক্ষয়িষ্ণু বিকৃতিতে নয়, বরং সদুদ্দেশ্যের মাত্রাধিক্যেই সোভিয়েত শিল্পীদের এই বিভ্রান্তি। সেই উদ্দেশ্যের চাপেই জীবন-রসের অফুরন্ত রহস্যময়তা, মানব-রসের অভাবনীয় বিস্ময় সম্বন্ধে সোভিয়েত শিল্পী সময়ে সময়ে অবহিত হন না। 'সামাজিক বাস্তবতা'র সুদৃঢ় সূত্রে কেন, কোনো ধরাবাঁধা সূত্রেই জীবনকে গাঁথিয়া ফেলা যায় না,—এবং তাহা করিতে গেলে সোভিয়েতের মূল মতাদর্শই অলক্ষ্যে লঙ্ঘিত হয়। চিত্রকলা ও সাহিত্যে যদি বা এই জীবনবোধ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, সোভিয়েত ব্যালে, সোভিয়েত অপেরা তো তাহা স্পষ্টই মানিয়া চলে। সঙ্গীতই কি না মানিয়া পারে? সৃষ্টির পক্ষে এই জীবনবোধের সত্যতাই চরম বস্তু, নিশ্চয়ই সৃষ্টির পরম অবলম্বন। তারপর আসে কলাকৃতিত্ব, উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, রূপায়ণের সর্বাঙ্গীণ সুষমা প্রভৃতি। সোভিয়েত শিল্পকলা এই কলা-কৃতিত্বকে প্রায়ই নিতান্ত গৌণ করিয়া তোলাতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় অনেকাংশে বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়ে। হয়তো সোভিয়েতের এক সাহিত্যিকের মুখে শোনা এই কথাটাই তাঁহাদের এই দিককার সমস্যার সন্ধান দেয়ঃ 'নতুন সমাজের নতুন মানুষ আমরা গড়িতেছি। সাহিত্যেও আমরা সেই নতুন মানুষের পরিচয় উপস্থিত করিতে চাই। কিন্তু কি জানো, নতুন অপরিচিত বলিয়াই নতুন; চেনাকে চেনানো যত সহজ অচেনাকে চেনানো তেমনি কঠিন। ঠিক সেই কারণেই ক্ষয়িষ্ণুতাকে, বিকৃতিকে যত সহজে শিল্পরূপদান করা যায়, বিকাশোন্মুখকে, নবজাতককে তত সহজে শিল্পায়ত্ত করা যায় না। আমাদের সার্থকতা এখন পর্যন্ত সৃষ্টির সম্পূর্ণতায় নয়, বরং নতুনের সৃষ্টির প্রচেষ্টায়,—এই আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায়, নতুন মানুষের প্রতি মমতায়, মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততায়।'

মানবতার প্রতি বিশ্বস্ততা—ইহাই সোভিয়েত বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতির পরম মন্ত্র। আর, বিশ্বসংস্কৃতির এই চিরন্তন সত্যকেই এই যুগে সোভিয়েত যেন নতুন করিয়া মূর্ত করিয়াছে। কুমার সংকটের আত্মসংযমেও তাহারই প্রমাণ মিলিল। তাই যুদ্ধ-প্রচারও সোভিয়েত জগতে নিষিদ্ধ।

মানবভ্রাতৃত্ব

সোভিয়েত রাষ্ট্রে যুদ্ধ-প্রচারের 'স্বাধীনতা' কাহারও নাই—শ্রমিকের নাই, সাধারণ মানুষের নাই, বুদ্ধিজীবীরও নাই। এমন কি, শিল্পে, সাহিত্যে, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক গবেষণায়ও এই ধরনের 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' ও 'প্রকাশের স্বাধীনতা' অস্বীকৃত। মানুষে মানুষে আরও অনেক পার্থক্যকে কৃত্রিম ব্যবধানে পরিণত করিবার চেষ্টাও অগ্রাহ্য—জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে, এমন কি নারী-পুরুষের দৈহিক গঠনের নামে তাহাদের ধীশক্তি ও ঐ ভাবের অপকর্ষ উৎকর্ষ প্রচারও সম্পূর্ণ অবৈধ। তাই বলিয়া য়িহুদীদের সম্বন্ধে সংশয়ের ছায়া সকল রুশের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, এখন পর্যন্ত তাহা বলা সঙ্গত হইবে না—এদিকে অতীতের জের সম্পূর্ণ কাটিয়া যায় নাই। তবে রুশে উক্রেইনীতে, কিংবা তাতারে-উক্রেইনীতে আজ অতীতের বৈরিতা প্রায় অবলুপ্ত। অথচ উক্রেইনী ও রুশের বিরোধকে পুঁজি করিয়া সোভিয়েত সংঘকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আশা হিটলারও করিয়াছিলেন, মার্কিন নেতাদের কমিউনিজম-নিসূদনের এখনো তাহা একটা স্বপ্ন।

মানবভ্রাতৃত্ব অবশ্য শুধু সোভিয়েত সঙ্ঘের জাতিদের ভ্রাতৃত্ব বুঝায় না—নিশ্চয়ই একই সামাজিক ও আর্থিক মতাদর্শের বন্ধনে তাহাদের সৌভ্রাত্র প্রায় অচ্ছেদ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানবভ্রাতৃত্বের নীতি অনুযায়ী জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব কেন, সোভিয়েত মানবতায় এই বর্ণ-বৈষম্যও নিষিদ্ধ। বিশ্বরাষ্ট্রসম্মেলনে সর্ব জাতির ও সর্ব বর্ণের মানুষের প্রতিনিধিরা আজ সমাধিকারে

অধিকারী। কিন্তু নিউইয়র্কে সম্মেলন-ভবনের আওতা ছাড়াইয়া শ্বেতাঙ্গ পাড়ার কোনো হোটেলে, কোনো রন্ধনশালায় প্রবেশ করিবার অধিকার শ্বেত ছাড়া অন্য বর্ণের মানুষের আছে কিনা জানি না। অন্তত কালা আদমীর নাই, কৃষ্ণ আফ্রিকানদের নাই, শ্যামল ভারতবাসীরও যে বিশেষ আছে তাহা নয়। অবশ্য মার্কিন জাতিরা বলিতে পারে—ভারতবর্ষেই কি আফ্রিকার ছাত্ররা ভারতীয় সমাজে তেমন স্বচ্ছন্দ সামাজিক মেলামেশার অধিকার ভোগ করে? নিশ্চয়ই এ বিষয়ে আমাদেরও আত্মবিচারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—সোভিয়েত দেশ শ্বেত, শ্যামল, কৃষ্ণ, পীত সকল জাতির স্বচ্ছন্দ বাসভূমি। কৃষ্ণাঙ্গদের সমাদরই বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিক। এই সমাদর শুধু আজিকার জিনিস নয়। কোনো দিনই সম্ভবত রুশ জাতি কৃষ্ণাঙ্গদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারে নাই। মহাকবি পুশ্‌কিন্‌ তাই দেড়শত বৎসর পূর্বেও সগর্বে উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার মাতৃকুলের কৃষ্ণ-পূর্বপুরুষ ঈথোপীয় হ্যানিবলের কথা। কিন্তু ব্যাপকভাবে ইহা পরীক্ষার বা পরিচয়ের যথার্থ সুযোগ এই যুগেই আসিয়াছে—বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। অবশ্য কৃষ্ণাঙ্গ ঔপজাতিক কর্তৃগোষ্ঠীর আফ্রিকান্‌ সন্তানেরা আদরের এই সুযোগের অপব্যয় করিয়া সমাজ-তন্ত্রী দেশে আফ্রিকার সুনাম কিছুটা বিনষ্ট করিতেছে , তাহাও সত্য।

মহামানবের সাগরতীর

তথাপি, ব্রিটেন যখন ওয়েস্টইণ্ডিয়ান্‌, পাকিস্তানী ও ভারতীয় শ্রমিকের বিরুদ্ধে 'বিদেশী প্রবেশ নিষেধ আইন' বিধিবদ্ধ করিতেছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যখন স্বদেশের কৃষ্ণাঙ্গদের স্কুল-কলেজে পড়িবার সাধারণ অধিকারকেও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না, সোভিয়েত শক্তি তখনি মস্কোতে খুলিয়া বসিল শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত সকল অনুন্নত জাতির জন্য 'লুমুম্বা সৌভ্রাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু এই একটি আয়োজনই সোভিয়েত মানবতার যথেষ্ট পরিচয় বহন করিত—মানব ভ্রাতৃত্বের তাহা জীবন্ত প্রতীক। এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পশ্চাৎপদ জাতিদের সোভিয়েতের প্রতি বিশ্বাসেরও সাক্ষ্য। কিন্তু শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাতেই সোভিয়েত বিশ্ব-মানবের অবাধ বিকাশের আশা সীমাবদ্ধ নয়। মস্কো, লেনিনগ্রাদ্‌ কীয়েফ প্রভৃতি শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেখা যায় আজ আফ্রিকার সকল দেশের অজস্র যুবক, অজস্র ছাত্র। শিক্ষালয়ের সঙ্গে নানা শিল্পক্ষেত্রে কারিগরী বিদ্যায় তাহারা শিক্ষা লাভ করিতেছে। আফ্রিকার নবকলেবর যেমন রাজনৈতিক সত্য হইয়া উঠিতেছে, তাহার সামাজিক-আর্থিক রূপান্তরের আয়োজনও তেমনি সোভিয়েত সুনির্বাহিত করিয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষিত আফ্রিকানদের উদ্ভবে নতুন আফ্রিকার সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশও সন্নিকট হইয়া উঠিতেছে। কে বলিবে বিশ্বমানবের ইতিহাস এই অপমানিত মহাদেশের জাগরণে ভাবীকালে কী অভিনব ঐশ্বর্যলাভ করিবে? আফ্রিকান্‌ জীবনানন্দের স্পর্শে, প্রাণ প্রাচুর্যের দানে, আফ্রিকান্‌ শিল্প-সঙ্গীত-নৃত্যের বিচিত্র বিকাশে আমাদের এই অতি-পরিশীলন-ক্লান্ত মানব সংস্কৃতির নব স্ফূর্তি হইবে, ইহা হয়তো স্বপ্ন নয়।

সোভিয়েত প্রয়াস অবশ্য শুধু আফ্রিকান্‌ ছাত্রদের লইয়াই বসিয়া নাই। আমরা তো জানি—ভারতীয় শিক্ষার্থীদেরও কাছে তাহারা দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। এশিয়ার আফ্রিকার ইউরোপের আমেরিকার সকল জাতের সকল মানুষের জন্য শিক্ষার, সংস্কৃতির, বিজ্ঞানের, কারুবিদ্যার প্রধান তীর্থক্ষেত্র সোভিয়েত দেশ। জটিলতাই কি ইহাতে কম? আফ্রিকার যে ছাত্র আসিল সে হয়তো মধ্য শিক্ষার বিদ্যাও স্বদেশে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার সুযোগ পায় নাই। আরব মণ্ডলের ইরাকী ছাত্র হয়তো আসিয়াছে কলেজের অন্তর্বর্তী (ইণ্টারমিডিয়েট) স্তরের শিক্ষা আয়ত্ত করিয়া। অথচ ভারতের শিক্ষার্থী গেল শিক্ষা শেষে দুই-চার বৎসর কলেজে অধ্যাপনা করিয়া বা গবেষণা করিয়া। এদিকে সোভিয়েত দেশের নিজের বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষায় আসে প্লাবনের মতো দিনে দিনে অধিকতর সংখ্যায়। ইহাদের সঙ্গে নানা স্তরের নানা ভাষার প্রত্যেকটি বিদেশীকে রুশ ভাষা শিখাইয়া তাহার

নিজস্ব মানে, নিজস্ব বিষয়ে সোভিয়েত শিক্ষায়োজনের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে মিলাইয়া লওয়া একটা জটিল সাংগঠনিক সমস্যা। আফ্রিকার ঔপজাতিক 'রাজার' (tribal chief) পুত্রকন্যা, কোনো কোনো আরব দেশের সেরূপ সম্পন্ন ছাত্রগণ অনেকে জীবনে গণতন্ত্রের পক্ষপাতী নয়, ও ছাত্রাবস্থার ছাত্রোচিত সংযম নিয়মের ঐতিহ্যেও অভ্যস্ত নয়। তাহারা তাই জটিল সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে। তাহা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নৈতিক আদর্শের তরুণ-তরুণীর ব্যক্তি-সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী আদান-প্রদানে। এই সব জটিল সমস্যার ঝুঁকি জানিয়া বুঝিয়াই সোভিয়েত সমাজ গ্রহণ করিতেছে। কেন? মানবভ্রাতৃত্বের সাধনা তাহার সাধনা বলিয়া।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে দাঁড়াইয়া, শহরের পথে চলিতে-চলিতে, গ্রীষ্মের স্বাস্থ্যনিবাসে বিশ্রাম করিতে করিতে, সোভিয়েতের সর্বত্র দেখিতে হয় এই কৃষ্ণ-আফ্রিকান্, ইরাকী-মিশরী, চীনা-জাপানী, কোরীয়, ইন্দোনেশীয়-ইন্দোচীনী, ভারতীয়, জার্মান, পূর্ব-ইউরোপীয় আর সর্বশেষে কুবান্ ছাত্রদের সমারোহ। মানব-মহাজীবনের সঙ্গীত কানে আসিয়া পৌঁছায়। তখন নিজেকেও বিরাট পুরুষের অবয়ব রূপে না চিনিয়া উপায় থাকে না—এই তো 'মহামানবের সাগর তীর'।

তারপর যখন 'এশিয়ার লোক জীবন পরিষদ্' ও 'আফ্রিকার লোক-জীবন পরিষদে'র আয়োজন লক্ষ্য করা যায় তখন বুঝিতে কষ্ট হয় না—কী আগ্রহ সোভিয়েত সংস্কৃতির পৃথিবীর সকল জাতির, সকল মানুষের ভাষা শিখিবার, তাহাদের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিচয় সংগ্রহ করিবার। ভারতের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সোভিয়েত সমাদরের কথা আমরা জানি—উহাতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিতেছে, তাহা আরও বেশি করিয়াই জানি। কিন্তু আমরা একবার কল্পনা করিয়া দেখি কি—শুধু ভারতের বাঙলা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি আধুনিক প্রধান ভাষাসমূহ নয়, শুধু রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত অনুবাদ-আয়োজন নয়, কিংবা সংস্কৃত ও আরবী-পারসীও নয়,—জাপান-কোরিয়া হইতে ব্রহ্ম সিংহল, আফ্রিকার ইউরোপের সকল প্রধান প্রধান ভাষার জন্য সোভিয়েত দেশে পাঠক্রম প্রস্তুত আছে, শিক্ষক আছে, শিক্ষা চলিতেছে,—অনুবাদ চলিতেছে, দোভাষী তৈয়ারী হইতেছে, গবেষণা আরম্ভ হইতেছে। আর এই সবই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরম্ভ হইয়াছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে—একদিকে যখন যুদ্ধের ধ্বংস সরাইয়া সোভিয়েতের মানুষ আপনাকে পুনর্গঠন করিতেছে, আরদিকে তখন বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ অনুশীলনেও তাহারা উৎসর্গীকৃত-চিত্ত।

সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন—সত্যই সোভিয়েত-ভূমি প্রাচুর্যের দেশ নয়; এখনো তাহার ভোগ্য বস্তুর আয়োজন অনেক দিকেই সীমাবদ্ধ। জীবনমানে সোভিয়েতের মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কেন, সুইডেন-নরওয়ের তুলনায় ও ব্রিটেন-অস্ট্রেলিয়ার তুলনায়ও দরিদ্র, নিম্নস্থ। অমন শীতের দেশে পশমের জামা বা চামড়ার জুতাও এখনো প্রত্যেকের সহজপ্রাপ্য নয়, যদিও বাজারে উহা পাইলে তাহা ক্রয় করিবার মতো অর্থ সকলেরই আছে। ইহা সত্ত্বেও সোভিয়েত বিশ্ব-মানুষের শিক্ষার মহাব্রত গ্রহণ করিল,—কতখানি মানব-ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায়, কতখানি অনুন্নত জাতিদের প্রতি শ্রদ্ধার বশে। মার্কিন ঐশ্বর্যের তুলনায় সোভিয়েত রিক্ত, তথাপি পশ্চাৎপদ জাতিদের জন্য আর্থিক সাহায্যেই বা কেন সোভিয়েত সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া আসিল—বিনা শর্তে, সামরিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধিও দাবি না করিয়া? সেই সাহায্যও যে কতখানি আন্তরিক, কতখানি অকৃত্রিম, তাহা তো ভারতে ভিলাই, সুরতগড় ছাড়া মিগ্‌জঙ্গীবিমানের কারখানা গঠনের ব্যাপারেও বুঝিতে পারি। ভিলাইয়ের পার্শ্বে দুর্গাপুরে ব্রিটিশ ধনিক-প্রয়াসের ও রাউঢ়কেলার পশ্চিমজার্মান ধনিক প্রয়াসের কথা মনে রাখিলে আরও বুঝি। বোকারোর ব্যাপারও তাহারই প্রমাণ। মানবতার প্রেরণা ও মুনাফার প্রেরণাতে এইরূপই তফাৎ—না হইলে মার্কিন রাষ্ট্রের তো পুঁজির পরিসীমা নাই; জার্মান বা ব্রিটিশ কারিগররাও বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায়, শিক্ষাসংগঠনে, ঐতিহ্যে তো কাহারও অপেক্ষা ছোট নন।

মুনাফার পলিটিক্‌স্‌ ও মানবতার পলিটিক্‌স্‌

নিশ্চয়ই তর্ক উঠিবে, এসব মানবতার নয়, পলিটিক্‌সের প্রমাণ। পলিটিক্‌সের জন্যই সোভিয়েতের এই আর্থিক সহায়তা নবজাত জাতিদের দেশে, এই দরদ তাহাদের ভাষার জন্য, সাহিত্যের জন্য। পলিটিক্‌সেরই জন্য ওই সর্বজাতির ছাত্র সংগ্রহ—কমিউনিজমের পাঠে তাহাদের দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে। এই কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়। সাম্রাজ্যের পলিটিক্‌সের জন্যই তো ব্রিটেনও একটি বিশিষ্ট গবেষক পরিষদ গঠন করিয়াছিল (British Society of Oriental and African Studies); তাহার গবেষণা-মান, শিক্ষামান বহুদিনে বহু যত্নে সে সমুন্নতও করিয়াছিল। তাহার সেই প্রতিষ্ঠান ও সেই আয়োজনকে তথাপি সশ্রদ্ধচিত্তে তাহাদের প্রয়াসের জন্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কেন সেই পলিটিক্‌স্‌ শত বৎসরেও ব্রিটেনকে একটা লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে প্রেরণা দিল না? এখনো কেন শিল্পায়নে প্রয়োজনীয় কৃষ্ণ বা শ্যামল কারুবিদ্‌-গোষ্ঠী গঠনে প্রবৃত্ত করিল না? কারণ, তাহা ইম্পীরিয়ালিস্ট পলিটিক্‌স্‌—শোষণের পলিটিক্‌স্‌—মানবস্বীকৃতির পলিটিক্‌স্‌ নয়। অপরিমেয় ঐশ্বর্যের ও অসামান্য কারুবিদ্যার দেশ—গণতন্ত্রের দেশ, 'মুক্ত পৃথিবীর' নায়ক, 'মানবাধিকারের' প্রবর্তক—মার্কিন মুলুকই বা কেন এই পীত বা কৃষ্ণ রঙের দুর্ভাগা জাতিদের জন্য এইরূপ শিক্ষার আয়োজন করিল না? এখনো করে না? কেন শর্তের আর সুদের ফাঁসে না বাঁধিয়া আর্থিক সাহায্যও মার্কিন মহাজন দিতে পারে না—ভারতবর্ষকে কিংবা সিংহলকে? কিংবা ইন্দোনেশিয়াকে? সত্যই, ইহারও কারণ পলিটিক্‌স্‌—মার্কিনের মুনাফাবাদের ও জঙ্গীবাদের পলিটিক্‌স্‌। এ্যারিস্তুতলের কথা মতো মানুষই শুধু পলিটিক্যাল জীব নয়। সকল রাষ্ট্রই পলিটিক্‌স্‌-এর মূর্তশক্তি। কোন্‌ পলিটিক্‌স্‌ কাহার, তাহাই তাই লক্ষণীয়। কারণ, মুনাফা শিকারের পলিটিক্‌স্‌ মুনাফার সংস্কৃতিকে মানুষ শিকারের সংস্কৃতিতে পরিণত করিয়া তোলে। আর, ওই শোষণ-মুক্তির পলিটিকস্‌ সৃজনমুখী সংস্কৃতিকে দেয় মানবতার দীক্ষা—পরিণত করে মানবভ্রাতৃত্বের সংস্কৃতিতে, মানব-বিশ্বাসের সংস্কৃতিতে। দুইই যদি পলিটিক্‌স্‌ হয়, তবে যেই পলিটিক্‌স্‌ মানবতার স্বপক্ষে তাহাই মানুষের জীবনদায়ী পলিটিক্‌স্‌—মুনাফা শিকারের পলিটিক্‌স তো মানুষ শিকারের পলিটিক্‌স—অমানুষিক পলিটিক্‌স্‌।

বিচারকালে আবার মনে করিতে হয়—এই কথা তো মিথ্যা নয়, সোভিয়েতের সংকল্প বিরাট হইলেও তাহার ঐশ্বর্য এখনো সীমাবদ্ধ সম্ভবতঃ তাহার বৈজ্ঞানিক উদ্যোগও সর্বদিকে এখন পর্যন্ত সমানভাবে অগ্রসর নয়। অবশ্য সোভিয়েত বিরোধীরাও বলেন, কারুবিজ্ঞানের শিক্ষায়োজনে সোভিয়েত ইতিমধ্যেই মার্কিন, ব্রিটিশ, ফরাসী প্রভৃতি সকলকে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে; তাই তাহার বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠতাও ভবিষ্যতে অবধারিত। ধনিকতন্ত্রে গণ্ডী-টানা (কর্দন স্যানিটের) ঘরের মধ্যে সুদীর্ঘ দিন যাপন করিয়া সোভিয়েত ভূমি পৃথিবী হইতে দীর্ঘদিন অনেকটা বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে, বিশ্বের নিত্য-বিবর্ধিত জ্ঞান সম্পদ হইতেও বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে তাহার মানস-ভঙ্গিতে একটা স্বয়ংসন্তুষ্ট ও আহত আত্মমর্যাদাবোধ প্রশ্রয় পাইয়াছে। সেই সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। তাহার অতি দ্রুতগঠিত সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্যেও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যাইতেছে,—যতটা তাহার ব্যাপ্তি আছে, ততটা গভীরতা জন্মায় নাই। আর্থিক বিকাশে ও আধ্যাত্মিক বিকাশে তাহার এক-একদিকে যতটা উন্নতি, কোনো কোনো দিকে তেমনি শ্লথতা থাকিয়া গিয়াছে। যে দেশ চন্দ্রলোকের বার্তা সংগ্রহ করিতেছে, সে-দেশে টেলিফোনের পঞ্জিকা দুর্লভ, চিঠিপত্রের বিষয়ে সে অমনোযোগী। অটোমেশন, সিবারনেটিক্‌স লইয়া যাহারা নতুন জীবন গড়িতেছে, ভালো ফাউনটেন্‌ পেন ও কালি তাহাদের নিকট দুর্লভ; ভারী দোয়াতদান ও মোটা কালিতেও তাহাদের আপত্তি নাই। এইরূপ অজস্র দৃষ্টান্ত যোগ করা চলিতে পারে। যে কোনো মানুষ সোভিয়েত দেশে সাধারণ

ভাবে দুই-এক মাস যাপন করিয়াছে সে-ই তাহা বলিতে পারে। শুধু ইহাই বা কেন? সেখানে পোশাক-পরিচ্ছদে ছিম-ছাম দোরস্ত লোক কম দেখা যায়। দফ্‌তরে তাহাদের ফাইলফিতা ও কাগজপত্রের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। লেখায় পড়ায়, প্রশ্নে উত্তরে কর্মচারীদের অমনোযোগ অসুবিধাজনক। জীবনযাত্রায় মোটা ধরনের স্বাচ্ছন্দ্যই যেন যথেষ্ট, বেশভূষায়, চলায় বলায়, কাজেকর্মে পরিপাটিতা, বা স্মার্টনেস-এ সোভিয়েত নরনারীর লক্ষ্য কম। অথচ, আজন্ম-মৃত্যু জীবনযাত্রার সকল বিভাগ সমাজতন্ত্রী কাঠামোতে বিধৃত বলিয়া সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ শত্রু আমলাতান্ত্রিক মূঢ়তা ও উগ্রতাও প্রশাসনের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া বসিতে চাহে এবং বসেও। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার দ্রুত প্রবর্তনের ও প্রতিপ্রসারের সঙ্গে সোভিয়েত চারুকলা ও সুকুমার শিল্পের অনুশীলন তাল রাখিয়া উঠিতে পারিতেছে কিনা সন্দেহ করা যায়। মার্কিন সংস্কৃতির মতোই সোভিয়েত সংস্কৃতির এই সমস্যাও এক প্রধান সমস্যা—কারুবিজ্ঞানের চাপে মানববিদ্যার অসমান বিকাশ। ইহার কিছুই মিথ্যা নয়। কিন্তু সোভিয়েত সমাজ গতিমান, তাহার গতির মাত্রা অন্যান্য অগ্রসর জাতিদের গতিমাত্রাকেও ছাড়াইয়া যাইতেছে, ইহা আরো সত্য। 'নিস্তালিনীয়' কর্মকাণ্ডে ভুলত্রুটি স্পষ্টই এখন স্বীকৃত হয়, দূর করিবার চেষ্টাও চলে। আর সকল রকম ছোট বড় ত্রুটি অসম্পূর্ণতাকে ছাড়াইয়া এই কথা সত্য—সোভিয়েত সমাজ জীবন্ত, চলন্ত, বিবর্ধমান। ঠিক সেইরূপে শত অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সোভিয়েত সংস্কৃতির সম্বন্ধে প্রধান সত্য এই কথা: মানবতায় বিশ্বাস, বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন প্রয়োগ, বিশ্বমানবের মুক্তি, বিশ্বশান্তির দুশ্চর তপস্যা সোভিয়েতের মূল সাধনা।

যুগসন্ধির যন্ত্রণা

পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া বিংশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্ধে কেহ বা অতি আশা পোষণ করেন, কেহ বা বিষম শঙ্কা বোধ করেন। কেহই বোধ হয় বিশেষ স্বস্তি বা সুস্থির বোধ করেন না। চিরদিনই পৃথিবী গতিমান। সেই গতির টেম্পো বা মাত্রা দিনের পর দিন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতেছে। এবং, যদি আকস্মিক কোনো বিপর্যয় না ঘটে, তাহা হইলে এই মাত্রা আরও তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়াই চলিবে। সভ্যতার বিকাশ গাণিতিক তালে না হইয়া যেন জ্যামিতিক তালেই হইবে। ইহারই মধ্যে এক-একটা যুগসন্ধিতে পৌঁছিলে অনেক মহানুভব মানুষের চিত্তে মানবভাগ্য ও আপন দায়িত্ব-চেতনায় যে গভীর মন্থন চলে তাহাতে হ্যামলেটের মতোই তাঁহারা অনুভব করেন—The world is out of joint! O cursed time, that I was e'er born to set it right.

মৃত্যুর সীমান্তে পৌঁছিতে পৌঁছিতে এ কালের মহত্তম বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের মুখেও এই মহামানবিক বেদনার বাণীই ফুটিয়াছিল: 'হায়, ইহার অপেক্ষা যদি সাধারণ কারিগর মিস্ত্রিও হইতাম!' আণবিক শক্তির এই আবিষ্কার যাঁহাদের তপস্যার ফল সেই বিজ্ঞানীদের জ্যেষ্ঠ, ঋষিশ্রেষ্ঠ যেন নিজের তপঃফলে স্বস্তিবোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথই কি পারিয়াছিলেন মানুষে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাস লইয়া জীবনের শেষপ্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে? অথচ ১৯৪১-এও আণবিক বোমা ছিল অজ্ঞাত। আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের মতো মানবপ্রেমিকদের এই মহৎ অস্বস্তিই মানুষের মহৎ সম্ভাব্যতারও একটা প্রমাণ, মানবতার পরম ধন। পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষদের যদি অন্তরে আজ এই আলোড়ন না জাগিত তাহা হইলে বুঝা যাইত মানুষ অধ্যাত্মবোধহীন একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র, একটা দানবীয় প্রকাশ মাত্র। অথবা, 'সভ্যতার নাড়ীতে নাড়ীতে নবজন্মের বেদনা'ও জাগে নাই। যে কোনো যুগসন্ধিই অস্থিরতার যুগ; যন্ত্রণাই তাহার মুখ্য অধ্যাত্ম লক্ষণ। আর, যে যুগসন্ধি গতিতীব্রতায় এত দুর্বার, দুর্নিরীক্ষ্য, তাহাতে মানুষের যন্ত্রণাও এরূপ তীব্র, এরূপ তীক্ষ্ণ হওয়া অনিবার্য। পৃথিবীর শিল্পে সাহিত্যে তাই এত অস্থিরতার ও যন্ত্রণার প্রতিফলন। সে যন্ত্রণা সৃষ্টির বেদনা, ইহাই বুঝিবার মতো কথা।

সভ্যতার এই মুহূর্তটিকে তাই কত বিভিন্ন দৃষ্টিপথ হইতে মানুষ বিভিন্ন রূপে দেখিয়াছে—কেহ দেখিয়াছে নিউরোটিক এজ রূপে, কেহ দেখিয়াছে এশিয়া আফ্রিকার জীবনপ্রভাতরূপে, এমন কি, পাশ্চাত্যের জীবন-সন্ধ্যারূপে। এরূপ জটিলই তাহার লক্ষণ, কোনো দেখাই একেবারে মিথ্যা নয়। কিন্তু সকল দেখাই তাই বলিয়া সমান সত্যও নয়। একটা কথা প্রায় সত্য—পৃথিবীতে আজ একটা বিপ্লবের কাল আসিয়াছে। পূর্ব-পশ্চিমের সকল মনীষীরা এ বিষয়ে একমত—এক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মতো আণবিক শক্তির অধিকার-লাভ হইতে তাহার কাল-গণনাও করা একেবারে অযৌক্তিক নয়—এই নবশক্তির প্রয়োগে শতাব্দীর প্রথমার্ধেই যে নূতন শিল্পবিপ্লবের সূচনা হইয়াছে তাহাও বলা চলে।

বিশ্বশান্তি ও বিশ্ববিপ্লব

কিন্তু এই কথা শেষ সত্য নয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিজ্ঞানের ইতিহাসে আণবিক শক্তির রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার পর আণবিক শক্তির উপর অধিকারও অর্জিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসের ইহা একটা নূতন অধ্যায়,—জানিবার মতো, বুঝিবার মতো। না জানিলে, না বুঝিলে মানুষের ইতিহাসে ও জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অবশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা জ্ঞানযোগ মাত্র নয়। উহাও মানবেতিহাসের একটা অঙ্গ, মানুষের জ্ঞানযোগের ও কর্মযোগের একটা কর্মাধিকৃত প্রকাশ। নিশ্চয়ই এই পথ একটানা অগ্রগতির পথ নয়, মানুষের সৃষ্টির অবাধ বিজয়ের কাহিনী নয়। আণবিক যুগের দুর্বুদ্ধিও সেইরূপ একেবারে নূতন জিনিস না। অগ্নির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই অগ্নিকে নির্বোধের মতো বা দুর্বুদ্ধির বশে প্রয়োগ করিলে সেই আদিম যুগ হইতে এখনো পর্যন্ত মানুষ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। তাই বলিয়া কোনো কালে কেহ কি বলিয়াছে—আগুনে কাজ নাই; অগ্নির আবিষ্কার একটা দুর্ভাগ্য? তাহা যদি না বলেন, তবে আণবিক শক্তির বেলাই বা এইরূপ বলি কেন?—বলি, কারণ দুর্বুদ্ধির বা বুদ্ধিহীনতার হাতে তাহার প্রয়োগ লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি মারাত্মক হইবে বলিয়া। এই দুর্বুদ্ধি ও বুদ্ধিহীন বা বিকৃতবুদ্ধি উন্মাদ তো পৃথিবীতে একেবারে থাকিবে না এমন না। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিকৃতির বিশেষ অবস্থায় যে রূপ হিটলারী-বুদ্ধির মানুষ, জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া বসিতে পারে, তাহা তো এই শতাব্দীতেই দেখিলাম। আণবিক শক্তির আবিষ্কারের পরেও যদি সমাজ বিকৃতি বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে যে কী হইতে পারে, তাহাও আজ বুঝিতে পারি। এই তো সেদিন তাহা ঘটিতেছিল শুধু একটি মার্কিন শঙ্কাঘোষক যন্ত্রের গোলযোগে। অতএব শুধু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রবর্তনে নয় সামাজিক বিকৃতির মূলোৎপাটনেই বিজ্ঞানের বিপ্লব সম্পূর্ণ হইতে পারে। তাহার সূচনাতেই আশু প্রয়োজন সামাজিক বিকৃতির শোধন—আর বিকৃত রাষ্ট্র ও সামরিক শক্তির হাত হইতে এই প্রলয়াগ্নি দূরে সরাইয়া রাখা। বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এজন্যই আপেক্ষিক সত্য বরং সামাজিক বিপ্লবের, অন্তত বহুল পরিমাণে বিকৃত সামরিক বুদ্ধির দমনের, এবং সেই সঙ্গে নূতন মানবিক মঙ্গলবোধের তাহা মুখাপেক্ষী। যে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে আণবিক বিজ্ঞানের জন্ম, সেই সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার মতো সার্থক আয়োজন তখনি অগ্রসর হইতে পারিবে যখন আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ হইবে, যখন সাধারণভাবে মারণাস্ত্র ত্যাগ করিয়া পৃথিবী দুর্বুদ্ধির ও নির্বুদ্ধিতার পথ বন্ধ করিবে, এবং রাষ্ট্রনেতা ও যুদ্ধনেতাদের হাত হইতে জাতিসমূহ এই প্রহরণ কাড়িয়া লইতে পারিবে—এক জাতির দ্বারা অপর জাতির শোষণ আর অস্ত্র বলে বজায় রাখা চলিবে না।

আণবিক বিদ্যার সার্থকতার জন্যও এই বিশ্বশান্তি প্রয়োজন। বিশ্ববিপ্লবের ফলে বিশ্বশান্তি আসিবে, না, বিশ্ববিপ্লব আসিবে বিশ্বশান্তির ফলে,—ইহা আণবিক শক্তির আবিষ্ক্রিয়ার পরে আজ এক বিপ্লবী জগতের বড় বিতর্ক, মতভেদেরও কারণ। অনেকটা উহা কুতর্ক। একবোখা বিতর্কের পথে

না গিয়া বরং বলা ভালো—বিশ্বশান্তির পথে যদি এক পা বাড়াই বিশ্ববিপ্লবের দিকেও আর এক পা বাড়ানো প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ও ঔপনিবেশিক শোষণের কবলমুক্ত সকল জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাতে বিশ্ববিপ্লবের সেইরূপ প্রথম পদবিন্যাস সুনিশ্চিত হইতেছে। আবার, বিশ্ববিপ্লবের এই পদস্থাপনা যদি সুদৃঢ় করিতে হয় তাহা হইলে বিশ্বশান্তির দ্বিতীয় পদক্ষেপও তখনি প্রয়োজন—অর্থাৎ, চাই অবিলম্বে আণবিক অস্ত্র নিষেধ। তখনি আবার আসিবে বিপ্লবের আরেক পদক্ষেপের সময়—প্রত্যেক জাতির আভ্যন্তরীণ আর্থিক বিকাশে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক সেবা ও সহযোগিতার নীতি ও পদ্ধতির প্রবর্তন, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা। এইসব ব্যবস্থার কোনো-একটিকে একান্ত বা নির্বিশেষ বলিয়া গণ্য না করিয়া পরস্পরের সহায়ক রূপেই দেখা সম্ভব, ও তাহাই খাঁটি দেখা। কারণ, আণবিক যুগে অন্তত বিশ্ববিপ্লবের নামে 'আগে বিপ্লব পরে শান্তি' এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়াইয়া থাকা চলে না—লেনিনের নামেও নয়। অবশ্য পরাধীন কোনো জাতির স্বাধীনতার চেষ্টাকেও শান্তির নামে গৌণ করা উচিত নয়—সে প্রশ্নও ওঠে না। মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝিয়াই কৌশল স্থির করিতে হইবে। তাহাতে মতভেদও ঘটা সম্ভব। কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, শান্তির সাধনাকেই বিশ্ববিপ্লবের অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বশান্তিই কি কম বড় বিশ্ববিপ্লব?

বিশ্বশান্তি যে বিশ্ববিপ্লবেরই পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে, এই সত্য অবশ্য মুনাফা-বাদী ও শোষণ ধর্মী শক্তিদের অজ্ঞাত নয়। নয় বলিয়াই তো মুনাফাবাদীরা শুধু সমাজতন্ত্র-বিরোধী নয়, তাহারা শান্তিবিরোধী ও যুদ্ধবাদী। পৃথিবীতে যুদ্ধ বা যুদ্ধের আতঙ্ক না থাকিলে মারণাস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই দেউলিয়া হইবে। মারণাস্ত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে মুনাফার জালে ফ্রি ওয়ার্লড-এর ('মুক্তপৃথিবীর') 'ফ্রি এন্টারপ্রাইজ' ('অবাধ ব্যবসায়') অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। তথাকথিত 'ফ্রিডম অব কালচার'ও সেই 'শোষণের ফ্রিডমেরই' পক্ষপাতী। যুদ্ধ না থাকিলে এ সবের দুর্দশা। মুনাফাতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার পথে যুদ্ধ ও যুদ্ধাতঙ্ক তাই জীবন-মরণের প্রশ্ন। মারণাস্ত্রব্যবসায়ীরা অস্ত্র-ব্যবসায়কে অন্যবিধ যন্ত্র-উৎপাদন শিল্পে ও ভোগ্য-উৎপাদন শিল্পে লাগাইলে পৃথিবী অবশ্য ভোগ্য ও কল্যাণপ্রদ সমৃদ্ধিতে ভাসিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে পণ্য কিনিবার মতো মানুষ থাকা চাই—যে দামে মানুষ উহা কিনিতে পারে, সেই দামে মুনাফাতন্ত্র কতটুকু বজায় থাকিবে? মুনাফা থাকিলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা খর্বিত থাকিবে। সাধারণ মানুষের ক্রয়-শক্তি বাড়াইতে হইলে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি প্রয়োজন; মুনাফা বজায় থাকিলে মজুরি বৃদ্ধিতে পণ্য-মূল্য বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী। আর তাহা হইলে আবার প্রশ্ন—সে পণ্য কিনিবার সামর্থ্য থাকিবে কয় জনার? মুনাফার পাপচক্রে অস্ত্রব্যবসায় ও প্রায় অন্যসমস্ত ব্যবসায় এইরূপে মরণায়োজন-রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে এইরূপ মুনাফাতন্ত্রী ব্যবস্থার বিলোপ সুনিশ্চিত। শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হইলেও মুনাফাতন্ত্রী ব্যবস্থার সংকট ঘনাইবে, ব্যবসায় মন্দা সুকঠিন হইয়া পড়িবে—মুনাফাতন্ত্রী দেশেও তখন অন্তর্বিপ্লব ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। —এই সত্যটা স্পষ্টকণ্ঠে স্বীকার করিতেও মুনাফাবাদীদের কাহারও কাহারও এখন বাধে না—শান্তিতে সমাজতন্ত্রীদের লাভ। কারণ তাহাদের উৎপাদন, বণ্টন, সেবা ও পালন সবই সামাজিক স্বার্থে চলে, মুনাফার উপর নির্ভর করে না। তাই শান্তি থাকিলে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রয়োগে তাহাদের আর্থিক উদ্যোগের বিকাশমাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ হারে বাড়িয়া উঠিবে। শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্র নিঃসন্দেহে ধনিকতন্ত্রকে পরাভূত করিয়া দিবে। অন্যদিকে শান্তি থাকিলে 'ফ্রি ওয়ার্লডে'র 'ফ্রি এন্টারপ্রাইজ' অবশ্যম্ভাবী সংকটে জড়াইয়া বিপ্লবের মুখে গিয়া পড়িবে। একটি গুলিও সমাজতন্ত্রীদের নষ্ট করিতে হইবে না, মুনাফাতন্ত্রী সমাজ আপনার আভ্যন্তরীণ অন্তর্বিরোধে সমাজ বিপ্লবকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিবে। বিশ্বশান্তি তাই মুনাফাবাদী জগতের বিভীষিকা,—জঙ্গীবাদী বিজ্ঞান, জঙ্গীবাদী-সংস্কৃতি-সাহিত্য-শিল্পে মুনাফাবাদীদের রক্ষাকবচ।

মার্কিন পুঁজিবাদ চতুর্দিকের অজস্র যুদ্ধঘাটি হইতে সমাজতন্ত্রী পৃথিবীর বুকের উপর সর্বদা বন্দুক ধরিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু মুনাফাতন্ত্রের তাহাতেও দুশ্চিন্তা ঘুচিতেছে না। এই কঠোর

সত্য জানিয়া বুঝিয়া, 'ইউ টু'র পরেও মুনাফাবাদী শক্তিসমূহের যুদ্ধায়োজনে সমাজতন্ত্রী শক্তিরাও আত্মরক্ষায় উদাসীন থাকিতে পারে না। কেন তাহারা তবে যুদ্ধবাদী প্রচার নিষিদ্ধ করিল? কেন শান্তির প্রচেষ্টাতেই সর্বস্ব পণ করিল? প্রথমতঃ, ইহাই সমাজতন্ত্রী মতাদর্শ সম্মত, ইহাই সমাজতন্ত্রী বিকাশেরও পরিপোষক। আর শেষ কারণ – এখন যাহা একটা প্রধান কারণও—আণবিক বোমা আবিষ্কারের পর যাহা অনস্বীকার্য—ইহা মানবতার নীতি। মানুষকে লইয়াই তো সাম্যবাদ—আশী কোটি মানুষকে বলি দিয়া সাম্যবাদ রচনা করিতে হইবে, এমন অমানুষিকতা সাম্যবাদে গ্রাহ্য নয়। সাম্যবাদ মানবতার উচ্চতর সাধনা, শ্রমিকশ্রেণীই সেই উচ্চতর মানবতার বাহক, পরিপোষক। কিন্তু সংস্কৃতির মহত্তর রূপান্তরেই সাম্যবাদের সার্থকতা।

কিন্তু প্রশ্ন হইবে সংস্কৃতির 'মহত্তর রূপের' অর্থ কী? কী সংস্কৃতির লক্ষ্য? হয়তো এক কথায় বলিলে তাহা নতুন কালের অর্থে সেই চিরকালের উত্তর ঃ 'মানুষ'। নতুন কালের মতো করিয়া আমাদের ভাবার এই উত্তরই নানা ত্রুটি সত্ত্বেও সোভিয়েত সংস্কৃতির কণ্ঠেও ফুটিতেছে ঃ সবার উপরে মানুষ সত্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংস্কৃতির গোড়ার কথা

সংস্কৃতির যে রূপান্তর হয়, সে রূপান্তর যে বারবার হইয়াছে—এই সহজ সত্যটি অনেকে একেবারেই হয়ত মানেন না ; আবার অনেকে মানিয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চাহেন না। ইহার অনেক কারণ আছে। **প্রথম কথা, সংস্কৃতি বলিতে কি বুঝায়** তাহাই আমরা স্পষ্ট করিয়া জানি না। কেহ মনে করি, সংস্কৃতি বলিতে বুঝায়—কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, ধ্যান-ধারণা। কেহবা মনে করি—আচার-অনুষ্ঠান, ভদ্রতা-শিষ্টাচার ; সে সম্পর্কীয় ভাবনা-ধারণা, নীতি-নিয়ম, এই সবও উহার অন্তর্গত। কেহবা উহাদের কোনো একটি জিনিসকেই সব বলিয়া ধরিয়া লইবেন। যেমন, কেহ বলিলেন ধর্মই হইল সংস্কৃতি ; ধর্ম সর্বব্যাপক। কেহবা অপর কোনো জিনিসকে মনে করেন মুখ্য কথা। যেমন, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ইহাকেই বলেন'কালচার'। তাই সংস্কৃতির অর্থ কি, তাহার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা কি, প্রথমত এই কথাটাই আমাদের পরিষ্কার করিয়া জানা প্রয়োজন।[১]

মূল একটি কথা স্পষ্ট—সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধু মাত্র মনের সৃষ্টি-সম্পদও নয়। উহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে এবং মানুষের জীবন-সংগ্রামে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব

(১) বাঙলা 'সংস্কৃতি' শব্দটি এই গ্রন্থে বরাবরই ইংরেজি 'কালচার' শব্দটির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যতদূর জানি, শব্দটি নতুন গঠিত। ইহার বয়স চল্লিশ বৎসরের বেশি নয়। তৎপূর্বে 'কালচার'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে কখনো 'অনুশীলন' কখনো বা 'সভ্যতা' ব্যবহার করিয়া অনেক সময়ে কাজ চালাইতে হইত। মাঝে 'কৃষ্টি' শব্দটিও এই অর্থে প্রযুক্ত হইত, এখনো 'কৃষ্টি' সেই অর্থে অচল হয় নাই। 'কাল্‌চার' শব্দের মৌলিক অর্থ ও গঠন ধরিয়া কর্ষণাত্মক 'কৃষ্টি' শব্দ তৈয়ারী করা অন্যায় নয়। অবশ্য কৃষ্টি ও অনেক পুরাতন শব্দ, উহার বৈদিক অর্থ এখন বিস্মৃত। সেই অর্থ ছিল 'সমুদায় কৃষক দল'। (দ্রষ্টব্য ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, ১ম ভাগ, পৃঃ ৬১)। 'সংস্কৃতি' শব্দটিও বৈদিক। 'সংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে মানুষের 'কৃতির' বা কৃতিমূলক সাধনা প্রয়াসের একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া তাহা সব যুগের মানুষের উপযোগী। সেই কারণেই লোক, কাল্‌চারের প্রতিশব্দরূপে 'কৃষ্টি' অপেক্ষা 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রচলনও ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে। 'সংস্কৃতি' এখানে সেই ব্যাপক ও সাধারণ অর্থেই মোটামুটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

বিচক্ষণ পাঠকের নিকট তথাপি প্রশ্ন উদিত হয়, 'সংস্কৃতি' শব্দটির কি অর্থে প্রয়োগ হইল? ইহা কি 'কালচার' বুঝায়? না বুঝায় 'সিভিলিজেশন'? নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক প্রবক্তা ওসাল্ড স্পেংলারের কৃপায় 'কালচার' ও 'সিভিলিজেশনের' মধ্যে একটা অচল প্রাচীর কল্পনা করা অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'কালচার'-এর মূল কথা—ব্যক্তিসত্তার ও জনসত্তার প্রাণময়, গতিময় বিকাশ অভিব্যক্তি। আর 'সিভিলিজেশনের' অর্থ সংগঠিত, পল্লবিত সমাজের স্থাণুর স্থাণুত্ব-কামিতা।— এই মর্মের ব্যবধান টানা শুধু যে অসঙ্গত নয়, উহাকে বিকৃত করা, মিথ্যারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। বলা বাহুল্য, সিভিলিজেশন মূলতঃ-পৌর-সদাচার। কিন্তু পৌর-জীবন ও পৌর সংস্কৃতির উদ্ভব বাস্তব কারণেই ঘটে। কেন্দ্র বিশেষে তাহার পতন ঘটিলেও পৌর সংস্কৃতির ঐতিহাসিক দাম তুচ্ছ নয়, তাহা শেষও হইয়া যায় নাই। বরং পৌর-সংস্কৃতির নব নব রূপই বিকাশিত হইয়াছে, এবং পল্লীসংস্কৃতি ও পৌর-সংস্কৃতির সমন্বয়ের পথ এই কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও ব্যবস্থাপনায় সুসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন কোন কোন পৌর সভ্যতায় জরা-মরণ ঘনাইয়া আসিল এই জন্য যে—সেখানে সমাজ শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বৈষম্যে ও বিরোধে ভারিয়া উঠিয়াছিল, আর পৌর-জীবনের আর্থিক প্রয়োজনে যুদ্ধ-বিগ্রহ শোষণ পীড়ন প্রভৃতি বহির্বিরোধেও উহার আয়ুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিল (দ্রষ্টব্য, ভিঃ গর্ডন চাইলডের Man Makes Himself)। অতএব 'কালচার' ও 'সিভিলিজেশন'-এর নামে স্পেংলারী গবেষণা বা আধুনিক পৌর সভ্যতার বিরুদ্ধে পল্লী-সভ্যতার 'বিকেন্দ্রীকরণ' প্রভৃতি প্রচারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে ঐ সব শব্দের পার্থক্য প্রদর্শনের আপেক্ষিক প্রয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু মুখ্যত ও কার্যতঃ কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। এই গ্রন্থে অবশ্য আমরা 'সিভিলিজেশন' শব্দটির জন্য সাধারণ অর্থে 'সভ্যতা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি ; বিশেষ অর্থে উহাকে 'পৌর-সংস্কৃতি' দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রথম-সংস্করণে 'কৃষ্টি' শব্দটি পরিহাসচ্ছলে ('বাঙলার কালচার' অধ্যায়ে) প্রযুক্ত হইয়াছিল। উহা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই এবার সেইরূপ অর্থে উহার প্রয়োগ হইল না, এই সংস্করণে 'কৃষ্টি' বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইল 'লোক-সংস্কৃতি' বুঝাইতে কিংবা প্রাথমিক কৃষি-জীবীদের সংস্কৃতি বুঝাইতে, এবং স্থলবিশেষে সেইরূপ কৃষি-জীবীদের শিল্প-সামগ্রী বুঝাইতে। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে কালচারেরও বিশেষ অর্থ আছে, তাহা না বলিলেও চলে। সাধারণভাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি কাল্‌চারের প্রতিশব্দরূপে প্রযোজ্য।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। সেই জীবনযাত্রারই ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপ ও রঙও পরিবর্তিত হয়। আবার, সংস্কৃতির সহায়েও জীবনযাত্রা যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিও তেমনি জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন হইয়া উঠে। জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির এই সম্বন্ধ যখন দেখিতে পাই তখনি বুঝি সংস্কৃতি নিশ্চল নয়,—তাহার রূপান্তর ঘটে।

সংস্কৃতির বিষয়ে দ্বিতীয় কথাটি তাই এই—কোন্ নিয়মে সংস্কৃতির রূপান্তর চলিয়াছে তাহা বুঝিয়া লওয়া, পরিবর্তনের মূল তত্ত্বটির পরিচয় লওয়া। ইহার ফলে সংস্কৃতির মোট অবয়ব ও অবলম্বন কী, কী তাহাদের পরস্পরের-সম্পর্ক, তাহাও বুঝিতে পারি। সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা তখন প্রায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। শুধু ইতিহাসের সাক্ষ্যের দিকে তখন একবার লক্ষ্য করিতে হয়,—দেখিতে হয় ইতিহাসের স্তরে স্তরে সংস্কৃতির কোন্ কোন্ রূপ কিভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাহাই এই প্রসঙ্গের শেষে প্রয়োজন—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতির পরিচয় সাধন। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রবাহের পরিচয় লওয়া; বুঝিয়া লওয়া ইতিহাসের ধারা কোন্ দিক হইতে বহিয়া আসিয়াছে, কোন্ দিকে বহিয়া চলিয়াছে;—আমাদের দেশেই বা তাহা কোন্ খাত হইতে কোন্ খাতে বহিয়া আসিতেছে। ইহা বুঝিলে আর সন্দেহ থাকে না—দেশ-বিদেশের ইতিহাসের কোন্ নতুন রূপ আজ প্রকাশিত হইতেছে—সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারাও চলিয়াছে আজ কোন্ দিকে।

সংস্কৃতির অর্থ কী?

সংস্কৃতির অর্থ কী, এই প্রশ্ন করিবার সঙ্গেই একটা কথা আমাদের মনে জাগা উচিত—মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলিয়া কিছু নাই। তাহার অর্থ—মানুষ হিসাবে মানুষের আসল পরিচয়ই তাহার সংস্কৃতি, এই 'কৃতির' বা কাজের বলেই মানুষ মানুষ হইয়াছে, প্রকৃতির নিয়মও বুঝিয়া উঠিতেছে, বাধা ছাড়াইয়া যাইতেছে।

প্রাণী মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা—বাঁচিয়া থাকা। মানুষ এই তাড়নায় চাহে আপনার পরিবেশের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া টিকিয়া থাকিতে। অর্থাৎ মানুষ চায়, বাঁচিবার উপায় যতটা পারে প্রকৃতির নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে। ইহারই নাম জীবিকা চেষ্টা। মানুষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়া, অর্থাৎ জীবিকা আয়ত্ত করা, তাহা সহজসাধ্য করা। দৈহিক মানসিক প্রয়াস-প্রযত্নে এই জীবিকা সে ক্রমেই আয়ত্ত করিয়াছে—এই প্রয়াস-প্রযত্নেরই নাম পরিশ্রম। এবং এই পরিশ্রমেরই ফলে তাই মানুষ অন্য জীব অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, শেষে সভ্যতার এক একটি উপাদান সৃষ্টি করিয়াছে। সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, শ্রমশক্তি; আর সংস্কৃতির মোট অর্থ বিশ্বপ্রকৃতির সহযোগে মানব-প্রকৃতির এই স্বরাজ-সাধনা।

জীব-জগৎ প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা। সেই নিয়মকেই আপনার নিয়ম বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহারা বাঁচে, তাহারা মরে। কিন্তু মানুষ জীবজগতের মধ্যেও একটু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। বাঁচিবার উপায়—জীবিকার উপাদান—সে নিজেই পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি করিতে পারে, নিষ্ক্রিয় হইয়া প্রকৃতির একান্ত মুখাপেক্ষী থাকে না। তাই, সে চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে কি করিয়া জীবনযাত্রা তাহার সুলভ হয়, প্রাণধারণ তাহার সহজ হয়। এই লইয়াই তাহার বিপুল প্রয়াস, অফুরন্ত পরিশ্রম আর প্রকৃতির শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে তাহার অশেষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে সে যতটুকু জয়ী হইয়াছে, জীবিকার তাড়না ও জীবনের তাগিদ যতটুকু মিটাইতে পারিয়াছে, তাহার সভ্যতায় সংস্কৃতিতে ততটুকুরই নিদর্শন মিলে। তাই, এই সভ্যতা বা সংস্কৃতিই তাহার সেই চির-সংগ্রামের জয়চিহ্ন; আবার ইহাই তাহার জয়-অস্ত্র।

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামের এই বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের এই যুদ্ধাস্ত্রেরও আবার বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন পর্যায় দেখা গিয়াছে, জয়-চিহ্নও হইয়াছে বিচিত্রতর।

সংস্কৃতির প্রচলিত নাম ও রূপ

গোড়াতেই তাহা হইলে দেখিতেছি—এইভাবে আমরা সংস্কৃতিকে সাধারণত বুঝিতে চাহি না। সংস্কৃতি বলিতে আমরা বুঝি কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, আচার-বিচার, বড় জোর এখন বিজ্ঞানও। কখনো আমরা ভাবি সংস্কৃতি দেশগত, কখনো বা ভাবি তাহা কালগত। যেমন, কখনো আমরা বলি ভারতীয় সংস্কৃতি, গ্রীক সভ্যতা, চীনা সভ্যতা, পাশ্চাত্য সভ্যতা। কিংবা আরও খণ্ড করিয়া বলি বাঙ্গালার কালচার, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', 'ভাগীরথী-সভ্যতা' ইত্যাদি (এইসব ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' শব্দ দুটি 'কালচার' অর্থে যদৃচ্ছ ব্যবহার করি)। অথবা ধর্ম ও জাতিগত সূত্র ধরিয়া বলি হিন্দু সংস্কৃতি, 'ব্রাহ্মণিক কালচার', মোসলেম সভ্যতা, ইত্যাদি। আবার কখনো কালের হিসাব মনে রাখিয়া বলি প্রাচীন সভ্যতা, মধ্যযুগের সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা, ইত্যাদি। এই সব হিসাব অবশ্য একেবারে মিথ্যা নয়, সব সময়ে এইগুলি পরস্পর-বিরোধীও নয়—কিন্তু এইরূপ হিসাব খুব যুক্তিসঙ্গতও নয়। যেমন, ভারতীয় সভ্যতা বলিলে তাহার মধ্যে হিন্দু সভ্যতাও আসে; আবার তাহাতে প্রাচীন সভ্যতাও যেমন বুঝাইতে পারে, মধ্যযুগের সভ্যতাও তেমনি বুঝাইতে পারে।

এই সব নামে বিভিন্ন সংস্কৃতির ঠিক পার্থক্য বা প্রকৃতি বুঝা সম্ভব হয় না; উহাতে সংস্কৃতির বিজ্ঞান-সম্মত পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি এইরূপ নাম-দানে সুবিধা অনেক—জনমন সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে পারে, আর তাহাদের মনের যৌথ-অহমিকা বা 'গ্রুপ প্রাইড' বেশ তৃপ্ত লাভ করে। কিন্তু সেই সূত্রে সেই নাম-মাহাত্ম্য আমাদের মনে এমনি একটা কমপ্লেক্স বা মোহের ঘূর্ণী সৃষ্টি করে যে, আমরা ভুলিয়া যাই সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ কী, তাহার মূল কোথায়, আর তাহার বৈশিষ্ট্যই বা কি দিয়া নির্ণীত হয়। তাই এক-এক জাতি বা জন যূথ ধরিয়া লয়—এই মূল আছে তাহার রক্তে। সে রক্ত 'নর্ডিক' রক্ত হইতে পারে, 'ল্যাতিন' রক্ত হইতে পারে, 'আর্য' রক্তও হইতে পারে, এমন কি 'বাঙালী রক্ত ও হইতে পারে। কেহ বা আবার বলে, তাহার সংস্কৃতির মূল আছে তাহার ধর্মে—ইসলামে, হিন্দুত্বে অথবা খ্রীস্টধর্মে কিংবা ভূতপূজায়। আর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও তেমনি প্রত্যেকে নিজের অভিরুচি মত নির্ণয় করিয়া ফেলে। কোনো সংস্কৃতির নাম দেয় 'আধ্যাত্মিক', কোনো সংস্কৃতিকে বলে 'জড়বাদী'। হইতে পারে গোষ্ঠীর ও ধর্মের গুণাগুণ খানিকটা আছে; আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও হয়ত খানিকটা সত্যই প্রত্যেকের থাকে। কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য প্রায়ই আপেক্ষিক, কাহারও 'একান্ত' নয়। আর, সে 'বৈশিষ্ট্য'ও আবার নানারূপে ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হয়। তাহা ছাড়া, সংস্কৃতির মূল বিচারে, রূপ নির্ণয়ে বা বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণে সেই সব নিতান্তই গৌণ। সেখানে মুখ্য কথা এই—জীবনযাত্রার কোন্ সৌকর্য-সাধন সে সংস্কৃতি করিতেছে? প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের যে অফুরন্ত প্রয়াস মানুষের, তাহার কোন্ স্তরের আভাস সেই সংস্কৃতি দেয়?

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাঁহারা তাই সংস্কৃতির বিচার করেন তাঁহারা দেখিতে পান সংস্কৃতির অর্থ এই—মানুষের জীবন সংগ্রামের বা প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি; আর সংস্কৃতির মূল ভিত্তিও অত্যন্ত বাস্তব—জীবিকা-প্রয়াস সহজায়ত্ত করা। কথাটাও তাই পরিষ্কার—জীবিকার প্রয়াসে মানুষ যেমন অগ্রসর হয় সংস্কৃতিরও তেমনি পরিবর্ধন ঘটে, পরিবর্জনও হয়, অর্থাৎ তাহার পরিবর্তন চলে।

এই কথাটাই আরও একটু তলাইয়া বুঝা দরকার—মানুষ নিজেও পরিবর্তিত হইতেছে; আর মানুষ ও তাহার পরিবেশ দুইই পরিবর্তনের স্রোতে পরস্পরকে পরিবর্তিত করিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মনে রাখা ভালো 'মানুষ পরিবর্তিত হয়', এই কথাটি কি অর্থে সত্য। মানুষের নাক-মুখ চোখ মোটামুটি সব একই আছে (অবশ্য প্রত্যেকেরই আবার এই সবদিকেও একটু না একটু বৈশিষ্ট্য আছে)। মানুষের আবেগ-কামনা, ক্ষুধা, জরা-মরণ,—তাহাও তো ঠিকই আছে। তবে মানুষ পরিবর্তিত হয় কি অর্থে? সে অর্থ এই যে, মানুষ যেই পরিমাণে পশুপক্ষীর মতো মাত্র জীব সেই

পরিমাণে সে প্রকৃতির বাধ্য, প্রাণ-বিজ্ঞানের বা বায়োলজির নিয়মের অধীন ; সেই পরিমাণেই তাহার পরিবর্তনও হয় না। সে আহার চায়, সন্তান চায়, মৃত্যুতেও ভয় পায়, সঙ্গম খোঁজে। কিন্তু মানুষ তো শুধু মাত্র জীব নয়, সে আপনার জীবিকা আয়ত্ত করিয়াছে, আর্থিক জীবন গড়িয়াছে। প্রকৃতির রাজ্যে সে নানারূপে অধিকার স্থাপন করিতেছে। সে অন্য জীবের মতো আহার করে, কিন্তু কত রকমে সে আহারও প্রস্তুত করে। সে সন্তান চায়, আবার কতকটা সেই ইচ্ছাকে নিয়মিতও করিতে পারে। সে মৃত্যুতেও ভয় পায়, কিন্তু আবার অনেকাংশে ভয়কেও দূর করিতে পারে। ভূতপ্রেতের ভয়, পশু-শ্বাপদের ভয় কাটাইয়াও মানুষ উঠিতেছে। সে পুত্র পরিবারের জন্য, দেশ ও সমাজের জন্য, এমন কি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাধনায়ও মৃত্যু বরণও করে। সে যৌন-কামনার অধীন, জরামরণের অধীন ; কিন্তু তাহাও আবার কতভাবে ছাড়াইয়া উঠে, বিচিত্র করিয়া তোলে। এই সব কারণেই তাহার পরিবর্তনের অসম্ভব সম্ভাবনা ও অবকাশ। জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের জৈবধর্ম বিলুপ্ত হয় না, কিন্তু উহার প্রকাশভঙ্গী ও শক্তির মাত্রা পরিবর্তিত হয়,—যাহাতে তাহা জীবনযাত্রার বেশি সহায়ক হইয়া উঠে তাহা চায়। এইরূপেই জৈবধর্ম প্রথমতঃ মনুষ্য-প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। তাই সেই জীবিকার প্রয়োজনেই যেমন মানুষের আর্থিক জীবন পরিবর্তিত হয়, তেমনি তাহার প্রবৃত্তিও আবার বিকশিত হয়, বিচিত্র হয় ; নূতন ভঙ্গীতে নূতন শক্তিতে, সংযমে-নিয়মে প্রকাশিত হয়। এই অর্থেই মনুষ্য প্রকৃতিও পরিবর্তনশীল। মানুষ শুধু মাত্র জৈবপ্রেরণার বশে চলিলে এই প্রকৃতি পরিবর্তিত হইত না। মানুষের আর্থিক জীবন না থাকিলে, সাংস্কৃতিক জীবন না থাকিলে, তবেই থাকিত শুধু তাহার পশু জীবন—যাহার পরিবর্তন নাই, যাহা নিজের পরিবেশকে বদলাইতে পারে না, নিজেও পরিবর্তিত হয় না। কিন্তু মানুষের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের শক্তি আছে বলিয়াই সে মানুষ, আর ঠিক সেই কারণেই মানুষের প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে।

এই পরিবর্তন অবশ্য জানায় অজানায় নিত্যই ঘটিতেছে। সাধারণত তাহা মানুষের চোখেও পড়ে না। কারণ জীবনযাত্রার এক স্তর হইতে অন্য এক স্তরে মানুষ নিত্য উত্তীর্ণ হয় না। সেইরূপ বিরাট ভাঙ্গা-গড়া, বিপুল বিপ্লব ঘটে এক এক যুগের শেষে এক-একবার। সেই যুগান্তরে সমাজের দেহান্তর হয়, আর সংস্কৃতিরও হয় রূপান্তর। তাহাতে মানব-প্রকৃতিও আপনার বিকাশের পথে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া যায়, আর বিশ্ব-প্রকৃতি মানুষের বিজয় স্বীকার করিয়া আরও একটু নতি স্বীকার করে।

এইভাবে মানুষ অগ্রসর হইয়াছে অনেকখানি। সেই প্রস্তরযুগের মানুষ আজ আর নাই। শিল্পযুগের মানুষ এখন সংঘবদ্ধ শক্তিতে চেতন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চাহিতেছে। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, এখনো তবু প্রকৃতির একাংশও মানুষ জয় করিতে পারে নাই। আর একটি কথা— প্রকৃতির সহিত মানুষের এই সংঘাত একেবারেই যেমন জন্মগত, তেমনি মনে রাখা দরকার মানুষও প্রকৃতির এক অংশ মাত্র। বিশ্ব-প্রকৃতিরই এক বিশিষ্ট শক্তি মানবপ্রকৃতি। প্রকৃতিরই সেই বিশেষ একটি প্রকাশ হিসাবে সে দাঁড়ায় আবার প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে। আর সেই দ্বন্দ্ব প্রথম চালায় বাহু পদের সাহায্যে, বিশেষত হস্ত ও মস্তিষ্কের দ্বারা, দেহের স্বাভাবিক বলে—প্রকৃতিজাতকে আপনার প্রয়োজনানুরূপে পরিবর্তিত করিয়া লইতে। অন্য জীবের এ-সব দৈহিক সুবিধা নাই, তাই তাহারা প্রকৃতির নিগড়ে বাঁধা। আবার বহিঃপ্রকৃতির সহিত এমনি প্রয়াসে এমনিভাবে তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে বলিয়াই মানবপ্রকৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া যায় : "He (man) opposes himself to nature as one of her own forces, setting in motion the arms and legs, head and hands, the natural forces of his body, in order to appropriate nature's productions in a form adapted to his own wants. By thus acting on the external world and changing it, he at the same time changes his nature." (*Capital*—Marx, Vol. I, Pt. III, Ch. vii, Sec I.)

রূপান্তরের মূলতত্ত্ব

সমস্ত পরিবর্তনের মূলতত্ত্বটি এইবার জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। কারণ, সমাজ পরিবর্তিত হয় ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়, ইহা না হয় মানিলাম। কিন্তু কেন, কী নিয়মে এই পরিবর্তন ঘটে তাহা না জানিলে,—কোন্ কোন্ দিকে মানব-সমাজের পরিবর্তন চলিয়াছে, আর তাই সংস্কৃতির আগামী রূপান্তরে কোন্ বিশেষ চেষ্টা সার্থক হইবে এবং কোন্ চেষ্টা নিষ্ফল হইবে,—তাহা বুঝিতে পারিব না। এই সত্য না বুঝিলে, বুঝিব না কেন সোভিয়েত প্রয়াস সার্থক হয়, কেন ফ্যাশিস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য; কেনই বা এই সোভিয়েত প্রয়াসের আবির্ভাব, আর কেনই বা তাহার সঙ্গে পুরাতন অন্য তন্ত্রের, বিশেষ করিয়া প্রতিক্রিয়া-নেতা ফ্যাশিতন্ত্রের বিরোধ অনিবার্য; কেনই বা ফ্যাশিতন্ত্র পরাজিত হইলেও মার্কিন-বৃটিশ প্রতিক্রিয়াশক্তি এখন মূলত সেই শোষণ-নীতিরেই আশ্রয় করিতেছে; এবং কেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়া, আফ্রিকার জাতিসমূহ রাষ্ট্রীয় শোষণের অবসান ঘটাইয়া এখন আর্থিক স্বাধীনতার বনিয়াদ গড়িতে চাহিতেছে; কেন সাম্রাজ্যবাদও বাধ্য হইয়া কোথাও তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বিভাগ বা দেশ বিভাগ সৃষ্টি করিয়া, কোথাও আর্থিক 'সাহায্যের' বেড়াজাল ফেলিয়া আপনাদের শোষণধর্মী ব্যবস্থাকে বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছে; এবং নতুন করিয়া আবার পৃথিবীর জাগ্রত জনশক্তির বিরুদ্ধে আণবিক যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিয়া গিয়াছে। এইসব কথা পরিষ্কার হইয়া যায় সভ্যতার রূপান্তরের মূলতত্ত্বে বুঝিয়া লইলে। অবশ্য এই মূলতত্ত্ব লইয়া বিচার-বিতর্কের অন্ত নাই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিচারের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব টিকিয়া গিয়াছে। এখানে শুধু তত্ত্বটি জানিয়া সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা, অর্থাৎ সাধারণভাবে মানুষের ইতিহাসের ধারা, এই আলোকে আপাতত একবার দেখিয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে—বুঝিতে পারিব সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা কোন্ দিকে চলিয়াছে।

বিজ্ঞানের সাক্ষ্য

মানুষের সামাজিক জীবন ও মানুষের অন্তর্জগৎ এই সমস্তই যে নিয়ম মানিয়া চলে তাহা "আধ্যাত্মিক" নয়, নিতান্তই "বাস্তব"। অবশ্য এই বস্তুবাদের মতে 'মন' যে নাই তাহা নহে; মনও আছে, তবে তাহা বস্তুরই এক বিকাশ। বস্তুই মূল জিনিস আর পৃথিবী এবং মানুষ সবই বাস্তব। কিন্তু বুঝিবার মতো কথা এই—কিছুই জড় নয়! বস্তুও জড় নয়, প্রকৃতিও জড়-প্রকৃতি নয়—তাহাও চঞ্চল, পরিবর্তমান, নতুন নতুন আবির্ভাবের উৎস।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃস্থলে যে একটি আলোড়ন অনির্বাণ জ্বলিতেছে, তাহারই ফলে সেই নতুন নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব—ইহাই বিজ্ঞানেরও সাক্ষ্য। বস্তুপুঞ্জের পঞ্জরে পঞ্জরে এক ঘূর্ণীর হাওয়া লাগিয়াই আছে—বৈজ্ঞানিক এই সন্ধান দিয়াছেন। উহার নিত্য নতুন তথ্য তাঁহারা আবিষ্কারও করিতেছেন। বিশ্বের মূল উপাদান খুঁজিয়া তাঁহারা একদিন পাইয়াছিলেন—ইলেকট্রন্ ও প্রোটোন; এখন আরও সন্ধান পাইয়াছেন নিউট্রন, পজিট্রন, মিসোট্রন (মেসন), এবং সম্ভবত নিউট্রিনের। সূক্ষ্মতর আরও আবিষ্কারও হয়তো হইবে। তবে এইসব উপাদানের সংঘর্ষে জন্ম হয় নব নব বস্তুর। অবশ্য সেই নতুন আবির্ভাবের বুকের মধ্যেও গুপ্ত থাকে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। তাহাই আবার ক্রমে ফুটিয়া বাহির হয়, আবার বাধে সংঘর্ষ আর তাহার সমাধান হয় নূতনতর আবির্ভাবে। এমনি করিয়া দ্বন্দ্বে-সমন্বয়ে চঞ্চল বস্তু আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বের তাগিদে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। যেমন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কণিকার দ্বন্দ্বে হঠাৎ দেখা দেয় জল। জলকে শুধু হাইড্রোজেনও বলা যায়

না, অক্সিজেনও বলা যায় না ; দুই-ই উহাতে আছে, কিন্তু উহা জল হিসাবে একটা নতুন বস্তু আবার জলও ফুটিতে ফুটিতে এক সময়ে বাষ্প হইয়া হঠাৎ উড়িয়া যায়। জল ও তাপ মাত্র নয়, বাষ্পও আবার একটা নতুন বস্তু। বস্তু-চাঞ্চল্যের মূলে আছে এই দ্বন্দ্ব, আর আভ্যন্তরীণ সেই দ্বন্দ্বের বশে বস্তু এমনি করিয়া বাড়িয়া চলে। কণিকার পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে (quantitative change) শেষে পুরানো বস্তুই একেবারে নতুন ধরনের, নতুন গুণযুক্ত (qualitative change) বস্তু হইয়া উঠে ; আর সেই নতুন বস্তুর মধ্যে তখনকার মতো মিলাইয়া যায় পুরানো বিরোধ। কিন্তু দ্বন্দ্বই যখন মূল ধর্ম তখন এই নিয়মই অনুসরণ করিয়া নূতন বস্তুও নূতনতর হইবে। হইতেছেও তাহাই। তবে, পুরাতন হইতে নতুন, বা নতুন হইতে নূতনতর ধাপে সে সমুত্তীর্ণ হয় আকস্মিক রূপে—একটু বড় রকমের বাধা ডিঙাইয়া—এক উৎক্রান্তিতে ('jump')। মানুষের সমাজে এই উৎক্রান্তিরই নাম—বিপ্লব। ইহারই বশে হয় বিরোধের সাময়িক বিনাশ, নতুনের আবির্ভাব,—আবার নতুনের বুক ফাটিয়া নতুনতরের জন্ম। ইহাই 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ', ডায়েলেক্‌টিকাল মেটিরিয়ালিজম্‌। শুধু বিশ্ব-প্রকৃতিতে নয়, মানুষের ইতিহাসেও এই বাস্তব সত্যের প্রমাণ মিলে ; এ জন্যই ইহাকে আবার বলা হয় 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', হিস্টোরিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্‌।

বস্তুর বুক চিরিয়া এমনি এক পরম মহৎ বিপ্লব ঘটে যখন পৃথিবীতে প্রাণবীজ বস্তুকেন্দ্রে জন্মাইল—যাহাকে প্রাণবিজ্ঞান নাম দিয়াছে প্রোটোপ্লাজম্‌। বস্তু হইতে প্রাণ, দূরত্বটা ভাবিলে আজ সংশয় জন্মে বটে ; কিন্তু প্রোটোপ্লাজম্‌ বস্তুর নিকটবর্তী। একবার প্রাণের আবির্ভাব হইলে পর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুপ্রগতির যে ইতিহাস শুরু হইল, ডারউইনের শিষ্যবর্গের কল্যাণে তাহা এখন সুবিদিত, এবং আজ অবিসংবাদিত। প্রাণের আবির্ভাবে প্রাণীর 'জীবন-সংগ্রাম' চলিল। তখনো কিন্তু প্রাণী অচেতন। সেই অচেতন প্রাণীর জগতে শেষে হঠাৎ চেতন প্রাণীর আবির্ভাব হইল—যে চেতন প্রাণীর চরম নিদর্শন মানুষ। কিন্তু চেতনাহীন প্রাণী হইতে এই যে সচেতন প্রাণীতে উৎক্রান্তি—প্রাণিজগতে উহা আর এক সুবৃহৎ বিপ্লব। এখানেও হয়ত আবার আমাদের মনে সংশয় হানা দেয়। কিন্তু চেতন প্রাণী হইতে ক্ষীণ-চেতন, প্রায় অচেতন ও অচেতন প্রাণীদের ক্রমপর্যায় বাহিয়া নামিলে কথাটা অসম্ভব মনে হয় না। বস্তু-বিকাশের শেষ দান কিন্তু মানুষের এই ক্রম-পরিস্ফুট চৈতন্য—যাহার বলে সে বস্তুর উপর নির্ভরশীল হইয়াও বস্তুকে আপনার দাস করিয়া লইতে শিখিতেছে ; প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা হইয়াও প্রকৃতিকে বন্দিনী করিতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু তবু তাহার বুকে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব, বিরোধের নব-নব সূত্র তাহারও সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়া অনুস্যূত হইয়া আছে। তাহা আছে বলিয়াই তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতি সংঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, নতুন হয়, উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যায়। আর এই উচ্চতর স্তরে উঠিবার পথই হইল সংকট (crisis) এবং বিপ্লবের (revolution) পথ,—ইহাই তাহার ইতিহাসের সাক্ষ্য। 'অমিত্রয়ের' বেনামীতে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এমনি ধরনের কথা আমাদের জানাইয়াছেন তাঁহার অনবদ্য ভাষায়—যদিও রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বমূলক বা বিপ্লবী বস্তুবাদে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী নন : "মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা-গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।"

ইতিহাসের সাক্ষ্য

বিশ্বনিয়মের পূর্বোক্ত মূল সূত্রটি যাঁহারা না মানিতে চান তাঁহারাও এইরূপে স্বীকার করেন ইতিহাসের পাতায় পাতায় এইরূপে বিপুল উৎক্রান্তির সাক্ষাৎ মিলে। মানুষের ইতিহাসের তলায় কোন্‌ শক্তি জমিয়া উঠিয়া তাহাকে এমনি করিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া দেয়, বস্তুপ্রগতির সূত্র না জানিয়াও

তাহার আভাস পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করিলেও যে তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় তাহাই যথেষ্ট। দেখিয়াছি, মানুষের ইতিহাস মূলত শুরু হয় তাহার জীবিকা-প্রয়াস হইতে; কিন্তু কিছু পরেই তাহার ইতিহাস হইয়া উঠে তাহার আত্মবিরোধের ইতিহাস। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সেই মূলত প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য শ্রেণী-বিরোধের কাহিনী, দ্বন্দ্বমূলক প্রগতির কাহিনী।

প্রাণিবিজ্ঞানের যাঁহারা ছাত্র তাঁহারা জানেন, সাধারণ জীবেরা প্রাণধারণের জন্য নিজ নিজ পরিবেশের উপর নির্ভর করে, পরিবেশ-বিজ্ঞানই (ecology) জীবজগতের বড় শাস্ত্র। কিন্তু মানুষের বেলা এই পরিবেশ বিজ্ঞান মানুষের নিজের গুণে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে অর্থবিজ্ঞানে। ecology র স্থান লইয়াছে economics। ইহার সূচনা হইয়াছে সেদিন যেদিন মানুষের আদিপুরুষ উন্নত দেহ লাভ করিল, খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে শিখিল, সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিল দুইখানি কর্মক্ষম হাত, উন্নত মস্তিষ্ক, উন্নত দৃষ্টিশক্তি। মননশীল মানুষের (হোমো সেপিয়ান্) পক্ষে দুই হাত ও মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার এখন সম্ভব হইল। তার দৈহিক গঠনের বলে নিজের জীবন সংস্থানের অবলম্বন (means) সে নিজে উৎপন্ন করিতেই অপরোক্ষভাবে মানুষের জীবনযাত্রার বস্তু-উপকরণও (material) উৎপন্ন হইল। 'They begin to differentiate themselves from animals as they begin to produce their means of subsistence, a step which is conditioned by their physical organisation. By producing their means of existence men indirectly produce their material life itself (***German Ideology*** – Marx Engels)।

সংস্কৃতির গোড়াকার কথা এই জীবিকা, অর্থাৎ আর্থিক উদ্যোগ। সেই জীবিকার তাড়নায় মানুষ তাহা আয়ত্ত করিবার উন্নততর উপায় সর্বদাই খোঁজে, সমাজ তাহার আর্থিক বনিয়াদ বারে বারে বদলায়। কারণ প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যেইতো লুক্কায়িত আছে বিরোধের বীজ। এক একটা ব্যবস্থা চলিতে চলিতে ক্রমে ক্রমে ঐ সমাজের মধ্যে উৎপাদন শক্তির (forces of production) তেজ এত বাড়িয়া যায়, তাহা এত প্রবল হয় যে, তখন পুরানো সমাজ ব্যবস্থা, অর্থাৎ পরস্পরের উৎপাদন সম্পর্ক (production relations) আর সেই উৎপাদন শক্তিকে সেই সমাজ কাঠামোর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না। সেই দ্বন্দ্ব বিস্ফোরিত হয়, মধ্যে অন্তর্নিহিত রূপে দেখা যায়। তাহাই এই ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তির ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বরূপে দেখা দেয়। কিন্তু তবুই কিন্তু পুরানো ব্যবস্থা আপনার বিনাশ বা বিলোপ চায় না, নতুনকে সে দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। কর্তাগণ তারা অর্থাৎ প্রভুশ্রেণী তাহাদের অধিকার ছাড়ে না, নতুন শক্তির শ্রেণী বিপ্লবের দ্বারা তাহা কাড়িয়া লয়, প্রভুর শ্রেণীতে উঠিয়া গিয়া নিজেদের উৎপাদন-প্রথা প্রচলিত করে। এইরূপে বারবার নতুন শ্রেণী জয়ী হয়, পুরাতন প্রাচীর ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়। অবশ্য, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরানো শ্রেণীর অনেক সৃষ্টিও চুরমার হয়—তাহার ধ্যান ধারণা, ভাবনা চিন্তা, সাহিত্য, চারুকুমার-কলা, বস্তু নিদর্শন যাহা কিছু সৌধশিখরের মুকুট শোভা, সমাজ সভ্যতার পরম গরিমা। উপায় নাই, তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে তাহার আয়ু ফুরাইয়াছে। সান্ত্বনা এই যে, নতুন ভিত্তি গড়া হইতেছে, আর তাহা গড়া হইতেছে উন্নততর ভূমির উপর। আরও সান্ত্বনার কথা—পুরানো সংস্কৃতি তাহার জ্ঞান বিজ্ঞান, তাহার বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টির সারবস্তু ও সৃষ্টিকলা নতুন প্রভুর প্রয়োজনানুরূপ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে—তাহা বিলুপ্ত হইবে না, প্রয়োজনমত মিশিয়া নবায়িত হইয়া উঠিবে, নতুন সৃষ্টিতে, নতুন রূপে সঞ্জীবিত হইবে। সমাজ এক ধাপ উঁচুতে উঠিয়া আবার কিছুদিনের মতো স্থির হইবে, গড়িয়া উঠিবে নতুন আর্থিক ব্যবস্থায় তদুপযোগী মানস সম্পদ, হইবে পুরানো সংস্কৃতির রূপান্তর।

ইতিহাসের মুখ্যরূপ

মোটামুটি মানুষের ইতিহাস এই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির ইতিহাস, আর তাই ইহার অনেকটাই শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী সংঘর্ষের ইতিহাস। পুরাতত্ত্বের,

নৃতত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের গবেষকদের হাতে ইহার প্রমাণ প্রচুর রহিয়াছে। আমরা অবশ্য সাধারণভাবে শুনি—নানা কারণেই মানুষের ইতিহাস নতুন নতুন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। যেমন, হয়ত কোন রাজার খেয়ালে, কোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণে, কোনো ধর্মপ্রচারকের ধর্মপ্রচারে। তদনুযায়ী রাজা-রাজড়ার রাজ্যারোহণ বা রাজ্যচ্যুতি দিয়া আমরা ইতিহাসের কাল নির্দেশ করিয়া থাকি; কিংবা কোনো রাজবংশের রাজ্যপ্রাপ্তি বা কোনো বিশেষ শক্তির রাজ্যাধিকার দিয়া ইতিহাসের যুগবিভাগ করি। বলি, আকবরের আমল কিংবা হিন্দু-রাজত্ব বা মুঘল-যুগ। এসব একেবারে মিথ্যা নয়, তাহা জানি, —তথাপি আবার মনে রাখা দরকার, এ সব গৌণ। এসবেও ইতিহাস প্রভাবিত হয়, কিন্তু ইতিহাসে মুখ্য প্রভাব আর্থিক অবস্থার, আর তাহারই জন্য ইতিহাসের মুখ্যরূপ শ্রেণী-সংগ্রাম।

বিশ্বচরাচরের এই বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বটি বুঝিয়া লইলে সংস্কৃতির মূল উপাদান ও উহার রূপান্তরের নিয়ম সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। গোড়াতেই দেখিয়াছি—মানুষেরই সংস্কৃতি আছে, কারণ মানুষ জীবিকার পথ আবিষ্কার করিতে পারে। অর্থাৎ, মানুষের একটা আর্থিক জীবন আছে, তাই মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃতির বনিয়াদ তাহার আর্থিক অবস্থায়। কিন্তু কেহ যেন মনে না করি—আর্থিক অবস্থাই সংস্কৃতির একমাত্র ব্যাখ্যা। মূলতঃ তাহা প্রধান বস্তু, কিন্তু একমাত্র বস্তু নয়। বাস্তব ও আধ্যাত্মিক আরও অনেক শক্তি থাকে।

সংস্কৃতির তিন অঙ্গ

সংস্কৃতি বলিতে তাই শুধু যে ঘরবাড়ি, ধন-দৌলত, যানবাহন বুঝায় তাহাও নয়। শুধু যে রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বুঝায় তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়—চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, ধ্যান ধারণা, এই সবও বুঝায়,—তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব ও মানসিক সমস্ত 'কৃতি' বা সৃষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি—মানুষের জীবন-সংগ্রামের মোট প্রচেষ্টার এই নাম।

এইজন্যই বৈজ্ঞানিক মতে, সংস্কৃতির মোট তিন অবয়ব বা তিন প্রকারের অবলম্বন আছে, দেখিতে পাই।

প্রথমত, উহার মূল ভিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ (material means), **দ্বিতীয়ত** সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজগঠনের বাস্তব ব্যবস্থা (social structure), আর **তৃতীয়ত**, সংস্কৃতির শেষ পরিচয় মানস সম্পদ। সেই মানস-সম্পদ এই হিসাবে সমাজসৌধের 'শিখরচূড়া' মাত্র (superstructure), সহজ কথায় উপরতলার উপকরণ। তাহা হইলে সাধারণ-ভাবে আমরা যে মনে করি কালচার জাতিগত দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার অর্থ কাব্য, গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি আর একটি অর্ধসত্য। কথা এই যে, **সংস্কৃতি সমাজদেহের শুধু লাবণ্য-ছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ**। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়—এইটিই আসল কথা।

সমাজের রূপঃ উপাদানের দান

সমাজের পরিচয়ও অবশ্য আমরা আবার জাতি বা ধর্ম দিয়া নির্দেশ করি। কিন্তু একটু পিছনে দৃষ্টিপাত করিলেই যখন এই সব জাতির ও ধর্মের ঠিকানা দুর্লভ হয়, তখন সমাজকে আমরা চিহ্নিত করি বৈজ্ঞানিক উপায়ে—তখনকার দিনের জীবিকার উপাদান (means of living) দিয়াই তখনকার সমাজের পরিচয়। যেমন, আমরা বলি প্রস্তর যুগের মানুষ—প্রস্তরের ছুরিকা, বল্লম এবং কুঠার ও তীর ছিল ইহাদের জীবিকার অস্ত্র। স্বর্ণ ও তাম্রযুগের মানুষ—প্রস্তর ছাড়াও এই সব ধাতুর ব্যবহার

তখন ইহারা শিখিয়াছে। শেষে বলি লৌহযুগের মানুষ—লৌহের উপকরণও ইহারা ব্যবহার করিতে পারিতেছে। এই সব মানুষের ধর্ম বা জাতি কি ছিল জানি না ; কিন্তু বুঝি ইহারা কী উপকরণ দিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। আর সেই সব উপকরণের নামেই তাহাদের তখন নাম দিই, ঐ উপাদান হইতেই তাহাদের সমাজের রূপ চিনি।

সংস্কৃতির প্রথম অবয়ব : বাস্তব উপকরণ

আমাদের তুলনায় নিশ্চয়ই সেই প্রস্তর যুগের বা তাম্র-প্রস্তর যুগের বা লৌহ যুগের মানুষ ছিল 'অসভ্য'। কিন্তু জীবিকার উপাদান তবু তাহারা আয়ত্ত করিতেছে, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের সূত্রে ভাবভঙ্গী ছাড়াও অন্যরূপ প্রণালী (কণ্ঠধ্বনি) আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, বিশেষ বিশেষ অর্থে এক-একটা শব্দকে প্রয়োগ করিয়া 'ভাষা' নামক অদ্ভুত মানস-সম্পদেরও অধিকারী হইয়াছে। এক কথায়, এই দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক অগ্রগতির বলে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের গণনায় তাই তাহাদেরও 'সভ্যতার' নাম আছে ; উপাদান দিয়াই সেই নাম স্থিরীকৃত হয়। কারণ ইহাদের সভ্যতার সাক্ষ্য, ইহাদের বিচারের উপাদান—ইহাদের ব্যবহৃত দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, আহার্য ও পানীয় পাত্র, ইহাদের শব-সৎকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এইসব বস্তুরই আমরা সন্ধান পাই, এখানো অন্য উপায়ে ইহাদের কথা জানিবার পথ নাই। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই সব উপাদানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রামাণিক রূপও (টাইপ্) চিনিতে পারেন। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে একই কালে এইরূপ যত বিশেষ ধরনের (টাইপের) উপকরণ মিলে তাহার এবযোগে তাঁহারা নাম দেন সেই 'কালচার' বলিয়া। যেমন, সোয়ান নদীর উপত্যকার 'সোয়ান্ কালচার'—পাথরের একটা বিশেষ ধরনের কৃতি তাহাতে দেখা যায়।

এই সব বাস্তব উপকরণ হইতে আবার ইহাদের সামাজিক বা মানসিক গঠনেরও একটা আভাস আমরা লাভ করিতে পারি। আহার, শিকার প্রভৃতি একই উদ্দেশ্য সাধনে নানা উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু উপকরণের নির্মাণে ও ব্যবহারের রীতিতে একটি বিশিষ্ট সামাজিক ঐতিহ্যও হয়ত এক-একটি অঞ্চলে গড়িয়া উঠে। তাহার অনুসরণ করিয়াই সেই বিশিষ্ট 'টাইপের' ছুরি, কুঠার, বাসগৃহ, সমাধিস্থল প্রভৃতি নির্মাণ চলে। সেই সামাজিক ঐতিহ্যের আভাসও তাই উপকরণে নিহিত থাকে। আল্‌তামিরা ও দর্দঞ্‌র গুহা-চিত্র এই কারণেই এত গবেষণার বস্তু। কারণ, মানুষ ও তাহার জীবিকার উপকরণ, এই দুই যেমন মানুষের সমস্ত ইতিহাসের গোড়ার বস্তু, তেমনি সে উপকরণের প্রয়োগ-সৌকর্যের জন্য মানুষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে—জীবিকার দায়ে মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যে যৌথ-বিন্যাস গঠন করিয়া চলে,—তাহারই নাম সমাজ। জীবিকার উপকরণ আর জীবনযাত্রার পরস্পরের সম্পর্ক, উহা দিয়াই সমাজের মুখ্য পরিচয় ; ধর্ম, জাতি এই সব দিয়া সমাজের নামকরণ এইজন্যই অবৈজ্ঞানিক এবং বিভ্রান্তিকর।

দ্বিতীয় অবয়ব : সামাজিক রূপ

কিন্তু প্রশ্ন হইবে উপকরণ হইতে না হয় উৎপাদন-প্রথা অনুমান করা গেল, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক রূপও অনুমান করা গেল, কিন্তু উহা হইতে সেই সমাজের মানুষের মনের হিসাব পাওয়া যাইবে কি করিয়া ? ইহার উত্তর এই যে, মানুষের মানসিক সৃষ্টি যেখানে পাই না, সেখানেও মানুষের মানসিক গঠনের কিছু পরিচয় তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। যেমন, যে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়া শিকার করিয়া খাইত, বুঝিতে পারি তাহারা দল বাঁধিয়া দুর্বল বা বৃদ্ধ

পশুকে তাড়া করিত, তাহারা সকলে মিলিয়া দল বাঁধিয়া থাইত, শিকারের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের মনে ক্ষুধা, পশু, শিকার, দল—এই সবই ছিল প্রধান কথা। কিন্তু যে মানুষ কৃষিকর্ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহার মনে নদী, মেঘ, ঋতু, জমির মালিকানা এ সবই হইবে বড় চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বড় বিষয়। মানুষের মানসিক গঠনের অবশ্য আরও বেশি পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি তাহার সামাজিক ব্যবস্থা হইতে—তাহার পরস্পরের সম্বন্ধ, রীতিনীতি, আচার-বিচার, উৎসব-অনুষ্ঠান জানিলে।

যে মানস-সম্পদকে আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলিয়া থাকি,—যেমন, দর্শন, কাব্য, চিন্তা, বিজ্ঞান প্রভৃতি—যেই যুগে মানুষের সেই সব রূপের খোঁজ পাই না সেখানেও তাহার সংস্কৃতির স্বরূপ অনুমান করিতে পারি—প্রথমত, সে যুগের জীবনযাত্রার উপকরণ হইতে, দ্বিতীয়ত তাহার সামাজিক রূপ হইতে। কোন যুগে জীবনযাত্রা তাই কী-কী প্রধান উপকরণ দিয়া নির্বাহ হইত, তাহা জানিলে আমরা বুঝিতে পারি সে যুগের সংস্কৃতি কোন্ স্তরে পৌঁছিয়াছিল। জীবনযাত্রার উপকরণ দিয়া এই পথে প্রধানত সংস্কৃতির বাস্তব রূপ অনুমান করিতে পারি, বস্তুটা মানসিক ভাবনা-ধারণারও পরিচয় পাই। যেমন, পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নব্য প্রস্তর যুগের (নিয়েন্ডারথাল) মানুষও মৃতসন্তান ও আত্মীয়বর্গের সমাধি মধ্যে খাদ্য পানীয় রক্ষা করিত। তাহাতে বুঝিতে পারি—'মানুষ মরে না', 'অমর' এরূপ একটা ধারণা সেই পঞ্চাশ হাজার বছরের আগেকার মানুষের মনেও জন্মিয়াছে। শুধু তাহা নয়, লাখ খানেক বৎসর পূর্বেকার মানুষ তাহার পাথরের অস্ত্রশস্ত্রকে এমন করিয়া সযত্নে পালিশ করিত যে তাহা দেখিয়া বুঝা যায়, শুধু শিকারের দায়ে নয়, নিজের মনেও জিনিসটি সুন্দর করিবার প্রয়োজন সে বোধ করিত। তারপর দেহসজ্জা, প্রসাধন প্রভৃতির প্রমাণ উপকরণ দেখিয়া 'অসভ্য' মানুষের এই মানসিক ভাবনা-ধারণার রুচিরীতির অনেক হদিসই পাওয়া যায়। কিন্তু উপাদান অপেক্ষাও মানুষের মানসিক গঠনের স্থিরতর পরিচয় পাই সামাজিক রূপে। যে যুগে আসিয়া সংস্কৃতির এইরূপ ঐতিহাসিক উপাদান মিলে, অর্থাৎ যে যুগের সমাজ-ব্যবস্থা জানা যায়, সেখানে আর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শুধু মাত্র জীবিকার উপকরণ দিয়া সভ্যতার নামকরণ করা প্রয়োজন হয় না। সেখানে সমাজের সেই বিশেষ রূপ দিয়াই সেই সংস্কৃতিরও নামকরণ করা আরম্ভ হয়। যেমন, পশুচারিক (pastoral) সভ্যতা, কৃষিমূলক (agricultural) সভ্যতা। অবশ্য, এই সব সভ্যতার বা সংস্কৃতিরও আরও স্তর-বিভাগ করিতে হয়। কারণ, প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই আবার নতুন নতুন স্তর ক্রমশ দেখা দেয়। জীবিকা-প্রণালীর বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা সেই সব স্তর বিভক্ত। সেই স্তর ভেদের মূলেও আছে জীবিকার্জনের নতুন প্রয়োজনের চিরন্তন তাগিদ।

"The special manner by which this union (between worker and means of production) is accomplished, distinguishes the different economic epochs from one another," (*Capital*—Marx, Vol II, Kerr end, p. 44). কোনো যুগের উপকরণ কি বিশেষভাবে প্রয়োগ করিয়া সে যুগের মানুষ জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হইয়াছে, উপকরণের প্রয়োগের সেই-সেই বিশেষ পদ্ধতি হইতেই সে যুগের সংস্কৃতির স্তর নির্ণীত হয়।

শেষ অবয়ব: মানস-সম্পদ

কিন্তু যেখান হইতে সামাজিক রূপের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সুলভ সেখান হইতে সংস্কৃতির মানস-সম্পদেরও আমরা প্রায়ই সন্ধান পাই। আচার অনুষ্ঠানের বোঝা বহিয়া কখনও চিত্র, কখনও গান, কখনও কোনো মূর্তি বা বিগ্রহ আমাদের সম্মুখে সেই সব যুগের মানস-ইতিহাস খুলিয়া দেয়। নিজেদের শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি-সম্পদের বিচারে আমাদের সামাজিক ও আর্থিক বিন্যাসকে আমরা বড় মনে করি না বটে, কিন্তু যখন এইসব প্রাচীন বা আদিম জাতির এই গীত, গান নৃত্যের বা চিত্রের হিসাব লই, তখন আমরা উপলব্ধি করি সেই সব মানস-সম্পদ তাহাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকা-

প্রণালীর সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। পশুচারীর গান নাচ, বা কৃষিজীবীর গান নাচ, তাহার পশুপোষন বা তাহার কৃষিকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিল। অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্র, আখ্যায়িকা, এইরূপ জীবিকা-প্রচেষ্টার সহায়ক হিসাবেই রচিত হইয়াছে। ঐসব মানস-প্রয়াসে তখনকার জীবিকা প্রয়াস সবল ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, সংস্কৃতি পূর্ণতর হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে কড্ওয়েল রচিত 'ইল্যুশন এণ্ড রিয়েলিটি' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

পরস্পরের সম্পর্ক

বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন জীবিকার নূতন উপকরণ আবিষ্কার করাতে জীবনযাত্রা অগ্রসর হইয়াছে,—তাহাতে সমাজ সম্পর্ক নতুন হইয়াছে, উন্নত হইয়াছে আর উহারই ফলে মানসিক ক্ষেত্রে নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে,—তেমনি আবার মানসিক ক্ষেত্রের সেই নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন সৃষ্টিও বাস্তব ক্ষেত্রে জীবিকার নূতনতর উপকরণ আবিষ্কারে ও নূতনতর বাস্তব সৃষ্টিতে মানুষকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে,—তাহার সামাজিক জীবনযাত্রাকেও ঐরূপ সৃষ্টির পক্ষে নতুনভাবে বিন্যাস করিতে প্রেরণা দিয়াছে। এইভাবে বাস্তব সৃষ্টি ও মানস-সৃষ্টি পরস্পরের সহায়ক হইয়াছে, সক্রিয়-ভাবে এক ক্ষেত্রের সৃষ্টি অন্য ক্ষেত্রের সৃষ্টিকে পুষ্ট করিয়া চলিয়াছে। তাহাতেই আবার সমস্ত সংস্কৃতি উন্নত, ব্যাপক ও গভীর হইয়া উঠিয়াছে,—থামিয়া থাকে নাই, বাড়িয়াই চলিয়াছে।

জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ ও মানসিক সম্পদ—এই তিনেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত-প্রতিঘাতে এইভাবে প্রতি যুগে সেই যুগের সংস্কৃতির সমগ্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে।

উপমা দিলে বলা যায়—কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সম্পদ যেন গাছের ফুল ফল; সমাজ যেন গাছের কাণ্ড ও তাহার শাখা প্রশাখা; আর জীবিকার উৎপাদন-প্রথা যেন সেই গাছের মূল। মূলের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক ভুলিবার নয়। ফুলই যে গাছ বা কাণ্ড এই কথা মনে করিলেও ভুল হইবে। আবার মূল ও কাণ্ড হইতে ফুলকে একেবারে নিঃসম্পর্কিত বলিয়া মনে করিলেও ভুল হইবে। মূল যেমন ফুল নয়, ফুলও তেমন আকাশে ফোটে না। আর একটা উপমা লওয়া যাইতে পারে—উৎপাদন প্রথা যেন গৃহের ভিত্তি; সমাজ-সম্বন্ধ যেন তাহার নিম্নতল বা গ্রাউণ্ড প্ল্যান, আর শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মানসিক সৃষ্টি যেন সে গৃহের কারুকার্যখচিত উপরতলা, বা সৌধচূড়া। দূর হইতে দেখিলে উপরতলার রূপেই আকৃষ্ট হইতে হয় প্রথম; তারপর নিম্নতলের দিকেও দৃষ্টি যায়; কিন্তু ভিত্তির কথা স্মরণ না রাখিলেও তো ভুল হইবে। বৈজ্ঞানিক বোঝেন যে, আসল কথাটা হইল এই যে, সমাজ অবয়বের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির গভীর যোগ আছে, সে যোগ সক্রিয় যোগ; আর উহার সমস্ত মিলাইয়া যে একটি রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাই সংস্কৃতি—ফল-ফুল-ভরা বৃক্ষ বা নানা-কক্ষ-সমন্বিত প্রাসাদ। অবশ্য এইসব উপমাতে একটা ভুল ধারণা হইতে পারে—গাছ বা গৃহের মত সংস্কৃতি বুঝি স্থাণু, নিশ্চল। কিন্তু আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি, মানুষ প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে একটু একটু করিয়া জয়ী হইতেছে—আর সংস্কৃতি তাহার সেই যুদ্ধের অস্ত্র, আবার সেই যুদ্ধেরই বিজয়-নিদর্শন। মানুষের সেই জীবন যুদ্ধ যেমন নতুন নতুন রূপে অগ্রসর হইতেছে, তাহার সংস্কৃতিও তেমনি রূপান্তরিত হইতেছে। মানুষের ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই তাহার সংস্কৃতির এই রূপান্তরের ধারাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

গ্রন্থপঞ্জী

মার্ক্সীয় দর্শন—সরোজ আচার্য
দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ—জোসেফ ষ্টালিন
স্বপ্ন ও সত্য—লেখক
Historical Materialism Marx-Engels.
Man Makes Himself—Gordon Childe.
Illusion and Reality—Christopher Caudwell.
Dialectical Materialism—Cornforth
Anti Duhring—Engels.
Dialectic in Nature—Engels.

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের ভূমিকা

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাস মানুষের জীবিকোপায়ের হিসাব মতো যুগে যুগে বিভক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক সেই যুগগুলির মোটামুটি পরিচয় এবং তাহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া দিতে পারেন। সেই সব যুগের নামকরণ হইয়াছে সেই সেই যুগের বিশেষ জীবিকা অবলম্বন ও উৎপাদন প্রথা হইতে। সংস্কৃতির নামকরণও অনুরূপই হইবে। অবশ্য এইসব যুগ একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, অনেক ক্ষেত্রেই পাশাপাশি দুই তিন যুগেরও উপায় উপকরণ লক্ষিত হয়। কিন্তু যুগের নামকরণ হয় কোন্‌টি তখন মুখ্য তাহা হইতে, প্রাচীন প্রস্তর ও নব্য প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, তামা, লৌহ ইত্যাদি মুখ্যত প্রযুক্ত বাস্তব হাতিয়ারের উপাদান হইতে। না হইলে প্রাচীনতর যুগের চিহ্ন ও আধুনিকতর যুগের চিহ্ন অনেক সমাজেই পাশাপাশি খুঁজিলেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশেই তো তাহা আছে, আদিম টোডা, ভীল, সিংহলের বেড্ডা প্রভৃতি জাতি হইতে নবজাত টাটা বিড়লা প্রভৃতি ধনিক শ্রেণী পর্যন্ত এই দেশেও আছে। আবার হস্তশিল্পও আছে, বিদ্যুৎচালিত কারখানাও আছে। তাই দেখিতে হইবে সমাজে কোন্‌ ধরনের সম্পত্তি ও উৎপাদন প্রথা তখন মুখ্য, কাহার নেতৃত্বে তাহা চালিত।

প্রস্তর যুগঃ প্রাচীন প্রস্তর যুগ

মানুষের ইতিহাস বহু বৎসর পর্যন্ত প্রায় প্রাঙ্‌নরের (hominids) ইতিহাস। চীনে, জাভায় টাঙ্গানায়িকায় (আফ্রিকা), জর্মানিতে ইহাদের করোটি ও নানা চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। তাহার পরে জন্মাইল 'হোমোসেপিয়ান্‌' বা সজ্ঞান নৃজাতি।

প্রস্তর যুগই এই মানুষের ইতিহাসের প্রথম যুগ—তাহার দুই ভাগ। প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নতুন প্রস্তর যুগ। পৃথিবীর বয়স হিসাবে প্লেইস্টোসিন্‌ যুগ তখন মোটামুটি চলিতেছে।

প্রাচীন প্রস্তর যুগের কাল প্রায় লাখ দুই বৎসর। পাঁচ লক্ষ বা আড়াই লক্ষ বৎসর পূর্বে নাকি তাহা আরম্ভ হইয়াছিল। অবশ্য এই দীর্ঘকালের আবার আদি, মধ্য প্রভৃতি ভাগ আছে। ইহার মধ্যে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহা মনে রাখা দরকার। তখন মানুষ পাথরের কুঠার ও ছুরি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র চাছিয়া তৈয়ারী করিত, ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া শিকার করিত, শিকারের পশু আগুনে পোড়াইয়া ঝলসাইয়া লইত, সবাই মিলিয়া মিশিয়া ফলমূল ও মাংস খাইত। নদী ও সমুদ্র হইতে মাছও তাহারা ধরিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর খাদ্য তখন বড় অনিশ্চিত। বহুকাল যাবত অন্য প্রাণীরই মত মানুষ খাদ্য কুড়াইয়া লইত, 'সংগ্রহ করিত'; ইহার পরে সামান্য হাতিয়ার দ্বারা শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ আরম্ভ হয়। মর্গ্যান এই যুগটাকেই বলিয়াছেন 'স্যাভেজারি'র যুগ। বাংলায় 'অসভ্য' না বলিয়া ইহাকে বলা ভালো 'নিষাদ সমাজের' যুগ। মানুষের না ছিল তখন পরিবারের চিহ্ন, না সম্পত্তি। কাজে কাজেই সমাজ-সম্পর্ক ছিল জীবিকাগত আর মানসবোধও তেমনি। শ্রেণী বিভাগও তখন পর্যন্ত এই আর্থিক গড়নে প্রথম দেখা দেয় নাই। তাই সেই অবস্থাকে 'আদিম সাম্যতন্ত্র' বলা হয়। পনের কুড়ি জনে এক সঙ্গে শিকার করে, একসঙ্গে ভাগ করিয়া খায়, মেয়েরা কুটনা কুটে, শিশু পালন করে। তবু ইহারই শেষার্ধে এই নিষাদ জীবনেও ওরিগ্‌নেশিয়ান হইতে ম্যাগ্‌ডোলিয়ান স্তর পর্যন্ত সংস্কৃতি বার পাঁচেক রূপান্তরিত হয়। এইসব স্তরের সব চিহ্ন যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা নয়। এখনো মালয়ে, মধ্য আফ্রিকায়, উত্তর-পশ্চিম

অস্ট্রেলিয়ায়, মেরু প্রদেশের অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে, এমন কি আন্দামানেও এরূপ স্তরের মনুষ্য-গোষ্ঠী বাঁচিয়া আছে, তাহা মনে রাখা উচিত। অবশ্য এই জাতীয় প্রস্তরাস্ত্র শুধু ইউরোপে, আফ্রিকায়, এশিয়ায় নয়, দক্ষিণ ভারতে ও পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায়ও পাওয়া গিয়াছে, তাহাও স্মরণীয়।

প্রাচীন প্রস্তরযুগের 'নিষাদ-জীবনের' বিশিষ্ট সামাজিক গড়ন দেখা যায় তাহাদের 'টোটেম'-এ। 'টোটেম' এই শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, কিন্তু জিনিসটির সঙ্গে তাই বলিয়া আমাদের যে পরিচয় একেবারে নাই তাহা নয়। কথাটা এই—সেই যুগের এক-একটি আদিম উপজাতির (ট্রাইবের) অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুল (ক্ল্যান) উদ্ভূত হয়। অনেক সময়ই দেখা যায়—এইরূপ এক-একটি কুল কোনো জীবজন্তুকে, কিংবা বৃক্ষলতাকে নিজেদের আদিপুরুষ বা আদিমাতা বলিয়া জানে; হয়ত সেই কুলের জীবনযাত্রায় খাদ্য বা সম্পদ হিসাবে প্রথমতঃ ঐ প্রাণীটি ছিল বিশেষ উপযোগী। অবশ্য তাহার পর হইতে সেই টোটেম পিতা বা টোটেম-মাতা হইয়া যায় পবিত্রতম বস্তু, আর তাই টোটেমেরও তাহা অভক্ষ্য ('তাবু')। তাহার নামেই সেই কুলের পরিচয় হয়। আর কুলস্থ সকলে তাহার সন্তান সন্ততি বলিয়া ভাতভাই; তাহাদের পরস্পরে তাই বিবাহ চলে না। 'তাবু' সেই আদিম বিধি-নিষেধ আইন-কানুন; উহা সর্বতঃ পালনীয়। শুধু তাহাই নয়, আসল 'পিতা' এবং কুলস্থ পিতৃ-পর্যায়ের সকলেই তখন হয় পিতা ('তাত'?), মাতৃ-পর্যায়ের সকলেই মাতা। প্রথম দিকে শিকারের প্রয়োজনে কুলবৃদ্ধই তাহার অভিজ্ঞতার জন্য এই টোটেমের নেতা বা কুলপতি নির্বাচিত হইত; এইসব অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের লইয়া টোটেমের পঞ্চায়েত বসিত। জন্মসূত্রেই অবশ্য টোটেমের লোক বলিয়া প্রত্যেকে নিজেকে জানিত; তবু যৌবনাগমে তাহাদের আবার টোটেমের নিজস্ব প্রণালীতে দীক্ষা না হইলে তাহারা পুরাপুরি টোটেমে গৃহীত হইত না। (দ্রষ্টব্য What Happened in History, Gordon Childe P. 14).

এই সমাজ পদ্ধতিকেই বলে টোটেমিক সমাজ। উহার স্মৃতি কি আমাদের মধ্যে একেবারে লোপ পাইয়াছে? টোটেম বলিতে আমাদের হিন্দুদের 'গোত্রের' ('গোত্র' ও 'গোষ্ঠ' গো-ধন সম্পর্কিত এক একটি সমাজ-সম্পর্কের পরিচায়ক) কথা মনে পড়ে; টোটেমের জীবপিতার কথা বলিতে হনুমান, জাম্ববানদের কথা মনে পড়ে, আর বিবাহ বা দীক্ষার কথা বলিতেও উপনয়ন ও বিবাহের নানা আচার নিয়মের কথা মনে পড়ে।

এই সমাজ-গড়ন হইতে আমরা নিশ্চয়ই এই নিষাদজীবনের মানসিক চিন্তাভাবনারও কিছুটা পরিচয় পাই। পবিত্রাপবিত্র, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতিতে ধর্মনীতির ধারণা দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা ছাড়াও সেই প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের মন বুঝিবার মত আরও কিছু কিছু চিহ্ন আছে: উত্তর স্পেন ও দক্ষিণ ফ্রান্সে প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে ম্যাগডেলিয়ান কৃষ্টির যে সব চিহ্ন আছে (আলতামিরা ও ফোঁ দ্য গ্যোম্-এ) তাহাতে দেখি গুহাগাত্রে ও অন্যত্র তাঁহাদের আশ্চর্য চিত্র-নৈপুণ্য। হাতিয়ার সুন্দর করিয়া গড়িতে দেখিয়া বুঝিতে পারি প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষের মনে জাগিতেছে প্রথম সৌন্দর্যবোধ। উহার পিছনে সে কালের যাদুর তাগিদও ছিল—শিকারের প্রাণী ও মাতৃকা মূর্তির ('ভেনাস্' এর মূল) এইজন্যই প্রাচুর্য বেশি। চিত্রিত মৃগয়া-দৃশ্যের যাদুশক্তি আছে; সেই চিত্রিত যাদুর সাহায্যে দুর্লভ শিকারের পশুকে ঐরূপে আয়ত্ত করা যায়; মাতৃকা-মূর্তি সুফলা ধরণীরই উদ্বোধক;—হয়ত এইসব ধারণা হইতেই তাহাদের গুহাচিত্রের ও এসব 'ভেনাস্' মূর্তির বিকাশ হয়। শিকারের উপর জীবন নির্ভর করে, শিকারের পশুর ধ্যানেই তাই তখনকার শিল্পীও মগ্ন। আর কী আশ্চর্য তীক্ষ্ন ও সত্যসন্ধ তাহার এই পশুজগৎ বিষয়ক দৃষ্টি! আধুনিক কালের শিল্পীরাও নিষাদশিল্পীদের এই শিল্পকুশলতা ও এই দৃষ্টিক্ষমতার জন্য তাঁহাদিগকে নিজেদের আত্মীয় বলিয়া গণনা করিতে পারেন। তবু মনে রাখিতে পারি—উহা জীবনবিচ্ছিন্ন শিল্পচর্চা নয়, জীবনের দায়ে একরূপ জীবিকাচর্চা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের 'ধর্মবোধ' বা 'মতাদর্শের' এক বিশেষ পরিচয় এই 'যাদুতে' (ম্যাজিক-এ)। অজ্ঞতা, ভয় আর বিস্ময় হইতে আদিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে স্বভাবতই নিজের ভাগ্যবিধাতা, ভূত বা দেবতা বলিয়া সন্তুষ্ট করিতে চাহিত।

এখনো অসভ্য জাতির মধ্যে তাহাই 'ধর্ম'। সেই সন্তুষ্ট করিবার একটা প্রাচীন কৌশল যাদু বা মন্ত্রতন্ত্র। জীবিকার প্রয়োজনে ও নিজ কামনার অনুরূপে মানুষ শুধু চিত্রে নয়, মন্ত্রতন্ত্রের সঙ্গে নাচে গানে, নানা অনুকৃতিমূলক কাজে জীবজন্তু, বৃক্ষলতাপাতা হইতে প্রকৃতির নানা ব্যবস্থাকে আপনাদের কবলে আনয়ন করিতে চাহিত। যেই ফল-লাভ তাহাদের অভীষ্ট, সেই ফল লাভ যেন ঐ অনুকৃতিমূলক প্রক্রিয়াতেই আয়ত্ত হয়, লক্ষ্য ও পদ্ধতি যেন অভিন্ন, সম্ভবত এইরূপেই ছিল সে দিনের মানুষের ধারণা। হয়তো যাদুর নিয়ম নীতি ও সংযমের মধ্য দিয়া সত্যই এইরূপে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তিরও এতটা উদ্বোধন ও অনুশীলন হইত যে, মানুষ সত্যই মৃগয়ায় বা জীবিকায়ুদ্ধে এই ভাবে ক্ষিপ্রতর, কুশলতর এবং বিচক্ষণ শিকারী হইয়া উঠিত। জীবিকাচর্চা হিসাবে নাচ-গান-চিত্র-নাট্য নানা রীতিনীতি এইভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে এই যাদুকে আশ্রয় করিয়া। আবার, যাদুই হয় একদিকে ধর্মবোধ ও ধর্মাচরণের মূল, অন্যদিকে বৈদ্যের ওঝার ঝাড় ফুঁকের, মন্ত্র-তন্ত্রের ও ঔষধ-প্রলেপের ও বিজ্ঞানের মূল। পরে তাই এই যাদুকর—একাধারে যে মন্ত্রজ্ঞাতা পুরোহিত ও প্রাণদাতা বৈদ্য—অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারীও হইতে থাকিবে, তাহাও সহজেই অনুমেয়। তখন পুরোহিত-তন্ত্রের জন্মের আর দেরী হইবে না।

নব্য প্রস্তরযুগ

নতুন প্রস্তরযুগের কাল কম,—হাজার দশ বারো বৎসর পূর্বে তাহা আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এই সময়ে প্রস্তরাস্ত্র ক্রমশ মসৃণ ও সূক্ষ্ম হইল, এই সময়ে কুঠার আর তীর দেখা দিল। পাথর ঠুকিয়া আগুন জ্বালিতে মানুষ আগেই প্রথম যুগেই শিখিয়াছিল—তাহার সংস্কৃতির পক্ষে কম বড় কথা নয় সেই আবিষ্কার। এই স্তরই মর্গানের কথিত 'বারবারিজম'—বর্বর জীবন কাল।

তারপরে হাজার পাঁচেক বৎসর পরে—হাজার সাতেক বৎসর হইল হয়তো—কৃষিবিদ্যা মানুষের আয়ত্ত হয়। ঘট ও পাত্র নির্মাণ চলিল, পশুপালনও একটু আগে বা পরে শুরু হয়। শেষে সুতাকাটা ও কাপড় বোনা আরম্ভ হইল। এই সব কাজে মেয়েরাই ছিল মুখ্য। তাই মাতৃকর্তৃত্ব ছিল তখন স্বাভাবিক। এই হাজার কয় বছরে মধ্যে মানুষের সমাজ দুইটি নতুন রূপ পাইল তাহার একটির বুনিয়াদ হইল পশুপালন, অন্যটির কৃষিকর্ম,—কোনোটিই আজও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু অনেক সমাজে তাহা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে।

পশুপালনের পরিণতি

পশুপালনের দিনে জাতিরা একটু সুস্থির হইল। সম্পত্তি জুটিতে লাগিল—গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, শুকর ইত্যাদি সেই সম্পত্তি।—ইহাদেরই নাম আমাদের ভাষায় 'গোধন'। পার্বত্য ও মরু প্রদেশের মানুষদের চারণ-ক্ষেত্রের সন্ধানে ঘুরিতে হইত, তাই সেরূপ মানুষ ছিল যাযাবর। ঘোড়া, উট প্রভৃতির আদর এইজন্য আরও বৃদ্ধি পায়। 'গোধন' বৃদ্ধি পাইলে একদিকে সমাজ বৃদ্ধি পাইল; পনের কুড়ি জনের পরিবর্তে দুশ' তিনশ' লোকও একসঙ্গে এক কুলে (clan) বসবাস করিত। বংশ ও পশুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে পশুচারণের জন্য অন্যের জমি কাড়িয়া লওয়া দরকার হইত। তাই এই আর্থিক আত্মীয়কুল এক সঙ্গে মিলিয়া সামরিক উপজাতি বা গোষ্ঠী (tribe) গড়িত। পরাজিতকে প্রথম প্রথম এই বিজেতারা হত্যা করিত, পরে বন্দীকে তাহাকে হত্যা না করিয়া কাজে লাগাইল, করিল দাস। নিজের খোরাক অপেক্ষা সে তখন বেশি উৎপাদন করিতে পারে, লাভ দেয়। এই দাস ও পশুর ভাগাভাগি লইয়াই নাকি সম্পত্তির ভাগাভাগির সূত্রপাত। আদিম সাম্যতন্ত্র এইভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে। অন্যদিকে এই যুদ্ধবিগ্রহে ক্রমেই দেখা দেয় পিতৃকর্তৃত্বের যুগ। গোষ্ঠীপিতাই কর্তা, সমাজের স্ত্রী ও শিশুরা তাহারই উপর নির্ভর করে। গো-মেষ পালনের জন্য প্রয়োজন মতো বহু স্ত্রী গ্রহণ চলে।

ধর্ম আগে ছিল প্রকৃতিপূজা, ভূতপূজা, মন্ত্রতন্ত্র ও যাদুর দ্বারা প্রকৃতিকে বশ করিবার, বন্য জন্তুকে বধ করিবার কামনা-কল্পনা। আগে কুল ও কৌমের যে ধর্ম ছিল টোটেম-তাবু-গত, সেই ধর্মই পরে হইল গোষ্ঠী-পিতার পূজা ; পরের দিকে তাহারই প্রতিচ্ছায়ায় দেবতা হইলেন গোষ্ঠী-পতি (Lord of Hosts)। এইরূপে জীবিকার উপকরণের অনুযায়ী হইল তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা, আবার সেই সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাদের মানস-দৃষ্টিতে।

কৃষির দান

ইতিহাসে এমন ঘটনা আর ইতঃপূর্বে ঘটে নাই—কৃষিকার্যের প্রচলনের মত বিপ্লবী ব্যাপার। পুরাতত্ত্ববিদরা তাই ইহাকে 'প্রথম বিপ্লব' বলেন। কৃষির আবিষ্কার হইয়াছিল যখন তখনো মানুষ "বর্বর-জীবনের" স্তরে। ধাতু বিশেষে, কাঠের খুন্তি বা পাথরের কোদালি দিয়া, জমি খুঁড়িয়া বীজ ছড়াইয়াই তখন চাষ চলিত। কিন্তু ক্রমে উহার বিস্তার হইল,—সমাজে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হইল. মানুষ "সভ্য-জীবনে" উত্তীর্ণ হইল। এই বিরাট পরিবর্তন প্রধানত ঘটিয়াছিল 'নব্য প্রস্তরযুগে'র শেষে উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ ইউরোপে, পূর্ব এশিয়ার বিশাল নদনদীর ধারে। তাই পরবর্তী কালে মিশরের নীল নদ, ইরাকের তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেতিস্ নদী, চীনদেশে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং, আর ভারতবর্ষে সিন্ধু নদের তীরে সভ্য জীবনের প্রথম পৌরকেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠে। সেই সব সভ্যসমাজের সাধারণ নাম—'এশিয়াটিক সমাজ।' কিন্তু নব্য প্রস্তরযুগের শেষে মানুষ পশুপালন ও কৃষিকর্ম আয়ত্ত করিয়া এই ঈষদুষ্ণ মণ্ডলের এক-একটা জায়গায় স্থির হইয়া বসিল, অর্থাৎ 'গৃহস্থ' হইল। জমি হইল তাহার সম্পত্তি, অবশ্য পশুও আছে। এই অবস্থায় কৃষির প্রধান প্রয়োজন সেচ, অর্থাৎ বৃষ্টির কিংবা নদীর ; তাই মেঘ বা ইন্দ্র—দেবশ্রেষ্ঠ, নীল নদ—দেবতা, গঙ্গা—দেবী। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পূর্বযুগে ছিল 'ভূত' ; ক্রমে তাহারা 'দেবতার' আসন দখল করিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পূর্তবিদ্যারও পত্তন হইল, আর কৃষির 'খন্দ' বুঝিবার দাগে গ্রহ-নক্ষত্র বিচার বা জ্যোতির্বিদ্যারও সূচনা হইল। কৃষির প্রথম দিকেও অবশ্য এই জমিজমা সবই ছিল 'জিন্' বা 'জনের' সম্পত্তি ; 'জন' বলিতে বুঝাইত এক একটা গোষ্ঠীকে, আর 'জনপদ' বলিতে এক এক গোষ্ঠীর বাসভূমি। তখন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াই জীবনযাপন করিত, সব সাধারণ স্বত্ব। প্রথমদিকে বিবাহও হইত অনেক স্থলে গোষ্ঠীগত—এক গোষ্ঠীর মেয়ে মাত্রই হইত অন্য গোষ্ঠীর স্ত্রী। অবশ্য ইহারও অনেক রকমফের ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। জমির বিভাগও ক্রমে বৈষম্যের সৃষ্টি করিল, আদিম সাম্যতন্ত্রের দিন ফুরাইল। উহাতে আর মানুষের জীবিকোপায় তখন পরিপুষ্ট হইতেছিল না—প্রত্যেকের উৎপাদনশক্তি বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দীর্ঘ নব্যপ্রস্তর-যুগ ব্যাপিয়া নানা কেন্দ্রে মানবের জীবনযাত্রা অবশ্য বিবিধ রূপে হাতিয়ারের প্রয়োগে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছিল, আর নানা পর্বে সেই বিবিধ কেন্দ্রের বিবিধ কৃষ্টিও আবার নানারূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তবু নব্য প্রস্তরযুগের প্রথমার্ধে 'বর্বর জীবনের' একটা সাধারণ রূপ ছিল বলা যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ইয়ুরোপের মধ্যে মিশরের নীলনদের তীরবর্তী ফায়ুম্, মেরিমদে প্রভৃতি কেন্দ্র হইতে এশিয়া মাইনরের রাস্ শামরা, ইরাকের নদীউপকূলস্থ নিনেভা, সামরা, সুসা, উর প্রভৃতি কেন্দ্র, এবং ইরানের তুর্কিস্থানের সিয়াল্ক, হিস্সার, ও সিন্ধুনদতীরের হরপ্পা, মোহেন্জোদড়ো প্রভৃতি কেন্দ্রের দিকে বিচ্ছিন্নভাবে প্রধান প্রধান মনুষ্যবসতিগুলি বিস্তৃত ছিল, ইহা দেখা যায়। আর ব্রোঞ্জ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে (তাম্রযুগে) সেই সব কেন্দ্রে 'বর্বর-জীবন' মোটামুটি আর একটা নতুন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাও বুঝা যায়। মানুষের কৃষ্টির যে পরিচয় আমরা এই নব্য প্রস্তরযুগে পাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার একবার হিসাব লওয়া উচিত।

'নব্যপ্রস্তর-যুগের' বর্বর-জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যখন প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের মত সামর্থ্য লাভ করিল—কৃষি ও পশুপালনে তাহা সম্ভব হইল। তাহাতেই

ঘটনির্মাণ, বয়ন প্রভৃতি অন্যান্য বৃত্তির উদ্ভব হয়; আর সেই সূত্রে আবার সেই আদিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের, কারুবিদ্যারও জন্ম-সম্ভাবনা ঘটে। পাথরের বা গাছের ডাল দিয়া 'জমের' মত চাষ (লাঙ্গল তখনো আবিষ্কৃত হয় নাই), টেকোয় সুতা কাটা, কাপড় বোনা, মৃৎপাত্র-নির্মাণ - জীবিকার এই প্রধান কাজগুলি তখনো ছিল স্ত্রীলোকের হাতে; পুরুষেরা প্রধানত করিত শিকার ও গোচারণ। তাই তখন জীবনেও স্ত্রীজাতি প্রাধান্য খোয়ায় নাই। সে যুগের চিন্তা-ভাবনার কিছু কিছু আমরা সন্ধান পাই। তাহাদের শব-সমাধিতে তখন আরও বিধিনিয়ম ও আড়ম্বর বাড়িয়াছে। মাতৃকামূর্তিগুলিও নিশ্চয়ই শস্যপ্রসবিনী পৃথিবীরই যাদু-প্রতীক। এইরূপ আরও অনেক দিকে যাদু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। জীবিকা-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট গ্রামগুলি ছাড়িয়া নতুন গ্রামের পত্তন হইতেছিল। প্রথম দিকে মনে হয় গ্রামগুলি আত্মনির্ভর, মোটামুটি তাহার শান্তিও অক্ষুন্ন আছে। কিন্তু ইহার পরেই দেখি সেইসব প্রত্নবস্তুতে যুদ্ধাস্ত্রের প্রাচুর্য—বুঝিতে পারি যুদ্ধবিগ্রহ, বিজয় ও দাসত্ব দেখা দিয়াছে (দ্রঃ Neolithic Barbarism, ***What Happened in History***, PP. 38).

ধাতুর আবিষ্কার—তাম্রযুগ

'নব্যপ্রস্তর-যুগ' শেষ হইয়া গেল ধাতু ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে—পাথরের প্রহরণ ও যন্ত্রপাতি লোপ পাইল না, উহার অনেক জিনিস রহিয়া গেল, কিন্তু ধাতব যন্ত্র ও অস্ত্র প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। সেই বিপ্লবে বর্বর-জীবনের প্রথমার্ধের অবসান হইল, আরম্ভ হইল দ্বিতীয় পর্বের 'উচ্চতর বর্বর-জীবনের' পালা। ইহার মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইবে প্রথম 'পৌর সভ্যতা'; তাম্র ও ব্রোঞ্জ; ও পরে (খ্রীঃ পূঃ ১০০০) লৌহ যখন প্রচলিত হয় তখন এই পৌরসভ্যতা অগ্রসর হইয়া যায়।

খুব বেশি দিন নয়, হাজার ছয় বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে) নিকট প্রাচ্যে প্রথম আবিষ্কার হইল তামার, পরে ব্রোঞ্জের প্রয়োগ—তামার হাজার দেড়েক বৎসর পরে আসে ব্রোঞ্জ (তামা ও টিনের মিশ্রিত ধাতু)। এই দুইয়ের ফলে সমাজ গঠনেও পরিবর্তন ঘটিবেই। কারণ, বিশেষজ্ঞ কারিগরেই তামা ও ব্রোঞ্জের বস্তু নির্মাণ করিতে পারে। অন্যেরা নিশ্চয়ই চাষ করিয়া, শিকার করিয়া, পশু পালন করিয়া তাহাদের খাদ্য জোগাইত। এই দক্ষ কারিগরদেরও যাদুকর বলিয়া মান ও সম্মান থাকা স্বাভাবিক। আর খনি হইতে এই ধাতু তুলিতে, চুল্লীতে তাহা গলাইতে, ঢালাই করিতে, খাদ মিশাইতে, গড়িয়া পিটিয়া হাতিয়ার তৈয়ারী করিতে শুধু বুদ্ধি আর ধাতুবিদ্যার জ্ঞান নয়, নানা নতুন যন্ত্রপাতিও প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তাই এই ধাতু যখন একবার আবিষ্কৃত হইল তখন তো ক্রমেই নতুন হইতে নতুনতর যন্ত্রপাতিও উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। চাষে, বস্ত্রবয়নে তো উহা লাগিলই। ক্রমে এই বহু বহু যন্ত্রপাতির কারিগররূপে দেখা দিল সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, ভাস্কর, লোহার, খোদাইকার, চর্মকার, স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি। অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমাজেও পরস্পরের উপর নির্ভরপরায়ণতা অপরিহার্য হইল। ধাতব যন্ত্র ব্যবহারের এই প্রথম দিককার হাজার বৎসরকে তাই পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন বর্বরজীবনের "দ্বিতীয় বিপ্লবের" যুগ। অন্যদিকে কাঠের লাঙ্গল আবিষ্কারে ও কুম্ভকারের 'চক্র' প্রচলনে কৃষিতে ও মৃৎপাত্র শিল্পে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য কমিয়া গেল—পুরুষ ক্রমেই জীবনযাত্রায় সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। এই সব ছাড়াও আবিষ্কৃত হইয়াছিল গো-যান, পালের নৌকা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি যানবাহন। শ্রমবিভাগের ফলে শ্রেণীবিভাগ পূর্বেই শুরু হইতেছিল; জীবিকোপায়ের উন্নতি হইলে তাহা এই ব্রোঞ্জ যুগে সুস্পষ্ট হইল—আদিম সাম্যবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই এই সময় নিঃশেষ হইল। 'সভ্য জীবনের' প্রারম্ভ হয় পশুপালন, দাসদাসী, জমি, যন্ত্রপাতিতে পরিবারগত স্বত্ব ও এই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ লইয়া।

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ

পশুপালন ও কৃষিকর্মের ফলে যেমন পশু, শস্য, যন্ত্রপাতি, জমির বৃদ্ধি হয় তেমনি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বাড়িল। চাষের সুবিধার জন্যই এক-এক খণ্ড বিশেষ বিশেষ জমি এক-এক গোষ্ঠীর হাতে গেল, পরে সেই গোষ্ঠী ভাঙিয়া তাহাও উহার অংশস্বরূপে পরিবারের হাতে জমির খণ্ড থাকিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে সেই পশুর ও দাসদের ভাগাভাগি পাকা হইয়া উঠিয়াছে। ওদিকে তখন তাঁতে আবার বস্ত্র বয়ন শুরু হইয়াছে। ধাতব দ্রব্য গলাইয়া নতুন নতুন অস্ত্র ও অলঙ্কার তৈয়ারী হইতেছে, অর্থাৎ গৃহ-শিল্পের সূচনা হইতেছে। আর যাহারা দরিদ্র হীনাবস্থ তাহারা ওইসব অস্ত্র ও যন্ত্র পায় না। পশুপালন, কৃষিকর্ম ও কুটির-শিল্প—এই সবের জন্য ক্রমেই আবার দাসদের উপযোগিতা বাড়িল। তবু দরকার হইল আরও শ্রম-বিভাগ—কারণ কৃষির ও পশুপালনের উন্নতিতে উৎপাদন বাড়িয়াছে, সকলের সব কাজ করা দরকার নাই। এবং কুম্ভকার, কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতি বিশিষ্ট বৃত্তিধারী যখন দেখা দিল তখন উৎপাদন-শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। আর এইরূপে শ্রম-বিভাগের সঙ্গে শ্রেণী-বিভাগও আরও পাকা হইয়া উঠিতে লাগিল। কৌম বা গোষ্ঠীগত অধিকার আর তখন চলে না; তাই সম্পত্তি পরিবারগত হইয়া দাঁড়াইল। অনেক দিন পর্যন্ত জমি ও উৎপন্ন দ্রব্য তবু পরিবারগতই ছিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় নাই।

এই পরিবারের আবির্ভাব মানুষের মানসিক জীবনেও একটা বড় ঘটনা। আজও আমরা পারিবারিক সম্পর্কের অপেক্ষা পবিত্র সম্পর্কের কথা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু মূলত ইহার আবির্ভাব সমাজের আর্থিক পরিবর্তনে, একটা আর্থিক বিন্যাসের তাগিদে। সন্তানের জন্য মমতা স্তন্যপায়ী জীবদের জননীর পক্ষে প্রায়ই একটা জৈবিক ধর্ম;—কিন্তু তাহাদের জনকের পক্ষে তাহা তত্টা নয়। এই জননীর কৃপায় মানব-শিশুর জীবন সম্ভব হয়; মানব-মাতাও এই শিশুর মায়ার বশ। সেই কারণেই নারী একদিন ছিল কর্ত্রী। প্রাচীন সমাজ প্রায়ই ছিল মাতৃ-প্রধান সমাজ। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগে নারী আর আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শিশুর প্রাণরক্ষার্থে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইল। এইভাবেই হইল মানবশিশুর পিতৃ পরিচয় ও পিতৃ-স্নেহের প্রথম সূচনা, আর নারীরও কর্ত্রীত্ব হইতে ধীরে ধীরে অপসরণ। পরিবার সৃষ্টি হইলে এইবার স্ত্রীরা গৃহলক্ষ্মী হইল, অর্থাৎ গৃহাবদ্ধ হইল। যুদ্ধবিগ্রহ, হলকর্ষণ ও ধাতুশিল্প তখন পুরুষ-সাধ্য কঠিন কর্ম, অন্যদিকে শ্রমবিভাগের বিস্তৃতিতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৃত্তিধারীও দেখা দিয়াছে। ঐসব পরিশ্রমের কাজেও তখন নারীর স্থান হইয়াছে গৌণ। সংসারেও তাই তাহাদের স্থান গৌণ হইয়া পড়িল—প্রধান কাজ হইল ঘরকন্না করা আর সন্তান ধারণ ও পালন করা। বিবাহও এইবার অনেকটা পরিচিত রূপে দেখা দিল। তাহার একটি প্রধান কারণ এইঃ সম্পত্তির সঙ্গেই উত্তরাধিকারের কথা উঠে—তাহা কে পাইবে? এইখানে সন্তানের দর বাড়িল। ফলে তাহার মাতার সঙ্গে পিতার সম্পর্কও অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী হইল; বিবাহ একটি স্থায়ী সম্পর্করূপে দেখা দিল। অবশ্য তখনো সম্পত্তি পরিবারগত, ব্যক্তিগত নয়; তাই বিবাহ এই প্রথম স্তরে কখনো কখনো পরিবারগত ছিল—এখনো কোথাও কোথাও তাহা আছে। আর সেদিন বহুবিবাহও ছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদও ছিল।

এদিকে যখন কৃষির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিল শিল্প তখন ধীরে ধীরে জিনিস-পত্রের বিনিময় শুরু হইল। দেখা দিল কেনা-বেচা, লেন-দেন, পণ্যের উদ্ভব;—বর্তমান যুগের উৎপাদনের যাহা সবচেয়ে বড় লক্ষণ সেই পণ্যসমূহ এইভাবেই সমাজে প্রথম আসিল। এই বিনিময়ের কাজটা সরাসরি এখনো এদেশের কোথাও কোথাও চলে। কিন্তু গোধন, কার্ষাপণ হইতে ক্রমে টাকা-পয়সা আর নোট ও চেকের যুগও আজ এদেশে আসিয়া গিয়াছে।

ইহার পরের স্তরগুলিও এই শ্রমবিভক্ত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মধ্য হইতে ক্রমাগত ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বহিঃশত্রু হইতে রক্ষার তাগিদে পরিবারগুলি ঐক্যবদ্ধ হইত; clan বা কুল একত্র হইত tribe বা উপজাতি বা কৌমে। যুদ্ধের প্রয়োজনে তাহারা চাহিল নেতা, যাদুশক্তির (ধর্মের) প্রয়োজনে চাহিল পুরোহিত। অনেক প্রাচীন দেশেই এরূপ বিভাগ ছিল, কিন্তু কোন কোনোখানে এইরূপে সৃষ্টি হইল চাতুর্বর্ণ্য—একেবারে ইস্পাত-মোড়া শ্রমবিভাগ, শ্রেণীবিভাগকে তাহা পাকা ও অনড় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু সবখানেই ধীরে ধীরে দেখা দিল এক ক্ষাত্রশক্তি—যুদ্ধ যাহার কাজ; আর পুরোহিতশক্তি—সেকালের গোষ্ঠীগত বিধি-নিষেধ, 'টোটেম', 'তাবু' হইতে মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক যাদুবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত 'ধর্মগত' রহস্যের যে ছিল সংরক্ষক,—সে-ই আবার কখনো পুরোহিততান্ত্রিক সমাজে ব্রাহ্মণ্য-শক্তিও হইয়া উঠিত। প্রাচীন মিশরের মত অনেক দেশে এই পুরোহিত শক্তিই হইতেন শাসক। শেষে শাসক শ্রেণী হইতেই উদ্ভূত হইলেন রাজা। অর্থাৎ এইবার রাজ্যের জন্ম। বৈশ্যদের অর্থাৎ বৃত্তিজীবী ব্যবসায়ীদের স্থান তখনো ইহাদের নিম্নে। কারণ, তখনো বিনিময় সমুদ্রতীরের দেশে (এশিয়া মাইনরে ও পশ্চিম ভারতে) ছাড়া তত প্রভাব বিস্তার করে নাই। অন্যান্য বৈশ্য উৎপাদকেরা, বৃত্তিজীবীরা প্রাচীন গ্রীসে ছাড়া উৎপাদন-প্রথায় মুখ্যস্থান অধিকার করিতে পারে নাই—ভারতবর্ষেও না, রোমেও না, চীনেও না। আসল প্রভুশক্তি ক্ষত্রিয় আর পুরোহিতেরা, বণিকেরা তাহাদের নিচে,—তাহাদেরই সহযোগী, কিন্তু স্বশ্রেণীর নয়। ক্রমে পরাজিত বন্দী ও শোষিত দাসদের কাজ হইল এই তিন শক্তির সেবা, অর্থাৎ সকলের জন্য পরিশ্রম ও খাদ্য উৎপাদন; আর সমাজশীর্ষে প্রভুশক্তির কাজ হইল তাহা ভোগ করা; ক্ষাত্রশক্তির কাজ পররাজ্য লুণ্ঠন, গোধন কাড়িয়া লওয়া ইত্যাদি। একদল পরিশ্রম করিবে অন্য দল তাহার ফল ভোগ করিবে,—সমাজের মধ্যখানে এই একটা দারুণ বৈষম্য ও বিরোধিতার সম্পর্ক এইরূপে আদিম সাম্যবাদ ভাঙিয়া 'সভ্য সমাজের' যুগে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে স্থায়ী হইয়া উঠিল।

শ্রেণী সংঘর্ষ

'সভ্য জীবনের' সময় ('আদিম সাম্যবাদের' শেষ ও 'দাসপ্রথার' প্রারম্ভ) হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাস শ্রেণীবৈষম্যের ইতিহাস—যেখানে একদল ক্ষমতাশালী পরশ্রমভোগী বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর শ্রমের উপরে জীবনযাপন করে। আমাদের পরিচিত সভ্যতার বনিয়াদ এই কঠিন সত্যের উপর স্থাপিত। একথা যাঁহারা সভ্যসমাজে শ্রেণীবিলোপ বা সাম্যবাদ মানেন না তাঁহারাও স্বীকার করিয়া ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেও এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি এইরূপে বলিতে পারি ঃ "মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। ...তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"

রাষ্ট্রের স্বরূপ

সভ্যসমাজ, শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রের জন্ম-সম্ভাবনা অবশ্য হইয়াছিল কৃষির আরম্ভ হইতেই; নব্যপ্রস্তর যুগ ছাড়াইয়া তাম্রযুগে পৌঁছিতে পৌঁছিতে সে সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কৃষি-প্রধান গ্রাম ও জনপদগুলিতে শ্রম-বিভাগের দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় আরম্ভ হইলে 'সভ্যতার' যুগ আসিতে থাকে। যতই এই সভ্যসমাজ গড়িয়া উঠিতে লাগিল, ধনবৈষম্য, শ্রেণীভেদ ততই পাকা হইতে লাগিল, শাসক ও শাসিত শ্রেণী স্পষ্টতররূপে দেখা দিল,—অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক শাসন-যন্ত্রটির উন্মেষ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য,

শ্রেণীভেদের ফলে শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখিবার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব, শাসক শ্রেণীর প্রবর্তিত সম্পত্তিব্যবস্থা বজায় রাখাই উহার প্রধান ও মূল কাজ; মূলগত হিংসার উপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি। সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী আবার রাষ্ট্রেরও রূপ প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত হয়; রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সাধারণতন্ত্র এইরূপে নানা তন্ত্রে শাসক শ্রেণী নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থই সিদ্ধ করে। কিন্তু যদি শ্রেণীভেদ দূর করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হয়—তাহা হইলে সমাজে শাসক ও শাসিত থাকিবে না। তাহা হইলে দমনামূলক, হিংসামূলক এই পীড়নযন্ত্রেরও প্রয়োজন ফুরাইবে,—তখন সেই সাম্যবাদী সমাজ পরিচালনা করিবে তাহার উৎপাদক জনগণ সমাজের প্রয়োজনানুরূপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া, উৎপাদন-বণ্টন প্রভৃতি সংস্থার সমবেত পরিচালক-মণ্ডলীর দ্বারা।

সভ্য-সমাজ ও যুগবিভাগ

সভ্যসমাজের প্রথম উন্মেষ হয় প্রধানত আফ্রিকা ও এশিয়ার বিশাল নদীতীরগুলিতে—দক্ষিণ ইউরোপের 'উচ্চতর বর্বর জীবন' এই স্তরে উন্নীত হইবার সুযোগ তখন পায় নাই। কিন্তু উত্তর চীনের হোয়াং হো উপত্যকায় সম্ভবতঃ সেখানকার মঙ্গোলজাতীয় মানুষরাও এই সভ্য সমাজের স্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তবে, সমাজ বিকাশ পৃথিবীর সর্বত্র সমান গতিতে সমছন্দে হয় না, কেহ আগাইয়া যায় কখনো, কেহ পিছাইয়া পড়ে। নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ ধাপ হইতে যাহারা তাম্রযুগে অগ্রসর হইয়া গেল তাহাদের প্রধান কেন্দ্রগুলি আফ্রিকার মিশর হইতে নিকট প্রাচ্যের পূর্ব-উত্তর ঈরান ও তুর্কিস্থান এবং সিন্ধু ও উত্তর পাঞ্জাবের মধ্যে, এবং দূরপ্রাচ্যে চীনে অবস্থিত ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এইসব অঞ্চলের নদীর উর্বর উপকূলের বন্যার জল, পলিমাটি, নাতিশীতল আবহাওয়া কৃষির অনুকূল; সেচ ব্যবস্থায় তাহা আরও উর্বর হইল। ইহারই মধ্যে মিশরে নীলনদের ধারে, ইরাকের ইউফ্রেতিস্ ও তাইগ্রিসের তীরে তীরে দেখা দিল প্রথম সভ্যসমাজ প্রায় সাত হাজার বৎসর পূর্বে;—এই অংশের বিষয়েই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেশি গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সম্ভবত ইরাকের এই 'দোয়াবে' সভ্যতার সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে; বাইবেলে সে দেশের নাম শিনার। সেখানে দক্ষিণে সমুদ্রের কাছাকাছি বাস ছিল সুমের জাতির, আর উত্তরে বাস ছিল আরব হইতে আগত সেম গোষ্ঠীর আক্কাদ জাতির। বলা হয়, ইহারাই প্রাচীনতম সভ্য সমাজের পত্তন করে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতাও প্রায় ইহাদের সমসাময়িক। একটু পরেই (প্রায় খ্রীঃ পূঃ ২৫০০) সিন্ধুনদের তীরে ইহার অনুরূপ সভ্যতার সন্ধান পাই মোহেনজো-দড়ো ও হরপ্পায়। প্রায় তেমনি সময়ে চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী দুইটির তীরেও দেখি এক স্বতন্ত্র সভ্যতা বিকাশ লাভ করিতেছে। অবশ্য স্থান কাল অনুযায়ী প্রত্যেক কেন্দ্রেই উপকরণ, উৎপাদন ও রীতিনীতির রকমফের থাকিবার কথা, তাহা ছিলও; কিন্তু মোটামুটি এই সভ্য-সমাজের রূপে একটা মিলও পাওয়া যায়। কয়েকটা সাধারণ লক্ষণও দেখি—ইহাদের সকলের সেচ-ব্যবস্থায় ও হল-কর্ষণে; ইহাদের পৌরজীবনে ও ইটপাথরের বাসগৃহে; সমাজে কারিগর, মিস্ত্রি, পুরোহিত, রাজা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায়; ধাতুবিদ্যা ও মৃৎপাত্রের উন্নতিতে; জিনিসপত্রের বিনিময়, আমদানি রপ্তানী ও তুলাদণ্ডের প্রচলনে, পালের নৌকা ও চক্র-চালিত রথের ব্যবস্থায়; এবং সীলমোহর ও লিপির উদ্ভাবনায়। এই সকলে দেখি সভ্যতার সেই প্রারম্ভ কালের রূপ।

এই আফ্রিকা-এশিয়ার মধ্যস্থ প্রাচীনতম সভ্য-সমাজেরই সাধারণ নাম পণ্ডিতেরা দিয়াছেন—'এশিয়াটিক সমাজ'।

'তাম্রযুগ' পেছনে ফেলিয়া এশিয়াটিক সমাজ 'ব্রোঞ্জের যুগ' আরম্ভ করে; খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ উহার প্রসার কাল। তাহার পর সে নাগাল পাইল 'লৌহযুগের'। মনে হয়, সর্বাগ্রে আর্মানিয়ার প্রাচীন মিতান্নি দেশে কোনো এক অখ্যাত আর্যভাষী শাখা লোহার আবিষ্কার করে (খ্রীঃ পূঃ ১০০০ শতাব্দের দিকে)—সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ-বস্তুর ও উৎপাদন-প্রথারও দ্রুত

পরিবর্তন হইল। কিন্তু ব্রোঞ্জ যুগের পূর্বেই 'সভ্য-সমাজ' আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাসে তখন হইতে উহার সুসংবদ্ধ লিখিত কাহিনী মিলে। তাই সভ্যসমাজের আরম্ভ হইতে আর উপকরণ দিয়া যুগ-বিভাগের প্রয়োজন থাকে না। কেহ বেহ ভাগ করেন তাহা সুমের, মিশর প্রভৃতি দেশ বা জাতির নাম দিয়া ; কিন্তু সমাজ-বৈজ্ঞানিক যুগ-বিভাগ করেন উৎপাদন প্রথার বিপ্লব-বিবর্তন অনুযায়ী। তাই সেই আদিম মনুষ্য সমাজ হইতে আজ পর্যন্ত জীবিকা উৎপাদনের পদ্ধতি অনুযায়ী মানুষের ইতিহাসে পাঁচটি প্রধান যুগ দেখিতে পাওয়া যায় :

১। আদিম সাম্যতন্ত্রের যুগ :—প্রধানত, 'সভ্য জীবনের' উদ্ভবের পূর্বেই প্রায় উহার অবসান হইয়াছে : নিষাদ-জীবন ও বর্বর-জীবনেই উহা সীমাবদ্ধ ছিল।

ইহার শেষে 'এশিয়াটিক সমাজে' উদ্ভূত হয় এক ধরনের প্রাচীন সামন্ত তন্ত্র, আর ভূমধ্যমণ্ডলে উদ্ভূত হয় দাসপ্রথা।

২। দাস-প্রথার যুগ :—দাসদের উৎপাদনেই তখন মুখ্যত সমাজ চলিত। গ্রীস ও রোমের সভ্য সমাজের বনিয়াদ ছিল মোটের উপর এইরূপ দাসপ্রথা। অবশ্য ইহার রকমফের আছে। আর ভারতীয় প্রাচীন সমাজে ঐরূপ দাসপ্রথা উৎপাদনের মুখ্য ব্যবস্থা ছিল না বলিয়াই মনে হয়।

৩। সামন্ততন্ত্রের যুগ :—ইহারই অন্য নাম বলা হয়, 'ক্ষুদ্র কৃষকতন্ত্র ও ক্ষুদ্র বণিকতন্ত্রের' যুগ ঐরূপ উৎপাদন ব্যবস্থা উহার মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

৪। পুঁজিতন্ত্রের যুগ :—যন্ত্র শিল্পের সঙ্গে ইহার প্রারম্ভ ও প্রসার, পুঁজিদারের মুনাফার জন্য মজুরের দ্বারা পণ্য উৎপাদন ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৫। সমাজতন্ত্রের যুগ :—কলকারখানা ও জমি প্রভৃতি উৎপাদন-যন্ত্রসমূহ এই প্রথায় সমাজের ও সর্বসাধারণের সম্পত্তি, উহা পুঁজিদারের মুনাফা জোগানোর হাতিয়ার নয়।

'এশিয়াটিক সমাজ' : পশ্চিম এশিয়া

সমাজ বৈজ্ঞানিকের এই যুগ বিভাগ মোটামুটি সত্য হইলেও যে কোনো সভ্য সমাজকে যেমন করিয়া হউক এই ছকে ফেলিয়া দিতে গেলে তাহা বৈজ্ঞানিক কাজ হইবে না। তাই কি দাসতান্ত্রিক উৎপাদন, কি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন, উহারও নানা দেশে, নানা পর্যায়ে রকমফের আছে। বিশেষত মধ্যযুগ পর্যন্তও যানবাহন যোগে ও আদানপ্রদানের সূত্রে সভ্যতার কেন্দ্রে কেন্দ্রে যোগাযোগ একালের মত এত ঘনিষ্ঠ ছিল না ; নানারূপ বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সেই সময়ে একই স্তরের সভ্যতারও বিভিন্ন কেন্দ্রে সুস্পষ্ট থাকাই স্বাভাবিক। পুঁজিতন্ত্রের যুগ হইতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সেই স্থানীয় পার্থক্যের মাত্রা কমিতে থাকে ; দ্বিতীয়ত, সমাজ-বৈজ্ঞানিকগণ প্রধানত ইউরোপীয় মণ্ডলের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আদিম সাম্যবাদের পরেই গ্রীস-রোমের দাসতান্ত্রিক উৎপাদন হইতে ইতিহাস গণনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যখানে সভ্যতার প্রথম প্রারম্ভ হয় সুমের-আক্কাদ, প্রাচীন মিশর, সিন্ধু-উপত্যকা ও উত্তর চীনে ; তাঁহারা নিকট প্রাচ্যের সেই সভ্য-সমাজের নাম দিয়াছেন 'এশিয়াটিক সমাজ'। কিন্তু এই সমাজকে ঠিক দাসতন্ত্রী সমাজ বলা সম্ভব নয়, বরং উহাকে এক ধরনের প্রাচীন সামন্তপ্রথা বলাই শ্রেয়ঃ। মধ্যযুগের ইউরোপের 'ফিউডাল সমাজে'র (মোটামুটি খ্রীস্টাব্দের ১০০০-১৫০০ পর্যন্ত) সঙ্গে এশিয়ার এই প্রাচীন সামন্ত সমাজের কিছু পার্থক্য থাকিলেও মিলও অনেক।

'এশিয়াটিক সমাজের' মোটামুটি রূপটা কী, তাহার আভাস আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহার উৎপাদনের ধাতব উপকরণের (তাম্র, ব্রোঞ্জ—উহা টিন ও তামার মিশাল ধাতু, যেমন দস্তা,—লৌহ) ব্যবহার হইতে ও তাহার সভ্য জীবনযাত্রার পরিচয় হইতে। একটা বড় কথা, এই সভ্যতা পৌর-সভ্যতা। এরেক্, এরিদু, লাগাস্ এবং উর প্রভৃতি উহার কেন্দ্রগুলি জনসংখ্যায় ও আয়তনে গ্রাম নয়, রীতিমত 'নগর'। গ্রাম-জনপদের যুগ এই সভ্যতা কাটাইয়া উঠিয়াছে, তাই ইউরোপীয়

ভাষায় ইহা 'সিভিলিজেশন'। গোড়ায় এ সমাজের কল্পিত কর্তা ছিলেন পুরাধিষ্ঠাতা দেব-দেবী; পুরবাসী সকলে যেন তাঁহারই পরিবারভুক্ত, তাই মন্দিরই তখন জীবন-কেন্দ্র ছিল। কিন্তু দেবতার মুখপাত্র হইতেন মানুষ, তিনিই প্রধান, আর তিনিই হইতেন প্রভু। খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার অব্দের কাল হইতে ইহাদের লিপিচিত্রের নানা বিষয়ের পাঠোদ্ধার হইয়াছে—অর্থাৎ লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া লাগাস্-এর বাউ-দেবীর জমিজমা হিসাবপত্রই বেশি পাই। খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ অব্দের দিকে দেখা যায় সুমের ও আক্কাদে খণ্ড খণ্ড পৌররাজ্য ছিল, উহার স্থানীয় প্রধান বা রাজাও ছিল, ইহাদের নাম ইশাক্কু। ইহারা একাধারে এই সব জমিদার ও পুরোহিতদের নেতা। ইশাক্কু ছাড়া পুরোহিতেরাও ছিল প্রবল। চাষীদের নিকট হইতে ইশাক্কু রাজস্ব রূপে শস্যের সপ্তমাংশ আদায় করিত; আর বাজোর বাঁধ খাল, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাষীদের 'বেগার' খাটাইত। এই আদায়-উশুল করিবার জন্য ও বেগার খাটাইবার জন্য নিয়োগ করিত এক ধরনের কর্মচারী—হয়ত কর্মচারীরা বেতনভুক্। ইহা ছাড়া হিসাবপত্রের জন্য (অঙ্ক ও লিপিচিত্রে দেখা যায়) ও লিখিবার জন্য কেরানিও ছিল। আর মন্দিরের ও প্রাসাদের সঙ্গে থাকিত তাহাদের আশ্রিত কারিগর—হয়ত মধ্যযুগের ইউরোপের কারিগরদের মতই। অবশ্য সমাজে দাসও ছিল, তাহারা প্রধানত গৃহকর্ম করিত। তবে প্রভুদের জমি চাষ করিবার জন্য প্রভু যাহাদের কাজে লাগাইত তাহারাও ছিল 'দাসের' সামিল। কিন্তু সমাজের প্রধান গঠন প্রভু-দাসের সম্পর্কের উপরই স্থাপিত হইয়াছিল, এই কথা বলা চলে না। প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসপত্রের অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে বিনিময় হইত; তাই ব্যবসায়ী বণিক শ্রেণীরও একসময় দেশে উদ্ভব হয়। কিন্তু বিক্রয়ের জন্য 'পণ্য' প্রস্তুত করা তখনো সাধারণ নিয়ম হইয়া উঠে নাই। আর এই বণিকেরাও ছিল প্রভুশ্রেণীর আশ্রিত ও শোষিত; ব্যবসায়ের লভ্যাংশ প্রধানত প্রভুরাই ভোগ করিত। এই সমাজ-ব্যবস্থাকে 'রাজস্বভোগী রাষ্ট্র' বলা হয়, কিন্তু ইহাকে 'সামন্ত তান্ত্রিক' ("ভ্যাসালেজ্") ব্যবস্থা বলাই বোধ হয় আরও শ্রেয়ঃ। তবে এই ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য ইহার স্থাণুত্ব। দেবতা বা দেবতার প্রতিনিধি রূপে রাজা ও পুরোহিতে মিলিয়া এই শাসক-শাসিতের সমাজকে অচলায়তন করিয়া তোলে। তাই সুমের ও আক্কাদে নানা শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যেও সহস্র সহস্র বৎসরে এই কাঠামো বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। ছোট ছোট রাজ্য ভাঙিয়া যখন সুমের আক্কাদে শারুকিন (বা সারগোন্) নামক একজন নেতা সম্রাট হইয়া বসিলেন (খ্রীঃ পূঃ ২৮৭২-২৮১৭), তখনো আসলে সমাজ রূপান্তরিত হইল না। ইহার পরে কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটিল—কিন্তু তাহাতে কি? কত সম্রাটের কত কীর্তি-কলাপ, জয়-পরাজয়ে সুমেরের পৌর সভ্যতা প্রসারিত ও গৌরবান্বিত হইল;—পশ্চিমে মিশর ও পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত এই সভ্যতার আদান-প্রদান চলিল;—সিন্ধু উপত্যকার সীলমোহর, মৃৎপাত্রাদির চিহ্ন এই কালের (খ্রীঃ পূঃ ২৬০০-২,১০০) সুমের নগরীতে পাওয়া যায়। তারপর খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের কাছাকাছি ব্যাবিলন নগরীর প্রধানরা এই সুমের সাম্রাজ্য আয়ত্ত করিল, এই অঞ্চলের নাম হইল তখন 'ব্যাবিলনিয়া'। আরও হাজার খানেক বৎসর পরে উত্তরের পাহাড় হইতে দুর্ধর্ষ আসিরীয় রাজারা লৌহাস্ত্রে ও সৈন্যবলে বিজয়ী হইয়া এই অঞ্চলের সম্রাট হইয়া বসিল; পারস্য হইতে মিশর পর্যন্ত ছিল তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত। শত দুই বৎসর পরে আর একবার স্বাধীন ব্যাবিলনিয়া শতখানেক বৎসর-ব্যাপী নতুন সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ইহারই নাম 'কালডিয়া-সাম্রাজ্য'। আর তাহার পরে আসিল ইরানী আর্যগোষ্ঠীর কাইরুসের প্রতিষ্ঠিত পারস্য সাম্রাজ্য। খ্রীঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে সেই পারস্য সাম্রাজ্যও গ্রীক সম্রাট আলেকজেন্দার অধিকার করিলেন;—প্রাচীন 'এশিয়াটিক সমাজের' প্রধান প্রধান কেন্দ্র তখন ভাঙিয়া গেল। কিন্তু এই চার হাজার বৎসরে এত রাজা-রাজড়ার পরিবর্তনে সেই 'এশিয়াটিক সমাজের' মৌলিক কোনো রূপান্তর ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির প্রাসাদ, পূর্ত বিদ্যার উন্নতি, সময়ের হিসাব, বারো মাসে বছর, সাতদিনে সপ্তাহ, বারো ঘণ্টায় দিনের পরিমাপ;—গ্রহ নক্ষত্রের জ্ঞান, অঙ্ক ও হিসাব, আর লিপিচিত্রের পরিবর্তে ফিনিসিয়ার উদ্ভাবিত আক্ষরিক লিপির প্রচলন—পরবর্তী অন্যান্য সভ্যতা সুমেরের এইসব কীর্তি বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু পূর্বাপর সেই সামন্তপ্রথাই

সুমেরীয়দের মধ্যে এই চার হাজার বৎসর বলবৎ রহিয়াছে—সম্রাটেরা দুর্বল হইলে ছোট রাজারা সম্রাটকে বিব্রত করিত বা পরস্পরে যুদ্ধ বিগ্রহে মাতিত, জনগণকে উৎপীড়ন করিত ; আর সম্রাট সবল হইলে শোষণ কেন্দ্রীভূত হইত ; পুরোহিত, মালিক ও বণিকদের স্বার্থকে তিনি নিজের আশ্রয়ে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতেন । কোন সময়েই কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো প্রকৃত পরিবর্তন হয় নাই, শোষণ-প্রথার কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নাই ।

সুমেরের সমসাময়িক ছিল মিশর, আর সুমেরের অপেক্ষা সামান্য বনিষ্ঠ হইলেও তাহার সমজাতীয় সভ্যতা ছিল মোহেন-জো-দড়ো হরপ্পার সভ্যতাও (পরে দ্রষ্টব্য 'ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা আদিপর্ব,' উহাতে হরপ্পাদির উল্লেখ করা হইল)। মিশরীয় সমাজের সাধারণ পরিচয়ও মনে রাখা প্রয়োজন ।

মিশর

মিশরের কীর্তি কাহিনী কিন্তু সুমেরের অপেক্ষাও বেশি বিস্ময়াবহ । তথাপি প্রাচীন মিশরের সামাজিক ব্যবস্থা ও ইতিহাস আসলে এই 'এশিয়াটিক সমাজের'ই একটা রকমফের—উহা সুমেরের সমসাময়িক ও সমতুল্য । হাজার সাতেক বৎসর পূর্বে মিশরের সভ্যতার উন্মেষ হইতে থাকে নীলনদের তীরস্থিত ফায়ুম্, মেরিমেদি প্রভৃতি কেন্দ্রে—তখনো 'বর্বর-জীবন' শেষ হয় নাই । সভ্য জনসমাজের প্রারম্ভকালে ছোট ছোট খণ্ড রাজ্য সেখানেও ছিল । জীবনযাত্রার দিক হইতে তবু এখানে বিশেষ লক্ষিত হয় দুইটি জিনিস ঃ—টোটেমিক জীবন,—অর্থাৎ আদিপুরুষের বা আদিমাতার ধারণা, তাহার নামে গোত্র বিভাগ ; এক একটি কেন্দ্র বা শহর ছিল এইরূপ গোত্রের বাসভূমি । সেই আদিমাতা বা আদিপুরুষ তাই সেখানে আদিদেব হয় । প্রাচীন মিশরও প্রায় 'দেবতার দেশ' হইয়া উঠে অর্থাৎ দেশ হইয়া উঠে কখনো দেবতার বংশধর 'পুরোহিত রাজার', কখনো বা রাজ-বিরোধী দেবতার প্রতিনিধি 'পুরোহিততন্ত্রের' । দ্বিতীয়ত, মানবের স্বাভাবিক কামনায় শব-রক্ষা অন্যত্রও বহু দিন হইতে চলিতেছিল । কিন্তু শব-সমাধি মিশরে এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হয় । 'মমি'রূপে দেহ-সংরক্ষণের বিদ্যার তাই একদিকে উন্নয়ন চলিত, অন্যদিকে পিরামিডের মধ্যে রাজা-রাজড়ার প্রত্যেকের ভোগ আড়ম্বরের অশেষ উপকরণসমূহও সঞ্চিত হইতেছিল—পরকালের দেহযাত্রার জন্যই যেন ইহকালের সমস্ত আয়োজন । মিশরীরা 'ইহ'-সর্বস্ব নয়, অথচ দেহসর্বস্ব নিশ্চয় ; তাই মিশর পিরামিডের দেশ । অবশ্য সাহিত্য, কবিতা, পৌরাণিক গল্প, সমাধি-মন্দিরের স্থাপত্য, চিত্রকলা, মূর্তিশিল্প, ভাস্কর্য, আর নানা তৈজসপত্র,—দেশ বিদেশের বাণিজ্যের সাক্ষ্য, প্যালেস্টাইন হইতে আনীত তাম্র, নুবিয়ার স্বর্ণ, লেবাননের দেবদারু কাষ্ঠে, আফগানিস্তানের লেপাস্ লেজুলি প্রস্তর, ঈজিয়ান্ মণ্ডলের মর্মর প্রস্তর,—সভ্যতার এই সব অজস্র সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রাচীন মিশরের স্থান ইতিহাসে অতুলনীয় । মিশরের ঐতিহাসিক কাহিনী ও সম্রাটগোষ্ঠীর পরম্পরাও মোটামুটি জানা গিয়াছে ঃ গোটা চল্লিশেক ক্ষুদ্র রাজ্য ভাঙিয়া প্রথম উদিত হয় উত্তরে ও দক্ষিণে এক একটি রাজ্য, তাহার পর খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার অব্দের কাছাকাছি মিশর এক-রাজ্যে পরিণত হয় । সম্রাট মেনেস্ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশ জুড়িয়া (খ্রীঃ পূঃ ৩১৮৮ হইতে ২৮১৫) চলে মিশরের "প্রাচীন" যুগ । তারপর উত্থান-পতনে ১১টি রাজবংশের কথা আছে, এই রাজাদের উপাধি আমরা জানি—'ফেরো' বা 'ফেরাও' । পুরোহিত ও প্রধানরা তবু কম ক্ষমতাবান ছিল না । সেই সব বিত্তবানদের শোষণেরও সীমা ছিল না । রাজস্ব জোগানো, বেগার খাটা, এই ছিল সাধারণের ভাগ্যলিপি । চাবুকের জোরে খাজনা আদায় হয়, দুর্ভিক্ষে আগাছা খাইয়া চাষীরা বাঁচে—এইরূপ বহু চিত্রে এই অবস্থার প্রমাণ মিশরীরাই রাখিয়া গিয়াছে । ইহার উপরেও ছিল রাজার শোষণ—পীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করা আর পিরামিডের মত কীর্তি নির্মাণের জন্য চাবুক মারিয়া বেগার আদায় করা । কিন্তু মিশরীয়দের চক্ষে এই রাজারা দেবতার বংশধর ; কেহ কেহ বা স্বয়ং দেবতাও । কাজেই

তাহাদের ইচ্ছা অমান্য করিবার কথা ভাবাও সাধারণের পক্ষে সহজ ছিল না। তবু বারে বারে মিশরে প্রজা বিদ্রোহও হইয়াছে; রাজশক্তি ও পুরোহিততন্ত্র ও বিত্তবানরা মিলিয়া সেইসব বিদ্রোহ দমন করিত। প্রজাদের অসন্তোষ অবলম্বন করিয়াই খ্রীঃ পূঃ ৫০০ বৎসর পূর্বে থীব্‌সের সামন্তরা ফেরো হইয়া বসে। আবার সাত শত বৎসর পরে এক প্রজাবিদ্রোহে তাহারা সাময়িকভাবে ক্ষমতা হারায়; মিশর তখন প্রকাণ্ড কেন্দ্রীভূত সামরিক সাম্রাজ্য হইয়া উঠে। ভাড়াটে সৈন্য থাকিত শান্তি-রক্ষার জন্য; অন্য দেশ লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ন আহরণ করিত এই সম্রাটরা; পরকালের জন্য তাহা জমাইত পিরামিডে! শোষিত প্রজাদের অসন্তোষ কাজে লাগাইয়া শেষ দিকে পুরোহিততন্ত্র—তাহারাও সামন্তদেরই সগোত্র—ফেরাওদেরও খর্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। উহার কিছুকাল পরে এশিয়াস্থিত আসিরীয়রা মিশর জয় করে। তারপরে পারস্য-সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তির দিন, আর শেষে আসিলেন গ্রীক আলেকজেন্দার (৩৩২ খ্রীঃ পূঃ)।

ঈজিয়ান্ মণ্ডল

একদিকে সুমের ও সিন্ধুতীরবর্তী ভারতবর্ষ অন্যদিকে 'মিশর', গ্রীক বিজয়ের ফলে এই বিস্তৃত 'এশিয়াটিক সমাজের' শেষদিককার কীর্তিকলাপ, উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার প্রভৃতি সভ্যতার দানকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন পাশ্চাত্য জগৎ তাহার সভ্যতা গঠনের সুযোগ লাভ করে। অবশ্য ইহা জানা কথা—গ্রীসদেশের মূল সভ্যতা বনিয়াদ স্বরূপ পাইয়াছিল ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ 'উচ্চতর বর্বর-জীবনের' কেন্দ্রগুলিকে। সেখানেও সভ্য-সমাজ 'পৌর সভ্যতা' রূপে ক্রিটে, এশিয়া মাইনরে, ট্রয় প্রভৃতি স্থলে ও সমুদ্র তীরবর্তী অন্যান্য শহরে জনপদে সভ্যতার এই পথেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল, তাম্রযুগ ও ব্রোঞ্জযুগের মধ্য দিয়া (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ ১২০০)। সেই গ্রীকদেশের প্রাচীনতম মানুষদের জীবিকার অন্যতম প্রধান আশ্রয় ছিল পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি বিদ্যা; কারণ গ্রীসের অনুর্বর ভূমি কৃষিকার্যের অনুকূল ছিল না। মাইনোস্ (ক্রীট দ্বীপের) পর্ব হইতে মাইকেনী (নিজ গ্রীসের) পর্ব পর্যন্ত (খ্রীঃ পূঃ ২,০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১,২০০ পর্যন্ত) ঈজিয়ান মণ্ডলের এই সভ্যতায় রাজা-রাজড়া আছে, মন্দির আছে (বিশেষত মাইনোস্-এ), যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে, যোদ্ধশ্রেণীও আছে (ভাড়াটে সৈনিক নয়, বরং সামন্ত অধিনায়কের মত, মাইকেনীর রাজার বশ্যতা স্বীকার করা)। কিন্তু 'এশিয়াটিক সমাজের' মত কৃষি-নির্ভরতা ও সামন্ততন্ত্র বেশি বিকশিত হইবার পূর্বেই আর্য-ভাষী অসভ্য হেলেনিক বা গ্রীক-জাতির আক্রমণে ঈজিয়ানের এই প্রাচীনতর প্রাক্-আর্য সমাজ (খ্রীঃ পূঃ ১২০০-৭০০ এর মধ্যে) ভাঙিয়া পড়িল। আর আর্যভাষী হেলেনিকরা তখন সমাজ গড়িল 'দাস প্রথা'কে প্রধান অবলম্বন করিয়া। এই আর্যভাষী হেলেনিকরাই ইউরোপীয় ইতিহাসে 'গ্রীক' বলিয়া পরিচিত।

দাসপ্রথার যুগ

সেই প্রায়-বর্বর জীবন হইতেই মনুষ্য সমাজে যে দাস আছে, তাহা সুবিদিত। ইহা যে এই যুগেও টিকিয়া ছিল,—দশ বৎসর পূর্বেও নেপালে দাসপ্রথা চলিতেছিল,—তাহাও আমরা জানি। কিন্তু দাসদের পরিশ্রমেই সমাজে উৎপাদন ও আর্থিক জীবন মুখ্যরূপে সংগঠিত করে গ্রীস ও রোমের সভ্যসমাজ। তাহার পূর্বে 'এশিয়াটিক সমাজে'ও এইরূপ উৎপাদনের প্রাধান্য ছিল না, তাহার পরে ইউরোপের প্রাচীন বা মধ্যযুগেও আর ঠিক দাসপ্রথার প্রচলন রহে নাই; মধ্যযুগের সামন্ত সমাজে দাসপ্রথা পরিবর্তিত হইয়া 'ভূমিদাস প্রথার' উদ্ভব হয়। **'দাস-উৎপাদনের' প্রধান দৃষ্টান্ত গ্রীস ও রোম।**

গ্রীস

গ্রীসের গ্রীক জাতীয় বিজেতারা ছিল আর্যভাষাভাষী (অর্ধ-বর্বর)। এক সময়ে তাহারাও সম্ভবতঃ আদিম সাম্যতন্ত্রী সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ব্রোঞ্জ যুগের প্রাচীন মাইকেনীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে যখন তাহারা জয়ী হইল তখন দেখি যুদ্ধের প্রয়োজনেই গ্রীকদের মধ্যে দলপতির উদ্ভব হইয়াছে। ছোট বিত্তবানদের শ্রেণীভেদ হইয়াছে। তাহাদেরই মধ্যে যে প্রধান দলপতি, সে আবার রাজা বলিয়া গণ্য হইতেছে, আর বিত্তবানরা মিলিয়া তাহার মন্ত্রণাসভা বা পঞ্চায়েৎ গঠন করিতেছে। এই সভার হাতে প্রভুত ক্ষমতা। হোমারের উল্লিখিত বিজয়ী গ্রীকদের সমাজ অনেকটা এইরূপ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। এশিয়া মাইনরের এই উপকূলে ক্রমে গ্রীকদের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ গড়িয়া উঠে, তাহাদের সমবেত নাম আইওনিয়া,—সংস্কৃত 'যবন' কথাটির উৎপত্তি এই শব্দটি হইতে, 'যবন' নামে সাধারণভাবে পূর্বে গ্রীকদেরই বুঝাইত। হোমারের যুগে গ্রীক সমাজে দাসদাসী আছে বটে, তবু গ্রীক সমাজে দাসপ্রথা ঠিক মত গড়িয়া উঠিতে আরও শত পাঁচেক বৎসর লাগে। তাহার পূর্বে লৌহ-উপাদানের ব্যবহার সুপ্রচলিত হইয়াছে, আর সেই পরাজিত মাইকেনীয় সভ্যতারও কিছু কিছু দান গ্রীকসমাজ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে— যেমন, ফিনিসিয়ার উদ্ভাবিত বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি, মাইনোস-মাইকেনিয়ার নৌ-বিদ্যা ও বাণিজ্যবৃত্তি, এবং মুদ্রাপ্রচলন, আঙ্গুর ও জলপাইর চাষ, জ্যামিতিক ক্ষেত্র নির্মাণ পদ্ধতি ইত্যাদি। কিন্তু গ্রীসের ভূমি অনুর্বর, তাই পশুপালন এই গ্রীকদের একটা প্রধান জীবিকোপায় হইয়া রহে। প্রধানত এক একটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে একটি 'পলিস' বা পুররাষ্ট্র। পশুপালনের সঙ্গে আরম্ভ হয় ঐ অঞ্চলের তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি খনিজ ধাতুর উত্তোলন, ধাতব যন্ত্রাদি নির্মাণ। এই সব জিনিসের বিনিময়ে বিদেশ হইতে শস্য, মাছ প্রভৃতি আমদানী করা গ্রীক ব্যবসায়ীদের কাজ হইয়া উঠে। ক্রমে লেনদেনের ব্যবসায়, লগ্নী কারবারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া সমুদ্রে অভিযান ও লুণ্ঠন, আর সমুদ্রের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপনও চলে। আর অঙ্গুরের মদ্য, জলপাইর তৈল, বাসনপত্র, ধাতু নির্মিত হাতিয়ার প্রভৃতি নির্মাণের কাজে মজুর কারিগরেরও দিনের পর দিন বেশি প্রয়োজন হইল। এশিয়াটিক সমাজে ব্যবসায়ী ও কারিগর ছিল মন্দির পুরোহিতের আশ্রিত, ভূ-সম্পত্তির অধিকারীদের অনুগত শ্রেণী মাত্র। কিন্তু অনুর্বর গ্রীসে ভূ-সম্পত্তির অধিকারীদের এত ক্ষমতা ও বিত্ত ছিল না ; গ্রীসে মালিক বণিকেরা ও শিল্পজীবীরাও তাই যথেষ্ট প্রভাবশালী হইবার সুযোগ পাইল। মালিকদের ব্যবসায় ও কারখানায় ক্রীতদাসের দ্বারা উৎপাদন ক্রমশ বিস্তার লাভ করে।

তবু গ্রীসের সভ্যতার প্রথম দিকে এই বণিক ও শিল্প মালিকের দ্বারা উৎপাদন উদ্যোগে দাসদের নিয়োগ তত বেশি হয় নাই। তাহার পূর্বেই গ্রীক সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্ব দেখা দেয়—মালিক ও অভিজাতবর্গও বণিকদের দমনার্থে যথারীতি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র হইতে রাজাকে অপসারিত করিয়া অভিজাত শ্রেণী রাজ্যভার গ্রহণ করে। তখন একদিকে অভিজাতবর্গ, অন্যদিকে ডিমোস্ বা জনসাধারণ—এই দুইশ্রেণীর সংগ্রামের শেষে এথেন্সে জনসাধারণ জয়ী হইল, তাহারা ডিমোক্রাসি বা সাধারণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। আর স্পার্টায় জয়ী হইল যোদ্ধৃবর্গ—তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিল একরূপ ক্ষাত্র-শাসন। ক্রমে প্রগতিশীল এথেন্স ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌবলে প্রবল হয়। তাহার বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য সমস্ত ঈজিয়ান উপকূলে ছড়াইয়া পড়ে। প্রতিক্রিয়াশীল স্পার্টা-ও অস্ত্রশক্তিতে পেলোপোনিসিয়া অঞ্চলের সকলকে পরাজিত করিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। এই দুই নগরীর পরস্পর যুদ্ধের কাহিনী অনেকাংশে বণিকশক্তির আর ক্ষাত্রশক্তির সংঘর্ষ, আর সেকালের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষও বটে। এথেন্সের বণিকরাষ্ট্রের দ্রুত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে বিকাশ ও পতন আবার সাম্রাজ্যবাদের এক শোচনীয় পরিণামের প্রমাণও। এবং যুদ্ধাবসন্ন স্পার্টা ও এথেন্সের অবসান ঘটাইয়া যখন ম্যাকিদনের অর্ধ-গ্রীক রাজা ফিলিপ (আলেকজেন্দারের পিতা) আপন সামরিক শক্তি

লইয়া সমুত্থিত হইলেন তখন গ্রীক বিত্তবানেরা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই স্বস্তি ও প্রতিষ্ঠা খুঁজিল। ইহার অর্থও বুঝিবার মত—শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরে বিত্তবানেরা শেষ পর্যন্ত নিজ রাষ্ট্র ও নিজ জন্মভূমিকে বিদেশীর নিকট সমর্পণ করিতে দ্বিধা করে না—তা সেই বিদেশী বিত্তবান্ বণিকই হউক, কিংবা অভিজাত ক্ষত্রিয়ই হউক—কিংবা হউক ফ্যাশিস্তদের কালে ফ্রান্সের 'দুইশত পরিবার', ব্রিটেনের ক্লাইভডেন্ চক্র আর ইংরাজের আমলে ভারতের ধনিক ও জমিদার। অবশ্য ম্যাকিদনের প্রতাপে গ্রীকমণ্ডলে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তারপর আলেকজেন্দারের দিগ্বিজয়ে গ্রীকেরা নতুন শক্তির ও সম্পদের আস্বাদন লাভ করে। এই দিগ্বিজয়ের ফলে গ্রীক সমাজেরও কম পরিবর্তন ঘটে নাই। গ্রীক ইতিহাসে আর এক নতুন পর্বের প্রারম্ভ হয়ঃ ইহার নাম হেলেনিস্টিক পর্ব। তাহার তিনটি প্রধান কেন্দ্র ঃ মিশরে টলেমি বংশীয় গ্রীক রাজারা রাজত্ব করিতে থাকেন; পশ্চিম এশিয়ায় সেলিউকাস-বংশীয় গ্রীক রাজারা রাজত্ব চালান (অবশ্য আফগানিস্থানে ও ভারতবর্ষে গ্রীক 'যবন' রাজারাও ছিলেন); আর মিশরে পশ্চিম এশিয়ায় গ্রীক রাজারা কতকাংশে পুরাতন 'এশিয়াটিক সমাজের' ঐতিহ্য গ্রীক নামের আড়ালে মানিয়া লইয়া চলেন। ম্যাকিদনকে কেন্দ্র করিয়া কিন্তু গ্রীক দেশ বহন করিয়া চলে তাহার দাসপ্রথায় পরিচালিত সমাজ-যাত্রা। খ্রীঃ পূঃ ২০০-১৫৫ এর দিকে রোমের হাতে উহা তুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত ইহাই ছিল গ্রীক সমাজের মূল রূপ—দাসপ্রথার উৎপাদন।

কী সেই রূপ? এথেন্সে স্পার্টায় মতই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটুক, চমকপ্রদ নানা রাজনৈতিক বিন্যাস (ডিমোক্র্যাসি, ওলিগার্কি বা মনার্কি) ও তাহার নীতি ও সূত্রের যত উদ্ভাবনা হউক—গ্রীকরা যখন শৈশব উত্তীর্ণ হইল তখন হইতে দাসপ্রথাই হয় তাহাদের প্রধান অবলম্বন। গৃহকর্মে তো নিশ্চয়ই, পশুচারণায়ও বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া কারখানায়, খনিতে, পরিশ্রমের সর্বক্ষেত্রে দাসেরাই হইয়া উঠে গ্রীক মালিকের, বণিকের, গ্রীক 'নাগরিকের' আর্থিক জীবনের নির্ভর। এথেন্সের সৌভাগ্যের দিনে দেখা গেল তাহার প্রয়োজনীয় শস্যের বারো আনি আসে বাণিজ্য-সূত্রে বিদেশ হইতে। তাহার মদ্য, জলপাই তৈল, মৃৎপাত্র, ধাতব দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে সেই চালানী ব্যবসায়ের রপ্তানী পণ্য হিসাবে। এমন কারখানাও গড়িয়া উঠিতেছে যেখানে এক শতের মত ক্রীতদাস কাজ করিত। যেমন দেখি, কেফালসের ঢাল তৈয়ারীর কারখানায় দাস খাটে ১২৫এর উপরে, ডিমোসথেনিসের পিতার খাটের মিস্ত্রিখানা, ও অস্ত্রের কারখানা প্রভৃতিতে ২৫।৩০ করিয়া দাস নিযুক্ত আছে। সমগ্র এথেন্সে এই দাসেরা তখন 'নাগরিকদের' অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশি। কাহারও কাহারও মতে দাস অধিবাসীই বারো আনার বেশি। তাহা হইলে এথেন্সের 'ডিমোক্রাসির' অর্থ ছিল কি? শাসনে ও সাধারণ কাজে অধিকারী ছিল একমাত্র সেই সংখ্যাল্প 'পৌরজন' বা নাগরিকেরা, দাসদের কোনো অধিকার নাই। স্বাধীন বৃত্তিধারী মানুষ অবশ্য এথেন্সে যথেষ্ট ছিল। আবার দাসদেরও রাজ্যের ছোট ছোট কার্যে নিয়োগের প্রমাণ আছে। দাসেরা 'মুক্তি'ও লাভ করিত; শিল্প ও শিক্ষারও আস্বাদ দাসেরা কেহ কেহ লাভ করিতে পারিত। কিন্তু এই কথা ভুলিবার নয়—সেই 'গণতান্ত্রিক পুররাষ্ট্রে' সংখ্যাগুরু দাসদের অধিকার নাই, সমাজে তাহাদের কোনো দাবী নাই; গ্রীক সংস্কৃতির ও সভ্যতার তাহারা ভারবাহী মাত্র ছিল।

গ্রীক সংস্কৃতির সামান্য কিছু পরিচয় না জানিলে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার অনেক সূত্রই অবশ্য অচেনা থাকিয়া যায়। কিন্তু এখানে তাহার সেইরূপ সামান্য পরিচয়-উল্লেখও সম্ভব নয়। সম্ভবত একটি ছোট জাতির পক্ষে এমন কীর্তি ইতিহাসে আর কখনো আয়ত্ত হয় নাই—এবং হইবে না। আজও আমরা গ্রীক সাহিত্য, তাহাদের মহাকাব্য, নাটক, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি অনুবাদ সূত্রে পড়িয়া আনন্দ পাই। স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতিও আমাদের আজ এতটা সমুন্নত জিনিস বলিয়া বোধ হয় না। গ্রীক শিল্পের, মূর্তির, মন্দিরের, মৃৎপাত্রের, চিত্রের অপরূপ সৌন্দর্য সুষমা ও মাত্রাজ্ঞান আমাদের বিমুগ্ধ করে,—সেই তুলনায় আমাদের প্রাচীন শিল্পকলাও আমরা আজ এতটা উপভোগ করিতে পারি না। গ্রীক অলিম্পিক ক্রীড়াকলাতে গ্রীক জীবন-দৃষ্টির যে সুন্দর পরিচয় মিলে তাহাও অতুলনীয়। আমাদের দর্শন লইয়া আমরা গৌরব করি; কিন্তু গ্রীক দর্শন সমস্ত পাশ্চাত্য ও আধুনিক চিন্তা-ভাবনার মূল বনিয়াদ। আর গ্রীক চিন্তার স্বচ্ছতা,

তাহার স্থির বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য অস্বীকার করা যায় না। ডিমোক্রিটাসের বস্তুবাদ, হেরাক্লাইটাসের পরিবর্তনবাদ, সোফিস্টদের জ্ঞান-জিজ্ঞাসা, এরিস্টটল-প্লেটোর ভাববাদ আজ পৃথিবীর সম্পদ। এরিস্টটলই মানুষের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করিয়া যান—জগৎ ও জীবনকে দেখিবার, জানিবার, বুঝিবার ঠিক এমন ব্যাপক ও বাস্তব প্রয়াস তাহার পূর্বে আমরা আর কোথাও পাই না—সম্ভবত চীনেও না। পৃথিবীর প্রাচীন জাতিদের ইতিহাসবোধ প্রায়ই অস্বচ্ছ। ভারতবর্ষে তো উহা দুর্লভ ও দুর্নিরীক্ষ্য। কিন্তু গ্রীকেরা প্রকৃত ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেন—চীনারাও তাহা করিয়াছেন। আইওনিয়ার (যবন) পণ্ডিতেরা প্রাকৃতিক সত্য লইয়া যে পরীক্ষা ও গবেষণা করেন তাহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্মেষ সূচিত হয়—প্রাচীন বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের দিক হইতে তাঁহাদের কীর্তি অসামান্য। পরবর্তী হেলেনিস্টিক যুগে আলেকজেন্দ্রিয়ায় জ্যামিতির গোড়াপত্তন হয়, পূর্তবিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সূচনা হয়, ভূগোলের জ্ঞান প্রসারিত হইতে থাকে। গ্রীসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটে। হয়ত ভারতে আয়ুর্বেদের ততোধিক উন্নতিও ঘটিয়াছিল। কিন্তু যে সহজ মানবীয় দৃষ্টিতে—মানব-জীবনের প্রতি মমতা ও মানুষের মহত্ত্ববোধের দ্বারা—গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়, সেই মানবতাবোধ আর কোন্ চিকিৎসক-সমাজের সহজ ধর্ম ছিল? সমস্ত গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে জীবন-ধর্মের ও মানবতাবাদের, অধ্যাত্ম ভাবনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের একটা সমন্বিত প্রকাশের, এবং সুষমাবোধ ও অপ্রমত্ত মাত্রাজ্ঞানের যে পরিচয় রহিয়াছে তাহার তুলনা আর কোনো সংস্কৃতিতে—সমাজতন্ত্রের যুগে না পৌঁছিতে—এতদিনেও আর বিশেষ মিলে নাই।

গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে যে আধুনিক মনোবৃত্তির আভাস পাই তাহার একটা কারণ সম্ভবত এই—তাহাদের ক্ষুদ্রতর পরিবেশে ও স্বল্পকালের মধ্যে গ্রীক-সমাজ সেই প্রাচীনকালে কতকাংশে আধুনিক সভ্য-সমাজের অনুরূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। গ্রীক বণিকদের বাণিজ্যসূত্রে, সমুদ্রযাত্রায়, কারবার কারখানার বিস্তারে গ্রীকদের মনের প্রসার ঘটিতেছিল। অন্যান্য অভিজাত সভ্যদেশে কৃষক লইয়া গঠিত সমাজ সাধারণত হইত স্থিতিশীল; এমন নানামুখী চেতনা সেরূপ সমাজে তাই দেখা যায় নাই। অন্যদিকে আধুনিক সমাজের মতই শ্রেণীভেদও গ্রীক সমাজে পরিস্ফুট। গ্রীক অভিজাতরা গর্বিত, গ্রীক সমাজে নারীর স্থান নিম্নে, আর দাসেরা মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়, ইহাও লক্ষণীয়। এরিস্টটলের মত যুক্তিবাদী মনস্বীরও মতে দাসপ্রথা প্রকৃতির বিধান; প্লেটোর মত অভিজাত আদর্শবাদী প্রায় ব্রাহ্মণ্যধর্মী শ্রেণী-বিভেদ পাকা করিয়া সেকালের স্থায়ী 'নেতৃরাষ্ট্র' গঠন করিতে চান, তাঁহার চক্ষে দৈহিক পরিশ্রম ও উৎপাদন একটা তুচ্ছ লজ্জাজনক কাজ। দাসপ্রথার প্রভাবেই এইরূপ ধারণা গ্রীকমনে বদ্ধমূল হয়। দাসপ্রথারই ফলে বাস্তব কাজকর্মের মধ্য দিয়া জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন গ্রীকদের ছিল না; বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রয়োগেও তাহাদের তাগিদ নাই;—দাসরূপ মনুষ্যযন্ত্রই তো কাজ করিতেছে। তাই গ্রীক বিজ্ঞানের পথ অনেক দিকে অবরুদ্ধ থাকে এবং দাসপ্রথা ক্রমে গ্রীক সভ্যতার অধোগতি ঘটায় (তুলনীয় ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা)।

রোম

রোমের ইতিহাসও দাসসমাজের ইতিহাস। গ্রীক দেশের মত সংস্কৃতিতে শিল্পে রোমকেরা অত পরাকাষ্ঠা দেখায় নাই। শিল্পকলায় তাহারা গ্রীক সংস্কৃতির দান আত্মসাৎ করিয়া তাহা লইয়াই প্রধানত কারবার করিয়াছে। কারণ রোম-সমাজে বণিক ও স্বাধীন কারিগরের প্রতিষ্ঠা ছিল না; উহা প্রধানত রোম অভিজাত ভূস্বামীদের সমাজ। কিন্তু সাম্রাজ্যজয়ে, শাসন, আইন-কানুন বিধি-বিধানের ধারণায় ও ব্যবস্থায়, এবং পথ-নির্মাণ, পৌর ও সৌধ-স্থাপত্যে রোমকরা বর্তমান পৃথিবীর গুরুস্থানীয়। তবু সে সভ্যতাও দাসপ্রথারই উপর গঠিত, আর রোমেরও পতনের প্রধানতম কারণ এই দাসপ্রথার ভাঙন, ইহার অচল অবস্থা।

খৃীঃ পূঃ ৮ম শতকে রোমের ইতিহাসের আরম্ভ, আর খৃীস্টীয় ২৫০ অব্দের পূর্বেই দেখি রোমের ঐশ্বর্য ফুরাইতে চলিয়াছে। তাহার পরেকার দেড় শত বৎসরে আসল রোম টিউটন জাতিদের ক্রমাগত আক্রমণে তাহাদের অধিকারে চলিয়া গেল। তারপরেও সাম্রাজ্যের পূর্বখণ্ডে বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্য দাসপ্রথা ও এশিয়াটিক সামন্ততন্ত্র মিশাইয়া অনেক কাল টিকিয়া ছিল—তুর্কদের আক্রমণে একেবারে তাহা ভাঙিয়া গেল (খৃীঃ ১৪৫৪)। কিন্তু রোমক সভ্যতার ও সমাজের বৈশিষ্ট্য খৃীস্টীয় ৩য় ৪র্থ শতকেই প্রায় ফুরাইয়া যায়। এই সুদীর্ঘ দিনের (প্রায় ১,২০০ বৎসরের) রোমের ইতিহাসের বহু তথ্যই জানিবার মত। কিন্তু এখানে বুঝিবার মত যাহা তাহা সংক্ষেপে এই ঃ—আদিম সাম্যতন্ত্র ভাঙিয়া রোমেও প্রথম দেখা দেয় প্যাট্রিসিয়ান্ বা অভিজাত শ্রেণী ও প্লিবিয়ান্ বা আশ্রিত শ্রেণী। রাজা অবশ্য প্রথমে সেখানে ছিল, কিন্তু উহাতে জমিজমা খনি প্রভৃতির মালিক প্যাট্রিসিয়ানরা ; অন্য রোমকরা কেহ বা গরিবচাষী, কেহ বা সাধারণ ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী ; কিন্তু অধিকাংশই প্যাট্রিসিয়ানদের অনুগ্রহজীবী, তাহাদের নিকটে ঋণে বাঁধা, তাহাদের লাঙ্গল-বলদ লইয়া চাষবাস করে, মজুর খাটে, প্রভুদের হইয়া কিছু কিছু ব্যবসাও করে। রোমেও রাজতন্ত্র নাকচ করিয়া প্যাট্রিসিয়ানরা রাজভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে। তাহাদের রিপাব্লিকের পরিষদের নাম সেনেট, দুইজন অধ্যক্ষ, তাহাদের পদবী কন্সাল, এক বৎসরের মত সেনেটে তাহারা নির্বাচিত হইত। এই ছিল গোড়ার দিকের রোম। কিন্তু সেই গোড়ার দিকেও প্যাট্রিসিয়ানে-প্লিবিয়ানে শ্রেণীসংঘাত বাধিয়া যায়। একবার সেই বিবাদের শেষে অবস্থাপন্ন প্লিবিয়ান্রা আপস রফা করিয়া বেশ কিছু ক্ষমতার ভাগ পাইয়া স্থির হইয়া বসে, কিন্তু দরিদ্র প্লিবিয়ান্রা তখনো রহিয়া গেল যে তিমিরে সে তিমিরে। এই দরিদ্রদের মধ্যে যাহাদের কোনো সম্পত্তি নাই, বা নিঃস্ব সর্বহারা, তাহাদের নাম হয় প্রোলিটেরিয়ান—'পুত্রদায়িক'। রোমের যুদ্ধে অন্য নাগরিকেরা টাকা-পয়সা, অনুচর প্রভৃতি দিয়া নিজেরা সৈন্য না হইয়া আইনের হাত হইতে রেহাই পাইত ; বিত্তহীনদের সেই সামর্থ্য নাই, তাই যুদ্ধে দিতে হইত নিজ নিজ পুত্রদের। আজ 'প্রোলিটেরিয়ান্' বলিতে অবশ্য বুঝায় 'নিঃস্ব' বা 'নির্বিত্ত' 'সর্বহারা' শ্রমিকশ্রেণী।

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যজয়ে রোম নামিল সম্ভবত সাধারণের অসন্তোষ চাপা দিবার জন্য ; লুণ্ঠনের একটা অংশ রোমের ইতর সাধারণকেও দেওয়া হইত, আর অধিকাংশ যাইত অভিজাতদের গৃহে। কিন্তু লুণ্ঠনের স্বাদ পাইয়া রোমকরা আর থামিতে পারিল না। অস্ত্রশস্ত্র বাড়িল, যুদ্ধবল বাড়িল, মধ্য ও দক্ষিণ ইতালি জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল রোমের রাষ্ট্রশাসন রীতি-পদ্ধতি, আইন-কানুনের বৃদ্ধি, গৃহে আসিল ধনরত্ন, আর দাস-সম্পদ। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই দাসপ্রথারও বহুল প্রচলন হইতে লাগিল।

ইহার পরে রোমের দিগ্বিজয়ের পালা—কার্থেজ ধ্বংস, সিসিলি স্পেনে রাজ্য বিস্তার, গ্রীস বিজয় ; তাহার পরে মিশর ও নিকট-প্রাচ্যের গ্রীক রাজ্যগুলি অধিকার। রোমের অভিজাতদের অগাধ ঐশ্বর্য, সাম্রাজ্য লুণ্ঠন, রাজস্ব আদায়, দাস-সংগ্রহ ও দাস-ব্যবসায়,—এই সবের সহিত দেখি দাসের পরিশ্রমে তো খনির কাজ চলেই, অস্ত্রশস্ত্রের ছোটোখাটো কারখানাও চলে, কেরানির কাজ চলে, এমন কি গ্রীক-শিক্ষারও কাজ চালানো হয় দাস-শিক্ষকের দ্বারা। রোমের বৈশিষ্ট্য যাহা দেখি তাহা এই ঃ—রোমের অভিজাতরা নানা উপায়ে সাম্রাজ্যের মধ্যে বড় বড় জমিদারী গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই সব জমিদারীর নাম 'লাটিফান্ডিয়া'। সময়ে সময়ে এইরূপ এক-একটা জমিদারী যেন ছোটখাট একটা প্রদেশ। এই জমিদারীতেও চাষের কাজ করে দাসগণ, কর্মচারীরা লাঠি ও চাবুক লইয়া দাস চাষীদের তদারক করে।—এই হইল রোম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক গড়ন। এই সমাজের মধ্যে কৃষক রোমান ও শহরের দরিদ্র প্রোলিটেরিয়ানের অসন্তোষ বাড়িতেছে ; মাঝে মাঝে সাম্রাজ্যের উদ্বৃত্ত শস্য বিলাইয়া তাহাদের শান্ত করিতে হইতেছে ; সার্কাস ও মল্লযুদ্ধের 'খেলার' ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের ভুলাইতে হয়। তথাপি বারে বারে দাস-বিদ্রোহ ঘটিতেছে ঃ (তাহার মধ্যে খৃীঃ পূঃ ৭৩ অব্দে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যে দাস-বিদ্রোহ হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা বড়) ; সেনেট ও নির্বাচন অফুরন্ত ঘুষের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে ; প্রোলিটেরিয়ান-ভাড়াটে সৈনিক লইয়া অভিজাত নেতারা পরস্পর ক্ষমতার

ছন্দে মাতিতেছে ; সীজারের সঙ্গে সঙ্গে এক-নায়কত্ব দেখা দিয়াছে, সীজার বংশই প্রায় সম্রাট হইয়া বসিতেছে। প্রদেশে, গ্রামে, এদিকে অসহায় দাস ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে খ্রীস্টধর্মের অধ্যাত্ম আশ্বাস শেষ ভরসা হইয়া উঠিতেছে ; ওদিকে রোমের নাগরিকদের সাম্রাজ্যের ফসল দিয়া ও বৎসরের অর্ধেক-দিন মল্লক্রীড়া দেখাইয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। রাজ্যজয়ের ফলে ক্রমে শিল্পী, কারিগর প্রভৃতি রোম ছাড়িয়া দূর দূর অঞ্চলে গিয়া অধ্যুষিত হইতেছে ; সেখানে নতুন জীবন-কেন্দ্র গড়িতেছে ; মহানগরীর ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাই ক্রমে মন্দা লাগিতেছে। অন্যদিকে বড় বড় জমিদারীগুলি আর শহরের কারিগরের দিকে না চাহিয়া থাকিয়া গ্রামে নিজেদেরই 'ভিলার' বা প্রাসাদের নিকটে তাঁতী, কামার, কুমার, মিস্ত্রী প্রভৃতি আনিয়া বসাইতেছে। ইহার উপর দেখা গেল সাম্রাজ্য হইতে দাস সংগ্রহও আর সুলভ নয় ; শস্য রপ্তানীর অভাবে খাওয়া-পরা জোগাইয়া দাস দিয়া চাষে লাভ টিকে না। জমিদারীর চাষবাসের কাজে তাই কৃষি-মজুর, ভাগ-চাষী, খাজনা-করা-প্রজা প্রভৃতির পত্তন বাড়িতে লাগিল :— তাহা হইলে সেই 'এশিয়াটিক সমাজের' দিকেই কি পশ্চিমের রোমসমাজ চলিয়াছে? অনেকটা তাহাই। কারণ, পূর্বেকার দাসপ্রথার স্থলে ক্রমে জমিদারী ভূমিদাস বা সার্ফ প্রথার প্রচলন আরম্ভ হইতেছে, ইউরোপের মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের আয়োজন এইরূপে চলিতেছে। শেষের শত দেড়েক বৎসরে (খ্রীঃ ২৫০—৪০০) একবার সম্রাটরা রোম সাম্রাজ্যের এই ঠাট বজায় রাখিবার জন্য সমস্ত শক্তি রাষ্ট্রে কেন্দ্রিত করিতে চাহিলেন, প্রজাসাধারণের সমস্ত অধিকার কাড়িয়া লইতে লাগিলেন ; খ্রীস্টীয় ধর্মও তাঁহাদিগকে যথানিয়মে 'প্রভু ও দেবতা' আখ্যা দিল,—রোম সাম্রাজ্য অনেকাংশে এক 'টোটেলিটেরিয়ান স্টেট' বা "সার্বিক রাষ্ট্রে" পরিণত হইল। কিন্তু তাই বলিয়া রোম সমাজ ও সাম্রাজ্য বাঁচিল না। অর্ধবর্বর জার্মান উপজাতিদের আক্রমণে সেই সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গেল ; অবশ্য ইউরোপের ইতিহাসেও তাহাতে কিছুকালের জন্য অন্ধকার নামিল।

ফিউডাল বা সামন্তযুগ

রোমের পতনের পরে পাশ্চাত্য জগতে অন্ধকার যখন চাপিয়া বসিয়াছে তখন একটু একটু করিয়া ইউরোপে গড়িয়া উঠে যে সমাজ তাহাকে 'ফিউডাল সামন্ত সমাজ' বলে। জার্মান জাতির বিজেতা অসভ্যরা ততদিনে আদিম সাম্যতন্ত্র ও শিকারী জীবনতো ছাড়িয়াছেই, খ্রীস্টান হইয়া এবং রোমের শেষ দিককার রাষ্ট্রনিয়ম-পদ্ধতি কতকাংশে গ্রহণ করিয়া এই জাতিরা রীতিমত রাজা, প্রধান ও সাধারণ লোক লইয়া নিজেদের রাজ্য গড়িয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের ছোট ছোট রাজ্য লইয়া ক্রমে হইল সাম্রাজ্য। নিজেদের সাম্রাজ্যের তাহারা 'রোম সাম্রাজ্য' বলিয়া পরিচয় দিতেও উৎসুক। ফ্রাংকদের রাজা শার্লমেন সেইরূপ চেষ্টা করেন। পরে জার্মান গোষ্ঠীর অটোও এ পরিচয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ফিউডাল সমাজের মূল রূপটা কী? দুইটি শ্রেণীতে ফিউডাল সমাজ বিভক্ত—উপরে জমিদার স্বরূপ সামন্তরা আর নিচে সাধারণ সার্ফ বা ভূমিদাস কৃষক। কিন্তু সার্ফেরা ঠিক দাস নয়। তাহারা জমিতে বাঁধা, প্রভুর গ্রাম ও জমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে না। তাই তাহাদের বাঙলায় নাম 'ভূমিদাস'। ছোট এক-আধ খণ্ড জমি তাহাদের কখনো কখনো নিজেদের থাকিত, তাহারা উহা চাষ-বাস করিত ; প্রভুর প্রাপ্য ভাগও দিত, রাজা. খাজনাও দিত, নানা আবওয়াবও মিটাইত, নজরানা দিত, নতুন জমির সেলামি দিত। কিন্তু বছরের প্রায় অর্ধেক দিন প্রভুর নির্দেশ মত জমিদারের জমিতে সার্ফদের বেগার খাটিতে হইত, মুনিব বাড়িতে কাজকর্ম করিতে হইত, ফরমায়েস মত অন্য কাজও করিত। ইহা ছাড়া অবশ্য চর্চ বা ধর্মমণ্ডলী ও পুরোহিতের দাবীরও অন্ত ছিল না। তাহাও মিটাইতে হইত। তদুপরি, জঙ্গলের কাঠ আহরণ, পশুপাখি শিকার, খালে-নদীতে-পুকুরে মাছ ধরারও খাজনা না দিলে চাষীদের অনেক সময়ে অধিকার ছিল না। রাস্তার মোড়ে, সাঁকোর মোড়েও কর দিতে হইত। উপরের জমিদারই ছিলেন সার্ফের শাসক,—রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূমিদাসের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কম,—জমিদার কাছারিতে তাহার বিচার হইত, জরিমানা হইত, কয়েদ হইত জমিদারের

'ঠাণ্ডা গারদে।' জমিদার ছিলেন নিজের এলাকায় গ্রামের প্রভু। এই এলাকার নাম 'ম্যানর'। জমিদারের খাস দখলে নিজের খানিকটা জমি থাকিত, বাকিটায় সার্ফদের পত্তন হইত। ফিউডাল রাষ্ট্রও এইরূপ জমিদারদেরই সৃষ্টি। ছোট জমিদারের উপর বড় জমিদার, তাহার উপর আরও বড় জমিদার, সকলের উপরকার জমিদারই রাজা—ফিউডাল সমাজে এইরূপ শাসক শ্রেণীর মধ্যে এই স্তরভেদ একটা বড় লক্ষণ। রাজা সামন্তদের সাহায্যে রাজকার্য চালাইবেন, তাহারাই সৈন্য জোগাইবে। রাজা দুর্বল হইলে তাই সামন্তরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়াইয়া লইত, প্রবল সামন্ত নিজে রাজা হইয়াও বসিতে চাহিত। তাহা না হইলেও সামন্তদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের শেষ ছিল না—ইহাও ফিউডাল সমাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। আর এইসব দ্বন্দ্ব লইয়াই সেই সমাজের চারণদের গান, নাইটদের স্তুতিকথা। কিন্তু ফিউডাল সমাজের আরেক প্রধান বৈশিষ্ট্য গির্জার প্রভাব। রোমের প্রধান পুরোহিত, 'পোপ' বা ধর্মাধিপতি, যেন পুরানো রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট্, তাঁহার নিচে বিশপরা, তাহাদের নিচে নানা পর্যায়ের পাদ্রী পুরোহিত প্রভৃতি। এই চর্চ ছিল সবচেয়ে বড় জমিদার—ভারতবর্ষের মোহান্তদের মত। তাহাদের ক্ষমতার অন্ত ছিল না। দেশের রাজার সঙ্গে দেশস্থ চর্চেরও বিবাদ বাধিত, পোপের সঙ্গে বিবাদ বাধিত সম্রাট্দের—ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস অনেকটা এই বিবাদের কথা। আবার, এই চর্চই ছিল সে দিনের সংস্কৃতির কেন্দ্র।

খ্রীঃ ১০ম হইতে ১৪শ শতকের মধ্যে ফিউডাল সমাজের এই বিশেষ রূপ পশ্চিম ইউরোপে ফুটিয়া উঠে; তারপর তাহা সেখানে বিলুপ্ত হইতে থাকে—তবে পূর্ব ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলে উহা আরও অনেকদিন টিকিয়া ছিল।

ফিউডাল সমাজ তাই প্রধানত গ্রাম্য সমাজ, চাষী ও কারিগরের সমাজ। ইহা এশিয়াটিক সামন্ত সমাজের বা গ্রীক ও রোমান সমাজের সেই পৌরসভ্যতা নয়। ছোট খাটো শহর অবশ্য ছিল,—তীর্থক্ষেত্র, রাজার রাজধানী, ব্যবসায়ের কেন্দ্র থাকিবেই। কিন্তু ক্রমে হাটবাজার মেলা অবলম্বন করিয়া নতুন শহর বা 'বুর্গ' বসিতে লাগিল। পুরানো শহরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ব্যবসাপত্র ঐসব স্থানে বাড়িতে থাকে, কারিগরদেরও তাহাতে পশার বাড়ে। পূর্বে এইসব কারিগর শিল্পীদের কাজের উপর প্রধান দাবী ছিল তাহাদের জমিদারদের। নিজ নিজ জমিদারের এলাকাতেই উহাদের কেনা-বেচাও হইত, উহাতে জমিদাররা ভাগ বসাইত—শহরের উপরও এইরূপ জমিদার-প্রভুর শোষণ ছিল। কিন্তু ব্যবসাপত্র বাড়িতেই এই কারিগর ব্যবসায়ীদের মধ্যে জমিদারের গণ্ডী ও শোষণের সীমা ছাড়াইবার তাগিদ আসিল। তাহারা "গিল্ডে" সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের শহরে কতকটা ব্যবসাবাণিজ্যের স্বাধীনতা অর্জনও করিয়া বসিল। জার্মান 'হান্সিয়াটিক লীগে'র নাম এইজন্য প্রসিদ্ধ। ক্রুসেড প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়া ইতালিতে ভেনিস্ প্রভৃতি শহরে বেণে-রাজারাও জাঁকিয়া বসিল;—কিন্তু তখন সামন্ততন্ত্রের শেষ দিন আসিতেছে। এই শহুরে কারিগর কারবারীরা, শহুরে ও ব্যবসায়ী,—ইহারা 'বুর্গে'র' আসল অধিবাসী বলিয়াই ইহাদের নাম 'বুর্জোয়া', উহার অর্থ 'ব্যবসায়ী'। বলা বাহুল্য, কালক্রমে ব্যবসায়ী বণিকেরাই কারিগর রাখিয়া কারখানা গড়িবে, পুঁজিপতি হিসাবে তাহারাই হইবে শিল্পপতি এবং পত্তন করিবে পুঁজিতন্ত্রের যুগ বা বুর্জোয়া যুগ। কিন্তু মধ্যযুগে শহরে বণিক কারিগরদের আত্মরক্ষার বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল নিজ গিল্ড বা 'সংঘ'—তন্তুবায়, কর্মকার, স্বর্ণকার, শকটকার প্রভৃতি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গিল্ড বা 'সংঘ' ছিল—অনেকটা আমাদের বৃত্তিজীবীর পঞ্চায়েতের মত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে এইরূপ গিল্ডেরই নাম ছিল 'শ্রেণী'। এই গিল্ডগুলি প্রভুদের শোষণের বিরুদ্ধে কারিগরদের শক্তিকেন্দ্র। ইহারা নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা কমাইয়া দাম বাঁধিয়া দিত, লাভের পরিমাণ ঠিক রাখিত। সাধারণতঃ ওস্তাদ কারিগর গিল্ড চালাইত, সাকরেদদের শিক্ষানবিসীর ব্যবস্থা করিত। কিন্তু ক্রমে এই ওস্তাদরাই গিল্ডের জোটের জোরে সাকরেদদেরও শোষক হইয়া উঠিল—তাহাও দেখা গেল। তবু গিল্ড মধ্যযুগের কারিগরদের পক্ষে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বড় শক্তিকেন্দ্র—এ-কালে মজুরদের ট্রেড ইউনিয়নের মত,—ইহা উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য প্রচুর। তাই এই সামন্ত স্তরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি যাহা, এদেশে আমরা প্রধানত তাহাই পাইয়াছি ভারতীয় সংস্কৃতিরূপে। আর এই দাক্ষিণ্যের জন্য এ-স্তরও এই

দেশে স্থায়ী হইয়াছে দীর্ঘদিন। উৎপাদনশক্তি এখানে বাধা না পাইয়া স্থির রহিয়াছে—একেবারে পাশ্চাত্য বণিক আসিয়া ও বিদেশী পণ্য আসিয়া উহার ওলট-পালট না করিয়া দেওয়া পর্যন্ত। কিন্তু ইউরোপের কঠিন বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া সেইখানকার লোকদের নতুন উৎপাদন-শক্তির সৃষ্টি অহরহ করিতে হয়। তাই এক-একটা প্রথাও তাহারা তাড়াতাড়ি সেইখানে ছাড়াইয়া যায়। সামন্ত যুগ ও সেই উৎপাদন সেই মহাদেশে শেষ হইতে লাগিল চতুর্দশ শতকেই। আসিল বণিকের যুগ।

বণিকতন্ত্র

আমেরিকা আবিষ্কারের পর পেরুর লুঠ-করা সোনায় ইউরোপের বৈশ্যদের ঘর বোঝাই হইল, বাজার ফাঁপিয়া উঠিল। তখন নতুন নতুন শিল্প দেখা দিতেছে। সেই বৈশ্য-স্বভাব বণিক ও শহুরে মধ্যস্বত্বভোগীর দল তখন আর সামন্তপ্রভুদের মানিতে চায় না; বণিকেরাই ছিল এতদিন সামন্ত ভৌমিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত শ্রেণী। একটু অবস্থা ফিরিতেই তাহারা চাহিল রাষ্ট্রে স্বাধিকার ও সমাজে মুক্তি। নতুন ব্যবসাপত্র ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সমাজ হইতে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ দরকার হইয়া পড়িল;—নতুন উৎপাদন শক্তি, অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য, পুরাতন উৎপাদন-সম্পর্ককে অর্থাৎ সামন্ত ও গোলামের সম্পর্ককে, ভাঙিয়া দিতে লাগিল। ইহারই ফলে ইংলণ্ডে হয় ক্রমোয়েলের সময় হইতে চল্লিশ বৎসরের বিপ্লব (১৬৮৮); উহার পূর্ণ একশত বৎসর পরে ফ্রান্সে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব হইল (১৭৮৯)। সামন্তযুগের অবসান করিয়া আসিল ঐই বণিক-তন্ত্র ও বণিক-পুঁজিদারের যুগ। তাহারই পরিণতি হইল বুর্জোয়া ধনিকদের যুগ—শিল্পপতির পুঁজিতন্ত্র বা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম-এর প্রসার। কিন্তু শিল্পপতিরাও পরশ্রমভোগী. শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্য সস্তায় লইয়া মুনাফা করে, শ্রমিককে তাহার শ্রমমূল্য আসলে ফাঁকি দেয়। বুঝা দরকার, মুনাফা জিনিসটা শ্রমিকেরই উদ্বৃত্ত শ্রম—শ্রমিকের যে পরিশ্রমের জন্য শ্রমিক মজুরী পায় না, তাহারই নাম মুনাফা। এই মূল কথাটা এই সম্পর্কে বারবার মনে রাখা দরকার। মুনাফার উপরই বুর্জোয়ার ঐশ্বর্য গড়া, বাণিজ্য গড়া, তাহার পুঁজি গড়া—আর গড়া এই বুর্জোয়া সভ্যতা। এই মুনাফার লোভই হইল তাহার সমস্ত প্রয়াসের মূলকথা। তাহার দান-খয়রাতি, আইনকানুন হইতে ধর্মকর্ম, কালচার—মুনাফার প্রসাদে; এবং প্রত্যক্ষে পরোক্ষে মুনাফার উদ্দেশ্যে। সেই মুনাফার লোভে সে বাণিজ্যের নামে সাম্রাজ্য আয়ত্ত করে; মুনাফার লোভে বিজিতদের শিল্প নষ্ট করিয়া নিজের মাল চালায়; একচ্ছত্র মুনাফা ভোগের আশায় সে সেখানে একচেটিয়া বাজার দখল করিয়া লয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উদ্ভব ও বিস্তারের ইতিহাসও ইহাই এই মুনাফার শিকার।

পুঁজিতন্ত্রের যুগ

ব্রিটিশ বুর্জোয়া বণিকের সেই লুঠ-করা ঐশ্বর্যের দ্বারাই ব্রিটিশ শিল্প-বিপ্লবের প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ হয়; তাহাতেই আবার পৃথিবীতে শিল্প যুগের গোড়াপত্তন হইল। কারণ, বিজ্ঞানের ক্রম-প্রসারিত জ্ঞান তখন কতকগুলি নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে। কলে জিনিস তৈরি করা যায় অনেক বেশি, অনেক তাড়াতাড়ি মানুষের অপেক্ষা কলে কম খরচে বেশি মাল উৎপাদন হয়, এই কথা দাসপ্রথায় গ্রীস-রোম বা সামন্ততন্ত্রী ভারতবর্ষ-চীনও বুঝে নাই, বুঝিল এই ইংরেজ বুর্জোয়া বণিকেরা। তাই নতুন কলকারখানা বসিতে লাগিল। ব্রিটেনের এই কারখানা বিস্তারের পুঁজিটা আসিয়াছিল প্রধানত ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য হইতে। বিদেশী বণিকই রাজা; আমাদের দেশের পুরানো হাতের কাজ বিলাতের কলের সম্মুখে তখন আরও টিকিতে পারিল না। দেশীয় শিল্পীরা

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়া গিয়া হয় চাষী হইতে চাহিল, নয় কলের মজুর হইতে লাগিল। যন্ত্রের মালিক কলওয়ালার কাছে মজুর খাটিতে গেলে মজুরদের নিজেদের উদরপূর্তির জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বাঁধা দিতে হয়। ইহাই পুঁজিতন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র (capitalism)। এই প্রথায় যন্ত্র রহে মালিকের হাতে, তাহা মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; যন্ত্রজাত দ্রব্য তৈয়ারী হয় কারখানার মজুরের সমষ্টিগত পরিশ্রমে (socialized labour)। উৎপন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য যাহা সর্বাংশেই তাহা মজুরের পরিশ্রমের সমতুল্য; কিন্তু মজুর পায় সেই মূল্য হইতে শুধু নিজের বাঁচিবার মতো অংশটুকু মজুরিরূপে, বাকিটা গ্রহণ করে কলের মালিক মুনাফারূপে; এই মুনাফাটা আসলে তাই উদ্বৃত্ত শ্রমমূল্য (surplus value)। তাই মুনাফার অর্থ হইল মজুরের মেহনতের সেই মজুরি ভাগ যাহা মজুরকে না দিয়া মালিক আত্মসাৎ করে। উহা 'উদ্বৃত্ত', কারণ মোট উৎপাদন-ব্যয়ের পরে উহাই থাকে উদ্বৃত্ত। এদিকে যত কল বাড়ে, যত বেশি সংখ্যায় মজুর খাটে, যত বেশি সময় মজুর কাজ দেয়—ততই এই মুনাফা ফাঁপিয়া উঠে। তাহাতে কলওয়ালার পুঁজি আরও বাড়ে; আবার সেই পুঁজিতেই বসে নতুন নতুন কল, নতুন নতুন কারখানা। এই কারণেই নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের তাগিদ পড়ে; কারণ ভালো যন্ত্র হইলে আরও বেশি পণ্য উৎপন্ন হইবে, আরও মুনাফা বাড়িবে। যতক্ষণ ক্রেতার সামর্থ্য থাকে ততক্ষণ এইরূপ চলে। এই নিয়মে দেড়শত বছরে আজ ইতিহাসে যন্ত্রযুগের বিবর্তনে অতিকায় কারখানার পর্ব দেখা দিয়াছে—যন্ত্রই যেখানে প্রধান, মজুরও সংখ্যায় সেখানে স্বল্প প্রয়োজন। যুগ হিসাবে আজ সভ্যতার ইতিহাসে দেখা দিয়াছে কৃষিযুগের শেষে এই শিল্পযুগ। বুঝিতে হইবে—যন্ত্রবলের প্রসারে এখন আবার উৎপাদনশক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এই মুনাফাদারীর হাত হইতে মুক্তি—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সমাজ ও সভ্যতা রূপান্তরিত হইতে চাহিতেছে, তাহা লক্ষণীয়।

কিন্তু তাহার পূর্বে লক্ষণীয় এই পুঁজিদারের যুগের বিশেষ লক্ষণগুলি কী কী? সভ্যতার ইতিহাসে কী ইহার প্রধান দান?

(১) জাতীয়তাবাদ—যাহা এই যুগেই প্রকট হয়। এই জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম্ আবার বাণিজ্য প্রসারের দায়ে পররাজ্যগ্রাসী হয় (predatory), অধীন জাতির 'জাতীয়তা বোধে'ও বাধা দেয়। যেমন, ওলন্দাজরা চাপা দিতে চাহিয়াছে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তা বোধ, ইংরেজ চাহিয়াছে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে চাপা দিতে।

(২) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—একটু একটু করিয়া সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা বহুদিকে আয়ত্ত হইয়াছে। কারণ প্রথম দিকে পুঁজিদারের দরকার ছিল মজুরের। নবজাত বুর্জোয়া তখন বলিল, প্রত্যেকেই নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করিবার অধিকারী হউক—কেহ কাহারও ক্রীতদাস বা ভূমিদাস বা গোলাম যেন না থাকে। কারণ মধ্যযুগে সামন্ত ভৌমিকের দাস ছিল শিল্পী ও কৃষকেরা; তাহারা চাকরানা ভোগ করে, তাই জমিদারের অনুমতি না পাইলে অন্যের কলে তাহারা কাজ করিতে পারিত না। সামন্ত যুগের ভূমিদাসদের এইরূপ 'স্বাধীন' মজুরে পরিণত না করিতে পারিলে পুঁজিদার তখন কলের মজুরই পাইত না। তাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী হইল পুঁজিদারেরা—মানুষ যেখানে খুশি বাস করিবে, যেভাবে পারে জীবিকা অর্জন করিবে, এই স্বাধীনতা না থাকিলে সে মানুষ কিসে? এই কথা গ্রাহ্য হইলে এই নীতি অনুযায়ী নিজের সম্পত্তিতেও প্রত্যেকেই অখণ্ড অধিকারী বলিয়া (private property) স্বীকৃত হইয়াছিল। পুঁজিদারের নিজেরও কাম্য ব্যক্তিগত মুনাফা, কাজেই private profit-এর পক্ষেও এইরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতিই গ্রাহ্য।

(৩) ডিমোক্র্যাসি বা গণতন্ত্র—'মানুষের অধিকারের' (Rights of Man) দাবী লইয়া সামন্তদের ও যাজকদের পুরুষানুক্রমিক privileges বণিক-ধনিকেরা উচ্ছেদ করেন, সেই বণিকরা ক্রমে রাষ্ট্রযন্ত্র চালনায় নিজেরা প্রধান পদ গ্রহণ করেন। এই রাষ্ট্রক্ষমতা তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন জনগণের সাহায্য লইয়া। তাই তাঁহারা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল রাষ্ট্র পত্তন করেন; ইহাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বুর্জোয়াদের এই গণতন্ত্রের অর্থ—রাষ্ট্রের চোখে সবাই সমান। উহার অর্থ কিন্তু ইহা নয় যে, আর্থিক বৈষম্যও বিদূরিত হইবে। বরং ব্যক্তিগত মুনাফা সর্ব-স্বীকৃত

ইওরোয় সম্পত্তি ব্যক্তিগত থাকিল ; তাহাতে মুনিবে মজুরে ধনের বৈষম্য কার্যত আরও পাকা হইয়া পড়িল। ধনিক শ্রেণীর ভাগ্যবানেরা জন্ম হইতে টাকাকড়ি, শ্রেণী ও পরিবেশের বলে যে সুবিধা পায় তাহা বিত্তহীন শ্রেণীর লোকেরা শত চেষ্টায়ও পাইবে না। দরিদ্রশ্রেণী, বঞ্চিতশ্রেণী তাই এই বুর্জোয়া গণতন্ত্র সত্ত্বেও না পায় খাইতে, না পায় পরিতে, না পারে লেখাপড়া শিখিতে, না পায় রাজ্যচালনায় নিজেদের অধিকার আদায় করিতে। 'রাজনীতিক গণতন্ত্র' থাকিলেও 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র' নাই। ধনিকের চালিত গণতন্ত্রের ভিতরের অবস্থা এইরূপ। যতক্ষণ ধনিকতন্ত্র আছে ততক্ষণ সত্যকার গণতন্ত্র তাই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

তবু এই পুঁজিদারের যুগ পূর্বযুগের তুলনায় অনেক উন্নত, তাহা তাহাদের এইসব দান হইতে প্রমাণিত হয়। এইসব নীতি অবশ্য নিজের প্রয়োজনেই পুঁজিদার গ্রহণ করিয়াছে, পরোপকারের ইচ্ছায় নয়। তবু তাহাতে মানুষের অধিকার কিছুটা প্রসারিত হইয়াছে, সভ্যতা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু শ্রেণীর স্বার্থে এইসব সৎনীতিকে আজ আবার পুঁজিতন্ত্র খর্ব করিতেও বাধ্য হইতেছে, এমনই ক্ষীয়মাণ পুঁজিতন্ত্রের নিয়ম।

সাম্রাজ্যবাদের সংকট

কারণ পুঁজিতন্ত্র তাহার শেষ পর্যায়ে আসিয়াছে সাম্রাজ্যবাদে। ইহার রূপ আমাদের পরিচিত ; —মুনাফার লোভে পরের দেশ পুঁজিতন্ত্র প্রথম জয় করিল। তারপর সেই দেশের শিল্প ধনিকেরা বিনষ্ট করিল নিজেদের দেশের মাল চালাইতে। বিজিত দেশের শিল্পীরা তখন বৃত্তি হারাইয়া হইল চাষী ; বাড়াইল সেই হতভাগ্য দেশের চাষীর সংখ্যা। আবার সাম্রাজ্যের শাসন ও শোষণের সুবিধার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী সেই অধীন দেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া তৈয়ারী করিল তাহার তল্পিদার এক শ্রেণী—রাজা, জমিদার, তালুকদার, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, আর শেষে—কেরানি। অথচ বিজিত দেশে প্রথম দিকে বিজেতা ধনিকতন্ত্র কলকারখানা গড়িতেও দিল না।—পাছে নিজের দেশের পণ্য-জাতের সঙ্গে ঐ সব অধীন দেশের কলের মাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই ভয়ে। সেখানকার তেল, কয়লা, পাট, তুলা প্রভৃতি মাল নিজে একচেটিয়া করিয়া লইল। সেই সব দিয়া নিজের দেশের কারখানায় কাপড় বুনিয়া শাসক দেশের ধনিকেরা সেই পরাজিত দেশেই চালায় একচেটিয়া ব্যবসায়। ইহাকেই বলে ঔপনিবেশিক (colonial) ব্যবস্থা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বড় কারখানারও দিন আসিল। তখন ক্রমে নিজের দেশের ব্যাংক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানি প্রভৃতি হইয়া পড়িল এই সব ব্যবসায়ের মালিক। এই অবস্থাটাতেই লগ্নী পুঁজি (Finance Capital) হয় শিল্পের মালিক। শোষণের নেশা বাড়িয়া গেল, অথচ শোষিতদের রক্তাল্পতা দেখা দিতেছে। পরাধীন দেশের নিজের হাতে শিল্প নাই, আছে শুধু চাষ-আবাদ ; সেই চাষের উপর সবাই নির্ভর করে—রাজা-রাজড়া, জমিদার ও তালুকদার, মহাজন তো আছেই, সরকারের সমস্ত পাওনাও আছে, বড় মাহিনার কর্মচারী আছে, বিলাতী পেনশন, ভাতা প্রভৃতিও আছে,—ইহাদের সকলকার এই [illegible] বোঝা পড়িল গিয়া দেশের উৎপাদকের উপরে। কে সেই উৎপাদক? মূলত চাষী, আর জনবয়েক খনির মজুর ও কলকারখানার মজুর। ইহারা এই বোঝা বহন করিতে করিতে শেষে মুখ থুবড়াইয়া পড়ে,—দেশের রাজস্ব যোগাইতে আর পারে না, সাম্রাজ্যবাদীর চালানো মালও কিনিতে পারে না, পাওনাদারের পাওনাও পারে না মিটাইতে।

এই যখন সাম্রাজ্যের দশা, অন্যদিকেও তখন পুঁজিতন্ত্র নানারূপেই অচল হইয়া পড়িতেছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক জগতে পুঁজিদার জাতের মধ্যে রেষারেষি বাড়ে, যুদ্ধ বাধে, কিংবা বাধে-বাধে। শিল্পপ্রধান প্রত্যেক জাতিই নিজের শিল্পকে বাঁচাইতে চায় অন্যের শিল্পের আক্রমণ হইতে। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রই শুল্ক-প্রাচীরে নিজ নিজ দেশ ঘিরিয়া লয়। ফলে সকলকারই ক্রয়বাণিজ্য বাধা পায়।

তাহাই ক্রমে আন্তর্জাতিক শুল্ক-দ্বন্দ্বরূপে দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্নত দেশের ঘরের মধ্যেও পুঁজিদার মুনাফা জমাইয়া ক্রমেই স্ফীত হয়, অথচ বঞ্চিত মজুর দুর্দশাপন্ন থাকে। ইহাতে দেশের ভিতরেও দুই শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য বাড়ে, বিরোধ ঘনাইয়া উঠে, শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দেয়—মূলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব আবার প্রকট হয়। তৃতীয়ত, ক্রমেই নতুন যন্ত্র আবিষ্কারে মজুরদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়ে; আর মজুরেরাই যখন দেশে-বিদেশে সংখ্যায় বেশি তখন তাহারা বেকার হইলে পণ্য-ক্রয়কারীর সংখ্যাও আসলে কমে। ফলে, উন্নততর যন্ত্রে পণ্য বেশি উৎপন্ন হয়; কিন্তু পণ্য বিক্রয় হয় কম। বিক্রয় না হইলে মুনাফা নাই; তাই পুঁজিদারও তখন কল বন্ধ রাখে। এইভাবে বাড়ে মজুরের বেকারসংখ্যা—আরও জমে দ্বন্দ্ব; দেখা দেয় আর্থিক সংকট।

এইজন্যই উৎপাদন-শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পাইলেও মুনাফাতন্ত্রের চক্রান্তে সেই উৎপাদনের সার্থকতা সমাজ আজ ভোগ করিতে পারিতেছে না। যদি 'ব্যক্তিগত মুনাফার' (private profit) দিন শেষ হইত, তাহা হইলে এই যুগের এই ঐশ্বর্য আয়ত্ত করিতে নাকি প্রত্যেক মানুষের সপ্তাহে মাত্র চার ঘণ্টা পরিশ্রমই হইত যথেষ্ট;—অবশ্য ইহাও ছিল ১৯৩০-৩৫ এর আমলের হিসাব। তাহার পরে যন্ত্র-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের জন্য এখন পর্যন্ত চলিয়াছে এই উৎপাদনে, বণ্টনে, বিনিময়ে একটা অরাজকতা! তাই অর্থ-সংকট দেখা দিতেছে, যুদ্ধ বাধিতেছে। অন্যদিকে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম অপরাজেয় হইয়া উঠিতেছে,—আর সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ও সাম্রাজ্যবাদের আয়ু শেষ হইতেছে, পুঁজিতন্ত্রেরও দম ফুরাইয়া আসিতেছে।

ভবিষ্যৎ ও সমাজতন্ত্র[১]

সেই নতুন সমাজতন্ত্রের যুগের বিশেষ রূপ কী হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে এখনো বলা শক্ত—কিন্তু ১৯১৭ হইতে ১৯৬৩ এই ৪৬ বৎসরের সোভিয়েততন্ত্রের বিকাশ হইতে তাহার রূপ এখন অনেকাংশেই বুঝা যায়। উহা আর এখন শুধু একটা অস্পষ্ট আনুমানিক বিষয় নাই। বুঝিতে পারি—এখনকার সমষ্টিগত উৎপাদনের মত সমষ্টিগত সম্পত্তিরও দিন আসিতেছে। অর্থাৎ কল-কারখানা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিবে না, হইবে সাধারণের সম্পত্তি। জমি প্রথমটা হয়ত হইবে চাষীর, পরে হইবে সাধারণের, চাষীরা তাহাতে সমবায় সূত্রে সম্মিলিত হইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করিবে শস্য। অর্থাৎ চাষীর কিংবা মজুরের উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকারী হইবে তাহারা নিজেরা—কোন মালিক পক্ষ নয়। সেই উদ্বৃত্ত মূল্যের খানিকটা থাকিবে নতুন যন্ত্রপাতি আয়ত্ত করার জন্য, কিন্তু মুনাফা না থাকাতে কেহ শ্রমিককে ঠকাইতে পারিবে না। আর সমাজে মুনাফাদার না থাকাতে একটা আর্থিক সাম্য ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। গণতন্ত্রের যাহা আসল লক্ষ্য—রাষ্ট্রে ও জীবনে মানুষের সমান অধিকার লাভ,—তাহাই এইভাবে ক্রমশ আয়ত্ত হইবে। এই যুগ আসিয়াছে সোভিয়েত ভূমিতে, তাহার জীবনযাত্রায় ও মানস সম্পদে সেই রূপ দেখা দিয়াছে। অবশ্য সেখানেও এখনো মাত্র উহার প্রথম ধাপ 'সমাজতন্ত্র' চলিতেছে, উহার নীতি এই—"From each one according to his ability, to each one according to his work."—অর্থাৎ কাজ অনুসারে বেতন। কাজেই মানুষে মানুষে বেতনের পার্থক্য আছে এই 'সমাজতন্ত্র' বা সোস্যালিজমের স্তরে। কিন্তু এই স্তরেও উৎপাদন-যন্ত্রের মালিক সমাজ, উহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত মুনাফার আয়ু শেষ হওয়াতে সে দেশে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগও পরিত্যক্ত

১. ১৯৪০-৪৮ সালের লেখা এই প্রস্তাবটি রাখা হইল—কারণ, ১৫ বৎসর পরেও মূলত তাহা মিথ্যা নয়। কিন্তু ১৫ বৎসর সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে যে সংশয় দেখা দিয়াছে ও সমাজতন্ত্রের গঠনকর্ম যে ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহা না জানিলে, না বুঝিলে এই সব অভিজ্ঞতার মূল্য থাকিবে না। অতএব সেই সমাজতন্ত্র গঠনের চেষ্টার মূলবিচার করা হইল পরবর্তী অধ্যায়ে।

হইয়াছে। অন্য প্রধান প্রধান দেশেও এইরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটিলে তবেই সোভিয়েত দেশ নিষ্কণ্টকে 'সমাজতন্ত্র' হইতে 'সাম্যবাদী সমাজের' দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে (১৯৪৫) পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র বিস্তৃত হওয়ায় ঐসব দিকে পদক্ষেপ আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক শক্তিদের উচ্ছেদ ঘটিলে মানুষও বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারিবে, আপনার সুষ্ঠির পরিকল্পনা বা প্ল্যানিংএর সহায়ে কঠিন পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্তি পাইবে। বিজ্ঞান এখনই সেই আশীর্বাদ কতকটা সম্ভব করিতে পারে, সাম্যবাদে তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহা হইলে—"Man will at once leap from the realm of necessity to the realm of freedom." তাহাতে মানুষ ক্রমশ বাধ্যবাধকতার, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ও বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে নিজের ব্যক্তি-স্বরূপকে সত্যরূপে চিনিতে পারিবে। সেই ব্যক্তিসত্তা সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব মানিয়া সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে—এখনকার মত খণ্ডিত হইয়া যাইবে না। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায়ও এইরূপে মানবপ্রকৃতির নতুন বিকাশ এক-আধ দিনে সম্ভব হয় না—সমাজতন্ত্র বহুদেশে বিস্তৃত ও পৃথিবীতে বিপদমুক্ত না হইতে উচ্চ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সেখানেও বাধামুক্ত হয় না। সেখানেও কিছু স্বার্থবুদ্ধি, দুর্নীতি থাকে। তবে, যখন শোষক ও শোষিতই থাকিবে না, তখন যে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির সুযোগ ও তাগিদ কমিয়া যাইবে, তাহা সহজবোধ্য। সেই পথেই অবশেষে, ধীরে ধীরে আসিবে সেই দিন যেই দিন এই নীতি গ্রাহ্য—"From each one according to his ability, to each one according to his need,"—উহাই কমিউনিজমের সুর।

কিন্তু কথা হইল, মানুষের এই ভাবী যুগ আসিবে কি করিয়া? সামন্ত যুগ ভাঙিয়া নতুন যুগ আনিয়াছে (সামন্তদের) নিম্নেকার বুর্জোয়ারা। বুর্জোয়া যুগও তেমনি শেষ হইবে এই যুগে যাহারা উৎপাদন শক্তিকে বাড়াইতে পারে তাহাদের হাতে—তাহারা মজুর ও তাহাদের সহযোগী কিসান। আর হয়ত এই গণশক্তির পিছনে থাকিবে সেই নিম্নমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী দল, যাহারা যুক্তি দিয়া বুঝিতেছে কেন বর্তমান অবস্থা অচল, আর কী হইবে ভবিষ্যৎ। এই যে রূপান্তরের পথ তাহা যতই সুগম হইবে ততই সমাজের মানুষ বুঝিতে পারিবে ইহার আবশ্যকতা ও ইহার অনিবার্যতা। এই জ্ঞানটা সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া দেওয়াই তাই প্রকৃত শান্তিকামীরও কাজ। এই চেতনা (consciousness) জনসাধারণের মধ্যে, মজুরের মধ্যে, কিসানের মধ্যে প্রাণের দায়েই আসিতেছে; বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের বেকার দশায় তাহা বুঝিতে পারিতেছে। তবুও সচেতন হইতে হইবে বুদ্ধিজীবীদেরই বেশি, চেতনা সঞ্চারের দায়িত্ব তাহাদেরই হাতে, তাহাদেরই হাতে এখন পর্যন্ত সংস্কৃতির দায়ভাগ।

ইতিহাসের ছন্দ

মানুষের ইতিহাসের এই এক নিঃশ্বাসে দেওয়া অস্পষ্ট আভাস, এই বিশ্ববীক্ষা (Weltanschaung), আমাদের সম্মুখে রাখা দরকার,—জগৎ ও জীবনের দূরপ্রবাহী স্রোতের মধ্যে আমরা কোথায় দাঁড়াইয়াছি দরকার তাহা আমাদের বুঝা। বলা কি আবার প্রয়োজন, কোনো দেশের ইতিহাসই অন্য কোনো দেশের ইতিহাসের শুধুমাত্র পুনরুক্তি হয় না? ইতিহাস পয়ার ছন্দে লেখা পাঁচালী নয়, ইতিহাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মহাকাব্য। তাহার ছন্দের মিল পংক্তির অভ্যন্তরে; সূক্ষ্মতর নিবিড়তর সেই মিল। মানব-ইতিহাসের সেই বিরাট ছন্দের সঙ্গে স্বদেশের ইতিহাসের ছন্দটিও মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইতিহাসের এই পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাটিকেও যাচাই করিতে হইবে এইরূপ বাস্তবদৃষ্টিতে। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব দেশে ও বিদেশে ইতিহাসের কোন্ নতুন রূপ প্রকাশিত হইতেছে—সংস্কৃতির রূপান্তর কেমন করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—আমাদেরও সংস্কৃতি সকল জাতির সংস্কৃতির মতো কি করিয়া এক বিশ্বসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

ইতিহাসের ধারা—অমিত সেন
মানব সমাজ—রাহুল সাংকৃত্যায়ন
পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র—এঙ্গেলস্
Imperialism— Lenin.
On Religion —Lenin.
What Happened in History— Gordon Childe (Pelican).
Man Makes Himself— (Watts & Co).
A Short History of Culture—Jack Lindsay.
Ancient Society—Morgan.
From Savagery to Civilisation—Graham Clark (Cobbett).
Science of Life—H. G Wells, Julian Huxley, C. P. Wells.
The Story of Tools—Gordon Childe (Cobbett, London).

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশধারা

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাঃ আদিরূপ

ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি নানা ভাঙা-গড়ার মধ্যদিয়া আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা প্রধানত কৃষিজীবী সমাজের সংস্কৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতেই অবশ্য ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প-উদ্যোগের সূচনা হইতে থাকে। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের জীবনে বা মনে শিল্পযুগের রঙ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তখনো ভারতীয় সমাজ প্রধানত কৃষি নির্ভরই ছিল। কৃষি-সমাজ একান্তভাবেই প্রকৃতির নিয়মে চলে, ঋতুর সঙ্গে তাহার ভাগ্য বিজড়িত। কৃষি-সমাজের সংস্কৃতিতে, তাহার জীবন-যাত্রা ও মানস-সৃষ্টিতেও তাই এই বহিঃপ্রকৃতির প্রভাব প্রবল। কৃষিযুগে তাই বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট মানবপ্রকৃতির বশ্যতার, অসহায়তার ও আত্ম-সমর্পণের চিহ্ন বেশি লক্ষিত হয়।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের মানুষেরাও তাই প্রধানতঃ আত্ম-নির্ভরশীল নহে। স্বভাবতই উপরের দেবতার দিকে চাহিয়া থাকে, অর্থাৎ অদৃষ্টবাদী ও রহস্যবাদী। তাহাদের সাহিত্যে, দর্শনেও তাই মানুষের বিজয়ের স্তব অল্প। আত্মপ্রত্যয় তাহাতে নাই, আছে অদৃষ্টবাদ, ভাববাদ ও সহজ আত্ম-সমর্পণ। ইহা কৃষি-সংস্কৃতিরই সাধারণ লক্ষণ। এই কারণেই প্রাচীন কৃষিসমাজে অদৃষ্টবাদ ও অধ্যাত্মবাদ স্বাভাবিক। তাহার উপর নানা বার পরাজয়ে ভাববাদ ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বড় লক্ষণ হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের এই সংস্কৃতি অবশ্য আজ ভাঙিতে বসিয়াছে; ইহারই রূপান্তর আমরা চোখের সম্মুখে দেখিতেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ১৯৪৭-এর রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই প্রকাণ্ড সত্য আংশিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, অবশ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের সেই প্রয়োজনীয় রূপান্তর এখনো বহুদিকে অসমাপ্ত। তথাপি এই ভারতীয় সংস্কৃতির একটা সামান্য পরিচয় আমরা গ্রহণ করিতে পারি—বুঝিয়া দেখিতে পারি তাহার খাটি বৈশিষ্ট্য ও আসল বৈচিত্র্য। ভারতীয় সংস্কৃতি মূলতঃ কৃষিগত, ইহাতে ভুল নাই। কিন্তু এখানে শিল্পযুগ আসিয়াছে;—আগামী দিনে ভারতে শিল্প-উৎপাদনের শক্তিও ক্রমশ প্রসারিত হইতে বাধ্য, তাহাও ভোলা সম্ভব নয়। তখন শিল্প প্রধান সভ্যতার লক্ষণও ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকাশ পাইবে। কিন্তু কৃষি-সভ্যতার যে প্রধান দুই-একটি লক্ষণ বা বিশেষত্ব এই ভূখণ্ডে এতদিন স্পষ্ট দেখা গিয়াছে তাহার পরিচয় লওয়া সমীচীন।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান লক্ষণ মনে হয় ইহার ধারাবাহিকতা। এখানে কৃষি-সভ্যতা খুব দীর্ঘদিন টিকিতে পারিয়াছে। ইহা আরম্ভ হইয়াছে অনেক দিন—অন্তত হাজার পাঁচ বৎসর পূর্বে, আর চলিতেছে এখনো। কৃষিকার্য এ দেশে ব্রিটেনের মত একেবারে নগণ্য জীবিকাপ্রণালীতে বোধহয় কখনো পরিণত হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা সোভিয়েত ভূমির মত এই দেশেও শিল্প-চালিত কৃষির প্রভাব যথেষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কৃষি-সভ্যতার এই দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রসার সম্ভব হইয়াছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে; সিন্ধু, গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদী ও বিস্তৃত সমতলভূমি কৃষি-সমাজের বিকাশের পক্ষে ছিল পরম অনুকূল। আর 'দেবতাত্মা হিমালয়' ভারতীয় সমাজকে অনেকাংশে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু এই কৃষি সভ্যতাও দ্বন্দ্ববিরোধ

বর্জিত নয়, ইহাতেও নানা বিপর্যয় ঘটিয়াছে। এই দীর্ঘ-জীবনের সম্পদ তবু ভারতবাসী মোটের উপর সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছে; নীল-নদের উপকূলস্থ সভ্যতার মত, তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিসের মধ্যবর্তী অঞ্চলের সভ্যতার মত উহা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখানেও মাঝে মাঝে বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, 'অন্ধকার যুগ' আসিয়াছে, বহুকাল অনেক অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় সংবাদও বিশেষ পাওয়া যায় না;—এই সব কথা সত্য। তথাপি তখনো সংস্কৃতির ধারা একেবারে মিলাইয়া যায় নাই, তাহা বুঝা যায়। ধ্বংসের মধ্য দিয়াও ইহার ধারাবাহিকতা অনেক জিনিস জীয়াইয়া রাখিয়াছে,—কোথাও নতুনকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে, কোথাও উহাকে রাখিয়াছে টানিয়া-বুনিয়া আপনার সঙ্গে শুধু যুক্ত করিয়া। এইরূপ নমনীয়তা-সহনশীলতাও ভারতীয় সংস্কৃতির ছিল, আর উহাই দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহাকে কোন কোন দার্শনিক বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের সমন্বয়-শক্তি; কেহ বলিয়াছেন—বহুকে এক করিবার সাধনা; আর কেহ বা বলিয়াছেন—সবল গ্রহণশীলতা; আর অন্য কেহ—অক্ষম নমনীয়তা। যাহাই তাহা হউক, আমাদের বর্তমান কালের সংস্কৃতির মধ্যেও এই দুই কারণে বহু বহু দিনের পুরাতন বীজকণা জমা হইয়া আছে, অতীতেরও নানা পর্যায়ের উদ্ভাবনা মিলাইয়া আছে, ইহা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন। আর তাহার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রধান লক্ষণও আমাদের সহজেই চোখে পড়ে—ইহার বৈচিত্র্য। পুরাতন কিছুকে আমরা একেবারে বিলুপ্ত হইতে দিই নাই; আদিম জীবন-যাত্রার ছাপ নানাখানে দেখা যায়। আবার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ বহু জাতির দেশ, দেশও প্রকাণ্ড, প্রায় একটি মহাদেশ। কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারণা উদ্ভূত ও বিকশিত (evolved) হইয়াছে, আমরা তাহাও নানা-ভাবে কালধর্ম, লোক-আচার, বা বিশেষ বর্ণের বা বিশেষ অঞ্চলের আচারধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। ইহা ছাড়া বারেবারে বিদেশী-শাসক আসিয়াছে; বিদেশী-উদ্ভাবিত জীবিকা-ধারা ও উহার ধ্যান-ধারণা ভারতবর্ষেও প্রসারিত ('diffused') হইয়াছে—যখনি ভারতবর্ষে তদুপযোগী প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ তাহা লাভ করিয়াছে। সেই সব 'দান' আসিয়া ভারতের নিজস্ব 'অবদানকে' আরও নতুন করিয়া দিয়াছে। তাই সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির একটা মোটামুটি—অত্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও—'ঐক্যবদ্ধ' রূপ যেমন আছে, তেমনি আছে এই ভারতীয় সংস্কৃতির অফুরন্ত বৈচিত্র্য। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য', ইহাও ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বড় লক্ষণ ও সাধনা।

বৈশিষ্ট্যের অর্থ

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লইয়া যাঁহারা গর্ব করেন তাঁহারা বলিতে চান—ভারতীয় সংস্কৃতি অনাদি-অতীত, অপরিবর্তনীয়; তাহা এক শাশ্বত সম্পদ। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেই প্রমাণ যে, (১) ভারতীয় সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় নয়, তাহার রূপান্তর হইয়াছে বারে বারে। (২) ভারতের একত্ব সাংস্কৃতিক হিসাবে সত্য এই কারণে যে, ভারতীয় সংস্কৃতি বৈচিত্র্যের সমাহার। (৩) এই সংস্কৃতি প্রাচীন হইলেও পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা নয়। জীবিত সভ্যতার মধ্যে চীনা সভ্যতাও এমনি দীর্ঘায়ুর গর্ব করিতে পারে। (৪) মোটামুটি এই সংস্কৃতি সর্বাংশেই কৃষিযুগের মধ্যেই নিবদ্ধ।

সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয়ঃ প্রথমত, কৃষি-সভ্যতার পূর্বেও মানুষ জীবিকাসংগ্রামে ও প্রকৃতি-জয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে—ভারতবর্ষেও সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সংস্কৃতির চিহ্ন রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কৃষি-সভ্যতাও আবার নানা স্তরের মধ্য দিয়া ক্রমশ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—কোনো একটি বিশেষ স্তরে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই, থাকিলে তাহারও মৃত্যু ছিল অনিবার্য। মোটামুটি ভারতীয় সংস্কৃতিতেও কৃষি-সভ্যতার সেই স্তরগুলি দেখিতে পাই। আর স্মরণীয় এই যে, কি প্রাগৈতিহাসিক কালে, কি ঐতিহাসিক কালে—এই কৃষি-সভ্যতার কাঠামোর মধ্যেও—সর্বস্তরে ও সর্বদেশেই যেমন, তেমনি ভারতবর্ষেও দেখিতে পাই,—জীবনযাত্রার নতুন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মানুষ পরস্পরের

সম্পর্কের নতুন পরিবর্তন সাধিত করিয়াছে ; আর সেই সামাজিক ব্যবস্থা ও আচার-বিচারকে অবলম্বন করিয়া আবার তাহার মানস-লোক নতুন সৃষ্টিতে (creations) মঞ্জরিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতিরও স্বরূপ বুঝিতে হইলে উহার বিভিন্ন যুগের পরিচয় এইরূপভাবেই গ্রহণ সম্ভব। সমাজের প্রত্যেক যুগের উপকরণগত, সমাজগত এবং মানসগত রূপ—এই তিন অঙ্গ, তিন অবয়ব, উহাদের পরস্পর সম্পর্ক ও সক্রিয় পরিণতি—এই সব প্রত্যেক স্তরেই বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন ;—তবেই এই পরিচয় বাস্তব ও সত্য হয়।

কিন্তু দেখিয়াছি, আমরা সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতির হিসাব লই অন্য রূপে। হয়ত ধর্ম দ্বারা ; যেমন, হিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি বা ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতি। কিংবা ভৌগোলিক ভাগের দ্বারা ; যেমন, বাংলার কাল্‌চার, "ভাগীরথ কাল্‌চার।" কিংবা ভাষাগত জাতি হিসাবে ; যেমন, তামিল সংস্কৃতি, অন্ধ্র সংস্কৃতি, বাঙালী সংস্কৃতি ইত্যাদি। বলিয়াছি, এই সব হিসাব যে একেবারে মিথ্যা তাহা নয়। ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতিতে তফাৎ নিশ্চয়ই আছে। 'ভাগীরথ কালচারের' সঙ্গে নিশ্চয় পদ্মাপারের জীবন-পন্থারও পার্থক্য আছে। বাঙালীর ও হিন্দুস্থানীর কাল্‌চারেও তফাৎ আছে কিন্তু এই সবই গৌণ তফাৎ। বরং এই বিভিন্ন ধরনের বাহ্য লক্ষণই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ। বারেবারেই মনে রাখা দরকার, সংস্কৃতির বিচারক্ষেত্রে মূলসূত্র ধর্ম নয়, দেশ নয়, জাতি নয়। সেই সূত্র জীবনযাত্রার বাস্তব উপকরণ, সামাজিক ব্যবস্থা, এবং তাহারই সহায়তায় সৃষ্ট মানসিক সম্পদ। তাই, এই দিক হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমপরিবর্তিত ধারাও বিচার করিতে হয়।

প্রমাণ-পঞ্জী

কিন্তু কথা এই, জীবনযাত্রার বস্তু-উপকরণ ক্রমশই পরিবর্তিত হয়, তাই সমাজও পরিবর্তিত হয়, মানসিক রূপেরও পরিবর্তন ঘটে ; তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রথম দিককার অধিবাসীদের প্রাথমিক জীবনযাত্রার রূপ আমরা জানিতে পারি কোথা হইতে ? ইহার উত্তর অবশ্য আজ সুবিদিত। যে সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ প্রাচীন মিশর, সুমের, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছে, সেই সব বৈজ্ঞানিক উপায়েই প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসও আমরা জানিতে পারি। এখানে সেই সব উপায়ের কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। মোটামুটি এই বিদ্যারই নাম পুরাতত্ত্ব বা প্রত্নবিদ্যা। ভূতত্ত্ব, প্রত্নজীববিদ্যা ও নৃতত্ত্ব লইয়া ইহা শুরু হয়। প্রথমত, ভূতত্ত্ব বলিয়া দেয় কোন্ ভূ-কালে, কোন্ ভূখণ্ডে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ ছি· কিরূপ। সেই নানা ভূস্তরে লুপ্ত জীবের হাড়গোড়, খুঁজি লইয়া আবার গবেষণা করে প্রত্নজীববিদ্‌। ভারপর নৃতত্ত্বের বিবিধ শাখা বলিয়া দেয় কোন্ দিকে মানুষ দেহ-মন-জীবিকায় কোন্ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পুরাতত্ত্ব প্রাচীনকালের মানুষের ধ্বংসস্তূপের, ভূগর্ভের ও গুহা-গহ্বরের লুপ্ত ও লুক্কায়িত সাক্ষ্য খুঁজিয়া বাহির করে। এদিকে জাতিতত্ত্ব একদিকে বর্তমানের মানবদেহের মাথা, চোখ নাক, চুল, চোয়াল, নানা অবয়বের মাপ-জোখ লইয়া তাহার মৌলিক বিবিধ গঠন বিশ্লেষণ করিয়া দেয় ; আবার সেই দেহ-পরিমাণ-বিদ্যার দিক হইতেই তারপর পুরাতত্ত্বের প্রমাণের সঙ্গে মিলাইয়া দেখে প্রাচীন মানুষের অনুরূপ দেহাবশেষের প্রমাণগুলি। সমাজতত্ত্বও আধুনিক অনগ্রসর ও অগ্রসর মানব-গোষ্ঠীর রীতিনীতি আচারবিচারকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার আদিম মূলকে বাহির করে। এমন কি, এইভাবে ভাষাতত্ত্ব পর্যন্ত মানুষের প্রাচীন সংস্কৃতির উপর এক-একবার এইরূপ অভিনব আলোকপাত করিতে পারে যে তাহা সাধারণত আমরা ভাবিতেই পারি না। এইসব বিবিধ বিজ্ঞানই সংস্কৃতির পথে আমাদের দিগ্‌দর্শনের পক্ষে নির্ভরযোগ্য যন্ত্র। মানব-সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক পরিচয়ে ইহাদের সাক্ষ্যই গ্রাহ্য—কল্পনাকুশল ভাবুকদলের ও ধর্মপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞদের তাহাতে যতই আপত্তি থাকুক। অবশ্য এই বিবিধ শাখার প্রমাণসমূহ সবক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপোষক নয়। তথাপি ইহাদের সকল সাক্ষ্য মিলাইয়া পাঠ

করিলে প্রাচীনের একটা যুক্তিসহ ও বোধগম্য চিত্র লাভ করা যায়।—এইভাবেই পুরাতনের প্রমাণ-পঞ্জী সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়।

ভারতবর্ষে প্রস্তরযুগের সভ্যতা

প্রস্তরযুগের নিদর্শনগুলির কাল নিরূপণ ভূতাত্ত্বিকদের সহায়তাতেই করিতে হয়—এইরূপ প্রস্তর নিদর্শন ভারতবর্ষেও মিলে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথম দিক্‌কার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার কথা, এমন কি, তাহাদের বাস্তব অবলম্বনের কথাও বেশি বলিতে পারেন না। ভূমিপৃষ্ঠের নানা স্তরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের (পাকিস্তানে, শিবালিক অঞ্চলে ও হিমালয়ে), মধ্য ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের শুষ্ক নদীতলে বা পর্বতকন্দরে অবশ্য প্রস্তরোপকরণ প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব ভারতেও এইরূপ যুগের তিনটি অঞ্চল স্বীকৃত হইয়াছে: আসামের নাগা পার্বত্য অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন (?) চট্টগ্রাম (পাকিস্তান) অঞ্চলে; দ্বিতীয়ত দার্জিলিং ও হিমালয় অঞ্চলেও কিছুটা; আর পশ্চিমরাঢ় হইতে সাঁওতাল পরগনার আদিবাসী-অঞ্চলে উহার তৃতীয় ক্ষেত্র। ২৪ পরগনায় বেড়াচাপার কাল, বর্ধমানের রাজার ঢিবির সম্বন্ধে স্থির করিয়া এখনো বলা যায় না—উহা তাম্র-প্রস্তর যুগের কিনা। তাহা হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রাচীন ও নবীন, দুই প্রস্তর যুগের উপকরণই ভারতবর্ষে আছে—তাহার নানা স্তরের প্রমাণও রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন নিদর্শন সম্ভবত ঊর্ধ্ব-শিবালিক শৈলস্তরের মনুষ্য নির্মিত প্রাচীন প্রস্তর হাতিয়ারসমূহ—ইহাকে 'প্রাক্‌ সোয়ান্‌ প্রস্তরশিল্প'ও বলা হয়। ইহার পরে মোটামুটি দুইটি বিশিষ্ট ধারা দেখা যায়—উত্তরে সিন্ধু ও সোয়ান নদীর উপত্যকায়, দক্ষিণে নর্মদা ও দাক্ষিণাত্যের শৈলস্তরে। ইহার একটি 'সোয়ান উপকরণ' নামে, অন্যটি 'কারত্রাস উপকরণ' নামে অভিহিত হইতে পারে। উভয়ই 'প্রাচীন প্রস্তরযুগে'র প্রমাণ। দক্ষিণাপথে এইরূপ প্রাচীন প্রস্তরযুগের নিদর্শন চিঙ্গলিপুটের, এবং 'নব্য প্রস্তর-যুগে'র নিদর্শন দক্ষিণে বেরিলি জিলার ও ইউ-পি বা উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরের প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কারমালায় দেখা যায়। এইরূপ এক একটি স্তরের মধ্যে কত সুদীর্ঘ বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্রের মত এইসব কোনো কোনো নিদর্শনও (যেমন, নিজাম রাজ্যের মস্‌কিতে) স্বর্ণখনির সন্নিকটেই লাভ করা যায়। খনির অভ্যন্তরে যে সে যুগের মানুষ নামিয়া সোনা কুড়াইয়াছে, তাহাতে তাই সন্দেহ নাই। অর্থাৎ 'অসভ্য' জাতিরাও স্বর্ণের সমাদর জানিত। এই স্বর্ণ-ব্যবহার অবশ্য নতুন প্রস্তরযুগেরও কালসূচনা করে। কারণ, ইহাতে বুঝা যায়, তখন ধাতুর মর্যাদা মানুষ বুঝিয়া উঠিতেছে। ইহা ছাড়া 'বৃহৎ-প্রস্তর' আচ্ছাদন (megalithik) হইতে তাহাদের জালায়-নিহিত শব সৎকার-পদ্ধতিও দেখিতে পাই। মৃতের সেই প্রকোষ্ঠে দেখি তাহাদের জীবনযাত্রার দ্রব্যাদি আছে,—মৃত্যুর পরেও মৃত মানুষের যেন ঐ সব ব্যবহার্য চাই! আর সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারি—মৃত্যু সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা কিরূপ। প্রাচীন প্রস্তরযুগের প্রথম দিক হইতে নতুন প্রস্তরযুগের শেষ দিক পর্যন্ত 'হস্ত-কুঠার সভ্যতার' ('Hand-Axe Culture') নিদর্শন কাশ্মীরে, উত্তর মধ্য ও পশ্চিম ভারতেও যথেষ্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার একটা স্তরবিভাগও করিতে পারিয়াছেন। তাহা হইতেও সে যুগের মানুষের জীবিকা ও জীবনের একটা অস্পষ্ট আভাস আমরা পাই। কিন্তু উহার বেশি তাহার সামাজিক রূপ জানিতে পারি না। আর তাহার মানসিক রূপেরও চিত্র পাই মাত্র ততটুকু যতটুকু আছে তাহার ঐ উপকরণ সমূহে। ইহার পরবর্তী-কালের নিদর্শন পটোয়ার বা রাওলপিণ্ডির নিকটস্থ সোয়ান নদী উপত্যকার তথাকথিত "সোয়ান-সভ্যতা" ('Soan Culture')—পাথরের ছিল্‌কে ("flake industry") তাহাতে অপর্যাপ্ত। কিন্তু এই যুগের কোনো কোনো ভূ-পর্বের, যেমন সোলুট্রিয়ান ও ম্যাগ্‌ডালেনিয়ান্‌ পর্বের, নিদর্শন ভারতবর্ষে এখনো পাওয়া যায় নাই। এবং শেষ দিককার পাঞ্জাব, মধ্যভারত ও দক্ষিণ ভারতের 'ক্ষুদ্র

প্রস্তর' নিদর্শনের (মাইক্রোলিথিক) সঙ্গে আফ্রিকা ও সিরিয়ার অনুরূপে মধ্যপ্রস্তর পর্বের (মেসো-লিথিক্) নিদর্শনের মিল আছে। নতুন প্রস্তরযুগের আদিক্ষণ (Proto-Neolithic) ও তাহার শেষ স্তর (Late Neolithic) পর্যন্ত সেই সব উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সকল ক্ষেত্রেই এই মাইক্রোলিথিক্ প্রস্তরযুগ নব্য প্রস্তরযুগে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীনগরের সন্নিকটস্থ বুর্জাহোম নামক স্থানের "বৃহৎ প্রস্তর"-নিদর্শনস্থলীতে পাওয়া গিয়াছে ইহারও পরেকার কালো বার্নিশ করা পোড়ামাটির জিনিস (ceramic ware)—ঠিক যেমনটি মোহেন-জো-দড়োতে আসিয়া পুরাতাত্ত্বিকের মিলিয়াছে। কিন্তু ততক্ষণে প্রস্তরযুগের মধ্যেই আমরা কৃষিযুগে আসিয়া পৌঁছাইয়া গিয়াছি। নতুন প্রস্তরযুগের সভ্যতা ভারতবর্ষে যে তাম্রপ্রস্তর (chalcolithic) যুগে উত্তীর্ণ হইতেছে, ইহা কাশ্মীর ও সিন্ধু উপত্যকার সেই নিদর্শন-সমূহ হইতে বুঝিতে পারি। তেমনি ঐ নিদর্শনগুলি হইতেই বুঝিতে পারি যে, নব্যপ্রস্তর যুগেরও মানবগণ প্রথম উত্তর-পশ্চিম ও সিন্ধু-উপত্যকা এবং ক্রমে তাহারও দক্ষিণস্থ নর্মদা উপত্যকার ও দক্ষিণাপথের উপর দিয়া ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য ***An Outline of Racial Ethnology in India***, B. S. Guha, Royal Asiatic Society of Bengal, 1937, এবং ***Stone Age in India***, Krishnaswamy, ***Ancient India***, No. 3 & No 16) গঙ্গার উত্তরে ও পূর্বেও প্রস্তরযুগের নিদর্শনের অভাব এখন নাই।[১]

ভারতের আদিবাসী

এই প্রকাণ্ড অঞ্চলের প্রাচীনতম আদিবাসীদের কথা আরও কিছু পরিমাণে বলিতে পারে জাতি-তত্ত্ব। জাতিতত্ত্ব ভাবতীয়দের দেহের গঠন বিশ্লেষণ করিয়া বলিতে চাহে—বর্তমান ভারতবাসীরও মধ্যে মোটামুটি এই কয়টি জাতির চিহ্ন এখনো লাভ করা যায় (***An Outline of Racial Ethnology in India*** ঐ): (১) নিগ্রোবটু মানুষ:—আন্দামানে, মাদ্রাজ প্রদেশের আন্নাইমালাই পর্বতের

১ 'ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগ বিষয়ক জ্ঞাতব্য কথা ও তথ্যের একটি প্রামাণিক বিবরণ সংক্ষেপে দান করিয়াছেন সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের বুলেটিন 'Ancient India'র প্রথমে ৩য় সংখ্যায় (পৃঃ ১১-৫৭) এর সম্পাদক । ১৬শ সংখ্যায় শ্রী ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী। সাধারণ পাঠকের নিকট সহজপাঠ্য না হইলেও প্রবন্ধটি তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারে।—'সোয়ান-প্রস্তর শিল্প', ও 'মাদ্রাজ প্রস্তর শিল্প', এবং ১৬শ সংখ্যায় মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের তিন পৃথক ভাগের বিবরণ চিত্রাবলী ও 'প্রস্তর যুগের নিদর্শন যুক্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র' প্রবন্ধে। চিত্রগুলি ও পরিভাষার [illegible] নানা কথা বুঝিবার পক্ষে অনেকটা সহায়তা করে। তৎসত্ত্বেও এখানে তাহার সারাংশ এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। ভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম দিককার নিদর্শন মিলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে (অর্থাৎ পাকিস্তানের) প্রাক-সোয়ান পাথরের ফ্লেক্ নিদর্শনে (শিবালিক পর্বতের উচ্চস্তরে উহা দেখা যায়)। ইহার পরে অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে মোটামুটি দুইটি শিল্পধারা দেখা দেয়:—একটিকে 'সোয়ান-শিল্পধারা' (ফ্লেকধারা) বলা হইয়াছে। প্রধানতঃ উহার স্থান উত্তরে সিন্ধু ও সোয়ান নদীর উপত্যকায়। অন্যটিকে 'মাদ্রাজ শিল্পধারা', ("হস্ত-কুঠার' ধারা) বলা হইল, প্রধানত দাক্ষিণাত্য ইহার কেন্দ্র, ইউরোপ-আফ্রিকার অনুরূপ ধারা ইহার সহিত তুলনীয়। ভারত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রস্তর যুগের অঞ্চলগুলিকে (ঐ ১৬শ সংখ্যায়) তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে (১) মধ্যাঞ্চল, মধ্যভারত মহারাষ্ট্র গুজরাত ও দাক্ষিণাত্য, (২) দক্ষিণ কন্নড় ও সন্নিকটস্থ অঞ্চল। (৩) পূর্বাঞ্চল আসামের নাগা দেশ এবং বাংলার চট্টগ্রাম (ইহার সহিত মালয় দ্বীপের সম্পর্ক) এবং দার্জিলিং ও পশ্চিমরাঢ়। 'ক্ষুদ্র প্রস্তর' নিদর্শনগুলি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের 'মেসোলিথিক' সন্ধিস্তরের সমতুল্য—প্রাচীন হইতে নব্য প্রস্তর যুগের সন্ধিকালের সৃষ্টি বলিয়া অনুমিত হয়—পাঞ্জাব, মধ্যভারত, গুজরাত, দক্ষিণ ভারতে এই ক্ষুদ্র-প্রস্তর নিদর্শনকেন্দ্র যথেষ্ট। কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের বীজক্ষেত্র ("প্রোটোলিথিক') উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ—সেখান হইতেই তাহা নব্য প্রস্তর যুগে দক্ষিণে প্রসারিত হয়, ইহা অনুমান করা চলে। বলা বাহুল্য, ভারতে আবিষ্কৃত এইসব বিবিধ স্তরের ও বিবিধ ধারার নিদর্শনের সহিত আফ্রিকার ও ইউরোপের, ও পশ্চিম এশিয়ার (নিকট প্রাচ্যের) অনুরূপ স্তরের ধারাগুলি নিঃসম্পর্কিত নয়। কিন্তু জাভার "হস্ত-কুঠার" প্রস্তর শিল্পের কোনো ধারা ব্রহ্মে মালয়ে পাওয়া যায় নাই। আবার জাভা ও ব্রহ্মের (এশিয়ায় চীনের প্রান্ত পর্যন্ত) অনুরূপ নিদর্শনের সহিত সোয়ান উপত্যকার ঐ জাতীয় নিদর্শনের পার্থক্য যথেষ্ট। গঙ্গারও পূর্ব দিকে ভারতবর্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তাই পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার সহিত ভারতের সম্পর্ক আর অনুমান সাধ্য নয়, অনেকটা প্রমাণিত। জাতিতত্ত্বও সে সন্ধান দেয়।

কাদর ও প্লেয়ন, আসামের আঙ্গামী নাগা, আর রাজমহলের বাগাদের মধ্যে নাকি এই জাতির অস্তিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে অবশ্য কেহ কেহ গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাও স্মরণীয়। কিন্তু একথা স্বীকার করিলে মনে হয়, দক্ষিণ ভারতের প্রাগৈতিহাসিক বৃহৎ-প্রস্তর-নিদর্শনগুলির সঙ্গে এই নিগ্রোবটু জাতীয় লোকদের সংযোগ থাকিবার কথা। "শিকারলব্ধ মাংস ও বন্য কন্দ মূল ইহাদের আহার ছিল, কৃষিকার্য ইহারা জানিত না এবং ইহাদের সভ্যতার কোনো বালাই ছিল না।" এক সময়ে আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষেও ভারত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে এই জাতির বসবাস ও গতায়াত ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত প্রস্তরযুগ জুড়িয়া ইহারাই ছিল ভারতের অধিবাসী। (২) আদি অস্ট্রেলয়েড্ বা অস্ট্রিক, অর্থাৎ 'আদি পুরবীয়া' মানুষ:—ছোটনাগপুর ও মধ্য ভারতের মুণ্ডা, কোল, ভীল, কেরিয়, খরবার ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি আজিকার 'আদিবাসী' (অবশ্য তাহাদেরও আদিতে নিগ্রোবটুরা হয়ত এই দেশে বাস করিত। তাহা সত্য হইলেও সেই নিগ্রোবটুদের সহিত অস্ট্রিকদেরও রক্তের সংমিশ্রণ নিশ্চয় ঘটিয়াছে), আর দাক্ষিণাত্যের চেঞ্চু, কুরুম্ব, মালয়ন, য়েড়ুব প্রভৃতিগোষ্ঠীর মধ্যে সেই 'আদি পুরবীয়া' বংশধরদেরই এখনো পাওয়া যায়। দক্ষিণেই নাকি ইহাদের সঙ্গে নিগ্রোবটু সংমিশ্রণের চিহ্ন স্পষ্টতর। আমাদের সুপরিচিত খাসিয়া জাতি এই আদি-অস্ট্রেলয়েড্ বা অস্ট্রিক জাতির খাঁটি নিদর্শন—ভাষা হিসাবেও বটে, জাতি হিসাবেও বটে। দাক্ষিণাত্যের টিনেভেলি জিলার 'বৃহৎ-প্রস্তরের' (মেগালিথিক্) নিদর্শনগুলির মধ্যে মানুষের দেহাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে এই অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরই চিহ্ন দেখিতে পাই। মৃতের উপযোগী জীবনযাত্রার দ্রব্যাদি সেখানে রহিয়াছে ও মাটির জালায় ইহাদের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে; সেই শব ও উপকরণ দণ্ডায়মান সুবৃহৎ প্রস্তরের দ্বারা চিহ্নিত। ইহাতে বুঝিতে পারি মৃতকে ইহারাও একেবারে নিষ্প্রাণ মনে করিত না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, তাহাদের বিস্তারের পথ ছিল এইরূপ: "মনে হয়, ইন্দোচীনের কোথাও হয়ত এই জাতির প্রথম উদ্ভব; তাহার পর দেশ দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়া ইহাদেরই কোনো শাখা মালয় জাতিতে, পরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়া পলেনিসীয় ও মেলেনসীয় জাতিতে, দক্ষিণ বর্মা ও শ্যামে মোন্ ও খ্মের প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের বিভিন্ন শাখা আসামের উপত্যকা-ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে থাকে।...উত্তর ভারতে ও বাঙ্গলাদেশে বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু আর রহিল না।" ('জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ এবং Ancient India—Massoon-Oursel, Grabowska & Stein)। অবশ্য, ঠিক ইহার উল্টা পথও কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন: —ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ষের উপর দিয়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও উহার দ্বীপপুঞ্জে এই জাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব-ভারতের কৃষি-সভ্যতার প্রারম্ভ

এই অস্ট্রিক বা আদি অস্ট্রেলয়েডদের সভ্যতার প্রমাণ অবশ্য ভাষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্বের মারফৎই, আমরা পাই (কিন্তু ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জাতিতত্ত্বের দিক হইতে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করা কর্তব্য)। ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে আমাদের ভাষায় যেইসব মূল শব্দ সম্ভবত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর দান, মনে করিতে পারি সেই সব দ্রব্যের সঙ্গে অস্ট্রিকদেরই পরিচয় হয় সর্বাগ্রে। এই সব প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভাষা-বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহাদের সভ্যতার যে আভাস দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে সে সভ্যতার বস্তু উপকরণ ছিল এইরূপ: "অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই ভারতে (পূর্ব ও মধ্য ভারতে?) প্রথম কৃষিকার্য ও তদবলম্বনে সংঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহারা ধান, পান, কলা ও নারিকেলের চাষ করিত (দ্রষ্টব্য এই যে, বাংলাদেশে সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে এইসব কোনো-কোনো দ্রব্য না হইলে আজও চলে না।—বর্তমান লেখক); পাহাড়ের গা কাটিয়া ধানের খেত প্রস্তুত করিত।

প্রথমটা উহাদের চাষ ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মত ; লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্মমুখ কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করিত (ধাতুর ব্যবহার তখনো জানা ছিল না বলিয়া)। ধনুর্বাণ ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। একখণ্ড গুঁড়িকাঠে তৈয়ারী ডোঙ্গায় (দ্রষ্টব্য, আজও পূর্ব বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে তেমনি 'কোন্দা' বা খোঁদা নৌকা খালে-বিলে প্রধান বাহন।—বর্তমান লেখক) এবং কতকগুলি গুঁড়িকাঠ বাঁধিয়া তৈয়ারী ভেলার আকারের বড় বড় নৌকায় করিয়া উহারা বড় বড় নদী, এমন কি সাগরও পার হইত।" মোটামুটি এই জীবন চিত্র হয়ত গ্রহণযোগ্য। আসলে ইহা নব্য প্রস্তরযুগের 'বর্বর-জীবনে'র চিত্র, তাহা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি,—ভারতবর্ষের সেই সময়কার মানুষদের 'অস্ট্রিক', বা যে জাতীয় বা যে গোষ্ঠীর বলিয়াই এখন আমরা নাম দিই। কৃষি-যুগের প্রথম সামাজিক রূপ ও গঠন এই সব দ্রব্যকে অবলম্বন করিয়াই এই দেশে গড়িয়া উঠে—ধান, পান, কলা, নারিকেল ইত্যাদি। ইহাদের সভ্য ও আদিবাসী দুই স্তরের বংশধরদের মধ্যে আজও অনেকাংশে তাহারই মূল রূপ হয়ত রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু 'বর্বর-যুগের' মানসিক ভাবনা ছিল কিরূপ ? শব-সৎকার ও অন্যান্য পদ্ধতি হইতে তাহার যে আভাস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত পরবর্তী, এমন কি বর্তমান ভারতীয় অনুরূপ প্রথা ও ধারণার তুলনা চলে। এইরূপ তুলনায় দেখি যে, যেমন সেই আদি অস্ট্রলয়েড্‌দের বা ঐরূপ প্রাচীন মানুষের উপকরণ ও আচার-ধারা এখনো আমরা অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু বহন করিতেছি, তেমনি তাহাদের প্রাথমিক ভীতি, বিস্ময় ও পূজা ও ধর্মকর্মও নানা সূত্রে আমাদের 'অধ্যাত্ম-সম্পদের' মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। "ইহারা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করিত—মানুষের মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা গাছে, পাহাড়ে, অথবা অন্য জীবজন্তুর ভিতরে প্রবেশ করিত, এইরূপ ধারণাই ইহাদের ছিল। এই ধারণাই পরবর্তীকালে ইহাদের লইয়া হিন্দুজাত সৃষ্টি হইবার পরে, হিন্দুদের মধ্যে উদ্ভূত পুনর্জন্মবাদে পরিণত হয়। শ্রাদ্ধের অনুরূপ রীতি—মৃতকে মধ্যে মধ্যে আহার্য দান—ইহাদের মধ্যেও ছিল বলিয়া মনে হয়। মৃতকে ইহারা হয় বৃক্ষ-সমাধি দিত, অর্থাৎ কাপড়ে বা বল্কলে জড়াইয়া বৃক্ষস্কন্ধে মৃতদেহ রাখিয়া দিত ; অথবা ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া সমাধির উপরে দীর্ঘাকার প্রস্তরখণ্ড খাড়া করিয়া পুঁতিয়া দিত।...উত্তর ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমত এই অস্ট্রিক জাতির লোকেরাই বাস করে ; সেখানে ইহারা কৃষিমূলক একটা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। 'গঙ্গা' এই নামটি অস্ট্রিক ভাষার শব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা ভিত্তি।"

যে কথাটি এইখানে প্রণিধানযোগ্য তাহা এই ঃ—ভারতীয় সংস্কৃতি তখন হইতেই কৃষিগত ; তাহার সেই কৃষিরূপ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও সর্বাংশে পরিবর্তিত হয় নাই। তাই সেই আদিম ভিত্তি বা কৃষিযুগের প্রাথমিক দানের এত বিশেষভাবে পরিচয় আমরা গ্রহণ করিতে চাই—বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারে সেই জাতির বা গোষ্ঠীর নাম যাহাই স্থির হউক, তাহাতে মূলতঃ আসে যায় না। এইটুকু পরিচয় না লইলে ভারতীয় সভ্যতার এই দিককার রূপ আমাদের নিকট অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে, স্তরের পরে স্তরে ইহার যে পরিবর্তনও ঘটিয়াছে তাহারও মূল্য অপরিজ্ঞাত রহিবে,—বিশেষত যখন পূর্ব ও মধ্য ভারতের প্রাগৈতিহাসিক তথ্য এখনো বহু পরিমাণে অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অস্ট্রিক জাতির মানসিক প্রবণতার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইতে পারে। কিন্তু কোনো বাস্তব প্রাচীন প্রমাণের উপর তাহা গঠিত, না, আধুনিক অস্ট্রিক বংশীয়দের মতিগতি ও অবস্থা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন ঃ—"অস্ট্রিক জাতির নৈতিক প্রকৃতি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়—ইহারা সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণযুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, দায়িত্বহীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহহীন, দৃঢ়তাবিহীন এবং সংহতিশক্তিতে হীন ছিল ; কিন্তু লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই ইহাদের অটুট প্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই।...ইহা বেশ দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, ভারতের ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে—ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি

প্রভৃতির স্থান অস্ট্রিক প্রভাবের ফল। অস্ট্রিকেরা গো-পালন করিত না, কিন্তু বোধহয় তুলার কাপড় ইহারাই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিল।" এক-একটা মানবযূথের মধ্যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে মনের এক-একটা বিশেষ বিশেষ ঝোঁক বা প্রবণতা দেখা যায় বটে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা "রক্তের গুণে" নয়; দ্বিতীয়ত, তাহাও আবার অপরিবর্তনীয় নয়; আর তৃতীয়ত, বর্তমানকালে কোন জাতিরই রক্ত অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ নাই—সম্ভবত পূর্বেও বিশেষ ছিল না; এইসব মনে রাখিয়া উপরকার উক্তিটি যথাভাবে গ্রহণ করা দরকার। উহা একটা অনুমান মাত্রই বলা চলে—সাধারণ যুক্তির অনুমান, বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুমান নয়।[১]

মোটামুটি ভারতীয় সংস্কৃতির খানিকটা প্রারম্ভ প্রায় আমরা এইসব বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি। বিশেষত পূর্বভারতের জীবনযাত্রার বাস্তব উপকরণ, ইহার কৃষিমূলক সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবস্থা, এবং ইহার মানসিক ধারণা,—এই তিনেরই একটি আভাস পাই।

বহুশত বৎসর ধরিয়া এই যে কৃষি-সভ্যতা ভারতের নানা খণ্ডে এইরূপে ইতিহাসের অজ্ঞাতে কোনো স্থায়ী কীর্তি না রাখিয়া বহিয়া চলিয়াছিল, তাহা একইভাবে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে নাই। তাহাও দিনের পর দিন বিকশিত হইয়া চলিয়াছে,—জীবিকার নতুন উপকরণ সন্ধান করিয়াছে, নতুন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দেশে সর্বত্র প্রস্তর-যুগ ছাড়াইয়া তাম্রযুগে তাহা পৌঁছাইল কিনা, ব্রোঞ্জ ও লৌহ প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার আয়ত্ত করিল কিনা, তাহার কোনো সুনিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বাঙলাদেশেও সম্প্রতি কয়েকটি প্রাচীন প্রাক্-ঐতিহাসিক নিদর্শনের কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা এখনো পরীক্ষাধীন। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত 'নিষাদ', 'ভিল্ল-কোল্ল' প্রভৃতি আদিবাসী কোনো কোনো শাখা হয়ত আধুনিক কোল জাতির পূর্বপুরুষরূপে অরণ্য-পর্বতে শিকার করিয়াই বেড়াইত। 'নিষাদরা', আমাদের বিবেচনায়, সভ্যতার আদিম স্তরে নিবদ্ধ ছিল। 'কোল-ভীল' কিন্তু সে তুলনায় এক ধাপ উন্নত। কৃষি-সমাজের জীবনযাত্রা বা চিন্তা-ভাবনা প্রথমে নিষাদদের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই—অন্য সমাজ হইতে পরোক্ষে তাহাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিতে পারে। তবে অনুমান করা যায়—এই অঞ্চলে কৃষি সেই অস্ট্রিকদের সময় হইতেই প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষের ধাতব যুগের প্রারম্ভ

উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে, হয়ত পূর্বাঞ্চলে অস্ট্রিকদের এই 'বর্বর' জীবন যখন চলিতেছে, তখনি আর এক উন্নততর কৃষি সভ্যতা আবির্ভূত হইতেছিল। অন্ততঃ সেখানেই ভারতের ধাতব যুগের সভ্যতার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কৃষি চলে ক্ষেত্রে, কৃষক সাধারণত গঠন করে গ্রাম, বাস করে গ্রামে। কৃষি সভ্যতা তাই পল্লী-প্রধান। তবু এই সভ্যতা বাড়িয়া উঠিলে উৎপাদকের নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যখন খাদ্যাদি উৎপন্ন হয়, তখন বৃত্তিজীবী কারিগরেরাও উদ্ভূত হয়, শ্রমবিভাগ দেখা দেয়, এবং খাদ্য ও এইসব পণ্যের আদান-প্রদানের (exchange) প্রয়োজনে এক একটি পৌরকেন্দ্র বা নগর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এই সব কেন্দ্রের খাদ্য জোগায় চতুর্দিকের কৃষি-অঞ্চল; তাই কৃষি-সমাজের জীবন-যাত্রা কতটা অগ্রসর হইলেই এইরূপ নগর পত্তন সম্ভব। সুমের, মিশরে যেমন, ভারতবর্ষে তেমনি এইরূপে দেখি এক পৌর সভ্যতাও গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বতন কৃষিজীবীরা ছিল একান্তভাবে

---

১ অমুক 'জাতির' (race) মানসিক ধর্ম এইরূপ—এই মর্মের কথা বলার অর্থ—মানুষের চিন্তায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উৎপাদন-প্রথার প্রাধান্যকে পরোক্ষে অস্বীকার করা। স্বভাবতই শাসক-গোষ্ঠীর, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবযুক্ত দেশের বৈজ্ঞানিকরা, এইরূপ 'জাতির ধর্মের' উপর জোর দেন,—সাম্রাজ্যবাদীরা 'প্রভুজাতি' (আর্য ?) আর শোষিতরা 'দাসজাতি' সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতদের ইহা নানাভাবে প্রমাণ করা একটা নিয়ম। হিটলারী 'রক্তের মাহাত্ম্যবাদ' বা ব্লাড থিওরি উহারই চরম রূপ মাত্র—আর এই কথাটা যে কত অবৈজ্ঞানিক তাহাও এখন অন্তত স্পষ্ট (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী)।

পল্লীবাসী। কিন্তু এই নতুন কৃষিজীবীদের মধ্যে ক্রমে তখন নগরেরও পত্তন হইতে শুরু করে। জাতি হিসাবে তাহারা কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়; খুব সম্ভব তাহারা আসলে সেই সুমের-আক্কাদদেরও আত্মীয়, এমন কি হয়ত বা বর্তমান দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদেরও সগোত্রের,—ভূমধ্য জাতিদের বংশধর বা জ্ঞাতি। ইহাদের বংশধারা লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে যে তর্ক আছে তাহা শেষ হয় নাই। কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে পারি—প্রাচীন এশিয়াটিক সভ্যতার শাখারূপে উহার কৃষ্টিধারা তাহারা হয়ত বহিয়া আনিয়াছিল বা গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতে এই সভ্যতার অনেক কেন্দ্র বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন আর উহাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' বলাও ঠিক নয়। পাকিস্তানের বালুচিস্তান, সিন্ধু, পশ্চিমপাঞ্জাব হইতে, ভারতবর্ষের গুজরাত, মধ্যভারত ও উত্তর প্রদেশের কোথাও কোথাও উহার কেন্দ্র ছিল। সর্বত্র উহা সম-বিকশিত নয়। হরপ্পা মোহন-জো-দড়োর মতো এত প্রচুর প্রমাণ আর কোথাও এখনো নাই। সাধারণভাবে 'হরপ্পা সভ্যতা' বা 'সিন্ধু সভ্যতা' বলিয়াই এখনো এই সর্বভারতীয় সভ্যতার পরিচয়। দেখা যায়, উহাতে প্রস্তরযুগের জীবন শেষ হইয়া অধিবাসীরা তখন ধাতুর ব্যবহার আয়ত্ত করিয়াছে, তাম্রের উপকরণ লইয়া যাত্রা শুরু করিয়াছে, লৌহ-যুগে পৌঁছিতেছে,—কিন্তু মধ্যবর্তী ব্রোঞ্জযুগের কোনো নিদর্শন সেখানেও নাই। তথাপি তখন মানুষের সভ্যতায় এবং ভারতের কৃষি-সভ্যতায় দ্বিতীয় স্তরের সূচনা হইতেছে। ইহাই তাম্র-প্রস্তর (chalcolithic) যুগ। অস্ট্রিকদের সভ্যতার সন্ধান দেয় আমাদের জাতি-বিজ্ঞান১ ও ভাষা বিজ্ঞান, আর এই ভারতীয় প্রাচীনতম পৌর-সংস্কৃতি আবিষ্কার করিয়াছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব।

১ প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন জাতি-বিজ্ঞানের নৃতত্ত্বের চক্ষে বর্তমান ভারতবাসী কয়টি ভাগে বিভক্ত। সংস্কৃতির এক-একটি যুগ হয়ত তাহাদের কাহারও কাহারও অতীতের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত— যেমন 'নেগ্রোবটু'দের সহিত প্রস্তরযুগ বা আদি-অস্ট্রালয়েডদের সহিত প্রস্তর শেষ বা ও ধাতব যুগের প্রারম্ভকাল সংযুক্ত—ইত্যাদি। কিন্তু জাতিবিজ্ঞানের চক্ষে সেই সব যন্ত্র ও উপকরণ বড় কথা নয়, বড় কথা মানুষের দেহের মাপজোক। সেই হিসাবে ডাক্তার বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয়ের মতে (পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।) বর্তমান ভারতবর্ষে এই সব জাতীয় লোক বসবাস করে, যথা: (১) 'নেগ্রোবটু', পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, (২) আদি-অস্ট্রালয়েড: ইহাদের পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি, (৩) 'লম্বা মাথাওয়ালা জাতি', দক্ষিণ ভারতের ও উত্তর ভারতের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহাদের পাওয়া যায়, (৪) 'বৃহৎ মস্তিষ্ক ভূমধ্যসাগরীয়' এবং তাহাদেরই একটু দুর্বল রূপ সিন্ধু সেকালের জাতি: হরপ্পা, মোহন-জো-দড়োতে আধুনিক পাঞ্জাবীদের মধ্যে ইহাদের নিদর্শন মিলে—যদিও একথাও স্মরণীয় যে হরপ্পা মোহেন-জো-দড়োর দেহাবশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সেখানে একজাতির নয়, নানাজাতির মানুষই ছিল। ইহারাই ডাক্তার গুহের মতে 'মূল ভারতীয় জাতি'। ইহার উপরে আরও জাতি আছে—(৫) 'গোল মাথাওয়ালা অ্যাল্পো-দিনারিক জাতি': গুজরাট, বাংলা ও কানাড়ায় ইহাদের পাওয়া যায় (৬) 'লম্বা মাথাওয়ালা আদি-নর্ডিক: উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বাসিন্দা উপজাতির মধ্যে এবং ভারতের রাজপুত ইহাদের নিদর্শন এখনো পাওয়া যায় (৭) 'পূর্বীয় (Oriental)' পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতানায় এই নীল চোখ মানুষদের দেখা যায়: (৮) 'ভোটাপ জাতি: হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে এবং বঙ্গদেশের সীমান্তে ইহারা স্থিতি (৯) 'লম্বা মাথাওয়ালা মঙ্গোলী', আসামের নাগা প্রভৃতি জাতির মধ্যে ইহাদের প্রমাণ মিলে, (১০) 'গোল-মাথাওয়ালা মঙ্গোলী', টিপরাই, 'চাকমা প্রভৃতি, বাঙলাদেশে যাহাদের মগ বলা হয়। (১১) সামুদ্রিক (Oceanic)': ইহারা সমুদ্র যোগে আগত তামিলনাড়ু ও মালাবারে সন্ধান করিলে এইরূপ লোক দেখা যায়। ভাষাতত্ত্ব বিষয় নানা হিসাবে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

ভাষাবিজ্ঞানের কথা মিলাইয়া পড়া যাউক। কারণ মানুষের সংস্কৃতির বাহন ভাষা। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের চক্ষে ভারতের বিভাগ অন্যরূপ, তাহা জাতি-বিজ্ঞানের মত নয়। কারণ কোনো কোনো জাতির ভাষা হয়ত আজ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে যেমন নিগ্রোবটুদের ভাষা।

তাহার এক আধটি শব্দও খুঁজিলে আর পাওয়া যায় না তাই ভারতে নিগ্রোবটু ভাষা নাই। ভাষা বিজ্ঞানের হিসাবও তাই স্বতন্ত্র রাখা হয়। মোটামুটি তাহা এইরূপ:— অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা: সাঁওতালী, শবর, কোল প্রভৃতি: (২) দ্রাবিড় গোষ্ঠীর: তামিল, তেলুগু, মালায়ালাম কানাড়ী, প্রভৃতি, ও মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উপজাতির ভাষা (৩) আর্য গোষ্ঠীর: বৈদিক, পরবর্তী প্রাকৃত (সংস্কৃত) ও বর্তমানকালীন বাংলা, হিন্দুস্থানী মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভোট চীনা গোষ্ঠীর: ভুটানী, আসামী নাগা প্রভৃতি ভাষাসমূহ।

বিশেষ স্মরণীয় এই যে, 'দ্রাবিড়' বা 'আর্য' এইগুলি বৈজ্ঞানিকদের মতে জাতি পরিচায়ক কথা নয় মূলত ভাষা-গোষ্ঠীর পরিচয় সূচক নাম। সাধারণ কথাবার্তায় এইগুলি দিয়া আমরা মানব গোষ্ঠী-বুঝাই তাহা একটা মারাত্মক ভুল। তাহাতেই এই দেশীয় 'আর্যামির' ও 'দ্রাবিড়ামি'র জন্ম ও প্রশ্রয়লাভ ঘটিয়াছে, অন্য দেশেও হিটলারী 'আর্যামির' প্রসারও সহজে সম্ভব হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সাধারণের ভুলে বর্বরে বর্বরতার সুযোগ পাইয়াছে।

হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কারে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন কালের লুপ্ত অধ্যায় আমাদের সম্মুখে খুলিয়া যায় ;—ইহার প্রথম কৃতিত্ব প্রাপ্য শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহানির ও পরলোকগত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পুরাতত্ত্বের এই আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেন পরে মার্শ্যাল, ম্যাককে, এবং মার্টিমার-উইলিয়ম প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিত ও অধ্যক্ষগণ। তাঁহাদের সেই কাহিনী আজ সকলকারই সাধারণভাবে পরিজ্ঞাত।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাঙ্‌মুহূর্ত

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাক্-ক্ষণের তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাই উত্তর ও পশ্চিম ভারতে আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্র হইতে। প্রধানত এই ক্ষেত্রসমূহ যে অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত মোটামুটিভাবে সেই সমুদায় অঞ্চলটি এখন পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের পশ্চিম ও মধ্যবর্তী অঞ্চল।

এই সূত্রে স্মরণীয় এই যে, এই রাষ্ট্রীয় ভাগ-বিভাগ দিয়া সেকালের সভ্যতার ভাগ-বিভাগ বা গোষ্ঠী নির্ণয় করার প্রশ্নই উঠে না। এমন কি, যখনকার সভ্যতার আমরা সন্ধান করিতেছি, 'পাকিস্তান' 'হিন্দুস্থান' ডোমিনিয়ন তো দূরের কথা, তখনো ভারতবর্ষ বলিয়া আমাদের এই সুপরিচিত বিশিষ্ট দেশও চিহ্নিত হয় নাই, তাহার নামকরণও হয় নাই। তখনো পর্যন্ত অবিভক্ত ভারতবর্ষের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সহিত—এমন কি, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলেরসহিতও—বালুচিস্তানের মারফৎ প্রাগৈতিহাসিক ঈরাণ ও ইরাকের সম্পর্ক ছিল নিকটতর ঃ এবং যে মানব-গোষ্ঠী ও মানব-সভ্যতা এই অঞ্চলে বর্তমান ছিল তাহারাও ছিল মোটামুটি পরস্পরের নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। ভূগোলের ও ইতিহাসের এই আদি সত্যকে পরবর্তী কালের 'দেশ', 'জাতি', 'রাষ্ট্র' প্রভৃতি সামাজিক বিকাশের সূত্র ধরিয়া ভাগ করা, খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচ্ছিন্ন রূপে দেখা, এখন প্রায় আমাদের একটা সংস্কার হইয়া উঠিয়াছে ; এবং সভ্যতার ইতিহাসের অনুসন্ধানে, উহার স্বরূপ বুঝিতে, এই সংস্কার তাই বাধাও হইয়া উঠিতে পারে। যেমন, এই বাঙলাদেশ হইতে আমরা যদি বলিয়া বসি ভারতবাসী হিসাবে আমরা মোহেন-জো-দড়োর উত্তরাধিকারী, তাহা হইলে স্মরণে রাখা প্রয়োজন—দেশ হিসাবে এইরূপ দাবী আরও বেশি করিতে পারে বালুচিস্তানের, ঈরানের, ইরাকের মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা। কারণ, সেই প্রাচীন ও অতি-প্রাচীনকালে সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল পরস্পরের আত্মীয়—গঙ্গার উত্তর-পূর্বে তাহাদের সমসাময়িক যোগসূত্র এখনো স্বল্প আবিষ্কৃত। কিন্তু বাঙলাদেশে সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'বেড়া চাপা' 'রাজার ঢিবি' প্রভৃতি অঞ্চলকে কোন্ সভ্যতার অংশীদার করা হইবে তাহা এখনো বিবেচনাধীন। আবার ঠিক এই ধরনের হাস্যকর ও অবৈজ্ঞানিক হিসাবে 'পাকিস্তানীরা' বলিয়া বসিতে পারে, তাহারাই সেই মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতার উত্তরাধিকারী (সুপণ্ডিত মার্টিমার উইলিয়াম যেমন তাহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন 5,000 Years of Pakistan !) হয়তো কেহ তাহারা বলিবে তাহারা শুধু মোহেন জো-দড়ো-হরপ্পার উত্তরাধিকারী নয়, তাহারা চিরদিনই সুমের-আক্কাদের জ্ঞাতি, ভারতের এই "হিন্দুস্থানী"দের হইতে স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন হইবে—কী হিসাবে তাহা হইলে আমরা ভারতবাসীরা এই প্রাগৈতিহাসিক ও ইতিহাসের আদিপর্বকে ভারতীয় সংস্কৃতির ও ইতিহাসেরই প্রথম পর্ব বা প্রাক্‌ক্ষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি ? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমত, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে এইসব কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয়ত,—আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে এইসব অঞ্চলের সেই সব প্রাগৈতিহাসিক বা ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের মানুষদের দান পৌঁছিয়াছে,—অর্থাৎ সত্যই আমরা তাহাদের সংস্কৃতির কিছু-না-কিছু উত্তরাধিকারী। ইহাই আসল কারণ। কতটা আমরা তাঁহাদের দান গ্রহণ করিয়াছি, কতটা বা করি নাই, তাহা সম্পূর্ণ জানিবার উপায় নাই। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিকের আবিষ্কৃত সেই বিলুপ্ত জীবন-চিহ্ন হইতে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারেরও সন্ধান লাভ করি ; এবং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকের প্রদর্শিত পথে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বিস্মৃত আদিরূপেরও কতকটা ধারণা লাভ করিতে পারি।

ভারতীয় সংস্কৃতির সেই প্রাগৈতিহাসিক আদিযুগকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আবিষ্কার করিতেছেন পুরাতাত্ত্বিকেরা। এইদিকে পুরাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের পর হইতে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হয়। স্যার অরেল স্টাইন্ উত্তর-পশ্চিম ভারত, বালুচিস্তান ও গেদ্রোসিয়ায় (১৯২৯-৩৪) এই উদ্দেশ্যে বারে বারে পর্যটন করেন। ম্যাককে ও স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদারও এই অঞ্চলে নতুন কেন্দ্র ও নতুন তথ্যের সন্ধান দেন। গর্ডন চাইল্ড্ এইসব আবিষ্কারের অর্থ, এশিয়ার প্রাচীনতম ইতিহাসে উহার স্থান, পূর্ব-ঈরানের আবিষ্কারমালার সহিত তাহার সম্পর্ক প্রভৃতি প্রামাণিকতার সহিত বিচার ও বিশ্লেষণ করেন (১৯৩৩-৩৪)। তাহা হইতে বুঝিতে পারি—ভারতের এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতাও সেই 'এশিয়াটিক সমাজের' (পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত) প্রাচীনতম একটি শাখাই। গর্ডন চাইল্ড্-এর আলোচনা অবলম্বন করিয়া ম্যাককোয়ান্ ও স্টুয়ার্ট পিগোট প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রাচীনতম ইরাক (উবাইদ, উরুক, জেম্‌দেত নস্‌র্, 'আদি বংশ,' আক্কাদ, উর-এর তৃতীয় বংশ, লর্‌সা ইসিন্ ক্রমিক ধারার) ও ঈরান-এর সুসা, সিয়াল্ক্, গিয়ান, হিস্‌সার ও আনাউ প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সভ্যতা-ধারার সহিত ভারতের এই উত্তর-পশ্চিম সভ্যতা কেন্দ্রের একটা কালানুক্রমিক কাঠামোও গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য ***Ancient India***, Vol. I. 'The Chronology of Pre historic North West India' by Stuart Piggott, 1946; ***Prehistoric India***, Stuart Piggott, pelican, 1950 বলা বাহুল্য, এইরূপ ক্ষেত্রে কালের হিসাব খুবই মোটামুটিভাবে করা সম্ভব, আর তাহাতেও ভুল ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু ইরাক, ঈরান ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রাচীনতম কৃষ্টির এই মোটামুটি সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বিচার, এবং তাহার পারম্পর্য নির্ণয় গ্রহণযোগ্য। অবশ্য, এই কালানুক্রমিক পারম্পর্যের মধ্যে আমাদের নিকট বেশি কৌতূহলোদ্দীপক সভ্যতার এই বিস্মৃত ক্ষেত্রের বিবরণ ও বিশেষ রূপটি। সংক্ষেপে তাহাই আমরা এখানে স্মরণ করিতেছি।

এক হিসাবে এইসব কেন্দ্র ও উহার নিদর্শন চোখে দেখিলেই এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছন্ন হয়—অন্তত চিত্রাদি হইতে উহা খানিকটা সংগ্রহ করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ভূতাত্ত্বিকের হিসাবে না হউক, ভূগোলের হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের এই 'হরপ্পা সভ্যতার' অঞ্চলটি কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বালুচিস্তানের উষর পার্বত্য প্রদেশ, দ্বিতীয় ভাগ সিন্ধুনদ-পরিপুষ্ট পাঞ্জাব-সিন্ধুর সমতল ভূমি। পূর্ব-পাঞ্জাবেও তাহার বিস্তৃতি এখন অনুমিত হইতেছে। হরপ্পা মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কারের (১৯২১ ২২) পরে ভারতবর্ষের সেই ধারার নিদর্শন গত বিশ বৎসরে (১৯৪৭-এর পরে) আরও যে-যে অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার একটি অঞ্চল গুজরাত (সবরমতী নদীর তীরস্থ রংপুর, লোথাল, এবং উহার বিস্তার নর্মদার উপকূলস্থ প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্র পর্যন্ত); দ্বিতীয়টি পূর্ব-পাঞ্জাব (সিন্ধুনদ তীরস্থ রূপার); তৃতীয়টি রাজস্থান (লুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরস্থ কালিবঙ্গা প্রভৃতি পৌরকেন্দ্র; চতুর্থটি মীরাট (হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র)। এই সবকটিই হরপ্পার সহিত সম্পৃক্ত বা উহারই ক্রমবিস্তার বলিয়া মনে করা হয়। স্বভাবতই বালুচিস্তানের কেন্দ্রগুলি অনেকাংশে পর্বত বেষ্টিত, দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন; দরিদ্র কৃষিজীবীর পল্লীসংস্কৃতি রূপেই তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে নদীমাতৃক উর্বর সমতল ক্ষেত্রের কেন্দ্রগুলি পরস্পর সম্পর্কিত অধিকতর সম্পদশালী। শেষ পর্যন্ত 'সিন্ধু সভ্যতা' একটি বিরাট পৌর-সভ্যতায় বিকশিত হইয়াছিল—হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়ো ছাড়াও পশ্চিম উপকূলে ও রাজস্থানে উত্তরপ্রদেশে পর্যন্ত এখন আমরা তাহার সন্ধান পাই। ভূতাত্ত্বিকের হিসাব পূর্ববর্তী প্রস্তর যুগের আলোচনাকালে আমাদের যতটা সহায়ক হয়, এ ক্ষেত্রে আর ততটা সহায়তা করিতে পারে না। পুরাতাত্ত্বিকের এখানে পৌর বাড়িঘরের পরেই মুখ্য অবলম্বন আবিষ্কৃত শিল্পবস্তু (artifacts),—এক্ষেত্রে বলিতে গেলে, মৃৎপাত্র ও মাটির ছোট ছোট মূর্তি, আর জীবিকার উপকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি। ইহার মধ্যে মৃৎপাত্রই প্রধান—উহার গঠন-পদ্ধতি, অলঙ্করণ-রীতি প্রভৃতি; এইসব জিনিস ও আবিষ্কৃত অন্য উপকরণ দিয়াই এইসব "কৃষ্টির" গোষ্ঠীবিচার ও কোষ্ঠীবিচার চলে; অবশ্য ভূতাত্ত্বিকের বিদ্যা ও অন্যান্য প্রাচীনতম পুরাতাত্ত্বিক তথ্য ও তত্ত্ব দিয়া আবার তাহা যাচাই করিয়া লওয়া হয়। পুরাতাত্ত্বিক বিচারের একটা সুসম্বদ্ধ বিবরণ—

বিশেষত প্রাগৈতিহাসিক ভারতের মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতার বিবরণ—স্টুয়ার্ট পিগটের 'প্রিহিস্টোরিক ইণ্ডিয়ায়' লাভ করা যায় (১৯৫০-এ প্রথম প্রকাশিত)। বলা বাহুল্য, এই বিচারও ক্রমশই নবাবিষ্কারে সংশোধিত হইয়া শঙ্ক হইতে শঙ্কতর হইয়া উঠিতেছে।

প্রাগৈতিহাসিক ভারতের কৃষ্টিকেন্দ্র

গোষ্ঠী বিচারের দিক হইতে একটা বড় ভাগ অবশ্য পল্লী সংস্কৃতির ও পৌর সংস্কৃতির। মৃৎ-পাত্রের সাক্ষ্যানুযায়ী তেমনি আর একটা ভাগ এই দক্ষিণ বালুচিস্তান, মোটামুটি "পীতাভ সামগ্রীর" ক্ষেত্র—উহার যোগ নিকটস্থ দক্ষিণ ঈরানের কেন্দ্রসমূহের সঙ্গে; দ্বিতীয় ভাগ উত্তর বালুচিস্তান, "রক্তাভ সামগ্রীর" কেন্দ্র—উহার যোগ উত্তর ঈরানের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে। এই দুই রকমের সামগ্রীর কেন্দ্রগুলিকে বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কয়েকটি বিশেষ স্তরে আবার ভাগ করা চলে (*Ancient India*, No 1, Stuart Piggott-এর মতানুযায়ী) সেই ভাগ ও তাহার স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

"রক্তাভ সামগ্রীর" ক্ষেত্র: প্রধানত তিনটি। যথা—

(১) "ঝোব্ কৃষ্টি": উত্তর বালুচিস্তানের ঝোব্ উপত্যকায় সুর জংগল (ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন), রাণা ঘুণ্ডাই; মোগল ঘুণ্ডাই, পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই (মধ্যবর্তী কালের নিদর্শন) প্রভৃতি গ্রামে ছিল ইহার কেন্দ্র। এইসব স্থানে মৃৎপাত্রের গায়ে কালোর সঙ্গে লাল রেখাঙ্কন দেখা যায়। মাটির তৈয়ারী ছোট ছোট স্ত্রীমূর্তি, গোরু ও লিঙ্গ-প্রতীক, মাটির ইটের বাড়িঘর, প্রস্তরের তীরের ফলা পাওয়া গিয়াছে। দেহভস্ম সমাধি দেওয়া হইত। তাম্রের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইসব এক একটি গ্রাম এক একটি ছোট কৃষিজীবীর বসতিমাত্র। কাল হিসাবে ইহারা হরপ্পার অপেক্ষা বহু প্রাচীন—ইরাকের উরুকের সময় হইতে উহার "আদি বংশের" মধ্যে।

(২) "হরপ্পা কৃষ্টি": মণ্টেগোমারি জেলার হরপ্পা ও সিন্ধু প্রদেশের মোহেন-জো-দড়ো ছিল ইহার দুই প্রধান পৌর-কেন্দ্র, তাহা ছাড়াও চানহু-দড়ো প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র নগর ছিল; আর দক্ষিণ-সিন্ধু প্রদেশে অনেক পল্লীকেন্দ্রও ছিল। পাত্রের রক্তাভ অংকনরেখায় ছাড়া ইহার সহিত ঝোব কৃষ্টির আর কোনো মিল নাই। সাধারণ ব্যবহার্য পাত্রাদি, নানা অলঙ্কৃত পাত্র, সীল, মূর্তি, পোড়া ইটের বাড়িঘর, কূপ, স্নানাগার, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি এই কৃষ্টিকেন্দ্রের বিপুল উপাদানের কথা পরে পৃথকভাবে আমাদের বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এখানে শুধু উল্লেখযোগ্য যে, "হরপ্পার কৃষ্টি ক্ষেত্রে" তাম্র ও ব্রোঞ্জের নির্মিত হাতিয়ারের অভাব নাই। খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ এর মধ্যে এ সভ্যতার কাল অনুমিত হইয়াছে।

(৩) হরপ্পার "এচ" সমাধিশালার উক্তরূপ রক্তাভ সামগ্রী। ইহাতে হরপ্পার শেষ দিককার অবস্থার নিদর্শনই পাওয়া যায়।

"পীতাভ সামগ্রীর" ক্ষেত্র, ইহার সবই কৃষিজীবীদের বাসভূমি, ইহাই প্রথম স্মরণীয়। বৈশিষ্ট্য-যুক্ত ক্ষেত্র ছিল এই সাতটি—

(৪) "কোয়েটা সামগ্রী": কোয়েটার সন্নিহিত গ্রামের আবিষ্কৃত ঐরূপ পাত্রালংকরণ—রক্তাভ রেখা এইসবে নাই। ইহা হরপ্পারও পূর্বকার বলিয়া মনে হয়: ইহা যথেষ্ট প্রাচীন—হয়ত বা ইরাকের উরুকের সমকালীন।

(৫) 'আমৃরী কৃষ্টি': সিন্ধুর এই দক্ষিণ অঞ্চলের কেন্দ্রে তাম্র গুটির ব্যবহার ছিল দেখা যায়। ইহা কোয়েটার পরবর্তী, হয়ত ইরাকের "আদিবংশের" সমসাময়িক, কিন্তু হরপ্পারও পূর্বেকার।

(৬) "নাল কৃষ্টি": দক্ষিণ বালুচিস্তানে ও সিন্ধুদেশে ইহার নিদর্শন মিলে। তাম্রনির্মিত কুঠারের ছবির প্রচলন দেখি। সম্ভবত ইহা আমৃরীর পরবর্তী ইরাকের আক্কাদের সমসাময়িক।

(৭) "কুল্লি কৃষ্টি": দক্ষিণ বালুচিস্তানে প্রস্তরের, মাটির ইটের বাড়িঘর, সীল, ক্ষুদ্র মূর্তি প্রভৃতি ছাড়া উল্লেখযোগ্য তাম্রের পিন্, আরশী প্রভৃতি। এখানে সম্ভবত দেহভস্ম সমাধি দেওয়া হইত। হয়ত নাল ও আম্রীর মধ্যকালে ইহার প্রতিষ্ঠাকাল—মোহেন-জো-দড়োর নবস্তরের প্রথম দিক তখন চলিতেছে।

(৮) "শাহী-টুম্প কৃষ্টি": ইহাও দক্ষিণ বালুচিস্তানে অবস্থিত; শবসমাধি, ও তাম্রের কুঠার, বল্লম, সীলমোহর ইহার বৈশিষ্ট্য। কাল গণনায় উহা কুল্লির পরবর্তী, হয়ত হরপ্পা মোহেন জো-দড়োর শেষ পাদের সম-সাময়িক।

(৯) "ঝুকর কৃষ্টি": মোহেন-জো-দড়োর নিকট উত্তরে অবস্থিত। নদীর পশ্চিম তীরে শুধু সিন্ধু প্রদেশে ইহার নিদর্শন মিলে, তাম্রের কুঠার, পিন্, ও ইটের বাড়িঘর পাওয়া যায়।

(১০) "ঝংগর কৃষ্টি": ইহাও সিন্ধু প্রদেশেই অবস্থিত। উত্তরে ঝুকর ও দক্ষিণে ঝংগর, দুইটি কৃষ্টির আবির্ভাব দেখা যায় চন্হু-দড়োর চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরে, (উহার প্রথম তিন স্তর হরপ্পার অন্তর্গত ও সমকালীন)—অর্থাৎ হরপ্পার যুগ তখন শেষ হইতেছে।

এই পুরাবস্তু ও কৃষ্টি-পীঠিকা হইতে প্রথম যাহা বুঝা গিয়াছিল তাহা এই যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই অতি-প্রাচীন কৃষ্টি আসলে ঈরান-ইরাকের এই ধরনের প্রাচীন কৃষ্টির মতই ছিল প্রাথমিক কৃষিজীবী সমাজের কৃষ্টি। তাহাদের গ্রামগুলি ছিল একব দুয়েকের ক্ষুদ্র গ্রাম। জীবন মোটামুটি ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ-শূন্য শান্তির জীবন (?); কারণ, গ্রাম রক্ষা করিবার মত ব্যবস্থা প্রথম পাওয়া যায় নাই। বৃষ এই কৃষিজীবীদের সুপরিচিত; পার্বত্য ছাগ ও হরিণ শিকারও চলিত। বিচ্ছিন্ন গ্রামে স্বয়ংসচ্ছল পল্লীসমাজ ধীরে সুস্থে চলিত; গতায়াত, বিনিময়, ব্যবসা বড় নাই। বাড়িঘর কখনো মাটির ইটের গাঁথুনির, কখনো পাথরের ইটের। ধাতুর মধ্যে তাম্রের প্রচলন আরম্ভ হইতেছে (ঝোব্ কৃষ্টিতে অবশ্য তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই); পল্লীর কারুবৃত্তিও কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। নানা কেন্দ্রের মৃৎপাত্রের অঙ্কনরীতি বিচার করিলে এখানে অন্তত গুটি ছয়েক বিশিষ্ট অঙ্কনরীতির ('স্কুলস্ অব পেণ্টিং') পরিচয় পাওয়া যায়,—সবলতা ও উদ্ভাবন-কুশলতা সহজেই চক্ষে পড়ে। রেখার ও রঙের সবল সুনিশ্চিত প্রয়োগ ও ভারসাম্য, প্রকল্পনীয় ('ডিজাইন')—এসব হইতেই বুঝিতে পারি—এই বর্বর-জীবনেও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটিয়াছে। (২) এই কৃষ্টি মূলত প্রাচীন ঈরানের কৃষ্টিকেন্দ্রের শাখা—ইরানের কেন্দ্রের সহিতও স্বভাবতই সমুদ পথে সম্পর্কিত। মূল বা কাণ্ডের কোনো একটি বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি শাখায় পৌঁছিতে বিলম্ব হয়, তাই সমপর্যায়ের সামগ্রীও কালানুসারে ভারতীয় শাখায় আবির্ভূত হয় (ইরাকী-ঈরানী) মূলের অপেক্ষা অনেক পরে, এইরূপ অনুমান করা চলে। (৩ কালানুক্রমে ইহার কাল খৃীঃ পূঃ ৩,২০০ হইতে খৃীঃ পূঃ ১৫০০ এর মধ্যে বলিতে পারা যায়। 'হরপ্পার কৃষ্টিধারার' (খৃীঃ পূঃ ২,৩০০ = "ইরাকের আদিবংশ" হইতে খৃীঃ পূঃ ১,৫০০, = ইরাকের "উরের তৃতীয় বংশ", কিংবা তৎপরবর্তী 'ইসিন লর্সা'র সমকাল, পর্যন্ত) তুলনায় কোয়েটার সামগ্রী ও আম্রীর কৃষ্টি প্রাচীনতর (খৃীঃ পূঃ ৪,০০০—৩,৫০০); কুল্লির কৃষ্টি হয়ত আংশিকভাবে হরপ্পার সমসাময়িক; নালের কৃষ্টি কতকটা সমসাময়িক কতকটা পরবর্তী, ঝুকর, শাহীটুম্প, ঝংগর প্রভৃতি হরপ্পার পরবর্তী উহার 'এচ্'-সমাধিশালার সমকালীন (১,৫০০—১০০০ খৃীঃ পূঃ)। হয়ত [illegible] কৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা হরপ্পার কৃষ্টিধারারও সূচনার আভাস পাই—যদিও হরপ্পার সুনিশ্চিত উদ্ভবক্ষেত্র এখনো অজ্ঞাত।

'হরপ্পা'র, সভ্যতা ক্ষেত্র

মোহেন জো-দড়ো ও হরপ্পার নামই আমাদের নিকট সুপরিচিত। 'সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা' বলিলে আমরা বুঝি প্রথমত মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কারাবলীকে, দ্বিতীয়ত হরপ্পার লুপ্তাবশেষকে।

কিন্তু তাহার পরেকার বিশ বৎসরে (১৯৭৬-এর মধ্যে) আরব সমুদ্রের তীর হইতে প্রায় সিমলা শৈলের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশে—পূর্বে যাহার কাঠিয়াবাড় রাজপুতানার মরুভূমি, পশ্চিমে ওয়াজিরস্তান বালুচিস্তানের সীমানা, উত্তরে হিমালয় - ইহার মধ্যে এই এক হাজার মাইল দীর্ঘ ভূ-ভাগে—সুমের সভ্যতার তুলনায় এই সভ্যতার ক্ষেত্র উহার অপেক্ষাও তিনগুণ বড়—সিন্ধু ও পাঞ্জাবের (ও বাহাওয়ালপুর), এই সমতল ক্ষেত্রে সেই 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার' ৩৭টি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত উহার ১টি ছাড়া [কোটলা নিহান্ খাঁ ?] বাকি সবগুলিই ১৯৪৭-এর পরে পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অবশ্য সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হরপ্পা ও মোহেন জো-দড়ো, এই দুই নগর, এবং পরে আবিষ্কৃত সিন্ধুপ্রদেশের চান্‌হু-দড়ো ও লোহুম-জো-দড়ো ; অন্যগুলি শহর নয়, গ্রাম মাত্রের ধ্বংসাবশেষ। পুরাতাত্ত্বিকের খাতায় ইতিমধ্যে সমগ্র 'সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার' নামকরণ হইয়াছে 'হরপ্পা সভ্যতা' বলিয়া ;—কারণ, আবিষ্কারাবলীর দিক হইতে হরপ্পাই নাকি এই সমগ্র সভ্যতার প্রতিনিধিস্থানীয়, যথার্থ পরিচায়ক।

১৯৪৭ হইতে ভারতরাষ্ট্রের মধ্যেও এই হরপ্পার ধারার কেন্দ্র পশ্চিম-উপকূলের সবরমতী ও নর্মদার তীরে, রাজপুতনায়, পূর্বপাঞ্জাবে, উত্তর প্রদেশের মীরাট জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। অর্থাৎ 'সিন্ধু সভ্যতা' বা 'হরপ্পা সভ্যতা' বলিতে এখন এইসব ভারতীয় কেন্দ্রসমূহকে বুঝায়। পশ্চিম ও মধ্যভারত এই সভ্যতা-ক্ষেত্র। তথাপি কোনো নাম স্থির না হওয়া পর্যন্ত ইহাকে 'হরপ্পা সভ্যতা' বলা চলিতেছে।

'হরপ্পা'র প্রধান কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধে দুই একটি তথ্য না জানিলে চলে না।

পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টেগোমারি জেলায় হরপ্পা অবস্থিত। সেখান হইতে মণ্টেগোমারি শহর ষোল মাইল ; গ্রামটির দক্ষিণ পশ্চিমে ভগ্নস্তূপ। দুইটি মোট প্রায় সাড়ে তিন মাইল চক্ররেখার মধ্যে এই ধ্বংসক্ষেত্র। উত্তরে মাইল ছয় দূরে রাবি নদী ; এক কালে উহার দুইটি শাখার সঙ্গমস্থল নগরের পার্শ্বে ছিল—হয়ত সেই বন্যার ভয়েই নগরের বাঁধ বা প্রাকারও বর্তমানের প্রধান ধ্বংসস্তূপের (এ, বি) চারিদিকে প্রথম নির্মিত হইয়াছিল - পরে তাহার উপর রচিত হয় পুরপ্রাচীর। ঊনবিংশ শতকের পুরাতাত্ত্বিকেরা (ক্যানিংহাম) এইরূপ প্রাচীরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন বটে : কিন্তু হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ তখন এতই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর তাহা হইতে নিকটের পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বহুকাল ধরিয়া এত ইট বহিয়া লইয়া গিয়াছে, এমনকি, নিকটস্থ লাহোর-মুলতানের একশত মাইল দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণের কালেও এখান হইতে পাথরের টুকরা এত বেশি পরিমাণে গৃহীত হয়, যে, হরপ্পার এই প্রাচীর-প্রাকার (এ, বি চিহ্নিত) বা মূল নগরের রূপ চিনিবার উপায় আর সহজ রহে নাই। সে তুলনায় মোহেন-জো-দড়ো রক্ষা পাইয়াছে বেশি—যদিও সিন্ধুর বন্যায় পুরাকালেও দুই নগরই বারেবারে বিনষ্ট হইত। পুরাতাত্ত্বিকেরা হাত দিতেই (১৯২২-৪৪) মোহেন-জো-দড়োর অভাবনীয় রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। হরপ্পায় দয়ারাম সাহনির (১৯২১-এর জানুয়ারীতে খনন আরম্ভ করেন) পরে হরপ্পার বিশদ পরিচয় প্রথম উদ্ঘাটন করেন (১৯২৬-৩৪) এম্-এস্-ভাট ; আর উহা এখন আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে মার্টিমার হুইলার (***Ancient India***, No. 3. 'Harappa 1946' by R. E. M. Wheeler) প্রমুখের সেই স্তূপ খননে (Mound A, B) ও সমাধিক্ষেত্র (Cemetery R 37) খননে।

মোহেন্‌জো-দড়ো ('মৃতের ঢিবি') হরপ্পা হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে সিন্ধু প্রদেশের লাড়্‌কানা জেলায় অবস্থিত (রেল স্টেশন ডোকুরি, ৮ মাইল দূরে)। অনেককাল হইতে এই ধ্বংসাবলী পড়িয়া আছে—এখনো তাহা প্রায় এক বর্গ মাইল বিস্তৃত। বিস্তৃত ধ্বংসক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয় এক অদ্ভুত নগর, সেই মূল ধ্বংসমালার পশ্চিমে এখানেও ৭০। ৮০ ফিট একটি বিচ্ছিন্ন ঢিবি দেখা যায় (নাম 'Stupa Mound')। তাহাতে কুশান আমলের একটি ইটের বৌদ্ধ স্তূপ আছে, উহার আভাস দেখিয়াই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-২১এ) প্রথম আকৃষ্ট হন।—ঐক্ষেত্রেই খননের পরে সুপ্রসিদ্ধ স্নানাগার, বিদ্যালয়, স্তম্ভগৃহ প্রভৃতি শক্তিশালী শাসন-পদ্ধতির অনেক উপাদান প্রথম মিলে—হরপ্পার পশ্চিম স্তূপের উত্তর দিকেই যেমন পরে মিলে (শ্রীযুক্ত ভাটের

খননে) মজদুর-বস্তি, শস্যাগার প্রভৃতি। অবশ্য সেই বৌদ্ধ-স্তূপের তলায় এখানে প্রাচীনতর বস্তু কী আছে তাহা না খুঁড়িতে মোহেন-জো-দড়োর পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। এতদিন পর্যন্ত বলা হইত—মোহেন-জো-দড়োতে এমন অপূর্ব পৌর-জীবনযাত্রার সমস্ত উপকরণ পাওয়া গেলেও কোনো একটা বড় প্রাসাদ, বড় মন্দির, অর্থাৎ সমসাময়িক সুমের-আক্কাদ বা মিশরের মত কোনো এক প্রবল ক্ষাত্রশক্তির বা ব্রাহ্মণ্যশক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; অস্ত্রশস্ত্রও বিশেষ পাওয়া যায় নাই। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বরং বণিক-ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতিতে বিভক্ত একটা অধিকতর অগ্রসর পৌর সভ্যতার। অর্থাৎ এই সভ্যতা যেন এক শান্ত নিরুপদ্রব পুরাতন বণিকতন্ত্রের ('বুর্জোয়া ইকোনোমির') প্রমাণ, পুরাকালীন পুরাধিপতিদের শাসনের ('citadel rule' এর) প্রমাণ নয়! কিন্তু মোহেন-জো-দড়োর এই স্তূপস্থলের মতই হরপ্পারও পশ্চিম দিককার সেই ঢিবি (এ, বি); মার্টিমার হুইলার তাহা খনন করিয়া (১৯৪৪-৪৬) প্রাকার-প্রাচীর-বেষ্টিত এক সুরক্ষিত পুরেরই প্রমাণ পাইয়াছেন। আর তাই তাঁহার বিশ্বাস মোহেন-জো দড়োর এই স্তূপতলও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন—'ঢিবি' দুইটির মিল নিতান্ত তুচ্ছ নয়। মোহেন-জো-দড়োর মতই স্তূপের ঠিক পার্শ্বেই তেমনি ভাগ-করা মজদুর ব্যারাক রহিয়াছে, তেমনি শস্যাগার ও ধান ভাণ্ডার উচ্চ চাতাল পাওয়া গিয়াছে;—এই সবে এক সুশৃঙ্খল কেন্দ্রীয় পৌরাধিপত্যের (citadel rule) ইঙ্গিত এখনো যথেষ্টই মিলে (তুল. পৃঃ ৬৭)।

ইহার পর আবার ১৯৪৭-এর পরে ভারতেও এই সভ্যতার ধারার কেন্দ্রসমূহ আবিষ্কৃত হইতেছে। এরূপ আবিষ্কার শেষ হয় নাই।

সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতার ধারণাই এইভাবে এখন পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে। এই সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করেন প্রধানত পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড্। তাঁহার মতে সুমের-আক্কাদের 'এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ ও সভ্যতার'ই সগোত্র এই পৌর-সভ্যতা। সম্ভবত তিনিই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে ইহাদের জীবনযাত্রার সম্বন্ধ প্রকাশ করেন। তখনো ইহার রাষ্ট্রশক্তির স্বরূপ জানা যায় নাই, মার্টিমার হুইলারের আবিষ্কারের ফলেও কোনরূপ পুরাধিষ্ঠিত পরাক্রান্ত শাসকশক্তির নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

হরপ্পার কৃষ্টি-পরিচয়

হরপ্পা সমস্ত সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় বহন করে বলিয়া এখন গ্রাহ্য হইয়াছে। মোহেন-জো-দড়োর কথা পূর্বেও বহুল প্রচারিত হইয়াছে; তাহার দান গুরুত্বে ও পরিমাণে অতুলনীয়। হরপ্পার আবিষ্কারমালার যথাযথ বিবরণ পুরাতত্ত্ব বিভাগের কৃপায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে পরে, তাহার মূল্য এখনো সুস্পষ্ট হয় নাই। ***Excavations of Harappa***—M. S. Vats; Archaeological Survey of India, 1940, 2 Vols.)। কিন্তু সেই দান যে কত গুরুতর তাহা পূর্বে শ্রীযুত ভাটের আবিষ্কৃত এই কয়টি তথ্য হইতেই অনুমিত হইয়াছিল। প্রথমত, মোহেন-জো-দড়োরও পূর্বে হরপ্পার জন্ম—এখন হইতে প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্বে,—তাহার জীবনও হইয়াছিল দীর্ঘতর। অলংকৃত মৃৎপাত্র, পোড়া মাটির, পাথরের, পর্সিলেন জাতীয় সীল বা মুদ্রাই হরপ্পার প্রাচীনতম যুগের চিহ্ন; আর উহার সমাধিক্ষেত্রে (Cemetery H) আছে উহার সর্বশেষ যুগের নিদর্শন। দ্বিতীয়ত, হরপ্পার মুদ্রাগুলির আকার বহুবিধ, কিন্তু একমাত্র ঘড়িয়াল ছাড়া অন্য প্রাণীর চিত্র সেই মুদ্রাসমূহে নাই। অন্যদিকে সমাধিক্ষেত্রের (Cemetery H) পাত্রে হরিণ, ছাগ, বৃষ, ময়ূর, চিল, মাছ ছাড়াও গাছ, পাতা, এমন কি নক্ষত্র পর্যন্ত সুদক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। অথচ হরপ্পার গার্হস্থ্য জীবনের পাত্রাদিতে শুধুই সরল জ্যামিতিক রেখার অঙ্কনমালা দেখা যায়। শব-রক্ষার পাত্রের চিত্রগুলি তাই তাহাদের শব সংস্কারের আচার ও ধর্ম-বিষয়ক ধারণার প্রমাণ। তৃতীয়ত শবাবশেষ পরীক্ষা করিয়া জাতি-বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতেছেন—ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধান প্রধান জাতিদের সকলেরই পূর্বজদের দেহাবশেষ এখানে রহিয়াছে; কোনো একটি বিশেষ জাতি, অবিমিশ্র

থাটি জাতি, এখানে বাস করিত, তাহা বলা চলে না। চতুর্থ কথা. সমাধিভবনের উপরিতলে পাওয়া যায় জালায় নিহিত শব, আর নীচেকার তলায় তাহার ব্যবহারার্থ তৈজসপত্র। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, এই কৃষি সভ্যতার পৌর-পর্বের পক্ষে যাহা উল্লেখযোগ্য – নগরের উত্তরে অবস্থিত প্রকাণ্ড ধর্মগোলা ; উহা প্রকোষ্ঠে ও বারান্দায় বিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুবিশাল। উহার দক্ষিণে রহিয়াছে শস্য ভাণ্ডার উচ্চ চাতাল—কাশ্মীরে, বাঙলায় এখনো যাহার অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। ষষ্ঠ, অধিকতর বিস্ময়োৎপাদক : এই পৌর কৃষি-সংস্কৃতি তাহার কারুশালার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে, মূল স্তূপের উত্তর-পশ্চিমে শস্যের চাতালের দক্ষিণে, সুবিন্যস্ত মজদুর বস্তি (Workmen's quarters)-কথিত ১৪টি ক্ষুদ্র সুপরিকল্পিত গৃহে। সপ্তম,—ইহার তাম্ররথ এবং তাম্র জালায় আবিষ্কৃত ৭০টি অস্ত্র ও উপকরণও হরপ্পার এই স্তরের জীবনযাত্রার এক মূল ভিত্তির সন্ধান দেয়। অষ্টমও তাহাই—মাটি ও তামা গালাইবার উপযোগী ১৬টি চুল্লী। ইহা ছাড়াও হরপ্পায় শ্রীযুক্ত ভাট আবিষ্কার করেন ইহার সামাজিক-মানসিক অগ্রগতির পরিচায়ক সুদক্ষ কারুকর্ম নগ্নমূর্তি, এবং সোনা. রুপা, নানা পাথর ও কড়ির নানা অলংকার, বলয়, মালা প্রভৃতি।

হরপ্পার সেই আবিষ্কারমালা হইতে আমরা বেশ দেখিতে পাই, অন্যান্য পৌর-সভ্যতার মত এই সভ্যতাও অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, কৃষি-সভ্যতার মধ্যে কারুশিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে। সামান্য উন্নতিও নয়, শ্রমবিভাগ, শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী বৈষম্য বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

শব-সৎকার-প্রথা হইতে মনে হয়, হয়ত পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং প্রেতলোক ও পরলোকে বিশ্বাস বেশ প্রবল ও প্রচলিত ছিল। নানা বিলাসোপকরণ হইতে যেমন হরপ্পার অধিবাসীদের রুচির সন্ধান পাই, তেমনি নগ্নমূর্তি, শিল্প ও শবাধারের চিত্র হইতে তাদের ধর্মবিষয়ক ধারণা ও শিল্প-প্রয়াসেরও একটা পরিচয় লাভ করি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কথা যে, অস্ত্রশস্ত্র পাওয়াতে মনে হয়—যুদ্ধ, আক্রমণ, আত্মরক্ষার কথাও ইহাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইয়াছে, হয়ত আক্রমণেই এই নগর বিধ্বস্তও হইয়াছে। সুমের আক্কাদ প্রভৃতি এশিয়াটিক পৌর-সভ্যতার মত মোহন-জো-দড়ো বা হরপ্পার কোনো সামরিক শক্তির চিহ্ন উন্নত রাজপ্রাসাদ বা বিরাট মন্দির ইত্যাদি খুঁজিয়া না পাইয়া ইহাদিগকে শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র বলিয়া কল্পনা করা হইত (পূঃ পৃঃ ৬৭)। সম্ভবতঃ তত শান্তিপূর্ণ রাজ্য তাহা বরাবর ছিল না।

মোহেন জো-দড়োর সভ্যতা সম্পদ

মোহেন জো দড়োর আবিষ্কার-মালা অপ্রতুল। কিন্তু তাহার খুঁটিনাটির বিশেষ পরিচয় আর না লইয়া এখানে শুধু এই কয়টি জিনিস উল্লেখ করিলেই চলে : (***Mohen-jo daro and the Indus Civilisation***, Sir J. Marshall, ও ***The Indus Civilisation***, Mackay, দ্রষ্টব্য)—মোহেন-জো-দড়োতে আমরা পাইয়াছি নগর-বিন্যাসের সুষ্ঠু চিহ্ন। সেখানকার পৌর-জীবনযাত্রার তাহা এক স্মরণীয় মাপকাঠি। যথা—নগরের সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত রূপ, উহার পোড়া ইট ও কাদার গাঁথুনির বহুতল বাড়ি, উত্তর-দক্ষিণে সরলগামী রাজপথ, নগরের জলনিষ্কাশনের প্রণালী ; গৃহস্থের ও সাধারণের স্নানাগার—যাহার চিহ্ন ভারতে পরবর্তী কালে আর পাওয়া যায় না। বাস্তুশিল্প ছাড়া অন্য শিল্প দেখিতে পাই কার্পাস বয়ন, সেই পোড়ামাটির, পাত্রাদি, পাথরের, সোনারুপো ও অন্যান্য ধাতব তৈজসপত্র দ্রব্যাদি। ব্যবসায় যানবাহন নৌকা, আস্ত কাঠের গো-শকটের চক্র (এখনো সিন্ধু দেশে চলিতেছে) প্রভৃতি আছে। তাহা ছাড়া আছে আবার লিপি ও লেখা—আজও উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। কিন্তু এই সভ্যতার মূল বনিয়াদ—প্রধানত ধান্য নয়, গম ও যব,—তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। তবে এই পৌরসভ্যতা সেই কৃষিসংস্কৃতিরই এতদঞ্চলে এক অদ্ভুত উন্নতির নিদর্শন। কৃষিগত উপকরণের মধ্যে মোহেন-জো-দড়োতে উল্লেখযোগ্য সেখানে প্রাপ্ত গম ও যব, আর সেখানকার মুদ্রায় আঁকা সুস্পষ্ট ভারতীয় বৃষ। (এই বৃষই পরে

শিবের নন্দীতে পরিণত হইবে)। ইহা ছাড়া সেখানকার আরশি, চিরুণী, পুঁতির মালা ও অন্যান্য অলঙ্কার আরও উন্নত জীবনধারার চিহ্ন বহন করিতেছে। আর মোহেন-জো-দড়োর মুদ্রায় ও পাত্রে খোদাই অসংখ্য উল্লেখযোগ্য প্রাণীচিত্র, হরপ্পার (সমাধিশালার পাত্র ছাড়া) সাধারণ পাত্রের জ্যামিতিক শিল্পধারা হইতে উহার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছে এবং জানাইতেছে, মোহেন-জো-দড়োর অধিবাসীদের শিল্পে প্রকৃতি-পরিচয়, প্রকৃতি-অনুরাগ ও প্রকৃতি-অনুকৃতি। এইরূপ চিত্রাবলীর মধ্যেও আবার বিশেষ লক্ষণীয় বৃক্ষ (অশ্বত্থের ?)-চিত্র, যোগী-মূর্তি (যোগের প্রক্রিয়া তখনি কি চলিতেছে ?) আদি দেবীমূর্তি (Magnum Mater), লিঙ্গমূর্তি ইত্যাদি।—অধিবাসীদের মানসরূপের আভাস এই সবে আমরা লাভ করি। এইসব অনেক নিদর্শনই আমরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্রেও পাই। তাই এইসব সামগ্রী মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সুমের সভ্যতা, এমন কি ভূমধ্যসাগর ও এশিয়ানিক (Asianic) সভ্যতার সহিত এই সিন্ধুসভ্যতার যোগাযোগ সূচিত করে। অথচ কুঠার, ছুরি, করাৎ, বর্শার ফলা হইতে ইহাও সুস্পষ্ট—সুমের বা উরের সভ্যতা হইতে ইহা স্বতন্ত্রও (***Ancient India***, Masson-Oursel, Grabowska & Stein, দ্রষ্টব্য)।

হরপ্পার রূপ-বিভাগ

ইহার পরে হরপ্পার এই জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের নতুন তথ্য জোগাইলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মর্টিমার হুইলার সাহেব। ১৯৪৬-এ তিনি হরপ্পার সেই পশ্চিমস্থ 'ঢিবি' (মাউণ্ড এ-বি) খনন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহা সংক্ষেপে এই (দ্রষ্টব্য ***Ancient India***, No 3, পৃঃ ৬৪) : —আবিষ্কৃত সর্বপ্রাচীন মৃৎপাত্রাদি ঠিক হরপ্পার পরিচিত রীতির নয়। তখনকার দিনে পুনঃ পুনঃ বন্যার প্রকোপও দেখা যায়। হরপ্পার নিজস্ব কৃষ্টি যখন পরিণত হইতেছে বুঝা যায়, তখন এই স্থলটিও বাঁধ ও প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়। সেই রক্ষা-প্রাচীর মোটামুটি চতুষ্কোণ—দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ গজ, প্রস্থ ২০০ গজ। প্রাচীরের পশ্চিমে একটি প্রবেশদ্বার—উহার প্রবেশপথ ঘুরানো, সম্ভবত আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনেই উহার ভিতরের দিকে বেদী থাক্-করা (terraces)। উত্তরের দ্বার কিন্তু তাহা নয়। সম্ভবত উহাই প্রধান প্রবেশদ্বার। এই প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল মাটির ও মাটির ইটের এক ১০।২০ ফিট উচ্চ বাঁধ বা প্রাকারের উপর। বন্যার জন্যই বাঁধ, তাহা বুঝা যায়। আর, কাজেই উহাতে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন উর নগরের অনুরূপ বাঁধের কথা মনে পড়িবে। বাঁধের উপরকার প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল মাটির ইট দিয়া। চতুষ্কোণ বুরুজ বা প্রহরীপ্রকোষ্ঠ প্রাচীরের বহির্গাত্রে ছিল। অভ্যন্তরের দিকে দেখা যায় —এই প্রাচীর নির্মাণের সময়ে মূল দুর্গাদির ভিত্তিতল হিসাবে প্রায় ৩৩ ফুট উচ্চ করিয়া মাটি ও মাটির ইটের মঞ্চ বাঁধানো হয়। সমগ্র রক্ষাব্যবস্থায় অন্তত তিনটি প্রধান যুগের আভাস রহিয়াছে—যেমন, উত্তর-পশ্চিম কোণ দেখিয়া মনে হয় প্রথম যুগের অনেককাল পরে যখন প্রাচীরের সংস্কার করা হইল তখন প্রাচীরের বেধ আরও চওড়া করা হয় আর প্রাচীর শক্ত করা হয় পূর্বের মত ইটের টুকরা দিয়া নয়, আস্ত ইট দিয়া। এই মধ্যযুগই "হরপ্পা সভ্যতার" ঐশ্বর্যের যুগ। ইহার পরে দেখি—সেই উত্তর-পশ্চিম দিকে আর একটি প্রহরী কোণ নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিমের প্রবেশদ্বার প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। বুঝি হরপ্পা আত্মরক্ষার চেষ্টাকল্পে উৎকণ্ঠিত। ইহার পরে হয়ত ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে—পশ্চিমের বেদীর উপরে যে (চতুর্থ যুগের) নিকৃষ্ট ধরনের বাসগৃহের ধ্বংসাদি পাওয়া যায় উহা পরবর্তী যুগের, সমাধিশালা 'এচ'-এর মৃৎপাত্রাদিতে যাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

হরপ্পার প্রাচীন ও অর্বাচীন এই আবিষ্কৃত বস্তু মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কৃত তথ্যের সহিত মিলাইয়া মিলাইয়া মিঃ মর্টিমার হুইলার নিঃসংশয় হন যে, সুমের ও আক্কাদের সমসাময়িক সভ্যতার মত হরপ্পাও বণিকতন্ত্রের নয়, ক্ষাত্রশক্তিরই কেন্দ্র ছিল ; বল চালনায় ইহার রাষ্ট্র অভ্যস্ত, সবল হস্তেই তাহারা শাসন করিতেন। তবে এখনো এই কেন্দ্রে উর প্রভৃতির মত কোনো মন্দির আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই কেন্দ্রে পুরোহিত রাজের শাসন ছিল, এই কথা তাই বলা চলে না। হরপ্পার নানা প্রমাণ মিলাইয়া তিনি হরপ্পা সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি কালকে মনে করেন—মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ কাল পর্যন্ত। আর হরপ্পার দুর্গটি বিভিন্ন নির্মাণপর্বের (মোহেন জো-দড়োতে পাওয়া যায় দশটি পর্ব) বিকাশ ধারা লক্ষ্য করিয়া মনে করেন মোটামুটি সিন্ধুসভ্যতার গতিবেগ তীব্র তো নহেই, বরং ধীরভাবে পরিণতি লাভ করে, সুস্থিরভাবে চলে। আর এই প্রমাণাবলীর আদি অন্ত লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে করেন—এই সভ্যতাস্রষ্টাদের পূর্বে যাহারা এই কেন্দ্রে বাস করিত তাহারা পল্লী বা ক্ষুদ্রনগরবাসী ছিল। তাহাদের পাত্রাদি হইতে এই পরিণত হরপ্পা সভ্যতার তুলনায় তাহাদিগকে ভিন্ন জাতির বা ভিন্ন গোত্রের বলিয়া মনে হয়। আর, হরপ্পার 'এচ' সমাধিস্থলী ও 'আর ৩৭' সমাধি-স্থলীতে প্রাপ্ত পাত্রাদি ও পশ্চিমস্থ পুরবেদীর উপরকার নিকৃষ্ট ধরনের গৃহাদি হইতে বুঝা যায়—ইহাও সেই হরপ্পার পরিণত সভ্যতার অধিকারীদের নহে—কোনো আগন্তুক গোষ্ঠীর। এই আগন্তুকরা "আর্য আক্রমণকারীও হইতে পারে'—গর্ডন চাইল্ড ১৯৩৪ সনেই এই অনুমান করিয়াছিলেন। —মোহেন জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপ বিশেষতঃ মৃতদেহের অবস্থা হইতেও সেইরূপ আকস্মিক আক্রমণ ও বিপর্যয়ের আভাস পাওয়া যায়।

গত ২০ বৎসরে (১৯২৭ এর পরে গুজরাতে রাজপুতনায়ও এই ধারার প্রাগৈতিহাসিক পৌর কেন্দ্র আরও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কথা বলা তথাপি দুঃসাধ্য—এই সকল শহর কি একটি বিরাট সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না, প্রতি বৃহৎ কেন্দ্রে ছিল এক একটি শক্তিশালী দুর্গাধিষ্ঠিত রাষ্ট্র। ইহার মধ্যেও মোহেন জো দড়োই ধ্বংসলীলায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

আনুমানিক সমাজরূপ

নৃতত্ত্বের বিবেচনায় হরপ্পার সভ্যতা কোনো একটি বিশেষ 'জাতির' সৃষ্টি বলিয়া স্থির হয় নাই। নানা জাতির সংমিশ্রণ পূর্বেই ঘটিয়া থাকিবে, আর সেই মিশ্রিত জাতিরই এই সভ্যতা। সমাধি শালার মৃতদেহের পরীক্ষায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষী জাতিদের সংস্কৃতিতে, সভ্যতায় যোগাযোগ থাকিবার কথা, নর্মদা তীরে, সবরমতী তীরে পর্যন্ত কেন্দ্র আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহা সম্ভব মনে হয়। প্রাচীন দ্রাবিড়েরা উচ্চ সভ্যতার অধিকারী ছিল, পৌর সভ্যতারও স্তরে পৌঁছিয়াছিল। জলপথে পশ্চিম উপকূল দিয়া বহুদূর পর্যন্ত নানা কেন্দ্রে এক সময়ে তাহাদের বিস্তার ছিল। বর্তমানকালেও বালুচিস্তানের সেই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী মুসলমানধর্মাবলম্বী ব্রাহুই জাতি রহিয়া গিয়াছে। ইহাদের অস্তিত্ব এই দ্রাবিড় ব্যাপ্তি এবং 'হরপ্পা সভ্যতার সহিত দ্রাবিড় ভাষীদের নৈকট্যের আরও প্রমাণ। কিন্তু জাতি হিসাবে কিংবা সভ্যতা হিসাবে তাই বলিয়া সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতা অভিন্ন, এমন প্রমাণও নাই। বরং হরপ্পা সভ্যতার সহিত পশ্চিমের সুমের আক্কাদ সভ্যতার যোগাযোগের প্রমাণ বেশি সুস্পষ্ট।

হরপ্পা-সভ্যতার লিপিমালা পঠিত না হইলে ভারতবর্ষের এই প্রাচীনতম সভ্যতার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আমাদের জানিবার উপায় নাই। আবিষ্কারাবলী হইতে তবু আমরা যাহা জানিয়াছি তাহাও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পক্ষে যুগান্তকারী। আমাদের সে জ্ঞান পুরাতাত্ত্বিকদের চেষ্টায় ক্রমে আরও স্থিরতর হইয়াছে, আমরা হরপ্পা সভ্যতার মোটামুটি সামাজিক রূপও এখন অনুমান করিতে পারি দ্রষ্টব্য গর্ডন চাইল্ড্, ***What Happened in History***, Pelican, P 111 ff, M. Wheeler, ***Ancient India***, ও Piggott, ***Some Ancient Cities of India***)। যেমন হরপ্পা সভ্যতার শাসকেরা কোনো পুরোহিত রাজা ছিলেন কিনা তাহা এখনো বলা যায় না। কিন্তু তাহারা যে সুমের-আক্কাদ প্রভৃতি এশিয়াটিক সামন্তশক্তির মত সামরিক শক্তির অধিকারী পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন, দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাহাতে ক্ষমতা কেন্দ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট।—(হুইলার ও পিগট্)। এই রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয়েই অবশ্য বণিক ব্যবসায়ী শ্রেণীও মোটামুটি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে,

তাই বলিয়া "বণিকতন্ত্র" প্রচলিত হইয়াছে (পূর্বে তাহাই অনুমিত হইত), এরূপ বলা চলে না। তখন তাম্র ও ব্রোঞ্জের (টিন ও তাম্র মিশ্রিত দস্তা) যুগ। তাম্র আসিত রাজপুতানা ও বালুচিস্থান হইতে; টিন ও নানা মূল্যবান প্রস্তর আসিত ভারতের বাহির হইতে; শিল্পের জন্য দেবদারু কাঠ আসিত হিমালয় প্রদেশ হইতে। বাণিজ্যের সুপ্রচলন না হইলে এইসব সংগ্রহ সম্ভব হইত না; আক্কাদ-সুমেরের প্রাচীন ধ্বংসাবলীর মধ্যেও হরপ্পার উপকরণ লাভ করা যাইত না। এমন কি আরব সমুদ্র হইতে মোহেন-জো-দড়োতে মৎস্য চালানও আসিত (গর্ডন চাইল্ড)। বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যই যে উৎপাদন বাড়িয়েছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম কী, সোনা, রূপা, তাম্রমুদ্রা, না অন্য কিছু, তাহা জানা যায় না। অনেক গৃহের সঙ্গেই শস্যাগার রহিয়াছে; বুঝিতে পারি গৃহস্বামী বণিক। ইহাদের সংখ্যার ও সম্পদের তুলনায় সাধারণ ঘরগুলি এবং 'মজুরপাড়ার' মাটির ইটের দো-খুপরীর ঘরগুলি অধিকারীদের দুরবস্থার পরিচায়ক (গর্ডন চাইল্ড)। সমাজে আয়-বৈষম্যের ও শ্রেণীভেদেরও উহা পরিচায়ক (চাইল্ড, হুইলার, পিগট)। মেসোপটেমিয়ার মন্দির-সংলগ্ন কারিগরদের বস্তির কথা উহা মনে করাইয়া দেয়। জানিবার উপায় নাই—ইহারা ক্রীতদাস ছিল, না, অর্ধদাস কারিগর ছিল। এই কথা বলা যায়—সমাজে ক্রীতদাস নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু ক্রীতদাস প্রথাই উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন, এমন কোনো প্রমাণ এই সভ্যতায় নাই। এ সভ্যতাকে 'এশিয়াটিক সামন্ত সমাজেরই' সগোত্র বা অন্তর্ভুক্ত ভাবা বোধ হয় পূর্বোক্ত এইসব কারণে অযৌক্তিক নয়। পথঘাট, জলপ্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারি পৌরকর্তৃত্বও অপরিণত নয়; কর্মক্ষম ও শাসনক্ষম। যে চিত্রাক্ষর এখনো পড়া যায় নাই তাহা সমস্ত সিন্ধু উপত্যকায় তখন সুপ্রচলিত, ইহাও কম সমাজ সংহতির কথা নয়। পাত্রাদির গায়ে সুস্থির জ্যামিতিক অংকনরীতি শুধু শিল্পবোধের সাক্ষ্য নয়, হয়ত জ্যামিতিক জ্ঞানও সুমের-আক্কাদের সমতুল্য বিজ্ঞান-চর্চারও প্রমাণ। টোটেম ও ফলন-কামী যাদুর (fertility magic) ঐতিহ্য-প্রভাবে যে ক্রমশ লিঙ্গাদি দেবপূজার বস্তু হইয়াছে, তাহাও দেখি। এইরূপ কুম্ভকারের চাকা, গো-শকটের চাকা, শস্য-ভাণ্ডার উপকরণ, বৃষ, যোগী, বৃক্ষাদি ও মোহেন-জো-দড়োর দোকানের বাঁধা সারি হইতে ভারতবর্ষের এখনকার জীবনযাত্রার কথাই অনিবার্যরূপে মনে পড়ে। "সিন্ধু উপত্যকার শহরের সেই বসন পরিধানরীতি এখনো এই (পাঞ্জাব) অঞ্চলে অচল নয়। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের এইসব চিত্রিত অনুষ্ঠানে বর্তমান হিন্দু দেবদেবীর মূল রহিয়াছে। হিন্দু বিজ্ঞানের ও তাহার মারফত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও অপ্রত্যাশিত ঋণ রহিয়াছে ইহার নিকট। ভারতের ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। আমাদের না জানা থাকিলেও তাহার কাজ চলিয়াছে এখনো।" (চাইল্ড)।

কালাত্তরের কালান্তক

হরপ্পার সভ্যতা তাই সত্যই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম বা আদি রূপ—নানা রূপান্তরেও যাহার উদ্দেশ আমরা এখনো পাই। কারণ, একেবারে সার্বিক রূপান্তরও ভারতীয় সংস্কৃতির এতদিন পর্যন্ত ঘটে নাই। কি করিয়া সেই সভ্যতা ধ্বংস হইল তাহা অবশ্য এখন বলা যায়—হরপ্পার দুর্গাধিষ্ঠিত শক্তি যে আক্রান্ত হইয়াছিল, মোহেন জো দড়োর কোন কোন মৃতদেহ যে আক্রান্ত ও অকস্মাৎ নিহত নরনারীর মৃতদেহ, এই অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কে এই আক্রমণকারী? পূর্বে আমরা গর্ডন চাইল্ডের অনুমানের উল্লেখ করিয়াছি। মনে হয় হরপ্পার দুর্গাদি আবিষ্কারে তাহার পরিপোষক প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। (দ্রষ্টব্য *Ancient India* No 3, Mortimer Wheeler এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৮২)। ঋক্‌বেদের সূক্তাদি হইতে দেখা যায়,—"সপ্তসিন্ধু" প্রদেশে (পাঞ্জাব) আর্যরা প্রাচীর-বেষ্টিত শত্রু-নগরীর বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতেছে। ঋক্‌বেদে এই নগরকেন্দ্রকেই বলিত 'পুর'। কখনো সেই পুরপ্রাচীর 'অশ্মময়ী'; কখনো তাহা বহু বেষ্টিত বা 'শতভুজি'; আবার কখনো 'আমা' অর্থাৎ কাঁচা মাটির। এই পুরধ্বংসকারী বলিয়াই ইন্দ্রের নাম

'পুরন্দর', তিনি দিবোদাসের জন্য নব্বইটি 'পুর' চূর্ণ করেন। শত্রু শম্বরের নিরানব্বই বা একশতটি দুর্গ তিনি বিধ্বস্ত করিয়াছেন।

সপ্তসিন্ধু দেশে এইরূপ সুরক্ষিত পুর কাহাদের ছিল? হরপ্পার পুরকেন্দ্র খনিত হওয়ার পরে আর সন্দেহ থাকে না যে—ইহা সিন্ধু উপত্যকার সেই রাষ্ট্রশাসিত পৌরসভ্যতারই ধ্বংসের কাহিনী। হাজার খানেক বৎসরের জীবনযাত্রার পরে খ্রীঃ পূঃ ১,৫০০ এর দিকে এই সভ্যতার ধারায় আসে কালান্তর। আর্যরাই সেই সভ্যতার কালান্তক।

একটা প্রশ্ন তবু রহিল—এই সিন্ধু সভ্যতার সহিত দ্রাবিড়দের তবে কিরূপ সম্পর্ক ছিল? মোহেন জো-দড়ো আবিষ্কারের পরেই যে পণ্ডিতগণ দ্রাবিড় ও সুমের সভ্যতার সহিত ইহার সগোত্রতা দেখিয়াছিলেন (অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে একজন) তাঁহাদের অনুমান একেবারে মিথ্যা হয় নাই। সুমের সভ্যতার সহিত, এমনকি, সেই এশিয়াটিক সামন্ত সমাজের সহিত তাহার সম্পর্ক প্রায় এখন সর্বস্বীকৃত। অবশ্য হরপ্পা সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্রাবিড়দের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গঠনের সমসাময়িক রূপ কী ছিল তাহা এখনো বিচার সাপেক্ষ। তবে বালুচিস্থানে এখনো দ্রাবিড়ভাষী মুসলমান ধর্মাবলম্বী ব্রাহুই জাতির অস্তিত্ব রহিয়াছে গুজরাটে রাজস্থানেও হরপ্পাধারার সভ্যতার কেন্দ্র পাওয়া যাইতেছে, সন্দেহ নাই একদিন সমস্ত পশ্চিম উপকূলেই দ্রাবিড়-ভাষীদের সভ্যতাকেন্দ্র ছিল। অভিন্ন না হোক—দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে তাই হরপ্পা সভ্যতারও যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল।

ভারতের যে প্রাগার্য ও প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এইরূপে তাহার প্রাচীনতম চিহ্নগুলির হিসাব লইলে দেখিব—পান, সুপারী, ধান কলা ও নারিকেল, আর মোটামুটি পল্লীপ্রাণ অস্ট্রিক জাতির সে জীবনযাত্রার বস্তু আজও আমাদের পূর্বাঞ্চলের ভারতবাসীর উৎসবে, ক্রিয়াকলাপে অপরিহার্য। আর আমাদের দেবদেবী, পূজা পার্বণ অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে রহিয়াছে ভারতের অন্য অধিবাসীদের দান: মোহেন জো দড়ো হরপ্পার আদি দ্রাবিড়ভাষী (? বা ভূমধ্য জাতীয়) অধিবাসীদের ধর্মগোলা, [illegible] এবং শিব উমা, অশ্বত্থ ও যোগ-প্রক্রিয়া প্রভৃতি তো ভারত সভ্যতার একেবারে মূল বনিয়াদ। ভারতীয় সভ্যতার আদিরূপ ইহাই। ইহারই মানসিক রূপ পরবর্তী ঐতিহাসিক কালে নতুন রঙ ও নূতনতর বস্তু গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। ভারতের কৃষি-সভ্যতার অস্ট্রিক পল্লীর বিশেষ রূপটি দেখা যায় পূর্বাঞ্চলে এবং পৌর-সভ্যতার দ্রাবিড় (? ভূমধ্য জাতীয়) বিশেষ রূপ দেখা যায় মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও দুই তিন সহস্রাব্দী টিকিয়া রহিয়াছে; পরবর্তীকালের নানা তরঙ্গে সেই কৃষি সভ্যতাই নতুনতর ও সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের গতিনিয়মে উহার অভ্যন্তরস্থ শক্তির দ্বন্দ্বে এই কৃষি সভ্যতারই নব নব স্তর বিকাশ লাভ করিয়াছে—তাই চার পাঁচ হাজার বৎসরের রূপান্তরের মধ্যেও সেই প্রাচীনতম রূপকে এখনো চিনিয়া লওয়া অসম্ভব হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী

Prehistoric India Stuart Piggott Pelican
Cambridge History of India Vol I
An Outline of Racial Ethnology in India—B S Guha
Racial Elements in the Population B S Guha
Languages and the Linguistic Problem S K Chatterji
The Indus Civilisation—Mackay
Ancient India No 3 1947, (Arch Survey of India)
What Happened in History—Gordon Childe
Pre Aryan and Pre Dravidian in India—Sylvan Levi & Bagchi

তখন অন্ধ্র সম্রাটদের রাজত্ব। (৩) আদি হিন্দু সংগঠনের যুগ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৮৫তে পুষ্যমিত্রের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ ঃ যবন, শক প্রভৃতির রাজত্ব ও ভারতে অধিষ্ঠান এই কালের মধ্যে ; খ্রীস্টীয় ৭৮ বা ১২০ অব্দে কনিষ্কের অভ্যুদয় পর্যন্ত বিস্তৃত)। (৪) বৌদ্ধ প্রাধান্যের (দ্বিতীয়) যুগ (খ্রীস্টীয় ৭৮ বা ১২০তে কুশান রাজত্ব হইতে আরম্ভ ; এবং ১৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বাসুদেবের মৃত্যুকাল হইতে প্রায় খ্রীঃ ৩০০ অব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যেরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এক অনালোকিত যুগ ইহার মধ্যে পড়ে।) (৫) হিন্দু অভ্যুদয়ের যুগ বা ভারতীয় সংগঠনের মধ্যকাল (খ্রীস্টীয় ৩২০ অব্দে গুপ্তসম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব হইতে খ্রীস্টীয় ৬৪৭-এ হর্ষের মৃত্যু পর্যন্ত। ইহা বাকাটক সাম্রাজ্যেরও কাল। খ্রীঃ ৪৫০ হইতে ৬০০-এর মধ্যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস ; হূন, পারসিক, গুর্জর প্রভৃতি জাতিদের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, ভারতবর্ষ ভগ্ন, খণ্ডিত ; সামন্ততন্ত্রের সূচনা, শ্রীহর্ষ ও দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে এই শেষ সংগঠন প্রয়াস শেষ হয়)। (৬) ভারতীয় মাৎস্যন্যায়ের যুগ (খ্রীস্টীয় ৬৪৭ হইতে খ্রীঃ ১,২০৩এ মুসলমান বিজয় পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল। ইহার মধ্যেই পড়ে বাংলার পাল সাম্রাজ্য ও সেন রাজ্যের কাল, গুজরাতে গুর্জর সম্রাট ভোজের রাজ্যকাল, ভিনমালে ও কনৌজে গুর্জর প্রতিহারদের কাল, বুন্দেলখণ্ডের চাণ্ডেল ও বুন্দেল, দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট, রাজপুতানার রাঠোর, চৌহান, প্রমার, সোলাঙ্ক, চালুক্য—এককথায় রাজপুত জাতির রাজত্ব)।

লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই যে, ইহার মধ্যে একবারের মত অন্ধ্রদের উল্লেখ থাকিলেও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রায় কোনো উল্লেখই ইহাতে নাই। নর্মদা ও কৃষ্ণ তুঙ্গভদ্রার মধ্যস্থিত দক্ষিণোপত্যকার ('ডেকান প্লেটোর') কন্নড়ের ব্রাহ্মণ কদম্ব রাজগণ (৩—৬ শতাব্দ), জৈনদের পৃষ্ঠপোষক গাঙ্গরাজগণ (২য় হইতে ১০ম শতাব্দ পর্যন্ত—শ্রাবণবেলগোলার গোমতেশ্বর মূর্তির নির্মাতা) বা 'মহারাষ্ট্র' দেশের বাদামির (বিজাপুর জিলা) চালুক্য (৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হর্ষের কাল পর্যন্ত, তামিল পল্লবগণ ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী) সম্রাটগণ, রাষ্ট্রকূটবংশ (খ্রীঃ ৭৬০-এর সময়ে—ইলোরার কৈলাস মন্দির ইঁহারা নির্মাণ করেন ; ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে জৈনদের সমর্থক সম্রাট অমোঘবর্ষের সময়ে আরব ভ্রমণকারীরা ইঁহাদের প্রধান রাজশক্তি বলিয়া জানিত), কল্যাণীর চালুক্য বংশ (চোলদের ইঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী, মহারাজ বিক্রমাংকের সময়ে স্মৃতিকার বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার 'মিতাক্ষরা' রচনা করেন। খ্রীস্টীয় ৯৭৩ হইতে ১১৯০ পর্যন্ত ইঁহাদের কাল), মৈশূরের হৈসলরাজগণ (খ্রীঃ ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে হালেবিদ্ ও অন্যস্থানকার হৈসল ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তাঁহাদের কীর্তি ; রামানুজাচার্য ইঁহাদেরই আশ্রয়ে 'শ্রীভাষ্য' লেখেন), দেবগিরির (ঔরঙ্গাবাদ) যাদব রাজগণ (১৩০৯তে মালিক কাফুর ইঁহাদের নিঃশেষ করেন), এমন কি, বিজয়নগরের সম্রাটগণ (মুসলমান আমলে ১৩৩৬-১৫৬৫ পর্যন্ত, সায়ন ইঁহাদের কালে বেদের ভাষ্য লেখেন)—এই দক্ষিণ-মধ্য ভূখণ্ডের সম্রাটদের কথা কি আমরা বিশেষ শুনিতে পাই? ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণস্থ তামিল জাতির প্রাচীনতম রাষ্ট্রত্রয় চের, চোল, পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখও এখানে নাই। চোল রাজ্যের মাদুরাতে খ্রীঃ ৩য় শতাব্দীতেই প্রাচীন তামিল সাহিত্য উন্নতিলাভ করে। কাঞ্চির অদ্ভুতকর্মা পল্লব সম্রাটগণ (৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উহাদের গৌরবকাল—চালুক্যদের হাতে খ্রীঃ ৭৫০-এর পরাজয়ে তাঁহাদের গৌরবাবসান আরম্ভ হয়। ইঁহারা কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব ; কাঞ্চী ও মহাবলীপুরম্ ইঁহাদেরই ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে অতুলনীয় ; রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতি চোল সম্রাটগণ (খ্রীঃ ৯০৭ হইতে ১০৭৪ পর্যন্ত ইঁহাদের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, চোল শাসন-ব্যবস্থার বিবরণ কুর্রম্—পল্লীমণ্ডল—ও 'সভার' উপর গঠিত ; রাজেন্দ্র চোলের রাজ্য ছুঁইয়াছিল গঙ্গা নদী পর্যন্ত : ইঁহাদের সময়ে যবদ্বীপে, সুবর্ণদ্বীপে ঔপনিবেশ ও বাণিজ্যিক প্রসার অব্যাহত রহে ; তাঞ্জুর, গঙ্গাই-কোণ্ডচোলপুরম্, চিদাম্বরম্-এ চোল শিল্পের অজস্র প্রকাশ চলিত থাকে) ;—ইঁহাদের কথাও ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের এই কাঠামোর বাহিরেই প্রায় থাকিয়া যায়। অথচ বুঝিবার মত কথা এই—ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক প্রাচীন কীর্তিই—দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, শিল্পকর্ম—দক্ষিণাপথের এইসব রাজ্যের সৃষ্টি। অন্ততঃ এইসব দক্ষিণী কেন্দ্রেই পুঁথিপত্র, শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি রক্ষার সুযোগ হিন্দুরা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসে দক্ষিণাপথের স্থান গৌণ।

এই কথা সহজেই বুঝিতে পারি—যে স্মৃতিকার বা দর্শনকার চালুক্য বা রাষ্ট্রকূট রাজ্যে বসিয়া বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন, তাঁহার চিন্তায়, ব্যবস্থায় সেই রাষ্ট্রের ও নিজ কালের কথাই বেশি মিলিবে—বাঙলা বা কান্যকুব্জের প্রথা বা নিয়মের সন্ধান হয়ত পাওয়া যাইবে না। অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া কোনো একটি রাষ্ট্রীয় বা আর্থিক নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত থাকিবার মত অবস্থা (মৌর্য বা গুপ্ত যুগ ছাড়া) ছিল না; কোনো একটি রাষ্ট্রেও একই সামাজিক বা আর্থিক ব্যবস্থা সর্বকালে অপরিবর্তিত থাকে নাই। আবার ইহাও সত্য, রাষ্ট্রীয় ঐক্য না থাকিলেও মৌর্য যুগের পর হইতে ভারতবর্ষে মোটামুটি একটা সাংস্কৃতিক ভাবধারার ঐক্য ও আচার-বিচারের ধারণা প্রচলিত ছিল; পরে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্ব পৌরাণিক ধর্মকে আশ্রয় করিয়া উহা বিস্তৃত করিতে থাকে। তাই, ভাবনার ও বিচারের জগতে আংশিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও কালগত প্রভাব কাটাইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবুকেরা কাশী বা কাঞ্চীতে চিন্তা ও বিচার করিতে পারিতেন—যে ই হোক যখন রাজা তাহাতে দার্শনিকদের ঐতিহ্য, বিচার, খণ্ডন, মণ্ডন বিশেষ বাধা পাইবে কেন? কিন্তু চিন্তা-ভাবনা সংস্কৃতির একটা অংশ মাত্র; আর ভাব-জগতও একেবারে সমাজ-নিরপেক্ষ হইতে পারে না, আর্থিক নিয়মকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

প্রাচীন ভারতের এই আর্থিক বিবর্তনের ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই। সত্য বটে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে বেদের নির্ঘণ্ট (ম্যাকডোনাল্ড ও কীথের বৈদিক ইনডেক্স) ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের অনুবাদ ও বিচার বিশ্লেষণ লাভ করায় এবং দেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট হইতে জাতকের অনুবাদ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উদ্ধার ও অনুবাদ প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়ায় এখন প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো পর্বের আর্থিক বিবরণ রচনা করা গবেষকদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বহু পর্ব এখনো অনালোকিত। আর, আর্থিক বিবরণকেও সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বুঝিবার চেষ্টা এখনো সুপরিণত নয়। তাহা না হইলে প্রাচীন ভারতীয় আর্থিক জীবন, তাহার রাষ্ট্রীয় রূপ, তাহার সামাজিক কীর্তি,—বনিয়াদ হইতে শিখরচূড়া কোনো কিছুকে সত্যরূপে বুঝাও সম্ভব নয়। অবশ্য এইদিকে বাধা অসামান্য;—ভারতীয় প্রাচীন জীবনযাত্রার বাস্তব প্রমাণ বিশেষ নাই, সামাজিক অবস্থার বিবরণ আরও জটিল। উহার অভাবে উল্টাপথে চেষ্টা করিতে হয়—সাংস্কৃতিক উপাদান হইতে সমাজ ও আর্থিক উপযোগ অনুমান করা। এই পথে যথেষ্ট ফাঁক এবং ভুলেরও যথেষ্ট অবকাশ থাকে।

মোটামুটি তবু সামাজিক পদ্ধতির দিক হইতে এই ভারতীয় ইতিহাসকে বিচার করিতে গেলে তাহাতে পৃথিবীর পরিচিত ইতিহাসের অনুরূপ প্রত্যাশা করি—নব্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে (১) 'জন' যুগের সমাজ বা ট্রাইবাল সমাজ, ও মাতৃ প্রাধান্য হইতে পিতৃ প্রাধান্যের উদ্ভব। পরে ক্রমোদ্ভাবিত (২) দাসত্ব প্রথার সমাজ, (৩) এশিয়াটিক (প্রাচীন) সামন্ত সমাজ, উহারই সমগোত্রীয় (৪) মধ্যযুগের সামন্ত (ফিউডাল) সমাজ, এবং ক্রমে (৫) ধনিকতন্ত্রী সমাজ ও (৬) সমাজতন্ত্রী সমাজ। কিন্তু প্রত্যাশা যাহাই করি, সব দেশে এই যুগগুলি এমন ধরা-বাঁধা নিয়মে আসে না, যেমন আধা-ফিউডাল সমাজ হইতেই ধনিকতন্ত্রী (১৮৬১ খৃঃ—১৯১৭) ব্যবস্থাকে (১৯০৫ ১৯১৭ এর মধ্যে) পাকা হইতে না দিয়া সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় সমুত্তীর্ণ হইল (১৯১৭-১৯৩৪এর মধ্যে) সোভিয়েট ভূমি, বিশেষত তাহার মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহ। আবার, অনেকখানেই যুগগুলি বিমিশ্র হইয়া আসে, এত পরিষ্কার সুচিহ্নিত কাটাছাঁটা রূপে দেখা দেয় না। এই কথা মনে রাখিয়া হরপ্পা-মোহেন্-জো-দড়ো হইতে (ইংরেজ অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত) ভারতের সামাজিক ইতিহাসকে কিভাবে বিভাগ করা সমুচিত? সম্ভবত এই কয়টি যুগে তাহা ভাগ করা চলে:

(১) এশিয়াটিক সামন্তসমাজ (হরপ্পা সভ্যতা ইহার ভারতদেশীয় নিদর্শন)।

(২) 'জন'যুগের আর্যসমাজ। বৈদিক যুগের আর্যদের প্রথম দিককার সমাজ এইরূপ ছিল—পিতৃ-প্রধান, পশু-পালক ও কৃষি-'জন' বা ট্রাইব-এ নিবদ্ধ; সম্পত্তি ট্রাইবগত নয়, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত; শ্রমবিভাগ শুরু হইয়াছে। এই 'জনযুগে'র আর্যেরা তুলনায় 'হরপ্পা' সভ্যতার মত উচ্চতর ও অগ্রসর সভ্যতার অধিকারী ছিল না। অবশ্য বৈদিক যুগ শেষ হইতে না হইতেই সেই

আদিম সভ্যতার অনেক উপকরণ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান আর্যসমাজ আত্মসাৎ করিয়া লয়। ফলে 'জনযুগের' পরিসমাপ্তি অচিরেই ঘটে—'বৈদিকযুগ' সম্পূর্ণ শেষ (৭০০ খৃঃ) না হইতেই। অবশ্য 'জনপদ' বা ট্রাইব বা ট্রাইবল্ রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ আমরা উহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত পাই। এমন কি, এখনো ভারতে ট্রাইবল বা 'জন'সমূহ টিকিয়া আছে। কিন্তু টিকিয়া আছে তাহারাই যাহারা সভ্যতার প্রবাহ হইতে দূরে ছিল ; বর্তমান ভারতীয় সমাজের তাহা মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়।

(৩) 'সামন্ত যুগ' বা 'ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র বণিকের সমাজ'। এইরূপ ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র বণিকের আধিক্য (মার্কস, ক্যাপিটেল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩) সামন্ততন্ত্রের মৌলিক আর্থিক ব্যবস্থা বলিয়া গণনা করা হয়। সেই বৈশিষ্ট্যই ভারতের সামন্ততন্ত্রের সর্বস্বীকৃত বৈশিষ্ট্য। ইহা দেখা দেয় বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই—যোদ্ধৃশাসক ও পুরোহিত শ্রেণীর পার্শ্বে তখন হইতেই দেখি বণিকশ্রেণীকে, ভূমিজ ও অন্ত্যজদের। একটু একটু করিয়া যেমন তাহা প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি নানা স্তরের মধ্য দিয়া এই সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিতে থাকে, বিশেষতঃ ইংরেজ (বুর্জোয়া) সাম্রাজ্যের পত্তনে। আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই এদেশে বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেয় নাই, আধা-সামন্ততন্ত্রকে টিকাইয়া রাখে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ইহারই শেষ বিঘোষিত হইয়াছে। বিদেশী বুর্জোয়ার মুখ্য অংশীদাররূপে দেশী বুর্জোয়া যুগের সূচনা হয়, স্বাধীন ভারতে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রথমেই যাহা তাই লক্ষণীয় তাহা এই—গ্রীস রোমের মত দাস-উৎপাদন ব্যবস্থা ও 'দাসতার যুগ' আমরা ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে পাই না ; গৃহদাস, দাসকৃষিক নিশ্চয়ই ছিল। দ্বিতীয়ত, সামন্ত যুগেরও নানা রকমফের এই দেশে দেখা যায়—যেমন, মৌর্যদের কেন্দ্রিত রাষ্ট্র ; সুঙ্গদের ব্রাহ্মণানুশাসিত শাসন হইতে ক্রমে গুপ্ত ও বাকাটকদের সময়ে সামন্তদের উদ্ভব, রাজপুত আমলে সামন্ততন্ত্রের ব্যাপ্তি ; তুর্ক-পাঠানদের জায়গীরদারী ; আকবরের আমলের জায়গীরদারী প্রথা বিলোপের লক্ষণ ; ব্রিটিশ আমলের 'দেশীয় রাজা' ও জমিদারপোষণ ইত্যাদি। তৃতীয়ত, বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব যতই প্রাচীন হউক (বুদ্ধদেবের সমকালীন), তাহারা বিনিময় ক্ষেত্র ছাড়াইয়া উৎপাদন ক্ষেত্রে শক্তিবৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হয় নাই—এদেশে সত্যকার উৎপাদন-বিপ্লব ঘটে নাই।

এই সুদীর্ঘ সামন্ত যুগ হুবহু অন্য কোনো দেশের সামন্ততন্ত্রের মত নয়, ইউরোপীয় ফিউডালিজম্ হইতে ইহা বহুদিকে পৃথক। এমন কি, 'এশিয়াটিক সামন্ততন্ত্র' হইতেও স্বতন্ত্র। কিন্তু মূলত সামন্ততন্ত্রের প্রধান গুণসমূহ উহাতে দেখা যায়। এই কারণে, 'ভারতীয় সামন্ততন্ত্র' বলিয়াও ইহার পরিচয় দেওয়া চলে। ইহার প্রধানতম লক্ষণ বা কাঠামো কি ? প্রথমত, এই সমাজের আর্থিক বনিয়াদ ছিল কৃষি এবং কৃষি-সম্পর্কিত শিল্প। দ্বিতীয়ত, নগর থাকিলেও ভারতবর্ষের এই কৃষিসভ্যতা মূলতঃ পল্লীভিত্তিক, উহা পৌরসভ্যতা হয় নাই। সামুদ্রিক বন্দর (ভারুকচ্ছ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি) ছাড়া শহরগুলি প্রধানত ছিল রাজধানী বা তীর্থক্ষেত্র। তৃতীয়ত, ভারতীয় সমাজের আসল শাসন-কাঠামো স্বয়ংনির্ভর পল্লী-পঞ্চায়েৎ বা 'ভিলেজ কমিউনিটি'। পল্লীর জীবনযাত্রা তাহাই পূর্বাপর সাধারণভাবে নির্বাহ করিত। রাজা-রাজ্যের পরিবর্তনে এই পল্লীসমাজ ভাঙে নাই। এইরূপ পল্লী-কেন্দ্রিত কৃষি-সমাজ হয়ত প্রাচীন যুগে এশিয়ার অন্য দেশেও দেখা দিয়াছিল। অন্তত চীনের ব্যবস্থা ইহার সহিত তুলনীয়। অবশ্য চীনা পল্লীজীবনের প্রধান কথা পিতৃ-চালিত পরিবার। ভারতবর্ষের জীবনের প্রধান একটি কথা তাহা বটে ; কিন্তু আবার পল্লী-পঞ্চায়েতও বটে। আর ক্রমে এখানে প্রধান হইয়া উঠে উহার সহিত জাত-পঞ্চায়েত। 'ফ্যামিলি', 'ভিলেজ কমিউনিটি' ও 'কাস্ট' এই ত্রিপাদের উপর ভারতীয় সমাজ প্রায় পূর্বাপর নির্ভর করিয়াছে। কোন আর্থিক বিপ্লবে উৎপাদন-শক্তির বিপুল বৃদ্ধি, উৎপাদন-সম্পর্ক বা সামাজিক ব্যবস্থার এমন অচল অবস্থা হয় নাই যাহাতে সামাজিক বিপ্লব ঘটে—পরিবার, পল্লীসমাজ বা 'জাতি'ভেদও উড়িয়া যায়।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের যে আর্থিক বনিয়াদ প্রধানত কৃষি ও কৃষি-সমাজের কুটির-শিল্প কেন তাহার কোনো বিপ্লবী বিপর্যয় ঘটে নাই, কী রূপে সেই উৎপাদন-শক্তির প্রসার বাস্তব ব্যবস্থা দ্বারা ও ভাবগত ধারণা-ভাবনার দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ করা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। এখানে

স্মরণীয় এই—এই কৃষি সমাজের প্রসার এই দীর্ঘকালে যে একেবারে ঘটে নাই তাহা নহে। ভিতরের ও বাহিরের তাড়নায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে; তাহাতে সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে চাহিয়াছে; শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের দ্বন্দ্বও নানা ধর্ম-সংঘাতে (দেবদেবীর নামের আড়ালে), রাষ্ট্র-সংঘাতে, বর্ণ-সংঘাতে—নানা স্মৃতি ও শাস্ত্রের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া—ফাটিয়া বাহির হইয়াছে; হয়ত আপনার অজ্ঞাতেই নানা সৃষ্টিতে, ভাবনায়, দর্শনেও আপনার ছাপ রাখিয়াছে;—ইহাও জানিবার মত, বুঝিবার মত সত্য।

বনিয়াদের বিস্তার

ইহার একটি বিশেষ ধারা আছে। সমাজ-বিকাশের যে নবযুগে আমাদের পৌঁছাইয়া দিয়া মোহেন-জো-দড়োর অধিবাসীরা বিদায় লয়, তাহার পরবর্তী ইতিহাস উত্থান পতনের মধ্য দিয়া সেই ধারায় প্রায় এই সাড়ে তিন হাজার বৎসর চলিয়া আসিয়াছে।

এই সাড়ে তিন হাজার বৎসরের ইতিহাস তাই বলিয়া কেবল সেই প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়। বরং বলিতে পারি উহার স্বাভাবিক বিকাশ—নানাস্তরের ক্রমপরিণতি, নানা বৈচিত্র্যের ক্রমোদ্ভব। মূলত তবু সেই একটি প্রধান যুগেরই তাহা কাহিনী। সে যুগে মানুষ কৃষিকেই জীবনযাত্রার অবলম্বন করিয়া লইয়াছে, মূলত যে সমাজ পল্লীকেন্দ্রিক, রাষ্ট্রীয় শক্তির নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও যাহার পল্লীপ্রাণ কৃষিসমাজ মোটামুটি টিকিয়া রহিয়াছে। আমরা জানি, ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কালও এই কৃষি-সমাজের বিচিত্র এবং বিপুল বিকাশের সাক্ষ্যই বহন করে। হরপ্পা, মোহেন-জো-দড়োর পরেই দেখি—সমাজে শাসক ও শাসিতভেদ ও বাণিজ্য প্রচলন যথেষ্ট দৃঢ়; পল্লীগত সেই কৃষিসমাজ নগরপত্তনও করিতে শুরু করিয়াছে; আর তাহাদের পৌর-জীবন গৃহশিল্পে, দ্রব্য বণ্টনে ও বিনিময় পদ্ধতিতে যথেষ্ট অগ্রসর ও উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরে ভারতবর্ষে নতুন নতুন জাতি আসিয়াছে, কিন্তু পূর্ববর্তী প্রাচীন লোকদের জীবিকার পন্থাকে তাহারা মুছিয়া ফেলে নাই। আবার গ্রীস বা রোমের মত পৌরসভ্যতার বিকাশ এখানে আর সম্ভব হয় নাই। নগর, বন্দর ছিল; কিন্তু জীবন ছিল প্রধানতঃ পল্লীতে বিস্তৃত। কৃষিসভ্যতার সেই সুদীর্ঘ যুগই চলিয়াছে। ভারতীয় সমাজ "এশিয়াটিক সমাজের" একটি বিশিষ্ট বিকাশ রূপে এক তৃপ্ত মন্থর গতিতে যেন এই ভূমিগত বনিয়াদের উপর বিবর্তিত হইতে লাগিল, শ্রেণীবিপ্লবের দ্বারা রূপান্তরিত হইল না; শ্রেণীবিদ্রোহের ফলে মাঝে মাঝে শুধু আপস রফা করিয়া টিকিয়া রহিল।

সেই বনিয়াদ আঁকড়াইয়া ভারতবর্ষের সামাজিক বিকাশ তথাপি থামিয়া থাকে নাই, তাহার সংস্কৃতির ইতিহাসও নিশ্চল হয় নাই। বরং যাহাকে আমরা সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতি বলি—আমাদের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও নানা ধর্মচিন্তা, ধর্মানুষ্ঠান, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ, লৌকিক ধর্ম ও আচার-বিচার—এই সবই এই সময়ের মধ্যে উদ্ভূত ও নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। জীবনযাত্রার বাস্তব বনিয়াদরূপে রহিয়াছে কৃষি ও কৃষিগত সমাজের ক্ষুদ্রশিল্প, এবং তাহারই বিনিময় ও বণ্টন পদ্ধতি। লৌকিক ধর্মানুষ্ঠানের বনিয়াদও কতকটা সেই প্রথমকার যুগের জন্মকালীন ক্রিয়াকলাপ, শব-সৎকার পদ্ধতি, সেই প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও উপকরণের উপাসনা, সেই পত্র-পুষ্প, ফল-জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু দিয়াই আবার দেবতার পূজা;—আর লৌকিক মনও এখনো পর্যন্ত ইহাদের প্রভাবেই পরিচালিত। কিন্তু জীবিকার স্বাভাবিক তাগিদেই এই প্রাগৈতিহাসিক বনিয়াদ ঐতিহাসিক কালে আরো প্রসারিত, আরো প্রবল আকার ধারণ করে। এবং শ্রেণীভেদের স্বাভাবিক নিয়মেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শ্রেণী-সংঘর্ষও বাধে; নানাভাবে শাসকশ্রেণী তাহা দাবাইয়া দেয় বা মানাইয়া লয়; সেই প্রয়োজনে স্মৃতি প্রণয়ন করে, আচার-নিয়ম, দর্শন, ধর্মকর্ম উদ্ভাবনও করে।

প্রসারের ধারা

ভারতীয় সমাজের এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমপ্রসারের নিয়মগুলি বারে বারে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তথাপি সেইগুলি স্মরণে রাখিলে ভারতীয় সংস্কৃতির নানাদিকের বৈচিত্র্যে বা আপাত-বিরোধিতায় চমকিত হইতে হয় না। ভারতীয় ইতিহাস ও তাহার ক্রমবিকাশের ধারাও আমরা যুক্তি-যুক্তভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। পশুচারিক সমাজ অপেক্ষা কৃষিসমাজ বেশি স্থায়ী সমাজ; কৃষি ও পশু উৎপাদন এই যুগে বাড়িয়া যায়; তাই তাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উৎপন্নের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের সমাজ তাহার প্রসারেরও কতকটা বন্দোবস্ত করিতে পারিত। দেশ বিরাট, স্বভাবতই নতুন বনভূমিতে আবাদ বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন গ্রামের পত্তন হয়; দেহের জীবকোষের বৃদ্ধির মত আবার একটির পর একটি নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। সঙ্গে সঙ্গে বণ্টনের ও বিনিময়ের নতুন তাগিদ আসে; গতায়াতের জন্য পথঘাট, যানবাহন দেখা দেয়। বংশ বা কুল (clan) ছড়াইয়া জীবনযাত্রার কেন্দ্র হইয়া উঠে এক এক 'জন' বা কৌম (tribe), আর তাহাদের আশ্রয়ও এক এক পল্লীকেন্দ্র (village) ছাড়াইয়া হয় এক এক অঞ্চল (zone)।

মানুষের সভ্যতার গোড়ায় তার উৎপাদন শক্তি। কিন্তু ক্রমে সভ্যতার উপর উৎপাদনের মত প্রবল প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এই বিচ্ছিন্ন মনুষ্য গোষ্ঠীর পরস্পরের সান্নিধ্য স্থাপনের চেষ্টা, অর্থাৎ বণ্টন ও বিনিময়। অবস্থা বিশেষে উহা প্রবলতর হইয়াও উঠিতে পারে। এ ব্যাপারটি আজ এমনি সত্য যে, কেহ কেহ বলিয়া বসেন সভ্যতার মূল তথা ইহাই: "diastole and systole of population" এবং "scope, pace and precision of human intercommunication"—অর্থাৎ লোকপ্রবাহ ও মানব গোষ্ঠীর পরস্পর পরিচয়ের সুযোগ, ঘনিষ্ঠতা ও সুনিশ্চয়তা। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ, সভ্যতা অগ্রসর হয় লোক-বৃদ্ধিতে এবং সেই লোকসমাজের পরস্পরের পরিচয় সূত্রে। কিন্তু সভ্যতার প্রারম্ভ জীবিকার প্রয়াসে, জীবিকা-উৎপাদন চেষ্টায়। উৎপাদনের বণ্টন ও বিনিময় সেই জীবিকা-প্রয়াসেরই একটা আনুষঙ্গিক দিক, এই উৎপাদন প্রথারই একটা বিশিষ্ট বিকাশ। সমাজ একটু অগ্রসর হইলে বিনিময় ও বণ্টনের কথা উঠে। লোক-বৃদ্ধিরও গোড়ায় চাই আহার্য-বৃদ্ধি, না হইলে লোকসমাজে বংশবৃদ্ধি কাজের হয় না। আর আহার্য বৃদ্ধির অর্থই আবার জীবিকার উৎপাদন-শক্তির উৎকর্ষ। তাই সকলের মূলে উৎপাদন, তাহার পর আসে বণ্টন ও বিনিময়। মানুষের নানা গোষ্ঠীর পরিচয়ের সূত্রও ইহাদেরই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে,—এই তিন লইয়া আর্থিক জীবনের বনিয়াদ। তাই সামাজিক অনুধাবনে নানা জাতির পরিচয়ের উপর তত জোর দেওয়া মূলত ঠিক নয়—সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তিপুঞ্জের দ্বন্দ্বই সমাজের বিকাশের কারণ, এমন কি নতুন জাতির সহিত সংস্পর্শে আসিবারও কারণ সেই আর্থিক বিকাশ।

নতুন শক্তির সহিত সংস্পর্শও দুই রকমের হইতে পারে—মিত্রতার কিংবা বিরোধের। জীবিকার তাগিদে যে গোষ্ঠী ছড়াইয়া পড়িয়া নতুন নতুন কেন্দ্র গড়ে তাহারা আবার পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠীর সহিত সেই জীবিকা লইয়াই কলহে ব্যাপৃত হয়। সে কলহ পশুচারী সমাজে পশু লইয়া বা পশুচারণ ভূমি লইয়া বাধে; কৃষিসমাজে তদুপরি বাধে ক্ষেত্র লইয়া, গোধন লইয়া আর গৃহের সঞ্চিত উপকরণ লইয়া। এই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্বের ফলেই সমাজে যোদ্ধৃশ্রেণীর প্রয়োজন হয় সর্বাধিক; তাহাতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রভুত্ব স্থায়ী হইতে থাকে, আর নারীজাতির প্রভাব ক্রমশ গৌণ হইয়া উঠে। এই বিরোধ দুই দশ বৎসরে শেষ হয় না, চলে পুরুষের পর পুরুষ। তারপর একদিন এইরূপে বিরোধেরও একটা সমাধান হয়। ততদিনে আবার পরস্পরের জীবনযাত্রা, আচার বিচার, চিন্তা-ভাবনা পরস্পরের জানা হইয়া যায়; এবং জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাহার প্রভাবও খানিকটা পরস্পরের মধ্যে সুদৃঢ় হইয়া উঠে। এইরূপেই জাতিতে জাতিতে পরিচয়ের সূত্রে মানুষের সভ্যতায় নতুন ভঙ্গিমা, নতুন রঙ, নতুন রস জোগাইয়া দেয়। শুধু উৎপাদনের পদ্ধতি দিয়া আঙ্কিকরূপে হিসাব করিলে হয়ত ইহার সঠিক

কারণ সব সময়ে বুঝিয়া উঠা যায় না। তবু সংস্কৃতির সেই নতুন নতুন ভঙ্গিমার কারণ নতুন আর্থিক ভঙ্গিমা। অর্থাৎ, ভঙ্গিমার কারণ থাকে উৎপাদন প্রথায়, উপকরণে, এবং উৎপাদনের বণ্টনে বিনিময়ে। কিংবা একেবারে নতুন মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়ে, মিলনে-বিরোধে—এই শেষ কারণেও সংস্কৃতির আর্থিক বনিয়াদ বদলাইয়া যাইতে পারে। যেমন, ইংরেজের আমলে আমাদের আর্থিক জীবন পরিবর্তিত হইয়াছে, আর তাই সংস্কৃতি রূপান্তরিত হইতে চাহিয়াছে। কিন্তু নতুন জাতির সহিত পরিচয়ে সব সময়ে আর্থিক জীবনের অত মূলগত পরিবর্তন নাও ঘটিতে পারে, শুধু একটা নতুন স্তর বা নতুন ভঙ্গিমার বিকাশ সম্ভবত হইতে পারে, প্রচলিত সংস্কৃতিতে কিছু বৈচিত্র্য জাগিতে পারে,—তুর্ক, মুঘল প্রভৃতি মুসলমান জাতিদের আগমনে ভারতবর্ষে মধ্যযুগে তাহাই ঘটিয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে তাকাইলেই এই সত্যটির আরও বিশেষ প্রমাণ মিলে ঃ—অন্যান্য দেশের কৃষিসংস্কৃতির সঙ্গে ভারত সংস্কৃতির ভঙ্গীর ও রঙের পার্থক্য কতকাংশে অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সে পার্থক্যের কারণ (১) কতটা ভৌগোলিক ঃ যেমন, এই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সুবিধা, এই নদীমাতৃক দেশের সুবিধা ; (২) মূলত এই সুযোগের জন্য উৎপাদন প্রথার বিশেষ বিস্তার ও সামাজিক বিন্যাস ও সঙ্গে সঙ্গে সহজায়ত্ত জীবিকার জন্য কতটা উদ্যমহীনতা, বিকাশের মন্থরতা ; (৩) কতটা আবার পৌরাণিক ও লৌকিক কারণ ঃ নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় আর্যভাষীদের মধ্যে উদ্ভাবিত আদিম আচার-বিচার, চিন্তা কল্পনা ; (৪) খানিকটা আর্য, ঈরানী, য়ুনানী প্রভৃতি নতুন নতুন জাতির আনীত তেমনি আচার-বিচার, প্রথা পদ্ধতি, শিল্প বিজ্ঞান ; (৫) এই সব নানা প্রভাবের দ্বন্দ্ব ও সম্মিশ্রণ ও বিচিত্র বিকাশে ভারত সংস্কৃতি গঠিত।

ঐতিহাসিক কালেও তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু তাহার প্রাগৈতিহাসিক কৃষি-সভ্যতাকে বনিয়াদ করিয়া একই রূপ বহিয়া গিয়াছে, এই কথা আক্ষরিক হিসাবে পুরা সত্য নয়। এই তিন হাজার বৎসরে ভারতবর্ষ প্রথমত সেই বনিয়াদের বিস্তার সাধন করিয়াছে—তাহার উৎপাদন-শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া, তাহার গৃহ শিল্পকে ক্রমবিকশিত করিয়া, তাহার বণ্টন-বিনিময়ের পদ্ধতিকেও ক্রমপরিণত করিয়া। দ্বিতীয়ত, আবার সেই নতুন ও পুরাতন বনিয়াদেরও উপর একদিকে পুরাতন আচার অনুষ্ঠানকে টিকিয়া থাকিতে দিয়াছে, অন্যদিকে পুরাতনকেও আবার নবায়িত করিয়া লইয়াছে—কোথাও নতুনের প্রলেপে, কোথাও নতুন মাল-মসলায় নতুনের সহিত পুরাতনের সমন্বয় করিয়া, কিংবা কোথাও নতুনে-পুরাতনে শুধুমাত্র বিমিশ্র করিয়া। তৃতীয়ত, ইহা ছাড়া আবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বনিয়াদের উপর নতুন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা গড়িতেও ত্রুটি করে নাই - কোথাও সেই অনুষ্ঠান সেই কৃষি-জীবনের স্বাভাবিক নতুন পরিণতি, কোথাও হয়ত তাহা অন্য মানবগোষ্ঠীর সহিত পরিচয় সূত্রে আহরিত, এবং হয়ত বা তাহাও কতকাংশে আবার ভারতীয় সমাজের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া সাজা। চতুর্থত, ভারতবাসীর মানস জীবনও ঠিক এই প্রণালীই পরিণতি যুগে যুগে ঘটিল, ভাবনা ইহারই প্রতিলিপি বহন করিল। চিন্তায় সেই আদিম ভক্তি ও পূজা, সেই আচার-বিচার সেই 'টোটেম-তাবু'র সংস্কার, যোগ প্রক্রিয়া, সেই ভাব প্রবণতা প্রভৃতি রহিয়া গেল, স্বাভাবিক বিকাশধর্মেই তাহা কিছুটা নতুনও হইল। অন্যদিকে নতুন অনুষ্ঠান, নতুন জাতি ও তাহাদের নতুন চিন্তা আসিয়া জুটিল, এবং তাহার খানিকটা গৃহীত, খানিকটা পরিবর্জিত হইল। ক্রমে এই নতুন পুরাতনের বিবিধ সংমিশ্রণে এই বিরাট দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় অনুষ্ঠান ও আচার অকল্পিত নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য লাভ করিল। সেই নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য মনে হয় আজ এমন মৌলিক যে এখন আমরা তাহার মূলেরও খুঁজিয়া দেখি না। ভুলিয়া যাই সেই মূল কৃষি সভ্যতা আর তাহার বৈশিষ্ট্যের কারণ এই ভৌগোলিক পরিবেশ। তাহার বৈচিত্র্যের গোড়া—এই দেশের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এদেশে মানুষের স্বচ্ছন্দ স্বতন্ত্র আর্থিক জীবনযাত্রা ; এই দুইএর মোটা-মুটি সম্মিশ্রণ ; আর সেই জীবন-প্রথার সহিত দ্বন্দ্বে-সমন্বয়ে সংযুক্ত নব নব জাতিদের জীবন ও চিন্তাধারা।—এইরূপ বহু বিচিত্র শক্তি, বহু বিমিশ্র অনুষ্ঠান ও মানসসম্পদ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি।

ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া সংক্ষেপে তাহার পর্বগুলিকে একবার বুঝিয়া লইলেও দেখিব—এই বৈচিত্র্য কিরূপ, উহার কারণই বা কী। মোটের উপর এইদিকে আমাদের উপাদানও আছে, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাস। এই ইতিহাসে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপতি কুলপতি হইল, গ্রামণী রাজন্য হইল; বৃত্তির তাগিদে শ্রমভেদ ও শ্রেণীভেদ জাতিভেদ রূপে দেখা দিল। (দ্রষ্টব্য—ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস' শীর্ষক ধারাবাহিক আলোচনা।) প্রায় দুই হাজার বৎসর চলিয়া আসিয়া যন্ত্রযুগের সম্মুখে সেই কৃষি-সংস্কৃতি শেষে ভাঙিতে শুরু করিয়াছিল। এখন স্বাধীনতা লাভের পরে তাহা নতুন হইয়া উঠিতেছে। ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য দুর্লভ—তবু মোট বিভাগগুলি দুর্লক্ষ্য নয়।

আর্য-বিস্তার

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক কাল শুরু হয় আর্যভাষী গোষ্ঠীদের আগমনে ও আর্যদের দানে। কালটাকে মোটামুটি এখন খ্রীস্টপূর্ব ১,৫০০ অব্দ বলা হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি। আজও ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির লৌকিক পরিচয়—যদিও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, আর বৈজ্ঞানিক পরিচয়ও ইহা নয়। ভুলিলে চলিবে না—প্রথম কথা, নবাগত আর্যসভ্যতাও শুধু আর্যেরই নিজস্ব সম্পদ নয়। আসিবার পথে সেই আর্যভাষী গোষ্ঠীগুলি মেসোপোতামিয়া ও আসুরীয় জাতিদের সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছিল। প্রাচীন ঈরানীয়দের সহিতও জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে ও জ্ঞাতি-শত্রুতায় ভারতীয় আর্যরা সম্পর্কিত ছিল। ভারতের পথে তাই ইহারা কুড়াইয়া আনিয়াছিল সেই প্রাচীনতর জাতিদের অনুষ্ঠান ও চিন্তা, প্রাক্ ও আদি বৈদিকধর্ম ও দেবতাবাদ,—বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে উহার চিহ্ন হয়ত সামান্য আছে, কিন্তু আর্যদের লৌকিক জীবন-প্রণালীতে উহার চিহ্ন ছিল এখনো হয়ত ব্যাপক। আর পরবর্তী কালের পরিবর্তনের মধ্যেও হয়ত তাহার পূর্বরূপ পরিবর্তিত হইয়াও কিছু না কিছু বহিয়া গিয়াছিল—হয়ত এখন আর তাহা চিনিয়া উঠাও সুসাধ্য নয়। যেমন, অথর্ববেদের মন্ত্রতন্ত্র একদিকে পূর্বকালীন ঈরানী অবৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের স্মারক এবং অন্যদিকে দেশীয় অবৈদিক ঝাড় ফুঁকের বাহক।

আর্যের 'নিজস্বতার' স্বরূপটি অবশ্য এইরূপ—অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিরই নিজস্বতা বহুলাংশে এমনি পরস্ব। দ্বিতীয় কথা, আর্যরাও সকলে এক গোষ্ঠীর নয় আর সবাই সভ্যতার সমস্তরেও ছিল না। তাহাদের মধ্যে জীবিকার উপাদান রূপে হয়ত তখনও সকলে কৃষি গ্রহণ করে নাই। কেহ কেহ ছিল পশুচারী; অধিকাংশই কৃষি ও পশুচারণা দুইই অবলম্বন করিয়াছে। মোটের উপর যাযাবর-বৃত্তি তাহারা কাটাইয়া উঠিয়াছে, তাহা ঠিক। তবে সকলেই এক ধর্ম ও সংস্কৃতি মানিত। 'আর্য' কথার অর্থ সম্ভবত ইহাই—"স্বজন"। তৃতীয় কথা, যেমন আর্যরা সকলে সমস্তরে ছিল না, তেমনি সকলে এককালেও আসে নাই—আসিয়াছিল বহু শতাব্দী জুড়িয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গে। হয়ত তাহা প্রারম্ভ খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের পূর্বে আর তাহার অবসান খ্রীস্টপূর্ব ১০০০—৭০০ অব্দের দিকে। চতুর্থ কথা, ততদিনে আর্যদের যাহা নিজস্ব রূপ তাহারা বহিয়া আনিতেছিল—বেদমন্ত্রে যাহার হয়ত অনেকটা অবিকৃত প্রমাণ রহিয়াছে—তাহা ভারতের অনার্যদের, অর্থাৎ সেই মিশ্র ও অমিশ্র কোল-সাঁওতাল, অস্ট্রিকদের এবং দ্রাবিড়ভাষীদের দানকেও স্বীকার করিয়া নতুন ও বিস্তারিত বনিয়াদ গড়িয়া ফেলিতেছিল—ভারতীয় 'হিন্দুসভ্যতার' বনিয়াদ সৃষ্টি করিতেছিল। ইহার অর্থ পরিষ্কার—হিন্দুসভ্যতা নিছক আর্য সভ্যতা নয়; তাহা দ্রাবিড়, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতির সকলের দান মিশাইয়া সেই আর্য সংস্কৃতির নবজন্ম। পঞ্চম কথা, কিন্তু যতই আর্যধর্ম ও আর্যভাষার প্রলেপে এবং আর্যের বিপুল শক্তির নিকটে এই ভূমির ঐ সব প্রাচীন ধর্ম ও ভাষা পরাজিত হউক, ইহাও স্বীকার্য যে নবাগত আর্যদল এইখানকার অধিবাসীদের, যেমন হরপ্পা কৃষ্টির অধিকারীদের, কাহারও কাহারও তুলনায় ছিল সভ্যতার হিসাবে অসভ্য ও বর্বর। (হরপ্পার লোকদের urn burial হইতে অ-বৈদিক আর্য ভাবিবার কারণ নাই; কারণ তাহাদের সহিত সুমেরের সম্পর্ক পরিষ্কার)।

মোহেন-জো-দড়োর সভ্য জীবনকে এই বিজেতারা ভাঙিতে পারিল। অর্ধ-সভ্যের হাতে গৃহস্থের অনেক সময়ে এমনি পরাজয় ঘটে। ইহার দুইটি বাস্তব কারণও সম্ভবত ছিল: প্রথমত আর্যেরা সেই যুগের ব্লিৎজ-ক্রিগের আবিষ্কর্তা। তাহাদের নতুন যুদ্ধযন্ত্র অবশ্য ট্যাঙ্ক নয়, তাহার নাম অশ্ব। যদিও বেদে 'অশ্বের' উল্লেখ পরিষ্কার নাই, কিন্তু ভারতের বাহিরেই এই জীবটির সহিত আর্যদের পরিচয় ঘটিয়াছিল। এই পৌরসভ্যতা ধ্বংস করিয়াই ইন্দ্র 'পুরন্দর' হন্—অর্থাৎ শতাধিক 'পুর' তিনি ধ্বংস করেন। তুরগবাহী আর্যের দলগত বিন্যাসও ছিল দুর্ধর্ষ; ইহাই তাহাদের জয়লাভের দ্বিতীয় কারণ। বিশেষত একালের বিত্তহীনদের মতো সেদিনকার আর্যদলেরও had nothing to lose. তাই, সেই গৃহস্থ সমাজকেও পরাজিত করিয়া যখন বলিষ্ঠ বর্বরের দল তাহাদের জীবন-যাত্রার উপকরণ অধিকার করিয়া বসিল তখন প্রাচীন সমাজেও এক প্রবলতর, নূতনতর প্রেরণাই আর্যরা দান করিতে পারিল। কৃষি সংস্কৃতি স্বভাবত ঐক্য বিধায়িনী নয়, খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত জীবনযাত্রায় তাহা অভ্যস্ত। কিন্তু এই বিজেতার দল শত্রুর সহিত সংঘর্ষের ও দ্বন্দ্বের প্রয়োজনে এই সমাজকে খানিকটা কেন্দ্রাভিমুখী না করিয়া পারে নাই। মনে হয়—সেই সংগঠন শক্তিও তাহাদের ছিল: "সম্ভবতঃ তাহারা (আর্যরা) ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী, একান্তরূপে কর্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, disciplined বা শৃঙ্খলাসম্পন্ন, সুদৃঢ় রূপে সঙ্ঘবদ্ধ গুণগ্রাহী কিন্তু আত্মসমাহিত।" (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায, পৃষ্ঠা ১৯)। বলা বাহুল্য বিভিন্ন দেশে প্রাচীন আর্যভাষীদের কর্মক্ষমতা লক্ষ্য করিযাই তাহাদের এইরূপ ভাবা চলে। 'রক্তের গুণ' যদি সত্যই থাকে তাহা হইলেও রক্ত বহিযা গুণগ্রাম বিশুদ্ধ আসে না, আসিলেও তাহা বহু রক্তে মিশিয়া এখন আর ভারতীয় রক্তে তেমন প্রবল নাই। আজ ভারতীয় জীবনযাত্রার মধ্যে ঐসব আর্য-মানসিকগুণের কতটুকু অবশিষ্ট আছে? বরং এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে পারি তৎপরিবর্তে টিকিয়া আছে (সুনীতিবাবুর উল্লেখিত) তথাকথিত 'দ্রাবিড়-ভাষীদের ভাব-প্রাবল্য' এবং 'অস্ট্রিক জাতীয় অলস নমনীয়তা'। অবশ্য এইরূপ সামান্যোক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অচল, জাতিগত ও রক্তগত ভাবে কোনো ভাব প্রবাহ বহিযা চলে বিজ্ঞান ইহা মানে না। যাহাই হউক, মনে হয় সংঘর্ষের উপযোগী মনোভাব ও শক্তি ভারতভূমি অপর্যাপ্ত দাক্ষিণ্যে সমাগত আর্য কৃষি-সমাজ হারাইয়া ফেলিতে দেরী করে নাই। তেমনি ভাবে য়ুনানী, শক, হূন প্রভৃতি অন্যান্য পরবর্তী আগন্তুকরাও তাহা অচিরেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতের গৃহস্থ কৃষি সভ্যতাকে তথাপি তাহারাও সকলেই নানাভাবে প্রসারিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছে।

বৈদিক সমাজ

বৈদিক আর্যদের সমাজের কথাই বেদে ও প্রথমদিককার বৈদিক সাহিত্যে আমরা লাভ করিতে পারি—অবৈদিক অনার্যদের কথা বা অ-বৈদিক আর্যদের কথা তাহাতে পরোক্ষে থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষসূত্রে নাই। যাহা জানি তাহা এই[1], :—'আর্য'রা তখনো বিভিন্ন 'জন' বা 'কুলে' বিভক্ত। 'জনে'র অধিনেতা 'রাজন্'। তখন যুদ্ধ ও বিপ্লবের যুগ। 'আর্য' জনগুলি পরস্পরেরও ভূমি, গোধন প্রভৃতি লুণ্ঠন করে, আবার বিভিন্ন আর্যগণ একত্রিত হইয়া 'পরে'র বিরুদ্ধে সংগ্রামও করে। যাহারা 'আর্য' নয় তাহারাই 'পর', শত্রু অর্থাৎ শত্রুরা বৈদিক দেবদেবী, যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মানে না। সচরাচর তাহাদেরই নাম 'দাস', 'দস্যু', অর্থাৎ শত্রু। হয়ত 'দাস' মূলতঃ কোন শত্রুগোষ্ঠীরও নাম হইতে পারে। আর্য জনের সংগঠনটা এইরূপ—কতকগুলি 'বিশ' লইয়া একটি 'জন' বা ট্রাইব, কতকগুলি 'গ্রাম' লইয়া আবার এক একটি 'বিশ', আর কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি 'গ্রাম', সকলের নীচে 'গ্রাম', উপরে 'জন'। যোদ্ধৃপ্রাধান্য এই সব 'জনের' মধ্যে বেশি, মন্ত্রকার ও যাগ-যজ্ঞাভিজ্ঞ যাজকশ্রেণীর ও প্রাধান্য তত নয়—অবশ্য মনে রাখিতে পারি, হয়ত পুরোহিত-

[1] এই আলোচনা প্রধানত ডা. দত্ত ও পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের গবেষণা অবলম্বনে লিখিত।

রাজের (উর, লাগাসের, হরপ্পারও ?) যুগ পশ্চিম এশিয়ায় তখনো একেবারে শেষ হয় নাই। নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে বৈদিক সামাজিক শ্রমবিভাগের ফলে ঈরানের আর্যদের মত তিনটি শ্রেণী ভারতীয় আর্যদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে—যোদ্ধশ্রেণী (ক্ষত্রিয়), পুরোহিতশ্রেণী (ব্রাহ্মণ), সাধারণ জনগণ (বিশ-বৈশ্য)। স্বাধীন নানা বৃত্তিধারী ও কৃষিজীবী পরিবার বিশ বা বৈশ্যের অন্তর্গত। এই তিন শ্রেণীর বাহিরে হয়ত ছিল 'উপাস্তি' বা প্রায় গোলামের (স্লেভ এর) তুল্য আশ্রিতশ্রেণী ; এবং ঋণ-দাস ও যুদ্ধ দাস, ক্রীত-দাস, প্রভৃতি গৃহদাস। ইহারাই (স্লেভস্) গোলাম শ্রেণী। 'বিশ' সকলের খাদ্যবস্ত্রাদির ভার গ্রহণ করে—অবশ্য প্রথমে ইহা কার্যবিভাগ মাত্র, শ্রেণীভেদ, 'জাতিভেদ' নয়। কিন্তু ক্রমশই যোদ্ধশ্রেণী রক্ষাকর্তা হইয়া উঠে! 'বিশই' প্রথম যোদ্ধনেতাকে হয়ত 'রাজন্' নির্বাচন করিত কিন্তু অনেক জনেই পদটি উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ বংশধরের প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাজকরও রাজনের ক্রমশ প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। বৈদিক আর্যসমাজে 'রাজন্' ট্রাইবল্ চিফ্, কিন্তু 'বিশপতি', 'গ্রামণী'ও আছে। গ্রামের 'সভা'য় তখনো কিন্তু গ্রামের পঞ্চায়েৎ বসে। আর জনের সাধারণ সম্মেলন 'সমিতি'ও সর্বমান্য। কিন্তু রাজন্ ও 'রাজন্য' (রাজগোষ্ঠী) ক্রমশ শাসনভার কাড়িয়া লয়—যদিও তখনো এই 'রাজন্'গণ স্পষ্টত দাবী করিত না যে, তাহারা শুধু 'নৃপতি', নয়, 'ভূপতিও' ভূমির মালিক। (রাজার এই দাবী পরবর্তী কালেও সকল স্মৃতিকার স্বীকার করেন নাই)।

পিতৃপ্রাধান্য তখন স্বীকৃত, পুরুষ প্রাধান্য সুস্পষ্ট, দেবতারাও অধিকাংশই পুরুষ। কিন্তু গৃহপতির যজ্ঞসঙ্গিনী 'গৃহপত্নী'ও সম্মানিত। পশুপালক সমাজে 'দুহিতার' তখনো প্রয়োজন আছে ; কিন্তু সেই যোদ্ধসমাজেও পুত্রের সঙ্গে সে তুলনীয় নয়, বলাই বাহুল্য। 'সতীদাহ' অপেক্ষাও বিধবার দেবর' বিবাহই হয়ত সুপ্রচলিত ছিল,—বংশবৃদ্ধির জন্যও বটে, পারিবারিক সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্যও বটে। বাস্তব উপকরণে তখনো তাম্রপ্রস্তরযুগ। পশুপালনই কৃষির অপেক্ষাও জীবিকার প্রশস্তর উপায়। প্রধান সম্পত্তিও তখন গোধন ; প্রধান খাদ্য দুগ্ধ, পায়স, ; গরু, মেষ, ছাগল, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া, কুকুর তখন গৃহপালিত জীব। আহারে যজ্ঞে, উৎসবে গোহত্যা যথেষ্ট প্রশস্ত। দ্বিতীয় সম্পত্তি—কৃষি। লাঙ্গলের দ্বারা চাষ হয়। গম, যব প্রভৃতি চাষ হইত, প্রথম চাউলের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। চাউল হয়ত ঐ অস্ট্রিকদেরই প্রথম উৎপন্ন শস্য। দেবতাদেরও প্রধান খাদ্য ঐ সব শস্যের পুরোডাশ, আর প্রধানতম পানীয় সোম (আধুনিক সিদ্ধি ?)। ইহার পর বৃত্তিধারীরা—ইহারা সূত্রধর, রথকার, কর্মকার, চর্ম পরিষ্কারক প্রভৃতি। তখনো লৌহ সম্ভবত অপ্রচলিত ; কাঠের তৈজসপত্র, তাম্র, পিত্তলের ও মৃত্তিকার 'স্থালী' প্রভৃতি। রঙীন ও কাজকরা 'বাস' ব্যবহৃত হয়, চর্ম-পরিচ্ছদও আছে।—এইসব জীবন যাত্রার আয়োজন। উৎসব প্রধানত সভায় 'দ্যূতক্রীড়া', রথের দৌড়, আর স্ত্রী পুরুষের একযোগে 'নৃত্য'। সোমপান অবশ্য ধর্মের অঙ্গ। আর সেই ধর্মের অধিকাংশ তখন যাগ যজ্ঞ নানা জটিল অনুষ্ঠান পল্লবিত—নিশ্চয়ই যে বিশেষজ্ঞ শ্রেণী তাহা রক্ষা করেন তাঁহারা পুরোহিত যাদুকরেরই মত শক্তিধর বলিয়া সম্মানিত ; আর দেবতারা কতকটা আদিকালের মত প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক, যেমন (ঊষা প্রভৃতি) ; কতকটা 'জন' বিভক্ত যোদ্ধসমাজের নেতা, যেমন ইন্দ্র কিম্বা বরুণ। দেবলোক এই মনুষ্যলোকেরই প্রতিচ্ছায়া।

প্রথম দিককার সপ্তসিন্ধু দেশের বৈদিক সমাজের ইহাই রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক রূপ। কুরু-পাঞ্চাল প্রদেশেও অবস্থা এইরূপ। যতই বৈদিক আর্যরা বিজয়ী রূপে দক্ষিণে গঙ্গা-যমুনা-রামগঙ্গা-প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল, বিজয়ী রূপে 'আর্যাবর্তে' স্থির হইয়া বসিতে পারিল ; ততই এই 'জন সঙ্ঘ' রূপ পরিবর্তিত হইয়া চলিল। 'ঋকবেদের'ও ১০ম মণ্ডল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া স্বীকৃত। উহার পরম গৌরব উহার একেশ্বরবাদ। বেদের বহুদেববাদ যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'জনের' শাসনের প্রতিচ্ছায়া, তেমনি এই নবোদ্ভিন্ন একেশ্বরবাদ বৈদিক 'জন'-স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তে সম্রাট শাসিত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র-উদ্ভবের আভাস। অর্থাৎ তখন বৈদিক 'জনযুগ' শেষ হইয়াছে ; বড় বড় 'রাষ্ট্র' গঠনের যুগ আসিয়াছে। নির্বাচিত নায়ক 'রাজন্' হইয়াছিল ; 'রাজন্য'-শাসনও চলিতেছিল ; এখন সে শাসক রাষ্ট্রের 'সার্বভৌম রাজা' হইয়া বসিয়াছেন। ইহাতে যোদ্ধ-শ্রেণীর ক্রমোন্নতির পরিচয় পাই। 'দশমমণ্ডলে' এমনি এক সুবিদিত সূক্ত 'পুরুষসূক্ত'—ব্রহ্মার দেহ

হইতে চতুর্বর্ণের উদ্ভবের প্রসিদ্ধ কাহিনী। পুরোহিত শ্রেণী শুধু উদ্ভূত হয় নাই, ব্রাহ্মণ রূপে সমাজদেহের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত বলিয়াই তাহারা ইহাতে দাবী করিতেছেন।—অর্থাৎ যোদ্ধৃসমাজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যুদ্ধ-বিজয়ের পরে আর বেদাভিজ্ঞ যাজক শ্রেণীকে মানিয়া লয় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়েই শাসকশ্রেণীর ; বিশেষত বর্ণভেদ তখনো ধর্মগত। রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপে তথাপি বৈদিক সমাজের অন্তর্বিরোধ ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। বেদের 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ' ভাগ ছাড়াইয়া 'আরণ্যকে'র রচনাকালে উপস্থিত হইতেই দেখি—যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠান বা কর্মকাণ্ড লইয়া পুরোহিত শ্রেণী যতই সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবী করুক, তত্ত্বজিজ্ঞাসায়, ব্রহ্মবিদ্যায়, রাজারাই বেশি উৎসাহী। অর্থাৎ প্রাচীনতর বৈদিক সমাজের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে ; যুদ্ধজয়, শত্রুবিনাশ, শত্রুর ধনজন লুণ্ঠনের জন্য দেবতার স্তবস্তুতির আর তেমন একান্ত প্রয়োজন নাই, চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানেরও উপর আর যোদ্ধৃশ্রেণীর তেমন শ্রদ্ধা নাই। থাকিবে কিরূপে?—জীবন-যাত্রার বাস্তব সাক্ষ্য যে তাহারা দেখিতেছে অন্যরূপে। কারণ বাস্তব রাজশক্তি হিসাবে রাজাদের অধিকতর জীবনানন্দ্য হইতে হয় ; আর কর্মকাণ্ডের রক্ষক হিসাবে ব্রাহ্মণদের হইতে হয় অধিকতর আচারনিষ্ঠ। বৈদিক যুগে তখনো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে পারে, ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ; এমন কি, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র কেহই জন্মসূত্রে তাহা হয় না। তবু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রেণী আলাদা। আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব যে এই শোষক চক্রের দুই শ্রেণীর মধ্যে বাধিয়া গিয়াছে তাহার আভাস বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভার্গব, পরশুরাম, হৈহয়কার্তবীর্য, পুরুরবা, নহুষ প্রভৃতির বহুবিদিত আখ্যায়িকাগুলিতে ছাড়াও সংগ্রহ করা যায়। এই শ্রেণীবিরোধে ব্রাহ্মণের স্বীকরণে বা গো ভক্ষণে ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বিধা ছিল না। শান্তিতে কুল হইলে ব্রাহ্মণরাও তাহাদের ছাড়িত না (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি', ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭-১০৪)। ক্রমে এই দ্বন্দ্ব মোটামুটি একটা সুপরিচিত মীমাংসায় পৌঁছে—ব্রাহ্মণ ধর্মনেতৃত্ব ও মন্ত্রণানেতৃত্ব লাভ করিয়া ক্ষত্রিয়কে রাষ্ট্রনেতৃত্ব ছাড়িয়া দেয়, ক্ষত্রিয়ও রাষ্ট্রনেতৃত্বের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লয়। কিন্তু ইহা পরবর্তী কালের কথা, যখন (কণ্ব, শুঙ্গদের সময়ে ?) হিন্দু সমাজ ও রাজত্বের সংগঠন চলে, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রণীত বা সংগৃহীত হইতে থাকে। ক্ষত্রিয়পুত্র গৌতম ও মহাবীরের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই ক্ষত্রিয়পুত্র শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকেও অবতার বলিয়া ব্রাহ্মণদের মানিয়া লইতে হয়। তবে সেই অবতারেরাও বেদ ব্রাহ্মণের দাস, বশিষ্ঠের মন্ত্রণায় চালিত, ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধরিয়া কৃতার্থ, ইত্যাদি। এখানে বুঝিবার মত যাহা তাহা এই :—বৈদিক যুগেরই শেষ দিকে চতুর্বর্ণ হিসাবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছাড়াও 'শূদ্রের' উল্লেখ পাই। 'শূদ্র অবশ্য বিজিত আদিম অধিবাসী নয়, আর্যদের মধ্যে কোনো অধঃপতিত অংশ (দত্ত, ঐ, ১০৫) ; দেখি বৈশ্য (কৃষি ও বৃত্তিজীবী সাধারণ স্বাধীন মানুষ) ও শূদ্র এই দুই শ্রেণীই নিম্নশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইতেছে। অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ও 'শ্রেণীভেদ' জাতিভেদে পরিণত হইয়া দানা বাঁধিবার দিকে চলিয়াছে।

অবশ্য বহুদিন পর্যন্ত তবু শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিত, ক্ষত্রিয় হইতে পারিত ; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও শূদ্র না হইত তাহা নয়। বিবাহেতো বাধা ছিলই না। কিন্তু কাহারা এই শূদ্রশ্রেণী ? নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই ; পরবর্তীকালের সাক্ষ্য দেখিয়া মনে হয়, সম্ভবত আর্য সমাজেরই সেই শ্রেণী শূদ্র যাহাদের ভূ-সম্পত্তি নাই ; কেহ বা হয়ত কেহ মজুর, কেহ বা শিল্পী কারুজীবী। অবশ্য আরও পরবর্তীকালে ইহাদের এক অংশ আবার সেই ভূ-সম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়া সৎ-শূদ্রে উন্নীত হয়, আর ভূমিহীনরা শূদ্র বা অসৎ-শূদ্র থাকিয়া যায়। কিন্তু সেই বৈদিক সমাজের বিষয়ে যাহা প্রথম এখানে জ্ঞাতব্য তাহা এই—নিজেদের এই অধোগতি বৈশ্য শ্রেণী ও শূদ্রশ্রেণী বিনা দ্বন্দ্বেই কি মানিয়া লইয়াছিল ? ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষে ক্ষত্রিয়ের পিছনে (কিংবা ব্রাহ্মণের পিছনে) কি ইহাদের শ্রেণীও সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায় নাই ? বৈদিক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ না থাকুক, বৈদিক যুগের শেষেই বৌদ্ধজাতকে দেখিতে পাই—বণিক-শক্তির (শ্রেষ্ঠী বৈশ্যদের) আর্থিক প্রতিষ্ঠা তুচ্ছ নয়। এবং একটু পরেই দেখি মগধের সিংহাসনে আসিয়া বসিতেছে শূদ্র সম্রাটরা, নন্দরা ও মৌর্যরা ; আর আরও শত পাঁচেক

বৎসর পরে জাতি-ভেদ যখন পাকা হইতেছে তখন বৈশ্য জাতীয় গুপ্তরা ভারতের সার্বভৌম সম্রাট। তারপরও শত বাধার মধ্যেও এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের শক্তিতেই বারে বারে নানা অজ্ঞাত নিম্নজাতীয় রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, আর নিজেরা শাসক শ্রেণীতে প্রমোশন লাভ করিয়া সেই রাজগণও সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়াছেন—বুঝিতেও পারেন নাই যে, শোষিতশ্রেণীর প্রতি তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন, বুঝিতে চাহেন নাই যে, বিরোধ নির্মূল হইল না, শুধু সাময়িক ভাবে চাপা পড়িল। অর্থাৎ শুধু শ্রেণীভেদ নয়, শ্রেণীদ্বন্দ্বের বীজ বৈদিক সমাজও বহন করিতেছিল, যদিও তখন পর্যন্ত দ্বন্দ্ব ছিল প্রধানত শোষক চক্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব তাহাদের ধর্ম প্রাধান্যের বিরোধ। এই শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে চাপা দিবার জন্য ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণী পরবর্তী কালে যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করে পরে তাহা দেখিব, কিন্তু সে পদ্ধতিরও উদ্ভাবনা আরম্ভ হয়—এই বৈদিক যুগের শেষদিকে—মতাদর্শ বা আইডিঅলজি দিক হইতে পুনর্জন্ম ও কর্মবাদের আবিষ্কারে, আত্মতত্ত্বের অনুশীলনে, বাস্তব ব্যবস্থার দিক হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজনীতিতে প্রয়োজন মত সংরক্ষণ সংস্কারে স্বীকারে, বর্জনে।

বৈদিক যুগেরই শেষ দিক হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করে। আর্যাবর্তের এই নতুন সামাজিক কড়াকড়ি, বিশুদ্ধি পশ্চিমে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের অধ্যুষিত আর্যদের ছিল না আর প্রাচ্যের (মগধ বিদেহের ?) আর্যদের নিকটও এইসব অগ্রাহ্য। এই দুই দলকে বৈদিক ব্রাহ্মণশ্রেণী সংস্কারহীন বলিয়া হেয় করিতে চায়। সপ্ত সিন্ধুর আর্যরা এইসব নতুন ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার জানেও না মানেও না প্রাচ্যের আর্যরা বেদও মানে না, তাহারা 'ব্রাত্য'। অথচ লক্ষণীয় এই, এই প্রাচ্যমণ্ডলেই ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন বেশি, রাজারা আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, এখানেই একটু পরে উদ্ভূত হন গৌতম বুদ্ধ ও জৈন মহাবীর। তাঁহারা ছাড়াও তাঁহাদের সমকালে এখানে তীর্থংকর, আজীবক, অগ্নিউপাসক প্রভৃতি নানা অবৈদিক সম্প্রদায়ের অভাব ছিল না। আসলে বৈদিক আর্যরা যতই বিস্তৃত হইয়াছে ততই অবৈদিক আর্যদের অস্তিত্ব ও প্রভাব তাহাদেরও মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। জীবনযাত্রায় কৃষিসমাজ স্থাপিত হইতেছে বিনিময় ব্যবসা ও মহাজনী দেখা দিতেছে, রাষ্ট্রে সমাজে পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাই একদিকে যখন সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ধর্মসূত্র গৃহ্যসূত্র রচনা করিয়া সংরক্ষণশীল পুরোহিতরা বাড়াবাড়ি করিতেছে, অন্যদিকে তখনি 'আথর্বণ' দিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, ব্রাত্যদেরও উদ্দেশে প্রশস্তি রচনা চলিতেছে, একেবারে দেশজদের সাপের মন্ত্র ঝাড়ফুঁকও, গোঁড়া পুরোহিত শ্রেণীর না হোক, বৈদিক সমাজের অন্যাদিগের গ্রাহ্য হইয়া পড়িতেছে। অতএব এই নানা অনার্য দেবদেবী, যোগ-তন্ত্র, আচার অনুষ্ঠান চিন্তা ভাবনাই কি শুধু আসিয়াছে সপ্তসিন্ধু দেশেও কি বিজিত 'হরপ্পা সভ্যতার' শেষ অধিবাসীদের শিল্পকুশল, কৃষিকুশল ব্যবসায়ীরা সমাজে ঠাঁই পায় নাই? মল্ল, লিচ্ছবী, বৃজি শাক্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজন্য জানপদগুলি সবই কি কেবল বৈদিক বা অ-বৈদিক আর্যদের পুরাতন ট্রাইবল, জনরাষ্ট্র না ঐ সব রাষ্ট্রে আরও প্রাচীনতর অনার্য জানপদগুলি নবকলেবর লাভ করে

বৈদিক যুগ সম্বন্ধে এই কয়টি সিদ্ধান্ত ও সমস্যাই তাই আমাদের স্মরণীয়: (১) বৈদিক আর্যসমাজেও পরিবর্তন আসিয়াছিল। ২) কৃষির সম্প্রসার ও বিনিময় বাণিজ্যের উদ্ভবে উৎপাদন অনেক বাড়িয়া যায়, (৩ শ্রেণীভেদ স্পষ্ট হয়; শ্রেণী বিরোধেরও সূচনা হয়। এমন কি, কৃষিজীবী ও কারুজীবীর দৈহিক শ্রমকে মস্তিষ্কজীবী শোষক শ্রেণী একটু একটু করিয়া হেয় জ্ঞান করিতেও শুরু করেন। (৪) জন সত্তাক সংগঠন ভাঙিয়া ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র (রাজতন্ত্র ও অভিজাত গণতন্ত্র, দুইই) দেখা দেয়,—ক্ষত্রিয়ের নেতৃত্বে ভারতের সুদীর্ঘ সামন্ততন্ত্রী সমাজের বীজবপন শুরু হয়। দেশজ নানা সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, ট্রাইবকে আর্যীভূত করিবার তাগিদ বাড়ে, পুরোহিতদিগের উপরেই পড়ে তাহারও ভার। (৫ এই আলোড়নের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ৭০০ অব্দের পূর্বেই পুরাতন বৈদিক দেবদেবী, যাগযজ্ঞ, অর্থাৎ বৈদিক আইডিঅলজি বদলাইতে থাকে। যাজক পুরোহিতেরা শক্ত করিয়া যতই বেদের কর্মকাণ্ড বাঁধিতে লাগিল, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ততই তাহার গোড়া ধরিয়া টান দিল—'সত্য কি?' বৈদিক আর্যসমাজ সম্ভবত অনার্যদের পুনর্জন্মতত্ত্বকে কর্মবাদে বিকশিত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা শুধু পরাবিদ্যাতেই ঝুঁকিয়া পড়ে নাই, সেই leisure class

idealism ছাড়া লোকায়ত মতও ছিল—যাহারা পৃথিবীকেই স্বীকার করিত, আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতি যাহারা মানিত না (দ্রষ্টব্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দর্শন দিগ্‌দর্শন, পৃঃ ৪৮৪) ; পরবর্তীকালে অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন এবং ষড়দর্শনেরও সাংখ্যযোগ ও কণাদের মধ্যেও বৈদিক যাগ-যজ্ঞতন্ত্রের বা আস্তিক্যবাদের কতটুকু নিদর্শন আছে ?

এই সিদ্ধান্তগুলি ছাড়া মোটামুটি বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই ভারতীয় কৃষিজীবী, গ্রাম্যসমাজ ও সামন্তব্যবস্থার গোড়াপত্তন করিয়া ভারত ইতিহাসের ৩টি বৃহৎ জটিল সমস্যারও বীজ বপন করিয়া যায় : (১) এই কৃষিসমাজে ভূমিস্বত্ব কিরূপ ছিল ? ইহা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের একটা মূল প্রশ্ন। (২) ভারতীয় জাতিভেদের স্বরূপ ও ইতিহাস কি ? ভারতীয় সমাজতত্ত্বের একটা বড় প্রশ্ন। (৩) নানা শ্রেণী-বিরোধের মধ্যেও কেন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়া থাকিতে পারিল ? ইহা ভারতের ইতিহাসেরই সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন।

এই সমস্যাগুলি পরবর্তী সমস্ত ভারত ইতিহাসের মধ্য দিয়া নানাভাবে আবর্তিত হইয়া উঠিয়াছে ; আর ইহা বুঝিতে পারিলে ভারতের ইতিহাস ও ভারতের সংস্কৃতির রূপ অনেকাংশে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সমস্যাগুলির আলোচনা তাই সমস্ত ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়াই করিতে হইবে। তৎপূর্বে ভারতের এই কৃষিসভ্যতা বৈদিক আর্যদের নিকট যে দান লাভ করিল, যুগে যুগে যাহাদের নিকট যে দানে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব স্মরণ করিতে পারি (দ্রষ্টব্য : স্বর্গীয় যদুনাথ সরকারের *India Through the Ages*, 1939)।

আর্য সংস্কৃতির রূপ

আর্য কৃষিজীবীর পক্ষে এই দেশে বাস্তব জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ, সুস্থির ও সহজলভ্য হইয়াছিল, এইটিই এই দেশীয় আর্য সংস্কৃতির একটি গোড়ার কথা। কিন্তু আজও সেই বাস্তব জীবনযাত্রা একেবারে অতীত বলিয়া মনে হয় না। সেদিনকার কৃষিসমাজের সেই বাস্তব উপকরণ বা জীবিকাপ্রণালী বলিতে গেলে আজও প্রায় ভারতীয় পল্লী-সভ্যতায় অব্যাহত রহিয়াছে—সেই সামান্য কাঠের লাঙল বলদের ব্যবস্থা, কৃষির উচ্চতম উপাদান, সেই মাটি ও খড়ের ঘর-দুয়ার, সেই মাটি ও ধাতুর বাসন কোসন, সেই বাঁশ ও কাঠের সামান্য তৈজসপত্র। (দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত 'বৈদিক সমাজ - জীবনযাত্রা' ও ***Life in Ancient India in the Age of the Mantras***, P. T. Srinivasa Iyengar)। মূল উৎপাদন-শক্তিতে একটা বিরাট সাধিত হইয়াছে কি এই কৃষি-সভ্যতায় ? ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্রাদিতে আমরা যে আর্যদের সাক্ষাৎ লাভ করি, মনে হয় তাহারা প্রবল ও দুর্ধর্ষ মানুষ ; যুদ্ধজয় ও শত্রুনাশ তাহাদের প্রধান সাধনা ; জীবনের সুখভোগে তাহাদের পরম আগ্রহ ; খাদ্য, পানীয়, নৃত্য, ক্রীড়া—এই সবেই তাহাদের উৎসাহ—চিন্তা, ধ্যান, বৈরাগ্য তাহাদের ধর্ম নয়। তবু বৈদিক সমাজে চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়া সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থকে অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই এমন এক মানসিক প্রকর্ষের অবকাশ সৃষ্টি হইল—যাহার তুলনায় আজিকালিকার পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় বা পরবর্তী যুগের আমাদেরই মঠ-বিদ্যাপীঠও বড় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইহা সম্ভব হইল যে বিশেষ কারণে তাহা আবার স্মরণীয়—নদীমাতৃক ভারতীয় প্রকৃতি কৃষিজীবীর প্রতি অকুণ্ঠিত স্নেহ পোষণ করেন ; নাতিশীতোষ্ণ ভারতীয় মণ্ডলের অধিবাসীরা পরিধেয়াদি সম্পর্কেও তাহার অযাচিত অনুগ্রহ লাভ করে। অর্থাৎ এখানে জীবন-যুদ্ধে মানুষের সহজে জয় হয়। এই জয়ে তখন শাসক শ্রেণীর জুটিল বিশ্রাম, অবকাশ। উৎপাদন কর্ম হইতে, ক্রমে কায়িক শ্রম হইতেও দূরে থাকিয়া উচ্চ-কোটির শাসক শ্রেণীর পক্ষে চিন্তায় ও কল্পনায় বাস্তবকে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ জুটিল। তাই এই অবকাশের সামাজিক মানসিক ফলগুলিও লক্ষ্য করিবার বস্তু : দৈনন্দিন জীবনে বিশ্রামের সুযোগে তাহাদের আনুষ্ঠানিক জীবনযাত্রায় অল্পকালের মধ্যেই বাহুল্য ও শৃঙ্খলা দেখা দিল। যথা, যজ্ঞাদিতে

একদিকে যেমন দেবতা হইলেন মেঘরাজ ইন্দ্রাদি কৃষকের রক্ষাকর্তারা, অন্য দিকে বেদের যুগ শেষ না হইতেই যেনো কর্মকাণ্ডও বহুবিস্তৃত ও বহুবিভাগে বিভক্ত হইল। সেই পরবর্তীকালে আর্য সমাজের শৃঙ্খলাবোধ যেন আর তাল সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই, লৌকিক ও দেশীয় চিন্তা ও অনুষ্ঠানকে যেমন ভাবে পারে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শাসিত লোকশক্তিকে একেবারে অবজ্ঞা করা আর সম্ভব হয় নাই।

বাস্তব জীবনযাত্রার সুবিধা ও অবকাশ এবং আনুষ্ঠানিক ঐশ্বর্যের ফলে অবকাশ-ভোগী সমাজে দৈহিক শ্রমের ও বাস্তব চিন্তার অপেক্ষা বাস্তবাতীত এক মানসিক প্রক্রিয়া, ভাববাদিতার (subjectivity) প্রতি শ্রদ্ধা জাগে বেশি। 'ভাববাদিতা' অবসরভোগীর স্বাভাবিক ধর্ম। ইহাই হিন্দু 'আধ্যাত্মিকতায়' পরিণত হয়। অবসরভোগীদের শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তিতে। 'বর্ণভেদের' বাস্তবক্ষেত্রে পর্যন্ত ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালেও যাস্কের (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ ?) নানাভাবে বেদ বেদাঙ্গের ভাগ-বিভাগ, তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, পাণিনির (খ্রীঃ পূঃ ৪০০ ?) মত অপূর্ব ব্যাকরণ প্রণয়ন, ইত্যাদি হইতে বুঝি চিন্তার ক্ষেত্রে আর্য মনীষীদের এই শৃঙ্খলা-বোধ অব্যাহত রহিয়াছে ; আর্যদের কাব্য বা কল্পনার প্রবাহেও অনেক দিন পর্যন্ত (গুপ্তযুগেরও শেষে) এমনি এক সুসঙ্গতি ও সু-সামিত (symmetry and proportion) বোধ অক্ষুণ্ণ ছিল (দ্রষ্টব্য *India Through The Ages*, J. N. Sarkar)।

এই দুইটি গুণই যতই দিন গিয়াছে ততই আর আর্য-সমাজের পক্ষে সংযতরূপে স্থির রাখা সম্ভব হয় নাই, অবকাশের প্রাচুর্যে, ভাবের উচ্ছ্বাসে, আনুষ্ঠানিক বাহুল্যে উহা সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। কায়িক শ্রম ক্রমেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে অপমানজনক হইয়া উঠিয়াছে, আর বস্তুবিমুখ চিন্তার প্রসার, ভাববাদ, একমাত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যতদিন বাস্তব জীবনযাত্রা জীবিকার প্রাচুর্যে ততটা গৌণ হইয়া উঠে নাই, ততদিন ভারতীয় সংস্কৃতিও তেমনভাবে তাল হারাইয়া ফেলে নাই—discipline বা শৃঙ্খলা-বোধ, organisation বা কর্মশক্তি, অকুণ্ঠ জীবন পিপাসা আপনাকে ততদিন আবেগ (emotion) বা কল্পনার (imagination) প্রবাহে চিন্তাশ্রিত অন্তর্মুখিতার—subjectivity'র, মধ্যে—ভাসাইয়া দেয় নাই।

কিন্তু এই subjectivity'র ভাবানুশীলনের তরঙ্গ যে কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে মানসলোকের আকাশগঙ্গায় বহিয়া চলাই যে স্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে, বৈদিক যুগেই তাহাও বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ তত্ত্বানুসন্ধানীরা তখন বৈদিক কর্মকাণ্ড ও প্রকৃতি পূজা ছাড়িয়া আত্ম-চিন্তায় ডুবিয়া পড়িয়াছেন। এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা স্বদেশীয় অপেক্ষাও বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট এক অপূর্ব মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক বলিয়া গত শতাব্দীতে বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছে। সত্যই তাহা মানসিক তৎপরতার প্রমাণ। কিন্তু তথাপি ভুলিবার নয়, ইহার মধ্যে ঋগ্বেদের অকুণ্ঠ জীবন-স্বীকৃতি নাই, আছে একটা একান্ত আত্মমুখিতা—সেই দুর্ধর্ষ মন যেন উপনিষদে অনেক স্থলে 'sicklied o'er with the pale cast of thought.' যাহা অমৃত নয় তাহাতে তাঁহাদের আর পিপাসা মিটিতেছে না। কারণ যাহা অমৃত তাহাই সত্য। জীবনের বাস্তব পিপাসা যতক্ষণ তৃপ্ত না হয় ততক্ষণ মানুষ এই পরম পিপাসার কথা টের পায় না। ক্ষুধার্ত উদর বেদান্তের কথা ভাবিতে পারে না—স্বামী বিবেকানন্দও এই কথাটিই স্মরণ করাইয়া দিয়েছেন। অন্নব্রহ্মের কৃপা সহজলভ্য হইলে মানুষ প্রাণ ও মনোময় কোষ ছাড়াইয়া বিজ্ঞানময় কোষের দিকে মন দিতে পারে। অবশ্য ভাববাদীর সেই মানসিক ভাবনাও পূর্ববর্তী ও সমকালবর্তী বাস্তব অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা ও মানসিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা নিয়মিত ও অনুরঞ্জিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈদিক যুগের শেষ দিকেই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হইল। হয়ত খণ্ড খণ্ড আর্য-অনার্য গোষ্ঠীগুলিও একীভূত হইতে তখন শুরু করিয়াছে—একই আর্য-শাসন জয়ী হইয়াছে। তাই বৈদিক বহু দেবতাবাদ ছাড়াইয়াও এক-দেবতার কল্পনা স্বাভাবিক হইয়াছে। তাই তখন মানবীয় দেহের রূপকে সমাজদেহকেও সাজাইয়া লইতে তাহারা চেষ্টা করিল। এই মানবীয় চিন্তা এক অর্ধসত্য লইয়া তখন হইতে ব্যাকুল হয়। তাহা এই : সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র

সমন্বিত প্রকৃতি ইহাদের চক্ষে মনে হইয়াছে স্থায়ী ও স্থির, চক্রাকারে চিরাবর্তিত। কিন্তু মানুষের আয়ু অল্প, সে মরণশীল, অমৃত নয়; তাহার জীবন-চক্র অস্থির, চঞ্চল, ক্ষণিক; অতএব নিত্য নয়, শাশ্বত নয়। আসলে জীবন কেন, প্রকৃতিও যে কত অস্থির ইহারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই; আর মানুষও প্রকৃতিরই একটি প্রকাশ ইহাও তাহাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। অমৃতের পিপাসা তাই তাহার পক্ষে আর কিছুই নয়—জীবমাত্রেরই জৈবধর্ম, সেই বাঁচিবার সাধ। এবং শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ করিয়া status quo অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজন। তাই তাহারা কেবলি অমৃতত্ব চাহিতেছিল, স্থিরতা খুঁজিতেছিল। ঘটনাপ্রবাহ ও গতিচঞ্চলতাই যে একমাত্র সত্য তাহারা তাহা বুঝিতেছিল না; ভাবিতেছিল, সত্য ইহার অতীত কিছু যাহা স্থির, অচঞ্চল, স্থাণু। গতিময় বিশ্বের উপর স্থাণুত্ব আরোপ করিবার প্রয়াসেই দেখা দেয় আধ্যাত্মিকতাবোধ, মর মানুষে অমর আত্মার আরোপ, পরিবর্তমান প্রকৃতির কেন্দ্রে এক অপরিবর্তনীয় বিশ্বাত্মার কল্পনা, আর সমস্ত চঞ্চল রূপকে গৌণ, এমন কি অসত্য ও মায়া বলিয়া পাশে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা। আসলে এই "a static application of a dynamic truth" পূর্ববর্তী কালের মন্ত্র-তন্ত্রেরও মূল, যজ্ঞাদি ক্রিয়ারও মূল, পরবর্তী তত্ত্বচিন্তারও মূল (*cf.* ***A Short History of Culture***, Lindsay, p. 40)। কিন্তু উদরজ্বালা যেখানে উগ্র সেখানে বাস্তবজীবনের এমন মায়া পরিহার অবকাশ জোটে না—তাই বিকার প্রচণ্ড দাবী চিন্তাকেও শাসনে রাখে।)

বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপ

এই জীবন বিমুখতা বৈদিক যুগের পরে দেখি বুদ্ধদেবের চিন্তায়ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—তত্ত্বচিন্তায় তিনিও পাগল হইয়া বাহির হইলেন। যে মতবাদ 'নির্বাণকেই' জীবন জ্বালার চরম অবসান বলিয়া স্থাপন করিতে অগ্রসর, তাহার পক্ষে জীবনের প্রতি মমতা না থাকাই স্বাভাবিক। নির্বাণ-বাদও যেন উপনিষদের ব্রহ্মবাদের আর এক ধারা, উহা বস্তুবাদ নয়, তাহা স্পষ্ট। কর্মবাদ ও জন্মজন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়া উহা শুধু দর্শনে নয়, সমাজেও বিপ্লব-বিমুখী ভাববাদের প্রশ্রয় দিয়াছে। অবশ্য পার্থক্যও সুস্পষ্ট। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনো উত্তর দিলেন না, আত্মার অস্তিত্বও মানিলেন না, বরং দেখিলেন সবই অনিত্য, সবই ক্ষণিক, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহও কিছুই নাই, 'বিচ্ছিন্ন প্রবাহ'ই চলিয়াছে (দ্রষ্টব্য, 'দর্শন দিগ্‌দর্শন', রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পৃঃ ৫১২)—জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া শুধু কর্মের জ্বলন্ত শিখা পুড়িতেছে—সমস্তই পুড়িয়া যায়, পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইলেই হইল নির্বাণ। জীবনে তাই চাই শুধু এই সত্যকে স্বীকার—ক্ষমা, মুদিতা, মৈত্রী, উপেক্ষার অনুশীলন।

এইরূপ চিন্তার উপরে আধুনিক বাস্তব বোধ আরোপ করা অবশ্যই ভুল; কারণ তাহা হইলে ঐতিহাসিক নিয়মধারাকেই অস্বীকার করা হইবে। কর্মতত্ত্ব ও জন্মান্তর যেমন সেই প্রাচীনের সামাজিক অবস্থার সম্ভাবনা ও ভাবনার পরিণতি, তেমনি বুদ্ধদেবের 'অনাত্মবাদ' ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা' প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন 'সাংখ্যের' সহিত সংযুক্ত। বলা বাহুল্য, সাংখ্য খাঁটি বস্তুবাদ (Realism) নয়; ইহা পরিচিত ভাববাদও (Idealism) নয়। মানুষের মন প্রাচীনকালে যতটুকু বস্তুনিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইত তাহারই এক পরিচয় বৈশেষিক দর্শনে (কণাদে) এবং অন্যতর পরিচয় সাংখ্যে দেখিতে পাই—কোনোটিই বস্তুবাদ নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় বস্তুবাদের দর্শন ছিল চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শন। তাহার সামান্যই টিকিয়া আছে। যাহা টিকিয়া আছে তাহা কিন্তু সবল ও সরস। আর ইহা যে 'লোকায়ত' তাহা হইতে বুঝা যায়, অলস শ্রেণী যতই ভাববাদে বুঁদ হইতে চান, জনসমাজ বাস্তবকে ভুলিতে পারে না, এবং সমাজের ও ধর্মের চিরাগত প্রথা নিয়মের সহিত তাহারা জীবন-যাত্রার পার্থক্য জানিত। তথাপি সাংখ্যতত্ত্বের অপেক্ষাকৃত বাস্তবনিষ্ঠাই কপিল

ও গৌতম বুদ্ধকেও একেবারে পথ হারাইতে দেয় নাই বরং এইরূপে তাঁহাকে কতকটা জীবননিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে।

অন্যদিকে বৌদ্ধ মতবাদ কার্যত এক অত্যন্ত স্বাভাবিক বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিল। সামাজিক জীবনের যাহা পরম প্রয়োজন, সহজ জীবনযাত্রার যাহা একমাত্র পাথেয় বৌদ্ধধর্মের পথ তাহাই—ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রভৃতি 'আর্য অষ্টমার্গ' এই পথ। বৌদ্ধ পথ 'মধ্যম পথ'—ইন্দ্রিয় লালসারও নয়, ইন্দ্রিয় সংহারেরও নয়, ইন্দ্রিয় সংযমের নিশ্চয়ই। এই পথ এক সমন্বয়-সন্ধানী বস্তুনিষ্ঠ চেতনার আবিষ্কার—যে চেতনা সমাজের দাবীকে সশ্রদ্ধচিত্তেই গ্রহণ করিয়াছে,—বুঝিতেছে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এইভাবে একটা সুসঙ্গতি রাখা যায়; আর চিন্তার ক্ষেত্রেও একেবারে উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ ও লোকায়ত বস্তুবাদের মধ্যে সেইরূপে সমন্বয় খুঁজিতেছে।

বুদ্ধদেবের সমস্ত মতবাদকে এই দৃষ্টিতে যাচাই করিলে বুঝিতে দেরী হয় না যে, তখনকার সামাজিক পরিবেশে এই সংস্কারবাদী বৌদ্ধনীতির প্রয়োজন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। "বেদহীন" "জাতিহীন" মতবাদের পিছনে শ্রেণীবিবোধ ছিল—তাহা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ। মনে রাখা প্রয়োজন, বুদ্ধদেব জন্মিয়াছিলেন এক ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে; মরিয়াছিলেনও এক ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে; তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে সেকালের ধনাঢ্য বণিক এবং রাজা ও সম্রাটরাও অবশ্য ছিলেন। তিনি সমাজসাম্য চাহিবেন ইহা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রেণী-বৈষম্যকেও পারিলে তিনি অস্বীকার করিতেন তাহাও স্পষ্ট—ইহা প্রমাণিত হয় তাঁহার বৌদ্ধসঙ্ঘের নিয়মাদি হইতে, গণতান্ত্রিক (অভিজাত) রাষ্ট্রগুলির প্রতি তাঁহার উদার উপদেশ হইতে (দ্রষ্টব্য দর্শন দিগ্‌দর্শন, পৃঃ ৫০৮)। তথাকথিত আর্য-অনার্য বা আসলে সেদিনকার নিম্নশ্রেণীর বিরোধের মুখপাত্র হইয়াছিলেন বোধ হয় সেদিনকার এই ক্ষত্রিয়রা। সেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজে বুদ্ধদেব (১) এক কেন্দ্রাভিমুখী সংগঠন, (২) এক জনসমন্বয়ী ব্যবস্থা, এবং (৩) এক জীবননিষ্ঠ মানসিক নীতি বা বিনয় পরিপাটির (code of ethics) নির্দেশ দান করিলেন। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এক সমাজরক্ষী ধর্মরূপে উদিত হয়। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে সমাজের জনগণের এক প্রতিষ্ঠান; কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জীবননিষ্ঠ মানুষের এক প্রতিরোধ। ক্ষত্রিয় শক্তি স্বভাবতই ইহাকে সমর্থন করিল, ইহাই বৌদ্ধধর্মের সামাজিক সার্থকতা। এবং ইহার বৈপ্লবিক ব্যর্থতা এই যে, বুদ্ধদেব ধনিক-বণিকের উন্নতির পথ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহেন নাই. তাব শত সত্ত্বেও উহা সংস্কারবাদী।

প্রথম সামন্ত সাম্রাজ্য

জীবনের বাস্তব উপকরণে কতদূর পরিবর্তন তখন সাধিত হইয়াছে বলা কঠিন। কিন্তু 'জাতকের' কথাসমূহ এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' যে স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সেই কৃষিযুগে গৃহশিল্পের প্রসার কম হয় নাই; অনাথপিণ্ডদের মত বণিকেরা বেশ প্রবল। পণ্যবণ্টন ও বিনিময় সূত্রে স্বার্থবহদল দেশদেশান্তরে চলিয়াছে আর বণিকগণ সমুদ্র পারাপার করিতেছে। ব্যবসায়ী সংঘ ও শিল্পী কারিগরের গিল্ড্ (ইহারই নাম ছিল 'শ্রেণী') গঠিত হইয়াছে, ছোট ছোট রাজ্যসীমা ইহাদের উদ্যোগ বিস্তারের পক্ষে বাধা। রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহও লাগিয়া থাকে, বাণিজ্য ব্যাহত হয়; তাহা ছাড়া উদয়ন, প্রসেনজিৎ, প্রদ্যোত, বিম্বিসার প্রভৃতি রাজগণের মধ্যে চলিয়াছে সংগ্রাম। রাজ্য-বিস্তারে তাঁহাদেরও আগ্রহ। কিন্তু অভিজাততন্ত্র রাষ্ট্রও (শাক্য, লিচ্ছবি প্রভৃতি) রহিয়াছে, তাহাদের 'সংঘাগার'ও আছে। ইহারাও সংগ্রামে কুণ্ঠিত নয়। ইহারই মধ্যে একই কালে দুই পূর্বদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজকুমার—সিদ্ধার্থ ও মহাবীর—বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেন। তাঁহাদের দুইটি বিষয়ে অপূর্ব মিল—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অবিশ্বাস তাহার একটি, অন্যটি তাঁহাদের প্রচারিত অহিংসাবাদ। ব্রাহ্মণ শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের অন্যান্য স্তরের যে বিদ্রোহ ধোঁয়াইতেছিল,

বুদ্ধি ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ক্ষত্রিয় মনস্বীরা ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞের সেই আনুষ্ঠানিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি অসার প্রমাণিত করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে আরও ম্রিয়মাণ করিলেন। এই বিদ্রোহের নেতা অবশ্যই অগ্রগামী ক্ষত্রিয়দল। অন্তত মগধ-বিদেহের মত প্রাচ্যদেশে দেখি ক্ষত্রিয়রাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ব্রাহ্মণরা নয়। তাঁহাদের একটি শক্তিকেন্দ্র ছিল অনাথপিণ্ডদের মত বণিকগণ আর তাহাদের সর্বশ্রেণীর অনুচরবৃন্দ। এই বৌদ্ধ অভ্যুত্থানের প্রথম ফলই এই :—(১) বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় শ্রেণীবিভক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডী অগ্রাহ্য করিয়া জনসমাজের দাবী সেই যুগের মত কতকাংশে স্বীকার করিল। তাই বৌদ্ধধর্মে বর্ণ বা শ্রেণী ভেদ নাই। উহার বিনয় পরিপাটি (নীতি ও ধর্ম) সকলেরই পালনীয়, এবং তাই সহজবোধ্য। বৌদ্ধসংঘে সকল শ্রেণীর প্রবেশের অধিকার রহিল। উহাতে একত্র হইয়া সামূহিক নির্ণয়ের নির্দেশ আছে। বৌদ্ধদের 'মহাসঙ্গীতি' শুধু এক বিপুল জনসমাবেশ নয়, এক বিশাল জনসভা। বৌদ্ধধর্মের প্রচারপদ্ধতিও তাই সরল হইল, সহজবোধ্য জনগণের ভাষায় সাধারণের কথাগল্পে রূপান্তরিত হইল (তুলনীয় খৃীস্টের পদ্ধতি)। (২) বৌদ্ধসংঘকে কেন্দ্র করিয়া এক কেন্দ্রাভিমুখী সমাজগঠনের আভাসও ইহার মধ্যে দেখা যায় (তুলনীয় রোমান্ ক্যাথলিক চার্চ)। খণ্ড কলহপরায়ণ রাজন্যবর্গ ও নানাজাতি লইয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপনের যেই প্রয়োজন অনুভূত হইতেছিল ইহা যেন তাহারই অনুলিপি (দ্রষ্টব্য ***India Through the Ages***, J. N. Sarcar)। মৌর্য সাম্রাজ্যের যে প্রাগ্-অশোকরূপ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও মেগাস্থেনিসের ভারত-বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে মৌর্য centralism বলিলেই ভালো হয়। ইহাতে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রথম কেন্দ্রিত সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা দেখা যায়। তাহার শিল্পযূথে 'শ্রেণী'-প্রবর্তন বর্তমান 'Corporate State'র একটি প্রাথমিক সংস্করণ। শূদ্রাজাত (?) মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের পরে মৌর্য অশোকের সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ সংগঠনী ধারার এই দিকটি আরও পরিপুষ্টি লাভ করে! ইহা যেন Holy Roman Empire-এরই এক প্রথম ভারতীয় রূপ। শূদ্র সম্রাটগণের স্বভাবতই বৌদ্ধধর্মের সংস্কার-প্রয়াস ও বর্ণ-বিরোধী নীতিতে আকৃষ্ট হইবার কথা—ফলত বৌদ্ধধর্মের মত সেদিনকার শূদ্রস্থাপিত মৌর্য-সাম্রাজ্যও সেদিনকার সমাজ-দ্বন্দ্বের সূচক। পরবর্তীকালে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের উত্থানে ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধে (Orthodox Counter-Revolution)-প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয় (দ্রষ্টব্য ***Manu and Yajnavalkya***, Jayaswal, p. 40 48 এবং তৎসহ ডাক্তার ঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী)। আর, এই সময়েই সম্ভবত ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ও রামায়ণ মহাভারতাদির প্রথম সংকলন আরম্ভ হয়; ব্রাহ্মণ্যবাদের নতুন করিয়া আত্মসংস্কার ও সংগঠন চলে। নিছক সংরক্ষণশীল সামাজিক ও মানসিক প্রয়োগের বিচারে এই প্রয়াসকে তুচ্ছ করাও অসম্ভব।

কিন্তু আলেকজেণ্ডারের অভিযানকাল হইতেই হয়ত ভারতবর্ষ একরাষ্ট্রিক শাসনের প্রয়োজন বোধ করে। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের শাসনে আপনার ঐক্য সম্বন্ধে সে ক্রমশ সচেতন হইয়া উঠিতে থাকে। এমন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ভারতবর্ষের ভাগ্যে আর জোটে নাই। (পরে গুপ্তযুগে হিন্দু তীর্থযাত্রার ও ধর্ম-পালনের নিয়ম হয়ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় একত্ববোধটিকে দৃঢ় করিয়া দেয়)। কিন্তু বৌদ্ধ প্রেরণা ও এই বৌদ্ধ সংগঠনশক্তিই মৌর্যসাম্রাজ্যের সহায়তায় ভারতীয় ভৌগোলিক বন্ধনকে ছাড়াইয়া জলপথে ও স্থলপথে ভারতকে পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করে তাহার সংস্কৃতিকে দেশে দেশে প্রসারিত করিয়া দেয় (দ্রষ্টব্য ***Indian and Indonesian Art***, **A. Coomarswami**)। বৌদ্ধধর্মের একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ছিল। এই ধর্মবিজয়ে সেদিনকার বণিকসমাজেরও যে বাণিজ্য প্রসারের দুয়ার খুলিয়া গেল, তাহা নিঃসন্দেহ; —অবলুপ্ত খোটানের পুঁথিপত্রে পর্যন্ত তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।

বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীর্তি

এই অভ্যন্তরীণ ঘটনা-প্রবাহে ও বাহিরের সম্পর্ক-সংঘর্ষে মিলিয়া ভারতীয় সমাজ যে নতুন ছাঁদে গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তাহা বুদ্ধদেবেরও স্বপ্নাতীত ছিল। তাই কয়েক শত বৎসর পরে ভারতীয় সমাজ যখন পারসীক যবন, শকদের আগমনে জীবনে ও চিন্তায় জটিল হইয়া উঠিল, সেই জটিল বাস্তব পরিণতিতে বৌদ্ধ মতবাদেও কালক্রমে জটিলতা ও বৈচিত্র্য দেখা দিল। আলোড়িত সেই ভারতীয় সমাজের চিত্র ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিবর্তমান রূপে লাভ করা যায়—বিদেশীয়দের ভারতীয়করণ বৌদ্ধধর্মের এক প্রধান কীর্তি। বুদ্ধদেব 'শাস্তা'র আসন হইতে ধীরে ধীরে মুক্তিদাতার আসনে উঠিয়া গেলেন—ইহাতে বেদোপনিষদের বিরাট পুরুষ বা বৌদ্ধ ধর্মের স্থির জ্ঞানমার্গের পরিবর্তে মানুষ জীবন্ত কিছু পাইল। জনসেবকের এই পরিণতি তখনকার দিনে স্বাভাবিক। জনশ্রেণীর আশাকে যিনি সঞ্জীবিত করেন স্বভাবতই তিনি অপ্রাকৃত শক্তির অধিকারীরূপে কল্পিত হন, শীঘ্রই অবতারে পরিণত হন। বুদ্ধ-জরথুস্ত্র হইতে লেনিন পর্যন্ত Culture Hero-দের এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই নতুন মানবীয় আবেগ এক অভিনব পথে আবার প্রকাশিত হইতে লাগিল—তাহা বুদ্ধমূর্তি। ভারতীয় শিল্পের জন্ম হয় বৌদ্ধ অশোকের প্রেরণায়। সাঁচী, ভাবহুত, অশোকস্তম্ভ আজ সুপরিচিত। আমাদের শিল্পের জাগরণ জাতকের কাহিনীতে চিত্রিত। দক্ষিণে অন্ধ্র রাজ্যের অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডে ইহার সুরম্য দান একটু পরেই বিকশিত হইয়া উঠে। কয়েক শত বৎসর আবার তাহার বিকাশ উত্তরে গান্ধারে। ইহার কতটুকু প্রাচীনতর ধারার উদ্বোধন,—যে ধারা পূর্বেও নানা মূর্তি গড়িতেছিল পশ্চিম-উত্তরে, দক্ষিণে, তক্ষশিলায়, ভিড়এ, লৌড়িয়া নন্দগড়ে মৃত পূর্বপুরুষের সমাধিস্তূপ সাজাইতেছিল,—এই মূর্তিপূজা কতটুকুই বা য়ুনানীদের সম্পর্কে প্রাপ্ত তাহা অনিশ্চিত। য়ুনানীরা তখন ঈরানে, গান্ধারে, কপিশায় অধ্যুষিত, ভারতেও নানাস্থানে পরাক্রান্ত। আর এদেশে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া তাহারা য়ুনানী ছাঁদে বুদ্ধকাহিনী রচনা করিতেছে কিংবা হেলিওডোরসের মত বিষ্ণুভক্ত হইয়া গরুড় স্তম্ভ নির্মাণ করিতেছে। গান্ধার শিল্পে তাহাদেরই প্রেরণা ও পদ্ধতি সবল। প্রথম দিকে এই উৎকীর্ণ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধের মূর্তি থাকিত না, শুধু প্রতীক স্বরূপে অঙ্কিত হইত তাঁহার পদদ্বয়। তাহার পরে আর সে দ্বিধা রহিল না, নানা আসনে নানা রূপে ভগবান তথাগত আবির্ভূত হইলেন। ইহাতে কুশান যুগ হইতে আবার ভারতশিল্পের নবজন্ম হইল। মন্দিরে, মঠে, বিহারে, চৈত্যে, পর্বতে, গুহায় বৌদ্ধধর্ম শিল্পের জোয়ার ডাকিয়া আনিল। হিন্দু ও জৈনধর্মও তাহার দুকূলপ্লাবনী ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। (দ্রষ্টব্য ***Civilisation in the East***, Vol II, Rene Grousset)। অন্য দিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কীর্তি তাহার ন্যায়শাস্ত্র। যবন (গ্রীক) দর্শনের সঙ্গে তাহার মুকাবিলা করিতে হয়। নাগসেন, নাগার্জুন, বসুবন্ধু, ধর্মকীর্তি (৬০০ খৃীঃ)—ইহাদের আশ্রয় করিয়া এই ধারা বহিয়া যায়।

পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি

এই পরবর্তী বৌদ্ধধারাকে সহস্র গুণে প্রশস্ত করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম আবির্ভূত হইল—আর পরেকার (খৃীঃ ২০০-১,০০০) সাত-আটশত বৎসরে তাহা যেরূপ বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া একটা বিষম ও বিশৃঙ্খল রূপ লাভ করিল তাহাতে তাহাকে আর বৌদ্ধ ধর্ম না বলিলেও চলে। তাহার ফলে পুরাতন হিন্দুধর্ম ও তাহার কঠিন জাতিবন্ধনই আবার মানুষের চেতনায় সমাজ-শৃঙ্খলার ও সমাজ-সংগঠনের

একমাত্র পথ বলিয়া প্রতিভাত হইল। হিন্দুধর্মে আহারে-বিহারে, বিবাহে-ক্রিয়াকর্মে শুচিতা প্রাধান্য পায়। খৃস্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দেও শক ও তুরানী গোষ্ঠী রাজন্যশক্তিরূপে বিভিন্ন কেন্দ্রে বৈষ্ণব বা শৈব হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-নীতির আশ্রয় লইতেছিল। কিন্তু সনাতন হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল গুপ্তযুগে আসিয়া। তখনো বৌদ্ধ শিল্প, বৌদ্ধ দর্শন কিছুমাত্র স্তিমিত হয় নাই। কিন্তু ইহার পরবর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন কালের শেষে হর্ষবর্ধন যতই বৌদ্ধ ধর্মের মহিমা প্রসারে উদ্যোগী হউন, বুঝা যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্ব কালের অধিকাংশ শক্তিই হারাইয়া ফেলিতেছে—নানা উদ্ভট শৃঙ্খলাহীন'বাদে' বৌদ্ধ চিন্তা ও জীবনযাত্রা তলাইয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ-চিন্তার সেই ক্রমাবসান যে বাস্তব ও সামাজিক দুর্যোগের সূচক তাহার সম্পূর্ণ হিসাব নাই, কিন্তু পরবর্তী কারণগুলি হইতে তাহা অনুমান করা চলে। যেমন (১) বৌদ্ধ সংঘগুলির বিপুল প্রভাবে দেশের রাষ্ট্রশক্তি নির্জিত হইয়া পড়িতেছিল ; আর দেশের জনশক্তিও সেই ভিক্ষু সম্প্রদায়ের নিকট অবজ্ঞেয় ও শোষণেরই বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ এই বৌদ্ধ সংঘের তখন কোনো সামাজিক দায়িত্ব নাই, এমন কি আত্মরক্ষারও শক্তি নাই। (২) গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষে তরঙ্গের পর তরঙ্গে যে হূনদল ভারতবর্ষের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা সেই ধর্মের মধ্যে নিজেদের জীবন-যাত্রা, ভাবনা-ধারা মিশাইয়া দিল, বৌদ্ধ সমাজেও তেমনি শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য ধ্বংস করিয়া ফেলিল। হয়ত বাস্তব জীবনযাত্রায়ও সেই যাযাবরেরা ছিল নিম্নস্তরের। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি আর একবার বাহিরের আঘাতে পর্যুদস্ত হইল। (৩) বৌদ্ধ-সংঘে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার থাকাতে নারীর প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছিল। নতুন করিয়া তাই আবার নারী 'শক্তি'রূপে আবিষ্কৃতা হইলেন ; মনে পড়িল নারীই মানুষের জীবধাত্রী প্রকৃতির প্রতীক। সমকালবর্তী হিন্দুরাও এই আবিষ্কারকে অঙ্গীভূত করিয়া লইতে দেরী করিল না। কিন্তু যেখানে জীবনযাত্রায় নারী গৌণ সেখানে এই মিথ্যা নারী প্রাধান্য মিথ্যাচারেরই কারণ হইতে বাধ্য। বিশেষত মঠে ও সংঘে যেখানে এই ভিক্ষুক-ভিক্ষুণীদের দায়িত্ব রহিল না কিছুই, কিন্তু হাতে রহিল অগাধ ধনৈশ্বর্য, সেখানে বিকৃতি অনিবার্য হইয়া উঠিবার কথা। অবস্থাটা প্রায় 'হলিউডের'ই একটা পূর্বাভাস—আধুনিক পাশ্চাত্য ধনিকসমাজের একটা প্রাচীন সংস্করণ। (৪) অথচ এই বিস্তৃত কালের মধ্যে কৃষি সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ঘটিয়াছে, জন সংখ্যা বাড়িয়াছে, যানবাহনের প্রসার ঘটিতেছে ; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলায় তথাপি তাহার পরিপূর্ণ স্ফূর্তি সম্ভব হইতেছে না। এমন কি, যে অখণ্ড একরাষ্ট্র মৌর্যেরা গঠন করিতেছিল বাহিরের আক্রমণে তাহাতেও বাধা পড়িল। মিনেন্দার, কনিষ্কের মত সম্রাটরা মধ্য এশিয়ার দিকে ভারতীয় বণিকের ও ধর্ম-প্রচারকের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য প্রসারে কতটা সহায়ক হইতে পারিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। এক সময়ে জলপথে ও স্থলপথে এই বাণিজ্যগতির পক্ষে বৌদ্ধ যুগ সহায়ক হইয়াছিল। কিন্তু শেষ দিকে শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের ধনৈশ্বর্য ভিক্ষুদের লুব্ধ মুষ্টি এড়াইবার হয়ত পথ খুঁজিতেছিল (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেণের মেয়ে" গ্রন্থে বাংলা দেশের দ্বাদশ শতাব্দীর চিত্র দ্রষ্টব্য) ; হিন্দু সমাজের সংযত ব্রাহ্মণ্য-শাসন তখন বণিকের আশ্রয়স্থল হইল। ব্রাহ্মণ্যবাদী এই বৈশ্য সম্রাটদের নিকটে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রাধান্য লাভ করিল, সমাজের এই বাস্তব ও জাগ্রত শক্তিচয় বাধা পাইল না ; সেখানেই সেই ভারতীয় সমাজের চরম প্রকাশ ফুটিয়া উঠিল। এই পরিবেশ একটি-বার মাত্র প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনে ঘটিয়াছে ; তখনো বৌদ্ধ মহাযান যুগেরই মধ্যাহ্নকাল। মনে হয় গুপ্ত সম্রাটেরা বৌদ্ধ ধর্মকেও প্রসারের ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিতেন—বৌদ্ধ শিল্পকলা ভারতবর্ষে তাঁহাদেরই আমলে চরম সৃষ্টিতে সার্থক হয়। কিন্তু এই পরিবেশ সৃষ্টি করিল, সমাজে চিন্তায় এই শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করিল, সাহিত্যকলায় তাহার সহস্রদল ছড়াইয়া দিল—কোনো পরম সৌগত বৌদ্ধ সম্রাট নয়। মগধের পরম-ভাগবত গুপ্ত সম্রাটরা। ভারতবর্ষকে তাঁহারা আর একবার ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন ; প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির তখনি এক সুদীর্ঘ উৎসব গিয়াছে। যতদিন সেই শান্তি, সেই শৃঙ্খলা, সেই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় হূনদের আক্রমণে একেবারে ভাঙিয়া না পড়িল, ততদিন ভারতীয় কৃষি-সংস্কৃতির এক বিকাশ-বৈভবের যুগ ছিল।

গুপ্তসাম্রাজ্যের কীর্তি

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান দান—হিন্দু সংস্কৃতি। তখনি নতুন করিয়া ভাষা ও সমাজ গঠিত হইতে লাগিল—পুরাণ গ্রথিত হইল, পৌরাণিক হিন্দু সমাজের পত্তন হইল। শিল্প ও ভাস্কর্যের সে এক স্বর্ণযুগ। অজন্তার ১৬ ও ১৭নং গুহা, সাবনাথ, দেওঘর, ভিতরগাঁও প্রভৃতির মূর্তি ভারতবর্ষের চিরন্তন গৌরব। কিন্তু সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূর্তি, নালন্দার তাম্রনির্মিত সুবৃহৎ (৮০ ফুটের) বুদ্ধমূর্তি, এবং সর্বোপরি দিল্লীর লৌহস্তম্ভ গুপ্তযুগের কারুশিল্পের যে বাস্তব প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে, তাহাও তেমনি বিস্ময়কর। পরবর্তীকালে এই লৌহ ঢালাই ও তাম্র ঢালাইর প্রক্রিয়া বিস্মৃত হইয়া পড়ে। মানুষের সেদিনকার সভ্যতা যে কত গণ্ডীবদ্ধ ও স্বল্পায়ু ছিল প্রসঙ্গত উহা তাহারও এক প্রমাণ। কিন্তু গুপ্তযুগ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে যত অগ্রসর হইয়াছে, শুধু এই লৌহ স্তম্ভাদি হইতেই যে তাহা বুঝা যায় এমন নয়। আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তাদি তখন গণিত ও জ্যোতিষের কঠিন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতেছেন। মহাকবি কালিদাস কাব্য লিখিতেছেন; শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক অভিনীত হইতেছে। কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবর্ধন যবদ্বীপকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়া নানকিং-এ দেহলীলা শেষ করিতেছেন। ফা-হিয়েন দেখিয়া গেলেন সুসমৃদ্ধ, শান্তিময়, সুসভ্য জাতির দেশ—যেখানে চৌর্য প্রায় নাই, মদ্যমাংস প্রায় বর্জিত হইয়াছে, বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ দুইই সমমর্যাদায় বাস করে—বৌদ্ধ বসুবন্ধু পরম ভাগবত সমুদ্রগুপ্তেরও সুহৃদ।

গুপ্তযুগ শেষ হইল বাহিরের আঘাতে। বর্বর হূনের দল প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি ও তাহার শাসক-শ্রেণীকে নিঃশেষ করিল, কিন্তু নতুন কিছুই স্থাপন করিতে পারিল না। সমাজ-শক্তি আর অখণ্ড রাষ্ট্রকেন্দ্র লাভ করিতে পারিল না—হর্ষবর্ধনের পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে নানা বিরোধী ধারার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে পরিবর্তিত হইয়া চলিল—পরিবর্ধিত হইতে পারিল না। (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী)। সাম্রাজ্যগঠনের চেষ্টা শেষ হইলে খণ্ড খণ্ড 'বৌমী রাজতন্ত্র' বা 'সামন্ততন্ত্রের' দিন আসিল। বারে বারে এই সাম্রাজ্য সংগঠনের ব্যর্থতার ফলেই ভারতবাসী এক রাষ্ট্রজাতি বা 'নেশন' হইবার সুবিধা পায় নাই, বহুজাতির দেশ ও সমাজ হইয়া রহিয়াছে। 'অখণ্ড ভারত' চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বপ্ন—অতীতে তাহা সফল হইলে এযুগে আমরা ভারতবাসী 'অখণ্ড ভারতীয় নেশন' হইয়া উঠিতে পারিতাম। তাহা হয় নাই, এখন যাহা সম্ভব তাহা এই—বহু-জাতিক রাষ্ট্র সংগঠন—বহু জাতি লইয়া মহাজাতি গড়া। সেই ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যে এখানে ওখানে জীবনের প্রয়াস না ছিল তাহা নয়—যবদ্বীপে, চম্পায়, কম্বুজে ভারতীয়রা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল, তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার চলিল, চীনে কাশ্মীরের দূত গেল, বাঙলায় পাল-সাম্রাজ্য এক নতুন তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত উত্তরাপথে শকবংশীয় নরপতিরা রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজে উন্নীত হইলেন, নানা রাজবংশ নানা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তন করিলেন, তাহাদের প্রসাদে সামন্ততন্ত্রের বিবিধ সৃষ্টি সেই সব রাষ্ট্র-গণ্ডীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেও লাগিল। কিন্তু সেই জাতীয় সমাজ ও তাহার বহুখণ্ডিত রাজশক্তি আর বাহিরের একটি আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াইবার শক্তি পাইল না। হিন্দুযুগ শেষ হইল—সংস্কৃতির এক পর্বান্ত হইল।

"হিন্দু সংস্কৃতি" বলিতে যাহা আমরা বুঝি তাহার বিকাশ এই গুপ্ত-সম্রাটদের সময়ে—তাহার অবসান এখনো হয় নাই। কারণ শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতির যুগ পার হইয়া বিবেকানন্দ অরবিন্দের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়, এমন কি, নানা সাধক সম্প্রদায়ের প্রয়াসেও তাহার সেই নবায়মান প্রকৃতির নানা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির সুপ্রভাত সেই গুপ্তযুগ—উহার সামাজিক মানসিক পরিবেশ এক নতুন অভ্যুদয়ের পরিচয় বহন করে। তাহারও পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত যে জীবনযাত্রা চলিয়াছিল তাহাও প্রধানত কৃষিমূলক; শিল্পের ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের

অভাব নাই ; মুদ্রারও প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু এত বড় দীর্ঘ যুগেও রোম সাম্রাজ্যের মত 'money community' বা 'কাঞ্চনকৌলিন্য' ভারত সংস্কৃতিতে কোন কালেই স্থাপিত হয় নাই। শ্রেষ্ঠী অপেক্ষা গুপ্তরাজ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব ছিল বেশি। অপর দিকে হয়ত এতদিনকার বৌদ্ধ প্রভাবে মদ্য মাংসাদি তখন হইতেই অশাস্ত্রীয় হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃত রাজাদের ভাষা হইয়াছে। পুরাণ ও শাস্ত্র নতুন করিয়া প্রাকৃতজনদের জীবনকে সুসংস্কৃত করিতেছে। মোটের উপর গুপ্তযুগ যেন এক সদাচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অভিজাত শ্রেণীর পুনর্জাগরণ। এই বিংশেই এই যুগের হিন্দু সংস্কৃতির সহিত বৌদ্ধ বা তৎপরবর্তী অন্যান্য ভারতীয় প্রয়াস ও চিন্তার পার্থক্য মনে পড়ে—যেমন, নাথ সম্প্রদায়ের, সহজিয়াদের, চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতির। সাধারণ মানুষও অভিজাতদের নানা সহজ সংস্কার ও প্রথাকে স্বীকার করিয়া লয়, পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি শৃঙ্খলা সংযম প্রভৃতি অভিজাত গুণাবলীকে বড় করিয়া দেখে। এই সংস্কৃতির আদর্শে এক আভিজাত্য আছে। এই আভিজাত্য সূচিত হয় কয়টি মানসিক দানে,—প্রথমত আত্মসংযমে, দ্বিতীয়ত অহিংসায়, তৃতীয়ত পরমতসহিষ্ণুতায়, চতুর্থত সত্যানুসন্ধিৎসায়। সমগ্র হিন্দু সংস্কৃতির মেরুদণ্ড এই আভিজাত্যচেতনা ; উহা বর্ণাশ্রম ধর্মেরও ভিত্তি। বারে বারে ভারতবর্ষের পক্ষে অতি বৃহৎ বর্বর আক্রমণের ও বিশৃঙ্খলার শেষে এই আত্মসংযত, নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাত্রার ও চিন্তাধারার বড় প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই আক্রমণে ও মাৎস্যন্যায়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীর দুর্ভাগ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বণিক শ্রেণীর ধন ও ব্যবসা বিনষ্ট হইয়াছে। তাই নিম্নশ্রেণীও এই ব্রাহ্মণ্যবাদী আভিজাত্য শাসন তখন প্রায় স্বচ্ছন্দে মানিয়া লইয়াছে—মনে মনে বুঝিয়াছে, এই শৃঙ্খলা স্বীকারেই তাহার আপন সার্থকতা। মোটের উপর এই অভিজাত ব্যবস্থাই ব্রাহ্মণ্যধর্ম—'ব্রাহ্মণিক কালচার।' গুপ্ত সম্রাটদের সময় হইতে ইহাই এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতিরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

মনে রাখা দরকার, পূর্বাপর হিন্দু সংস্কৃতির বনিয়াদ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। শ্রেণীভেদ সেই বৈদিক সমাজেও চিন্তায় ভাবনায় তাহার দুস্তর ছাপ রাখিয়া যাইতেছিল, আমরা তাহা দেখিয়াছি। 'জন্মান্তরবাদ' ও 'কর্মবাদ' এই পৃথিবীর বঞ্চিতদের প্রবোধ দিবার ও সান্ত্বনা পাইবার মত এক অদ্ভুত মতবাদ। 'পরলোক', 'তত্ত্বমসি'ও সেদিকে বেশ কার্যকরী হয়। পরবর্তী হিন্দু-সংস্কৃতি এই শ্রেণী-বৈষম্যের বনিয়াদকে পাকা করিয়া লইয়াছে 'অধিকারভেদ' নামক নীতি সুপ্রচলিত করিয়া—বঞ্চিতের পক্ষে আত্মহত্যার এমন নীতি আর নাই। হিন্দুর সমস্ত দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এই বৈষম্যবাদের দ্বারা জর্জরিত। দেখিতে পাই এই হিন্দু-সংস্কৃতির চক্ষে সমাজের উৎপাদক-শ্রেণীর স্থান কত নিম্নে। তাহারা রহিল শূদ্র ও অন্ত্যজ হইয়া, মানুষের অধিকার হইতে তাহারা সর্বভাবেই বঞ্চিত হইয়া রহিল। প্রায় তেমনি বঞ্চিত রহিল স্ত্রীজাতি। হিন্দুসমাজের পরমত-সহিষ্ণুতার অর্থ তাহা হইলে এই—এই সমাজের জনগণের অর্থাৎ অধিকাংশের মন ও মতের একেবারে ধ্বংস-সাধন। তাহার অহিংসার অর্থ—গো-ব্রাহ্মণেরই রক্ষা। এবং তাহার সত্যানুসন্ধিৎসা, এক অসাধারণ মানসক্রিয়া—পৃথিবীর রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধকে উহার বলে সে তত্ত্ব হিসাবে উড়াইয়া দেয়, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার তিলার্ধও তাই বলিয়া ত্যাগ করিতে চায় কত জন? আর হিন্দুর সংযমনিরত সাত্ত্বিক জীবনযাত্রার অর্থ দাঁড়ায় শুধু অসংখ্য স্মৃতির অনুশাসন, শেষ পর্যন্ত পঞ্জিকা ও বিধি-নিষেধ। এই কথা মনে করিবারও কোনো কারণ নাই যে, ইহা শুধু আজকার (বা মুসলমান আমলের) 'পতনে'র জন্যই ঘটিয়াছে—পূর্বাপর হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সমাজ যে বনিয়াদকে অটুট রাখিতে চাহিয়াছে তাহাতেই এই পতন অবশ্যম্ভাবী হইতে বাধ্য। আজ শুধু আমরা সেই অধ্যায় সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছি।

তবে মানিতে হইবে, সেই হিসাবে গুপ্তরা একান্তভাবে প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাধারী ছিলেন না। তখনকার মত গুপ্ত সম্রাটদের ভূমিকা ছিল সাময়িক প্রগতি বাহকের—প্রকৃতিপুঞ্জের আদর্শ-স্থানীয়, বণিক ও শিল্পীর প্রিয়, রাষ্ট্র ও সমাজে একটা শান্তি ও সুস্থিরতার প্রতিষ্ঠাতা—সমগ্র ভারতব্যাপী সাংস্কৃতিক ঐক্যস্থাপয়িতা। তাই নাকি গুপ্তযুগে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন সকলের সৃষ্টি এমন উৎসারিত হইয়া উঠে, এবং অব্যাহতভাবে বহির্ভারতেও ভারতীয় সংস্কৃতির অপূর্ব বিকাশ দেখি। গুপ্তযুগের

প্রতিক্রিয়ার দিকটি তখনো ভারতের সমাজ-জীবনে প্রকট হয় নাই। পরে তাহা ক্রমেই প্রকট হইল। এই প্রতিক্রিয়ার মূলে নিহিত ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণাশ্রমের বজ্রবন্ধন রচনায়, বর্তমান পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠায় (পুরাণগুলি তখন শেষবারের মত গ্রথিত হয়)—সমুদ্রযাত্রা নিষেধে, জাতিভেদ ও আচার, স্পর্শদোষ প্রভৃতি হাজার ব্যবস্থায়।

গুপ্তরা নিজেদের জাতির কথা উল্লেখ করেন নাই—সম্ভবত তাঁহারা ছিলেন বৈশ্য। কিংবা আরো নীচেকার, শূদ্র। লিচ্ছবী দুহিতাকে বিবাহ করায় হয়ত তাঁহারা শক্তিলাভ করেন; পুনর্গঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদের মহিমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মণশাসিত ভারতীয় সমাজের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারিলেন। পূর্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজা ও রাজাদের অত্যাচার হইতে বণিক ও সাধারণ শিল্পীদের মুক্তি দিয়া তাহারা হয়ত (সিজার অগস্টাসের মত, কিংবা ইংলণ্ডের টিউডর রাজাদের মত?) সত্যই সেকালের 'শ্রেণী' সমৃদ্ধ বণিক্ ও শিল্পীদের পরম পূজ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন ('রঘুবংশ' যদি গুপ্তবংশের প্রতিলিপি বহন করে তাহা হইলে ইহাই মনে হয় সত্য)।

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সংস্কৃতির মতোই এই হিন্দু সংস্কৃতিও শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের মানসিক উৎকর্ষের ও অগণিত জনগণের দেহ মন প্রাণের সুদীর্ঘ দাসত্বের পরিচায়ক।[১] অবশ্য সেই জনসমাজ, শূদ্র ও চণ্ডালের দল, এই জীবনই মাথা পাতিয়া লইয়াছে,—এখনো লয়, যতদিন পর্যন্ত সেই মূল কৃষি সমাজের পরিবর্তন না হইবে গণতান্ত্রিক বিপ্লব কার্যকরী না হইবে, ততদিন লইবেও।

কিন্তু বর্ণ আভিজাত্য যেখানে একালের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ধ্বংস হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে যেখানে নতুন ধনাভিজাত্য চাপিয়া বসিতে লাগিল, সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও ক্ষাত্রধর্মের পালনীয় আত্মসংযম ও আত্মোৎসর্গের চিহ্নও আর নাই। শুধু ধনাভিজাত্যের স্বার্থপরতা ও বিলাসবাহুল্যই উৎকট হইয়া উঠিয়াছে, শোষিত শ্রেণীর মধ্যেও তাই বিদ্রোহের সূচনা হইতেছে, অথচ এতদিনকার বাধ্যতার অভ্যাসে হিন্দু নিম্নবর্গের শোষিতদের সে বিদ্রোহ আজও উগ্র হয় নাই। মূল কারণ বিনষ্ট না করিয়া তাহা আবেদনকারী নিবেশে 'লোক' নাম লইয়া সমাজ-বিপ্লব হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেছে।

১ 'We must not forget that these idyllic village communities, inoffensive though they may appear, had always been the solid foundation of Oriental despotism that they restrained the human mind within the smallest possible compass, making it the unresisting tool of superstition enslaving it beneath traditional rules depriving it of all grandeur and historical energies We must not forget the barbarian egotism which, concentrating on some miserable patch of land, had quietly witnessed the ruin of empires the perpetration of unspeakable cruelties, the massacre of the population of large towns with no other consideration bestowed upon them than on natural events, itself the helpless prey of any aggressor who deigned to notice it at all We must not forget that this undignified, stagnatory, and vegetative life that this passive sort of existence evoked on the other part, in contradistinction, wild aimless unbounded forces of destruction and rendered murder itself a religious rite in Hindustan. We must not forget that these little communities were contaminated by distinctions of caste and by slavery, that they subjugated man to external circumstances, that they transformed a self developing social state into never changing natural destiny, and thus brought about a brutalising worship of nature, exhibiting its degradation in the fact that man, the sovereign of nature, felldown on his knees in adoration of Hanuman, the monkey, and Sabala the cow' New York Daily Tribune, June 25, 1853

KARL MARX.

প্রাচীন ভারতের আর্থিক বনিয়াদ

আড়াই হাজার দুই হাজার বৎসর (আনুমানিক ১,০০০-৫০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে খ্রীস্টীয় ১,২০৩-এ মুসলিম বিজয় পর্যন্ত) প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা একটি বিশেষ আর্থিক বনিয়াদেরই উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কথা আবার মনে করা নিষ্প্রয়োজন যে, এই বিরাট দেশে সর্বত্র রাষ্ট্রীয়, কেন ভৌগোলিক পরিবেশও একরূপ নয়, এবং সর্বকালেও একই অবস্থা কোথাও অব্যাহত থাকে নাই। জীবনযাত্রা একই বনিয়াদে গড়িয়া উঠিলেও দেশে ও কালে মিলিয়া ইহারও মধ্যে তাহার অনেক রকমফের দেখা দিয়াছে ; ঐক্য সত্ত্বেও তাহাতে অসামান্য বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে। এই বৈচিত্র্যের জন্য এবং স্থায়ী রাষ্ট্রীয় বন্ধনের অভাবে প্রাচীন ভারত রাজনৈতিক "একজাতীয়ত্বের" দিকে তখনো অগ্রসর হইতে পারে নাই, তবে ভবিষ্যতের "বহুজাতিক মহাজাতির" উপযোগী উপাদান রচনা করিয়া গিয়াছে। কারণ, এই দুই হাজার আড়াইহাজার বৎসরে তাহার সর্বক্ষেত্রের জীবনযাত্রায় একটা মূলগত মিল ছিল, তাহার সংস্কৃতিরও একটা মূলগত ঐক্য রহিয়া গিয়াছে—পরবর্তী কালেও তাহা অটুট রহিয়াছে। তাহাই ভারতীয় মহাজাতীর প্রাচীনতম ভিত্তি।

জীবন-যাত্রার এই সাদৃশ্যের কারণ, ভারতীয় সমাজ পূর্বাপর কৃষিকর্মকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন সভ্য সমাজেরই প্রধান আশ্রয় থাকে কৃষি। কৃষি সম্পর্কিত শিল্পেরও সেই অবস্থায় জন্ম হয়—কিন্তু শিল্পের স্থান সেখানে গৌণ। কিন্তু ভারতীয় সমাজে এই কৃষি-সভ্যতারও একটা বিশিষ্ট রূপ বিকশিত হয়, তাহাই বুঝিবার মত। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রীয় নানা প্রভাব ছাড়াও যে দুইটি বিশিষ্ট পদ্ধতিতে কৃষি-সমাজের বিকাশ এখানে প্রভাবিত হয় তাহার একটি ভারতীয় ভূমিব্যবস্থা, অন্যটি ভারতীয় "জাতি" ব্যবস্থা। দুইটিই পরস্পর সম্পর্কিত ; দুইটিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দুই জটিল প্রশ্ন ; এবং কোনোটিরই বিষয়ে আজও ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ সকল প্রশ্নে একমত নন, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। অথচ, ভারতবর্ষের কৃষি-সভ্যতার বা ভারতের সামন্ততন্ত্রের বিশেষ রূপটি এই আর্থিক বিন্যাস ও সামাজিক বিধি নিষেধের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছে।

ভূমি ব্যবস্থা

কৃষি-সমাজের প্রধান কথা হইল ভূমি-ব্যবস্থা—যাহারা প্রকৃত কৃষক, মূল উৎপাদক (primary producer), জমিতে তাহাদের স্বত্ব কি ধরণের, অন্যান্যরাই বা জমিতে কি স্বত্ব ভোগ করে ?[১]

বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিশ্চয়ই এই ভূমি-স্বত্ব ও ভূমি সম্পর্কের রদ-বদল হইয়াছে। কিন্তু মোটামুটি কয়েকটি সাধারণ রূপে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া যায়। যথা, (১) গ্রামের জমি প্রথমত গ্রামের দশজনেই (সভা, পঞ্চায়েত, পল্লীসমাজ) বিলি ব্যবস্থা করিত। (২) জমির বণ্টন পরিবার ('কুল' বা 'গৃহ') হিসাবে পরিবারই সমগ্রভাবে তাহাদের জমি চাষ করিত, নিজেদের হালবলদ, বীজধান তাহাদের ছিল,—সমগ্রভাবে পরিবার হইত তাহাদের উৎপন্ন শস্যের অধিকারী। অবশ্য গ্রামের কিছু কিছু সাধারণ গোচারণ ভূমি প্রভৃতিও থাকিত। কিন্তু মোটের উপর জমি পরিবার বা ব্যক্তির সম্পত্তি। (৩) উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ 'রাজস্ব' হিসাবে প্রজার বা কৃষকের রাজাকে দিতে হইত। মুদ্রায় নয়, 'রাজস্ব' দিতে হইত দ্রব্যজাতে। রাজস্ব না দিলে

---

১ 'ভূমি-ব্যবস্থা' 'জাতিভেদ' প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের Studies in Indian Social Polity, 1944, Calcutta, দ্রষ্টব্য। যথাসম্ভব ঐ গ্রন্থ ও রাহুল সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থাদিতে মূল শাস্ত্র, পুরালিপি প্রভৃতির বিচার আছে এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অবশ্য ভূমি হারাইতে হইত। এখানেই প্রশ্ন—রাজস্ব কি অধিকারে রাজা আদায় করিত? প্রজাপালক ও রাজ্যরক্ষক বলিয়া? না, সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক বলিয়া? অর্থাৎ ইহা কি ট্যাক্স্ না, রেণ্ট? জমির উপর কৃষকের অধিকারই বা কি? এই প্রশ্নে ভারতীয় পণ্ডিতদের মতভেদের অন্ত নাই।

মেন্ প্রমুখ বিদেশীয় পণ্ডিতদের অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশীয় গবেষকগণ অধিকাংশেই পল্লী-সমাজ (ভিলেজ কমিউনিটিকে) গ্রামের জমির মূল মালিক ও কৃষককে বা (কৃষক পরিবারকে) জমিতে স্বত্বাধিকারী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে চাহেন। ইঁহাদের মতে—ভারতীয় কৃষক এই স্বত্বস্বামিত্ব হারায় বিদেশীয় বিজেতাদের আমলে—অর্থাৎ মুসলমানদের সময়ে, বিশেষতঃ ইংরেজ রাজত্বে। ইহার সমর্থক প্রমাণপত্র তুচ্ছ নয়। সত্যই মনু (খ্রীঃ পূঃ ২০০ এর দিকে), জৈমিনি (খ্রীঃ ২০০ এর দিকে) ও সায়নাচার্য (খ্রীষ্টীয় ১৩০০'র দিকে বিজয়নগর সাম্রাজ্য) প্রজাকেই ভূমির মালিক বলিয়াছেন। ফ্লাউড কমিশনের নিকটে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই সব প্রমাণ বিশদ ভাবেই উপস্থিত করেন। ইহাও ঠিক, মুসলমান রাজগণ বিজেতা হিসাবে সমস্ত দেশের মালিক বলিয়া নিজেদের গণ্য করিতেন, কোরানের নিয়ম ও ধারণানুযায়ী ঐরূপ ব্যবস্থাও প্রচলন করিতে থাকেন, এ দেশে প্রজার অধিকার ক্রমশঃ তাহাতে খর্ব হয়। ইহাও ঠিক, ইংরেজ পণ্ডিতেরা (ফ্লাউড কমিশন পর্যন্ত) ভারতবর্ষে বরাবরই রাজা জমির মালিক' এই মত প্রচার করিতেন। কিন্তু বিদেশী ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে দেশী সাধারণ কৃষকের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও আমাদের জাতীয় স্বার্থবাদী গবেষণার যে একটা ঝোঁক আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই 'জাতীয়তাবাদী' পণ্ডিতগণ কংগ্রেসী রাজের আমলে কৃষককে জমিতে অধিকার না দিয়া জমিদারী প্রথা বিলোপের নামে নতুন করিয়া রাষ্ট্রাধিকৃত জমিদারী প্রথার পুনর্গঠনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজাই যে প্রাচীন কালে জমির মালিক ছিল মেগাস্থেনিস প্রমুখ গ্রীক ও কৌটিল্য প্রমুখদের কথা এই বিষয়ে প্রামাণ্য। এই দিকেও এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ এই মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ উপস্থিত করেন। ভারতবর্ষে প্রজাদের ভূসম্পত্তিতে কোনো স্বামিত্ব বা মালিকানা (প্রাইভেট রাইটস ইন ল্যান্ড) ছিল না ইহা মার্কস্-এর অভিমত। মার্কস ভালো করিয়াই জানিতেন, প্রাচ্য বা 'এশিয়াটিক সমাজে' পল্লী-সমাজ বা ভিলেজ কমিউনিটির আয়ু কম ছিল না। ঐতিহাসিকেরা আরও দেখেন, সর্বকালে সর্বত্র প্রজা ভূমি দান-বিক্রয়ও করিতেছে। তাই মনে হইতে পারে প্রজাই জমির মালিক। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকদের যে সব প্রমাণপত্র মার্কসের হস্তগত হইয়াছে তাহা হইতেই তাঁহাকে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে মত গঠন করিতে হয়। তাই এই সব অপর্যাপ্ত তথ্যের জন্য প্রশ্নে তাঁহার ভুল ঘটা অসম্ভব নয়। তথাপি ভুল মার্কসের ঘটে নাই, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মৌর্য যুগ হইতে বিজয়নগর সম্রাটদের কাল পর্যন্ত বহু শিলালিপি ও তাম্রলিপি বিচার করিয়া এই সুস্থির সিদ্ধান্তেই পৌঁছেন (দ্রষ্টব্য *Studies in Indian Social Polity*, Chapter xv)। মার্কসের কথা ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেই তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কার হইয়া উঠে। (এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: *The Modern Quarterly*, Summer, 1948-এ জন মরিস্ লিখিত *Slaves and Serfs* নামক প্রবন্ধ।)

মার্কস্ এশিয়ায় সাধারণভাবে দেখিতে পান—'কর গ্রাহী রাষ্ট্র' ('tribute state'), অর্থাৎ "রাষ্ট্র প্রধানতম ভূস্বামী (State as the supreme landlord)। কখনো কোনো যাযাবর 'জন' বা কোনো বড় সংগঠিত রাষ্ট্র এক একটা সামূহিক (collective সত্তারূপে গণ্য হইত। (কাশী, কোশল, মগধ এবং পরে মৌর্য সাম্রাজ্য এমনি একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়, শাক্য-লিচ্ছবী, সংবজ্জদের ট্রাইবাল রাষ্ট্রও ছিল, তাহা আমরা জানি। বৈদিক যুগের 'প্রাচ্য সমাজ' এইরূপ রাষ্ট্রের বিকাশে অবশ্য লোপ পায় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য)। এইরূপ সামূহিক সত্তার যে শাসক, হোক সে রাজা কিংবা সম্রাট কিংবা গণ অভিজাততন্ত্র, সমগ্রভাবে ক্ষমতার সে-ই জীবন্ত প্রতীক; সমগ্র ভূসম্পত্তিতে তাহারই স্বামিত্ব থাকিত। কাজেই "জমিতে কাহারও নিজস্ব স্বত্ব নাই; অবশ্য জমিতে দখল ও ভোগের সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার আছে।" ('there is no private ownership of land, although there is complete private possession and use of

land." *Capital*, III, p 918 হইতে উদ্ধৃত ; দ্রষ্টব্য *The Modern Quarterly*, Summer, 1948, p 44)। এই উক্তি হয়তো ভারতবর্ষ ও মিশর সম্বন্ধে সত্য ; কিন্তু প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া সম্বন্ধে সত্য নয় বলিয়া ষ্ট্রুবে প্রমুখ রুশ ঐতিহাসিক কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু 'স্বামিত্ব' ও 'দখল ও ভোগের অধিকার' এই দুই-এর পার্থক্য মনে রাখিলে এইরূপ আপত্তির কারণ ভারতবর্ষ বা মেসোপোটেমিয়া কোনো ক্ষেত্রেই থাকে না। ভারতবর্ষের প্রজাসাধারণ এক একটি পরিবার ("কুল" বা "গৃহ") অনুযায়ী গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইত। সেই 'গ্রাম্য সমাজ' ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হইল এক একটি রাষ্ট্রে, কখনো-কখনো বা সাম্রাজ্যেও। কখনো সে রাষ্ট্র হইত রাজতন্ত্র, কখনো রাজন্যতন্ত্র (অভিজাততন্ত্র)। প্রজাকুলের উৎপাদনের একাংশ (এক-ষষ্ঠাংশ) শাসকরা ভূস্বামীরূপে পাইতেন। রাজশক্তির, ইহাই ছিল আয়ের প্রধান পথ। অবশ্য এই মূলে আদায়ের সঙ্গে শ্রমের উপরও দাবী ('বেগার'), এবং আরও অন্যান্য নানা রাজকীয় সামন্ততান্ত্রিক আদায়-উশুল (আবওয়াব) প্রভৃতির দাবী, যথা, 'কর' বা ট্যাক্স (পুষ্প, দুগ্ধ, দধি, প্রভৃতির উপর) কিংবা 'শুল্ক' প্রভৃতি বাড়িতে বা কমিতে পারে ; এবং রাজা ও কৃষকের মধ্যে রাজা কাহাকেও নিজের রাজস্ব দান করিয়া ভূমির সামন্তরূপে স্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু মোটামুটি রাজাই যে ভূমির মালিক, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং প্রমাণাবলী হইতে দেখা যায়—(ক) প্রজারও অধিকার কিছু ছিল, সেই অধিকার জমি দখলের ও ভোগের। রাজা খাজনা অনাদায়ে ছাড়া সাধারণত তাহা বিলুপ্ত করিতে পারিতেন না। খ) অন্যকে রাজা দিতেন তাঁহার নিজ অধিকারটুকু—প্রদত্ত ভূসম্পত্তির দ্রব্যজাতের যেটুকু রাজার প্রাপ্য তাহাই রাজা দান করিতে পারিতেন—সেই দেয় অংশ প্রজা দিলে তাহার স্বত্ব পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকিত। (গ) এই ভোগ-দখলের অধিকার প্রজা-পরিবার হস্তান্তর করিতে পারিত। কিন্তু হস্তান্তর করিতে হইলে ভূমির নিকটস্থ দশজনকে অধিকারীর সাক্ষ্য রাখিয়া করিতে পারিত—অর্থাৎ পল্লীপ্রধানদের উহাতে অনুমোদন প্রয়োজন হইত। তাহা হইলে চাষীর ভূসম্পত্তিতে স্বত্ব কতটুকু ছিল? দখলীস্বত্ব—রাজস্ব না দিলে সে উচ্ছেদ হইত। হস্তান্তরেও কিছু বাধা ছিল। ধর্মকর্মে ছাড়া—দেব-ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে ছাড়া—প্রজাদের সত্য সত্যই একে অন্যে ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীন অধিকার (প্রাইভেট রাইট ইন্ প্রোপার্টি) কতটুকু ছিল বলা সুসাধ্য নয়।

মোটের উপর এই পরস্পর বিরোধী প্রমাণাবলী হইতে যে ঐতিহাসিক সহজ সত্য বুঝা যায় তাহা এই : বৈদিক সমাজেই রাজা যোদ্ধনায়ক হইতে রাজমহিমা আয়ত্ত করিতে লাগিয়াছিলেন। তখনো তিনি নিজ প্রাপ্য পাইতেন উপহাররূপে, সে প্রাপ্যের প্রথম নাম ছিল 'বলি' (সশ্রদ্ধ উপহার)। কিন্তু ক্রমে উহাতে তাহার 'অধিকার' জন্মিল, তখন উহার নাম হইল 'ভাগ'। হয়ত স্পষ্ট করিয়া উহাকে 'খাজনা' বলিয়া ঘোষণা করিতে সময় লাগিয়াছে। পতিত জমি, বন, খনি প্রভৃতির উপর রাজার স্বামিত্ব স্থির হইয়া গিয়াছে। অবস্থাটা নির্ভর করিয়াছে রাজার ও জন-সমিতির পরস্পরের শক্তির উপর। শক্তি থাকিলে ক্রমেই রাজারা এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতেন—'নৃপতি' তখন অবশ্য 'ভূপতি' হইয়া উঠিতেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের ঠাট দেখিয়াই বুঝা যায়—রাজার শক্তি সেখানে অপরিমিত, কৌটিল্য বা গ্রীক সাক্ষীরা রাজাকে ভূমির মালিক বলিলে সত্য কথাই বলিয়াছেন। তখন হইতে অবশ্য ছোট বড় সকল রাজাই এইরূপ দাবী করিত, তাহাতে ভুল নাই ; এবং ক্রমশই প্রজাদের তুলনায় রাজার দাবী বাড়িয়া যায়, তাহাও নিঃসন্দেহ। বারে বারে বিদেশীয় আক্রমণে বিদেশীয় রাজশক্তি নিজেদের ক্ষমতা বাড়ান ; অষ্টবসুর শক্তি ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়াও ক্রমশ রাজারা অলৌকিক মহিমা আয়ত্ত করিতে থাকেন। তথাপি এই বিরাট দেশে সকল স্থানে রাজার এই দাবী গ্রাহ্য হয় নাই ; সর্বকালেও স্বীকৃত হয় নাই। মনু-জৈমিনি প্রভৃতি হয়ত এমনি আদর্শের কথা মনে রাখিয়াই রাজার স্বামিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। সায়ন ও মাধবাচার্য প্রভৃতির কথা অন্তত বিজয়নগরের রাজশক্তির সম্বন্ধে মোটেই খাটিত না—প্রজারা সেখানে জমির মালিক ছিল না। তথাপি মনে করা চলে, ভারতবর্ষে যখন যেখানে রাজশক্তি দুর্বল হইয়াছে, সেখানেই তাহাদের সেই সার্বভৌম অধিকারের দাবীও টিঁকে নাই ; অন্তত মনু, জৈমিনির মত গোঁড়া ব্রাহ্মণরাও রাজার এই দাবীকে স্বীকার করিতে বা শাশ্বত বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ভূমিস্বত্বের রূপ

প্রজার অধিকার যে ক্রমশই খর্ব হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ও প্রজার মধ্যে রাজা নানা মধ্যস্বত্ব গড়িয়া তুলিতে থাকেন। কত রকমের ভূমিস্বত্ব যে সৃষ্টি হইতে থাকে তাহারও উল্লেখ পুরালিপি হইতে পাওয়া যায়—যথা, (ক) 'নিবি-ধর্ম' ও 'অক্ষয় নিবি', হয়ত দুইটি কথা মোটামুটি একই স্বত্বকে বুঝাইত—মূল দ্রব্যের ('শিবর') ক্ষয় না করিবার শর্তে বরাবর ভোগ করিবার অধিকার (ইউরোপের ফিয়েফ্ এর মতই ?); 'অপ্রদ',—যাহা আর দান করা চলিবে না,—তাহাও এই স্বত্বই বুঝাইত। (খ) কিন্তু 'নিবিধর্ম-ক্ষয়' রূপ স্বত্বে গ্রহীতা বা ক্রেতা দান ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত স্বত্ব লাভ করিত। 'অপ্রদ ক্ষয়ও' এইরূপেই অধিকার। (গ) 'ভূমি ছিদ্রের' ('ভূচ্ছিদ্র') কথাই বেশি পাওয়া যায়—ইহার অর্থ আজকালকার ভাষায় 'খাজনা লাগিত না'। স্বভাবতই অনেক দান এই পর্যায়ে পড়িবে। (ঘ) 'দান' বা 'নিষ্কর' জমি, দেবত্র, ব্রহ্মত্র প্রভৃতি সর্বরকম কর, শুল্ক, শ্রম-শুল্ক (বেগার) হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইত—(ইউরোপীয় 'বেনিফিস্' এর অনুরূপ ?)। (ঙ) 'স্থূল বৃত্তি'তে কর, খাজনা প্রভৃতি দ্রব্যজাত দ্বারা দেওয়া হইত।

এই সব নানা স্বত্বের উদ্ভবের মধ্য দিয়া স্বভাবতই বুঝি রাজা ভূস্বামী রূপে স্বীকৃত; তিনি নানা স্বত্বের মধ্যবিত্ত সৃষ্টি করিতে পারেন; প্রজা-সাধারণের অধিকার সীমাবদ্ধ। কিন্তু সকল প্রজাই যে জমি চাষ করে তাহা নয়; 'ভাগচাষী' বা 'বর্গাদার'এর মত চাষীও আছে। কোথাও তাহারা পায় ফসলের 'আধি', কোথাও তাহারা পায় 'তেভাগার' মাত্র এক ভাগ। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক একটা ভূমিব্যবস্থার ও সমাজব্যবস্থার পরিষ্কার সাক্ষ্য ইহাতে দেখি।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের স্বরূপ বুঝিবার পূর্বে অবশ্য এর জাতিভেদ প্রথার প্রশ্ন সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। আর বর্তমান প্রসঙ্গে এই অধিকারহীন 'ভূমিদাস' 'দাসদের' কথা একবার বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় দাসপ্রথা

কি কৃষিকর্মে, কি শিল্পকর্মে, কোনো দিকে দাস-পরিশ্রমে (slave labour-এ) উৎপাদন কি প্রাচীন ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল ? তাহা মনে হয় না। গ্রীসের মত 'খনি' বা 'কারখানায়' এখানে দাস শ্রমিক প্রযুক্ত হইবে, কিংবা কার্থেজ বা রোমের মত ক্ষেতে বাগিচায় (প্লানটেশনে) পণ্যশস্য উৎপন্ন হইবে দাস-পরিশ্রমে, এমন অবস্থাও হয় নাই। উহার প্রমাণও ভারতবর্ষে কোথাও নাই। সেইরূপ দেখি ইউরোপের ফিউডাল সমাজের 'সার্ফ' বা 'ভূমিদাস'ও ভারতবর্ষে ছিল না—কৃষক এদেশে জমির সঙ্গে বাঁধা নয়, প্রজা বা কৃষক জমি হস্তান্তর করিতে পারিত। অবশ্য 'দাস' বা 'স্লেভ্' বরাবর ছিল (একেবারে আদিতে বৈদিক সমাজে 'দাস' প্রথার যাহাই অর্থ থাকুক, 'দাস' আমরা এখানে 'স্লেভ্' অর্থে ব্যবহার করিতেছি)। বৈদিক সাহিত্যেও দাসদের অনেক উল্লেখ আছে,—ক্রীতদাস ছিল, ঋণদাস ছিল, যুদ্ধদাসও ছিল; বিচারে অধিকার হারাইলে দাস হইত, দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া (সবংশে) চিরকালের মত বা নির্ধারিতকালের জন্যও কেহ কেহ দাস হইত। প্রভুর পরিবারে দাসেরা থাকিত, অর্থাৎ গৃহদাস হইত। ভৃত্যরূপে শিল্পে বাণিজ্য-ব্যবসায়েও নিযুক্ত হইত; অনেকে রাজভৃত্য রূপে বহু উচ্চপদে আরোহণ করিতে পারিত। এই সব বিষয়ে তাহাদের অবস্থা গ্রীক দাসদের অপেক্ষা হয়ত ভালোই ছিল। কিন্তু কোনো সময় ভারতীয় সমাজে দাসেরা সংখ্যায়ও তত অধিক হয় নাই, আর উৎপাদন ক্রিয়ায়ও প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে নাই। তাহার

প্রধান একটি কারণ এই যে, ভারতীয় সমাজে এমন নিম্ন-শ্রেণী ছিল, যাহাদের দ্বারাই উৎপাদন করা চলুক, দাসতা প্রথার প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ ঠিক দাস না থাকিলেও 'দাসতুল্য' শ্রেণী সমাজের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল, আর তাহারাই ক্ষেতে, গৃহশিল্পে, গৃহকর্মে উৎপাদনের একটা বড় অংশ জোগাইত। এইরূপে 'সার্ফ' না থাকিলেও এমন স্বত্বহীন উৎপাদক শ্রেণী তৈয়ারী হইয়াছিল যাহারা 'সার্ফ-তুল্য'—নিজের ইচ্ছামত শ্রমোৎপাদনের কোনো অধিকারই পাইত না। 'জাতিভেদ' প্রথার ইহাই এক অসাধারণ কীর্তি—আইনত দাস না করিয়া কার্যত দাসশ্রেণীর সৃষ্টি করা—চিরস্থায়ী দাস প্রথার প্রচলন করা।

ভারতের 'জাতিভেদ'

'জাতিভেদের' বা 'বর্ণাশ্রম ধর্মের' যাহা প্রধান বিশেষত্ব তাহা মোটের উপর তিনটি—বংশানুগত বৃত্তি গ্রহণের নির্দেশ, ভিন্ন জাতিতে বিবাহের নিষেধ এবং ভিন্ন জাতির সহিত আহারের নিষেধ। অবশ্য ইহা ছাড়া ছোটখাটো কত রকমের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও আচার, খাদ্যাখাদ্য বিচার এবং স্পর্শ-দোষ, কৌলিন্যের নানা ধাপ প্রভৃতি ধারণা যে প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহা ছাড়া সগোত্র, সপিণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি কৌলিক ধারণাও আছে, আর মূলত আছে পরিবারগত ঐক্য। কিন্তু বৃত্তি, বিবাহ, আহার্যসম্পর্কিত এই তিনটি মূল ব্যাপার সকল প্রাচীনপন্থী হিন্দুই মানে; হিন্দু ছাড়া ভারতের অন্য সম্প্রদায়ের উপরও ইহার প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছে। এবং আজ আবার সমস্ত ভারত-বর্ষেরই আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রচলনে শহরে ও খানিকটা পল্লীঅঞ্চলেও শিক্ষিত সমাজে জাতিভেদের কঠিন বিধিনিষেধ শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তাহাও স্মরণীয়।

বৈদিক সমাজে আমরা দেখিয়াছিলাম 'বর্ণভেদের' উৎপত্তি; শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীভেদকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আবির্ভাব হয়। প্রাচীন সমাজে অন্যত্রও এই ধরণের 'বর্ণভেদের' অস্তিত্ব যথেষ্ট দেখা যায়—বংশানুগতভাবে বৃত্তিবিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নিষেধ, 'এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ' কেন, প্রাচীন গ্রীসে রোমেও ছিল; সামন্ত ইউরোপেও ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য ডাঃ দত্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭ম অধ্যায়)। সুতরাং এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি একমাত্র ভারতীয় বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যান্য দেশের সেই সব ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থার তফাৎ তবু গুণগত এবং অসামান্য। পৃথিবীর আর কোনো সভ্য সমাজ ঠিক এইরূপ ভাবে এই ব্যবস্থা এমন রূপে গড়িয়া উঠিয়া এমন জটিল, এমন পাকা, এমন অচ্ছেদ্য বিভাগে পরিণত হইতে পারে নাই।

বেদের প্রথম দিক্‌কার তিন বর্ণের পরে বৈদিক যুগেই (যজুর্বেদে) চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের কথা জানিতে পারি। 'বর্ণ' সংজ্ঞাই কি বুঝায় এবং কাহারা এই 'শূদ্র'—এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই। কিন্তু যাহা সত্য মনে হয় তাহা এইঃ বিজিত অনু-আর্য জাতির অনেকেই শূদ্রে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণকায় ছিল, আর্যরা শ্বেতকায়, আমাদের বহুপঠিত এই সব ধারণা খুব সম্ভব মিথ্যা। সমস্ত 'বর্ণভেদের' গোড়ায় ছিল শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীভেদের বুনিয়াদ। সাধারণ 'বিশ' ভাঙিয়া যোদ্ধারা শাসক শ্রেণীতে উঠিয়া যায়, সম্ভবত (অন্যান্য দেশের মতোই) ইহাদেরই একাংশ আবার পুরোহিত বা যাজকরূপে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পরিণত হয়। সাধারণ লোক, স্বাধীন কৃষক ও কারুজীবীরা রহিল 'বিশে'। এই 'বিশের' বা কৃষক ও বৃত্তিজীবীদের বৃহৎ অংশই অধিকারচ্যুত হইয়া দাসতা প্রাপ্ত ও 'শূদ্রে' পরিণত হয়। অবশ্য বাদবাকী অংশ ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া স্বাধীন থাকে, 'বৈশ্য' জাতি হয়, শ্রেণী হিসাবে হয় 'শ্রেষ্ঠী' বণিক। সেই অধিকারচ্যুত 'শূদ্রের' মধ্যে প্রাক আর্য সমাজের শ্রমিক শ্রেণী (যথা, হরপ্পা সভ্যতার বস্তিবাসী শ্রমিক শ্রেণী) যেমন ঠাঁই পাইয়াছিল, তেমনি বৈশ্যের শ্রেণীর মধ্যেও ঠাঁই পাইয়া থাকিবে সেই প্রাক্-আর্য সমাজের সম্পন্ন বণিক শ্রেণী। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও হয়ত ঠাঁই পাইয়াছে 'অসুর', 'রাক্ষস' প্রভৃতি অনু-আর্য (এবং সম্ভবত সুসভ্য) ক্ষমতাবান্ শাসকশ্রেণীর লোক—ইহা অনুমান করা যায়। অন্তত বর্ণভেদের

মূল কারণ রঙের পার্থক্য (বা কলার ডিফারেন্স) নয়, জেতা-বিজেতাদের রেসিয়াল্ সমস্যাও নয়—আসল কারণ এই শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীভেদ, উহাই ক্রমে 'জাতিভেদে' রূপ লাভ করে,—এই কথা বহু পণ্ডিতেরই মত। সমাজের বিকাশের সঙ্গে নতুন নতুন শিল্প দেখা দেয়। তন্তুবায়, কুম্ভকার তাম্রকার, (লৌহকার, কাংস্যকার), সূত্রধর, রথকার, চর্মণী ছাড়াও আরও নতুন শিল্পী দেখা দেয় —তৈলকার, নাপিত, ধোপা ইত্যাদি। নতুন নতুন কারিগর ও নতুন বৃত্তিজীবী এইভাবে বাড়িতে থাকে শিল্পকৌশলের ক্রমবিকাশের সহিত। সমস্ত শিল্পী শ্রেণীই প্রায় শূদ্রদের মধ্যে পরিগণিত হয়, শুধু চার বর্ণে তাই আর কুলাইল না। সন্দেহ নাই যে শারীরিক শ্রম ঘৃণ্য বিবেচিত হওয়াতে শ্রেণীভেদ ক্রমশ বংশগত হইতে লাগিল। বিবাহ, আহারাদির নিষেধ ইহার মধ্যে জুটিতে লাগিল। এইরূপে বর্ণভেদ হইতে 'জাতিভেদ'-রূপে মূলের শ্রেণীভেদ এমন আকার গ্রহণ করিল যে মূল সত্যও প্রায় চিনিবার উপায় রহিল না। 'জাতিই' একটা প্রবল ও ব্যাপক ধারণা ও ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত যুগের সময় হইতে গ্রাহ্য হয় এবং সমাজের নানা ভাঙ্গা-গড়ায় এক এক অঞ্চলে নতুন জাতিরও এইভাবে আবির্ভাব হয় (যেমন, প্রাচ্য ভারতের লেখক-বৃত্তিধারী 'করণ', কায়স্থ, ও মহারাষ্ট্রদেশের 'প্রভু')। অনেক পুরাতন জাতি লোপ পায় (যেমন, হিন্দুস্থান ও রাজপুতানার বাহিরে ক্ষত্রিয় প্রায় বিলুপ্ত)। অনেকের আবার অধোগতিও হয় (যেমন, বৌদ্ধ পালদের পরে সুবর্ণ বণিকদের বাঙলায় দুর্দশা ঘটে। অনেক বৌদ্ধ মুসলমান হয় ; অন্যেরা পরে বৈষ্ণব সমাজে স্থান পায়)। বিভিন্ন অঞ্চলের জাতির মধ্যেও ব্যবধান বাড়ে (যেমন, 'রাঢ়ী', 'বারেন্দ্র' ব্রাহ্মণের তফাৎ), এবং হয়ত পুরাতন ট্রাইব হইতেও নতুন জাতি গড়িয়া উঠিতে থাকে (বাঙলার বাগ্দি, বাউড়ি, প্রভৃতি জাতি)।

বর্ণভেদ হইতে জাতিভেদও একটা সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস—তাহা ভারতীয় সামাজিক বিবর্তনের ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা প্রধান সত্য। এই বিবর্তন-ধারা লক্ষণীয়। বৈদিক যুগেই বর্ণভেদের যখন সূচনা হয় তখনো ভেদ বংশগত নয়, বর্ণান্তর বিবাহে বাধারও উল্লেখ নাই, আহারাদির সম্পর্কেও নিষেধ দেখা যায় না। অনেক রাজা ও মন্ত্রী শূদ্র ছিল, শূদ্রত্ব অনেকে প্রাপ্তও হইত, আবার অনেক শূদ্রও শাসক বর্গে উঠিয়া যাইত। কিন্তু শূদ্র তখনি হেয়, সম্ভবত দাসমাত্র ; প্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও পারে—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই কথা বলিতে আরম্ভ করে। ইহার পরে বৈদিক যুগের পরে বুদ্ধ-জন্মকালে ব্রাহ্মণ্যবাদও জন্মিতেছে। আপস্তম্ভ, গৌতম ও বোধায়নের ধর্মসূত্রে (আনুমানিক কাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০—খ্রীঃ পূঃ ৩০০ পর্যন্ত) দেখিতে পাই—ব্রাহ্মণ সুবিধাভোগী (প্রিভিলেজড্) শ্রেণী হইয়া উঠিয়াছে। তবু অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহও চলে, ব্রাহ্মণও শূদ্রার বিবাহও অসিদ্ধ নয়, ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার পুত্র ব্রাহ্মণই থাকে,—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতিগত হেয়তার গোড়াপত্তন হইয়াছে, তবে তাহা তত কঠিন হইয়া উঠে নাই। সমসাময়িক বৌদ্ধ প্রমাণে দেখি ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী, যদিও তখনো ব্রাহ্মণ সম্মানিত ; কিন্তু পেশা হিসাবে ব্রাহ্মণও চাষী, ব্যবসায়ী শিকারী, সূত্রধর, সৈনিক, কশাই-র কাজ করে। এই মর্মের তথ্য রামায়ণ মহাভারতেও মিলিবে—হয়ত ঐ সব পুরাণ-ইতিহাসে তাহা সংগৃহীত রহিয়াছে। বৌদ্ধজাতকে দেখি এক ক্ষত্রিয়-কুমার রাঁধুনি, মালাকার ও বেতওয়ালা হিসাবে কাজ করিতেছে। তবে কারিগর ও শিল্পীরা 'গিল্ডে' সুসংগঠিত, বৈশ্য ব্যবসায়ীরাও শ্রেষ্ঠীরূপে গিলড বা 'শ্রেণী' রক্ষা করিতেছে। তথাপি সন্দেহ নাই যে, কাজ এই সময়ে বংশগত হইয়া গিয়াছে।

অন্য দিকে এই বিষয়েও সন্দেহ নাই যে, বুদ্ধ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জিজ্ঞাসুরা, ও নানা অ-বৈদিক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মতো অ-বৈদিক ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য অনেকাংশে খর্ব করিয়া দেয়। মানুষের মূল্য নির্ণয়ে বুদ্ধদেব মানুষের গুণের উপর জোর দিয়াছেন—জন্মের উপর নয়, শ্রেণীর উপর নয়। ইহার পরে—তৃতীয় পর্বে—মৌর্য যুগ যখন আসিল তাহার পূর্বেই মগধের সিংহাসনে শূদ্র মহাপদ্ম নন্দ অধিষ্ঠিত হইয়াছে, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত শূদ্র ছিলেন ('বৃষল' অন্তত ক্ষত্রিয় নয়) তাহাই সাধারণ বিশ্বাস। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের ঔদ্ধত্য পাই না, শূদ্রদের বিরুদ্ধেও তেমন উগ্রতা দেখি না ; এমন কি শূদ্রদেরও আর্য পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, বলিয়া মনে হয়। জয়সোয়ালের মতে এই অর্থশাস্ত্র "Imperial Code of the law of the

Mauryas"। অশোকের শিলালিপিতে যে ধর্ম, নীতি, অহিংসার আভাস, 'ধর্ম-মহামাত্যের' নিয়োগ 'দণ্ড-সমতা' ও 'ব্যবহার সমতার' নির্দেশ দেখি তাহাতে বুঝি ব্রাহ্মণ্যবাদ রীতিমত প্রতিহত হইল। অপর পক্ষে পুরাণাদির (বিষ্ণুপুরাণের) কথা হইতেও বুঝি নন্দদের পর হইতে ক্ষত্রিয়রা আর রাজশক্তি একচ্ছত্র অধিকারে রাখিতে পারে নাই; শূদ্র শ্রেণী হইতে রাজার উদ্ভব হইল, বৌদ্ধ ও জৈনমতাবলম্বী রাজারাও বহুস্থলে রাজত্ব করিতেন। এই পর্বেরই পরে (চতুর্থ পর্বে) আসিল কণ্ব ও শুঙ্গদের ব্রাহ্মণ-রাজত্ব, অশ্বমেধ, ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রথম রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, "Orthodox Counter-Revolution" (জয়সোয়ালের ভাষায়)। আর, এই সময়েই সম্ভবত মনুসংহিতা রচিত হয়। ব্রাহ্মণ্যশক্তির হিটলারী দাপট, 'ব্লাড থিওরি' হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর শাসক শ্রেণীর যাবতীয় উৎকট-অধিকারের দাবী এবং শূদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ, ঘৃণা, অবজ্ঞা—মনু মহারাজের পাতায় পাতায়। ইহাই First Code of law of Fascism.

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে গ্রীক-বংশোদ্ভূত বাহ্লীকের যবন রাজারা, শকেরা, বিশেষত কুশান সম্রাটরা অধিষ্ঠিত হইতেছিল। ব্রাহ্মণবাদ গ্রীকদের মিশ্র বর্ণের (ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত) বলিল, শকদের বলিল শূদ্র, ম্লেচ্ছ। আসলে এই নবাগতরা বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করে, ব্রাহ্মণ্যশক্তি ও ব্রাহ্মণ্য শাসন চক্র চূর্ণ করা তাহাদের প্রয়োজন, নিজেদের শাসন-চক্র প্রচলন করাও চাই। ইহাই শ্রীযুক্ত জয়সোয়ালের অভিমত। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র শাতকর্ণী বা শাতবাহন (খৃীঃ পূঃ ২০০ হইতে খৃীঃ ২৩০ পর্যন্ত) একদিকে এই বিদেশীদের রাষ্ট্রক্ষমতা ঠেকাইয়া রাখেন, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদকেও সুদৃঢ় আশ্রয় দেন। এমনি সময়ে (পঞ্চমপর্বে) মধ্য দেশে—হয়ত ম্লেচ্ছ রাজারই রাজত্বে—যাজ্ঞবল্ক্য (খৃীঃ ২০০ ?) তাঁহার স্মৃতি রচনা করেন—মনুর মত উগ্রতা তাহাতে নাই। শূদ্র, স্ত্রীলোক প্রভৃতির সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ, কড়াকড়ি একটু কম। এই স্মৃতিই সম্ভবত পরবর্তী গুপ্ত রাজত্বে পশ্চিম ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু গুপ্তদের পূর্বে ভারতবর্ষে আর একটা ভাঙা-গড়ার কাল গেল। ষষ্ঠপর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদের তাই পুনর্গঠন শুরু হইল। বৈদিক কর্মকাণ্ড আর চলে না, নতুন দেবতাদের পূজা প্রচলিত হইতেছে—ভারশিব বাকাটক রাজারা তখন মধ্যভারতে রাজত্ব করেন। নাগরাজ ভারশিব ছিল সম্ভবত দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত, কিন্তু তাহারা শৈব, ব্রাহ্মণ্য সমর্থক,—পূর্বাধিষ্ঠিত বৌদ্ধ রাজা ও বৌদ্ধধর্মের সহিত তাহাদের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। ভারশিবরা ক্ষত্রিয় আখ্যা পাইলেন ব্রাহ্মণদের কৃপায়। (তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, না, ছিলেন বৈশ্য ?)। 'বিন্ধ্যশক্তি' বাকাটকগণ (খৃীঃ ২৮৪ ৩৪৮) কিন্তু নিজেরাও ব্রাহ্মণ, তবু ভারশিব-কন্যাকে তাঁহার রাজপুত্রের বিবাহ করিতে বাধে নাই। বাকাটকরাও শৈব ছিলেন। বৈদিক যজ্ঞাদিও করেন। এদিকে আরও দক্ষিণে পল্লবরা (ব্রাহ্মণ ?) কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব; কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের তাঁহারাও পরিপোষক। বর্ণাশ্রম ধর্ম এই স্তরে সুদৃঢ় হইল।

এই ষষ্ঠপর্বের পুনর্গঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদের যাহা কিছু শক্তি ও কীর্তি তাহা কিন্তু প্রবর্তিত হয় গুপ্ত যুগে; আর তাহাকে চিরস্থায়ী করার যাহা কিছু প্রতিক্রিয়া-মূলক প্রচেষ্টা তাহাও তখনি শাণিত ও সুনিশ্চিত হইয়া উঠিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্ম তখন উদ্ভূত হইল বেদের পরিবর্তে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে অবলম্বন করিয়া (বৌদ্ধ জাতকের সহিত তুলনা করিলে দেখি ইহাতে সাধারণ জীবনযাত্রার কথা নাই)। বর্ণাশ্রম ধর্ম বা জাতিভেদ প্রথা তাহার ভিত্তিরূপে নির্দিষ্ট হইল—মানুষের (নিম্ন : ?, বৌদ্ধ শ্রমণের) দর্শনে, স্পর্শে পাপ; আচার-বিচারের অবধি নাই। অথচ তখনো বিধবা বিবাহের বিধানও কোনো কোনো স্মৃতিতে আছে। শূদ্র ও বৈশ্যদের প্রতিও এক-আধটুকু কৃপার দৃষ্টি আছে (সম্ভবত গুপ্তরা বৈশ্য না হলেও আরও নিম্নজাত ছিলেন)। ব্রাহ্মণ তখন "ভূদেব" হইয়াছেন। স্বভাবতই অন্যদিকে বাস্তববিমুখ ভাবনাদিতে বেদান্তদর্শন প্রভৃতি বিকাশ লাভ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব-ভক্ত পরম ভাগবত সম্রাটদের যুগে বৈষ্ণব ধর্মও (মহাযান বৌদ্ধ ধর্মকে আত্মসাৎ করিবার জন্যই যেন) একটু করুণামিশ্রিত ভক্তিবাদকে সমাজে প্রচলিত করিতেছে। গীতায় "গুণকর্মবিভাগশঃ"ই ভগবান চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, (বুদ্ধদেবের অনুকরণে ?) এমন কথাও স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন। তবু মোটামুটি ব্রাহ্মণ্যবাদের সার্বভৌম

শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান গুপ্ত সম্রাটরা। তাঁহাদের পরে জন্মগত জাতি, রক্তের বিশুদ্ধিতা, বিবাহে আহারে বিধি-নিষেধ, জাতিধর্ম, ক্ষাত্র-ধর্ম (সামন্ততন্ত্র, দাস-ও-ভূমিস্বত্বের বিকাশের সহিত), রাজার ঐশ্বরিক বিভূতি প্রভৃতি ধারণা সাধারণের মনে গাঁথিয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের সময় হইতে উত্তরাপথ দক্ষিণাপথের এই দিকে সাংস্কৃতিক ব্যবধানও মুছিয়া যায়—শাতবাহনদের মতই চের ও পাণ্ড্য রাজারা ('ক্ষত্রিয়' বলিয়া দাবী করিতেন) ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিপোষক হন। পল্লবরাও (হয়ত উত্তরাপথের ব্রাহ্মণ বংশীয় তাঁহারা) ব্রাহ্মণ্যবাদকে পরিপুষ্ট করেন। শকরা, যবনরা (হেলিয়োডোরস্‌ও) ব্রাহ্মণ্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন—ব্রাহ্মণ্যধর্মের বুদ্ধিব ও গ্রহণশক্তিরও তাহা চিহ্ন।

গুপ্তযুগের পরে একটা অন্ধকার—সেই অন্ধকারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বজ্রবন্ধনই টিকিয়া রহিল। তাই সপ্তম পর্বে হর্ষবর্ধন যখন আসিলেন (খৃঃ ৬০৬-খৃঃ ৬৪৮) তাহার পূর্বে গৌড়ের ব্রাহ্মণ রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম উৎপাটিত করিয়া হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। হর্ষবর্ধন বৈশ্যবংশোদ্ভব, সম্ভবত শ্রেষ্ঠীরা অনেকেই তখন বৌদ্ধও। গুপ্তদের সময় হইতেই শ্রেষ্ঠী বণিকদেরও সম্পদের ও সুযোগের পথ প্রশস্ততর হইয়াছিল; বণিকশক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণশক্তির তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলিতেছিল (ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া)। হর্ষবর্ধনের জয়লাভে সমসাময়িক বৈশ্যদের ও বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি রক্ষিত হইল—বৈশ্যরা তখন হইতে বাণিজ্যই সার করে, কৃষিকর্মও শূদ্রের কর্ম হইয়া পড়ে। বৈশ্য অবশ্য তখন রাজার জাতি; তাহাদের 'শ্রেণী' বা গিল্‌ড প্রবল, সম্পদও যথেষ্ট। তাই পরবর্তী বহু দুর্যোগের মধ্যেও উত্তর ভারতে বৈশ্যরা এক সম্মানিত জাতি রহিয়া গেল। সেই দুর্যোগের মধ্যে (অষ্টম পর্বে) বাঙলায় পাল সম্রাটরা প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া 'মাৎস্যন্যায়' শেষ করেন। তাঁহারা ছিলেন সম্ভবত শূদ্র (দাসজীবিন্), অন্তত (তান্ত্রিক সিদ্ধচার্য ও নাথগুরুদের) বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিপোষক আর সামন্ত অত্যাচার ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী বলিয়া তাঁহারা পরিগণিত। নিশ্চয়ই শূদ্র সামন্ত ও শাসক-চক্র তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হয়, আর বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মত বৌদ্ধ বণিকেরাও তাঁহাদের আশ্রয়ে পৃষ্ঠপোষকতায় দেশ-বিদেশে গৌড়ীয় বৌদ্ধ-সংস্কৃতির মহিমা প্রচার করেন—আর তাই সেন যুগের সময় হইতে বাঙলার অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ জাতি (বৌদ্ধ? সুবর্ণবণিক, সাহা, প্রভৃতি) অনাচরণীয় হন।

কিন্তু ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদ আর একটি শাসন চাতুর্যের উদ্ভাবনা করিয়া বসিয়াছে—যে কোন জাতির নতুন রাজশক্তিকে তাহারা কোনোরূপে একটা ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়া নিজেদের ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারে—সূর্যবংশ-চন্দ্রবংশের বংশ-পীঠিকায়ও প্রয়োজন মত তাঁহাদের স্থান করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, এই ভাবে প্রমোশন পাইয়া প্রত্যেক নবাগত রাজবংশও ব্রাহ্মণ্যবাদের বড় পরিপোষক হইয়া দাঁড়াইবে এবং অন্য ছোট জাতিকে দৃঢ় হস্তে দমন করিবে, তাহাতে বিস্ময় নাই। তাই এখন হইতে (এই নবম পর্বে) আবার নতুন ক্ষত্রিয় বংশের সৃষ্টি হইল। গুর্জর প্রতিহাররা 'ক্ষত্রিয়', চালুক্যরা সূর্যবংশীয়, রাষ্ট্রকূটরা চন্দ্রবংশীয়, সেনরা কর্ণাটের 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়'। অবশ্য এই সব ক্ষত্রিয়দের বিবাহাদিও ভিন্ন জাতিতে হয়,—আর তাই ইহাদের পরে (দশম পর্বে) যদি হিন্দু যুগের শেষ দিকে দেখি,—নানা সামন্ত শাসক সকলেই 'রাজপুত' এই নামে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (উত্তর ভারত তখন রাজপুত রাজবংশ-গুলিরই কবলিত) তাহা হইলে বুঝিব জাতিভেদ প্রয়োজন মত উদার হইয়া তাহার নিগড়কে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া ফেলিয়াছে। দুইটি চতুর নীতির ফোড়ন এ জন্য প্রথম হইতেই ইহার দরকার হয়—'চাতুর্বর্ণ্যের' বাহিরের বর্ণকে 'মিশ্র জাতি' বলিয়া ব্যাখ্যার চেষ্টা, আর পরে রাজবংশ (ও তাহার স্বজন) মাত্রকেই ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমোশন দান। মুসলমান বিজয়ের পর হইতে অবশ্য এই 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অনেক বেশি সংকীর্ণতার ও বর্জননীতি গ্রহণ করে—এবং কতকাংশে হয়ত এই 'কমঠ ব্রতের' জন্যই ইসলামের সর্ববিজয়ী প্লাবনের মধ্যেও হিন্দুরা টিকিয়া থাকিতে পারে, ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বপক্ষে ইহাও বলা চলে। এই সময়ের মধ্যে এক-একটি গিল্‌ডের[1] অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিজীবী যূথ ক্রমে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়—মিশ্র জাতিগুলি অনেকাংশেই এই গিল্‌ড-জাতি। তাই গিল্‌ডের বিবর্তনও এই দিক

১. প্রাচীন ভারতে 'গিল্‌ড'কে বলিত শ্রেণী। এখানে বাঙলায় আমরা 'ক্লাস' অর্থে শ্রেণী শব্দ সুপ্রচলিত হওয়ায় গিলড অর্থে 'শ্রেণী' (উর্ধ্ব কমার মধ্যে) প্রয়োগ করিলাম।

হইতে স্মরণীয়। বৈদিক যুগের পর হইতে বৃত্তি বংশগত হইতে থাকায় কারিগরদের গিল্‌ড বা 'শ্রেণী' গঠন সহজ ও স্বাভাবিক হইতে থাকে। শিল্পীদেরই তাহা কারুসংস্থা। মৌর্য যুগের পূর্বেই গিল্‌ড বা শ্রেণীগুলির সুস্পষ্ট অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্তু শ্রেণীগুলি তখনো গণ্ডীবদ্ধ হয় নাই; দুয়ার রুদ্ধ করিয়া বসে নাই, 'জাতি' হইয়া উঠে নাই। এই মৌর্যদের সময় (খ্রীঃ পূঃ ৩২১) বা তৎপূর্বেই বর্ণাশ্রমের তৃতীয় স্তরের সূচনা—ক্ষত্রিয়ের শক্তি খর্বিত, শূদ্ররা রাজা। ওদিকে 'অর্থ-শাস্ত্রে' দেখি তখন ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলিও সুবিকশিত। কোনো কোনো বিষয়ে রাজা তাহাদের আত্ম-শাসনের সুবিধাও দিয়াছে। (কৌটিল্য শূদ্রকেও 'আর্য'—স্বাধীন নাগরিক, যে দাস নয়—পর্যায়ে গণ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মৌর্য সম্রাটদের বংশটা উচ্চ নয় বলিয়াই কি?) এক একটি কারু-বৃত্তি এক একটি 'শ্রেণী' সৃষ্টি করে, এক একটি কারুবৃত্তিধারী 'শ্রেণী' নিজেদের মধ্যেই বৃত্তি ও কলাকৌশল, বিবাহ ও সামাজিক বন্ধন সীমাবদ্ধ রাখিতে থাকে—জাতি হইয়া উঠিতে চাহে। খ্রীস্টীয় শতাব্দ আরম্ভ না হইতেই (কণ্ব ও শুঙ্গদের ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার সহায়ে মনু তখন শূদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইলেন) মোটামুটি এই শ্রেণীগুলি গণ্ডীবদ্ধ হইয়া যায়—জাত্যান্তরে বিবাহ ও আহার নিষিদ্ধ হয়। গুপ্তযুগে তাহারা নিজেদের বিচার ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিকতর সুবিধা উপভোগ করে (দ্রষ্টব্য ***New History of Indian People***, Ed. Altekar & Majumder, p. 333 ff)। করিবার কথা, কারণ গুপ্ত সম্রাটরা সম্ভবতঃ বৈশ্য (?) ছিলেন, শ্রেষ্ঠীদের এক একটা 'শ্রেণী' তখন এক-একটা 'কর্পোরেশনের' মত হইয়া উঠিয়াছে। বহু শহরে উহাদের শাখা, উহা আবার অনেকটা 'চেম্বার অব কমার্সে'র'ও মত। সমৃদ্ধিও তাহাদের যথেষ্ট। মন্দির নির্মাণ গুহা নির্মাণে তাহারা উৎসাহী। আবার কারিগরদের শ্রেণীগুলিও সমৃদ্ধ—যথা তন্তুবায়, তৈলকার, প্রস্তর ভাস্করদের শ্রেণী। মহাজনীও আছে। ক্রমে কারিগরের 'শ্রেণী' বৃহৎ হইলে ভাগ হইয়া একটা নতুন 'শ্রেণী' সৃষ্টি করে—অর্থাৎ নতুন জাতি আরও বাড়িল (যেমন হেলে ও জেলে কৈবর্ত, কলু ও তিলি)। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও এই শ্রেণীগুলি সামন্ত যুগে লোপ পায় নাই—পাঠানরা চেষ্টা করিয়াও ইহাদের দমন করিতে পারে নাই। উহাই অনেকখানে 'জাতি পঞ্চায়েৎ'-এ পরিণত হয়। তথাপি ব্যবসায়ীদের গিলড (পঞ্চায়েৎ-শাসিত) এখনো দক্ষিণে ও উত্তর ভারতে টিকিয়া আছে।

এই বহুস্তরের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে ভারতীয় বর্ণভেদ-জাতিভেদের যে বিবর্তন ঘটে তাহাতে তাই মোটামুটি দেখা যায়ঃ

(১) বৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ শাসক বর্গরূপে জনসাধারণের ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছে। রাজাই জমির চরম মালিক ছিল; সে সামন্ত বা মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করিত।

(২) 'বিশ' প্রথমত ছিল জনসাধারণ, পরে 'বৈশ্য' অর্থ হইল কৃষক, ব্যবসায়ী শিল্পী। তাহারা বণিক হিসাবে যথেষ্ট সম্পদ ও মান। গুপ্তযুগে লাভ করিয়াছিল। হর্ষবর্ধনও বৈশ্য-কুল-সম্ভূত। তখন হইতে বৈশ্যরা ব্যবসায়ী। আর তখন হইতে এখন পর্যন্ত বৈশ্যরা উত্তরে সম্মানিত জাতি রহিয়াছে। অন্যত্র তাহারা প্রায় লুপ্ত—হয়ত বৌদ্ধ বণিক সম্প্রদায় ক্রমে শূদ্র জাতিতে নিমজ্জিত হয়।

(৩) বিশেষতঃ সাধারণ শিল্পীরা (যাহারা কায়িক পরিশ্রম করিত) তাহারা চাষী, কারিগর হিসাবে ক্রমশ শূদ্র' গণ্য হইল। (ক) শূদ্র সাধারণত ছিল অধিকারহীন,—ভূসম্পত্তি তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু সকলে স্লেভ্ নয়, অনেকে ভাগচাষী কিংবা ক্ষেতমজুর। (খ) শিল্পী কারিগর হিসাবে অবশ্য তাহারা হইত সমস্ত গ্রামের প্রতিপাল্য—গ্রামের চাহিদা জোগাইয়া যদি কিছু থাকিত তাহা শ্রেষ্ঠীরা হয়ত নগরের পণ্যরূপে গ্রহণ করিত। (গ) অধিকারহীন শূদ্রদের মধ্যেই ছিল ক্রীতদাস, ঋণদাস, এবং অন্য জাতির পতিতরা, এবং বিজিত দেশের শ্রমজীবীরা। (ঘ) শূদ্রদেরও বাহিরে ছিল ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ। মৌর্য যুগে শূদ্রদের যেটুকু প্রতিষ্ঠা ছিল মনুস্মৃতি তাহা হরণ করে। মোটামুটি শূদ্রের অর্থ হইয়া দাঁড়ায়—ভারতের অধিকারহীন দাস-তুল্য শ্রমজীবীশ্রেণী। (ঙ) পরে ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু সুবিধা করিতে পারে, বাংলাদেশে তাহারা একটু প্রোমোশন পাইয়া সৎশূদ্র হয়; অন্যেরা অনাচরণীয় হয়, অন্ত্যজ হয়, পঞ্চম হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় সমাজের উৎপাদক

শ্রেণী মুখ্যতঃ এই শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতিরাই—ইহারাই ছিল ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, সামান্য কারিগর শিল্পী, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই কৃষকও। মোটামুটি শূদ্র অর্থ দাঁড়ায় এই—দাসতুল্য, অধিকারহীন শ্রমজীবীকুল।

(৪) প্রধানত ব্রাহ্মণরাই এই শ্রেণীবিন্যাসে নিজের মহিমা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য শ্রেণীর মধ্যেও এই উচ্চ-নীচ-পর্যায় বাড়াইতে থাকে। বৃত্তি বংশগত হইয়া উঠিতে থাকিলে বৃত্তিজীবীরা কলাগত-জীবিকা নিজেদের বংশগত করিয়া রাখিবার জন্য তাহা মানিয়া লয়।—তাহাদের এইরূপ গিল্ড বা 'শ্রেণী'গুলিই ক্রমে নানা জাতিতে পরিণত হয়, এই বংশগত বৃত্তির সুবিধার জন্যই বিবাহ ও আহারের বিধিনিষেধ গ্রাহ্য হয়। তখন গিলড্ 'জাত পঞ্চায়েতের' জাতি হয়।

(৫) এই ভেদ-রেখা ধরিয়া ক্রমে টোটেম (বা গোষ্ঠীপিতা বিষয়ক) তাবু (বা ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও অন্যান্য নিষেধাত্মক) সম্পর্ক ও 'মেনা' (বা শুদ্ধাশুদ্ধ, পাপপুণ্য) মূলক আদিম সংস্কারগুলি নতুন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিল। তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর জাতির পক্ষে নিম্ন শ্রেণীর জাতির শুধু ভোজ্যপেয় বা পরস্পরের বৈবাহিক সম্পর্ক নয়, স্পর্শ, দর্শন পর্যন্ত অমঙ্গলসূচক হইয়া উঠিল। শুদ্ধাশুদ্ধের ধারণা ও বিচার শুধু অসম্ভব রূপে পল্লবিত হইল না, এই ভেদরেখা অনুসরণ করিয়া তাহা অসম্ভব রকমের সুদৃঢ়ও হইল। এবং প্রত্যেকটি জাতিকে তাহারই শ্রেণীর অন্যান্য জাতি হইতেও দূরে করিয়া রাখিল, শ্রেণীর মধ্যেও অসংখ্য ও অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিল। যে 'জাতি' আসলে আর্থিক মাপকাঠিতে যত নিম্ন, স্বভাবতই সে হইল অশুদ্ধ, অস্পৃশ্য। কিন্তু তাহার পক্ষে এই ধারণা মানিয়া চলাই হইল তাহার জাতি-নিয়ম, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি সংস্কারের অনুশাসন। এইভাবে একটা আর্থিক-সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অন্যান্য সংস্কারের দ্বারা একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া আরও দুর্বোধ্য ও রহস্যাবৃত হইয়া পড়ে। এই রহস্যময় বিধিবিধান সমন্বিত জাতিভেদ-প্রথা সামন্ত সমাজ-ব্যবস্থাকেও একটা রহস্যময় ঐশ্বরিক মহিমাও দান করে আর ভারতীয় সামন্ত-তন্ত্রের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও হইয়া উঠে।

এই জাতিভেদের প্রধান যাহা উদ্দেশ্য তাহা যে অনেকাংশে সিদ্ধ না হইয়াছে তাহা নয়। আর্থিক শ্রেণীভেদকে প্রথম হইতেই ধর্মশাস্ত্রের বলে অপার্থিব বিধান বলিয়া প্রচার করা হয়। শুধু সমাজ নয়, শাসিত শ্রেণীও খণ্ড খণ্ড জাতিতে ভাগ হইয়া গেল—না রহিল জাতীয় অখণ্ডতা, না রহিল শ্রেণীগত অখণ্ডতা। ইহার ফলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কলানৈপুণ্য জোটে, কিন্তু মোট উৎপাদনশক্তি ক্রমেই রুদ্ধগতি হইয়া পড়ে। অর্থাৎ নতুন যন্ত্র উদ্ভাবনা, বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ রহিল না। উৎপাদক শ্রেণীর মনে উদ্যোগের কারণ নাই। শাসক বা ধনিক শ্রেণীর লাভ ও প্রাপ্য এতই সুনিশ্চিত যে, শিল্পোদ্যোগের প্রয়োজন তাহারা বোধ করে না। গ্রীস সভ্যতাও পুরানো সভ্যতা, তাহা দাসতার ফাঁদে এইরূপে মরে; ভারতীয় সভ্যতা জাতিভেদের বন্ধনে ধীরে ধীরে slow death গ্রহণ করে। এই বর্ণভেদের ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সহায়তায় ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পক্ষে টিকিয়া থাকিবার মত একটা স্থাণু ব্যবস্থা হইল, এবং শ্রেণী সংঘাতও প্রতিহত করিবার মত বাস্তব উপায় শাসকশ্রেণীর হাতে আসিল। সমাজ-বিকাশ রুদ্ধ করা গেল—উৎপাদনশক্তি এইরূপে দুর্বল করিয়া। উৎপাদক শ্রেণীকে এইভাবে ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নামে এবং বাস্তব রাষ্ট্রীয় বিধানের জোরে পোষ মানাইয়া রাখিয়া সামন্ততন্ত্রকে টিকাইয়া রাখিবার পক্ষে জাতিভেদ প্রথার মত এমন নিগড় আর কি হইতে পারে?

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র

ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা ও শিল্প উৎপাদন যেমন ভারতীয় 'বর্ণাশ্রমের' সহিত জড়িত, তেমনি সেই ভূমি-ব্যবস্থা ও 'জাতিভেদ প্রথা' মিলিয়া আবার ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে বিশিষ্ট রূপ ও বিশিষ্ট স্থায়িত্ব দান করিয়াছে। এই জন্যই এই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে ইউরোপীয় বা অন্যান্য ফিউডাল

ব্যবস্থার তুলনায় পৃথক জিনিস বলিয়া মেন্ প্রমুখের মনে হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি মোটা লক্ষণের কথা সম্মুখে রাখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে এই ভারতের সামন্ত-ব্যবস্থা কি আকারের।

প্রথমত, কৃষিই যখন প্রধান উৎপাদন-পন্থা, ভূমি-ব্যবস্থাতেই তখন সমাজের মূল জট নিহিত থাকিবে। সেই ভূমি-ব্যবস্থার দিক হইতে দেখি—সর্বোপরি রাজা আছেন ভূস্বামী; তাঁহার নীচে তাঁহার সৃষ্ট দেব-ব্রাহ্মণ হইতে নানা মধ্যস্বত্ববানরা আছে; এবং তলাকার দিকে আছে দখলী স্বত্ববান্ কৃষক গৃহস্থ (পূর্বে এ কাজ করিত বৈশ্যরা; পরে শুধু বৈশ্য ধনিকেরাই বৈশ্য থাকে, এই কৃষকেরা শূদ্র হইয়া যায়), তাহাদের নীচে আছে বর্গাদার, নানা পর্যায়ের দাস ও অন্ত্যজ ক্ষেতমজুর। ঠিক 'ক্রীতদাস' বা ভূমিদাস' না হইলেও ইহাদের অনেকের অবস্থা দাসদের মতই। মুদ্রায় বেতন বা মুদ্রার প্রচলন মোটেই বাড়ে নাই। কাজেই শস্যে বা বস্তুতেই বেতন দেওয়া হইত।

জন বা ট্রাইব্ ভাঙিয়া যখন বৈদিক সমাজ গঠিত হইতেছে তখনও এই স্তর-বিন্যাস (হেয়ারারকি) ছিল না, অবশ্য রাজারা তখনো ভূমিদান করিতেন; সম্পন্ন (মহাকুল, মঘবন্) সম্মানিত গোষ্ঠী তখনো ছিল। মৌর্যযুগেও সামন্তদের যথার্থ সাক্ষাৎ পাই না; বিরাট মৌর্যসাম্রাজ্যের শাসন রাজ-কর্মচারীদের (মহামাত্র) সহায়ে চলিত। এত বিরাট দেশে আমলাশাহি কেন্দ্রিত হইলেও অঞ্চলের আত্ম-শাসনও স্বীকৃত ছিল। শুঙ্গদের সময়ে সামন্তদের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। হয়ত মহামাত্রদের পূর্বাধিকার এইভাবে স্বীকার না করিয়া এই দুর্বল রাজারা পারিত না। কিন্তু ভারশিব-বাকাটক ও গুপ্তযুগে আসিতে আসিতে সামন্ততন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সমস্ত হিন্দুযুগে উত্তরে ও দক্ষিণে সামন্ত-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে (মুসলমান যুগে তাহা আরও পাকা ও সুদৃঢ় হয়)।

এই বিভিন্ন স্তরের সামন্তদের স্তরবিভাগ সুপরিচ্ছন্ন না হইলেও কৌতূহলোদ্দীপক। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত পুরালিপি হইতে তাহা উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। যথা: (১) উপরে মহারাজাধিরাজ, পরে একে একে (২) মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি, মহামাণ্ডলিক, (৩) সামন্ত মাণ্ডলিক, মণ্ডলেশ্বর ইত্যাদি, (৪) ভুক্তিপতি, ভোগপতি, শাসক ইত্যাদি, (৫) বিষয়পতি, গ্রামপতি, (৬) ষষ্ঠাধিকৃত (রাজস্বের এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী,) (৭) ভোজক (সম্ভবতঃ গ্রামের অধিকারী), (৮) কুটুম্বি, ক্ষেত্রকার, কর্তৃক, ইত্যাদি (কৃষক, ক্ষেত্রকার) (৯) পরের ভূমিতে কৃষি করিয়া শস্যের একাংশ পায় (ভাগচাষী, বর্গাদার) ও (১০) দাসেরা এবং দাসেই শেষ হইত। ইহারা সম্ভবত 'কর্মক' নামেই পরিচিত হইত, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ইহাই অনুমান।)

এই নামগুলি রাজকর্মচারীদের উপাধি নয়। বরং সামন্তরাই নিজ নিজ এলাকায় শাসন-বিচারেরও অধিকারী। রাজকর্মচারীরাও যেমন সামন্ত অধিকার লাভ করিত, সামন্তরাও তেমন রাজকর্মচারী হইত, ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। দ্বিতীয়তঃ, ভূমিস্বত্বের দিক হইতে নিষ্কর ধর্ম (ফিউডাল ফিয়েফ্, মুসলমান আমলের জায়গীরের সমতুল্য), পাট্টাব (ইমিউনিটি), ভূমিচ্ছিদ্র দান (ফিউডাল 'বেনিফিস্' এর সমতুল্য) প্রভৃতি ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্রের সুপরিচিত ব্যবস্থা, তাহা দেখিয়াছি। ইহার সহিত পরবর্তীকালের 'নিষ্কর', 'চাকরান্' প্রভৃতির কথা স্মরণীয়—গ্রাম গোষ্ঠীর পূজা পার্বণে, এবং দেবী-প্রতিমা, হাঁড়িকুঁড়ি, ক্ষৌরকর্ম, বস্ত্র ধোলাই প্রভৃতির প্রয়োজন মিটাইবার শর্তে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোত্র), ও কুম্ভকার, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি নানা শিল্পীরা, এমন কি ভৃত্যেরা পর্যন্ত, এইরূপে নিষ্কর ভূমি লাভ করিত। ইহা ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থা। তবে ভারতে এই ব্যবস্থা মুসলমান আমলেই এতটা বিকাশ লাভ করিয়া থাকিবে। শেষ কথা: ভাবাদর্শের দিক হইতে ক্ষাত্রধর্মের যে আদর্শ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়—রাজপুতদের কেন, মুসলমানদের মধ্যেও দেখি—তাহা ইউরোপীয় নাইট্দের আদর্শের অপেক্ষাও অনেকাংশে উচ্চতর।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র অবশ্য যোদ্ধশ্রেণীর (ক্ষত্রিয়দের) সৃষ্ট নয়; ভারতের সামাজিক অবস্থা হইতে তাহা উদ্ভূত হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যে যাহা স্মরণীয় তাহা এই: 'চাকরান' বা ইউরোপীয় ধরনের মেনোরিয়েল প্রথা এখানকার বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শিল্পী কারিগররা গ্রামের প্রয়োজন জোগাইত, গ্রামই তাহাদের পোষণ করিত। একমাত্র শহরে বন্দরে হয়ত রাজশিল্পীরা রাজা বা সামন্তর ভৃত্য ছিল—কেহ একটু সম্মানিত, কিন্তু অধিকাংশেই গণনাযোগ্য নয়।

সাধারণভাবে শিল্পীরাই শিল্পকর্মের ও জীবিকার উপযোগী নিজেদের যন্ত্রপাতির অধিকারী ছিলেন, এবং কৃষকেরা নিজেদের লাঙল গোরু প্রভৃতি দ্বারা জমি চাষ করিতেন। ইহাই এদেশের ফিউডাল 'সার্ফের' অবস্থা—'ভূমিদাস' বলিলেও আসলে ইহারা জমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিত। কারণ, সামন্ত প্রথার মূল কথা হইল এই—উৎপাদকের (কৃষক বা কারিগর যাহাকেই ধরি) সহিত তাহার ঊর্ধ্বতন অধিকারীর বা মালিকের সম্পর্ক; কি কি সামাজিক আর্থিক সত্যের উপর এই পারস্পরিক আদান প্রদানের সম্পর্ক স্থাপিত তাহাই আসল কথা।[১]

বলা বাহুল্য, সাধারণ কৃষক বা কারিগরের অবস্থাটা ইহাতে স্লেভ্ বা দাসের মতও নয়, আবার নির্বিত্ত বন্ধনমুক্ত প্রোলিটেরিয়েটের মতও নয়। কতটা শাসক-শক্তি কোন্ শ্রেণীর—যোদ্ধৃ শ্রেণীর অস্ত্র, না পুরোহিত রাজাদের, না কোনো চিরাগত প্রথা ও বিধি-বিধান সেই শক্তির উৎস,—এই কথা গুরুতর হইলেও গৌণ, আসল কথা উৎপাদনের অবস্থা। এই বিচারে দেখিব যে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের কাঠামো ক্ষাত্রশক্তি জোগায় নাই, ব্রাহ্মণশক্তি জোগাইয়াছে,—তাহাদের বর্ণাশ্রমের বাস্তব মতাদর্শ ও ব্যবস্থা দ্বারা। উহার মেরুদণ্ড স্তরবিভক্ত ভূমি-ব্যবস্থা বটে, কিন্তু এই মেরুদণ্ড 'ক্ষুদ্র কৃষক (ও কারিগর) ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী'র আর্থিক নীতি; এবং উহার ভিত্তিভূমি ভারতের চিরদিনকার বিচ্ছিন্ন স্বয়ং-নির্ভর পল্লী-সমাজ, উহার কৃষি ও কৃষিশিল্প।

সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে এই ভারতীয় পল্লী-সমাজের পরিবর্তন কতটা হইয়াছে? এই কথা সত্য, ভূমি কোনো দিন গ্রাম্য-সমাজের সাধারণ সম্পত্তি ছিল না। উহা ছিল পরিবারগত সম্পত্তি; পরে গ্রামপতিরও উদ্দেশ মিলে। পল্লীর স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতাও অনেকাংশেই ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া যায়। বেদের গ্রাম্য-সভার কথা মৌর্য যুগেই আর শুনি না; অবশ্য শহরের শ্রেণী বা করপোরেশন তখন প্রভাবশালী। গুপ্তযুগে আসিতে আসিতে দেখি, 'নগর শ্রেষ্ঠী,' 'প্রথম সার্থবহ' (বণিক গিল্ডের নায়ক), 'প্রথম কুলিক' (শিল্পী গিল্ডের নেতা), 'প্রথম কায়স্থ' (লেখাকারদের নেতা) প্রভৃতি লইয়া নগরের 'নিগম-সভা' চলে। গ্রামে ভূমির ক্রয়-বিক্রয়ে দানে 'গ্রামকূট', 'মহামাত্র' (মাতব্বর), 'গ্রামিক' (প্রধান) 'কুটিম্বী'দের (গৃহস্থ কৃষকদের) মতামত ও উপস্থিতি প্রয়োজন; —প্রত্যেক গ্রামের জীবন অনেকটা স্ব-নির্ভর। উত্তরে ও দক্ষিণাপথে (বাংলায়ও) গ্রাম্য-সভা বা গ্রাম্য-সমিতির এইটুকু ক্ষমতা অনেকদিন স্বীকৃত ছিল, অবশ্য গ্রাম্য ও নগর সভায় অবস্থাপন্নরাই আসন লাভ করিত,—'নির্বাচিত' হইত না। কিন্তু মুসলমান বিজেতারা এই ক্ষমতা আর স্বীকার করেন নাই। তাহার পর হইতে গ্রাম্যসভা নয়, 'জাত পঞ্চায়েত'ই প্রবল হয়। তখনও কিন্তু তাই বলিয়া গ্রাম্য অর্থনীতির বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই;—বাহিরের বাজারে যায় বিলাসপণ্য, এবং কৃষক, পল্লীর শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গ্রামে পরস্পরের প্রয়োজন মিটায়। যানবাহন নাই, মুদ্রার প্রচলন সামান্য, গ্রামের উপজ তাই গ্রামেই রহে। তাই ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর এই আর্থিক শক্তি লইয়া আত্মসন্তুষ্ট গ্রাম্য-সমাজ মোটামুটি শত পরিবর্তনের মধ্যে একই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের এই স্বরূপ বুঝিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না—কেন এত সুদীর্ঘকাল ইহা স্থায়ী হইতে পারিল। পুনরুক্তি হইলেও তাহা আর একবার স্মরণীয়ঃ প্রথমত, স্বাভাবিক কারণ ছিল (ক) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে ভারতবাসীর জীবনমান সরল ছিল; (খ) উর্বর ভূমির জন্য

১. "The emphasis...will lie...in the relation between the direct producer (whether he be artisan in some workshop or peasant cultivator on the land) and his immediate superior or overlord and in the socio-economic contents of the obligation which connects them." (Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism).

"The direct producer is here (i, e, in Feudalism) in possession of his means of production, of the material labour conditions required for the realization of his labour and the production of his means of subsistence. He carries on his agriculture and the rural house industries with it as an independent producer; at the sametime the property relation must assert itself as a direct relation between rulers & servants that the direct producer is not free.'. (ঐ গ্রন্থে Capital, III হইতে উদ্ধৃত)।

কৃষি-সমাজের জীবনযুদ্ধ সহজ হইয়াছিল ; (গ) বিরাট দেশের তুলনায় সেদিনে জন-সংখ্যা ছিল অল্প ; দ্বন্দ্ব বাধিলে নতুন গ্রাম স্থাপনেও বাধা হয় নাই। দ্বিতীয়ত ভারতীয় সমাজে শ্রেণীভেদ বর্ণভেদ ও জাতিভেদে পরিণত হইয়া শোষিত শ্রেণীকে বিভক্ত ও উদ্যোগহীন করিয়া রাখিতে পারে। তৃতীয়ত, ভারতের এই চিরাগত ভাবাদর্শ, ধর্ম, দর্শন, এমন কি সাহিত্য, শিল্পনীতি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উদ্যোগ আয়োজন জাতির দিকে বিশেষ তাড়না দেয় নাই। চতুর্থত, 'কর্মফলের' ধারণা ও 'অধিকার-ভেদের' ধারণা প্রায় অবিসংবাদিত সত্যরূপে গ্রাহ্য হওয়ায় মানুষ যে-কোন দুঃখ দৈন্যকে মানিয়া লওয়াই শ্রেয় বলিয়া বুঝিয়াছে। আর শেষ কারণ, এইসব বাস্তব ও মানসিক কারণে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে **উৎপাদন শক্তি এত বৃদ্ধি পায় নাই যে সমাজ-বিপ্লব অনিবার্য হইয়া পড়ে।** নতুন গ্রাম গঠন করিয়া কিংবা ব্রাহ্মণের সুচতুর শম-দম-দণ্ড-ভেদ নীতি, শ্রেণীদ্বন্দ্ব চাপা দিবার অদ্ভুত কৌশল প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া উৎপাদনশক্তি ফাটিয়া বাহির হইবে কৃষিব্যবস্থার বা শিল্পব্যবস্থার **এমন কোনো উপকরণগত পরিবর্তন হয় নাই**—সেই পুরানো সামান্য লাঙল-গরু বহিল সম্বল, সেই পুরানো চাকা কুমারের সর্বস্ব, সেই হাতুড়ীই কামারের উপায়—এবং বন্দরের বণিক, সমৃদ্ধ বণিকশ্রেণী, উপনিবেশের বহির্বাণিজ্য ও আন্তর্বাণিজ্য সত্ত্বেও শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর হয় নাই, কারখানা বসায় নাই, (হয়ত দাদন দিয়া) শিল্পীদের পণ্যজাত লইয়া ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছে মাত্র, ব্যবসা ও সাউকারী করিয়াছে, শিল্পোদ্যোগে হাত দেয় নাই। মুদ্রাযুগ প্রায় আসে নাই, যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা সামান্য, পল্লী প্রধান সমাজ নিশ্চল রহিয়াছে।

শ্রেণী-সংঘাতের সাক্ষ্য

ইহা দেখিয়া কি বলা যাইতে পারে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা শ্রেণীবিরোধের মীমাংসা করিয়াছিল ('জাতিভেদের' ও 'কর্মফলের' ব্যবস্থা দ্বারা ?) ? উলটাইয়া কেহ বা বলিবেন—শ্রেণীবিরোধই যে ইতিহাসের মূল সূত্র ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। প্রমাণ অবশ্য উপরেই রহিয়াছে—কোনো একটা বিরোধকে দমন বা প্রশমন করিতে পারিলে অবশ্য সেই বিরোধের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। ইহাও সত্য বটে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্পষ্ট প্রমাণপত্র এত কম যে, উহাতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা না পাইলে মোটেই বিস্মিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ এই যে, যত ভাবেই শ্রেণীদ্বন্দ্ব চাপা দেওয়া হউক, তাহার সংবাদ এবং এক আধটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'মানবসমাজ, ৫ম অধ্যায় ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ***Studies in Indian Social Polity***, Class Struggle in Ancient India, p. 9 pf)। আমরা দেখিয়াছি বৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয় ও যাজক শ্রেণী অন্যদের ক্ষমতা কাড়িয়া নিজেদের শক্তিশালী করিতে থাকে। কিন্তু মল্ল লিচ্ছবী শাক্য প্রভৃতি অভিজাততন্ত্র এবং রাজা বা ব্রাহ্মণকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দেয় নাই, যৌধেয় মালব প্রভৃতি গণতন্ত্র অনেকদিন টিকিয়াছিল। এদিকে বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ এই শাসক শ্রেণীর অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কুমাররা যে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করিলেন, তাহা কোন্ সামাজিক আর্থিক তাড়নায় ? অবশ্য অনেকাংশে তাহা সেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের একটা আপস মীমাংসা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোনো সামাজিক দ্বন্দ্বই যে ধর্মের দ্বন্দ্ব বা দেবতার দ্বন্দ্বরূপে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত হয় তাহা তো জানা কথা। ইহাই মুসলমান আমলের ধর্ম প্রবর্তকদের ও সংস্কারকদেরও সম্বন্ধে সত্য। নন্দদের পর হইতে ক্ষত্রিয় রাজাদের পরিবর্তে শূদ্র অভ্যুত্থান ঘটিল কি করিয়া—যদি সেই বিশেষ রাজবংশ ও তার অনুচরগণ বর্ণাশ্রমের নিয়মে উচ্চবর্ণের রাজাদের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত ? আর কোন্ সূত্রে আসিল শুঙ্গ-কণ্বদের ব্রাহ্মণ রাজত্ব, ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়া ? কিংবা পরবর্তী কালের নিম্নজাতীয় সম্রাটদের অভ্যুদয় ? গুপ্তদের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ছায়ায় বণিক ও শিল্পী জাতীয় শ্রেণীর সমৃদ্ধিই কি অর্থহীন ? (অন্ত্যজের 'দেবী' মনসার পূজা প্রচলিত হইবে চাঁদবেণের পূজায়—ব্রাহ্মণের নয়, ক্ষত্রিয়ের নয়, একজন বণিক নেতার ?

এই কি পাল রাজত্বের বাঙালী সমাজে বণিক প্রতিপত্তির স্মৃতিচিহ্ন ?) । বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আপেক্ষিক উদারতা ও শান্তির প্রয়াসকে অবলম্বন করিয়া যে শ্রেষ্ঠী বণিকেরা প্রথম অবধিই আপনাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, সমাজের নিম্নশ্রেণীরা আপনাদের দুর্ভাগ্যের বোঝা লাঘব করিতে চাহিয়াছে, তাহারও আভাস যথেষ্ট আছে। বৌদ্ধধর্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব শ্রেণীর ভারতীয় বর্ণাশ্রমের মধ্যে শূদ্র শ্রেণীতে স্থান হইল, তাহারও প্রমাণ মিলে। অবশ্য এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের সব চেয়ে ভালো প্রমাণ এই যে, নানা অশ্রুতনামা গোষ্ঠী রাজশক্তিতে পরিণত হইলেই 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া গণ্য হয়, তাহাদের স্বজনগণও সম্ভবত সেই মর্যাদা লাভ করিত। কিন্তু এই সুযোগ লাভে তাহারাই আবার শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীকে বর্জন করে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইহাতে সমাধান হয় না ; হয় কোনো নিম্ন-শ্রেণীর রাজগোষ্ঠীর উন্নতি ; সমগ্রভাবে শ্রেণীবিদ্রোহে একটা সাময়িক ব্যর্থতা আসে।

এই কথা নিশ্চয়ই সত্য যে, এই দীর্ঘকালে সমাজবিপ্লব সাধিত হয় নাই। তাহার কারণ আমরা পূর্বেই বুঝিয়াছি, উৎপাদনশক্তির তত বিকাশ ঘটে নাই। শুধু বিলাস-পণ্যের বাণিজ্য সূত্রে পল্লী-প্রধান সমাজ পরিবর্তিত হয় না। এমন কি, মুদ্রা বিনিময় ও টেকনোলোজিক্যাল উন্নতি যথেষ্ট না হইলে 'বণিকপুঁজি'ও প্রভাবশালী হয় না। আর নির্বিত্ত বা প্রোলিটেরিয়ানের (ভূমিহীন শ্রমসর্বস্ব শ্রমিকের) সৃষ্টি না হইলে আসলে বণিকতন্ত্রও ধনিকতন্ত্রে উন্নীত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রেণীদ্বন্দ্ব ঘটে না তাহা নয়,—শ্রেণীবিরোধ, শ্রেণীবিদ্রোহ এই সামন্ততন্ত্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগের ভারতেও নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই শ্রেণীসংঘাতের ছাপ তাই রাষ্ট্রে সমাজে কেন সাহিত্যে দর্শনেও লাভ করা যায়—তবে লাভ করা যায় অনেক খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিচার করিলে।

মুসলমান বিজয়

মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হইল। প্রথম পর্ব জুড়িয়া ছিল হিন্দু-সংস্কৃতি—তাহা অবশ্য শেষ হইল না ; আসিল দ্বিতীয় পর্ব—এক নতুন শক্তি।

মনে রাখিবার মত কথা এই যে, এই দুই পর্বের মধ্যে জীবনযাত্রার দিক হইতে মৌলিক তফাৎ সামান্য। দুইই একটি প্রধান যুগের রূপভেদ মাত্র, জীবিকা ও জীবিকার উপাদান প্রায় সম্পূর্ণ একই রহিয়াছে ; তাহা সেই কৃষি যুগের পরিচিত বস্তু সম্ভার। উহাতে যাহা কিছু তফাৎ দেখা যাইবে তাহা সামান্য। কতকাংশে তাহা এখানকার কৃষি-সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফল, কতকাংশে তাহা নবাগত তুর্ক-তাজিক-ঈরানী মুঘল প্রভৃতি জাতিদের বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক নিজস্ব নিয়মকানুন ও ধারণা, কতকাংশে বা তাহাদেরই গৃহীত মুসলমান ধর্মের ব্যক্তিগত ও সম্পত্তিগত নিয়ম কানুন, ক্রিয়া কলাপ, আচার পদ্ধতি—তাহাও আবার অধিকাংশই আরবীয়, খানিকটা ঈরানী। কিন্তু জীবনযাত্রার বাস্তবভিত্তি তখন পরিবর্তিত হয় নাই—এইটুকু ভুলিবার নয়। পরবর্তীকালে যে সামন্ততন্ত্র সমস্ত মুসলমান আমলের প্রধান লক্ষণ লইয়া রহিল, তাহার সাক্ষাৎ গুপ্তযুগেই পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধনের পর হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগের যে সূচনা হয়—তাহাতে ক্রমে রাজপুত জাতির রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় এইরূপে সামন্ততন্ত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

তুর্ক বিজয়ের সঙ্গে দিল্লীর মুসলমান সুলতানেরা স্বভাবতই তুর্ক ও ঈরানী আফগান সেনাপতি ও প্রাদেশিক কর্তাদের বড় বড় জায়গীর দিয়া এক নতুন ধরনের সামন্ততন্ত্রের পত্তন করিয়াছিলেন। অবশ্য পুরাতন হিন্দু রাজারাও অনেক ক্ষেত্রে বশ্যতা স্বীকার করিয়া সামন্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিত, অনেক ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া শাসক শ্রেণীতে নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করিত। তথাপি রাজ্যের প্রধান সামন্ত, পাত্রমিত্র, সেনাপতি প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই যে তুর্ক কিংবা আফগান জাতীয় ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই। এই নতুন সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিভেদ বা পুরাতন হিন্দু শ্রেণীভেদের

মূল ভিত্তিই ধসিয়া গেল। মুসলমান সম্রাটদের শাসনকালে ভারতে সামন্ততন্ত্রের অবসান হইল না, ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে একটা নতুন পর্বের সূচনা হইল। তুর্ক তাজিক প্রভৃতি জাতিরা ভারতবর্ষের বাহির হইতে যে সামন্তপদ্ধতি বহিয়া আনিল তাহা সুপরিচিত সামন্তপ্রথার অনুরূপ, বরং সামন্ততন্ত্রের আরও প্রবল ও আরও সুদৃঢ় রূপমাত্র। ইহারই জন্য এই বিপুল দেশে দিল্লীর সুলতানদের একটু মাত্র কড়া দৃষ্টির অভাব ঘটিলে তাঁহাদের এই সামন্তরা বিদ্রোহী হইত, নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্যে নিজেরা স্বাধীন হইয়া বসিত। আলাউদ্দীন খিলজি (১২৯৪—১৩১৬) অবশ্য জায়গীরের পরিবর্তে সেনাপতি ও শাসনকর্তাদের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বেশি দিন কার্যকরী হয় নাই। বলা বাহুল্য, আলাউদ্দীনের হিন্দু ধনিকবণিক কাহাকেও নিস্তার দিবার কথা নয়, দেনও নাই। নিশ্চয়ই মুসলমান ধর্মের অনুশাসন ছিল তাঁহার প্রধান যুক্তি এবং তুর্কদের ধর্মান্ধতার অপেক্ষাও তাহা ক্রূর নিষ্ঠুর প্রবল ছিল—কিন্তু যুক্তিটা আসলে শোষণ মাত্র। তখন জমির নতুন করিয়া মাপজোক হয়, রাজার পাওনা হিন্দু আমলে ছিল সাধারণত একষষ্ঠাংশ, এখন আলাউদ্দীন আদায় করিলেন অর্ধাংশ। "কাহারও ঘরে সোনারূপা রহিল না·· ···কোনো জিনিসই উদ্বৃত্ত দেখা যায় না।" ইহাতেই বিদ্রোহের মূল কারণ নাকি দূর হয়। অবশ্য খাজনা আদায়ের জন্য তুবুক ঠোকা, কারাদণ্ড হইতে শৃঙ্খলবন্ধন, কিছু আলাউদ্দীন বাদ দিতেন না—জিয়া বরনী তাহাও জানাইয়াছেন।

আলাউদ্দীন শীরীর (তৎকালীন শহর) নির্মাতা, নতুন সৌধ হর্ম্যও নির্মাণ করেন। তাঁহার সভাতেই কবি ছিলেন প্রসিদ্ধ আমীর খসরু (যদিও খসরুর হিন্দী পদ হয়ত তাঁহার রচনা নয়, কিংবা কালে কালে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে)। এই ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতি অনুরাগের সহিত দেশের জনসাধারণের সম্পর্ক থাকার কথা নয়—উহা এক সামন্ত সম্রাটের কঠিন দর্প ও দুর্ধর্ষ স্বেচ্ছাচারিতারই সাক্ষ্য বহন করে। এই কথা সত্য যে, এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যাহারা করিত তাহারাও সামন্তশ্রেণীরই প্রধান, তাহাদের সেই বিদ্রোহের শক্তি জোগাইত সাধারণ মানুষের ধূমায়িত অসন্তোষ। মহম্মদ তোগলকের (১৩২৫-১৩৪৭) সময়েই দিল্লীর এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে (আনুমানিক ১৩৪৯);—বাঙলায়, গুজরাটে (পাঠান শিল্প ও স্থাপত্যের বহু কীর্তিই এইসব স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজাদের), সিন্ধুতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। দক্ষিণে বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত (১৩৩৬-১৬৪৬) হয়, কুলবর্গায় বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৩৪৬-১৪৭৪ ও ১৬৭৩) করে হাসান গঙ্গু বাহমনী। জিয়া বরনী বলেন "জনসাধারণও বিদ্রোহ করিতে ক্ষান্ত হন নাই, সুলতানও তাহাদের শাস্তি দিতে ক্ষান্ত হন নাই।" হয়ত ইহার মধ্য দিয়াই পুরাতন জমিদার প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত হইতেছিল। অন্তত ফিরোজশাহ তোগলোক (১৩৫১-১৩৭১) জায়গীরদারী প্রথাই পুনঃ প্রবর্তন করেন। তুর্ক-পাঠানের রাজত্বশেষে মুঘলরা (১৫২৬ খৃঃ অঃ) রাজা হইয়া বসিলেও এই জায়গীরদারী পদ্ধতি অব্যাহত চলে। (ইহারই মধ্যে অশোকের কাল হইতে পূর্বাপর আমরা যাহা জানি তাহাই দেখি শের সাহের (১৫৪০-১৫৪৫) সময়ে আরও সুনিশ্চিত রূপে)। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র বিরাট দেশের পথঘাট নির্মাণ করে, কূপ খনন করে, সরাই স্থাপন করে, কৃষকের সেচের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে স্বেচ্ছাচারী শাসকদেরও মুখাপেক্ষী করিয়া রাখে—বলা বাহুল্য এই পালনমূলক মূল কাজ সাধারণ গ্রাম্যসমাজের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নয়। ক্ষুদ্র সামন্তের পক্ষেও কূপ ও পুষ্করিণী খনন মাত্র সম্ভব,—এই কৃষি সমাজের পক্ষে এই দুর্ধর্ষ এবং শোষণধর্মী কেন্দ্রিত রাজ্যগুলিও ছিল তাই বাঞ্ছনীয়। এইখানেই ছিল সাধারণভাবে তাহাদের সার্থকতা। কদাচিৎ যদি অশোক, শেরশাহ, আকবরের মত মহৎ রাজা এই রাজ্যের নিয়ন্তা হন, তখন প্রজাসাধারণের পক্ষে তাহা একটা অভাবনীয় সৌভাগ্য—আসলে তাহা প্রায় নিয়মের ব্যতিক্রম (কি হিন্দু, কি মুসলমান যুগে, কিংবা কি বিজয়নগর সাম্রাজ্যে, কি বাহমনী সাম্রাজ্যে প্রজারা শোষণের পেষণ হইতে নিশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ পাইত কদাচিৎ)।

ভারতবর্ষে এই সামন্তপ্রথার অবসান আরম্ভ হয় সম্রাট আকবরের আমলে (১৫৫৫-১৬০৫) টোডরমল্লের নতুন জরিপ ও বন্দোবস্তে। আকবর এক কেন্দ্রিত ও সংগঠিত সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হন। জায়গীরদারী প্রথা তিনি বাতিল করিয়া সেনাপতিদের (মনসবদার) ও শাসনকর্তাদের

(সিপাহিসালার) বেতন দিতে লাগিলেন। তাহাদের পক্ষে শর্তমত সৈন্য সরবরাহ করা অনেক ক্ষেত্রে আর প্রয়োজন হইল না—সৈন্যবাহিনী সরাসরি রাষ্ট্রের হাতে আসিল। রাজস্ব যাহারা আদায় করিত তাহারাও জায়গীর হিসাবে উহা রাখিতে পারিত না; আদায় উশুলের ভারই মাত্র তাহাদের উপর ছিল, জমির মালিকানা নয়, কোনো স্বত্ব নয়। কৃষকের সঙ্গে ব্যবস্থা হইত রাজার—আধুনিক রায়তোয়ারী প্রথার মত। আকবর ফসলের এক তৃতীয়াংশ আদায় করিতেন—মুদ্রায় আদায়ও চলিত। কিন্তু স্মরণীয় এই যে, এই ভূমিব্যবস্থা যথার্থভাবে বাঙলায় তখনো প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। আসলে বাঙলাদেশের ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটান মুর্শিদ কুলি খাঁ—বাঙলার পুরাতন জমিদার বংশগুলি (নাটোর, দীঘাপাতিয়া, মুক্তাগাছা প্রভৃতি) তখনকার নবাবী আমলা ও প্রধানদের এই রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ হইতে উদ্ভূত হয়। ইহা রায়তোয়ারী ব্যবস্থা নয়, বরং অনেকটা জমিদারী ব্যবস্থার প্রথম সংস্করণ (দ্রষ্টব্য—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত ***History of Bengal***, Vol. II)।

কিন্তু তৎপূর্বেই পাশ্চাত্য দেশে বিরাট উদ্যোগ দেখা দিয়াছে। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকেরা ভারতবর্ষে আসন স্থাপন করিতেছে, ইংরেজ ফরাসির অভ্যুদয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ সামন্ত যুগের জীবনে একটা নতুন স্রোত আসিয়া লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই। প্রথমত, ভারতবর্ষের বাণিজ্য এইবার সত্য সত্যই সিংহল, মালয়, লংকা ও ইরানের উপকূল ছাড়াইয়া বিশাল পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—শোড়া, সুতা, বিশেষত বস্ত্রশিল্পের প্রকাণ্ড চাহিদা এই প্রথম দেশের উৎপাদক শ্রেণীর চক্ষুগোচর হইবার কথা। এতদিন পর্যন্ত শত সত্বেও উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় প্রয়োজন মিটানো, বড় জোর সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহ, বাদশা-বেগমের জন্য বিলাসোপকরণ তৈয়ারী করা (ফিরোজ শাহ হাজার কুড়ি ক্রীতদাস কিনিয়া নানা শিল্পকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন প্রধানত হয়ত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মিটাইতে)। কিন্তু এই বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য-প্রসারে পণ্যউৎপাদন—'বাজারের জন্য' উৎপাদনও—আরম্ভ হয়, (বেশি হইত দাদনে)। ইহাদের কুঠিতে ফ্যাক্টরির অনুরূপে উৎপাদন পদ্ধতিও গৃহীত হয়। মজুর খাটাইয়া কারখানা চলিত, তাহার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়ত, প্রতি বৎসর বহুলক্ষ টাকার সোনা ও রূপা বিদেশ হইতে এই পণ্য ক্রয়ের জন্য ভারতবর্ষে আসে,—তাহার একটা বৃহৎ অংশই হয়ত অলংকারে পরিণত হইত। কিন্তু মুদ্রা-চালিত বিনিময়ের (মানি ইকোনমিক) যে সূত্রপাত হয় তাহাও স্বীকার্য (দ্রষ্টব্য ***History of Bengal***, ঐ)। অর্থাৎ বিদেশের বণিকপুঁজি ক্রমেই সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে পরিবর্তনের শক্তিসঞ্চার করিতেছিল।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইহাই অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ—উহার প্রথম পর্বেও যেমন, দ্বিতীয় পর্বেও তেমনি সামন্ততন্ত্র প্রবল ছিল। ভারতীয় জীবনযাত্রায় সামন্ততন্ত্রের ভিতরকার অসামঞ্জস্য ইংরেজ অভ্যুদয়ের পূর্বে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে নাই। জীবনযাত্রার বাস্তব ভিত্তি তখনো সুদৃঢ় ও বিস্তৃত; ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ জীবিকা-পদ্ধতিতে তখনো উহার প্রসারের ক্ষেত্র রহিয়াছে। যেমন করিয়া শক, হূন প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব জাতিরা বাহির হইতে আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া প্রায় সেই মধ্য এশিয়ার ঊষর প্রান্তর হইতেই তাহাদের বংশধরগণ তুর্ক, পাঠান, মুঘল এবারও আসিল, আর ভারতবর্ষে তাহারাও স্থান করিয়া লইল। অষ্টাদশ শতকে তাহার ভাঙন দেখা যায়।

ভারতবর্ষের দিক হইতে দেখিলে পরাজয়টা নতুন নয়, শুধু তাহার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতারও ফল নয়, তাহার জীবিকাবলম্বনের ত্রুটি মাত্র নয়। তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে কৃষির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবিকা-উপায় মানুষের জানা ছিল না—ক্রুসুস্, টায়ার, সিডোন প্রভৃতির বাণিজ্যপুষ্ট প্রাচীন সভ্যতাকে অবহেলা না করিয়াও ইহা বলা যায়। সেই কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের জীবনে তখনো প্রসারের ক্ষেত্র ছিল—তাহারও দেশবিদেশে বাণিজ্য বাড়িতেছিল; ভরকুচ্ছ, তাম্রলিপ্ত ও চোলমণ্ডলের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি উহারই পরিপোষকরূপে বিকাশলাভ করিয়াছিল; আর লোকসংখ্যা বাড়িলে নতুন জাতির আবির্ভাবেও সেই জীবনযাত্রায় স্থানাভাব হইত না। বরং ভারতবর্ষের এই সুজলতা ও সুফলতাই ছিল বাহিরের জাতিদের ভারত-আগমনের ও ভারত-আক্রমণের প্রধান কারণ।

এই আক্রমণের হেতু হয়ত আরও আছে। মধ্য এশিয়ার বা দূর দূরান্তরের এই জাতিগুলি প্রায়ই ছিল যাযাবর—যাযাবরের হাতে গৃহস্থ-সভ্যতা অনেক সময়ে মার খায় ও মারা পড়ে, ইহা নূতন কথা নয়। কিন্তু এই যাযাবরের দলও যে কারণে নিজেদের পরিচিত ভূভাগ ছাড়িয়া দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে সেই কারণ অনেক সময়ে বংশবৃদ্ধি; অনেক সময়ে মধ্য এশিয়ার ঐরূপ অন্যান্য দেশের এক-একবার সাময়িকভাবে ভৌগোলিক পরিবর্তন। এক-একবার নদী মরিয়া যায়, মরুভূমির তলে গ্রাম নগর চাপা পড়ে, আর পশুচারণের তৃণভূমি শুকাইয়া উঠে। অমনি যাযাবরদল সেই ভূভাগ পরিত্যাগ করে, নিকটবর্তী ভূভাগে চড়াও হয়। এমনি করিয়াই শুরু হয় তাহাদের অভিযান,—যেমন ভারতবর্ষে শুধু নয়, ইউরোপ-এশিয়ায় আর্যদের সময় হইতেই তাহা হইয়াছে। শক-হূণ-তুর্ক তাতারের আক্রমণে ভারতবর্ষের মতো পূর্ব-ইউরোপও বারবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে মুসলমান বিজেতাদের আবির্ভাব সেই বৃহত্তর ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ, তাহা মনে রাখা দরকার।[১] উহার পিছনকার ঐতিহাসিক তাগিদটা ভারতের নয়, ভারতের অভ্যন্তরে উৎপাদন-প্রথার সংকটে বা কোনোরূপ অর্থনৈতিক অচল অবস্থার জন্য তাহা জন্মে নাই। জন্মিয়াছিল বরাবরকার মত ভারতের বাহিরে সেই মধ্য এশিয়ায় আর্থিক কারণে, রাষ্ট্রীয় কারণে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মগত কারণেও।

তখনকার তুর্ক বিজেতাদের আবির্ভাবে এই এক নূতনত্ব ছিল—সে নূতনত্ব এই যে তাহাদের এই অভিযানের সঙ্গে মিশিয়াছিল তাহাদের নতুন গৃহীত ধর্মের প্রেরণা। মুসলমান ধর্ম অন্যান্য সেমিটিক ধর্মের মতোই স্বমতসর্বস্ব এবং পরমতে অবিশ্বাসী। সেমিটিক জাতিদের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা ভিন্ন মতের জাতি ও রাজাদের হাতে কম উৎপীড়ন সহ্য করে নাই। সেমিটিক গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত মুসলমান ধর্মের প্রেরণাও তাই উগ্র। সেই প্রেরণা যে কত প্রবল তাহা এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শতখানেক বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ আরব, পারস্য, সিরিয়া, আর্মেনিয়া জয় করিয়া মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়া স্পেন পর্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিল। পূর্বে অক্ষুনদীর পরপারে বর্তমান তুর্কীস্থান জয় করিয়া উহা চীনের সীমান্তে আসিয়া ঠেকিল, সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুদেশে পদার্পণ করিল। মরুভূমির এই ঝড়ের সম্মুখে পূর্বের গৌরব মিশর ঈরান মহম্মদের মৃত্যুর পরে পঁচিশ বৎসরও টিকিয়া রহিল না। এই বিপুল প্রেরণা অবশ্য ইতিহাসে আরব জাতির অভ্যুদয়রূপেও পরিচিত। তাহার সামাজিক ঐতিহাসিক কারণসমূহ সেই সময়কার সেই ভূখণ্ডের জীবনযাত্রার দিক হইতেও পর্যালোচনা করা চলে। তারপর পূর্ব পশ্চিমের বিবিধ সংস্কৃতির সার্থবাহ হিসাবে, বণিক হিসাবে, আরব জাতি সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনায় ইতিহাসের পথকে আলোকিত করিয়া রাখিল,—তাহারও বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কিন্তু যাহাদের সম্মুখে পৃথিবী দাঁড়াইতে পারে নাই, তাহারাও সেদিন ভারতবর্ষে সিন্ধুদেশের পরে আর অনেককাল অগ্রসর হইতে পারিল না। মুসলমান ধর্মের আঘাতে একশত বৎসরে মিশর স্পেন পর্যন্ত ভাঙিয়া পড়িল—অথচ পাঁচশত বৎসরেও ভারতবর্ষে (প্রায় ১৩শ শতাব্দীর পূর্বে) তাহা প্রবেশ পথ পায় নাই। যাঁহারা মনে করেন ভারতীয় হিন্দুদের অধঃপতনে মুসলমানেরা এদেশে বিজয়ী হন তাঁহাদের এই কথাটি স্মরণীয়: ইস্‌লাম ঈরান তুরানে প্রবেশ করিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ জাতিদের উহা স্বধর্ম হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা ভারতবর্ষ বিজয়ের পথ পায় নাই। সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিয়াও সেখানেই ঠেকিয়া গিয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় যখন সুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম ও য়ুনানী খ্রীষ্টধর্ম নিশ্চিহ্ন করিয়া তুর্ক, তাতার, মুঘল জাতিদের উহা নিজ পক্ষে টানিয়া লইল, তখন ভারতবর্ষেও ইস্‌লামের প্রবেশ ঠেকানো দুঃসাধ্য হইল। কারণ, এই মধ্য এশিয়ার জাতিরা বরাবরই ভারতবর্ষের দুয়ার ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের প্রতিরোধ করা যায় নাই। প্রবেশের পরে বারবার তাহার জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির মধ্যে অনায়াসে তাহাদের স্থান হইয়া গিয়াছে। স্থান এবারও হইল, কিন্তু এবার তাহারা মিলাইয়া গেল না। কারণ, এবার তাহারা এক নতুন গর্বে গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন উগ্র গর্ব আর নাই,—তাহার নাম ধর্মপ্রাণতা বা ধর্মান্ধতা।

১। আরব জগতে বণিক ও বাণিজ্যের যে প্রাধান্য ছিল তাহা এইক্ষেত্রে কম কাজ দেয় নাই। আরব অভ্যুত্থানের বাস্তব কারণের ও বস্তুমুখিতার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দ্রষ্টব্য Cambridge Mediaeval History – Vol I.

একদিক হইতে বলিতে পারা যায় ভারতীয় জীবনধারার ও সংস্কৃতিধারার এই প্রথম পরাজয় ঘটিল। এই পরাজয় রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, ইস্‌লামের আত্ম-সচেতনতার নিকটে। ভারতবাসীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় পরাজয় নতুন নয়—সে তো বহুবার ঘটিয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের সমাজ রাষ্ট্রের মধ্যে তাহার নিজ শক্তিকে কেন্দ্রিত করিয়া তুলিত না—কৃষিসমাজের পক্ষে তাহা করা সহজও নয়। সেখানকার জীবন পল্লীগত, শক্তি সেখানে সংহত নয়, বিসর্পিত; যুদ্ধাদি প্রয়োজনে ছাড়া রাষ্ট্রে কেন্দ্রিত হইত না, কেন্দ্রিত হইলেও বেশিক্ষণ টিঁকিত না। ইহার কতকগুলি কারণ ঐতিহাসিক, কতকগুলি ভৌগোলিক। যেমন, যেখানে বহুজাতি আসিয়াছে, মিশিয়াছে, বহু ভেদ রহিয়াছে, বিভাগ চলিতেছে, সেখানে বৈচিত্র্যই স্বাভাবিক, সেখানে 'ঐক্যের' শক্তি দুর্বল,। "এক জাতি, এক দেশ, এক রাষ্ট্র',—এইরূপ কথা উঠিতেই সেখানে পারে না, তাই, হিন্দু ভারতেও তাহা উঠে নাই। অবশ্য রাজারা একরাট্ হইতে চাহিয়াছেন, সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তী হইবার চেষ্টা করিয়াছেন;—আর এত বড় দেশে বারেবারেই সেই অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র গড়িবার চেষ্টা ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া যেখানে দেশ এত প্রকাণ্ড—রুশিয়াশূন্য ইউরোপের প্রায় সমতুল্য—সেখানে এই 'এক দেশ', 'এক জাতি' কথাটা শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তব হয় না। ইউরোপে 'হোলি রোমান এম্পায়ার'ও এক রাষ্ট্রে এমনি বড় এক ভূখণ্ডকে আনিতে পারে নাই,—ভারতবর্ষেও গুপ্ত বা মৌর্য-সম্রাটরাও চেষ্টা করিয়া পারেন নাই। পরে মুঘল সম্রাটদের চেষ্টাও সফল হইল না। ভারতবর্ষের সেই রাষ্ট্রীয় খণ্ডতা তখন স্বাভাবিকই ছিল; তাহার ঐক্য ছিল সামাজিক ও জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে। কিন্তু যানবাহনের বর্তমান সুযোগ তখন ছিল না; তাই বিস্তৃত দেশে এই ঐক্যবোধ গভীরতর হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা সহজ কথা—ইহাতে বিজেতার সুবিধা হইয়াছিল। আর এই বিজেতারা দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধবিদ্যায়ও সত্যই কৌশলী ছিল। কিন্তু পূর্বাপর দেখিলে, সমসাময়িক কালের পটভূমিকায় দেখিলে, ইহাকে "ভারতবর্ষের পতনের যুগ" বলা চলে না। কারণ সামরিক ও রাষ্ট্রীয় পরাজয়ে ভারত-সমাজ পরাজিত হইত না, সে সমাজ আহত হইত। দুইদিনেই সে ক্ষত শুকাইত—সমাজ নতুন রাষ্ট্রশক্তিকে অঙ্গীভূত করিয়া লইত। ক্ষতি দুই দিনেই পূরণ হইয়া যাইত; ভারতীয়দের আত্মসাৎ করিবার শক্তি ছিল।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই দিকেই পরাজয় ঘটিল এইবার। তাহার বাস্তব জীবিকা-প্রণালী ও সামাজিক জীবনধারা পূর্বে যথেষ্ট নমনীয় ছিল, উদার প্রশস্ত ছিল। মুসলমানগণ নতুন জীবিকা-উপকরণ দাবী করিল না—কিন্তু তাহারা এক উগ্র মানসিক ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় শক্তি লইয়া উহার উপরে বিরাজ করিতে লাগিল। এবার আর বিজেতারা ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলাইয়া গেল না। ভারতীয় সমাজই ক্রমশঃ আপনাকে গুটাইয়া লইল।

ইস্‌লামের স্বাতন্ত্র্য

ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান বিজেতাদের আত্মসাৎ করিতে পারিল না; তাহার কারণ মুসলমান ধর্ম সেই প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ 'তত্ত্বের' বেশি পরোয়া করে না, কোনো বিচার বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা সহ্য করে না! ইস্‌লাম সেমেটিক্ গোষ্ঠীর ধর্ম,—তাহার হিসাবপত্রও সেই গোষ্ঠীর মতোই একেবারে পরিষ্কার। হিন্দুধর্ম বলিতে পারে—'একমেবাদ্বিতীয়ং', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; আর ইহার পরে ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু দ্বিতীয় কেন—গাছ, পাথর, পশু, মানুষ যে কোন জিনিসকেই দৈবশক্তির আধার বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুদের বাধে না। ইস্‌লামে এইরূপ তত্ত্বকথার ও গোঁজামিলের স্থান নাই। কোনো তর্কেই ইস্‌লাম মূর্তি-উপাসনা সহ্য করিবে না। অথচ হিন্দুর জীবনে অনেকখানি জুড়িয়াই সেই মূর্তি, বিগ্রহ, মন্দির। তাহা ছাড়া, ইস্‌লামে এমন পুরোহিত-তন্ত্রের ও জাতিভেদের স্থানও নাই। কিন্তু হিন্দু মুখে বলিবে 'তত্ত্বমসি' এবং কার্যক্ষেত্রে সবলকেই অধিকারভেদে পৃথক কোঠায় চিরকালের মতো পুরিয়া রাখিবে। তাই এই দুই ধর্মাবলম্বীদের

সম্মেলন পূর্বাপরই দুর্ঘট রহিয়াছে। সেই দুর্ঘটত্ব আরও দুস্তর হইয়া রহিল আনুষঙ্গিক কারণে। প্রত্যেক ধর্মেরই জন্ম হয় অনেকাংশে পারিপার্শ্বিকের তাগিদে; অন্তত সেই পরিবেশের ছাপ তাহার নিজস্ব হইয়া যায়। স্থান ও কাল পরিবর্তিত হইলেও সেইগুলি সে সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারে না। হিন্দুধর্মের পরিবেশ ভারতবর্ষ। তাই এই ধর্মকে সত্যই "ভারতধর্ম"ও বলা চলে—এই দেশের নদ-নদী, গিরি-পর্বত আহার্য পানীয় এবং ইহার ইতিহাসের উপলব্ধিই হইল সেই হিন্দুধর্মের দেহ ও প্রাণ। ইস্‌লাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম হইবার স্পর্ধা রাখে। তবু ইস্‌লামের জন্ম আরবে; সে যুগের, সে দেশের ছাপ সে অস্বীকার করিবে কিরূপে? সেমেটিক প্রতিবেশীদের প্রভাবও সে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশের ছাপ, সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপ সে গ্রহণ করে না। কতকটা এই কারণে মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভারতে থাকিয়াও 'ইণ্ডিয়ান ফার্স্ট' হইতে পারিলেন না—ভারতের বাহিরে তাঁহাদের 'পবিত্র ভূমি'। দিনে পাঁচবার তাঁহারা পশ্চিমে মুখ করিয়া নিজেদের সেই স্বপ্নের 'স্বদেশের' কথা স্মরণ করেন; মক্কা তাঁহাদের প্রাণভূমি, আরব তাঁহাদের ধর্মের জন্মভূমি, তাঁহাদের মূল উত্তরাধিকার সেখানকার আরবী সমাজের; ধর্মভাষাও তাঁহাদের আরবী; মূল ধর্মনেতৃবর্গ আরব সন্তান ফকির দরবেশ; সাহিত্য শিল্প, দার্শনিক চিন্তা পর্যন্ত প্রধানতঃ আরব, পারস্য, মিশর, সিরিয়ার—ভারতের নয়। তাই ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দীতেও ইস্‌লাম নিমজ্জিত হইয়া গেল না। প্রথম দুই এক শতাব্দীতে তাহার গায়ে ভারতের দাগও যেন পড়িল না। (বাঙলা দেশে এই দুই শতাব্দীতে কোনো শিল্প-সাহিত্যের চিহ্নও দেখা যায় না। তারপর পঞ্চদশ শতক হইতে মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতে পরাজিত হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ও সামাজিক পুনর্গঠনের চিহ্ন দেখা যায়। দ্রষ্টব্য—লেখকের 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা', ১ম খণ্ড)

জেতা ও বিজেতাদের সংযোগ

সাধারণ ভাবে ইস্‌লাম শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে প্রাচীর এইভাবে রচনা করিয়াছিল তাহাতে মধ্যযুগের এই দ্বিতীয় পর্বে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ও মিশ্রণের সুযোগ দেয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাবক্ষেত্রে চিরদিন পর্যন্ত শাসক ও শাসিত তত স্বতন্ত্রও থাকিতে পারে নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, ইসলাম কোনো জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। উহা অন্যকে জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, লোককে দীক্ষা দেয়। তাই ইস্‌লামের বিজাতীয় ও বিদেশী প্রচারকের দল ভারতের লোকগণকে বিন্দুমাত্রও অবজ্ঞা করিল না। হিন্দু সংস্কৃতি বেদ, সামন্ত, রাজসভা ছাড়াইল, শুধু ক্ষুদ্র অভিমানে 'ম্লেচ্ছকে' বর্জন করিয়া উহার কাছ হইতে বরং সম্পূর্ণ আত্মসংকোচের চর্চা করিতে লাগিল। বিজেতার সংস্কৃতিও দর্পভরে তাহাকে আঘাত করিতেছিল, তথাপি চূর্ণ করিতে পারিল না। হিন্দুর নির্বিরোধ অসহযোগিতা বা 'কমঠ-বৃত্তি' হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করিল—অন্য কোনো দেশে ইস্‌লাম রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়া সমাজে ধর্মে এমনভাবে প্রতিহত হয় নাই। এই বিরোধ কিন্তু চলিতেছিল সামন্ততন্ত্রের দুই শাসকদলের সংস্কৃতিতে—একদল শাসনদণ্ড হারাইয়া ক্ষুব্ধ; আর একদল শাসনদণ্ড লাভ করিয়া দর্পিত। কিন্তু দেশের জনসমাজ দুই সংস্কৃতির শাসকদলের নিকটেই প্রায় সমান অপাংক্তেয়—তাহাদের পল্লী-জীবনে মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই মুসলমান শাসকদের প্রভাবে বড় কোনো সমাজগত পরিবর্তনের তরঙ্গও দেখা দিল না।

ইহার কারণ আমরা জানি, সেই কৃষি-সমাজের জীবন রাষ্ট্রে কেন্দ্রিত নয়; পল্লীতে পল্লীতে সমাজের নানা সম্পর্কে তাহা বিধৃত ছিল। তাই, মোটামুটি পল্লী-জীবনযাত্রা অব্যাহত চলিল—জিজীয়ার ভারে, বিশেষ কোনো জায়গীরদারদের অত্যাচারে মাঝে মাঝে তাহা শুধু প্রপীড়িত হইত। তেমনি আবার বাঙলার মত কোনো কোনো অঞ্চলে সমাজের সেই নিম্নশ্রেণীর কাছে মুসলমান ধর্ম একটা উদ্ধারের পথ হইয়া দাঁড়াইল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়তো হিন্দুর উপর রাগ করিয়া তাহা বরণ করিলই

("শেখ শুভোদয়া" ও "নিরঞ্জনের রুষ্মা" দ্রষ্টব্য), ফিরোজ শাহ-এর মতো সম্রাটদের চেষ্টায় হিন্দুরাও অনেকে বজ্রচনুলো নিশ্চয়ই ইস্‌লাম কবুল করিয়াছিল। অবশ্য সূফী-সাধক ও ইস্‌লাম প্রচারকের দল জনগণকে একবারও অবহেলা করে নাই। তাই বলিয়া যে ভারতবর্ষের এই নতুন মুসলমানেরা খাঁটি ইস্‌লামকেই গ্রহণ করিল তাহা নয়। নামে মাত্রই তাহারা অনেকে মুসলমান হইল। কিন্তু এইভাবেই একটা সংযোগ স্বদেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে স্থাপিত হইল। যতই বিজেতা মুসলমান দিল্লী বা জৌনপুর ছাড়াইয়া অগ্রসর হইল ততই এই জনসমাজ, এই পল্লী-জীবন ও এই জনসংস্কৃতির সঙ্গে তাহাদের সংযোগ বাড়িতে লাগিল। এমন কি, উত্তর বাঙলার মত কিংবা চট্টগ্রাম আরাকানের মত সীমান্তক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান শাসকশ্রেণীর মধ্যে একতরফা বৈবাহিক সম্পর্কও চলিল—শাসক-শ্রেণী হিসাবে উভয়ই নিজেদের সমশ্রেণীর বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। আবার যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই এই যোগ ব্যাপকতর হইতে লাগিল। এবং আকবরের সমকালে পৌঁছিয়া অবশেষে মুসলমান যুগ সত্য সত্যই ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল।

যোগাযোগের ফল

এই যোগাযোগের ফলে মুসলমান শাসকসম্প্রদায় ভারত-সভ্যতায় আবার কয়েকটি নতুন জিনিস দান করিল। সাড়ে পাঁচশত বৎসরে মুসলমান যুগের মধ্যে আমরা মুঘল যুগের দানই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছি। নানা রকমের সম্পদ প্রথম হইতেই সৃষ্টি হইতেছিল। পরবর্তী সময়ে তাহাও নানা ঘটনায় আবার পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার সেই পরবর্তী রূপই হয়ত আমরা পাইয়াছি। যেমন, প্রথমত ফারসী ও দেশীয় ভাষার মিশ্রণে রেখ্‌তা বা দেশী কথার উদ্ভব হইল, ইহাই উর্দুরও আদিরূপ। হিন্দু রাজাদের রাজকার্যেও ইহার প্রাধান্য বরাবর রহিল। দ্বিতীয়ত, দুরদুরান্তের বিজেতার দল দেশীয় কথায় দেশীয় কাহিনী ও দেশীয় কাব্যগান শুনিতেন—সেখানে রেখ্‌তা কিংবা ফারসী জবান কে বুঝিবে? ইহাদের আসরে তাই দেশীয় ভাষাগুলির আদর বাড়িল। তাই সাধারণ লোকের সাহিত্য এইবার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল; ভারতবাসীর সাহিত্যসৃষ্টি আর প্রধানত 'দেবভাষায়' আবদ্ধ রহিল না। এইভাবে বাঙলা, হিন্দী প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলি এই সময়েই প্রথম পুষ্টিলাভ করিল। বাঙলায় ইহার প্রমাণ লস্কর পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁর মহাভারত লেখানো। বস্তুত হুসেনশাহের সভাতে বাঙলা কাব্যের পুষ্টি; বাঙলার আমলা মুন্সি প্রভৃতি ফারসী জানা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রলোক মধ্যবিত্তদের তাহা জন্মক্ষণ। তাহার পর আসে আকবরের পরবর্তী মুঘল যুগ, এবং চৈতন্য যুগ ও বৈষ্ণবযুগ। এদিকে পাঠান যুগেই হিন্দীতে আমরা পাই মালিক মহম্মদ জৈসীর "পদ্মাবৎ", কবীরের দোহাবলী, আর তুলসীদাসের রামচরিতমানস। মুঘল-যুগের প্রশস্ত অবকাশে এই সকল ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিকরূপে লাভ করিয়াছে। তৃতীয়ত, হিন্দু ও মুসলমান সংযোগের প্রধান বাধা যেমন ছিল ধর্ম, তেমনি ধর্মের দিক হইতেও সেই বাধা যেভাবে অপসারিত হইতেছিল তাহাও এক প্রধান উল্লেখযোগ্য জিনিস। বিজয়ীর ধর্মের স্বভাবতই প্রাধান্য থাকে। নানাভাবে ইস্‌লামও সাধারণ জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। আর ইহাও আমরা জানি যে, এই নতুন ইস্‌লামকেও জনসাধারণ স্বভাবতই তাহাদের পূর্ব পরিচিত জিনিসের আধারে ঢালিয়া সাজাইতেছিল—নিরঞ্জন হইতেছিলেন আল্লা, বৌদ্ধ দেবতারা হইতেছিলেন মুসলমান পীর, স্তূপ হইতেছিল দরগা, পুরাতন দেবলীলার কাহিনী নতুন পীরের কেচ্ছায় পরিণত হইতেছিল; এসব আমরা বুঝিয়াছি। ইহাই ছিল ভারতীয় ইস্‌লামের একটা জনগ্রাহ্যরূপ (popular form)। কিন্তু ইস্‌লামের বলিষ্ঠ ও সবল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টি আর এক নতুন রূপেও পরিগ্রহ করিল। তাহাই রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতির মধ্য দিয়া এক ভারতীয় রূপ ও বেগ লাভ করিল, এবং ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চস্তরের চিন্তার সহিত এইভাবে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া ফেলিল। মোল্লা ও ব্রাহ্মণ, দুই—এরই বিরুদ্ধে ইহা এক বিদ্রোহ। মধ্যযুগের

খ্রীষ্টান সমাজে, পারস্যে, এমন কি তুরস্কে এক অধ্যাত্ম প্রেমভক্তিবাদের বান ডাকে। হয়ত সেযুগের কৃষিসমাজ ও সেই সংঘাতক্লিষ্ট সামন্ততন্ত্রের মধ্যে মানব-প্রয়াস, মানব-মনীষা ও মানব-আবেগ বাস্তবক্ষেত্রে কোনোরূপে প্রকাশের সহজ পথ পাইতেছিল না। তাই তাহা এক অর্ধবাস্তব ও অতীন্দ্রিয় 'অধ্যাত্ম' রসে ও অধ্যাত্ম সাধনার আপনার পরিতৃপ্তি খুঁজিতেছিল। ইউরোপেও সে যুগে খ্রীষ্টান মিষ্টিকের অভাব ছিল না; ঈরানের সুফীবাদ গোঁড়া ইসলামের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করিয়া রূপে রসে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভারতবর্ষেও হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের মধ্যে তেমনি এক 'অধ্যাত্ম' সাধনা দেখা দিয়াছিল। বহু ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ঈরানের সুফীবাদ তাহাকেও পুষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতীয় সাধকদের প্রধান দুইটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য: একদিকে প্রবল অধ্যাত্ম বোধ, অন্যদিকে তেমনি প্রবল মানব-সাম্যের ধারণা। হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম ও জাতির সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ মনস্বীরা মানুষের মৌলিক একত্বের সন্ধান পাইতেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছিলেন "সেই এক"-কে, বাস্তবক্ষেত্রের এই বিভিন্নতা যাঁহার অখণ্ডতাকে স্পর্শও করিতে পারে না। ইহার লৌকিক বাহন একদিকে ছিলেন কবীর, দাদু, নানক ও চৈতন্যের অনুবর্তী সাধকগণ; অন্যদিকে সমাজ-ছাড়া-আউল বাউলের দল, ফকির দরবেশের সমাজহীন সম্প্রদায়; আর একেবারে উপরে, সুফী ও অনুরূপ মতাবলম্বী সাধক-সুধীগণ, যাঁহাদের মধ্যে সম্রাট আকবর ও হতভাগ্য রাজকুমার দারাশুকোরও নাম করিতে হয়।

ইহা ছাড়াও লৌকিক সংস্কৃতিতে মুসলমান যুগের দান কত ভাবে জমা হইতেছিল, তাহার ঠিকানা নাই। যেমন, হিন্দুর দণ্ড ও রাজকর্মচারীর শাসন বিচার সবই ধীরে ধীরে মুসলমানীরূপ গ্রহণ করিল। কৃষি-সমাজের পরিবর্তন হইল না বটে, কিন্তু তাহার সামন্ততন্ত্র জায়গীরদারীরূপে ক্রমপরিস্ফুট হইল। প্রথম দিকে অবশ্য ভূমিজমার বন্দোবস্ত, খাজনার হিসাবপত্র সবই অনেকটা পুরাতন ধারায় চলিত, কিন্তু ক্রমে তাহা চলিল মুসলমান কায়দায় ও ফারসী ভাষায়। বলাবাহুল্য—ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির রূপ এই ভূমি-ব্যবস্থাতেই স্পষ্ট হয়। তাহা বর্গগত মৌলিক কোনো পরিবর্তন সেদিকে সাধন করে নাই। অথচ জীবনযাত্রায় তাই বলিয়া কি মুসলিম সংস্কৃতির দান কম? শহরে বাজারে ও সওদাগরী দোকানপাটে মুসলিম দান বাড়িয়া উঠিল। কাগজ এদেশে তাহারাই আনয়ন করে, তাহার পর কেতাবের কদর বাড়িল। খানাপিনায় নতুন বিলাসিতা দেখা দিল; মুসলিম হকিম ও মুসাফিরেরা সমাদৃত হইল। সাড়ে পাঁচশত বৎসরের মুসলমান যুগে—মধ্যযুগের এই দ্বিতীয়ার্ধে—এইসব লৌকিক পরিবর্তন ছাড়াও ভারতীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় চেতনাও পরোক্ষভাবে জমাইতেছিল।

ঐক্য চেতনা

সংক্ষেপে মনে রাখিতে পারি:—প্রথমত, এই বাহিরের ধর্ম ও বাহিরের শাসকদলের চেষ্টায় ভারতের সঙ্গে এই সময়ে বৃহত্তর জগতের আদানপ্রদান পুনঃস্থাপিত হইল (***Mughal Administration***, J. N. Sarkar, দ্রষ্টব্য)। পূর্বযুগের মত ইহার দ্বারপথ পূর্ব উপকূলে নয়। ইহার দ্বারপথ ছিল প্রধানত উত্তর পশ্চিমে, ও পশ্চিম, এবং পশ্চিম সিন্ধুর উপকূলে। তাহা ছাড়া, এই বিজেতাদের দল অন্তত উত্তর ভারতে বিস্তৃত অংশ জুড়িয়া কতক পরিমাণে শান্তিও স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী যুগের রাষ্ট্র কেন্দ্রহীন ভারতীয় সমাজের উপর ইঁহারা স্থাপিত করেন নিজেদের এক শাসনব্যবস্থা। মুসলিম রাজ্যের উজীর, কাজী, মুন্সী প্রভৃতি আমাদের নাম ও পদবী, এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত ফারসী ভাষাই ক্রমে দেশীয় শাসনের ধারা হইয়া উঠে,—হিন্দু রাজ্যেও তাহা গৃহীত হয়। ঠিক ঐরূপে রাজপুরুষদের ও অভিজাতদের আদব-কায়দা, খেতাব-খেলাৎ, উর্দি-কুর্তা প্রভৃতিও মুসলমানদের নিকট হইতে ভারতবাসী সকলেই লাভ করিল—উহা আজও ভারতে হিন্দু মুসলমান সকলকার দরবারী পোশাক এবং কায়দা কানুন। এই দুই দিকেই ইঁহারা ভারতীয় ঐক্যের রূপকে

তাই পুষ্ট করিয়া তোলেন। আর ইঁহাদের তৃতীয় দান—যুদ্ধবিদ্যায় নতুন কৌশল ও নতুন পরিকল্পনা,—যুদ্ধবিদ্যার এই জ্ঞানের অভাবেও ভারতীয়গণ এই বিদেশীয়দের নিকট বারবার পরাজিত হইত।

এই কৃষি-সমাজে মুসলমানগণের দান ছিল প্রধানত কারু-শিল্পে ও সওদাগরী কাজের উন্নতিতে। একদিকে শাল, কিংখাব, কার্পেট, মসলিন প্রভৃতি, অন্যদিকে নানারূপ অলংকার, মিনার কাজ, বিদুরির কাজ প্রভৃতিও তখন মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনেক সময়েই মুসলমান কারু-শিল্পীর হাতে গড়িয়া উঠে। (দ্রষ্টব্য **India through the Ages,** J. N. Sarker) মধ্যযুগের কারুকলার চরম নিদর্শন হিসাবে সেযুগের পৃথিবীতে এইসব কাজের তুলনা মিলে না। ইহাতে অবশ্যই জীবনযাত্রার মৌলিক ভিত্তি পরিবর্তিত হয় নাই, কিন্তু জীবনযাত্রার উর্ধ্ব শ্রেণীতে, শাসক শ্রেণীতে, যে আহার-বিহার ও সাজ সজ্জায় একটা রুচিবিকাশ ঘটিতেছে, তাহা বুঝা যায়। তেমনিতর রুচির উন্নতি তখনকার ভেনিসের, কিংবা লণ্ডনের, কিংবা ওলন্দাজ ধনী ব্যবসায়ী ও নাগরিকদলও দাবী করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

অবশ্য এই উন্নতি অনেকাংশেই জনগণের জীবনযাত্রা বা রুচির সহিত সম্পর্ক রাখিত না। প্রথম দিককার ভাষা, শিল্পকলা, সবই ছিল ঈরানী ও তুরানী, মধ্য এশিয়ার ও অল্পাংশ আরবীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত।[১] পরবর্তীকালে ক্রমশই ভারতীয় জীবনের ও শিল্পধারার সহিত মুসলমানী জীবন-যাত্রার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আকবরের সময়েই এই ধারা প্রবল হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মধ্য-যুগের চরম সৃষ্টি ফুটিয়া উঠে নানা সৌধে, শিল্পে, চিত্রকলায়। এমন কি তানসেনের প্রেরণার ফলে সঙ্গীতে পর্যন্ত মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। বিপুল মুঘল স্থাপত্যের বিস্ময়কর ইতিহাস এখনো মুছিয়া যায় নাই, ভারতীয় সঙ্গীতের সেইধারাও লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন এই শিল্পকলা আবার দরবারেই সীমাবদ্ধ হইতে চলিল, তখন উহার সেই প্রশস্ততা ও সজীবতা নষ্ট হইয়া গেল। তখনকার মুঘলশিল্পে সূক্ষ্ম রূপবিলাস (baroque) বাড়িয়া চলিল। সেই সূক্ষ্ম নিপুণতা, অলংকরণ, রঙের ও রেখার সুচিক্কণ নমনীয়তা তবু অপরূপ রূপদান করিয়াছে মুঘল ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি (miniature) গুলিকে। আর সেই মুঘল শিল্পেরই অন্যদিকে একটা শেষ পরিণতি দেখি লক্ষ্ণৌর স্থাপত্যে ও সঙ্গীতে খেয়ালে ঠুংরিতে।

কিন্তু এইসব শিল্পনিদর্শন হইতেই একদিকে যেমন উহার সূক্ষ্মতা সুস্পষ্ট তেমনি অন্যদিকে সুস্পষ্ট এই কথা যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা হইতে ইহার রসজ্ঞ সমাজ আবার অনেক অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন, জীবনের উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁহারা আর বিচরণ করিতে পারিতেছেন না।

শ্রেণী বিরোধ

এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শোষিতের সহিত শোষক শ্রেণীর সংঘর্ষ যে বহু বহু বার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সহজবোধ্য। এই সংঘর্ষ সাধারণভাবে পূর্বাপর রূপ গ্রহণ করিয়াছে—প্রথমত কোনো হিন্দু রাজার (যেমন শিবাজী) নেতৃত্বে শোষিত (হিন্দু) সাধারণের বিদ্রোহরূপে। দ্বিতীয়ত, নিশ্চয়ই বহুক্ষেত্রে মুসলমান সামন্ত ও এই জনতার নেতৃত্ব বা মুখপাত্র হিসাবেই স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে অগ্রসর হইত। মধ্যযুগের অধিকাংশ সংঘাতই ধর্মের আবরণ গ্রহণ করিবে, তাহা আবার বলা

১. ভারতীয় মুসলমানের ধর্মজীবনে ছাড়া আরবীয় প্রভাব যাহা আসিয়াছে, প্রধানত তাহা আসিয়াছে ঈরানের মারফৎ। আরব নাবিক মালাবার উপকূলে, যবদ্বীপে, মালয়ে সর্বত্র রাজ্য ও ব্যবসা কাঁদিতেছিল। চট্টগ্রামেও কিছু কিছু আসিয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের উপকূলে—চট্টগ্রামের দিকেও—তাহাদের তেমন অধিক সংখ্যায় আগমনের বা ব্যবসাপত্র চালাইবার সঠিক প্রমাণ কতটা পাওয়া যায়? বাঙালী মুসলমানের জীবনযাত্রার যে 'আরবীয়' প্রভাব দেখা যায় তাহা ধর্মসূত্রেই প্রাপ্ত আর বিশেষ করিয়া পরবর্তী কালে প্রাপ্ত; উহা জাতিসূত্রে অর্থাৎ আরবীয়দের সঙ্গে পরিচয়ে প্রাপ্ত বলিয়া মনে হয় না।

নিষ্প্রয়োজন। মধ্যযুগের বহু সামন্ত-বিদ্রোহের শক্তি জোগাইত এক মূক জনতা—যাহারা তখনো নিজের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় নাই। বিশেষত, বণিকশক্তি তখনো মোটেই আত্মসচেতন নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রাণের আসল বিদ্রোহ রূপ লাভ করিয়াছে তখনকার অধ্যাত্ম বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে—কবীরের, নানকের, চৈতন্যের এবং শত শত মরমীয়া সাধকের সংঘ ও গোষ্ঠী গঠনে। ইঁহাদের সাধনায় ও সংঘে ব্যক্তি-মন স্বাধীনতা পাইয়াছে। সেই আওতায় দুর্বলও পৃথিবীতে এক আধটুকু স্বস্তি না পাইয়াছে তাহা নয়। সেদিনের গণকর্মীদের পক্ষে ইহার বেশি কিছু করা ছিল স্বপ্নাতীত। মুঘল রাজত্বের শেষদিকে অবশ্য মারাঠা, রাজপুত, শিখ, সৎনামী প্রভৃতি প্রধান বিদ্রোহীরা নিজেরাই রাজ-শক্তিরূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং অত্যাচারও তাহারা অপরের উপর করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু ইহাদের অভ্যুত্থানের পশ্চাতে যে সামন্ততন্ত্রেরই অভ্যন্তরে নিষ্পেষিত জনসমাজের বিদ্রোহই শক্তি জোগাইয়াছে তাহা বিস্মৃত হইবার কারণ নাই।

যুগান্ত

এই শাসকশ্রেণীর হাত হইতেও যখন রাজদণ্ড খসিয়া পড়িল জনগণ তাহাতে চমকিত হইল না; ভারতবর্ষও তাই আর একবার বিদেশীর নিকটে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই, যে বিদেশী আর রাজা নয়, একটা বণিক-সম্প্রদায়, আর রাজদণ্ড সে হস্তগত করিল তাহার বাণিজ্যের প্রয়োজনে। সমাগত ব্রিটিশ রাজত্বের এই প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল—ইহার পূর্বে ভারতবর্ষে যেসব আগন্তুক শাসকদল আসিয়াছে তাহাদের সহিত এইখানে এই নবাগতদের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে, পৃথিবীতে বণিগ্‌রাজের দিন আসিয়াছে, সামন্ত-যুগ শেষ হইয়াছে। এই সঙ্গে স্মরণীয় এই কথা। ইহার পূর্বেও মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত হইতে সম্রাট আকবর বা আওরংজীব পর্যন্ত অনেকেই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। নানা কারণে তাঁহাদের চেষ্টা বারে বারে নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটেন ভারতবর্ষে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের একটা গুণগত পার্থক্যও আছে। তাহারাও শাসন করিত, জনসমাজকে শোষণ করিত; ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীও তাহা করে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী যুগের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ছিল সামন্ততন্ত্র, এবারকার 'সাম্রাজ্যবাদ' বণিকতন্ত্রের উদ্ভব। এই কারণেই তখনকার সাম্রাজ্য 'দেশী' হইয়া উঠে, 'নেশন' গড়িবার পথেও সহায়ক হইত, এখনকার সাম্রাজ্যবাদ এদেশকে 'উপনিবেশ' মনে করে, নিজের শোষণের দায়েই 'নেশন' গড়িতে দেয় নাই, এরূপ চেষ্টা ব্যাহত করিয়াছে।

সমাগত বণিগ্‌যুগের আঘাতে ভারতের সামন্ততন্ত্র [illegible] হইয়া গেল। কিন্তু ক্ষয়ের জন্য নিজের অভ্যন্তরেই ভারতের সমাজও তখন প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল। সাম্রাজ্য যে মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর হাতে ছিল তাঁহাদের হাত তখন কাঁপিতেছে। দিল্লী হইতে সেই সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। সুবায় সুবায় ক্ষুদ্র শাসকেরা দলাদলি চক্রান্ত লইয়া নবাবী নিজামতের খেলা খেলিতেছে। মারাঠা শক্তি লুণ্ঠনে দস্যুতায় আপনার রাষ্ট্রীয় সম্ভাবনা বিনষ্ট করিতেছে।—আর জনগণ এই দস্যুদের দিনে "সিং গর্দী, শাহ গর্দী, ভাও গর্দী," বোরাগো বারে বারে ত্রস্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যে কোথায় ছিল [illegible] নবাব জগৎশেঠ উমিচাঁদের স্বার্থ ও দেশপ্রেম? কোথায় ছিল দেশীয় অভিজাত রাজা নবাব মীর প্রভৃতির নিশ্চিন্ততা? কোথায় বা ছিল এই সব উজীর ও শেঠ প্রভৃতি রাষ্ট্র-শাসকগণের সততা বা আত্মমর্যাদা বা শ্রেণীগত স্বার্থবোধ?

মুঘল রাজত্বও জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, মারাঠা রাজত্বও জনগণের দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই। উভয়েরই ভরসা ছিল এই আমীর ওমরাহ ও সুবাদার জায়গীরদারের দল, তাহাদের আদায়ী খাজনা, তাহাদের পোষিত ফৌজ। যখন দেখি, এই শাসকের দল যে কোনো উপায়ে নিজ নিজ লাভ লইয়া ব্যস্ত, যে কোনো কর্মচারী ঘুষের বশ, ফৌজের বেতন বহু বাকী, আর সকলের বিশৃঙ্খলার চাপ গিয়া পড়ে অসহায় রায়তের উপরে, নিরুপায় কারিগরের উপরে, তখন বুঝি এই রাষ্ট্রের আর কোনো আশাই নাই (***India through the Ages***, J. N. Sarker.)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ঃ অর্ধ-আধুনিক রূপ

উপনিবেশিক সংস্কৃতির যুগ ঃ বাঙলার কাল্‌চার

"বাঙলার কাল্‌চার" কি? সাহিত্যের একজন রসজ্ঞ অধ্যাপক বলিয়াছিলেন ঃ "বাঙলার কাল্‌চার? একটা কড়া পাকের সন্দেশ ও একটা ভালো পাকের পেড়া দাও দিকিনি কোনো তামিলকে; তিনি খেয়ে বল্‌লেন, 'বোথা আর ইকুয়েলি স্যুইট্‌,' দুইই সমান মিষ্টি। ঠিক কথাই,—অনেক কালের কাল্‌চার থাকলে বোঝা যায় সব মিষ্টিই এক নয়। রসজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয়ের মতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশও সায় দিবে,—বাঙলার কাল্‌চারের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিনিধি আর কিছুই নয়—রসগোল্লা ও সন্দেশ।

পৃথিবীতে মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া নাম রাখিতে পারা কম কথা নয়, ইংরেজেরা অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাখে—এমন কি দেখা যাইতেছে অধ্যাপকরাও বেহ বেহ তৃপ্ত হন। কিন্তু নানা অধ্যাপকের নানা মত। শিল্পকলার অধ্যাপক শাহিদ সুরহাবার্দি বিলাতে নাকি তাঁহার বন্ধুদের বলিয়াছিলেন ঃ "বাঙলার বৈশিষ্ট্য? পৃথিবীতে যা আর কারুর নেই—তার নাম আড্ডা।"—মনে হয় এমন সত্য কথা আর কখনো বলা হয় নাই। ক্লাব, পার্টি, সভা সমিতি, ব্যবসাপত্র—সবই আমাদের ঢিলে ঢালা—আড্ডা না হইলে চলে না। কিন্তু জানি, অধ্যাপকরাও একমত নহেন। নাম করিতে সাহস করি না, আর একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন ঃ "বাঙলার বাইরে 'ভদ্রলোক' নেই—অ্যারিস্টোক্র্যাসি আছে, আর আছে 'কিসান'; কিন্তু এমন 'ভদ্রলোকের সমাজ' দেখেছ মেড়ো পাঞ্জাবীর দেশে?"

তিনি একবারে মুঘল যুগের পূর্ব হইতে প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হইবেন; দেখাইবেন,—'সদ' বৌদ্ধ-করণ-কায়স্থ-ঠক্কুর' মহাশয়েরা কেমন করিয়া মানসিংহ, তোডরমল, মুর্শিদ কুলি খাঁ প্রভৃতিদের যুদ্ধে হিম-সিম খাওয়াইয়াছেন, জমাবন্দির হিসাবপত্রে সকলকে সর্ষে ফুল দেখাইয়াছেন, অবশেষে ক্লাইভ হেস্টিংস্‌-এর দিনে রাজ্যে-বাণিজ্যেও আপনাদের আসন পাকা করিয়া লইয়াছেন।

এই দাবিতে অবশ্য ইতিহাস কতটা সায় দিবে তাহা জানি না। তবে আমরা সবাই স্বীকার করিতাম যে,—ইংরেজ আমলে বাঙলা দেশের বাহিরে 'ভদ্রলোক' নাই। তখনকার 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বারে বারে, অবাঙালীদের না পারিলেও, আমাদের মনে করাইয়া দিত—আমরাই অবাঙালীর দেশে শিক্ষার মশাল জ্বালিয়াছি, আর আমাদের সাহিত্য আছে।

এই সত্যটা কিন্তু কাহারও উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। দেশী অধ্যাপকেরা যা'ন, একজন ইংরেজ অধ্যাপকও বলিয়াছেন ঃ "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ইংরেজী ছাড়া আর একটিমাত্র ভাষায় এপর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে, সে ভাষা বাঙলা।" সাম্রাজ্যের নতুন সংস্করণ কমনওয়েল্‌থ্‌ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। উপনিবেশের পরিবেশেও বাঙলা সাহিত্য বিকশিত হইতে পারিয়াছে।

ভাষা ও সাহিত্য অবশ্যই মানস সংস্কৃতির প্রধান বাহন। কিন্তু সাহিত্য কাল্‌চারের এক বা অদ্বিতীয় মানদন্ড নয়। এবং সকল জাতির মানস-সম্পদের প্রকাশও সাহিত্যে হয় না। কাহারও বা সে জীবন রূপ লাভ করে কাব্যে-সাহিত্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে-গানে, কাহারও শিল্পেচারু-কলায়, আবার কাহারও বা অপূর্ব কারু-নৈপুণ্যে। মোটামুটি ভাবে তবু কথাটা গ্রহণ করা যায় যে, যে জাতির সত্যই একটা সাহিত্য আছে তাহার কাল্‌চার অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অথবা ভারতবর্ষে স্বাধীন বাঙালীর যদি এই দাবি থাকে, তবে সেই দাবি সে তুলিবে না কেন?

একটা তর্ক উঠিতে পারে—'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে'র কথাটা আর না পাড়িলেই বা ক্ষতি কি? আর সেই সাম্রাজ্যের মধ্যে কি বাঙলা ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হইয়াছে? অন্য ভাষায় হয় নাই? হিন্দীর

সাহিত্য সংসার সুবিশাল ; উর্দুর জগৎ সুমার্জিত ও সুসংস্কৃত ; মারাঠীর সাহিত্য সুদৃঢ় ও সবল ; গুজরাতীর সাহিত্যও সচেতন। ইহাদের প্রত্যেকেরই পিছনে পাঁচশত হইতে হাজার বৎসরের ইতিহাস। শুধু বাঙলার কথা বলিয়া লাভ কি ?

কিন্তু যে হিসেবে কথাটা বলা হইয়াছে সে হিসাবে তাহা মিথ্যা নয়। সত্যই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সহিত ঐ সব সাহিত্যের তুলনা হয় না। এই হিসাবে ছাড়াও আধুনিক কালের ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বাঙলার সাহিত্যকে মোটের উপর মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সেই মানদণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপটিও নিরূপণ করা চলে। তাহাতে দেখিতে পাই—ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির কি রূপান্তর ঘটিল ; সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে অর্ধ-সামন্তের যুগে—পরাধীন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে—ভারতীয় সংস্কৃতি কোন্ পরিণতি লাভ করিয়াছে ; বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দুনিয়াব্যাপী গণ বিপ্লবের পরিবেশে ঔপনিবেশিক কালচারের গতি কোন্ মুখে ? তাহার পরে বুঝিব স্বাধীনতার যুগের বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতির হিসাব।

ঔপনিবেশিক ভারতীয় জীবনের হিসাবেই বাঙলার কালচার একবার বুঝিয়া দেখিবার মতো—সন্দেশ রসগোল্লা হইতে একেবারে কলিকাতার চায়ের দোকানের 'ডবল ডিমের মামলেট' পর্যন্ত সব কিছুই এই কালচারের পরিচয় দিত, এখনো দেয়। কারণ, বাঙলায় শুধু সেই ঔপনিবেশিক যুগে সাহিত্যই জন্মে নাই, আরও অন্যান্য জিনিসেরও উদ্ভব হইয়াছে। আর তাহার অনেক উত্তরাধিকার স্বাধীনতার যুগেও গৌরবের। কারণ তাহা শুধু ঔপনিবেশিক নয়, আধুনিকতার তপস্যাও।

যেমন দেখি—সেই যুগেও বাঙালী একটা নতুন চিত্রকলা আবিষ্কার করিয়াছে, নতুন নৃত্যকলার উদ্বোধন করিয়াছে, এক নতুন সঙ্গীত শৈলী রচনা করিয়াছে। বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, প্রত্নতত্ত্বে তাহার তীক্ষ্ন বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাঙলার সে নবজাগরণ রূপ লাভ করিয়াছে ধর্মান্দোলনে, সমাজসংস্কারে ; আর শেষে বাঙালীর সেই আবেগময় প্রেরণা জন্ম দিয়াছে প্রবলতম বিপ্লবী প্রয়াসকে। ঔপনিবেশিক কালচারের সর্বাপেক্ষা মহৎ সৃষ্টি মানসক্ষেত্রে—সাহিত্য ; কর্মক্ষেত্রে—রাজনীতিতে বিপ্লবী আন্দোলন। জীবনে এত ঐশ্বর্য আর ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতি সেই পর্বে দাবি করিতে পারে না। তাহার মধ্যেও যে আধুনিকতার তপস্যা চলিতেছে, তাহাও তাই সত্য। আর যাহা বাঙলার ক্ষেত্রে প্রকট, ভারতের অন্যত্রও তাহারই ছিল প্রবর্তনা, আরও একটু প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট।

"ভারতীয় সংস্কৃতির ঔপনিবেশিক রূপ" দেখিতে পাওয়া যায় তখনকার বাঙলার সংস্কৃতিতে। ঔপনিবেশিক অসঙ্গতির জন্যই আমরা ইহাকে একটু পরিহাসের দৃষ্টিতে দেখিয়া নাম দিয়াছি 'বাঙলার কালচার'।

বাঙলার সংস্কৃতি ঃ পূর্বকথা

বাঙলার এই 'কালচার' অবশ্য আধুনিক কালের জিনিস—এত অভিনব যে ইহাকে "বাঙলার সংস্কৃতি" বলিতে যেন বাধে। "বাঙলার কৃষ্টি" বলিয়াও ইহার অনুবাদ করিতে পারি না। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির যে ধারা বাঙলা দেশেও বহিয়া আসিতেছিল—এখনও মৃতপ্রায় বহিতেছে, একেবারে থামিয়া যায় নাই—বাঙলার কালচার যেন এই আধুনিক কালে (ইংরেজ আমলে) তাহার সহিত যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, আর তাহা খুঁজিয়াও পায় না। অন্যদিকে 'কৃষ্টি' বলিতে আমরা যদি উহার মূলগত কৃষ্ধাতু ও কৃষির উপর জোর দিই, তাহা হইলে বলিতে পারি—'বাঙলার কালচার' কৃষি বা কৃষকের সহিত সম্পর্ক প্রায় রাখে না—ইহা বাবুদের জিনিস, "বাবু কালচার"। এই জন্যই আমরা 'বাঙলার কালচার' বলিলেই বুঝাই ভদ্রলোকের জিনিস ; এই কথা মনে মনে বুঝি বলিয়াই বলি, অন্য প্রদেশে 'ভদ্রলোক' নাই।

"বাঙলার কালচার" নতুন জিনিস, "বাঙলার সংস্কৃতি" কিন্তু বহুদিনের। আমাদের যে সাহিত্য, সঙ্গীত, যে নৃত্যকলা ও শিল্পকলা লইয়া আমাদের এই ঔপনিবেশিক যুগের গর্ব—এমন কি

যে "ভদ্রলোক" শ্রেণী লইয়া আমাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক সমস্যা—তাহার জন্ম বেশি দিন হয় নাই। সে জন্মিয়াছে ইংরেজের বাঙলা জয়ের পর, সাম্রাজ্যবাদের আওতায়, প্রায় ইংরেজের তৈয়ারি কলিকাতা শহরে। কিন্তু "বাঙলার সংস্কৃতি"—বাঙলার মাটি, বাঙলার জল ও বাঙলার জনজীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল হাজার বৎসর হইতে, ভারতীয় সংস্কৃতির কোলে (দ্রষ্টব্য ***History of Bengal***, Vol I, Dacca University)।

প্রায় হাজার বৎসর আগে "পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল।" তাহার পূর্বেকার ও পরেকার মধ্যযুগের কাহিনী আমাদের জানাই আছে—কিন্তু তাহা ভারতীয় ইতিহাসের বড় জোর একটি গর্ভাংক মাত্র। সপ্তম শতাব্দী হইতে ভারতীয় শিষ্ট-সংস্কৃতির সহিত সমসাময়িক বাঙলা শিষ্ট সংস্কৃতির যোগাযোগ দেখা যায় (দ্রঃ ***Early Culture of Bengal***)। তারপর পাল যুগে বাঙালী নিজের একটা বিশিষ্ট স্থান সেই সংস্কৃতির ইতিহাসে করিয়া ফেলিয়াছিল। তখন সংস্কৃতে তাহার "গৌড়ী রীতি" গৃহীত হইল; তাহার ধীমন ও বীতপাল নতুন মূর্তি-শিল্পের প্রচলন করিল; বৌদ্ধগুরুদের হাতে মহাযান নতুন রূপে পাইল এবং সিদ্ধাচার্যরা দেশীয় ভাষায় গান রচনা করিয়া গেলেন (চর্যাপদ)। এইরূপে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙলা ভাষার জন্ম হইল। সঙ্গে সঙ্গে জন্মিল বাঙালী জাতি। তারপর মধ্যযুগে তুর্কীবিজয় ও মুসলমান আধিপত্যের দিনে বাঙলার সংস্কৃতি ক্রমেই বাঙলা ভাষার ভিত্তিতে আপনার রূপ আবিষ্কার করিতে লাগিল। বাঙলার সংস্কৃতির সেই মধ্যরূপেও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অনুচ্ছেদমাত্র—তখন-ও কৃষি সমাজের সুদীর্ঘ মধ্যাহ্ন। তাই বাঙলায়ও তখন দেখা যায় তেমনি সুযোগ ও সমন্বয়—সেই আউলিয়া, বাউল, সুফী, দরবেশ ও নানা সম্প্রদায়ের সহজিয়া দল, সেই মুসলমান শাসক, ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ধর্মপ্রচার, বৈষ্ণব মহাজনদের চেষ্টায় বাঙলা সাহিত্যের বিকাশ, আর তেমনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের আত্মরক্ষার দায়ে লৌকিক রচনা। বৈষ্ণব প্রেরণায় সেই সংস্কৃতিতে ষোড়শ-শতাব্দীতে একটা প্রবল স্রোত বাহিয়া যায়—বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবনযাত্রা একটা নিজস্বতা লাভ করে।

গৌড় ও নবদ্বীপে শিষ্ট চর্চার কেন্দ্র থাকিলেও বাঙলার সংস্কৃতির প্রধানত কেন্দ্র ছিল পল্লী। "বাঙলার সংস্কৃতি মুখ্যত গ্রামজীবনকে অবলম্বন করিয়াই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল"। প্রাচীন ভারতে নগর ও নাগরিক রীতি ও জীবনযাত্রার উল্লেখ কম পাই না—বিশেষত বাৎস্যায়নে বা মৃচ্ছকটিকাদির মত সাহিত্যে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ যে মুখ্যত ছিল পল্লীসমাজ, এই কথা সত্য। বাঙালী সমাজের সম্বন্ধে এই কথা আরও অধিকতর স —এই দেশে নগর বা রাজধানী বলিয়া যাহা সচরাচর উল্লেখিত হইয়াছে আসলে তাহা গ্রামেরই চিহ্নিত (হয়ত বা কল্পিত) সংস্করণ। ভারতীয় প্রধান প্রধান জীবন-কেন্দ্র হইতে দূর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বলিয়া এই গ্রাম্যসভ্যতা নিজ নিজ গ্রামের মধ্যে আরও বেশি নিজের ধারায় নিজের নিয়মে নিজ নিজ বিচিত্র ও বহুবিস্তৃত আচার-বিচার চিন্তা ধারণা লইয়া চলিতে পারিয়াছে—তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য "মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হিন্দুযুগের অবসানের পরে বাঙালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডী প্রথমে কাটাইয়া নিখিল ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড় সুযোগ পাইল।" কিন্তু তখনো একদিকে ঢাকা মুর্শিদাবাদের মুসলমান দরবার, অন্য দিকে বিষ্ণুপুরের রাজসভা—ইহার বাহিরে মধ্যযুগের সেই মার্জিত সংস্কৃতির অনুশীলনের নিদর্শনই বা বেশি আমরা পাই কোথাও? (দ্রষ্টব্য ***History of Bengal***, Vol II, Dacca University)।

প্রায় এক হাজার বৎসর হইল বাঙলা ভাষা জন্মগ্রহণ করিয়াছে—অল্পাধিক ঐরূপ সময়েই ভারতীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান ভাষাও জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। তাই ভারতীয় এই সব জাতিদের সংস্কৃতির (হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতির) নিজস্ব জীবনও প্রায় হাজার বৎসরের, তাহার পূর্বে তাহারাও ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির জঠরে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া। কাজেই জন্মিল যখন তখন বাঙালী সংস্কৃতি, মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি জন্মিল এতদিনকার (প্রাক্-মুসলীম) ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লইয়া। বাঙালী সংস্কৃতি উহার মগধ-মণ্ডলের রূপ ও ঐতিহ্যের বিশেষভাবে অংশীদার হয়। তাহার সঙ্গে অন্য বড় অংশীদার অবশ্য ছিল মৈথিল,

আর প্রায় সেই সময়েই (খ্রীঃ ১০০০,—১২০০ শতকের) পৃথক হইয়া অহংশীদার হইয়া উঠিল ওড়িয়া, এবং একটু পরেই (চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই) অসমীয়া প্রভৃতি বাঙলা ভাষার নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির আদিযুগে (আনুমানিক খ্রীঃ ১,০০০ ১,২০০ শতক) ও মধ্যযুগে (সাধারণ ভাবে মুসলমান আমলে) মোটামুটি এই সংস্কৃতির যে ভিত্তি ও যে গঠন ছিল , প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা সূত্রেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি— শুধু পূর্বপ্রত্যন্তবাসী বলিয়া বাঙলার অধিবাসীরা ছিল উত্তর ভারতের বা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র হইতে আরও বিচ্ছিন্ন, ঐ সব সংস্কৃতি দ্বারা ক্রমপ্রভাবিত, এবং ঐ সব উন্নাসিক শাসক ও শাস্ত্রকারদের চক্ষে (বেদ ও আরণ্যকের যুগ হইতেই) একটু অবজ্ঞাত , আচার বিচারে শিথিল, ধ্যান-ধারণায় 'পাষণ্ডী' (heretic) , ভাষার সৃষ্টিতেও হয়ত অনির্ধারিত, রাষ্ট্র সংগঠনেও কেন্দ্রানুগ নয়,—বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ, গৌড, বরেন্দ্র প্রভৃতি বিবিধ অঞ্চলে অঞ্চলে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। আবার উহারই মধ্যে আদিম বা অতি প্রাচীন ঔপজাতিক (tribal) যৌন বন্ধন ও রাষ্ট্র বন্ধনের অথবা ভারতীয় সমাজের বর্ণভেদ, জাতিভেদ, শ্রেণীভেদের মধ্যে এই বাঙালী একেবারে তলাইয়া যায় নাই। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের সমাজ এখানে চাপিয়া বসিয়াছে। ক্ষত্রিয়েরা (যেমন কর্ণাটাগত সেনেরা) উহার মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। কৈবর্ত, বাগদী, ডোম, ও ব্যাধ, নিষাদ জাতিরা বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তথাপি তুচ্ছ নয়। বাঙলার কালচারকে বুঝিবার জন্য তাই বাঙলারও আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতির কয়েকটি প্রধান বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত, মোটামুটি উৎপাদন শক্তির ও উৎপাদন পদ্ধতির কোনো বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই ; তাই উৎপাদন-সম্পর্কেরও পরিবর্তন প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ সমাজ বিপ্লব ঘটে নাই , ঘটিয়াছে রাজা রাজ্যের পতন অভ্যুত্থান, শাসক শ্রেণীর কোনো এক বংশের পতন ও তাহার পরিবর্তে অন্য এক বংশের উত্থান। সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া এখানে তাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে অব্যাহত রহিয়াছে "ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারা"—উহার প্রাচীন হিন্দু পর্বেই মুসলমান আমলে আরও সুদৃঢ় হয়। আকবরের পরে (জাহাঙ্গীরের সময়ে) সেই জায়গিরদারী প্রথা বিলোপের চেষ্টা হয়, তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে। অন্যদিকে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যবিস্তারে ক্রমে দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও মুদ্রামূলক বিনিময়ের (money economy) প্রসার ঘটিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বণিগ্‌যুগের প্রথম সূচনা হয়। সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পিছনে ছিল একদিকে তাহার সামন্ত, অন্যদিকে বণিক ব্যাঙ্কারদের (ক্লাইভ, উমিচাঁদ জগৎশেঠ) চক্রান্ত।

দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকাল এখানে যে সামন্ততন্ত্র চলে তাহার রূপ কি? ভারতের অন্য প্রদেশের অপেক্ষাও বাঙলাতে অধিক ছিল বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবন, তাহার স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক জীবন, সেই ভারতীয় কৃষিপ্রধান সমাজ , গ্রামের কারিগর, বৃত্তিধারীদের গ্রামের শস্যে জীবনযাপন , গ্রামের তন্তুবায়, কুম্ভকার, রজক, নাপিতের কাজে গ্রামের অভাব পূরণ , কৃষি সমাজে ভূমির অধিকার ও উহার তারতম্য দিয়া সামন্তকালীন পদমর্যাদা (status) নির্ণয়,—ভূমিহীন কারিগর, ক্ষেতমজুর প্রভৃতির শূদ্র অনাচরণীয় জাতিতে (caste) পরিণতি , দখলী স্বত্ববান কৃষকদের 'আচরণীয়' (তুলনীয় হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত , ধোবা ও চাষা ধোবা) নবশাখ জাতিতে স্থানলাভ , উচ্চবর্ণের জাতিদের সামন্ত ভৌমিকত্ব ভোগ , আর ভূমির সর্ব স্বামিত্বে রাজার একচেটিয়া অধিকার। মূলত ইহার পরিবর্তন ঘটে নাই ; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে জাগিয়াছে বিরোধ তাই বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে।

তৃতীয়ত এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে শ্রেণী বিপ্লব না ঘটিলেও শ্রেণীসংঘাত ছিল, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ পরিবর্তিত হইয়াছে আপোসের মধ্য দিয়া সংস্কারের মধ্য দিয়া। সেই শ্রেণী-বিরোধের প্রমাণ রহিয়াছে কোথাও অর্ধপ্রকাশিত, কোথাও প্রচ্ছন্ন। প্রধানত সেই শ্রেণীবিরোধ (ক) মধ্যযুগের সাধারণ নিয়মে রূপ লইত ধর্ম বা সম্প্রদায়গত প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা বিরোধের আড়ালে ধর্ম আন্দোলন রূপে। (বৌদ্ধ ও হিন্দু, কিংবা বৈষ্ণব ও শাক্ত, মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতির বিরোধ মিলনের মধ্যে এই মূলসূত্র লক্ষ্য করা যায়)। (খ) ধর্মমত ও দেবদেবীর পূজা লইয়া এই শ্রেণীবিরোধ অত্যন্ত

প্রচ্ছন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত, যেমন, ধর্মমতের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীর পৌরাণিক অবতারবাদ (রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি) ও সাধারণ শ্রেণীর লৌকিক গুরুবাদ ('নাথ গুরু'দের হইতে একেবারে আউল-বাউলের ও কর্তাভজাদের গুরুবাদ পর্যন্ত) ; এবং মুক্তির আদর্শেও নির্বাণ, লৌকিক মহাসুখবাদ এবং বৈদিক যজ্ঞ ও সংস্কারকর্ম এবং লৌকিক পূজা ও তন্ত্র (বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, শৈব, সহজিয়া ও শাক্ততন্ত্র পর্যন্ত) ইহার মধ্যে রহিয়াছে মতাদর্শের বিরোধ। এই বিরোধের মধ্যখানে একটা আপোষপথ বৈষ্ণব অবতারবাদ ও গুরুবাদ এবং বৈষ্ণব সদাচার, দয়িত সম্পর্ক, পরকীয়া তত্ত্ব ও সাধনা নির্মাণ করে। আবার অন্যদিকে দেবদেবীর ব্যাপারে সাধারণ লোক পৌরাণিক দেবদেবীদের গ্রহণ করিলেও তাহা গ্রহণ করিল নিজেদের শ্রেণীজীবন ও ধারণা অনুযায়ী (প্রতিতুল ভগবতের শ্রীকৃষ্ণ ও ধামালির শ্রীকৃষ্ণ ; পৌরাণিক শিব ও চাষী শিব ও গাজনের শিব ; চণ্ডী ও বনদেবী চণ্ডী ; দুর্গা ও অন্নপূর্ণা)। কখনো বা লৌকিক দেবদেবীরা উচ্চ দেবদেবীর বিরোধ সত্ত্বেও আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেন (যেমন মনসা), কখনো বিনা বাধায় তাহারা প্রতিষ্ঠিত হন (যেমন, দক্ষিণ রায়, কালু রায়, কিংবা 'ধন' বা কচ্ছপরূপী ধর্মঠাকুর)। (গ) ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশেষ সৃষ্টি যে জাতিভেদ (caste) সেই জাতিগত (caste) দ্বন্দ্ব, বৈষম্য প্রভৃতির আকারে শ্রেণীসংঘাতই আসলে রূপলাভ করিয়াছে (বিশেষতঃ সেন রাজত্বে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি ও সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত বেণে বা বৈশ্য সমাজের—সম্ভবত সদ্ধর্মানুরাগী বৌদ্ধ বলিয়া—অপোনয়ন প্রভৃতি স্মরণীয়)। সেকালের বিরোধ বৈষম্যরই ফলে বাঙলায় বৌদ্ধ নাই এবং মুসলমানের এত সংখ্যাধিক্য এবং বৈষ্ণবধর্ম এত বিস্তৃত।

বাঙলার এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ধারা হইতে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা বিশ্লেষণ করিলে যাহা মনে জাগে তাহা এই—

প্রথমত, যে-বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের এত প্রচলন দশম শতাব্দীতেও দেখি—সে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাঙলায় মধ্যযুগে কোথায় লুপ্ত হইল ?

অনুমান করা হয় মৌর্য যুগ হইতে বাঙলা দেশে উত্তর ভারতীয়দের বসতিস্থাপন আরম্ভ হয়। সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরে জৈন, বৌদ্ধ ও (বৈষ্ণব) শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার প্রমাণ হইতে বুঝি এই সব ধর্ম তখন কত প্রসারিত। পাল ও সেনরা বাঙলায় সেই ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় (গৌড়ীরীতি, পাল সেন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি) সুদৃঢ় করেন। কিন্তু বিজিত জনসাধারণ, বাঙালী জনসমাজ, সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার-নিয়ম সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া লইতে পারে নাই। তাহারা তাহাদের আদিম তন্ত্রমন্ত্র, যোগ-প্রক্রিয়া, লৌকিক দেবদেবী এখনো ছাড়ে নাই। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদ অপেক্ষা বাঙলাদেশ মহাযানী তন্ত্রের (বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতির) ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের (ইহারা অনেকেই ছিলেন হাড়ি, ডোম জেলে) প্রধান কেন্দ্র হয়। লৌকিক ভাষায় (বাঙলায়) ধর্ম প্রচার এই সিদ্ধাদেরই কীর্তি—ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নয়। এই বাঙলা রচনাই ইহাদের একটা বিদ্রোহের প্রমাণ। বলা কর্তব্য, এই লৌকিক ধারা, তন্ত্রের মূলস্থিত এই গুহ্যসাধন ও যোগপ্রক্রিয়া হয়ত মৌর্য যুগের পূর্ব হইতেই আদিম জনসমাজের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল—যদিও শাস্ত্রকার তাহাকে মানিত না, উল্লেখযোগ্যও মনে করিত না ; কিন্তু এই লৌকিক ধারাই সিদ্ধাদের বৌদ্ধতন্ত্র ও শৈবতন্ত্রের মধ্য দিয়া আসিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের তন্ত্রাচারের বামাচার দিয়া সহজিয়া, আউল বাউল, (দেহতত্ত্ব, কর্তাভজা, নানা ভজন) প্রভৃতিতে, ও একটু শুদ্ধিলাভ করিয়া রামপ্রসাদের কালী কীর্তনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চর্যাপদ হইতে বাউলের গান, দেহতত্ত্বের গান, সুফী মারফতী গান, গীতি কবিতার ঐতিহ্য এবং লৌকিক সঙ্গীত ও লৌকিক কাব্যের এক বিশিষ্ট এবং সরস ধারা এই বাঙালীর সঙ্গীতপ্রিয়তা ও রসবোধের একটি প্রমাণ। বৈষ্ণব "পদাবলী" এই ধারারই লৌকিক রস ও ভাগবত মধুর রসে মিশাইয়া এক অপরূপ সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে—কীর্তন রূপে এক নিজস্ব সংগীত শৈলীও দান করিয়াছে। বাঙলায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার বিবর্তনে মানস-সম্পদের দিক হইতে এই ভাবে ঘটিয়াছে বৈষ্ণব ধারার উদ্বোধন ; তাহা লৌকিক রস-উত্তরাধিকার ও পুনরুজ্জীবিত হিন্দু সদাচারের ফল।

বাস্তবপক্ষে বৌদ্ধ জাতিগুলি সেন যুগে অপমানিত ও অধিকার-বঞ্চিত হইয়া মুসলমান বিজয়ের পরে সহজেই মুসলমান হয় ("নিরঞ্জনের রুষ্মা' ইহারই আভাস)। যাহারা তাহার পরেও বৌদ্ধ ছিল তাহারা নিত্যানন্দ ও গোস্বামীদের প্রয়াসে 'নেড়া-নেড়ী' রূপে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান রাজশক্তির বিজয়লাভে হিন্দু শাসকশ্রেণী যে দেড় শত দুই শত বৎসরের মত (খ্রীঃ ১২০০ খ্রীঃ ১৪০০) মুহ্যমান হইয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে 'বাস্তুত্যাগী' হইয়া পুঁথিপত্র, ধনজন লইয়া নেপাল ও বঙ্গে আশ্রয় লয়, এবং নিম্নস্তরের মত উচ্চ স্তরেরও কিছু কিছু হিন্দু তখন বিজেতার ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু বা বৌদ্ধ নিম্নবর্ণের পক্ষে ধর্মান্তর গ্রহণে অবশ্য শুধু জাতিগত (caste) পীঠিকা (status) ভাঙিয়া ফেলা চলিল, কিন্তু সামন্ত সমাজের শোষণ তাই বলিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দিল না। উচ্চস্তরের হিন্দুদের পক্ষে অবশ্য শাসক-প্রতিষ্ঠা অনেক সময়ে অক্ষুণ্ণ রহিল। কিন্তু দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইতে হইতে দেখি—শাসকশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানরা নিজেদের শ্রেণীগত নৈকট্য ও শোষক স্বার্থের ঐক্য বুঝিয়া লইয়াছে—পুরাতন হিন্দু শাসকশ্রেণী তখন মুসলমান সুলতান ও মুসলমান শাসকশ্রেণীর সহিত বুঝাপড়া করিয়া লইয়াছে। ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে ত কথাই নাই, না করিলেও প্রাক্তন হিন্দু শাসকশ্রেণী অনেকাংশে নতুন শাসক-শ্রেণীর দোসর রূপেই পরিগণিত হইয়াছে। রাজা গণেশ ও যদুর (মুসলমান শাসকশ্রেণীর সমর্থনের জন্যই কি তিনি 'জালালুদ্দিন' হন ?) পূর্বেই সেনাপতি রায় রাজাধর, আচার্য বৃহস্পতি মিশ্র প্রভৃতিকে আমরা দেখিতে পাই মুসলমান গৌড়েশ্বরের সহকারীরূপে সনাতন-রূপ (ব্রাহ্মণ) মালাধর বসু 'গুণরাজ খাঁ,' লস্কর রামচন্দ্র খাঁ (কায়স্থ), মহাকবি দামোদর (বৈদ্য), কুলধর শুভরাজ খাঁ (বণিক)—প্রভৃতির নাম পাঠান প্রশাসকবর্গের মধ্যে সুপরিচিত। হোসেন শাহ ও নসরত শাহের সুশাসনকালে (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে) এই হিন্দু-মুসলমান শাসকশ্রেণীর সহযোগ সুনিশ্চিত হইয়া যায়—কর্মচারী ও ভৌমিক 'ভদ্রলোক'' সমাজের বিকাশও চলিতে থাকে। আর উহারই আওতায় একদিকে মুসলমান শাসকদের প্রয়োজনে আর অন্যদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের স্বধর্মরক্ষার চেষ্টায় বাঙলা ভাষায় পৌরাণিক (বিবাদ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণকথা ও মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি) রচিত হইতে থাকে। সামন্ত রাজাদের সভায়ও কোচবিহারে, রোসাঙ্গে, ভুলুয়ায়, পরাগল খাঁ'র সভায় এই বাঙলা রচনার ধারা উৎসাহ পাইতে থাকে। বলিতে গেলে মধ্য যুগের বাঙলার ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতিরও এক প্রধান পরিচয় বাঙলা রচনায়, অন্য পরিচয় সংস্কৃতচর্চায়—নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতির পণ্ডিত সমাজে। বিশেষত মিথিলা হইতে ন্যায়চর্চা বিজিত করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে 'নব্যন্যায়ের' আসন প্রতিষ্ঠায়, রঘুনন্দন প্রভৃতির নতুন স্মৃতি প্রণয়নে তাহা সুদৃঢ় হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভদ্র সমাজ মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই—মুসলমান ধর্ম হইতে বরং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদকে রক্ষা করিতে লাগিল, রাজনৈতিক বশ্যতা মানিয়া ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সংগঠিত করিয়া চলিল।

অবশ্য মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান পরিচয় এই সব শাস্ত্রে নয়,— নব্যন্যায়েও নয়, বৈষ্ণব শাস্ত্রেও নয়,—সেই পরিচয় বৈষ্ণব আন্দোলনে,—বিশেষ করিয়া বাঙলায় রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে, পদাবলীতে, জীবনী গ্রন্থে, এবং বাঙালী হিন্দু সমাজকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামীদের নতুন করিয়া সংগঠনে। জাতিচ্যুত বৌদ্ধ নেড়ানেড়ীদের দীক্ষা দান, নিপীড়িত সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতিদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সসম্মানে স্থান লাভ; ও প্রবীর প্রতাপ রুদ্র ও বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বিরের রাজ্যে বৈষ্ণব জীবন-চর্যার প্রতিষ্ঠা—এইসবের মধ্য দিয়া যে সত্য স্পষ্ট হয় তাহা এই যে, হোসেন শাহ নসরৎ শাহের রাজত্বে আপেক্ষিক স্বস্তি লাভ করিয়া বাঙালী পণ্ডিত ও অভিজাত গোষ্ঠী এক ভক্তি-প্রধান ও রস-প্রধান আন্দোলনে সমাজের আপামর সাধারণকে 'কোল' দিতে চাহিলেন—এটিও বুদ্ধদেবের মত সংস্কারবাদী (অরাজনৈতিক) প্রয়াস। এক বাহু রাজা ও অভিজাতের দিকে আর বাহু লোক-জীবনে প্রসারিত। ইহারই অনুরূপ একটি সংস্কারবাদী প্রয়াস করেন তন্ত্রাচার্যরা—সেই লোকসমাজের আদিম তন্ত্রাচারকে খানিকটা শোধন করিয়া, খানিকটা বৈদিক আগম-নিগম ও পৌরাণিক দেবতা শিব ও শক্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া।

চতুর্থত, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেও সাধারণ পল্লীজীবী বাঙালী মুসলমান শরিয়তি ইসলামকে গ্রহণ করিতে থাকে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে। তৎপূর্বে শরিয়তি জীবনযাত্রা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত একমাত্র শহর ও রাজধানীর নিকটস্থ মুসলমানদের উপর, দূর পল্লীগ্রামের জনতার উপর নয়। কিন্তু তাই বলিয়া মুসলমান ধর্মের জাতিভেদহীন বিরাট আবেদন হিন্দুধর্ম ও সমাজকে প্রভাবিত করে নাই, তাহা নয়। কবীর নানকের মত চৈতন্যেরও চেতনায় উহা নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আবার মুসলমান বৈষ্ণব কবি পদাবলীও লিখিয়াছেন। এবং মুসলমান সুফী ধর্মের আলোকে বাঙলার লৌকিক রস-প্রধান সাধনা যে নতুন কাব্য-সম্পদ (মারফতি গান, মুরশেদি গান) লাভ করিল তাহাও স্মরণীয়। কিন্তু মুসলমান বিজয়ের প্রধান এক ফল আরব্য রমান্যাস ও ফারসী (জিন-পরী প্রভৃতির) কল্পনা-কাহিনীর প্রসার; অন্য প্রধান লাভ ঐহিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কাব্যচেতনা। মুসলমান কবি দেবতার গান গাহেন না—শুধু জিনপরীর কথা বা জঙ্গনামাও তাহার গান নয়। তাঁহার গান মানুষের কথা—পদ্মাবতীর (আলাওলের), লোরচন্দ্রানীর (দৌলত কাজীর)। আর অনেকাংশে এই মানবীয় চেতনাই 'ময়মনসিংহ গাথার' মত গাথা-সাহিত্যের লৌকিক ধারাকেও পুষ্ট করে। বলা বাহুল্য, লৌকিক কাব্যেরই একটি ধারা এই গাথার মধ্যে প্রবাহিত—আর বাঙলা সাহিত্যে 'ময়মনসিংহ গীতিকার' তুলনা নাই। 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রামায়ণ ও মহাভারতের চিরনতুন কাহিনী, কবিকঙ্কণের চরিত্র-চিত্রণের সার্থকতা, এবং পরম মধুর বৈষ্ণব পদাবলী ও ভাব-গম্ভীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত', শেষে রামপ্রসাদের ও ভারতচন্দ্রের কাব্য—উচ্চ গোষ্ঠীর ন্যায় ও স্মৃতি আর সংস্কৃতকাব্য রচনা কিংবা পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য প্রচার,—এইসব কম সম্পদ নয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মনে হয়, আদি ও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতি বড় বৈচিত্র্যহীন,—এক ঘেয়ে,—প্রায়ই বিষয়বস্তু এক, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, কিম্বা চণ্ডী-মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা। প্রায়ই কাব্যকলা বৈশিষ্ট্যহীন, নিরর্থক পদ মিলানো, অধিকাংশ সাহিত্য পদবাচ্য নয়। বলা বাহুল্য, এই বৈচিত্র্যহীনতা ও একঘেয়েমি বাঙলার সমতল ক্ষেত্রে প্রতিলিপি নয় (শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহারই আভাস একস্থলে দেখিয়াছেন)। উহা অতি-দীর্ঘায়িত সামন্ত যুগের সংস্কৃতির প্রতিলিপি ও অতি-বিচ্ছিন্ন এক পল্লীপ্রধান কৃষি-সভ্যতার বর্ণহীনতার প্রতিচ্ছবি। আর ইহার মধ্যেও যাহা প্রধান কীর্তি তাহা লৌকিক প্রেরণার,—ও লৌকিক সংযোগে প্রাপ্ত এক সম্প্রদায়েরই লৌকিক ধর্মান্দোলনের (বৈষ্ণব)।

বাঙলার লোক সংস্কৃতির রূপ

কিন্তু যে বাঙালী সংস্কৃতি এই হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ক্রমশ নানাদিকে বিকশিত হইয়াছে, সেই পল্লীপ্রধান বাঙালী সংস্কৃতি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত। এখনো তাহা লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু অত্যন্ত পরিচিত বলিয়াই আমরা তাহার সহজ ও অনাড়ম্বর উপকরণ ও উপাদানকে আমাদের সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন বলিয়া ভাবিতে কুণ্ঠিত হই। তথাপি দুই একজন সংস্কৃতির সন্ধানী বাস্তবদৃষ্টিতে উহার রূপ সন্ধানে অগ্রসর হন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তিনি অবশ্য মোটেই বস্তুবাদী নহেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ; সেই হিসাবেই তাঁহার বিবরণ বস্তুবাদীর পক্ষে আরও মূল্যবান্। তাঁহার কথিত বাঙলার সংস্কৃতির দিগ্‌দর্শনটি তাই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। আদি ও মধ্যযুগের বাঙলার সংস্কৃতিকে আমরা কি কি সৃষ্টিতে, অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে এখনো দেখিতে পাই, ইহা হইতে তাহা সংক্ষেপে জানিতে পারি।

"[১] বাঙলার বাস্তব সভ্যতা—বাঙলায় খড়ের চালের কুটীর, পূর্ববঙ্গের বেতের ও বাঁশের কাজ (লুপ্তপ্রায়); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ; ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা খুঁটি, চালের বাতা প্রভৃতিতে নানা চিত্র খোদাই করা (এই কাষ্ঠ-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু যুগের কাষ্ঠের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্যের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল); ইটের মন্দির, পোড়ামাটির

ভাস্কর্য—ইটের উপরে নানারকমের খোদাই (মন্দির ও ইটে খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ উল্লেখ করিতে হয়)—ইটে খোদাই ও মন্দিরের বাস্তুবিদ্যা এখন প্রায় অবলুপ্ত।

চিত্রবিদ্যা—পুথির পাটা (লুপ্ত), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় লুপ্ত), এবং অন্য প্রকারের খাঁটি বাঙালী চিত্র-পদ্ধতি, যথা পশ্চিমবঙ্গের পটুয়ার পট, পূর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, শরায় ছবি আঁকা—ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুপ্ত ; মাটির ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চালচিত্র আঁকা মাটীর সঙের পুতুলের পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র—ইহাই আমাদের বার্ষিক পূজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে ; রঙ্গীন মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, গ্রাম্যশিল্পের মধ্যে অন্যতম শিল্প—জাপানী সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিতা করিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

দাঁইহাটা কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূর্তিশিল্প ও অন্য ভাস্কর্য ; মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাতীর দাঁতের কাজ—মূর্তি, চুড়ি, কৌটা প্রভৃতি (বাঙলার হাতীর দাঁতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর পর্যন্ত পহুঁছিয়াছে) বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শাঁখের কাজ—শাঁখে খোদাই, আধুনিক মিহি কাজের শাঁখের সরু চুড়ি ইত্যাদি। সারা বাঙলায় সোলার কাজ—খেলনা, ঠাকুরের সাজ, ডাকের সাজ।

এতদ্ভিন্ন ঢাকার রূপার তারের কাজ (filgree work) ; কলিকাতার রূপার নকাশীতোলা কাজ (repousse work) ; কলিকাতার স্বর্ণকারদের অলঙ্কারশিল্প, এতে বিলাতিধরণের মীনার কাজ—এগুলির প্রভাব বাঙলার বাহিরেও গিয়াছে।

বাঙলার পিতল-কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদ-খাগড়ার কাঁসার বাসন, বিষ্ণুপুরের পিতল কাঁসা ও ভরনের বাসন, দাঁইহাট কাটোয়ার, বলগ্রাস বর্ধমানের এবং ঢাকা প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের নানাস্থানের পিতলের বাসন ; কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্বীপের মূর্তি ঢালাই, শাসপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের ইস্পাতের কাজ।

বাঙলার খাদ্যদ্রব্য—বাঙলাদেশের বিশিষ্ট শাকশুক্তানি ঘণ্ট প্রভৃতি, নিরামিশ ব্যঞ্জন ও তরকারী ; বাঙলার বিশেষত পূর্ব-বঙ্গের মৎস্য ও মাংস পাকের বিশেষ রীতি, বাঙলার কাসুন্দী, ছড়াতেঁতুল, আচার, খেজুর গুড়, পাটালী, মুড়ী, মুড়কী, চালের গুড়া নারিকেল ও ক্ষীরে তৈয়ারী নানা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন ; বীরখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজা, সীতাভোগ, মিহিদানা ইত্যাদি ; ছানার তৈয়ারী মিষ্টান্ন, বাঙলার নিজস্ব মিষ্টান্ন, নানাপ্রকারের সন্দেশ, পানিতোয়া রসগোল্লা।

বাঙলার পরিধেয়—মিহি মলমল, ঢাকার জামদানী (ফুলতোলা কাপড়), টাঙ্গাইল, শান্তিপুর, চন্দ্রকোণা, ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর) প্রভৃতি স্থানের ধুতি ও শাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতীর শাড়ী, মুর্শিদাবাদের রেশম, গরদ, তসর, বীরভূম বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রেশম, রাজশাহীর মট্‌কা ; বীরভূম তাঁতিপাড়ার কড়িধার তসর ; বিষ্ণুপুরের রেশম—কেটে, চেলি, নকশাদার ও বুটিদার শাড়ী। অধুনা বিলুপ্ত মর্শিদাবাদের বালুচরের শাড়ী ; হিমালয় প্রান্তের মোটা পশমী কম্বল ; অধুনা প্রচলিত বাঙলার ছাপা রেশমের শাড়ী।

মেদনীপুরের সূক্ষ্ম মাদুর ; কুমিল্লা, নওয়াখালি ও শ্রীহট্টের শীতল পাটি ; বাঙলার নিজস্ব কৃষিশিল্প—নানাপ্রকারের ধান, পান, পাট ; বাঙলার মাছের চাষ।

বাঙলার নৌ শিল্প—বিভিন্ন প্রকারে নৌকা (এই নৌ শিল্প এখন প্রায় অবলুপ্ত) ; বীরভূমের বুহিতাল এবং চট্টোগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল।

[২] বাঙলার অনুষ্ঠান-মূলক সংস্কৃতি—বাঙলার সামাজিক বিধি ও ধর্মসাধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান, বাঙলার হিন্দুর সম্পত্তি উত্তরাধিকার রীতি—দায়ভাগ ; বাংলার সামাজিকতা—বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের রীতি এবং জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও মিত্রসম্মেলনের বিশেষ রীতি ; বাঙলার পূজা,—দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, দোল, রাস, সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা বিশ্বকর্মা পূজা প্রভৃতি বিশেষত্বময় পূজা ও অনুষ্ঠানসমূহ এবং বিশেষ করিয়া বাঙালীর জীবনে

দুর্গাপূজো ; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বালিকাব্রত ; পারিবারিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উৎসব—আটকৌড়ে, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাই ষষ্ঠী, পৌষপার্বণ, নবান্ন, অরন্ধন, নতুন খাতা প্রভৃতি।

মেয়েদের আলিপনা আঁকা, কাঁথা সেলাই ও অন্যান্য গৃহ-শিল্প।

বাঙলার লাঠিখেলা ও অন্য ক্রীড়া-কসরৎ ; রায়বেঁশে নাচ ; পূজোর সময় ঢাকী-ঢুলীদের নাচ ; পূর্ববঙ্গের আরতী নৃত্য ; মেয়েদের ব্রতনৃত্য ; অন্য নানাপ্রকারের নৃত্য।

বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব, মহরমের ও শাহ্ মাদারের অনুষ্ঠান ; ও নানাবিধ নৃত্য ও কসরৎ।

[৩] বাঙলার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি—টোল চতুষ্পাঠি ; বাঙলার সংস্কৃত বিদ্যা—জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলার সংস্কৃত কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীর্তি ; বৃন্দাবনের গোস্বামীগণ ; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পরম্পরা ; নৈয়ায়িক ও স্মার্তগণ ; কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্যগণ ; মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ বৈদান্তিকগণ, বাঙলার আধ্যাত্মিক পদ ; বৌদ্ধ চর্যাপদ ; বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব ; কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত ; ব্রজবুলী ভাষার সৃষ্টি ও ব্রজবুলি সাহিত্য ; বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ, শাক্তপদ—রামপ্রসাদ ; রামায়ণ-মহাভারতের রূপ ; দেশে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর বিশিষ্ট অভিব্যক্তি ; শাক্ত, শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গলকাব্যের উপাখ্যান—বেহুলা লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা, লাউসেন কথা (অধুনা কম প্রচলিত) ; পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম পূজা ; বাঙলার কথকতা, কীর্তন গান—কীর্তনের অভিব্যক্তি,—গড়েরহাটি বা গরাণহাটি, মনোহরশায়ী, রাণীহাটি প্রভৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন ; বাউল ও ভাটিয়াল গান ; বাঙলার শ্লোক-পড়ার সুর, কবি, ঝুমুর ; তরজা ও অন্য গ্রাম্যগীতি ; পাঁচালী, বাঙলার যাত্রা, জারিগান ; মুসলমান মারফতি গান, মর্সিয়া গান ; বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান পুঁথিপড়ার সুর, বাঙলারপয়ার। পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুগানের বাঙলায় প্রচার—বাঙলার ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, চপ, খেমটা।

বাঙলার সাহিত্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্য বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্র বিষয়ক পুস্তক, পদাবলী সাহিত্য, প্রাচীন বাঙালীর কাব্যাবলী (মঙ্গল কাব্য) ইত্যাদি ; ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ, বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্তু—গীতি কবিতা।

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করিয়া ইংরাজদের আগমন পর্যন্ত বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।" ('জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য"—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৩৯-৪৩—১৩৪৫ বাং)।

এই হিসাব সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হোক, মাটামুটি বেশ বিশদ। ইং ১৯৩৮ সালে রচিত এই সুদীর্ঘ অভিভাষণে বাঙালী সংস্কৃতির যে পরিচয় আছে আজ তাহাতে বড় বড় গ্রন্থ ও তথ্যরাশি যোগ করিয়া আর বেশি নতুন সত্য যোগ করা হয় মাত্র। কিন্তু লক্ষ্য করিবার মত কথা এই যে, এই অমূল্য তালিকায় মানস-সম্পদের উল্লেখ আছে, পণ্যেরও উল্লেখ আছে ; উল্লেখ নাই জীবিকার মূল উপকরণের, উৎপাদন প্রথার, সমাজ-সংস্থানের। তাই এই সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে এই হিসাবের সহায়ে আমরা কিছুটা ধারণা করিতে পারি। কিন্তু সর্বাংশে সেই সংস্কৃতি বুঝিতে পারি না।

সংস্কৃতি বনাম 'কাল্চার'

তথাপি অবশ্য বুঝি, যাহাকে আমরা 'বাঙলার কাল্চার' বলিতাম তাহা নিশ্চয়ই এইসব জিনিস লইয়া নয়। সেই 'কালচারের' দৃষ্টিতে বাঙলার এই জীবনযাত্রা মনে হইত 'সেকেলে' এবং 'পাড়াগেঁয়ে', তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অবশ্য ক্রমশ বাঙলার পট, চালচিত্র মূর্তিমন্দির আলপনা

প্রভৃতি লোক কৃষ্টির একটা সত্যকার ও কৃত্রিম সমাদরও বাড়িয়াছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার—বাঙালী আধুনিক যুগেও গ্রামেই থাকে। শতকরা ৮০ জন বাঙালী (দুই-বঙ্গের) গ্রামবাসী; বাঙালী অপেক্ষা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের (বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রদেশগুলি বাদ দিলে দেখিব) অধিবাসীরা তাহাদের শহরে বেশি বাস করে। সভ্যতার "শহুরে মাপকাঠিতে" (standard of urbanisation) বাঙালী উচ্চে নয়—যদিও পশ্চিমবঙ্গরাজ্যে তাহারা এখন অগ্রসর। তাই, এই উপরের চিত্রেরই বাঙলার চিত্র, বাঙলার সংস্কৃতি, না বলিয়াও উপায় নাই। কিন্তু 'বাঙলার কালচার' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাই যে এই বাঙলার সংস্কৃতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে তলাইয়া দিতেছে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই। আর তাহাতে আমাদের দুঃখও বিশেষ নাই। অবশ্য দুঃখ থাকিলেও ফল হইত না,—কারণ 'বাঙলার কালচার' ঔপনিবেশিক যুগের বাঙলার সামাজিক অবস্থার ও ব্যবস্থার ফল—আধুনিক জীবনের সঙ্গে পরাধীন জীবনের সংযোগে তাহার উদ্ভব, কিন্তু তাহার মধ্যে আধুনিক ও ভাবী জীবনের বীজও না ছিল তাহা নয়।

বাঙলার কালচার বিলাস

তবে ঔপনিবেশিক মাঝারিদের বাঙালীর কালচার বিলাস কৌতুক রঙ্গের বিষয়, সে দৃষ্টিতে তাহা তখন (১৯৪১ ইং) এইরূপ বোধ হইত। 'বাঙলার কালচার' 'সেকেলে'ও নয়, 'পাড়াগেঁয়ে'ও নয়। তাহা অন্য জিনিস। কিন্তু কি জিনিস, সে বিষয়ে অধ্যাপকগণ কিন্তু একমত নন, শুধু এই বিষয়ে তাঁহারা একমত যে, উহা 'পাড়াগেঁয়ে' নয়, 'সেকেলে'ও নয়। দরকার হইলে 'বাঙলার কালচার' বলিতে অবশ্য আমরা বৈষ্ণব কবিতার নাম করিব, ফ্যাশান হিসাবে কীর্তনের উচ্চাঙ্গতা প্রমাণ করিব, এমনকি বোটওতে ভাটিয়ালী চালাইব, ড্রয়িংরুমে পল্লীসঙ্গীতের চর্চা করিব, পুরানো কুলা, কাঁথা, পিড়া কলিকাতার বাহিরে আনিয়া 'বাঙলার কৃষ্টির' জন্য প্রাণপাত করিব, আর কলম ধরা আঙুলে আমাদের কন্যারা পর্যন্ত কলিকাতার সিমেন্ট বাঁধানো সভাতলে আলপনা আঁকিতে বসিবেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি উহা আমাদের স্বাভাবিক ও জীবন্ত অভ্যাস নহে, কৃত্রিম 'কৃষ্টি-চর্চা'—ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র আর নাই। তাই এই প্রাণপাত পরিশ্রমেও সেই পল্লীপ্রাণ 'বাঙলার কৃষ্টি' বাঁচিয়া উঠিবে না। যে সামন্ততন্ত্র ও পল্লীসমাজে এইসব জীবন উপাদান ও এই জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল সেই সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়া গিয়াছে, সেই পল্লীসমাজ ম্রিয়মাণ—কৃষি-সংস্কৃতির সেই স্তর শিল্পপ্রধান সাম্রাজ্যবাদের আঘাতে পরিবর্তিত হইয়াছে। তাই সেই স্তরে যেসব সৃষ্টি সহজ ও সম্ভব ছিল, তাহা পরে সহজ ও সম্ভব নয়। জনগণও তাই ঐ সব উপাদান অনুষ্ঠানকে সহজ রূপ দিতে পারে না, আর তাহাকে বিকাশ করিতে পারে না। আমরা 'ভদ্রলোকেরা' তাহা হইতে আরও দূরে—আমরা উহাকে জীবন্ত রূপ দিব কি করিয়া? তাই ফ্যাশন হিসাবে চেষ্টা করি এসবকে বাঁচাইয়া তুলিবার। অবশ্য আমাদের এইরূপ 'কৃষ্টি চর্চা'ও এই বাঙলার কালচারের একটা অঙ্গ—যেমন, বিলাতী শিল্পীদের চক্ষে নিগ্রো আর্ট আদরণীয়, যেমন আমাদেরই শিল্পীদের চক্ষে সাঁওতাল জীবন ও বৌদ্ধযুগ একটা রোমান্টিক বিষয় বস্তু। আমাদের পুরানো আচার অনুষ্ঠান আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর জীবনযাত্রার পক্ষে এতই দূরবর্তী ঠেকে যে, আজ বিদেশী অতিথিকে সংবর্ধনা করিবার কালে প্রথমেই মনে পড়ে আয়োজনটা 'ওরিয়েন্টাল' হওয়া চাই। তারপর অধ্যাপকের বাড়িতে পাঁতি লইতে ছুটি, "স্রক্ চন্দন 'ওরিয়েন্টাল' হবে ত?" অর্থাৎ, কি আমার দেশীয়, কি আমার দেশীয় নয়, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি, মনে শুধু একটি খাঁটি দেশীয় ভাবই তবু নিজের অজ্ঞাতে জাগিয়া আছে—"পাঁতি লওয়া।"

ইহাই বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ঔপনিবেশিক যুগের বাঙলায় কালচারের পরিচিত রূপ—উহা ৯০% জনের জিনিস নয়, অথচ উহা ৯০% জনের সেই পাঁতি লইবার মনোবৃত্তি ছাড়িতে পারে নাই; উহার আসন শহর, বলিতে পারি একটিমাত্র শহর—কলিকাতা, উহার জন্মও এই শহরের সঙ্গে, অর্থাৎ ইংরেজের কর্তৃত্বে।

বাঙলার কাল্‌চারের কেন্দ্র

ভারতবর্ষে ইংরেজের অভ্যুদয় তিনটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া আরম্ভ হয়—মাদ্রাজ, কলিকাতা, বোম্বাই। ইহাদের গায়ে ইংরেজ রাজত্বের তিন যুগ, ইঙ্গ-ভারতীয় বা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির তিন স্তর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। (লেখকের 'শহরের রূপ ও স্বরূপ', আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসর, পৌষ, ১৩৩৮, লেখকের ***History of Madras***, Calcutta Municipal Gazette, Nov. 9, 1940; লেখকের ***Bombay : Where it beats Calcutta***, Calcutta Municipal Gazette, Nov. 30, 1940; লেখকের ***This Calcutta Culture***, Calcutta Municipal Gazette, Nov. 25, 1939 দ্রষ্টব্য)। যেমন মাদ্রাজে প্রথম যুগের সেই আবহাওয়া রহিয়া গিয়াছিল; নতুন শিল্পযুগের হাওয়া ঠিক বহে নাই, বোম্বাইতে নবজাত 'জাতীয় ধনিক তন্ত্র' (national bourgeoisie, 'স্বারাজ্য' ও 'স্বদেশী'তে (শব্দটি বিশেষ অর্থযুক্ত) প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। আর কলিকাতায় খাঁটি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যাহ্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও শেষ হয় নাই—বণিক ও ধনিক ইংরেজ পুঁজিরূপী-রূপে এক বিলাতি পুঁজির এবং ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার পত্তন করিয়াছে।—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তাহাতে দেশী মাড়োয়ারী জাটিয়া ভাগীদার জুটিতে থাকে। মোটের উপর ইংরেজের প্রথম উদয় বাঙলায়ঃ তাহার প্রধান প্রতিষ্ঠা বাঙলায়। আবার ইংরেজের রাজত্বের ফলেই বাঙলায় ও সমগ্র ভারতে একভাবে "আধুনিক যুগ" আরম্ভ হয়। ইংরেজ যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোচ্চ নিদর্শনও তাই এই 'বাঙলার কাল্‌চার', "আধুনিক যুগের" প্রথম পীঠস্থানও তাই ইংরেজের শহর এই কলিকাতা। এখান হইতেই আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইত। প্রধানত বাঙলাতেই আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি রূপ লাভ করে,—তারপর অনুরূপ ঢেউ অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া যায়।

ইংরেজী আমলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আপন আপন চেতনা ইংরেজ রাজত্বে যাহা জাগিয়া উঠিতেছিল, প্রাগ্‌গামী বাঙলার জীবন ও চিন্তা হইতে তাহা প্রেরণা সঞ্চয় করে, তাহারই অবশ্য 'আপন-আপন' ছাঁদে, ভঙ্গিতে—আধুনিক হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতীভাষী জাতিগুলি আপনাদের অনুরূপ কালচারও সৃষ্টি করিতে যত্নবান হয়। এই আধুনিক কালের খণ্ডিত ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্য প্রতিনিধি 'বাঙলার কাল্‌চার'। যাহা বাঙলার কাল্‌চার সম্বন্ধে প্রধানতম সত্য, তাহা ঐ সব আধুনিক ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধেও প্রধানতম সত্য;— গৌণ বিষয়ে পার্থক্য, অবশ্য সুবিদিত। ভারতীয় সংস্কৃতিকে যে পূর্বযুগের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ বলিলে চলিবে না, তাহা আমরা দেখিতেছি। তাহার কারণ, এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় জীবনযাত্রার এক আমূল পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজের ভারত আগমনও সেই পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের পরিচয় দেয়—তাহা হইতেই সভ্যজগতে সামন্তযুগের অবসান ও বণিগ্‌রাজের অভ্যুদয় বুঝিতে পারা যায়। আর সেই বণিক্‌তন্ত্রের বহু জটিল ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন ভারতবর্ষের ইংরেজ বণিকের রাজত্ব লাভ হইল, তেমনি প্রধানত ভারতের ঐশ্বর্যে বিলাতে ব্রিটেনের শিল্পযুগের পত্তন হইল। আবার ভারতেও সেই শিল্পযুগের আক্রমণ, ফলে লোপ পাইল কৃষি-সমাজের গৃহশিল্প ও পল্লী-সমাজের পুরানো ছাঁচ, এই কারণেই সেই পুরানো জন-সংস্কৃতির পুরানো ধারা আজ শুকাইয়া উঠিতেছে; জন জীবনও নতুন খাতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে—কিন্তু তাহার একালের উপযোগী রূপ ঠিক গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। জন সংস্কৃতির এই সংকটের সূচনা হয় সাম্রাজ্যবাদের ও বণিকতন্ত্রের আবির্ভাবে আমাদের পুরাতন শিল্প ও কারু-শিল্পের ধ্বংসে। তখন দেখা দিল নতুন শাসক ও তাহার তাঁবেদার আমলা দালালের দল; দেশীয় সামন্ত রাজ, জমিদার ও তালুকদার, ফড়ে, ব্যবসায়ী ও উপজীবিকাবলম্বী 'মধ্যশ্রেণী'। ইহা শুধু বাঙলা নয়, ভারতীয় জীবনের প্রধান সত্য। ইহার সম্মেলন-ফলে ফুটিয়া উঠিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী

প্রভাবে, বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে, এক নতুন 'ভদ্রলোকে'র জীবনযাত্রা ; উহারই শ্রেষ্ঠ কীর্তি "বাঙলার কাল্‌চার"।

বাঙলার কাল্‌চারের পর্ববিভাগ

এই কাল্‌চারেরও অবশ্য পর্ব বিভাগ করা হয়। যেমন, প্রথম পর্ব 'রামমোহনী পর্ব" (ইং ১৮১৭-৪৩)। রামমোহনের যুক্তিবাদ (rationalism) সেদিনকার ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সহজেই আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিল। কারণ, তখন ফরাসী বিপ্লবের পরস্তরে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের (Democracy), ব্যক্তি-স্বাধীনতার (Individualism) ও জাতীয়তার (Nationalism) বোধন চলিয়াছে! সতীদাহ নিষেধ, একেশ্বরবাদিতা, স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি বহু বিষয়ে রামমোহন ইংরেজের সহায়তা লাভ করেন। তাঁহার চোখে ইংরেজের সংস্কৃতি এক নতুন সম্ভাবনার বাহন রূপে দেখা দেয় ; ইহা রামমোহনের যুগাবতার গণ্য হইবার শ্রেষ্ঠ দাবি, এবং উহা যথেষ্ট দাবিও। ইউরোপের সভ্যতা যে যুগান্তরকারী হইবে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন—ইহার অপেক্ষা বড় তাঁহার প্রতিভার প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না। কারণ, ইংরেজী শিক্ষার অর্থ তখনকার বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়া বা বণিকতন্ত্রের শিক্ষার ফল লাভ করা। পৃথিবীতে তখন পর্যন্ত তাহাই সর্বাপেক্ষা উন্নত শিক্ষা। উহার সংস্পর্শে আসিলে ভারতীয়গণের পৌরাণিক ও সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা ও দৃষ্টি পরিবর্তিত হইবে, ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মে, চিন্তায়, আচরণে, অনুষ্ঠানে বিপ্লব আসিতে বাধ্য, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। মেকলে ও লর্ড বেণ্টিংকের প্রথম শিক্ষা প্রস্তাবে ও নানা সংস্কারে এই রামমোহনী পর্বের জয় ও অবসান ঘটে ১৮৪০ এর পূর্বেই। দ্বিতীয় পর্বে আসিল ফোর্ট উইলিয়মের শিক্ষিত আমাদের 'ইয়ং বেঙ্গলের' পর্ব। ইঁহারা ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষায় একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহাতে নিজেরাই ডুবিয়া গেলেন, দেশকে তখনো নোঙ্গর-ছাড়া করিতে পারিলেন না। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় নাই—ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা, ইংরেজ সমাজের উপকরণ ইংরেজের সমাজ সম্পর্ক ও জীবনযাত্রা হইতে উঠিয়াছে। আর এই দেশের সমাজ, ইহার জীবনের উপকরণ, ইহার সমাজ-সম্পর্ক ইংরেজের রাজ্যাধিকারে ভাঙিতেছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে ইংরেজ ধনিকতন্ত্রের ছাঁচে গঠিত হইতেছে না,—গঠিত হইতেছে "ঔপনিবেশিক" (colonial) ছাঁচে। যে 'বিদ্রোহ' প্রায়ই বিপ্লবের পূর্বাভাস 'ইয়ংবেঙ্গল' সেই বিদ্রোহের বাহন—ইতিহাসের শ্রদ্ধেয় গোষ্ঠী। এই দ্বিতীয় পর্বের শেষ হইল ওয়েলেসলি ডালহৌসির সময়ে—যখন বণিকের রাজত্ব রেল লাইন পাতিয়া ব্যবসায় ফাঁদিতে ও বাড়াইতে আরম্ভ করিতেছে। একবার যেখানে রেল লাইন বসিল, সেখানে আর শিল্পযুগের আবির্ভাব ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইল না—বিশেষত যখন আবার সেই দেশে আছে সস্তা মজুর, প্রচুর লোহ ও কয়লা (Letters—Marx and Engels)। অন্যদিকে এই সময়েই (ইং ১৮৪৩) রাজনৈতিক আন্দোলনেরও সূত্রপাত করিল বাঙালী শিক্ষিতরা এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা হইল। অতএব তৃতীয় পর্বে (ইং ১৮৫৮) দেখা দিল ভারতীয় সমাজের সত্যকার সামাজিক পরিবর্তন ; এবং দেখা দিলেন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, কেশব (দয়ানন্দ), ও সর্বশেষে সেই পর্বের সর্বপ্রধান ভারতীয় নেতা বিবেকানন্দ। রেল ও শিক্ষা সংযোগের ফলে প্রথম ভারতীয় স্বাজাত্যের আরম্ভ, আর সিপাহী বিদ্রোহের ফলে খাঁটি সামন্ততন্ত্রের অবসানও ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এই সময়েই স্থির হয়। তাহার পর চতুর্থ পর্বে ভারতের চক্ষে বিংশশতাব্দীর উদ্বোধন ঘটে বুয়ার যুদ্ধে ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে ; উহার চেতনা প্রকাশিত হয় স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৪-৫)। তাহার স্বরূপ ক্রমপরিস্ফুট হইয়া উঠে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শেষে। তখন হইতে (১৯১৮) শুরু হয় ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্ব—সংঘর্ষের পর্ব। একদিকে সোভিয়েতের জন্ম ও দুঃসাহসিক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা উহার প্রেক্ষাপট। আর গৃহমধ্যে বঙ্কিম সে প্রেরণা আসিয়া পৌঁছায় (তিলক)-অরবিন্দ হইতে রবীন্দ্রনাথে উত্তীর্ণ হয়, (গান্ধী)-চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথে মূর্ত হয় এবং সর্বশেষে ১৯৩০এর পরে তাহাই আর এক নতুন পর্বের ইঙ্গিত (পঞ্চম ?)

দান করে—একরূপে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে, (পণ্ডিত জহরলালেও), অন্যরূপে প্রধানত সাম্যবাদী চিন্তায়। স্বাধীন ভারতের জন্মে সেই সমাজতন্ত্রী সংগ্রামের পর্বের পথ মুক্ত হয়।

দ্রষ্টব্য এই যে, বাঙলার কাল্‌চারের নায়কদের মধ্যে একজনও মুসলমান নন। ভারতীয় মুস্‌লিম জীবনযাত্রা প্রধানত শহুরে। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে ও সিপাহী যুদ্ধদমন-আঘাতে সেই জীর্ণ মুস্‌লিম সংস্কৃতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—যেমন তুর্কী আগমনে হিন্দুশাসকের সংস্কৃতি একদিন মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙলার মুসলমানের সংস্কৃতি পল্লীগত অর্থাৎ জনগণের জিনিস। আমাদের শহুরে কাল্‌চারের উদ্বোধনে সেই পল্লীকেন্দ্রিত জনসমাজের কেহই আহূত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সবে নতুন কাল্‌চারের শিহরণ জাগিয়াছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে[১]।

দ্বিতীয় কথা এই যে, এই চার পাঁচ পর্বের 'বাঙলার কাল্‌চার'কে প্রায় আধুনিক ভারতীয় কাল্‌চারও বলিতে পারা যায়, বন্ধনী মধ্যস্থ নাম কয়টি শুধু অবাঙালীর। এই কালচার যতই অগ্রসর হইয়াছে ততই অবাঙালীও সেই ভারতীয় জীবনযাত্রায় প্রাধান্য পুনর্লাভ করিয়াছে। প্রথম দিকে এই প্রাধান্য বাঙালীরই একচেটিয়া ছিল,—কেন ছিল, তাহার ঐতিহাসিক কারণ আমাদের বুঝিবার বিষয়। তাহাই আসলে বাঙলার কাল্‌চারের স্বরূপ, অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির ঔপনিবেশিক রূপ, আমাদের চোখের সম্মুখে খুলিয়া দেয়।

বাঙলার কাল্‌চারের দশদিক

তাহার পূর্বে এই বাঙলার কাল্‌চারের নানা দিক কয়টি আবার একবার এক নিমেষে আমরা দেখিয়া লই। তাহাতেই ঔপনিবেশিক ভারতেরও আভাস পাওয়া যায়, স্বাধীনতার যুগেও উহার উত্তরাধিকার বাঙলা ও ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে বণিক ইংরেজ রাজা হইলেন ১৭৬৪ হইতে। তারপর কাল্‌চারের নানাপর্বের মধ্যে আমরা দেখি—(১) ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ :—ইহার প্রবক্তা রামমোহন হইতে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত নেতৃগণ। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপের Reformation ও Protestantism—বাঙলাদেশে উহাতে এক হিসাবে বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণার অঙ্কুরোদ্গম হয় বলা চলে। (২) হিন্দু জাগরণ :—বঙ্কিম, বিবেকানন্দ হইতে রামকৃষ্ণ মিশন ও হিন্দু মহাসভা পর্যন্ত এই স্রোত বহিয়া আসিয়াছে। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় ক্যাথোলিক ধর্মের Counter-Reformation. (৩) সংস্কৃত চর্চা—রামমোহনের বেদান্ত অনুশীলন, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রয়াস, বাচস্পতির অভিধান, মহাভারতের অনুবাদ হইতে এই ধারা একেবারে বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রকাশের অধ্যায় পার হইয়া বিংশ শতকের পণ্ডিতদের মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও তৎকালীন গ্রীকচর্চা। বাঙলাদেশ সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতির চর্চায় ও অনুবাদে অগ্রগণ্য ছিল। কিন্তু স্মরণীয় এই যে রেনেসাঁস বাঙলা দেশে যদি সত্য হইয়া থাকে, সংস্কৃত চর্চায় হয় নাই, হইয়াছে ইংরেজী শিক্ষায়,—অর্থাৎ বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষায়। (৪) সমাজ-সংস্কার :—রামমোহন, বিদ্যাসাগর হইতে কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ইহার প্রবক্তা। ইহার ঐতিহ্য ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্য-সমাজ ও হিন্দুমহাসভার সম্বল ছিল।

১ বাঙলার মুসলিম শিক্ষিতদের পক্ষে স্বভাবতই বাঙলার নিজস্ব জনসংস্কৃতির বাহন হওয়া এই কারণে সহজসম্ভব ছিল, কারণ তাহারা জন-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারায় নাই। অবশ্য তাহার অর্থ—তাহাদিগকে বাঙলার জীবন্ত যুগের জন-জীবনকে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার যুগোপযোগী রূপ আবিষ্কার করিতে হবে। তাহা করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রথমে শরিয়তি ইসলাম কথিত সমাজ ও সভ্যতা গড়িবার মোহ—অর্থাৎ সপ্ত শতাব্দীর আরব সভ্যতাকে বাঙলা দেশে বিংশ শতাব্দে প্রবর্তিত করিবার মোহ—ত্যাগ করিতে হইত। দ্বিতীয়ত, এই নতুন মুস্‌লিম চেতনাও পঁচাত্তর বছর আগেকার হিন্দু চেতনার মত ভুল করিতে আরম্ভ করে। নোকরশাহীর আওতায় হিন্দুদের বাঙলার কাল্‌চার চাকরের কালচার হইয়াছিল। মুসলমান চেতনাও ১৯৩০-৪৭এর সময়ে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে আবদ্ধ থাকে, তাহারা চাকুরী ও মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার লোভে মাতিয়া থাকায় তাহাদের প্রয়াসও চাকরের কালচার হইতেই চাহিয়াছিল। 'বাবু কালচারের' পার্শ্বে বাঙলাদেশে তাহা হইলে দেখা দিত এক 'মিঞা কালচারের'। বাঙালী মুসলমানের সে শক্তিও আয়ত্ত হইবার পূর্বে তাহারা সর্বভারতীয় মুসলমান সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া পড়েন ও দেশ-বিভাগে বাঙালীত্ব ছাড়িয়া পূর্ব পাকিস্তানী হইলেন। সেইখানে তাহারা আজ ১৯৫২-৭১ সম্বিত ফিরিয়া পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়—আপন বাঙালী গণতন্ত্রী স্বাধীনতার সংগ্রামে।

কিন্তু সমাজে আজ আর সংস্কারের যুগ নাই, বৈপ্লবিক সংগঠনের যুগ আসিয়াছে। এই দিকে শিল্প-প্রবর্তকও সাম্যবাদাবলম্বী জনসমাজই সেই প্রেরণার উত্তরাধিকারী। (৫) সাহিত্য :—ঈশ্বরচন্দ্র (শিক্ষা-প্রবর্তক), মধুসূদন ও বঙ্কিম প্রমুখ ইংরেজী শিক্ষিতদেরই ইহা সর্বাংশে কীর্তি। সাহিত্য হিসাবে ইহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বা মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্যের সম্পর্ক প্রায় নাই। বরং ইহার প্রেরণা—ইহার সহিত তুলনীয়ও—যোড়শ শতাব্দী হইতে ইংলন্ডে যে সাহিত্য জন্মে তাহাই। (৬) নব শিল্প পদ্ধতি :—স্বদেশী যুগের পরে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল হইতে ইহার জন্ম। ইহার সহিত ভারতীয় প্রাচীন শিল্পধারার বা বাঙলার পটুয়াদের ধারার যোগসূত্র অবাধ ছিল না—যোগসূত্র আছে নিবেদিতার, ওকাকুরার, হ্যাভেলের এবং কুমারস্বামীর সহিত। (৭) সঙ্গীত : ওস্তাদের আসরে বাঙালীর স্থান ছিল গৌণ কিন্তু নগণ্য নয় ;—ধ্রুপদে, (উচ্চাঙ্গের কীর্তনে), টপ্পায়, ও যে নতুন সঙ্গীতের ধারা রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেন, তাহা উহার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথা ও সুরের সমন্বয় স্থাপিত হয়। ইহার রহস্যটুকু বুঝিবার মত। লোক-সঙ্গীত সাধারণত কথাপ্রধান ; বাঙলার লোক-সঙ্গীতও তাহাই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে সেই কথার সঙ্গে সুরের নতুন সমন্বয়ে ইহা একালের বাঙলায় জনপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু ঠিক এই বিশেষ একটি ভাষার কথার জন্যই মনে হয় তাহা এক নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত-শৈলীরূপে গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ। 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত' ছাড়াও একটা বাঙালী সঙ্গীত-ধারা ক্রমশ বিকাশ লাভ করিয়াছে। বাউল, পল্লী-সঙ্গীত, ভাটিয়ালী প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতের আবার প্রথম উদ্বোধনও বাঙালী শহুরে বরে। (৮) নাট্য ও নৃত্যকলা :—বলাবাহুল্য ইহার বাহিরের রূপ যাহাই হউক, ইহার প্রেরণা ও আদর্শ প্রথমত আধুনিক ইংরেজী ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির। ভারতীয় চলচ্চিত্রের আদর্শ, মার্কিন বিকৃতি। মুনাফাই চলচ্চিত্র শিল্পের লক্ষ্য, শিল্প-সৃষ্টি বা মানুষের জীবনকে রূপায়িত করা সে হিসাবে ইহার গৌণ আদর্শ ছিল। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বাঙালী প্রতিভা বিশেষ করিয়া চলচ্চিত্রেই নতুন সৃষ্টিপথ আয়ত্ত করিয়াছে। সত্যজিৎ রায় বাঙালী প্রতিভার সেই নতুন দিকের নায়ক। (৯) সাংস্কৃতিক গবেষণা :—ইতিহাসে, পুরাতত্ত্বে, ভাষাতত্ত্বে, নৃতত্ত্বে বাঙালীর দান আদর লাভ করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কলিকাতার বৈজ্ঞানিকগণই ভারতীয় গবেষকের দ্বার প্রথম মুক্ত করেন। (১০) রাজনৈতিক আন্দোলন :—উহার উদ্বোধন প্রধানত ইংরেজী শিক্ষিতদের দ্বারা বাংলাদেশে আরম্ভ হয়, আর উহার দুইটি ধারা অন্তত আছে। যেমন, একদিকে ডব্লিও-সি ব্যানার্জি (নামেই তাঁহার স্বাজাত্যের আদর্শ পরিস্ফুট), আনন্দ-মোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি লিবারলগণ হইতে বিংশ শতাব্দীর পদস্থ ন্যাশানালিষ্টরা ; আরদিকে বঙ্কিম-অরবিন্দের প্রেরণাপ্রসূত বাঙলার নিম্ন মধ্যবিত্ত বিপ্লবী ধারা,—যাঁহারা ক্রমে বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক চিন্তায় ও সামাজিক কর্মক্রমে বিশ্বাসী, ও গণবিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছেন, মোটামুটি যাঁহারা সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী।

বলা হয়ত প্রয়োজন যে, যাহাকে আমরা 'বাঙলার কালচার' বলি প্রধানত তাহা সম্ভব হইয়াছে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য :—উহা ইংরেজ অধিকারেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। কাজেই ঐ শিক্ষার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই পাশ্চাত্য শিক্ষা অবশ্য তখনকার 'বুর্জোয়া' শিক্ষা-পদ্ধতি ; তাহার ফলে যে আমরা গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্ত্রীশিক্ষা, সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মূল্য বুঝির, ইহা আবার না বলিলেও চলে। দ্বিতীয় একটি কথা, এই বাঙলার কালচারের দিক কয়টির মধ্যে মানসিক সম্পদগুলিরই হিসাব লওয়া হইয়াছে—পাট, কয়লা, চা প্রভৃতির কথা বলা হয় নাই। কারণ, 'বাঙলার কালচার'-বাদীদের চোখে কালচারের সেই বাস্তব হিসাব গৌণ বলিয়া গণ্য হইত। সেই মারাত্মক ভ্রান্তির ফলে ভারতীয় জীবনে নেতৃত্ব লাভ বাঙালীর অসম্ভব।

বাঙলার কালচারের বনিয়াদ

মোটামুটি এই যে নানাদিকে বাঙলার কালচার বিকাশ লাভ করিল তাহার মূলে কোথায়, আর সমস্ত জড়াইয়া তাহার কোন্ রূপটি প্রকাশিত হইল—অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কী—এইবার সংক্ষেপে

তাহা নির্দেশ করিতে বোধহয় অসুবিধা নাই। পুনরুক্তির দোষ ঘটিলেও বলিতে হইবে—(১) ইহা ৯০% জনের কাল্‌চার নয়; (২) ইহা ভারতীয় পুরাতন সংস্কৃতির স্বচ্ছন্দ ক্রমবিকাশ নয়; (৩) ইহা কৃষি-প্রধান পল্লী-জীবনের সংস্কৃতি নয়; (৪) ইহা মাত্র মধ্যবিত্ত ও ইংরেজী শিক্ষিতদের সৃষ্টি (এবং যেহেতু ইহারা অধিকাংশেই প্রায় হিন্দু, অতএব মুসলমানগণ ইহাতে উল্লেখ-যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই); (৫) ইহা শহরে জাত এবং শহরেই প্রায় সমাসীন; (৬) ইহা বাহিরের বণিক্ সংস্কৃতির আঘাতে আমাদের ক্রম-পরাস্ত কৃষি-সংস্কৃতি হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে; (৭) ইহা প্রধানত বাঙালীর মানস সংস্কৃতির ইতিহাস বহন করে, এবং তাহার আর্থিক জীবনকে ভুলিয়া থাকিতে চাহিত বা অবজ্ঞা করিত; (৮) এবং সর্বশেষে, ইহা মাত্র সামান্যাংশে আভাস দেয় সমাজগত পরিবর্তনের (রাষ্ট্রকর্মে ও সামাজিক সংস্কারে), আর জীবিকাগত বা বাস্তব উপকরণগত সংস্কৃতির (যাহা ৯০% জনের কিংবা শহরের বাকী জনগণের, মজুরের, ফেরিওয়ালার, দোকানীর, পশারির জীবনযাত্রা, জীবন-দৃষ্টি, এই সবের) প্রায় খোঁজই রাখিতে চাহে নাই।

কর্নওয়ালিসী ভূমি-ব্যবস্থা

মানস-সংস্কৃতির উপর যে এত বেশি জোর পড়িল, এবং উহার যে এরূপ অসাধারণ বিকাশ ঘটিল তাহার কারণ ঐতিহাসিক। ইংরেজ বণিক রাজা হইলেন; ১৭৬৫ সালে তাঁহারা দেওয়ানী লাভ করিলেন। ১৭৯৩তে দশশালা বন্দোবস্ত করিলেন, এবং তাহাই পরে জমিদারী প্রথায় 'চিরস্থায়ী' রূপে লাভ করিল। অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাঙলার ভূমি ব্যবস্থায় এত বড় একটা বিপর্যয়ের সূত্রপাত হইল যাহা পূর্বে পূর্বে যুগে সম্ভব হয় নাই। প্রথমত, বিলাতী কায়দায় খাজনা (rent) ধার্য করা হইল, শস্যের পরিবর্তে 'মুদ্রা কর' প্রবর্তনের চেষ্টা চলিল। পূর্বে রাজস্ব অজন্মা অনাবৃষ্টিতে বাড়িত-কমিত, কৃষকের উহাতে সুবিধা ছিল। 'মুদ্রা কর' সেই অবস্থার হিসাব রাখে না, জমির উপর 'খাজনা' দিতে হইবে—এই তাহার হিসাব। উহা পূর্বেকার মত 'রাজস্ব' উৎপাদনে রাজার অংশ, বলিয়াও পরিগণিত হয় না। দ্বিতীয়ত, জমির মালিকানা আর কৃষকের কিংবা পল্লী গোষ্ঠীর রহিল না। ইংরেজী থিওরি মত, উহা রাজার হইল। ইহাই বিলাতী নীতি—এই নীতি অনুযায়ী কৃষক খাজনা না দিলেই উৎখাত হয়। তৃতীয়ত, বণিক রাজা আবার মালিকানা ইজারা দিয়া দিলেন নানা খাজনা-জোগানদারদের হাতে—ইহারাই জমিদার। কার্যত জমির মালিক হন ইহারাই।[১] প্রজার খাজনা দাঁড়ায় ১৮ কোটি টাকা (আবওয়াব কত কোটি টাকা তাহা না বলিলেও চলে), আর সরকার পাইতেন ৩ কোটিরও কম; বাদবাকী জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাপ্য হইত। কিন্তু ১৭৯৩-এর বন্দোবস্ত অনুসারে কথা ছিল সরকারী পাওনার (যেমন তখনকার হিসাবে ৩ কোটির) এক দশমাংশের (অর্থাৎ তখনকার হিসাবে ৩০ লক্ষের) বেশি জমিদারেরা প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিবেন না। কিন্তু ক্রমে জমিদারের নিজ আদায় মোট ৯ কোটির মত হইল—কাহারো কাহারো মতে ১৭।১৮ কোটি। অতএব 'জমিদারী' যে বাঙলা দেশের সম্পন্নদের নিকট একটা প্রকাণ্ড লাভের ও লোভের জিনিস হইয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। মনে হইতে পারে জমিদারী প্রথায় ইংরেজ বণিকরাজের বুঝি লাভ ছিল না। কিন্তু ১৭৬৫এর পরে দেশে যে 'খাজনা নিলামের' অত্যাচার চলে আজও তাহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" এই দেশের Black Death! ১৭৯৩তেও ইংরেজ বণিক লাভের অঙ্ক কিছু মাত্র কমাইয়া এই ভূমি-ব্যবস্থা করে নাই। তাহাদের হিসাব মতে মুঘল রাজত্বের শেষদিকে ১৭৬৪-৬৫এ রাজস্ব ছিল ৮,১৮,০০০ পাউণ্ড; কোম্পানি দেওয়ানী পাওয়ার

১. ভারতবর্ষের যেখানে 'তালুকদারী' ও রায়তোয়ারী প্রথা প্রবর্তিত হয় সেখানেও 'মুদ্রা কর' প্রবর্তনে কৃষক নিঃস্ব হইল। সেখানেও মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হইল, সেখানেও ক্রমশ গৃহশিল্পের বিনাশে শিল্পীরা আসিয়া কৃষকের সংখ্যা বাড়াইল। কিন্তু রায়তোয়ারী প্রদেশে 'জমি' মুনাফার এত বড় বস্তু হইল না, ব্যবসায়ীরাও তাই জমিদার হইতে চাহিল না।

সঙ্গে ১৭৬৫-৬৬তে উহা বাড়িল, ১৪,৭০,০০০ পাউণ্ডে; আর ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্ত অনুযায়ী সেই সরকারী ভূমি-রাজস্ব স্থির হইল ৩০,৯১,০০০ পাউণ্ড। আর যাহাই হউক, বণিকেরা মুনাফা ছাড়িয়া দেয় নাই, ইহা না বলিলেও চলে।

তাহা ছাড়া কয়েকটি প্রধান কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হয়—প্রথমত, বৎসরে বৎসরে বন্দোবস্ত যাহারা লইত তাহারা রায়তের উপর শত অত্যাচার করিয়াও সেইরূপ উচ্চহারে খাজনা আদায় করিয়া উঠিতে পারিত না। কাজেই সরকারী বাজেটের আদায়ী খাজনা বাকী পড়িত। দ্বিতীয়ত, কর্ণওয়ালিস্ স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছেন, তিনি চাহিয়াছিলেন এই দেশে ইংলণ্ডের অনুকরণে একদল ভারতীয় ভূস্বামী (landholder) গঠন করিবেন। ইহার এক যুক্তি—তাহারা জমির উন্নতি করিবে; —জমিদারেরা অবশ্য ইহার কিছু মাত্র করিলেন না। কর্ণওয়ালিস চাহিয়াছিলেন এইভাবে জমিদারদের ঘাড়ে ভারতবর্ষে চিরদিন যাহা রাজার কর্তব্য ছিল;—যেমন কৃষির প্রয়োজনে বড় বড় খালবিল খনন ও সংরক্ষণ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পথঘাট প্রভৃতি—তাহা চাপাইয়া দিবেন, কোম্পানি শুধু জমির মালিকানা ও রাজস্ব ভোগ করিবে। উহার ফলে এবং দুইশত বৎসরে এসব জিনিস একেবারে ধ্বংস হইল, নদীনালা বন্ধ হইল, রাজা বা জমিদার কেহই দৃক্‌পাত করিল না (***Public Works in India***, Sir Arthur Cotton, 1854 ও ***Bengal Irrigation Committee Report***, 1930 দ্রষ্টব্য)। এই ভূস্বামী সৃষ্টি করার তৃতীয় যুক্তি—কর্ণওয়ালিস বুঝিয়াছিলেন, জমিদার সরকারের নতুন প্রতিষ্ঠিত শাসনের মেরুদণ্ড স্বরূপ হইবে। পরে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক আবার এই কথাই মনে করাইয়া দেন: (Lord William Bentinck—Speech on Nov. 8, 1829; quoted from ***Speeches and Documents on India Policy***, Vol. I, P, 215, Ed. A. B. Keith দ্রষ্টব্য।) 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ত্রুটি আছে সত্য; তবু ইহার দ্বারা জনগণের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশালী বড় একদল ধনী ভূস্বামী সম্প্রদায় তৈয়ারী হয়। ইহাতে এই একটি বিরাট সুবিধা হইয়াছে যে—যদি বিস্তৃত গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লবের ফলে শাসনকার্যের নির্বিঘ্নতার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা তৎপর থাকিবে।"

পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনে কিন্তু কৃষি-সমাজের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হইল। কারণ (১) মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে জায়গীরদারেরা প্রায় আধা স্বাধীন সামন্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন—সেই সব বুনিয়াদী বংশের আরও পতন হইল। (২) টাকাওয়ালা 'দেওয়ান' 'গোমস্তারা' কোম্পানির প্রভুদের কৃপায় এই মুনাফার ব্যবসায়ের মালিক হইয়া নতুন জমিদার গোষ্ঠীর পত্তন করিলেন। ইহাদের অর্থলোভ স্বভাবতই ছিল অপরিমিত। কারণ অনেকেই ছিলেন কোম্পানির নায়েব সুবার অনুচর, দালাল, বেনিয়ন, মুৎসুদ্দি; বাজারে বন্দরে সেদিন ইহারা ভাগ্যান্বেষণে জুটিয়াছিলেন। সেদিনকার ইংরেজ 'কুঠি'র কাণ্ডই মানদণ্ডই ছিল ইহাদের নিকট প্রধান। ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীর পদবীতে উন্নীত হইবার আশা তাঁহাদের ছিল না, সেই আভিজাত্যের মানদণ্ডও তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। শোভারাম বসাক, বতু সরকার, গোবিন্দ মিত্র প্রভৃতি (১৭৫৭) প্রধানগণ পোষ্য অনুচর ও বাইজীর নামে টাকা মারিতে দ্বিধা করিতেন না—তাঁহাদের নীতিজ্ঞানে উহা দোষবহ ছিল না। (***Long-Selection from the Records of the Government***, No, 354, 358 ও 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের কৃপায় একেবারে সেই অভিজাত পর্যায়েই এই শ্রেণীর স্থান পাইবার সুযোগ হইল জমিদার রূপে, অথচ মুনাফার হিসাবেও জমিদারী তাঁহাদের নিকট অত্যন্ত লোভনীয়।

ইহারও আবার ফল যাহা দাঁড়াইল তাহা বুঝিবার মত। প্রথমত, যে সব পুরানো ঘর পুরানো সমাজ ও বাস্তব সংস্কৃতি পোষণ করিতেন তাঁহারা লোপ পাইলেন। নতুন জমিদারেরা শিক্ষায় (অথবা উহার অভাবে), রুচিতে (উহারও অভাবে) সেই পল্লী-সংস্কৃতিকে পালন করিতে পারিলেন না। খালবিল নদীনালা মজিয়া চলিল, পথঘাট জল সংরক্ষণের ও নিষ্কাশনের নালাগুলি, এই সবের দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা শহরের মানুষ, কাজেই পল্লী-সংস্কৃতির সমাদর বুঝিতেনও না।

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দূরে দূরে গ্রামে জমিদারীর মধ্যে বাস করিতেন—যেমন বরেন্দ্র ভূমির জমিদারেরা—তাঁহাদেরও ক্রমেই চোখ পড়িল সাহেবদের ও কোম্পানির কায়দার দিকে। সর্বত্রই কৃষি-সংস্কৃতির ক্রমশ দুর্দিন আসিল। কারণ, প্রথমত ছিল নতুন নিষ্ঠুর করভার, দ্বিতীয়ত পূর্তাভাবে কৃষির অব্যবস্থা। তৃতীয়ত, কৃষকের সহিত ব্যবহারে নতুন জমিদারেরা কোনো পুরাতন সম্পর্কের মর্যাদা রাখিলেন না। 'খাজনা দেও, নজরানা দেও, আবওয়াব দেও, না হইলে উৎসন্নে যাও'—অর্থাৎ বিলাতী বণিক্‌রাজের যেমনিতর নীতি, তেমনিতর তাহাদের দালাল দেশীয় জমিদার বেনিয়ানদেরও নীতি হইয়া উঠিল। পরবর্তীকালে ইহাদের উত্তরাধিকারিগণ অবশ্য আবার পূর্ব-পুরুষের সেই দালালী-মনোবৃত্তি ছাড়িয়া নতুন আভিজাত্যরীতির চর্চা করেন। ফলে তাঁহারা আবার দেশে নানা পর্যায়ের তালুকদার, জোৎদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীর ও মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইংরাজ যুগের ভূমি-ব্যবস্থায় ১৮০০ সনের পূর্বেই যে আঘাত পল্লীকেন্দ্রিক কৃষি-সমাজ লাভ করিল তাহা প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্য নয়—আর কাহারও সে ইচ্ছাও ছিল না।

এই সঙ্গেই এই ভূমি-ব্যবস্থার দ্বিতীয় ফলটিও উল্লেখযোগ্য: কোম্পানির এই বেনিয়ান, মুন্সী, মুৎসুদ্দি, দেওয়ান—ইঁহারা দেশের নতুন ব্যবসায়িরূপে দাঁড়াইতেছিলেন। ইঁহারাই স্বাভাবিক বিকাশের পথ পাইলে বাণিজ্যে ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠিলাভ করিতেন—বণিক ধনিকে পরিণত হইতেন। পূর্ব যুগের সওদাগরী পুঁজি ইঁহাদেরই চেষ্টায় 'বণিক পুঁজি' হইবার কথা। কিন্তু বিদেশী বণিক্‌রাজের আওতায় ইঁহারা প্রথমত রহিলেন দালাল শ্রেণীর ব্যবসায়ী হইয়া। তারপর দেখিলেন দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির একচেটিয়া, দেশীয়দের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ, অথচ বহির্বাণিজ্যেই আসল লাভ। অন্যদিকে অন্তর্বাণিজ্যে, অর্থাৎ ব্যবসায়পত্রেও তাঁহারা আবার দেখিলেন, কোম্পানির রাজত্বে তাহার জুলুমবাজ সাহেব কর্মচারীরা বড় বড় দিকগুলি দখল করিয়া বসিয়াছেন। অতএব, বাধ্য হইয়াই দেশীয় ব্যবসায়ীরা অনেকটা ব্যবসায়পত্র ছাড়িয়া বাড়িঘর, জমিজমায় টাকা খাটাইতে লাগিলেন। পরের দিকে 'কোম্পানির কাগজ' ও তাই ইহাদের নিকট একটা লোভের জিনিস হইল। এমনি অবস্থায়—যখন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' তাঁহাদের একই কালে মুনাফা ও আভিজাত্যের পথ করিয়া দিল তখন—দেব, মিত্র, সিংহ, বসাক, শেঠ, মল্লিক, শীল সকলেই জমিদার হইতে চলিলেন। ইঁহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিলি ও সাহা ব্যবসায়ীরাও পরবর্তী সময়ে 'জমিদারবাবু' হইতে লাগিলেন। অন্যদিকে প্রদেশান্তরের ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে বাঙলার অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন; —তাঁহাদেরও দুই চারিজন অবশ্য জমিদার হইলেন। বাংলার ব্যবসাপত্র চলিয়া গেল এই ভিন্ন প্রদেশীয়দের হাতে। সেই ব্যবসা ক্ষেত্র হইতেই অন্যান্য প্রদেশের মত এখানকার সেই মাড়োয়ারী ধনবান্ ব্যবসায়ীরাও ধীরে ধীরে শিল্পপতি ও পুঁজিপতি হইতে পারিয়াছেন। অন্যদিকে বাঙলার বাতিল জমিদার শ্রেণীর তদুপযোগী শিক্ষাও নাই, পুঁজিও নাই, জমিদারী হারাইলেও ধনিক হন নাই।

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমি ব্যবস্থায় দেড়শত বৎসরে বাঙালী ব্যবসায়ী আর রহিল না, বাঙলার ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যান্বেষীরা—বাঙালী হাইকোর্টের জজ হইতে বাঙালী পশ্চিমের কমিসেরিয়েটের জোগানদার এবং পূর্ববাঙলার ব্যবসায়ী মহাজন সকলে—শিল্প-প্রচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া রহিলেন। বাঙালী 'স্বদেশী' আন্দোলন করিল, 'স্বদেশী শিল্প গড়িতে পারিল না—ইহাও সেই 'জমিদারী প্রথার' ফল।

কর্ণওয়ালিসী ভূমি-ব্যবস্থার ফল একটু বিশদ করিয়াই বলা হইল। বাঙালীর পক্ষে তাহার গুরুত্ব কাল হইয়াছে। কারণ, ইহার ফলে ব্যবসায়ীরা জমিদার হইল, বাণিজ্যের ও শিল্পের পথে পা'ও বাড়াইল না; অর্ধ সামন্ত জমিদারের সৃষ্টিতে পুরাতন কৃষি-সম্পর্ক পরিবর্তিত হইল, সৃষ্টি হইল মধ্যস্বত্বের। আর করভারে ও নদীনালার অভাবে, বাঙলার কৃষক-সাধারণ একটা চরম দুর্দশার দিকে চলিল। তাহারই ফলে আবার প্রভাবশালী হইল মহাজন বা সাউকার ও মহাজন-জমিদার শ্রেণী; উহাদেরও টাকা ব্যবসায়ে খাটিত না, খাটিত শেষ পর্যন্ত জমিতে বা জমির উপস্বত্বভোগীদের মধ্যে।

পল্লী-শিল্পের ধ্বংস

এক কথায় জমি ছাড়া টাকা খাটাইবার আর কোনো উপায়ই ইংরেজ বণিক্‌রাজ দেশীয় বিত্তবান লোকদের হাতে রাখিলেন না। ইহাই সাম্রাজ্যবাদের সনাতন নিয়ম। ইহার সঙ্গে আবার স্মরণীয় আরও ভয়ঙ্কর কথা—জমি ছাড়া দেশীয় শ্রমজীবীদের জীবিকারও আর কোন পথ সাম্রাজ্যবাদ উন্মুক্ত রাখিল না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হইতেই বণিক্‌রাজ এখানকার শিল্পীদের ধ্বংস-সাধন করিতে আরম্ভ করেন। এইদিকে তাঁহাদের তখন পর্যন্ত সহায় ছিল—নিজেদের সংগঠনশক্তি এবং নবলব্ধ রাষ্ট্রশক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ আরম্ভ হইতেই বিলাতের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বিলাতের ব্যবসায়ীদের তাড়নায় শিল্পযন্ত্র আবিষ্কার করিতে লাগিল, সেই পাদ উত্তীর্ণ না হইতেই বিলাতের 'শিল্প-বিপ্লব' সম্ভব হইল (১৮১৫)। বণিক্‌রাজ যখন ধনিকরাজ রূপে ভারত-সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন—রাষ্ট্রশক্তি ও যন্ত্রশক্তির যুগপৎ প্রয়োগে আমাদের কৃষি-সমাজের পল্লী-শিল্প দেখিতে না দেখিতে নষ্ট হইয়া গেল। উহার স্থান লইল ইংরেজ পুঁজিদার, ইংরেজ বণিক—ইহারই নাম 'ঔপনিবেশিকতা'। এই কাহিনী আজ এতই সুপরিচিত যে বাড়াইবা বলিয়া লাভ নাই। এই দেশের শতসহস্র নিপুণ শিল্পী দেখিতে না দেখিতে জীবিকা হারাইল—পুরানো শিল্পকেন্দ্র শ্মশান হইল—শিল্পীর দল গ্রামে গিয়া কৃষি সম্বল করিল, জনগণের জীবিকার পক্ষে একমাত্র পথ উন্মুক্ত রহিল—কৃষি। আর সেই কৃষিও রাজা ও জমিদারের অবহেলায় ক্রমশই চরম দুর্দশায় পৌঁছিতে লাগিল, তাহাও আমরা জানি।

এইরূপে জমির নতুন ব্যবস্থায় ও বিলাতের শিল্প-বিপ্লবে—এক কথায় সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়—ভারতীয় কৃষি সমাজ বিনষ্ট হইতে লাগিল, অথচ এদেশে বণিক-সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিল না, বিদেশীয় ধনিকই শাসন ও শোষণ চালাইল।

মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ

ইহার মধ্যে গড়িয়া উঠিল যাহা তাহারই নাম "বাঙলার ভদ্রলোক"। তাঁহাদের জন্ম ও ইতিহাসই "বাঙলার কাল্‌চারের"র জন্ম ও ইতিহাস, তাঁহাদের শিকড় পূর্বে ছিল নবাবী আমলের দপ্তরখানায়, জায়গীরদার ও রাজাদের সভায় এবং আসরে। এইবার তাঁহাদের নতুন শিকড় আঁকড়াইয়া ধরিল নতুন মনিবের নতুন সৌভাগ্যকে; কুঠিতে, কাছারিতে, আপিসে, আদালতে এবং জমিদারিতে বা জমিদারের অধীনে নানা মধ্যস্বত্বে উহার আশা ও আশ্রয় মিলিল। চোখের উপর যখন কোম্পানির রাজত্ব জাঁকিয়া বসিল, তখন পূর্বেকার আমলা কর্মচারীরা ফারসী ছাড়িয়া ইংরেজী ভাষা ও কায়দা-দস্তুর শিখিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিল। কোম্পানিরও প্রয়োজন ছিল এই কর্মচারীদের। এত বড় দেশ বিলাতী কেরানীতে চলিবে না; তাই মেকলে না বলিলেও সৃষ্টি করিতে হইত নতুন বাঙালী কেরানী। অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষার দুয়ার এই মধ্যবিত্ত ভাগ্যান্বেষীদের জন্য উন্মুক্ত হইল। অন্য-দিকে যেভাবে ইংরেজের প্রথম প্রসাদপ্রার্থীরা কলিকাতায় "বাবু" রূপে জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই দেশের ভাগ্যান্বেষীরা বুঝিতে পারিলেন—উন্নতির পথ ইংরেজের কুঠি ও কাছারির আনাচে-কানাচে; উন্নতির উপায় যে করিয়াই হউক ইংরেজের প্রসাদলাভ, আর উহার একটা সহায় ইংরেজি বাং, ইংরেজি কায়দা।

অবকাশের বিলাস

একদিকে 'বাবুর' যুগ ও অন্যদিকে অবকাশরঞ্জনের প্রয়াস, উহাই "বাঙলার কাল্‌চারের" প্রাথমিক নমুনা। বেনিয়ন মুৎসুদ্দির যুগটা তাহার অবতরণিকা স্বরূপ। সে পর্বের ইতিহাস

বিশদ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। 'ময়না', 'বুলবুল', 'আখড়াই গান', আর সর্বশেষে 'কানন ভোজন' ইহাই 'বাবুদের' বিলাস; আর তাঁহাদের উপজীব্য ব্যবসায় কিংবা চাকুরি কিংবা শহরের জীবিকার নানা রকমের সুরঙ্গ পথ,—বাঙলার 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' সেই সব সকলের গোচর করিয়া দিয়াছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাহার চিত্র তুলিয়া দিয়াছেন। আমাদের জন্য "বাবুর যুগ" চিরস্থায়ী হইয়া আছে 'নববাবুবিলাসে' (১৮২১-২৩), 'কলিকাতা কমলালয়ে' (১৮২৩) আর বাঙলার সাহিত্যের চিরগৌরব 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়'-(১৮৬১-৬৪; হুতোমের চিত্রিত কাল একটু পূর্বেকার হইতে পারে—আনুমানিক ১৮৪৬-৬০)। রামমোহনী পর্ব ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-পর্ব জুড়িয়াও এই বাবুদের দিন চলিয়াছিল; অবশ্য নতুনের বীজও তখনই উপ্ত হইতেছিল হিন্দুকলেজ আশ্রয় করিয়া।

তখন কেহবা কোম্পানির কর্মচারীরূপে নানাভাবে অতুল বৈভবের মালিক হইয়াছেন (যেমন স্বয়ং রামমোহন), কেহবা কোম্পানির সাহেবদের হৌসে বেনিয়ন হইয়া ধনে মানে বড় হইয়াছেন। কিন্তু সকলেই ব্যবসায় ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধায় সকলেই জমিদারী জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। (যেমন স্বয়ং রামমোহন ও তাহার বংশধরগণ)। সুখের ও সখের মধ্যে তখন তাহাদের অকর্মণ্য বংশধরদের "বাবু-বিলাস" ছাড়া আর কী-ই বা করিবার ছিল?

অবশ্য যাঁহারা গুণবান্ তাঁহারা এই অলস দিনরাত্রি অন্যভাবে সার্থক না করিতেন তাহা নয়। তাঁহাদের 'অবকাশ-বঞ্জনী' জীবনযাত্রার হিসাব লইলে দেখিব, উঁহাদের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন বিলাতের হুইগ্‌গণ (Whig)। টাকা-কড়ি, বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, শহরের উপকণ্ঠে একটু নিভৃত নিবাস, আর নানাবিধ অবকাশ-বঞ্জনী অনুশীলন,—পাল্‌কী, বেয়ারা, চোপদার, হলঘরে বড় তৈলচিত্র, ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রের প্রতিলিপি—ইঁহারা যেন এই সব দিয়া ইংরেজ শাসকদের নিকট প্রমাণ করিতে বসিয়াছিলেন, 'আমরা তোমাদের হুইগ্ ভূস্বামীদেরই সগোত্র।' মিথ্যা নয়, বিলাতের 'হুইগ্' অভিজাতরাও অনেকেই এমনি বণিক্-বংশের বংশধর ছিলেন। কিন্তু বিলাতের হুইগ্‌রা ছিলেন সমাজের বিপ্লবী শক্তি, তাঁহারা তাঁহাদের সমাজে শিল্প-বিপ্লবের ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন। ধনিক-সভ্যতাতে তাঁহারাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেন। সমাজে তাঁহাদের দায়িত্বও ছিল, অধিকারও ছিল। আমাদের অবকাশ-কুশল অভিজাতের পক্ষে ইহার কোনোটাই খাটিত না—ব্যবসায় ছাড়িয়া এক আধাসামন্তযুগে তাহারা ঠেকিয়া গিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় হুইগ্‌দের অনুরূপ দায়িত্বও তাঁহাদের ছিল না, অধিকারও ছিল না। এ শুধুই 'নকলের নাকাল'।

অথচ অবরুদ্ধ জীবন চেতনা প্রকাশ ক্ষেপণের আর কোনো পথই পাইল না—হয় 'বাবু-বিলাস', নয় 'অবকাশ-বিলাস'। এই অবরোধের পীড়ায়ও কিন্তু ইঁহারা স্বদেশ-প্রীতিতে বিশেষ উদ্বুদ্ধ হন নাই। কারণ ইঁহাদের নিকট ব্রিটিশ শাসনই সৌভাগ্যের মূল,—কর্ণওয়ালিসের আশা তাই সফল হইতেছিল। রাজা রাধাকান্ত মোটের উপর রক্ষণশীল (—Tory); তিনিও 'ব্রিটিশ রাজের বিশ্বস্ত প্রজা' বলিয়া গর্ব করিতে ব্যস্ত। সিপাহী বিদ্রোহের দিনে উত্তর ভারতের পুরাতন সামন্ত অভিজাত শ্রেণী শেষবারের মত আপনাদের অধিকারের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। তখন বাঙলার এই ইংরেজ-সৃষ্ট নতুন অভিজাত দল গোলাপ মল্লিকের বাড়িতে সভা করিয়া বলিতেছেন—অবশ্য 'হুতোমের' ভাষায়—আমরা 'ম্যাড়া বাঙালী', আমেরিকান হইতে চাই না।

পাশ্চাত্য মানস সম্পদ

জীবনে যাহা তাঁহারা হারাইয়াছেন—যে সামঞ্জস্যহীন জীবনের মধ্যে তাঁহারা আবদ্ধ হইয়া গিয়াছেন—সাম্রাজ্যবাদের সেই দেহ-প্রাণ বিনাশী পীড়া এই অবকাশ-বিলাসীদের বুঝাও সম্ভব হয় নাই, আর তাহা তাঁহারা বুঝিলেনও না। বরং বুঝিল তাঁহারাই যাঁহাদের মেকলে সৃষ্টি করিতে চাহিয়া-

এই বাঙলার কালচারের পর্বগুলি নানাদিক দিয়া আবার মনে করিবার দরকার নাই। পূর্বাপর ঔপনিবেশিক কালচারের অসামঞ্জস্যটা এখন সহজেই আমরা বুঝিতে পারি। যাহা শুধু শিক্ষার মধ্য দিয়া আহরণ করিয়াছি, জীবনক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিতে পারিলাম না,—যে সংস্কৃতির প্রেরণা শুধুই মানস-গত, বস্তুগত নয়,—তাহার স্বরূপ সহজেই অনুমেয়। আভ্যন্তরীণ আত্মবিরোধ তাহাতে রহিয়াই গিয়াছে। প্রেরণা হিসাবে ইহা সত্যই আন্তরিক, কিন্তু ইহার গোড়ায় মাটি ছিল না। সেই গোড়ায় একটা প্রাক্ধনিক দিনের বালুর চড়া পড়িয়াছিল—তাহা হইতেও আমরা রস সংগ্রহ করিতে চাহিলাম নতুন 'জাতীয়তাবোধে' (প্রথম হিন্দু এবং পরে মুসলমান) ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করিতে গেলাম, কিন্তু রসের আসল উৎস ছিল শুধু মনে। প্রাণবান্ মনীষা যেন তাই এই জীবনযাত্রায় কিছুতেই স্বস্তি পান নাই। বিবেকানন্দ তাহারই আঘাতে দরিদ্র নারায়ণের ব্রত গ্রহণ করিলেন। "বাস্তব অবস্থার প্রতি বিপুল অসন্তোষে, জীবনে গভীর অতৃপ্তিতে, ধর্মের সূচনা হয়"—"Religion begins with a tremendous dissatisfaction with present state of things, with our lives…" (Vivekananda)। তাই সেদিন ধর্মের পথই ছিল প্রাণবান্ পুরুষের পথ। কেশবচন্দ্র উহারই মধ্য হইতে একদিকে সমাজ-সংস্কারের যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, আর দিকে সামন্ততন্ত্রের নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন—সমসাময়িক বাঙালী কালচারের শ্রেষ্ঠ প্রতিলিপি ইহাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও এই বিলাতী পিউরিটান সংস্কৃতিকে সেই ধর্মের পথ দিয়াই বাহিত করাইয়া দিলেন। আর পরবর্তী হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করিয়া ভিক্টোরীয় যুগের যুক্তিবাদ ও স্বাজাত্যবোধ এবং বিবেকানন্দের প্রেরণা প্রভৃতিকে সম্বল করিয়া এই ব্রাহ্মসমাজের আসল দাবীই অঙ্গীকার করিয়া ফেলিল।

এই সমস্ত অসঙ্গতির মধ্যে একটা বিরাট ও সামগ্রিক দৃষ্টি লইয়া রবীন্দ্রনাথ উদিত হন—ঔপনিবেশিকতা ছাড়াইয়া যাঁহার দৃষ্টি বিশ্বমানবতার দিকে পৌঁছায়—এবং পারিপার্শ্বিক কারণে ইহাও কতকটা অস্পষ্ট থাকিয়া যায়!

একবার বাঙলার কালচারের নানাদিককার রথীমহারথীদের নামগুলি স্মরণ করিলেই এবার বুঝিতে পারিব—ইহা তাহাদেরই কালচার যাহারা ইংরেজী বুর্জোয়া শিক্ষার রসাস্বাদন করিল; আর তাহাদের আসনও আমাদের বাঙলার অর্ধসামন্ত বিত্তবানদের সঙ্গেই; আর এই মানসিক ঐশ্বর্যের জন্যই এই অর্ধসামন্ততান্ত্রিক সমাজে তাহাদের স্থান হইল সেই সম্মানিত পংক্তিতে। মধুসূদন পাইক-পাড়া-জোড়াসাঁকোর জমিদারদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। হেমচন্দ্রেরও সে মর্যাদালাভ ঘটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের কথা উঠেই না,—নোবেল প্রাইজের সম্মান যদিও তাঁহাকে ঔপনিবেশিকতার যুগের স্বদেশীয়দের চোখে আরও সম্মানিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবনে অন্য বাঙালীরা কেহ ডেপুটি, কেহ উকীল, কেহ ব্যারিস্টার,—দুই একজন মাত্র জমিদার শ্রেণীর;—মোটের উপর মধ্যবিত্তের উপজীবিকা ইহাদের প্রধান সম্বল। তথাপি এই বুর্জোয়া-প্রেরণাকে বাঙালী মধ্যবিত্ত আপনার করিয়া লইলেন আপনাদের মানসিক চেষ্টায়। বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙলার সাহিত্য পরিষদ, বাঙলার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, কলেজ, হাসপাতাল সব কিছুই সেই উপজীবিকাবলম্বী বাঙালী চাকরে, উকীল, ব্যারিস্টার ও দুই-

বিরোধিতা করিয়াছেন। (৪) যে মুষ্টিমেয় বাঙালী মুসলমান জনকয় অভিজাতদের বংশধর না বড় সওদাগর বণিকের বংশধর ছিলেন তাঁহাদের অবশ্য বরাবরই আদর্শ 'নবাবী'—অর্থাৎ [illegible] সামন্তদের আদব কায়দা গোলাম-বাঁদী, বেগম-জেনানা লইয়া তাঁহারা এমনই একটা জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়া বসিতেন যাহাতে আধুনিক শিক্ষা ও উহার জীবনাদর্শ গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। ইহাকে 'ওহাবি প্রতিবাদ' বলিয়া ভুল করা ঠিক নয়। মোটামুটি তবু এই 'ওহাবি প্রতিবাদ, 'নবাবী আয়েস' ও দারিদ্র এবং গ্রামীণতার সম্মেলিত ফলে বাঙালী মুসলমানের মধ্য হইতে তেমন 'মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী' তখন উঠিতে পারে নাই। ইং ১৯২১-এর পর হইতে তাহার উত্থান—নানা সুবিধা লাভে তাড়াতাড়িই এই উত্থান ঘটিয়াছে। সেই নতুন মুসলমান মধ্যবিত্ত এই 'বাঙলার কালচারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন (দ্রষ্টব্য মৌঃ মুজিবর রহমান খাঁ ও আবুল মনসুর আহমদ সাহেবদের 'পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির' অভিভাষণ), কিন্তু 'পাকিস্তান কালচার'ও গঠন করিবার মতো বাস্তব ও মানসিক অবস্থাও তাঁহাদের ছিল না। তাই পূর্ব পাকিস্তানে আজ তাঁহারা অ-বাঙালী ঔপনিবেশিকদের শোষণে নিষ্পিষ্ট. এবং উহার বিরুদ্ধে বাঙলা সংস্কৃতি-গঠনের সঙ্গে সেই ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। এই পথেই তাঁহারা আত্মস্থ হইতেছেন।

একজন অর্ধসামন্ত জমিদারের সৃষ্টি। বাঙলার শিল্পপতিরা সাহেব, তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন বিলাতের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান। তাই বাঙালীর এই কাল্‌চার, এমন কি বিজ্ঞানের গবেষণা পর্যন্ত, মানসিক ক্ষেত্রেই, প্রায় সীমাবদ্ধ।

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব বিকাশ-পথ রুদ্ধ হয় নাই। একদিকে এই পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতি, অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের মানসিক সম্পদ; একদিকে সামন্ত-নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা, অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় ভিক্ষানীতির স্বদেশীতে অরুচি; তৃতীয়ত, আপন পারিবারিক ধারারও বিশিষ্ট দান;—এই সবলের পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছিল রবীন্দ্রনাথে। তাই তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, শ্রেষ্ঠ মানবধর্মী কবি—ব্যক্তি-সত্তার শ্রেষ্ঠ মহিমা তাঁহারই কণ্ঠে উদ্‌গীত হইল। তবু তাঁহারই জীবনকালে স্পষ্ট হইয়া উঠে—কত সামান্য বনিয়াদের উপর বাঙলার এই কাল্‌চার গঠিত। উহার গোড়াকার 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রার' মুক্তিকাহীন শুষ্কতা ক্রমশ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় এত বাড়িল যে জীবিকার জন্য কেরানীশালায় স্থান হইল না। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরে বাঙালী শিক্ষিতদের শ্রেণীতে বেকার-দশা গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। 'ভদ্রলোকের' জীবিকায় প্রবল দাবীদার হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল নব্য শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, নবজাত মুসলমান মধ্যবিত্ত (ও মুষ্টিমেয় নিম্নবর্ণ শিক্ষিত হিন্দু)। এই মধ্যবিত্তের চাকরির কাড়াকাড়িই মূলত বাড়িতে বাড়িতে দাঁড়াইল সাম্প্রদায়িক মারামারিতে। ১৯২১এর পর হইতে তাই বাঙালী 'ভদ্রলোকের' মনে মধুসূদন-বঙ্কিম যুগের সেই প্রবল আত্মবিশ্বাসের স্থান কোথায় ছিল? সবল মানসিকতা আর তখন টিঁকে নাই। তাহার পল্লীসভ্যতা তখন একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছে, অনেক পূর্বেই ব্যবসাব ক্ষেত্রে তাহার স্থান সে নিজেই ত্যাগ করিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও তাহার আসন ধসিয়া যাইতেছে। এদিকে শিল্পক্ষেত্রে নিজের প্রবেশপথও তাহার অগোচর। যে কাল্‌চারের গোড়ায় উপকরণগত স্থিরতা নাই, যাহার পরিবেশে সমাজগত পুষ্টি নাই,—শুধুমাত্র একটা মানসিক আবেগকে সম্বল করিয়া মাত্র জনকয় চাকুরের ও উকীলের ডাক্তারের প্রয়াসে যাহা রূপ পাইয়াছিল, সেই 'বাঙলার কাল্‌চার' যে ঊনিশ শত ত্রিশের পরে তাহার শেষ পাদে আসিয়াই পৌঁছিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ ছিল না। বাঙলার ভদ্রলোক শ্রেণীর শেষ সার্থকতা ঘুচিয়া গেল স্বাধীনতা আন্দোলনেব সাফল্যের সঙ্গে।

কারণ, তৎপূর্বেই তাহার 'ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রা' ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের মধ্যে এক বিদেশী-পুষ্ট শিল্পযুগের (Industrialism) পত্তন হইতেছিল। ভারতবর্ষ শুধু কৃষিপ্রধান দেশ নয়, ১৯২০এর পরে পৃথিবীতে সে শিল্পেও অগ্রসব হইতে চাহিল। সেই শিল্পেরও সর্বপ্রধান উদ্যোগ-কেন্দ্র তখনো বোম্বাই নয়, কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠ। অর্থাৎ এইখানেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি 'লগ্নী পুঁজি' (Finance Capital) শতবাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠে। এণ্ড্রু-ইয়ুল, শ'-ওয়ালেস, বেগ ডান্‌লপ, অক্টেভিয়াস্‌ স্টিল প্রভৃতি ট্রাস্ট, কার্টেল পৃথিবীময় তাহার সম্পর্ক পাতে। কিন্তু তাহার প্রসারে বাঙলার মধ্যবিত্ত বা বিত্তবানদের কোনো প্রসারের পথই হইল না। এদিকে ভূমি-সমস্যার ও ঋণভার-সমস্যার জটিল আবর্তে মৃতপ্রায় পল্লী-সমাজ মরিয়া হইয়া উঠে। তাহারই এক প্রকাশ দেখা দিল বাঙলার কাল্‌চারের বিরুদ্ধে মুসলমান বাঙলার বিদ্রোহে, আর এক প্রকাশ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তায়। ফলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই বাঙলার জমিদারী প্রতিষ্ঠা যাইতে বসিল, মধ্যবিত্তের অদৃষ্টে বেকারত্ব ছাড়া কিছুই রহিল না। শতকরা পঞ্চাশজন কৃষকের তখন জমি নাই। বাঙলার কাল্‌চারের ভবিষ্যৎ তবে কোথায়? পৃথিবী-ব্যাপী ধনিকতন্ত্রের সঙ্কটের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র অন্ধকারে, ঔপনিবেশিক জীবনযাত্রায় তৈলহীন স্তিমিত শিখা নিবিয়া আসিতেছিল; 'ঔপনিবেশিক কাল্‌চারের' আয়ুও শেষ না হইয়া পারে না।

১৯৪৭এর ১৫ই আগস্ট আসিল বাঙলায় বিরোধ ও বিভাগের লিপি লইয়া,—এবং এই মধ্যবিত্ত ঔপনিবেশিক কাল্‌চারের মৃত্যুলিপি লইয়া। বাঁচিতে হইলে তাহাকে এখন নতুন জনশ্রেণীর দানে নতুন জনশ্রেণীর সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হইতে হইবে।

গ্রন্থ-পঞ্জী

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী, বিশেষত বঙ্গদেশের কৃষক, সাম্য, অনুশীলন কৃ[illegible]চ[illegible]।
মধুসূদনের জীবনী (যোগেন্দ্রনাথ বসু) ও মধুস্মৃতি (নগেন্দ্রনাথ সোম)।
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।
বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখা বক্তৃতা পত্র।
রাজনারায়ণ বসুর লেখা।
সংবাদপত্রে সেকালের কথা—সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভারতে জাতীয় আন্দোলন, ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট (ইংরাজী)।
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—সুকুমার সেন
India Today—R. Palme Dutt ('আজকার ভারত')
Imperialism—Lenin
Empire of the Nababs—Hutchinson
Economic History of India—R. C. Dutt
A Sketch of the History of India—Dodwell
Cambridge History of India—Vols V VI
History of Bengal, Vols I & II (Dacca University)
Economic History of Bengal, Vol I & Vol II—N. K. Sinha

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাঃ আধুনিকরূপ

স্বাধীনতার রূপায়ণ

খ্রীঃ ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট ভারতবর্ষে যুগান্তরের সূচনা হইল। সেদিন ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়, বাঙলা দেশ ও পাঞ্জাব বিশেষ করিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। বাঙালীর সংস্কৃতি যে তাহাতে অনিবার্য সংকটের মধ্যে গিয়া পড়িবে, তাহা বুঝিতে না পারার কারণ ছিল না। সেদিন হইতে বাঙালী ভারতরাষ্ট্রে মাত্র একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তায় পরিণত ; পাকিস্তানে সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও সে অবজ্ঞাত। উভয় বাঙলারই সংকট ত্রাণের পথ--প্রথমত ভারতরাষ্ট্রের ও পাক-রাষ্ট্রের এমন গণতান্ত্রিক বিকাশ যাহাতে দুই রাষ্ট্রেই ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতিই নিজ নিজ মহাজাতিক রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীন বিকাশের ও স্বেচ্ছামিলনের অবকাশ লাভ করে, এবং ভারত ও পাকিস্তান দুই মহাজাতিক রাষ্ট্রও আবার স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্রের সূত্রে পূর্ণ বিকাশের অধিকারী হয়। এইরূপ বিকাশ যে কী, ইতিহাসে তাহা অপরিজ্ঞাত নয়—গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে শোষণ-হীন সমাজগঠনে রূপায়িত করাই এই বিকাশ, বিজ্ঞান ও মানবতার সমন্বিত সৃষ্টিতেই উহার সম্পূর্ণতা। বলা বাহুল্য, এই কথা বলা অন্যায নয় যে, স্বাধীনতার এইরূপ রূপায়ণ পাকিস্তানের এখনো চিন্তারও বাহিরে পড়িয়া আছে। ভারতের অবশ্য তাহা লক্ষ্যের বাহিরে নয়—'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' যখন (দ্বিতীয় পরিকল্পনা, ১৯৫৬ হইতে) তাহার লক্ষ্য। কিন্তু উহা লাভের জন্য যে আয়োজন ভারত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা অভিনব! পার্লেমেণ্টারি গণতন্ত্রের পথে, 'মিশ্র আর্থিক নীতি'তে সমাজতন্ত্রের বিকাশ—তর্কস্থলে মানিতে পারা যায়—অসম্ভব নয়। কিন্তু কার্যত ইতিহাসে তাহার একটিও দৃষ্টান্ত নাই। বরং কেরালার কম্যুনিস্ট মন্ত্রিমণ্ডলের বিতাড়নের পর সে সংশয় এ দেশে আরও ঘনীভূত হয়। তাহা ছাড়া, নানা উদ্যোগ আয়োজনে ভারত যে ভাবে ঘরে-বাহিরে ধনিক-বাধায় ব্যাহত হইতেছে, তাহাও গুরুতর। অবশ্য সম্প্রতি (২০শে নবেম্বরের মধ্যে) চীনের আক্রমণে ভারতের আদর্শ আরও অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। তথাপি যে ভারতীয় নেতৃত্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় পরিকল্পনা এখনো খর্ব করে নাই, 'সমাজতন্ত্রী ধাঁজের সমাজের' আদর্শ বিসর্জন দেয় নাই এবং পররাষ্ট্রনীতিতেও গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বদ্ধপরিকর, ইহাতে তাহার আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কথাটা স্বীকার্য—এমন সমস্যা পরিকীর্ণ দেশে স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক রূপায়ণও সহজ মসৃণ গতিতে সুসাধ্য হয় না। এই সব কথা মনে রাখিয়াই ভারতের এই আধুনিক রূপের হিসাব লইতে হইবে।

অ-পূর্ণ স্বাধীনতা

গোড়াতেই বুঝা উচিত ১৯৪৭এর পরিবর্তনটা মূলত বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়—প্রথমত ও প্রধানত উহা ছিল রাজনৈতিক। অবশ্য শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহা সীমাবদ্ধ থাকিত না, এবং তাহা থাকেও নাই। সম্পূর্ণ না হউক, সে রাজনৈতিক পরিবর্তন অংশত ভারতীয় জনগণের বিপুল ও সুদীর্ঘ বিপ্লবাত্মক প্রয়াসেরই পরিণতি ; এবং, সম্পূর্ণ না হউক, সেই পরিবর্তনে ভারতীয় সামাজিক শক্তিরও আংশিক প্রতিষ্ঠালাভ অবশ্যম্ভাবী। তবে ১৯৪৭এর পনেরই আগস্ট সামাজিক শক্তির যে সম্পূর্ণ জয়লাভ ঘটে নাই, তাহাও ঠিক। সমাগত বিপ্লবকে অসম্পূর্ণ রাখিবার প্রয়োজনেই ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদ পনেরই আগস্টের ব্যবস্থা অতি দ্রুত প্রণয়ন করিয়া ফেলে। সাম্রাজ্যবাদের চরম সর্বনাশের মুখে যতটা সম্ভব নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা ছিল তাহাদের তখন মূল লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক বিত্তবান নেতৃশ্রেণীর অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করা সাম্রাজ্যবাদের সনাতন নীতি; এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া দেওয়া, ইহাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বার্থের দিক হইতে ১৯৪৭এর ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রধান কূটনীতি। তাহাদের আশা ছিল ভারতের ও পাকিস্তানের দুই বিরোধী নেতৃগোষ্ঠী তখন হইতে দুই রাষ্ট্রের সৈনিক ও পুলিশ হাতে লইয়া পরস্পরকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমাগত দুই-পক্ষই একই রূপে ব্রিটিশ শক্তির কৃপাপ্রার্থী হইয়া থাকিবে। তাহা ছাড়াও, ১৯৪৭এর ব্যবস্থা মত উভয় রাষ্ট্রেরই অভ্যন্তরে রহিল সামন্ততন্ত্রী রাজন্যগণ, তাহারা প্রত্যেকে স্বাধীন এবং প্রত্যেকে ব্রিটিশ শক্তির অনুচর। অর্থাৎ পনেরই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতাও এইরূপে অনেক দিকে খর্বিত ও বহুরূপে কণ্টকিত রহিল, এবং দ্বিতীয় কথা, আর্থিক স্বাধীনতা একেবারে আয়ত্তের অতীত রহিল। আর্থিক স্বাধীনতা লাভ না হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতাও যে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, তাহা এই যুগে পরিষ্কার। তৃতীয়ত, এই যুগে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ স্বদেশীয় কোনো নেতৃচক্রের ক্ষমতালাভ নয়, এমন কি, ১৮৭১এর (ফরাসী বিপ্লবের) ধারণানুযায়ী দেশীয় ধনিকতন্ত্রের বা ন্যাশনাল বুর্জোয়াদের ক্ষমতালাভও তাহা বুঝায় না। কারণ, ইং ১৯১৭এর পরে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়াইয়াছে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক গণতন্ত্র (political and economic democracy) প্রতিষ্ঠা, সমাজতন্ত্রী সমাজের বুনিয়াদি রচনার উপযোগী আয়োজন (creating conditions of socialism)। ১৯৪৭এর পনেরই আগস্টের স্বাধীনতায় কি ভারত কি পাকিস্তান কেহই সেইরূপ অধিকার অর্জন করে নাই।

স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা

কিন্তু ১৯৪৭এর পরেকার কয় বৎসরের ভারতীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের দিকে তাকাইয়া বলা যায়—ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সেই পনেরই আগস্টের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে মোটামুটি স্বাধীনতার উপযোগী বনিয়াদ রচনার কাজে (for creating conditions of independence) বহুলাংশে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে। যথা, সামন্ত রাজ্যসমূহ হস্তগত করিয়া ভারতীয় নেতৃগণ মোটের উপর একটি ঐক্যবদ্ধ ভারত রাষ্ট্র সংগঠিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করিতে পারিয়াছেন। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ বা বৈদেশিক আর্থিক স্বার্থের সহিত বিরোধিতা এড়াইয়া এতদিনকার ঔপনিবেশিকতার পঙ্গু আর্থিক জীবনকে ('stunted growth') পরিকল্পনা-সহায়ে (Planned Economy) নবায়িত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই বিকাশ সম্পূর্ণ হইলে বলা যাইবে পূর্ণ স্বাধীনতার রূপায়ণ সম্ভব হইতেছে।

বলা বাহুল্য, এই কথা এখনো পাকিস্তানের নেতৃবর্গ সম্বন্ধে বলা যায় না। ভারত অসম্পূর্ণ বিপ্লবের (unfinished revolution) সমস্যাকে সমাধান করিতে সচেষ্ট, কিন্তু পাকিস্তানী নেতৃবর্গ এখনো সে বিষয়ে তৎপর নন।

ভারতের পক্ষে অবশ্য এইরূপ প্রয়াস বিস্ময়কর নয়। বহুদিন হইতে এশিয়ার বিপ্লবী জনজাগরণের এক প্রধান মুখপাত্র ছিল ভারতের স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ। দুঃখের বিষয় মুসলিম লীগের পরিচালিত পাকিস্তানী জনসাধারণের সে রাজনৈতিক ঐতিহ্য বেশি নয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহ্য আর মুসলিম লীগের ঐতিহ্য প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্বজোড়া গণবিপ্লবের ধারা হইতেও ভারতীয় জনসাধারণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। ভারতীয় নেতৃত্ব যতই মুনাফাতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হউক, এশিয়া আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী স্বাধীনতাকামীদের—নব্য চীন, ইন্দোনেশিয়া হইতে মিশর আলজিরিয়া পর্যন্ত সকল জনগণের প্রতি—

উহা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রেও 'পঞ্চশীলের' প্রবক্তা নিরপেক্ষ শক্তিরূপে ভারতবর্ষ যথার্থই বিশ্বশান্তির পরিপোষক।

অবশ্য, ভারতীয় নেতৃত্ব সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ এমত নয়। সে নেতৃত্বের অভ্যন্তরেও দ্বিধাসংশয় প্রবল। কারণ, ভারতের ধনিকগোষ্ঠী অন্যান্য ধনিকগোষ্ঠীর মতই গণবিপ্লববিরোধী। মিশ্র আর্থিক ব্যবস্থায় (Mixed Economy) ও আর্থিক পরিকল্পনায় নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিতেছে বলিয়াই তাহারা আভ্যন্তরীণ উন্নয়নমূলক আর্থিক ব্যবস্থায় (development economy) স্বীকৃত। এজন্যই কংগ্রেস নেতৃত্বের 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁজের সমাজ গঠনে'র (socialist pattern of society) কথায়ও ভারতের ধনিকগণ প্রকৃতপক্ষে গুরুত্ব আরোপ করে না। বিশেষত, মার্কিন প্রভাব এখন আর্থিক সাংস্কৃতিক নানা সূত্রেই পৃথিবীর সব দেশেই সক্রিয়। ভারতবর্ষে জনগণের মধ্যে অবশ্য মার্কিন ধনিকগোষ্ঠীর প্রভাব স্থাপিত হয় নাই। মার্কিন পক্ষ তাই একদিকে ভারতের নেতৃগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তারে উদ্যোগী, অন্য দিকে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তারে সক্রিয়। ফোর্ড রকফেলার ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি প্রভৃতি, কিংবা মার্কিন-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণাদি, শুধু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত প্রদত্ত, এমন নয়। 'আমেরিকান লবি' কথাটি নয়াদিল্লীতে সুপরিচিত। কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, জনসংঘ, পি-এস-পি, এমন কি উচ্চ রাজনৈতিক মহল হইতে ভারতীয় ধনিক-মহল পর্যন্ত সেই 'লবি' বিস্তৃত। বিশেষত বিড়লা গোষ্ঠীর সাংবাদিক ও অর্থনৈতিক প্রচারকদের কংগ্রেসের সহিত যতটা যোগাযোগ, আমেরিকান লবির সহিত যোগাযোগ তদপেক্ষা বেশি। ভারতীয় অর্থনীতিকে এইসব গোষ্ঠী ইঙ্গ মার্কিন নেতৃত্বে ঔপনিবেশিকতার খাতে ধরিয়া রাখিয়া প্রধানত কৃষি উন্নয়নের খাতে বহাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল—অনুন্নত দেশের মৌলিক শিল্পায়ন তাহাদের অভিপ্রেত নয়। এশিয়ার জন্য প্রণীত 'কলম্বো প্ল্যানের' মত ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—১৯৫১ এর এপ্রিল হইতে ১৯৫৬এর মার্চ পর্যন্ত—অনেকটা তাহাদের এই উপদেশ মানিয়াই প্রণীত হয়। তখন পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃত্ব প্রধানত দেশবিভাগের পরবর্তী আর্থিক সামাজিক দুর্যোগ কাটাইতে ব্যস্ত ছিল; এ্যাংলো মার্কিন আর্থিক সহায়তা, খাদ্যঋণ প্রভৃতি সেই কারণে তখন অপরিহার্য বলিয়া মনে হইত।

ভারতের পথ ঃ নির্বিরোধ বিকাশ

কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
অপেক্ষাকৃত স্থিরতর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থায় জাতীয় স্বার্থে প্রণীত হয়। উহাতে মূল শিল্প ও ভারী শিল্প গঠনের নীতি গৃহীত হইয়াছিল। অর্থাৎ, নীতির দিক হইতে ঔপনিবেশিকতার খাত ছাড়িয়া ভারতীয় আর্থিক জীবনকে স্বাধীনতার দিকে প্রবাহিত করাইতে আরম্ভ করানোই ইহার অন্তর্নিহিত মূলনীতি ছিল। এইরূপে পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিরচনা হইবে। তবে ভারতীয় নেতৃত্ব তাহা সাধন করিতে চাহিয়াছে যথাসাধ্য নির্বিরোধের পদ্ধতিতে। যেমন, তাহারা এ্যাংলো-মার্কিন ধনিকতন্ত্রের সরাসরি বিরোধিতা এড়াইয়া চলিয়াছে, কারণ ইহাদের সাহায্যের তাহারা প্রার্থী। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী মণ্ডলীরও সহানুভূতি এবং সাহায্য তাহাদের কাম্য। আবার, যথাসম্ভব দেশীয় ধনিকগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করিয়াই তাহারা সরকারী আওতায় শিল্পগঠন করিতে চায়, অথচ জন-সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মূলস্বরূপ আর্থিক প্রয়োজনকেও একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে না। এইরূপে দেখি, ভারতের অভীষ্ট যদিও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অবসান, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির নীতি বা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক হয় নাই। উহা 'মিশ্র অর্থনীতি'র একটা সশঙ্ক আপোষ-রফার নীতি ও পদ্ধতি। কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা এড়াইয়া ইহা স্বাধীনতাকে কতকটা গণতান্ত্রিক ধারায় রূপায়ণের চেষ্টা করিতেছে।

স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৪৮এ এই মিশ্র আর্থিক (Mixed Economy) ব্যবস্থার নীতিকে ব্যাখ্যা করিয়া ভারত সরকার তাহাদের মত ১৯৫৬তে ব্যাখ্যা করিলেন। একমাত্র অস্ত্রশস্ত্র, আণবিক শক্তি, ইস্পাত, লৌহ প্রভৃতি শিল্পেই সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে; কারণ এইসব ক্ষেত্রে ধনিকগোষ্ঠী অগ্রসর হইতে চাহে না, বা পারে না। দ্বিতীয়ত, খনি, এল্যুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতব শিল্প, যন্ত্রপাতি কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায়ও সরকার উদ্যোগী হইবে। সরকার নিজের হাতে এসব ভার ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিবে, তবে ব্যক্তিগত মালিকানাও সেখানে প্রসারের সুযোগ পাইবে। তৃতীয়ত, এইসব বিভাগ ব্যতীত সর্বত্রই ব্যক্তিগত মালিকানার অবাধ ক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ রহিবে। এইরূপ আশ্বাস লাভ করার পরে মালিকগোষ্ঠী, নিজেদের অংশের বায়ভারও যাহাতে বিশেষ বহন না করিতে হয়, তাহার জন্য নানা উপায় গ্রহণ করিল। এই সময়ে তাহারা অনেকাংশে নিজেদের স্বার্থ বিস্তৃত করিতে পরিয়াছে। তাই দেখি একদিকে ব্যক্তিগত-মালিকানার ক্ষেত্র (Private Sector) প্রসারিত করিয়া ও সরকারী ক্ষেত্র (Public Sector) সীমিত করিয়া মালিকদের তুষ্ট করা হইয়াছে, অন্যদিকে ভারী শিল্পের আয়োজনও কিছুটা খর্ব করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক পুঁজিকে সর্বরকম সুযোগ-সুবিধা দিয়া বৈদেশিক কায়েমীস্বার্থ গোষ্ঠীকেও তুষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। অবশ্য তাহারা তাহাতে ভুলিবার নয়, তাই পরিকল্পনার জন্য প্রত্যাশিত বৈদেশিক সাহায্য মার্কিন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুর্লভই রহিয়া গিয়াছিল। 'মিশ্র অর্থনীতি' ও আর্থিক পরিকল্পনা এই দুইটি ভারতের নিজস্ব পথ.—সেই পথে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ গড়া কতটা সম্ভব তাহাই লক্ষণীয়।

আর্থিক পরিকল্পনার অর্থ

বলা বাহুল্য, 'আর্থিক পরিকল্পনা' বলিতে সমাজতন্ত্রীরা যাহা বুঝান ভারতের আর্থিক পরিকল্পনা তাহা নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ১৯২৯এ পরিকল্পনানুযায়ী সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির রূপায়ণে প্রবৃত্ত হয় তখন পৃথিবীর ধনিকতন্ত্রী উন্নত শক্তিরা হাসিয়াই খুন হইয়াছিল। মানুষের সাধ্য কি আর্থিক, সামাজিক নীতি নিয়মকে নিজেদের প্রয়োজনমত পরিবর্তিত করে? সেযুগ অবশ্য এখন চলিয়া গিয়াছে। ধনিকতন্ত্রীরাও এখন পরিকল্পনা দ্বারা নিজেদের ব্যবসা বজায় রাখিতে উদ্‌গ্রীব। তবে এই সব ধনিকতন্ত্রী পরিকল্পনা ও সোভিয়েত পরিকল্পনায় যে মূলগত পার্থক্য আছে তাহা ভুলিবার নয়। সোভিয়েত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল—মুনাফার প্রয়োজনে নয়, সামাজিক প্রয়োজনে উৎপাদন বৃদ্ধি—সমাজের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনশক্তির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। ধনিকদের পরিকল্পনার মূলে উদ্দেশ্য হইল—মুনাফা বজায় রাখা ও বাড়ানো. ধনিকদের অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যথেচ্ছ উৎপাদন একটা সেই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়াও মুনাফার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা; সমাজের প্রয়োজন নয়, মুনাফার প্রয়োজনই ধনিকতন্ত্রী পরিকল্পনার মূল নীতি। কিন্তু মুনাফার রাজত্বে অরাজকতাও থাকিতে বাধ্য—ধনিকে-ধনিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবে, এবং মুনাফার প্রয়োজনেই উৎপাদনশক্তির অপচয়ও এইরূপে ঘটিবে। তাই, ধনিকতন্ত্রী পরিকল্পনা যতই সাময়িক ভাবে সার্থক হোক আসলে উহা অপচয়ের পরিকল্পনা—Planning for planlessness. অপরপক্ষে সোভিয়েত পরিকল্পনার যত ত্রুটিই থাকুক উহা সৃষ্টিমূলক পরিকল্পনা—Creative planning ; সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধ অপসারিত করিয়া সমাজ-শক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করাই উহার কাজ, সমাজের সৃষ্টিশক্তির মুক্তিদানই সমাজতন্ত্রী পরিকল্পনার অর্থ।

আমরা অবশ্য ভারতে ১৯৪৭এর পরেই সমাজতন্ত্র গঠন করিবার মত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারি নাই—তাহা সম্ভবও হইত না। আমাদের প্রথম প্রয়োজন ছিল আধাসামন্ত ঔপনিবেশিক অর্থ-নীতির স্থলে জাতীয় অর্থনীতির প্রবর্তন, এ বিষয়ে সম্ভবত মতান্তর নাই। স্বাধীনতার অর্থই এই যে, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অবসান করিয়া জাতীয় সৃষ্টিশক্তি আত্মবিকাশের অধিকার লাভ করিয়াছে। সৃষ্টিশক্তির এই মুক্তির অর্থ—ভারতীয় জনসমাজের উৎপাদনশক্তির আর্থিক ক্ষেত্রে সার্থকতা, এবং

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞানের অনুশীলনে, তদনুরূপ কুশলতা অর্জন। ভারতীয় আর্থিক জীবনের পক্ষে স্বাধীনতার বাস্তব অর্থ : এক, কৃষিবিপ্লব। উহার অর্থ শুধু জমিদার মহাজনের শোষণের অবসান নয়, (১) কৃষককে জমির মালিক করিয়া কৃষিবিপ্লবের সূচনা, এবং (২) ভূমিসংস্কার-সাধন করিয়া বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালীর প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা, (৩) সমবায়-নীতিতে কৃষক শ্রেণীর আত্মগঠন করা, ইত্যাদি—তাহাতে কৃষি-বিপ্লব সম্পূর্ণ হইত। কিন্তু ভারতে তাহা হয় নাই। দুই, পল্লী-উন্নয়ন ব্যবস্থা ও ক্ষুদ্র পল্লী-শিল্পের ব্যবস্থাপনা করিয়া দেশের বেকার অর্ধবেকার বিরাট জন-শক্তিকে ফলপ্রসূ সামাজিক কার্যে নিয়োগ করা। ইহার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন প্রধানত বিদ্যুৎশক্তির সহায়তা ও সমবায়নীতির সার্থক প্রয়োগ (Electrification ও Cooperatives)। তিন, দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়ন (Industrialization), এবং সেইরূপে শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে প্রথমত গুরু ও ভারী-শিল্পের (basic and heavy industries) পত্তন। অবশ্য, (চার), উহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, এবং ব্যাপক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও কারুশিক্ষার প্রসার ; দেশের চিন্তায় ভাবনায় বিজ্ঞান সম্মত সাংস্কৃতিক আদর্শ স্থাপন। বলা নিষ্প্রয়োজন সকল প্রয়াসের মূল কথা—সর্বদিকে, সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের উদ্যোগ উৎসাহ ; কারণ, জনশক্তির প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিতে না পারিলে জনসমাজের সৃষ্টিশক্তি বিকাশ লাভ করিবে কিরূপে ? কৃষিতে শিল্পে সর্ববিধ ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণকে সহযোগী করিতে হইলে, তাহাদের পরিশ্রম ও ত্যাগ এই বিরাট যজ্ঞে প্রার্থনা করিলে, তাহাদের জীবনধারণের উপযোগী নিম্নতম আয়ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। উহা জনতার উৎসাহ-সৃষ্টির পক্ষে একটি অপরিহার্য বাস্তব শর্ত। সেই নিম্নতম জীবন-মান লাভ করিলে দেশগঠনে, জাতি-গঠনে জনশক্তি স্বেচ্ছায় অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করে,—গত মহাযুদ্ধের কালে যুদ্ধরত ধনিক দেশে ও সমাজতান্ত্রিক দেশে বরাবর তাহা দেখা গিয়াছে। অতএব, দরিদ্রতম জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন, এবং কর্মক্ষম সকল মানুষের কর্মসংস্থান, স্বাধীনতার রূপায়ণেও ইহা প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পরিকল্পনার পথে ভারত

ভারতের পরিকল্পনাকারীরা অবশ্য এইসব কথা চিন্তা করিবার অবকাশ পূর্বেই পাইয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের উৎসাহে প্রথম ১৯৩৮-এ জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় পরিকল্পনা সংসদ গঠন করিয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল ছিলেন উহার সভাপতি। তখন ব্রিটিশ আমল ; সেই সংসদের রিপোর্টসমূহে মহোৎসাহে নানা তথ্য ও নির্দেশ প্রকাশিত হয়। যুদ্ধান্তেও টাটা-বিড়লাদের জাতীয় ধনিকগোষ্ঠীর প্ল্যান রচিত হয়। অন্য ধরনের গান্ধীবাদী প্ল্যানও ছিল—শ্রীমন্ নারায়ণের বোম্বাই প্ল্যান ; উহার লক্ষ্য অবশ্য শিল্পসমৃদ্ধ সমাজ গঠন নয়, বিকেন্দ্রিত ক্ষুদ্র শিল্পের সমাজগঠন। তারপর ১৯৪৭এ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইল। স্বাধীনতা লাভ করিয়া ১৯৫০ সালে কংগ্রেস সরকার পরিকল্পনা-কমিশন নতুন করিয়া নিয়োগ করিলেন। গান্ধীবাদীরা যাহাই চাহুন, সমাজের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের তখন ভুল হইল না। স্থির হইল যে, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিয়া জনসমাজকে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র জীবনের সুযোগ দান করাই হইবে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় যাহাতে অন্তত দ্বিগুণ হয়। ১৯৫০-৫১ সালে মোট আয় ছিল বার্ষিক ৯,১১০ কোটি টাকা, মাথাপিছু আয় বার্ষিক ২৫৩ টাকা। তাহা হইলে মাথাপিছু আয় (টাকার তখনকার মূল্যে) হওয়া চাই প্রায় বার্ষিক ৫০০ টাকা। পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত জাতির মাথা পিছু আয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহা সামান্যই উন্নতি। বিশেষত আমরা যখন প্রতি পাঁচ বৎসরে এক পা এক পা করিয়া পঞ্চ পদক্ষেপ করিব, যাহারা পূর্বেই দশ পা আগাইয়া আছে তাহাদের ততক্ষণে পঞ্চপদ নয়, আরও দশপদ, মোট বিশপদ আগাইয়া যাইবার সম্ভাবনা—অবশ্য যদি আভ্যন্তরীণ বিরোধিতায় বা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

এই উন্নত শক্তিরা নিজেদের শক্তি ক্ষয় না করে।[১] যুদ্ধ না বাধিলে সোভিয়েত ভূমিরও এরূপ উন্নতির সম্ভাবনা, কারণ, আর্থিক অরাজকতা দ্বারা সোভিয়েত দেশের কারু বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক উন্নতি ব্যাহত হয় না। অবশ্য অনুন্নত দেশের পক্ষে প্রথম পাঁচ পদক্ষেপই সর্বাধিক কঠিন কাজ। একবার চলিতে আরম্ভ করিলে আমরা আমাদের বিরাট জনশক্তি লইয়া পরে কাহাকে কাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিব, সামাজিক গতি-বিজ্ঞানের ছাত্র কেন, সাধারণ বুদ্ধির যে কোনো মানুষও তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পাবে। অতএব সমস্যাটা আসলে এই প্রথম যাত্রার—প্রথম পাঁচটি পঞ্চবার্ষিক উদ্যোগের।

এই প্রাথমিক প্রয়াস হিসাবেই ভারতের পরিকল্পনা সমূহ ও কার্যত তাহার উদ্যোগ-আয়োজন বিচার্য। সেদিক হইতে অবশ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে বিশেষ মূল্যবান বলা চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনা—যা ১৯৫৬এর এপ্রিল হইতে স্বাধীনতার রূপায়নের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বপক্ষেও একটা কথা বলিবার আছে। দেড়শত দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ রাজত্বে যেখানে "কিছুই করা যায় না" এই ছিল স্বীকৃত নিয়ম, সেখানে স্বদেশীয় সরকার 'কিছু করা হইবে', এই নীতি মানিয়া লইয়াছিল। যেখানে কিছুই ছিল না, সেখানে যে কিছু হইতেছে, দুইশত বৎসরের অচল অবস্থা ভাঙিবার পক্ষে ইহাই একটা বড় কথা। অবশ্য ২,৩৫৬ কোটির মধ্যে ১,৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যথার্থই দ্রুততর অগ্রগতির উপযোগী ভিত্তি রচিত হইয়াছে কিনা এবং অনুষ্ঠিত আয়োজনের কতটা যথার্থই, পুরাপুরি সম্পূর্ণ না হউক, সেই ভাবী গঠনের দিক হইতে অন্তত পাস মার্ক পাইবার মতও সফল হইয়াছে, তাহা একটা বড় বিচার্য বিষয়। সেখানে কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রহিয়াছে। কারণ, অনেক সরকারী হিসাব কাঁচা হিসাব। সেই হিসাব সত্য হইলেও সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া গিয়াছে, কারণ সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বিশেষ বাড়ে নাই। ধনীরা আরও ধনী হইয়াছে, গরীবেরা গরীব হইয়া গিয়াছে। যাহাই যাউক, দ্রুততর উন্নতির উপযুক্ত বুনিয়াদ প্রথম পরিকল্পনায় রচিত হয়, তাহা মানিয়া লওয়া যাউক। ইহা ধরিয়া লইয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত ও প্রারব্ধ হয়। এবং সেই পরিকল্পনার মোট রূপটি যে স্বাধীনতার রূপায়ণের পক্ষেও বহুলাংশে অনুকূল তাহাও মানিয়া লওয়া যাউক। তারপর দ্রষ্টব্য তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণের প্রয়াস—আবার চীনা আক্রমণও সেই সময়ে বাধা হইয়া উঠে।

পরিকল্পনার রূপ

অঙ্ক ও তথ্য দ্বারাই অবশ্য পরিকল্পনার আয়তন ও আয়োজন বুঝিতে হয়। কিন্তু পরিকল্পনার রূপ বুঝিতে হইলে সেই অঙ্কের অরণ্যে পথ না হারাইয়া, গৌণ তথ্যের বাঁকে বাঁকে দিগ্‌ভ্রান্ত না হইয়া, উহার মূল সত্যকেই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। পরিসংখ্যান ছাপা হইতে না হইতেই বদলাইয়া যায়—কিন্তু পরিস্থিতি তত বদলায় না। তাই অঙ্ককে মূল্যহীন মনে করিলেও তাহার উদ্ধৃতি অনাবশ্যক। মূল সত্য প্রধানত পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়ত পাওয়া যায় বাস্তব উদ্দেশ্যের (objective) হিসাব হইতে। কারণ, অঙ্ক খাতায় থাকে, তথ্যও পরিবর্তিত হয়, মূল উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হয়, অতএব পরিবর্তমান আয়োজনের গতিরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই পরিকল্পনার রূপ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য শেষ হিসাব—কার্যত কী হইয়াছে, খাতার হিসাব মিথ্যাও হইতে পারে।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল নীতি বলা হইয়াছে সমাজতান্ত্রিক ধাঁজের সমাজ-গঠনের অনুকূলনীতি। পরিকল্পনার রূপ বিচারের পক্ষে ঐ কথাটি অবশ্য বিস্মরণীয় নয়। কিন্তু, 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁজের সমাজ' কথাটি অস্পষ্ট। কে এই কথায় কী বুঝেন, তাহার ঠিকানা নাই। অতএব, উহাতে তত গুরুত্ব না দিয়া উহার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহই (objectives) বরং অধিক লক্ষণীয়। সেই প্রধান উদ্দেশ্য কি কি?

প্রথমতঃ, জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি; দ্বিতীয়ত, দ্রুত শিল্পায়ন (industrializa-ation), বিশেষত গুরুশিল্প ও ভারী শিল্পের বিকাশ; তৃতীয়ত, কর্মসংস্থানের বড় রকমের সুযোগ বৃদ্ধি; চতুর্থত, আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস ও আর্থিক শক্তির অধিকতর পরিমাণে সমবণ্টন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে তৃতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কালে সুদীর্ঘ হিসাব দিয়া পূর্ব দুই পরিকল্পনার সাফল্যের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। সেই সব অঙ্ক ও গণনায় প্রবেশ নিরর্থক। শুধু এই জানাই যথেষ্ট যে, প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতিতে জাতীয় আয় শতকরা ১২ ভাগ বাড়িবার কথা ছিল, বাড়িয়াছিল বলা হয় ১৮ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পবৃদ্ধি প্রায় দ্বিগুণ হয়, কৃষি বৃদ্ধিও শতকরা ৪৬ ভাগ হয়, আর জাতীয় আয় শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়—যদিও ২৫ ভাগ বাড়িবার কথা ছিল। ইহা সত্ত্বেও দুই তিনটি কথা বুঝিবার মতো ঃ—

মুদ্রাস্ফীতির ও দ্রব্যমূল্যের কথা মনে রাখিলে বুঝিতে পারিব আসলে আয়বৃদ্ধির হার বেশি নয়।

দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে পরিকল্পনায় বেশি কর্মসংস্থান করিলেও বেকার সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এইরূপ বেকারের সংখ্যা ৯০ লক্ষ ছিল; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১ কোটির অনেক বেশি হইবে; উহার সহিত অর্ধবেকার-দের সংখ্যা যোগ করিলে বুঝা যায় অবস্থা ভয়াবহ।

তৃতীয়ত কথাটি এই 'জাতীয় আয়'। মনে রাখা দরকার—মাথাপিছু গড়পড়তা আয়-ব্যয় কথা দুটি শোষণবাদী ব্যবস্থার একটা ফাঁকি। বিড়লা ও বিড়লার মজুরের আয় মাথা পিছু আয়ের হিসাবে এক সমান। 'জাতীয় আয়ের' মধ্যে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ঢাকা পড়িয়া যায়। তাই, সামাজিক বৈষম্য বুঝিতে হইলে, দারিদ্র্য দূরীভূত হইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে হইলে, নিম্নতম আয়ের, তদূর্ধ্ব নিম্নতর আয়ের, তদূর্ধ্ব নিম্ন আয়ের, বিবিধ আয় স্তর, এবং মধ্য আয়ের, উচ্চমধ্য আয়ের ও উচ্চতর, উচ্চতম আয়ের প্রতিস্তর বিভাগ করিয়া তবেই হিসাব উত্থাপিত করা প্রয়োজন—তাহাতে বুঝা যাইবে জাতীয় আয়ের কত ভাগ পায় জাতির শতকরা ৬০ ভাগ বা কত ভাগ পায় ৮০ ভাগ মানুষ; আর কতভাগ শোষণ করে ঊর্ধ্বস্তরের সামান্য কয়েক হাজার লোক—জাতি যাহার কর্বলিত, সাধারণ মানুষের না, ধনিকদের।

এই হিসাব কিরূপ?

ধনী-দরিদ্রের লাভালাভ

প্রজাতন্ত্র দিবসের (২৬শে জানুয়ারি) পূর্বে শুক্রবার, ২৫শে জানুয়ারি, ভারতের পরিকল্পনা কমিশন বরাবরের মত এক অধিবেশনে দেশের আর্থিক উন্নতির একটি হিসাব গ্রহণ করেন।[১] তাহাতে তাঁহারা যে চিত্র, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের যে সম্ভাবনা দেখিতে পান তাহা কাহারও অকল্পিত ছিল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাইয়া তথাপি কেহ না আঁৎকাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর চলিতেছিল—দেশে যেই হারে

জাতীয় ও মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি পরিকল্পিত তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেও যে হারে লোকবৃদ্ধি প্রত্যাশিত তাহা মনে করিয়া দেখা যাইতেছে—এখন অবস্থা কত কঠিন। কমিশন দেখিতেছেন : (১) এই শতাব্দীর শেষে, অর্থাৎ ইং ২,০০০ সালেও ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশ লোক জীবনধারণের উপযোগী অন্নলাভও করিতে পারিবে না। অবশ্য বর্তমানে দুই তৃতীয়াংশ লোকই তাহা হইতে বঞ্চিত। (২) দেখা যাইতেছে যে 'জাতীয় আয়' বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোকই তাহাতে সুবিধা করিয়া লইতেছে, অধিক সংখ্যক লোকই সেই আয় হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। কমিশনের পরিসংখ্যানের দ্বারা কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

(ক) সমাজের উপরিস্থিত মোট জনসংখ্যার ১০% শতকরা দশজন গ্রাস করিতেছে মোট জাতীয় আয়ের ৩৩.৩, শতকরা একতৃতীয়াংশ ভাগ, এবং এই উপরের দশ জন গ্রাস করে মোট জাতীয় ভোগ্য বস্তুর শতকরা পঁচিশ (২৫%) ভাগ।

অন্যদিকে (খ) নিম্নস্থিত মোট সংখ্যার শতকরা দশ জন (১০%) পায় মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ২½%, আড়াই শতাংশেরও কম। স্বভাবতই এই শতকরা (১০%) দশ জন পায় মোট ভোগ্যবস্তুর তিন শতাংশেরও (৩%) কম।

অর্থাৎ টাকার হিসাবে অবস্থা দাঁড়ায় এইরূপ :

নিম্নতম জনসংখ্যার	১০%	শতকরা	দশ	জনের	মাথাপিছু	আয়	মাসে	৭.০০	টাকারও	কম
ঠিক তদূর্ধ্ব	১০%	"	"	"	"			১০.০০	"	"
আরও ঊর্ধ্ব	১০%	"	"	"	"			১২.০০	"	"
" "	১০%	"	"	"	"			১৫.০০	"	"
" "	১০%	"	"	"	"			১৮.০০	"	"
" "	১০%	"	"	"	"			২১.৫০	"	"
অর্থাৎ শতকরা মোট	৬০%	মানুষ			"	"		২৫.০০	"	"

অথচ, বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করিয়াছেন যে অন্ততঃ মাসে ৩৫ টাকার কম খরচে কাহারও স্বাস্থ্য কর্মশক্তি অক্ষুণ্ন রাখা যায় না। কমিশনও এই কথা অস্বীকার করেন না। তবে তাঁহারা আশা করেন—এখনো না হয় মাসে ২৫ টাকাতেই কোনো রূপে প্রাণধারণ করা চলুক। সেই নিম্নমানে খাইয়া বাঁচিয়া থাকিলেও তাঁহারা দেখিতেছেন আগামী ২,০০০ খ্রীষ্টাব্দেও শতকরা ৩০ জনের মাথাপিছু ২৫ টাকা আয় হইবে না।

কমিশন চাহেন আর্থিক উন্নতির হার এখন শতকরা ৫% ভাগ হইতে শতকরা ৭% ভাগে বাড়াইতে হইবে— যেন অন্তত কেহ অনাহারে না থাকে। অবশ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি উহার একটা প্রধান প্রয়োজন—তাহা ছাড়াও প্রয়োজন আর্থিক বিনিয়োগ (fiscal) নীতির পরিবর্তন, পল্লী অঞ্চলে দ্রুত বিরাট শিল্প সন্নিবেশ ব্যবস্থা, এবং জাতীয় উন্নয়ন 'লেভির' প্রবর্তন।

পুঁজিতন্ত্রী গণতন্ত্রী

উপরের এই হিসাব হইতে ভারতরাষ্ট্রের স্বরূপ, উহার "চরিত্র" বুঝা আর কষ্টকর নয়।

ভারতরাষ্ট্র শোষণেরই প্রশ্রয় দিতেছে, সামন্ততন্ত্রের প্রাধান্য শেষ করিয়া ধনিক-আয়ত্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইয়া উঠিয়াছে। এই বিংশ শতকে বিপ্লবের যুগে ঊনবিংশ শতকের পুঁজিতন্ত্রী প্রথায় শিল্প-বিপ্লব সম্পূর্ণ সম্ভব কিনা তাহা দেখিবার মতো। তবে 'সমাজতন্ত্রী ধাঁজের সমাজ' এই মিশ্র অর্থ-নীতিতে গড়িয়া উঠিতেছে না। শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প দেখিয়া মনে করা উচিত নয় যে, সমাজতন্ত্র বুঝি এই ভাবে নির্মিত হইতেছে। রাষ্ট্র কাহার আয়ত্ত, কোন্ সামাজিক শক্তির, তাহা বুঝিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মালিক কার্যতঃ কোন্ শ্রেণী তাহা উপলব্ধি করা যায়। অথবা, শোষণের হার বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহা দিয়াও বুঝা যায় সমাজতন্ত্রের দিকে সমাজ চলিতেছে, না, ধনিকতন্ত্রের

দিকে চলিতেছে। না হইলে প্রতিক্রিয়াশীল তুর্কী রাষ্ট্রেও শতকরা ২৫% ভাগ শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত, আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প পরিমাণে তদপেক্ষা অনেক কম।

তৃতীয় পরিকল্পনা বড় করিয়াই করা হইয়াছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা স্থির করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় সাড়ে দশ হাজার (১০,৫০০) কোটি টাকা নিয়োগের প্রস্তাব ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রস্তাব—একুশ শত (২১,১৫০) কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনার প্রস্তাব পঁচিশ শত (২৫,০০০) কোটি টাকা বা বেশি নিযুক্ত হইবে। তার শেষে আমাদের মিশ্র অর্থনীতি স্বয়ং চালিত হইতে পারিবে, ইহা আশা করা যায়। তাই তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য বহু পরিমাণে নির্ভর করিবার কথা ছিল বৈদেশিক (বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের) ঋণের উপর। কিন্তু চীনা আক্রমণের (২০শে অক্টোবর) পূর্বেই এই বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়। ফলে বুঝা গেল আমাদের পরিকল্পনার লগ্নীর অর্থ তুলিতে হইবে বহুলাংশেই নিজ দেশ হইতে। পরে আত্মরক্ষার জন্য ব্যয়ও বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়াও, তৃতীয় পরিকল্পনা বহুদিকে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। কি করিয়া উঁহার অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে তাহাও লক্ষণীয়ঃ

(১) জাতীয় আয়ের অংশ সঞ্চয় করিয়াঃ—অর্থাৎ করবৃদ্ধি করিয়া (ক) এই করবৃদ্ধি 'পরোক্ষ কর' রূপে সাধারণ মানুষের বেশি বহন করিতে হইবে। (খ) মালিকশ্রেণীকে প্রত্যক্ষ কর বেশি দিতে বাধ্য না করিয়া তাহাদিগকে ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবে। উহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং শোষণবাদী উদ্যোগের দিকটি প্রসারিত হইবে। অন্যদিকে পরোক্ষ করে শোষিত মানুষ আরও দুঃস্থ হইবে।

(২) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প হইতেও অধিক পরিমাণে অর্থনিয়োগ করিতে হইবে। ইহা কার্যতঃ কতটা সম্ভব বলা দুরূহ। কারণ, রেল ব্যতীত অধিকাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পই এখনো বিশেষ লাভজনক নয়। উহা যে সব ধনিক গোষ্ঠীর অনুচরের দ্বারা পরিচালিত তাহাতে সার্থক না হইবারই কথা। সাধারণ শ্রমিকরা ঐসব শিল্পকে আপনার মনে করিতে পারে না। কাজেই তাহা হইতে আশানুরূপ অর্থ লগ্নী হওয়া কঠিন হইবে। অবশ্য ব্যাংক ও রপ্তানী ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে এই আয় বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাহা রাষ্ট্রীকরণে সরকার অস্বীকৃত।

(৩) বিদেশী ঋণঃ—প্রথমত, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কড়া সুদে ঋণ দিতে চাহে—তাহাও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে নয়, বরং ব্যক্তিমালিকানার উদ্যোগে। কাজেই উহাতেও পুঁজিতন্ত্রই প্রসারিত হইবার কথা। অবশ্য সমাজতন্ত্রী দেশ (সোভিয়েত, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে ঋণ দিতেছে। কিন্তু তাহারা মার্কিন রাষ্ট্র বা পশ্চিম জার্মানির মতো অতো সুসমৃদ্ধ রাষ্ট্র নয়—অতো ঋণদানে সমর্থও নয়।

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা প্রয়োজন—নিশ্চয়ই বৈদেশিক ঋণ আপন আদর্শানুযায়ী কর্মে আপন শর্তানুযায়ী পাইলে তাহা আর্থিক উন্নয়নে পরম আদরণীয়। উহা একেবারে না পাইয়াও অবশ্য সোভিয়েত সংঘ আত্ম-সংগঠন করিয়াছিল। নিশ্চয়ই বাহিরের সহায়তা পাইলে তাহাদেরও শিল্পায়নে আরও বেশি সুবিধা হইত। কথাটা এই—ঋণ প্রয়োজন, কিন্তু আদর্শ বা লক্ষ্যকে বিপন্ন করিয়া নয়। ভারত সেই লক্ষ্য ততটা বিপন্ন না করুক কতকাংশে চাপা দিতে বাধ্য হইতেছে। তাহা ছাড়া, পরোক্ষ করবৃদ্ধি করিয়া অর্থাৎ দরিদ্রকে করভারগ্রস্ত করিয়া পরিকল্পনানুযায়ী শিল্পায়ন করা ভুল নীতি,—তাহা সম্ভবও নয়। দেশের অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইলে ব্যাংক ও প্রধান-প্রধান আয়ের উপায়গুলি (যেমন পাটের, চায়ের রপ্তানি ব্যবসায়) রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া উহার মুনাফাই লগ্নী করিতে হইবে। এইরূপ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পত্তন হইলে পুঁজিতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। 'মিশ্র অর্থনীতি' সমাজতন্ত্রের পথ কতকাংশে প্রস্তুত করিতে পারে—যদি সত্যই পুঁজিতন্ত্রকে তাহা ফাঁপিতে না দেয়।

যাহাই হউক, ভারতের পরিকল্পনায় একটা সংকট দেখা দিতেছিল, তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে। 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁজের' দিক হইতে দেখিলে দেখা যাইত—মিশ্র অর্থনীতি আসলে ভেজাল অর্থনীতি; উহাতে পুঁজিতন্ত্রীদের সুবিধা ও প্রসার ঘটিতেছে, রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানার ক্ষেত্র সে

পরিমাণে প্রসারিত হইতেছে না ; উহাতে শ্রমিকসাধারণের উৎসাহ বাড়িতেছে না। বলা বাহুল্য, স্বাধীন ভারতের সামাজিক চরিত্র আমাদের বিজ্ঞান সাধনায় ও সংস্কৃতি সাধনায়ও প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। খাদ্যে ও ঔষধের মতো সংস্কৃতির রূপায়ণেও ভেজাল জুটিতেছিল। এমন সময় এই সামাজিক পরিস্থিতির উপর চীনা আক্রমণে অভাবনীয় আঘাত পড়িল। তৃতীয় পরিকল্পনা রক্ষার জন্য যতই চেষ্টা করি, প্রতিরক্ষার ব্যয় ও পরিকল্পনার পুঁজি একই সঙ্গে সংগ্রহ করা ভারতীয় জনসমাজের পক্ষে এক অসাধ্য পরীক্ষা। বুঝা যায় বিদেশের সাহায্য গ্রহণ করিতে গিয়া বাধ্য হইয়া স্বদেশে মালিক গোষ্ঠীকে আরও পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। আর দেশের শিক্ষাদীক্ষা কালচার এমন কি, বৈদেশিক নীতিতেও ধনিক গোষ্ঠীর খবরদারি সহিতে হইবে। ইহারও মধ্যে যে, ভারত রাষ্ট্র গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি রক্ষা করিতে সচেষ্ট, পরিকল্পনানুযায়ী শিল্পপ্রসারে, কৃষি উন্নয়নে এখনো প্রয়াসী, উহাই প্রমাণ কতখানি সবল এখনো ভারতের জনসাধারণের জাতীয় চেতনা ; এবং কতখানি সুস্থ প্রেরণা ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনে—কতখানি সম্ভব ছিল ভারতের পক্ষে সুস্থ বৈজ্ঞানিক সম্প্রসারণ, সামাজিক মৌলিক বিবর্তন ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর।

ভারতীয় প্রয়াসের অর্ঘ্য

ভারতের এই স্বাধীনতার রূপায়ণ যে পথে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বিপ্লবের পথ নয়—বিপ্লবের বন্ধুর পথ আমরা গ্রহণ করি নাই। রক্তপাত অনিবার্য না হইলেও বিপ্লবের পথে বিরোধ অনিবার্য। কায়েমী স্বার্থ কখনো বিনা বিরোধে পথ ছাড়িয়া দেয় না। কিন্তু বিপ্লবের পদ্ধতিতে যে বিকাশ ত্বরান্বিত হয়, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সত্য বটে, মৌলিক দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের পথে এখন পর্যন্ত কোথাও সম্ভব হয় নাই। অথচ মৌলিক ও দ্রুত পরিবর্তন চাহিলে ব্যক্তিস্বাধীনতাও অনেক দিকে খর্ব করিতে হয়, মানুষ বড় বেশি রকমে আদেশে-নির্দেশে চালিত হইতে থাকে, ইত্যাদি সত্য কথা। তাহা ছাড়া, এইরূপ বিপ্লব নির্বিরোধে সম্ভব হয় না, কারণ শ্রেণী-বিরোধই উহার পিছনের তাড়না। এই পথে দেশের কায়েমী স্বার্থ ও বিদেশের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামেই অগ্রসর হইতে হয় : কায়েমী স্বার্থকে পরাভূত করিয়া করিয়া বিপ্লবীদের চলিতে হয়। অবশ্য পাশ্চাত্য অর্থ-নীতিজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিয়া এদেশের কোনো কোনো অর্থনীতিজ্ঞ বলেন, সোবিয়েতের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী এই সব সমাজতান্ত্রিক দেশ সাধারণের ভোগ্য পণ্য (consumer goods) বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া রাখিয়া ও উৎপাদন পণ্যে (productive goods) সমস্ত অর্থশক্তি প্রয়োগ করিয়া দ্রুত শিল্পাদি বাড়াইতেছে। এই কথা মূলতঃ সত্য। কিন্তু আত্মগঠনের কালে কোনো সমাজের পক্ষে অন্য উপায় নাই। তাই আমাদের পরিকল্পনা-প্রবক্তা নেতৃবৃন্দও কেহই ইহাকে বিশেষ দোষাবহ বলিয়া মনে করেন না। তবে নির্বিরোধ উন্নয়নের পথই তাঁহারা বেশি সুগম, এবং বাস্তব ও মানসিক আধ্যাত্মিক সর্বকারণে বেশি সুবিধাজনক মনে করেন।

এমন কথা জোর করিয়া বলা অসম্ভব যে, ভারতের এই পথ একেবারেই ভ্রান্ত। তবে দ্রুত উন্নয়নের পক্ষে এইটি প্রকৃষ্ট পথ নয়, তাহা নিঃসন্দেহ। কারণ, দুই একটি মূল কথা বিস্মৃত হইবার নয়। যেমন, আমাদের পরিকল্পনার পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যচতুষ্টয় বিচার করিলে দেখি—প্রথমত, জাতীয় আয় যদি সম্পূর্ণ সুবণ্টিতও হয় তথাপি ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় হইবে ৫৪৯ টাকা। পৃথিবীর অন্য জাতিদের আয় যদি সেই সময়ে বিন্দুমাত্র না বাড়ে, তাহা হইলেও আমরা তখনো থাকিব প্রায় দরিদ্রতম জাতিদের কোঠায়। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ-ক্ষেত্রে ও ব্যক্তি-মালিকানার শিল্পক্ষেত্রে আমরা যেরূপ সমান হারে টাকা খাটাইতেছি, তাহাতে মালিকেরা ক্ষুদ্র শিল্পেই শুধু নয়, গুরুশিল্পেও সুযোগ অর্ধেক ভোগ করিতেছে। তৃতীয়ত, কর্মসংস্থানের হিসাবে দেখি মোটের উপর এখনকার বেকারের উপরেও আরও লক্ষ লক্ষ বেকার বৎসরে বৎসরে বাড়িবে। চতুর্থত,

আয়-বৈষম্য হ্রাস করিবার সংকল্পে কি ফল হইয়াছে? এই বিষয়ে বিষম ব্যর্থতা জমিতেছে। সন্দেহ নাই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এখন পর্যন্ত এই দেশে ধনীই আরও ধনী হইতেছে, দরিদ্র দরিদ্রই রহিয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ এইজন্যই পরিকল্পনাগুলি দেশের জনসাধারণের মন এখন পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। যে কোনো পরিকল্পনারই সার্থকতা নির্ভর করে জনসাধারণের উদ্যম-উৎসাহের উপর, সংকল্প সাধনার উপর, কঠিন পরিশ্রম ও কঠোর ত্যাগের উপর। অথচ, ঠিক এই প্রধান ও প্রাথমিক বিষয়েই পরিকল্পনার রূপায়ণে মারাত্মক ত্রুটি রহিয়া যাইতেছে। অনেক দেশের আর্থিক পরিকল্পনাতেই ত্রুটি কিছু না কিছু থাকে। তাহা শোধরাইয়া লওয়ার মত হইলে জনসাধারণ আপনাদের ত্যাগ ও পরিশ্রমের দ্বারা তাহা শোধরাইয়া লইতে পারে। ভারতের পরিকল্পনাসমূহ অতি বৃহৎ বা অতিরিক্ত আশাবাদী পরিকল্পনা নয়। এই সীমিত পরিকল্পনাতেও অর্থনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিতে পারে—ডেফিসিট ফিনান্স, মূল্যবৃদ্ধি, বৈদেশিক বিনিময়ের ক্রমবর্ধিত সংকট, এবং বৈদেশিক সহায়তার অভাব, প্রভৃতি সমস্যাসমূহ হয়ত তাহার ফল। এ সব অবজ্ঞা করিবার মত নয়। কিন্তু জনশক্তি প্রাণ ভরা আকাঙ্ক্ষাতে সে সব ত্রুটি যে কাটাইয়া ইহাকে সার্থক করিতে পারে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। অথচ এখনো সে লক্ষণ কোথাও দেখা যায় নাই। বরং পরিকল্পনার উদ্যোগাদিতে এখনো জনসাধারণ তেমন উৎসাহ বোধ করে না, ইহাই সাধারণভাবে সত্য। যেটুকু উৎসাহ দেখা যায় তাহা অনেক সময়ে স্থানীয়, ব্যাপক নয়;—কিংবা সাময়িক, দীর্ঘস্থায়ী নয়। চীনের আক্রমণের পর যে দেশব্যাপী গণজাগরণ দেখা দিয়াছিল তাহাও স্থায়ী হইতে পারিল না।

জনশক্তির অবসাদ

১৯৪৭এর স্বাধীনতার পরেও জনসাধারণের মনে এইরূপ যে আশা-উৎসাহের শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ক্রমে স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল। এখনো আবার যাইতেছে। ইহার অনেক কারণ আছে। কিন্তু যে সব কারণে জনসমাজের অবসাদ আসিয়াছে তাহা বুঝিয়া রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, জমিদারী প্রথা রহিত হইলেও এখনো জমি বণ্টন হয় নাই। কৃষক জমি পায় নাই, পাইবে কিনা, কতটুকু পাইবে, তাহাও অনিশ্চিত। জমি সে পায় নাই, ইহাই প্রধান কথা। দ্বিতীয়তঃ, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সব ব্যবস্থা হইতেছে তাহার সুযোগ এখনো কৃষক গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সেচ, সার, বীজ-বিলি প্রভৃতির অব্যবস্থায় ও দুর্ব্যবস্থায় বার্থতঃ বহু পরিমাণে নিরর্থক হইতেছে। বিশেষতঃ রাজনৈতিক দলপুষ্টির জন্য উহা গ্রামের জোতদারের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। চাষী তাহার ফল পায় না। তৃতীয়তঃ, পল্লীশিল্প ও বস্তুশিল্পের আয়োজনে এখন পর্যন্ত গ্রামের প্রায় বেকার ও প্রচ্ছন্ন বেকার জনগণের উপকার হয় নাই। সমবায় নীতির যথার্থ প্রসার হয় নাই। এমন কি, পল্লী-উন্নয়ন-মূলক কার্য প্রভৃতিতে জনসাধারণ নিজেরা আকৃষ্ট হয় নাই—ইহা সরকারী রিপোর্টেও স্বীকৃত সত্য। সমস্তটাই আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। সমবায় পর্যন্ত জোতদার মালিকদের কুক্ষিগত। গ্রাম্য জনতার সংকল্প ও উদ্যোগ তাই এখনো অপ্রকাশিত ও অবিকশিত। সহজ কথাটা এই, ভারতের কৃষিবিপ্লব অসমাপ্ত এবং প্রায় অনারব্ধই রহিয়া যাইতেছে। সে বিপ্লবকে ভিত্তিস্বরূপ করিতে না পারিলে ভারতের শিল্পায়নও ব্যাহত হইবে, অগণিত জনসাধারণের সৃষ্টিশক্তি মুহ্যমান থাকিবে, ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইবে না, শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় অসম্ভব হইবে, এমন কি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ পর্যন্ত বিফলে যাইবে।

ইহার অর্থ এই নয় যে, 'কলম্বো প্ল্যানের' নির্ধারণানুযায়ী কৃষিসংস্কারকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া চলাই আমাদের উচিত ছিল। কারণ, সামাজিক শক্তির মুক্তি ও সার্থকতা কৃষি বিপ্লবেরই অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন, পল্লীঅঞ্চলে শিল্পে বিদ্যুৎ প্রয়োগ ও সেইজন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিল্পের পত্তন, এবং শিল্পবিপ্লবের সূচনাস্বরূপ গুরু

ও মূল শিল্পের পত্তন। ত্রুটি ঘটিয়াছে এইখানে যে, পরিকল্পনার নানা আয়োজনে কায়েমী স্বার্থের সুযোগ ও সহায়তা লাভ যে পরিমাণে ঘটিতেছে, সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্যোগের সহায়তালাভ সেভাবে ঘটিতেছে না। যেমন, সরকারী ব্যয়ভারের চাপ পড়িতেছে সাধারণের উপর। দুর্মূল্যতায় সাধারণ মানুষ দিশাহারা। অথচ পরোক্ষ করের (indirect tax) পরিমাণেও তাহারাই প্রপীড়িত। অন্যদিকে আয় কর, সম্পত্তি কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতিতে ধনিকের প্রদেয় অংশ হইতে সরকার কোটি কোটি টাকা বঞ্চিত হয়। এই ধনিক পোষণের নীতিতে ও বঞ্চনার বাহুল্যে সাধারণ মানুষ আরও বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপর প্রতিদিকেই তাহারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দেখে—পরিকল্পনার নামে শাসকগোষ্ঠীর অপচয়, ধনিকশ্রেণীর লুণ্ঠন, চারিদিকে চোরাবাজার। দেখে কর্মচারী-গোষ্ঠীর অকর্মণ্যতা ও অসাধুতা। আর দেখে তাহাদেরই পরিচিত নেতৃগোষ্ঠীর দুর্নীতি, অপদার্থতা, আত্মীয় পোষণ, স্বার্থপর অর্থগৃধ্নুতা, বিলাস-ব্যসন, ঔদ্ধত্য ও বেপরোয়া লুণ্ঠন। তাই সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইতেছে যে, পরিকল্পনা হউক আর যাহাই হউক, সাধারণের স্বার্থে কিছুই হইতেছে না; মুষ্টিমেয় ফন্দিবাজের স্বার্থেই সব চলিতেছে। ইহাই হয়ত ভারতের পরিকল্পনার দিক হইতে সর্বপ্রধান সংকট এবং ভারতের ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের পক্ষে সর্বাধিক কলঙ্কের কথা: **সাধারণ মানুষ তাহাদের পরিকল্পনায় আস্থা পোষণ করে না বা করিতে ভরসা পায় না।**

সত্য সত্যই তাই শুধু অর্থব্যয়ের হিসাব দিয়া ভারতের পরিকল্পনার সার্থকতা বা ব্যর্থতা পরিমাপ করিবার উপায় নাই। কারণ, পঞ্চাশ বা ষাট কোটি টাকার কাজ যদি একশত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সমাপ্ত হয়, বাকিটা যায় অপচয়ে ও লুণ্ঠনে,—সেই পঞ্চাশ কোটি টাকার কাজ যদি কাঁচা কাজ না-ও হয়,—তাহা হইলেও টাকার হিসাব যাহাই বলুক, উৎপাদনের গণনায়, সম্পদসৃষ্টির গণনায়, সেই কাজকে সার্থকই বলিতে হইবে। অবশ্য প্রত্যেক প্রয়াসেই কিছু অপচয় হইতে পারে। কিন্তু দামোদর উপত্যকা, হীরাকুঁদ বাঁধ প্রভৃতি নানা ব্যাপারে অর্থের অপচয় যে বেশিই হইয়াছে তাহা মিথ্যা নয়। তাহার পর, সেই দামোদর উপত্যকার বিদ্যুৎ নতুন শিল্পে ব্যয়িত না হইয়া ধনিক কোম্পানীর মুনাফা বাড়াইয়া শহরে শহরে চড়া মূল্যে বিক্রয় হইলে, ময়ূরাক্ষীর সেচের জলের দাম ক্ষুদ্র দরিদ্র চাষীর আয় বাড়াইতে বাধা দিলে, সে সব প্রয়াসকে খাতাপত্রে যাহাই বলা হউক, সাধারণ লোক 'লুণ্ঠনের পরিকল্পনা' বলিয়াই ভাবিতে আরম্ভ করিবে। সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যখন উচ্চতম নেতারাও (যেমন, বিলাতের জীপ্ ক্রয়, রাইফেল ক্রয় প্রভৃতির অপচয়ে ও দেশে জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের টাকার লগ্নির ব্যাপারে) সেই সব দুর্নীতি ও অপচয়ের অভিযোগ ধামা-চাপা দিতে চেষ্টা করেন। রাঁচীর ভারী শিল্পের অন্তর্ঘাত চোখে আঙুল দিয়াই দেখাইয়া দিতেছে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কী ভাবে চলে। বৃটিশ সরকারের লুণ্ঠন ও অপচয় জনসাধারণ ধরিয়া লইত বৈদেশিক শাসনেরই অঙ্গ। কিন্তু স্বদেশীয় শাসনে সেইরূপ লুণ্ঠন দেখিলে দেশের মানুষের ক্ষোভ দশগুণ বৃদ্ধি পায়। দুইদিনে তাহা সকলেই জানিয়া ফেলে, আর তাহা সাধারণের মনে একটা ক্ষোভ, অশ্রদ্ধা ও হতাশার সৃষ্টি করে। এ কথা আজ তাই অনেকের মুখেই শোনা যায়—আমরা স্বাধীনতার অযোগ্য। চীনা আক্রমণের পরে বিভ্রান্ত ভারতীয়দের মুখে আরও হতাশার কথা শোনা যায়।

মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের অপঘাত

কথাটা হয়ত ক্ষোভের বশেই বলা হয়, কিন্তু আমাদের শাসক শ্রেণীর সম্বন্ধে যে কথাটা একেবারে অপ্রযোজ্য তাহা নয়। শ্রেণীহিসাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহার বিপ্লবী শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতি হিসাবে তো আমরা অযোগ্য নই। সাধারণ মানুষ তো এখনো প্রয়োজন উপলব্ধি করিলে দেশের জন্য মুখ বুজিয়া খাটিতে প্রস্তুত। দুই শত বৎসরের পরাধীনতার পাপ

একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে আরও কয়েক বৎসর কঠোর পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিতে যদি হয়, তাহা হইলেও তাহাতে সাধারণ ভারতবাসী কুণ্ঠিত হইবে না, ইহা জানা কথা। কাজেই, জাতি অযোগ্য নয়, অযোগ্য প্রমাণিত হইয়াছে তাহার শাসক-শ্রেণী। তাহারা পুঁজিতন্ত্রের কবলে আত্মভ্রষ্ট, নীতি হিসাবে প্রগতিশীল হইলেও কার্যক্ষেত্রে আমাদের নেতৃশ্রেণী প্রগতিশক্তি দৃঢ় করেন নাই, ধনিক গোষ্ঠীরই উপর ভরসা রাখিয়াছেন।

ভারতের সেই ধনিক গোষ্ঠীর ঐতিহ্যও আবার সামান্য। শিল্প অপেক্ষা বাণিজ্যে, উৎপাদনের মুনাফা অপেক্ষা যুদ্ধকালীন চোরাবাজারের মুনাফায়, তাহারা ধনাধিকারী হইয়াছে। কাজেই, উৎপাদন মূলক কোন বিরাট প্রয়াসে অগ্রণী হইয়া গিয়া শিল্প গঠন করিবে, এমন ধনিক এদেশে এখনো বেশি নয়। ভারতের ধনিক-গোষ্ঠী এই স্বাধীনতার রূপায়ণে নিজেদের সার্থক করিবার অপেক্ষা, রূপায়ণের নামে অভ্রান্ত মুনাফাশিকারেই নিজেদের পরিস্ফীত করিতে ব্যস্ত। অবশ্য, ধনিকদের অযোগ্যতার অপেক্ষাও শোচনীয় নেতাদের অযোগ্যতা। নেতাদের একটা ঐতিহ্য ছিল দেশসেবার ত্যাগের, দুঃখ সহনের ও কর্মকুশলতার। ইঁহারা ঠিক ধনিক শ্রেণীর মানুষ নন, এ দেশের মধ্যবর্গের শিক্ষিত শ্রেণী। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ইঁহারাই সংগ্রামে নেতৃত্ব করিয়াছেন— যত দ্বিধাগ্রস্ত হউক তাঁহাদের সেই নেতৃত্ব। কিন্তু ইঁহাদের যতটুকু বিপ্লবী ভূমিকা ছিল তাহা ১৯৪৭ এর সঙ্গেই নিঃশেষ হইয়া গেল। এই গণতন্ত্রী বিপ্লবের আয়োজনে অতঃপর তাঁহারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিতে অক্ষম। তাঁহাদের সাধ্য নাই যে, কৃষি বিপ্লব সার্থক করেন, শিল্পায়নে উদ্যোগী হইয়া জনগণকে নেতৃত্ব দান করেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তাই গোষ্ঠী হিসাবে আজ নিঃশেষিত হয়ে অবক্ষয়ের পথে। এইখানেই ভারতের স্বাধীনতার রূপায়ণের আসল সংকট। এই সংকল্পভ্রষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর ও বিকৃত ধনিকপদ্ধতির অধিকারী দেশীয় ধনিকশ্রেণীর দ্বারা স্বাধীনতার সার্থক রূপায়ণ আর সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

অসম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি

এই কথা তথাপি যেন আমরা না মনে করি, এই রূপায়ণের চেষ্টাও অলীক। প্রতিশ্রুতি অলীক নয়, তবে দ্বিধাগ্রস্ত। খণ্ডিত হইলেও পরিকল্পনা সমূহ মিথ্যা নয়। যাহারা নির্দেশক গোষ্ঠী তাঁহারা বহুলাংশে অক্ষম ও অযোগ্য। জনগণের দাবীর চাপে ও নিজেদের কুণ্ঠা কাটাইয়া, এবং ধনিক স্বার্থে তাঁহাদেরও অনেকটা নবরূপায়ণে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে আর তাহার পরিমাণও নিতান্ত তুচ্ছ নয়।

প্রথমত, যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে আজ এই কিছু গড়িবার চেষ্টা হইয়াছে। কৃষি উন্নয়নের দিক হইতে সেচের ও বাঁধের যে সব আয়োজন হইয়াছে, এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে চেষ্টা হইয়াছে গত দুইশত বৎসরের ইংরেজ রাজত্বে তাহা অভাবনীয় ছিল। এমন কি প্রথম পর্বেই যেসব আয়োজন চলিয়াছিল সেগুলির কথা মনে করিলে পরিবর্তনের যথার্থ ছবিটা মনে আসিবে: পাঞ্জাবের ভাকরা-নাঙ্গল বাঁধ দাক্ষিণাত্যের তুঙ্গভদ্রা, উড়িষ্যার হীরাকুঁদ বাঁধ, মধ্যভারতের চম্বল, বিহারের কুশী, উত্তর প্রদেশের রিহান্দ—ইহার যে কোনোটি স্মরণীয় কীর্তি। অগ্রগামী জাতিদের তুলনায় আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কিছুই নয়, কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগের তুলনায় নিশ্চয়ই উল্লেখ-যোগ্য। শিল্পবৃদ্ধি আমাদের প্রয়োজনানুরূপ নয়, কিন্তু শিল্পের উৎপাদন প্রতি পরিকল্পনাতেই কিছু বাড়িয়াছে। রাষ্ট্রাধিকৃত শিল্পের মধ্যে সিন্দ্রি সার কারখানা, রূপনারায়ণপুরের হিন্দুস্থান কেবলস্-এর কারখানা, বিশাখাপত্তনম এর হিন্দুস্থান জাহাজী কারখানা, চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন কারখানা, পেরাম্বুরের রেল-কোচ তৈরির কারখানা, বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান বিমান-কারখানা ও টেলিফোন্-কারখানা এবং এলওয়ের দুর্লভ মৃত্তিকা কারখানা প্রভৃতি প্রথম পরিকল্পনা-কালেই আরম্ভ হইয়াছিল। দুর্গাপুর, ভিলাই, রৌরকেলা প্রভৃতি সার্থক উদ্যোগ আজ আশার জিনিস। পুরাতন

তৃতীয় খণ্ড

বিজ্ঞানের বিপ্লব

অষ্টম অধ্যায়

বিজ্ঞানের জগৎ

মানুষের সভ্যতা মোটের উপর একই পথ অতিবাহিত করিয়া একই দিকে ছুটিয়াছে—ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপারেও তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু সমাজের বিকাশ অসমান, কোথাও তাহা খুব অগ্রসর, কোথাও তাহা পিছনে পড়িয়া আছে। ইহার অনেক কারণ আছে। একটা কারণ বহুদিন পর্যন্ত প্রধানত সভ্যতা ছিল নানা বিভিন্ন কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত,—কোনো গিরিগুহায়, কোনো তৃণক্ষেত্রে, কিংবা দূর দূরের নদী-উপকূলে। এই দূরত্ব নানা ভূখণ্ডের মানুষদের পরস্পরের নিকট সুপরিচিত হইতে দেয় নাই। এই কারণেও অনেক সময়ে মানুষের সমাজ সমছন্দে চলে নাই। কেহ একবার পথ হারাইলে আবার পথ খুঁজিয়া পাইতে বহু শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে। ইহার প্রমাণ আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিই। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের সভ্যতা সেই দূরত্বের বাধাও দূর করিয়া দিয়াছে, প্রায় সকল কেন্দ্রের মানব সভ্যতার ধারাকেও তাহার বিপুল প্রবাহে টানিয়া লইতে দুর্জয় বেগে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। তাহার ফলে ছোট বড় তরঙ্গ-সংঘাত দেখা দিয়াছে, দেখা দিয়াছে সভ্যতার প্রবল বাহনদের বিকট দম্ভ বিভিন্ন খণ্ডের সংঘর্ষ, বিভিন্ন স্রোতের ঘূর্ণীপাক। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই আবার মানুষের সভ্যতা এক ও ঐক্যবদ্ধ "সমগ্র" হইয়া উঠিতেছে—হইতেছে আবার বিচিত্রতর ও বৃহত্তর,—তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মানব সংস্কৃতি জাগিয়া উঠিতেছে ধীরে ধীরে। আজও তাহার প্রধান কেন্দ্র পশ্চিমেই; তাই বলিয়া তাহা আর ইংলণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বরং বলিতে পারি সে কেন্দ্র এখন মার্কিন দেশে ও সোভিয়েত ভূমিতে। এই নতুন সংস্কৃতির রূপ আজ প্রায় আমাদেরও পরিচিত। আমরা চাহি বা না চাহি, সে নিজেই আসিয়া আমাদের সহিত পরিচয় করিয়া লয়—তারপর আমাদের পরিচয়ই প্রায় উল্টাইয়া দেয়। এই পরিচয়ের সূত্র তাহার নতুন যন্ত্র (machines) ও নতুন আবিষ্ক্রিয়া (inventions); তাহার দ্বারা তাহার নতুন উৎপাদন-শক্তি (forces of production) বাহ্যতঃ শিল্পোৎপাদন (industrial production); আর ইহার ফলে তাহার আয়ত্ত হইয়াছে জীবনে এক নতুন অভাবনীয় শক্তি—সাধারণভাবে যাহাকে আমরা বলি বিজ্ঞান।

আসলে বিজ্ঞানই এই নতুন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পাথেয়, তাহার বাস্তব সম্পদের মূল। উহাই তাহার শ্রেষ্ঠ মানস-সম্পদও। যদিও এই সত্য মানুষ সবে মাত্র উপলব্ধি করিতেছে, সমস্ত জীবন দিয়া তাহা সে এখনো স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। তাই এখনই হয়ত সে মানিবেও না, পৃথিবীকে যে চোখে সে দেখিতেছে, সে আর প্রাচীন চোখ নয়। বিজ্ঞানের আবির্ভাবে সেই পৃথিবীও তাহার চোখে নতুন পৃথিবী হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানের জন্মমূল

আধুনিক কালের প্রারম্ভে দেখি, সামাজিক পারিপার্শ্বিকে ও চিন্তায় মানুষ অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্নতা লাভ করিয়াছে,—জীবন-যাত্রার কৌশলগুলি অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু হইয়াছে, আপনার চিন্তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা না করিলে সে তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না। এই সময়ে সেই জীবনযাত্রার তাগিদে মানুষ খুঁজিতেছে নূতনতর কৌশল (technique) সহজতর যন্ত্র (tools), উন্নততর জীবিকা-পদ্ধতি (forms of existence)। সেই তাগিদেই একটু একটু করিয়া এই যুগের বিজ্ঞান পশ্চিম দেশে ভূমিষ্ট হইল—যেখানে জীবনের তাড়নায় মানুষ বহিঃসমুদ্রে যাত্রা করিয়াছে;

বণিক সম্রাটগণ চাহিয়াছেন দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ; চাহিয়াছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান,—সমুদ্রের, পৃথিবীর, আকাশের তথ্য ; বাণিজ্য-বিস্তারের নতুন নতুন পথ। এই আর্থিক বা সামাজিক প্রেরণাই বিজ্ঞানের জন্ম-মূল। এক একটি নতুন অভাব সমাজে অনুভূত হয়, বণিক-সমাজের মাথায় টনক নড়ে ; বৈজ্ঞানিকদের মাথায় বুদ্ধি আসে ; নতুন আবিষ্কার তাঁহারা বণিকদের হাতে তুলিয়া দিয়া আপনাদের বৃত্তি ও বেতন গ্রহণ করেন। তার ফলে জীবনযাত্রা একপদ অগ্রসর হইয়া যায়—আর এক পা তুলিবার জন্য উন্মুখ হয়। আবার অভাব, আবার তাড়না, আবার প্রেরণা ও আবার আবিষ্কার—এই ইতিহাস বহন করিয়া আজ বিজ্ঞান দিকে দিকে আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, আর দিনে দিনে তাহার পদ্ধতিকে স্থির ও সুমার্জিত করিয়া লইয়াছে। (***The Social Function of Science*** J. D. Bernal, ***The Social Relations of Science***—I. Crowther এবং ***Science for Citizens***—L. Hogben এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।) যেমন, বিলাতের কাঠ-কয়লা ক্ষয় হইয়া আসিল, খনির কয়লা পোড়াইয়া লোহা গলানো চলিল। কয়লা তুলিতে গিয়া খনির জল পাম্প করিতে হয় ; সেই উদ্দেশ্যে শক্তি খুঁজিতে খুঁজিতে বাষ্প-শক্তির নাগাল পাওয়া গেল। জেমস্ ওয়াট সেই বাষ্প-ইঞ্জিনকে লাগাইলেন কলে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম সুতাকলে এই স্টিমের প্রয়োগ ; ১৮০৫ এ যানবাহনের কাজে লাগিল স্টিম ; তারপর ১৮২৫-এ বিলাতে প্রথম চলিল রেলগাড়ী। পঁচিশ বৎসর যাইতে-না যাইতেই ডালহৌসির চেষ্টায় আমাদের দেশেও বিলাতের পুঁজিপতিরা মুনাফার তাড়ায় রেললাইন পাতিয়া ফেলিলেন। কারণ, ইতিমধ্যে বিলাতে শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছে, আমাদের বাজারে বাজারে তাহার পণ্যভার না পৌঁছাইলে নয়, আমাদের গ্রাম গ্রামান্তর হইতে কৃষিজ সামগ্রী বিলাতী কারখানাতে না জোগাইলে চলে না। প্রকাণ্ড দেশের নববিস্তৃত শাসন ও শোষণকৌশল আপনাকে রেল-পথের বন্ধনে সুদৃঢ় করিয়া লইল—সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও পরস্পরকে পরস্পরের নিকটতর না করিয়া পারিল না।

বিজ্ঞান ও কর্মজগৎ

এক নিঃশ্বাসে এই যে ইতিহাস বলা হইল ইহা বিজ্ঞানের ইতিহাস নয়, শুধু যেমন করিয়া সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে বিজ্ঞানের প্রসার আধুনিক যুগে আরম্ভ হয় তাহারই কথা। তাহাতেও হাসি পাইবার কথা। কারণ ইহা যে কত বড় পরিবর্তনের ইতিহাস তাহা এইরূপভাবে বলিলে আমরা বুঝিতেও পারি না। মানুষ ইহাতে শুধু ভৌগোলিক দূরত্বের অবসান করিল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু আয়ত্ত করিয়া ফেলিল,—প্রকৃতির অনেক দেশ-মহাদেশ একটু একটু করিয়া জয় করিয়া লইল। সেইরূপ এক দেশ—পদার্থের দেশ। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের উহাই গবেষণাক্ষেত্র। সেদিকে এই বিজ্ঞানের কার্যগত সার্থকতা আজ ভাবিয়া শেষ করা যায় না। এক একটা তুচ্ছ দ্রব্য গ্রহণ করিলেও তাহার ইতিহাসই মনে হয় অশেষ। যেমন 'সেলুলোস'-এর ব্যবহার বলিতে গেলে সেই মহাদেশের একটা পাড়াগাঁ। কিন্তু বলিতে গিয়া মনে করিতে হয় 'রেয়ন' 'নাইলন' প্রভৃতি বস্ত্রশিল্পের কথা, যাহাতে আমাদের রেশমের-মটকার ব্যবসায় বিপন্ন হইল ; মনে করিতে হয় ফিল্মের কথা, ক্যামেরার কথা, মোটরের উইণ্ড স্ক্রীন্-এর কথা ; উড়োজাহাজের 'ডোপ' বা বার্নিশের কথা ;—উনিশ শতকের শেষ দশক হইতে শুধু কাঠের চাঁছা ও ঝড়তি-পড়তি তুলা হইতেই এরূপে অজস্র এই সব জিনিস তৈয়ারীর কৌশল আয়ত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় এক বিস্ময়কর কাহিনী এই শিল্পোৎপাদনে জীবজন্তুর ও গাছগাছড়ার সার্থকতা। উহা জীববিজ্ঞানের মহাদেশের অন্তর্গত। গো-পালন এখনো লুপ্ত হয় নাই ; প্রাণিমাংস এখনো জীবিকার বড় উপাদান। কিন্তু চর্বি, সাবান, তৈল, মার্জারিন, দুধের কাসিন (গুঁড়া), নকল আইভরি, শিঙ, হাড়, টর্টয়েস্-শেল, এম্বার, এবনি, সিগারেটকেস্ হইতে ছুরি কাঁটা, ছাতার বাঁট—কোথায় যে এইসব না লাগে তাহাই বলা দুঃসাধ্য। এমনি রেজিনের কথা। পেট্রোলিয়ামের ও রবারের তো কথাই নাই। আবার, খনির আঁধারে, লোহা ঢালাইর চুল্লিতে, পাথরের পাহাড়-খনিতে (quarry), তেলের সমুদ্রে, সিমেণ্ট ও চিনামাটির কারখানায়,

কাঠের কারখানায়, চটকলে, সুতাকলে, কাগজের কলে, অরণ্যানীর ছায়ায় চা-বাগানে, রবারের ক্ষেতে—আমাদেরই দেশেও এইরূপ যে-কোনো একটি স্থানে একবার তাকাইলেই বুঝিব মানুষ বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক পদার্থকে কি ভাবে আয়ত্ত করিতেছে, কিসে পরিণত করিতেছে; জৈব সম্পদকেও তাহার সহিত যুক্ত করিয়া কী নতুন পরিণতি দান করিতেছে। আর এই এক-একটি পদ্ধতি আবার কত কত পদার্থের এমনি প্রয়োগে ও পরিবর্তনের ফলে সম্ভব হইতেছে। অবশ্য ইহার মধ্যে রহিয়াছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক, আর মানুষের সমাজ বিজ্ঞানের দিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সকল বিকাশের দিক,—বৈজ্ঞানিক নীতিতে যাহার গবেষণা না করিলে মানুষের আত্মশক্তি যথার্থ আত্মপরিচয় পাইবে না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের এই অভিযান শুধু নিষ্প্রাণ বস্তু ও জীব জগতেই সীমাবদ্ধ নয়—একই কালে জানিয়া-না-জানিয়া পৃথিবীর বহুবিধ পদার্থের উপর ক্রমাধিকার বিস্তার চলিতেছে। এমন কি, মানুষের চিন্তার রাজ্যও তাহা হইতে বাদ যায় না। প্রত্যেকটি বিশেষ ক্ষেত্রের সফলতার সঙ্গে অপরাপর সকল ক্ষেত্রের প্রয়াসের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে; আর তাই সকলের সক্রিয় সম্পর্কে সামান্য এক একটি বৈজ্ঞানিকের প্রয়াসও সফল হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। মানুষের মনও তাহাতে সচেতন রূপে আত্ম-পরিচয় লাভ করিতেছে। এইরূপ দুই একটি সামান্য ক্ষেত্রের কথা ভাবা যাক।

ধাতবরাজ্য: লৌহ ও ইস্পাতের দেশ

সেইতো মানুষ যবে পৌঁছিয়াছিল লৌহের যুগে,—সেদিন সত্যই নতুন পৃথিবীর গোড়াপত্তন সে করিতেছিল। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আনুষঙ্গিক পদার্থনিচয়ের উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত এই লৌহ ও ইস্পাতের সম্পূর্ণ সার্থকতা সে সম্পাদন করিতে পারে নাই। চুল্লিতে লৌহ ঢালাই হিত্তীয়দের মধ্যেই প্রথম শুরু হইয়া চলিয়াছিল। বাঙলাদেশেও 'অসুর' নামে উপজাতিরা এখনো সেই পুরা যুগের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে। সেই চুল্লিই হইয়াছে ব্লাস্ট ফার্নেস্—জামসেদপুরে বার্ণপুরে যাহার খানিকটা আধুনিক রূপ আমরা দেখিতেছি। 'কাস্ট আয়রন' (Cast Iron), 'রট আয়রন' (Wrought Iron) 'শীয়ার স্টিল' (Shear Steel), 'কাস্ট স্টিল' (Cast Steel) দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইংলণ্ডের ভাবী যুগের পথ করিতেছিল (মনে রাখা মন্দ নয়, এই ঢালাই লোহার লাইনের অভাবেই নাকি রোমের সভ্যতা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।)। তখনো (১৮০০তে) লৌহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ চলিত না, পারিমাণিক রসায়নের (Quantitative Chemistry) জন্ম হয় নাই। নেইলসনের (Neilson) আবিষ্কারে (১৮২২) চুল্লির তাপ উঠিল ৬০০ ডিগ্রি ফারেনহীটে,—আজিকার ব্লাস্ট ফার্নেসে তাপ ২ হাজার ডিগ্রিতেও ওঠে। বেসেমার পদ্ধতিতে (Bessemer Process) ১৮৫৬-৬০ মধ্যে গলিত 'পিগ্ আয়রনের' ময়লা উড়াইয়া দিবার প্রক্রিয়া বাহির হইল। ইস্পাত সহজপ্রাপ্য হইল, এক সঙ্গে ২৫ টন ঢালাই করাও সম্ভব হইল। চার বৎসরের মধ্যে "খোলা চুল্লিতে" ১০০ টন ইস্পাত ঢালাই করা গেল। এক একটা এইরূপ খোলা চুল্লি হইতে ঘণ্টা পিছু এমন শতখানেক টনের ইস্পাত ঢালাই করা কিছুই নয়। বিদ্যুৎ চুল্লি (electric furnace) আসিয়াছিল ১৮৯৫তে। তাহাতে দেখা দিল 'এলয় স্টিল' (alloy steel); মোটর গাড়ীতে ও মরচে হীন ইস্পাতে ইহার প্রয়োগ চলে। বো... টিপিলেই আজ গলিত লৌহ গড়াইয়া পড়ে—আর চুল্লির প্রচণ্ড তাপ মজুরের মুখ-চোখ ঝল্সাইয়া দেয় না। সোয়া শত বৎসরে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িয়াছিল এক-আধ গুণ নয়, ১৩১ গুণ। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার ইস্পাতের রাসায়নিক বিশ্লেষণ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বিলাতেও ইস্পাত বলিতে আমাদের মত বুঝিত ছুরি, কাঁচি। আজ সেই ইস্পাতেই রকম ফের প্রায় ১০।১২ ধরণের, কারবোন্ স্টিলই ৬।৭ ধরণের। কারবোন্ স্টিলে আছে কারবোন্ ছাড়াও ফসফরাস, সালফার সিলিকোন্, মেংগানিজ্। টনেজ স্টিলে আবার মেংগানিজই বেশি। "অধিক নরম" (extra soft) কারবোন্ স্টিল এখন 'রট আয়রণকে' হটাইয়া দিতেছে। স্ট্রাক্চারল্ স্টিল সেতু, বয়লার, মালগাড়ীতে লাগে। 'মধ্যম' (medium) স্টিল

লাগে জাহাজ-তৈয়ারীতে ও কল-কব্জায়। 'মধ্যম দৃঢ়' (medium hard) স্টিল দরকার রেলে, রেলওয়ে ইঞ্জিনে ও গাড়ীর এক্সেলে। দৃঢ় (hard) স্টিল চাই চাকা কাঠ-কাটার যন্ত্রের জন্যও। সাত রকমের 'কারবোন্ স্টিলের' দৃঢ়তায়ও তফাৎ আছে। কারবোনের সূক্ষ্ম পরিমাণের তফাৎ থাকেই আবার মেংগানিজ, নিকেল, টুংগস্টেন, ক্রোমিয়াম প্রভৃতির পরিমাণের সঙ্গেও দৃঢ়তার তফাৎ হয়। মেংগানিজ স্টিলেরও এইরূপ নানা প্রকারভেদ আছে—ট্রামওয়ে পয়েণ্ট, ড্রেজার-বালতি, এইসব হয় এই স্টিলে। এমনিভাবে 'নিকেল স্টিল' 'ক্রোমিয়াম স্টিল'ও আবার নানা ধরণের শক্ত ইস্পাতের নাম। 'কারবোন স্টিলের' যন্ত্র কাটিতে পারে মোটের উপর কম ; তাতিয়া উঠিলে ইহার ধার পড়িয়া যায়। টুংগস্টেন্ মিশাইলেই সেই স্টিলের কাটিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। 'কারবোন্ স্টিল' যেখানে মিনিটে কাটে ১৬ ফিট, 'হাই-স্পিড্' স্টিল সেখানে কাটে ১০০ শত ফিট ; আর 'টুংগস্টেন্ কারবাইড' স্টিল সেখানে ৩০০।৪০০ ফিট কাস্ট-আয়রন মিনিটে কাটিয়া শেষ করে। আবার, এই টুংগস্টেনই উড়ো-জাহাজে ও মোটর গাড়ীতে লাগিত, ইহাই বিদ্যুৎ-বাতিতেও দরকার হয়, বেতারটেলিফোনে ও বেতার-বার্তায়ও প্রয়োজনীয়। মনে রাখা দরকার, একদিকে যেমন এই লৌহের ইস্পাতের প্রসার ঘটিতেছে, অন্য দিকে আসিয়া যাইতেছে নূতনতর পদার্থ—টিটেনিয়াম, এলোমিনিয়াম, জির্কোনিয়ম সিমেণ্ট, কাচ প্রভৃতি। কোনো একজন বিশেষজ্ঞের পক্ষেও বলা অসম্ভব—লৌহ ইস্পাতের এই কথা। তারপর আণবিক যুগে এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিবর্তন হয়তো অসম্ভব হইবে না।

মানুষের "বল-বৃদ্ধি"

এই পদার্থ-বিজয়েরই প্রধান সহায় এখন—'বল' (power)। মানুষের এই অনায়ত্ত দেশই পূর্বকালে প্রকৃতিকে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল ; আকাশ বাতাস সবই হইয়াছিল মানুষের চক্ষে দেবতা বা দৈববলের আধার। সেই বলের রাজ্যে ক্রমাধিকার বিস্তার আজ বিজ্ঞানের অন্য এক প্রধান কৃতিত্ব। মানুষ তাই অপরিমিত বলের অধিকারী হইল। তাহার এই বলবৃদ্ধিতে তাহার নিজের কার্যশক্তি অতুলনীয় পরিমাণে বাড়িয়া গেল। মিশরের ফেরাওর শতসহস্র দাস দিনের পর দিন যে পরিমাণ পরিশ্রমে যে কাজ করিত, আজ সামান্য কারখানায়ও দুই দশ জনেই একদিনে তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি কাজ করে। কারণ, বহুগুণ বলশালী দাসদের আজ কাজে লাগানো চলিয়াছে। এতদিন পর্যন্ত সেই দাসদের বল জোগাইত কয়লা, পেট্রল, জলস্রোত—সেই দাস স্টিম গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ। জেমস্ ওয়াট্ হইতে ইহার নতুন যাত্রা আরম্ভ হয়। টারবাইন ইঞ্জিনে ইহার প্রকাশ ঘটে ও ইণ্টার্নাল কমবাশ্শন্ ইঞ্জিনে ১৮৭০-৭৮-এর মধ্যে ইহা আর একদিকে প্রসার লাভ করে। পাশে পাশে বাষ্পের রাজত্বও বাড়িয়া চলিল। তখনো তেলের ইঞ্জিন দেখা দেয় নাই। এখন অবশ্য খনিতে না নামিয়াই কয়লাকে খনির অভ্যন্তরে গ্যাসে পরিণত করা চলে। সম্ভবত আরও দাহ্যবস্তু হইতেই বিদ্যুৎ উৎপাদনেও আরও বৈপ্লবিক আবিষ্কার ঘটিবে। ১৮৮৪তে ডেইমলার পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কার করিলেন। সেই বৎসরই স্টিম্ টার্বাইন্ ইঞ্জিনেরও বৎসর। ডিজেল ইঞ্জিনের সূচনা ডিজেলের 'মোটা তেলের' ইঞ্জিনের পেটেণ্ট হইতে ১৮৯৫-তে—বৎসর বিশেকে ইহার কাজ শুরু হয়। দিনে দিনে কম তেলে বেশি উন্নত ইঞ্জিন চালাইবার উপায় বাহির হইতে লাগিল। ফলে স্টিম ইঞ্জিনের জায়গা জুড়িয়া বসিতেছে তেলের ইঞ্জিন। ইহাতেই কারখানা চলে, বিদ্যুৎ-উৎপাদন চলে, মোটর চলে, জাহাজ ও উড়োজাহাজ চলে। আর, ভবিষ্যৎ তৈলপ্রবাহ পৃথিবীর উপর হইতেই নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হইতে পারে। স্টিমের রেলগাড়ী আমাদের দেশেও মোটরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অস্থির হইয়া পড়িতেছে। আর এই তেলের জন্যই যুদ্ধ চলে—আবার যুদ্ধ বাধেও। এইসব ইঞ্জিন দিনের পর দিন যেমন সূক্ষ্ম, যেমন উন্নত হইয়াছে, তাপ, চাপ ও ক্ষিপ্রতা এই সবের মধ্যে যেরূপ ভাবে সংযোজিত হইতেছে, ইহাদের বলকে দূরে দূরে প্রয়োগ করিবার উপায়ও সেরূপ আসিয়া পড়িয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে বহুদূরের শিল্প-কেন্দ্রে যেভাবে বিদ্যুতের শক্তি চালান হইতেছে, তাহাতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

কিন্তু তাহারই পাশাপাশি আবার পুরানো বলের নতুন বিক্রম আরও বিস্ময় বাড়াইয়া তুলে। হাওয়ার জোরে কূয়ার জল তোলা, আর নদীর স্রোতোবলে কল চালানো—বহু শতাব্দী পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল। বিদ্যুতের নতুন বলের উন্নতিতে সেই বাতাসের ও জলের নূতনতর 'বল' প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরাতন দিনে কয়লা পোড়াইয়াই বিদ্যুৎ পাওয়া যাইত—আমাদের দেশে এখনো তাহাই বিদ্যুতের প্রধান উপকরণ। কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশে জলবিদ্যুৎই প্রধান আশ্রয় হইয়া উঠিতেছে। আণবিক শক্তির আবিষ্কারে অফুরন্ত বিদ্যুৎ-বল বাড়িয়া গেল—যদিও এখনো তাহাতে ব্যয় বেশি। ইহার পরে সূর্যতাপ আয়ত্ত করিবার বিদ্যা যদি বিজ্ঞান আবিষ্কার করে তখন তো বলের উৎস অনন্ত হইবে। এইসব নতুন 'বলের' নিকট সেই গ্যাস ও তেল মনে হইবে 'সেকেলে'—'Fossil Power', তাই বলিয়া তাহা বাতিল হইবে না, বরং তাহারও আরও উন্নততর প্রয়োগ আয়ত্ত হইবে। মানুষ প্রকৃতির সম্পদকে এখন বিনষ্ট করিয়া আর বলবৃদ্ধি করিতেছে না, প্রকৃতির নিয়মিত গতি হইতেই এবার তাহার বল সংগ্রহ করিতেছে। ঘূর্ণ্যমান পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহার সমুদ্রে জোয়ার ভাটা বহে, তাহার মেঘ আকাশ ছাইয়া আসে, তাহার নদীতে বান ডাকে, বন্যা আসে, স্রোত ছুটিয়া চলে—এই বিরাট জগৎ-যন্ত্রই তো মানুষের বিরাট ডাইনেমো।

দূরত্বের বিনাশ

বল-বিজ্ঞানের এইরূপ প্রসারেই পৃথিবীর দূরত্বও আর বাধা হইয়া রহিল না ; ক্রমশই পৃথিবীর দেশদেশান্তর নিকটতর হইয়া পড়িল। আর এই যানবাহনের উন্নতিতে—প্রথমত রেলওয়ের সূত্রপাত হইতেই তাই বলা যায়—এক নতুন পৃথিবীর পরিচয় বিজ্ঞান পৃথিবীর দুয়ারে দুয়ারে বহিয়া লইয়া উপস্থিত হইল। আজ তাই খাদ্যের জন্য, পরিধানের জন্য, জীবনযাত্রার সহস্র উপকরণের জন্য দেশবিদেশের মানুষ পরস্পরের মুখাপেক্ষী। আমরা কুনো জাতি। তথাপি জীবনযাত্রার যে কোনো শিল্প দ্রব্যের জন্যই পৃথিবীর অন্য কোণে আমরা তাকাইয়া থাকি। এমন কি, আমাদের কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের জন্য পর্যন্ত আমরা অন্যের মুখাপেক্ষী। পূর্বে ছিল রেঙ্গুনের চাউল না আসিলে আমাদের দুর্ভাগ্য ; বোম্বাই-জাপানের বস্ত্র না আসিলে আমরা অসহায়। এখন তো কানাডা আমেরিকার গম না হইলেও আমাদের চলে না। আর বিদেশে আমাদের পাটের চাহিদা না থাকিলে, আমাদের চায়ের বাজার না থাকিলে আমরাই বা বাঁচি কিসে? রেল ও জাহাজ তাই আমাদের চোখে পৃথিবীকেও প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। মোটরের প্রচলনে ও বিমানের আবির্ভাবে আমাদের সেই পৃথিবী যেন আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছে না। আবার, ইহারই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে সংবাদপত্র, আসিয়াছে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, আর আসিয়াছে বেতার যন্ত্র, আসিয়াছে সবাক্‌চিত্র, আসিয়াছে বেতার ফটোগ্রাফী, টেলিভিসন।—আমাদের কাছেও লণ্ডন-কলিকাতা 'এপাড়া-ওপাড়া' হইয়াছিল পূর্বেই, এবার হইয়াছে এঘর-ওঘর। বোম্বাই হলিউডের পাড়াগাঁ মাত্র। আর কে বলিবে "দিল্লী দূর হনুজ অস্ত"? দিল্লী আর দূর নয়। মানুষ যখন মহাবিশ্ব ঘুরিয়া আসিতেছে, রবোটস্থ যন্ত্রে চন্দ্রের ফটোগ্রাফ তুলিতেছে, মহাকাশের বেতার তথ্য সংগ্রহ করিতেছে, তখন দিল্লীর দূরত্বের কথা আর কেন তোলা?

ক্ষুৎপিপাসা জয়

তবু যাহা ঘটিতে পারে—পৃথিবীর অন্যত্র ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদেরই আয়ত্ত হইল না,—তাহাও কম নয়। এক কথায় বলিতে গেলে—তাহা বিজ্ঞানের বলে মানুষের পক্ষে ক্ষুৎপিপাসার পীড়ন জয়,

এবং মানুষের পক্ষে মেঘ ও রৌদ্রের রাজ্য জয়। খাদ্য এখনো কৃষিক্ষেত্র হইতে আসে, কিংবা আসে কৃষকেরই পালিত জীব হইতে। কিন্তু তাহা ছাড়াও খাদ্য আজ দেখা দিয়াছে—জেম, জেলি, আচার, আমরা জানি; অস্ট্রেলিয়ার-আরজেণ্টিনার চালানি মাংসও দেখি। কিন্তু 'উপজাত' (ersatz) খাদ্যও আজ সুপরিচিত। বৈজ্ঞানিক সারে ও প্রজনন বিদ্যার উন্নতিতে শস্যের ও জীবজন্তুর পরিমাণ ও প্রকৃতি অসম্ভব রূপে বাড়িয়া গিয়াছে—জমির উর্বরতা বাড়িয়াছে. শস্যের উৎপাদনও বাড়িয়া চলিয়াছে। নতুন 'যন্ত্রের লাঙ্গল' আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিদ্যুতের লাঙ্গল পর্যন্ত ইউরোপে আমেরিকায় চলিয়াছে। বিদ্যুতের যন্ত্রে ফসল কাটা, ছাড়ানো, বাছাই, বহু দেশে এখন চলিতেছে। বিদ্যুতের প্রয়োগে কৃষকের পশুপালনের চেষ্টাও নতুনরূপ লইতেছে। যেমন, ডিম হইতে বিদ্যুতের তাপে যথাসময়ে শাবক ফুটিয়া উঠে, নষ্ট হইবার উপায় নাই; যথারূপে সংরক্ষিত হয় ফসলের বীজাণু ও প্রাণী জীবাণু (bacteria)। ইহা তো আমাদের দেশেও এখন কার্যত হইতেছে। মানুষ কি সংখ্যায় বাড়িতেছে? খাদ্যও জলেস্থলে বাড়িবার কথা।

বৃক্ষ-জগতের ও জীব-জগতের জীবনের প্রবাহ নানারূপে একদিকে যখন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে কৃষকের সম্মুখে, আর দিকে নিজেকে কৃষক আবিষ্কার করে এই প্রাণীপ্রবাহের নিয়ামক হিসাবে—এক নতুন ঐশ্বর্যে। এই যন্ত্র, বিদ্যুৎ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে তাই কৃষিকার্য ও কৃষকের জগৎ আর সেই পুরানো জগৎ নাই। সেও আর নিজেকে মনে করে না প্রকৃতির খেয়ালের বশ, মেঘ ও রৌদ্রের ক্রীড়নক, শুধুমাত্র অদৃষ্টের অন্ধদাস, মানব-সভ্যতার ভারবাহী পশু।

মেঘ ও রৌদ্রের পরাজয়

কারণ, বিদ্যুৎ যেখানে কৃষকের গৃহে আসিয়াছে সেখানকার মানুষ আর মেঘ ও রৌদ্রের কৃপাবশ নাই। সে আবহাওয়াকেও খানিকটা জয় করিয়াছে। পরিচ্ছদে সে আপনাকে সংরক্ষণ করে; প্রসাধনে সে নিজেকে সুসজ্জিত করে; রৌদ্র হাওয়ার দাপট হইতেও সে নিজকে রক্ষা করিতে পারে। গৃহ তার আর শত-ছিদ্র নয়; গ্রাম তাহার শহর হইয়া উঠিতেছে; আবাসস্থল স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতায় সমৃদ্ধ। তাহাতে রেডিও-টেলিফোন্ রহিয়াছে, সংবাদপত্র আসিতেছে, যানবাহনেরও অভাব নাই। আবার শহর তাহার উদ্যানের সম্পদে উন্মুক্ত, স্থাপত্যে সমৃদ্ধ। এইসব কারণে তাহার সামাজিক সম্পর্কগুলিও তাই নূতনতর হইয়া উঠিতেছে, তাহার চোখে পৃথিবীরই যে পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে হয়ত তাহা সে সম্পূর্ণ জানেও না।

ইহাই মোটের উপর সাধারণের চক্ষে বিজ্ঞানের রূপ ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত জগতের রূপ। তাহাদের বাস্তব কর্মজীবন এই কর্ম জগতের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া উঠিতেছে। যন্ত্র ও শিল্পের সাহায্যে এইভাবেই বিজ্ঞান উৎপাদন-প্রণালীকে নতুন করিয়া তুলিয়াছে, প্রায় পৃথিবীব্যাপী ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। তাই উৎপাদনক্ষেত্রের এই দানই বিজ্ঞানের মূল দান, প্রাথমিক দান ও প্রধান দান। ইহার সহিত পরিচয়ও তাই সকলেরই প্রত্যক্ষ। সাধারণ মানুষের জীবনের রূপ যেমন শিল্প প্রবর্তনে পরিবর্তিত হইতেছে তেমনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা-অভিজ্ঞতাও প্রধানত এই 'ফলিত বিজ্ঞানের' দানেই নূতনতর হইতেছে।

এই বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে কিন্তু বাধাও সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে—কিরূপে, ঠিক কোথায়, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

বিজ্ঞানের পক্ষে 'নিষিদ্ধ জগৎ'

দুই একটি কথা এখন স্মরণ করিতে হইবে—প্রথমত, পৃথিবীর সকল জাতির নিকট বিজ্ঞানের এই বাস্তব দান এখন পর্যন্ত পৌঁছে নাই; যেমন আমাদেরই দেশেও তাহা এখনো সীমাবদ্ধ। আমরা

জান পৃথিবীতে এই বিজ্ঞানোন্নত উৎপাদন-প্রণালীই জয়ী হইয়াছে। যদিও এখনো সেকেলে ধরণের কৃষি রহিয়াছে, পশুপালন আছে, ইতিহাসের কোনো দানই অগ্রাহ্য নয়, তথাপি বিজ্ঞানের দানই প্রধান এবং ইতিহাসের হিসাবে তাহাই আজ 'ঐতিহাসিক উৎপাদন-প্রণালী'। দ্বিতীয়ত, যাহাদের নিকট বিজ্ঞানের দান পৌঁছিয়াছে, তাহাদেরও সকলের নিকট তাহা সমভাবে পৌঁছে নাই। যেমন, আমাদের খনির মজুর ও কারখানার মজুর যতটা প্রত্যক্ষভাবে এই নতুন জগতের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আমাদের বি-এস্-সি পাশ ইস্কুল মাষ্টার মহাশয়ও তাহা করিতে পারেন না। তৃতীয় কথা: পৃথিবীর বিজ্ঞানোন্নত জাতিরা বিজ্ঞানকে সৃষ্টির কাজে না লাগাইয়া ধ্বংসের কাজে, যুদ্ধের কাজে প্রয়োগ করাতেই প্রায় অর্ধাংশ শক্তি ও অর্থ বিনষ্ট হয়। মানবতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের এই প্রয়োগই মানুষের চক্ষে আজ প্রত্যক্ষ। চতুর্থ কথাও গুরুতর কথা—বিজ্ঞানের এই বাস্তব দান এখনও অংশত উৎপাদন ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইতেছে, সেইখানেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, এমন কি সেখানেও তাহাকে অনেক সময়ে সংকুচিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা চলে। কিন্তু—যাহা পঞ্চম কথা—উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সত্যকে প্রয়োগ করা এখন পর্যন্ত আরম্ভ হয় নাই—একমাত্র সমাজতন্ত্রী ভূমিতে ছাড়া। এমন কি অন্যত্র মানুষ কর্মজগতে বিজ্ঞানকে সময়ে সময়ে প্রসারিত করিতেও ভীত। কারণ, তাহাদের সমাজ-সম্পর্কের ওলট পালট যে তাহাতে অনিবার্য। তাহাদের এতদিনকার সামাজিক ধ্যান-ধারণা তাহাতে নষ্ট হইবে, রীতিনীতি যাইবে, সহস্র ছোট বড় সুযোগ-সুবিধা ধ্বংস হইবে। ধর্ম, ভূত, ভগবান কিছুই যে আর টিকে না; টিকে না তাহাদের এতদিনকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত নীতিবোধ। তাই, মানুষ সমাজের বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না। বরং বিজ্ঞানের মুখ ফিরাইয়া দিতে চায় সমাজক্ষেত্রের দিক হইতে ধ্যানের জগতে, অবাস্তব চিন্তার জগতে। সমাজ হইল আজও বিজ্ঞানের পক্ষে কার্যত 'নিষিদ্ধ জগৎ'।

বিজ্ঞান ও চিন্তাজগৎ

বাস্তব জগতের যে রূপান্তর ঘটিল স্বভাবতই সে পরিবর্তন চিন্তার জগতেও তাহার ছায়া ফেলিয়াছে। সাধারণ মানুষের কথাবার্তা, ধ্যান ধারণা, অর্থাৎ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে চেতনা একটু একটু করিয়া পরিবর্তিত হইতেছে। তাহারা নিজেরাও তাহা হয়ত জানে না—এমনি সূক্ষ্ম, এমনি বিচিত্র সেই পরিবর্তন। কিন্তু তবু তাহাদের চিন্তায় চেতনায় অস্পষ্ট পরিবর্তনের রেখাপাত প্রতিনিয়ত চলিতেছে। অবশ্য যাঁহারা চিন্তা জগতের নায়ক তাঁহাদের মনেই এই পরিবর্তনের স্পষ্ট ও সচেতন প্রতিলিপি পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজে যেখানে পূর্ব হইতেই বহু বাধা (inhibition) রহিল সেখানে এই চিন্তার ধারাও বাঁকিয়া চলিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার জগৎ যতই বাস্তবলোক ছাড়িয়া মানস লোকের দিকে অগ্রসর হয় ততই যেন অদ্ভুত ও অবাস্তব হইয়া উঠে। কিছুতেই যেন তাঁহারা বিজ্ঞানের কর্মজগৎ ও বিজ্ঞানের চিন্তাজগৎকে এখনো মিলাইয়া লইতে পারেন না। ইহার কারণ—এই দুই জগতের মাঝখানে যে একটু মধ্যদেশ রহিয়াছে সেখানে তো বিজ্ঞানের পথ এখনও রচিত হইয়া উঠে নাই। সেই দেশটি সমাজক্ষেত্র—যেখানে বিজ্ঞান নিষিদ্ধ। অবশ্য সেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগৎও তাই বৈজ্ঞানিকদেরই শুধু মনে আলোড়ন তোলে। সাধারণ লোক কর্মজগতের লোক, বিজ্ঞানের বাস্তবলোকের কথাই তাহাদের পরিচিত। তাহারা দেখে স্টিমের, গ্যাসের, বিদ্যুতের ব্যবহারিক জগৎ। বৈজ্ঞানিকদের 'আধিমানসিক' (intellectual) কল্পনা-জল্পনার তাহারা খোঁজও রাখে না। এই 'চিন্তাজগতে' বিজ্ঞান তাই চিন্তানায়কদের সম্মুখে জগতের যেই রূপ তুলিয়া ধরিতেছে তাহা এই যুগের এই বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণ জয়ের ও মানুষের বর্তমান মুহূর্তের ব্যাহত সংস্কৃতির এক পরিচয় প্রদান করে।

'শুদ্ধ বিজ্ঞানের' সেই ক্রমপ্রসারিত রাজ্যের কোনো একটি কোণের সম্পূর্ণ পরিচয়ও নাকি আজ আর কোনো একজন বৈজ্ঞানিক দিতে পারেন না,—ইহাই বৈজ্ঞানিকদের মত। তাই, তাহার সামান্য

পরিচয়ও আমরা সহজে পাইব না। তবু পরিচয় একটা সংগ্রহ করিতে হয়। বাঁচিয়া থাকিলে সে পরিচয় আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। তবে তাহা বিশেষজ্ঞের পরিচয় নয়, কাজ চালাইবার মতো পরিচয়। শিক্ষিত মানুষের আধুনিক চিন্তার জগতে বিজ্ঞান মোটের উপর এইরূপে তিনটি দিক হইতে তাহার তরঙ্গ তুলিতেছে—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Sciences) রূপে, প্রাণিবিজ্ঞান (Biology) রূপে, আর নবজাত মনোবিজ্ঞান (Psychology) রূপে। পূর্বে তাহার পরিচয় কিছু পাইয়াছি ; এখন এই বিষয়টিকে আরও বুঝিয়া দেখা যাউক।

পদার্থ বিজ্ঞানের জগৎ

এক সময়ে একটা কথা বাঙলায় প্রচলিত ছিল—প্রাণহীন বস্তু হইল জড়বস্তু। জড়বিজ্ঞান কথাটা এখনো চলিত। 'জড' কথাটা আজ আর প্রকৃতির অচেতন অংশ সম্বন্ধেও খাটে না। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহাকাশ হইতে পৃথিবীর ধূলিকণা পর্যন্ত সবই এক সময়ে মনে হইয়াছিল জড়জগৎ, আর জড়বিজ্ঞান ছিল তাহাদের কথা। প্রকৃতির এই কোঠাই বৃহৎ ; অন্যকক্ষে প্রাণিজগৎ ; আর তাহারও ছোট একটি কোণ মাত্র চেতন-প্রাণীর। কিন্তু বিজ্ঞান যেখানে আসিয়া ঠেকিয়াছে সেখানে আজ নিখিল বিশ্বে 'জড়'ই কিছু নাই, 'জড়পিণ্ড'ও কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত এই নতুন জ্ঞানই বিজ্ঞানকে ভাবুকতার পক্ষপাতী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে।

পরমাণুর কাণ্ড

বিশ্বের গোড়ার সামগ্রী খুঁজিতে গিয়া অনেকেই ভাবিয়াছিলেন এক জড় কণাই বুঝি শেষ কথা, উহাই মৌলিক জিনিস। উহাকেই এক যুগে কণাদ অবলম্বন করেন, আর যুগে তাহাই ডাল্‌টনের 'অ্যাটম' বা 'পরমাণু' রূপে প্রকাশিত হইল। ক্রমে দেখা গেল তাহাও যৌগিক পদার্থ, আর পদার্থ মাত্রই দেখা গেল দুই বিদ্যুৎ কণার সমষ্টি ; ইলেকট্রন ও প্রোটনের, অর্থাৎ ধনাত্মক ও নির্ধনাত্মক বিদ্যুতের যোগ-বিয়োগের ফল। শুধু তাই নয়, পদার্থ মাত্রই নানা 'অতি-পরমাণু'র ঘূর্ণী, কেন্দ্রে রহিয়াছে প্রোটন, তাহার চারিদিকে হালকা ইলেক্‌ট্রনের অস্থির ঝড় ; প্রতি সেকেণ্ডে ইলেক্‌ট্রন ছুটিতেছে ১৩৫০ মাইল। আবার ইলেক্‌ট্রনের নতুন জাতও ক্রমে বাহির হইল, পজিট্রন। ঐ শাখায় আরও আবিষ্কার চলিতেছে। ইহাদেরই অবস্থিতি পার্থক্যে চরাচরের তাবৎ বস্তুর প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যেমন, সর্বাপেক্ষা হালকা পদার্থ হাইড্রোজেন। ইহা একটা গ্যাস, তবু ইহা বস্তুই। তাহার কেন্দ্রে আছে সাধারণত একটি প্রোটন ; আর চারিদিকেও ঘুরিতেছে মাত্র একটি ইলেক্‌ট্রন। সর্বাপেক্ষা ভারী বস্তু য়ুরেনিয়ম ; উহা বহন করে ৯২টি প্রোটন, ১৪৬টি নুট্রন। রদরফোর্ড দেখিয়াছিলেন পরমাণু যেন এক এক ক্ষুদ্র সৌরমণ্ডল। ম্যাক্‌স প্ল্যাংক, নীলস্‌ বোহর এর গবেষণান্তে (Quantum Theory) তেজ মনে হইল দমকে দমকে গুলির মত ছিটাইয়া পড়ে। ইলেক্‌ট্রনেরও ঘূর্ণীনাচে দেখা গেল উহারা কক্ষ কক্ষান্তরে লাফালাফি করিয়া বেড়ায় ; আর সেই লাফালাফিতে বিকীর্ণ হয় কিরণ। ফলে আমরা পাই আলো। ১৯২৫ এর কাছাকাছি আবার গণিত-বিজ্ঞানী বলিলেন—ইলেক্‌ট্রনের চালচলনের মধ্যে আছে একটা ঢেউ খেলা ; তাহাকে আর গণিতের সাহায্য ছাড়া বোঝাই যায় না।[১]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই পরমাণু-তত্ত্ব সমূহকে অবলম্বন করিয়া বিরাট রকমের গবেষণার আয়োজন হইল। তাহাতেই আণবিক শক্তি মানুষ আয়ত্ত করিল, উহারই পরিচয় দেখা গেল হিরোশিমার বিস্ফোরণে, তাহার মূল উরেনিয়াম্‌। উহার পরে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষাও

(১) এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপাদেয় বিবরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন 'বিশ্বপরিচয়ে'-এ, পৃষ্ঠা, ১৮—৩৭।

so impossible to prove that we regard it as absent and can neglect), the economic movement finaly asserts itself as necessary."[1]

বিজ্ঞানের ভাববাদিতা যেন একদিকে আত্মসচেতনতা, অন্যদিকে আত্মরতি। অতএব গণিতের ও বিজ্ঞানের কোনো কোনো প্রসার আমাদের চোখে জগৎকে শুধু 'গণিতের খেলা' ও 'বুদ্ধির অতীত লীলা' বলিয়া প্রকাশ করিতে চাহে। অথচ চরাচর যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার খেলা সেই সত্যটি উহাতে চাপা পড়িয়া যায়। গণিত ও বিজ্ঞানের এই পরিণাম মোটেই নতুন কিছু নয়, অন্যান্য বিদ্যা ও বিজ্ঞানেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

"Like all other sciences Mathematics arose out of the needs of men, from the measurement of land and of the content of vessels, from the computation of time and mechanics. But as in every department of thought, at a certain stage of development the laws abstracted from the real world became divorced from the real world, and are set over against it as something independent, as laws coming from outside, to which the world has to conform. This took place in society and in the State and in this way, and not otherwise, pure mathematics is subsequently applied to the world, although it is borrowed from the same world and only represents one section of forms of its interconnection, and it is just precisely because of this it can be applied at all."

বস্তুর প্রবাহ

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান এইরূপে নিজেদের রাজ্যকোণে বন্ধ থাকিয়া পড়ে চারিদিকের অন্তঃ-ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতে বিযুক্ত রাজ্য গড়িতে গিয়া। পরমাণু কিন্তু তাহার জড়ত্ব হারাইতে মোটেই আপত্তি করে নাই। দেখা গেল তাহা এক চঞ্চল ঘূর্ণী, তাহা জড়পিণ্ড নয়, বস্তুর প্রবাহ, ইলেকট্রন-প্রোটনের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, আর মধ্যে মধ্যে আবার উৎক্রান্তি (jump)। অর্থাৎ পদার্থ জগৎ হইল বস্তু ঘটনার জগৎ (events), জটিল প্রবাহ স্বরূপ ("a complex of processes")। কথাটা এমন অভাবনীয় বা অসম্ভব কিছুই নয়। আমাদের দেশের ক্ষণিকবাদ বা 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' হইতে একেবারে রবীন্দ্রনাথের গতিবাদে, প্রাচীন হেরাক্লিটাস হইতে এই যুগের বের্গস, হোয়াইটহেডদের চিন্তায়ও জগতের এইরকমের রূপই প্রতিভাত হইয়াছে। তাহাদের মূল কথা জগৎটা 'গম্'-ধাতুতে গড়া, তবে তাহা নিছক 'নিপাতনে'—অর্থাৎ তাহার নিয়ম জানা নাই। ইহারই বিরুদ্ধে বিজ্ঞান অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, বলিল, জগৎ যন্ত্রস্বরূপ। আজ আবার এই দ্বন্দ্বের শেষে এক সমন্বয়ে পৌঁছিতেছে—আর এক উচ্চতর স্তর হইতে আবার পূর্বেকার কথা বলিতেছে—জগৎ একটা প্রবাহ। ইহার সঙ্গে শুধু মনে রাখিবার কথা এই যে, এই ঘটনা ও প্রবাহ একটা বাস্তব ব্যাপার, বাস্তব প্রবাহ, মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণা মাত্র নয় ("existing outside our cognition")।

অনিশ্চয়তাবাদ

কিন্তু শুধু ঘটনার প্রবাহ বলিলেই পরমাণুর কথা বৈজ্ঞানিকদের কাছে শেষ হয় না। এখনো তার পথ অনিশ্চিত অর্থাৎ নিপাতনে কাজ চলে। পরমাণুতত্ত্বের সহিত একই কালে আরও সমস্যা

১ Letters of Marx and Engels Lawrence and Wishart, p. 457. The Marxist Philosophy and the Sciences, J. B. S. Haldane, P. 49-50 হইতে উদ্ধৃত।

২. Anti-Duhring, Engels, 1878 দ্রষ্টব্য। Materialism and Empirio-Criticim, Lenin, 1909, দ্রষ্টব্য।

আসিয়া তাঁহাদের হাতে জুটিয়াছিল। যেমন, আলো কি? উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে কোয়ান্টাম্‌বাদ জন্মে; তখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল জটিলতর। আলোর তরঙ্গের রূপকে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রশ্ন হইল—'আকাশ' হইতে আলো কিসে দিয়া আসে? ইথরের সম্বন্ধে যত ধারণা ছিল সব বদলাইতে হইল, তবু ইথর টিকিল না। এদিকে আলো হইতে পরমাণুবাদে আসা গেল। দেখা গেল আলো "লাফ মারা ইলেকট্রনের চমক।" তাহার এই এক এক দমকে (punch) এক একটি বিশেষ পরিমাণ কিরণ বিকীর্ণ হয়, তারই নাম হইল কোয়ান্টাম্‌। এক এক রঙের আলোর মধ্যে এক এক আকারের 'কোয়ান্টা', আবার 'কোয়ান্টা'র সংখ্যাতেই আলোর উজ্জ্বল্য কমে বাড়ে। তাহার 'তেজ'ও আবার একটা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের চিরপ্রবাহ মাত্র।

কিন্তু সমস্যা জটিলতর হইল ক্রমেই—সূক্ষ্ম পরমাণুর সন্ধান কালে দেখা গেল সন্ধান পর্ব্বাতেই তাহার কিছু না কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় ('complimentary relationship')। অর্থাৎ সন্ধানীর সঙ্গেও বস্তুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যোগ ঘটিতেছে। 'দ্রষ্টা' তাহা হইলে শুধুমাত্র নিরপেক্ষ দ্রষ্টা নহে—'স্রষ্টা'ও। অতএব, বৈজ্ঞানিক বলিলেন—বস্তুর প্রকৃতি জানিবার আর উপায় কোথায়? আমার মনের ছায়া তো তাহার সহিত মিশিতেছে [illegible]। তাহা হইলে বস্তু বস্তুতঃই মনোময়, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ মনোময়। এই ভাবেও দেখিলে বলা যায় কথাটা তেমন নতুন না—অনেকদিন হইতেই দার্শনিক বলিতেছেন 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। সামাজিক দিক হইতে দেখি, [illegible] ক্ষেত্রেও বুদ্ধি—সমাজের গবেষকগণও [illegible], ইহারা উৎপাদন করেন না ভোগ করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিও তাই হয় উৎপাদক না ভোগকারীর। তাহাদের সামাজিক স্থান ও মোটের উপর সেই অনুযায়ী গঠিত হয়। এইরূপ অধ্যাত্মবাদ তাহা হইলে [illegible] ও স্বার্থে তাহাদেরই হয়।

কিন্তু এই আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে দুটি জগৎ উঠিয়া যায় না। [illegible] প্রমাণিত হইল তাহা এই—প্রকৃত নির্লিপ্ত বা নিরপেক্ষ কিছুই নাই। নিরপেক্ষ তেমন কোনো দ্রষ্টাও নাই, আত্মাও নাই স্রষ্টাও নাই। কারণ সবই চলিতেছে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সংঘাতে রূপায়মান। দ্বিতীয়তঃ, যে ইলেকট্রন [illegible] অনিশ্চিত বলিয়া [illegible] একটি ইলেকট্রনের বেলাই তাহা সত্য। কিন্তু বহু ইলেকট্রন এক সঙ্গে হইলে মোটের উপর তাহাদের ব্যবহার হয়তো ঠিকরূপে নির্ধারণ করা যায়। সমাজের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেইরূপই। ব্যক্তি বিশেষ কিভাবে চলিবে, বলা শক্ত। কোনো হিন্দুর ছেলে ইয়র্কশায়ার [illegible] প্রিয়ও হইতে পারে। কিন্তু মোটামুটি হিন্দু-সাধারণের পক্ষে গোমাংস পরিহার্য। বিজ্ঞানের [illegible] অংশে [illegible] চলিতে পারে নাই [illegible] মোটামুটি [illegible] শ্রেণীস্বভাব আমাদের অপরিচিত নয়।

মোটের উপর কোয়ান্টাম্‌ থিওরির [illegible] পঞ্চাশ বছর পূর্বে বলেছেন। 1878 এঙ্গেলস এর *German Philosophy* [illegible] পৃঃ ৫৫।

'One knows that what is maintained to be necessary is composed of sheer accidents and that the so-called accidental is the form behind which necessity hides itself.'

আপেক্ষিকতাবাদ

এদিকে ইথর যখন টিঁকিল না, তখন বৈজ্ঞানিকদের ভাবনা হইল, 'আকাশ' (space) তাহা হইলে কিরূপ। স্থান-কাল সম্বন্ধে যে ধারণা মানুষের মনে ছিল তাহাও আর টিকে না। এই নিমেষে আমাদের দেশে ছটা দশ মিনিট বিলাতে প্রায় অপরাহ্ণ; তাই ঠিক আমাদের চোখে যাহা ঘটিতেছে বিলাতের চোখে তাহাই ফুটিবে আলোক-গতিতে গেলেও আরও একটু পরে। সকল দেশে সমকালিক (simultaneous) কোনো কিছুই প্রায় নয়। সবই বাকি আপেক্ষিক (relative)। অবশ্য এই কথা মোটেই নতুন নয়, কার্যতঃ কোনো একটা জিনিসের রদ বদল ইহাতে হয় নাই। কিন্তু

ইহার পরে স্থান ও কালকে আর স্থির মানদণ্ড ধরিবার উপায় নাই। ১৯০৫ হইতে ১৯১৫-এর মধ্যে আইনস্টাইনের কাজে এই পুরানো আপেক্ষিকতাবাদ অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ঘটাইল। শিক্ষিত জগৎ শুধু জানিল, স্থান কালে মিলিয়া নতুন এক আয়তন (dimension) এবার স্বীকার করিতেই হইবে। এতদিন মানুষের চিন্তার প্রাকার ছিল তিনটি—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর বেধ। এবার স্থান-কাল তাহার চতুর্থ প্রাকার হইয়া উঠিল। চতুর্থ dimension স্থান-কালের আবিষ্কারের ফলে পুরাতন জ্যামিতি, পুরাতন পদার্থবিজ্ঞান সবই আবার নতুন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইতেছে। সব অদ্ভুত কথা শোনা গেল—দুইয়ে দুইয়ে নাকি চার হয় না। বিশ্বের সর্বত্র হয়ত দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না, ঠিকই; কিন্তু সাধারণ নিয়মের সংসারে তাই বলিয়া দুইয়ে দুইয়ে একবার চার একবার পাঁচ হইবে, তাহাও নয়। সেখানে চার বা পাঁচ, একটি সত্য; যদিও সেই নিয়মের সংসারের বাহিরে তাহা আর সত্য না হইতে পারে। উপগ্রহের পথ ডিম্বাকৃতি (eclipse); 'চতুর্থ আয়তনে' তাহা হইবে পাকানো পথ (spiral); আবার 'মহাশূন্যতাবা'র নিকটে এই দুই পথই বর্জিত হয়—এই তৃতীয় পথকে সেখানে 'সরল রেখা' বলিতেও আপত্তি নাই। এইরূপই আপেক্ষিক দুনিয়ারও ছোট-ছোট হাটে এক একটা নিয়ম—কোনটাই তাহা নিখিল বিশ্বের নির্বিশেষ (absolute) বা চূড়ান্ত নিয়ম নয়। বড় জোর নিজের ক্ষেত্রেই তাহা চূড়ান্ত—আর সেই হিসাবেই খাঁটি সত্যও। ১৯০৩ সনের একজন বাস্তববাদী (লেনিন) এই বিষয়ে যে আভাস দিয়াছিলেন ১৯০৫ এর পরে আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাহা মিথ্যা হইয়া যায় নাই।

"Human conceptions of space and time are relative, but on the basis of these relative conceptions we arrive at (approach ?) absolute truth. These relative conception in their development follow the line of absolute truth and continually approach it. The mutability of human ideas in regard to space and time no more refutes the objective reality of either than the mutability of scientific knowledge concerning the structure and forms of matter in motion refutes the objective reality of the outer world."[1]

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত জগতের মোট দুইএকটু খোঁজ মিলিল। 'জড়' বিজ্ঞানের জড়তা ভাঙিলে শেষ পর্যন্ত এই জগৎ দেখা দিল—এখানে প্রকৃতি মায়া নয়, বাস্তব সামগ্রী; তেজই (energy) তাহার স্বরূপ, তাহার পাথেয়, আর এই দ্বন্দ্বের ফলে গতি তাহার স্বভাব। "Motion is the mode of existence of matter···Matter without motion is as unthinkable as motion without matter."[2]

'মহতো মহীয়ান্'

পদার্থ বিজ্ঞানের এই এক প্রদেশের দুই একটি নতুন চিন্তার হিসাব লইতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল, অথচ বলিতে গেলে এক পাড়ার এক পরিবারের সামান্য হিসাবও ইহা নয়। প্রকৃতির এই রূপই তথাপি শিক্ষিত মানুষের নিকট বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্ব-সংকটের যুগে নানাভাবে উপস্থিত করেন—যেখানে প্রকৃতি মনে হয় অনিয়মের দেশ, যেন অত্যন্ত অপ্রাকৃত। কিন্তু প্রকৃতি মোটের উপর প্রকৃতিই রহিয়াছে, এই কথাটা ভুলিবার উপায় নাই। তাহার জটিলতা ও বিচিত্রতার অর্থ এই নয় যে, প্রকৃতি আসলে মায়াপুরী,—কার্য-কারণের রাজত্ব সেখানে নাই। এই কথা আবার বিশ্ব ও মহাকাশের খোঁজ লইলেও বিজ্ঞান স্বীকার করিবে। সেখানেও অবশ্য বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত রহস্যাকুল হইয়া উঠিতে পারে। কারণ

১. The Physical Nature of the Universe, J. W. N. Sullivan. The Marxist Philosophy and the Sciences J. B. S. Haldane.

২ Anti Duhring, Engels P. 71

পরমাণুর হিসাবে একদিকে যেমন সৃষ্টি 'অণোরণীয়ান্'; বিরাট এর মাপকাঠিতে তেমনি সে 'মহতো মহীয়ান্'। এই বিশ্ব শেষ পর্যন্ত অশেষ নয় (finite)—ইহা আজিকার বিজ্ঞানের মত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার প্রান্তে পৌঁছানো যাইবে, তাহা নয়, সেই ডিম্বাকৃতি পথে ঘোরাই হইবে সার। এই অশেষ বিশ্বের যে চিত্র ১৯৫৭ হইতে মহাকাশ অভিযান আমাদের চোখে তুলিয়া ধরিয়াছে, সেখানে আমাদের বিস্ময়েরও শেষ থাকে না। মহাকাশের সেই সমুদ্রে অন্ততঃ ১০ লক্ষ নক্ষত্র নীহারিকার পুঞ্জ বিঘূর্ণিত হইতেছে দেখা যাইতেছে। ইহারা এক একটি ছায়াপথ রচনা করিয়াছে। এমনি প্রায় ১০ লক্ষ ছায়াপথের মধ্যে, ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র লইয়া এক একটি ছায়াপথ। সেই ছায়াপথের ১০ হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে আমাদের সূর্য মাত্র মাঝারি গোছের একটি নক্ষত্র। আমাদের সৌরমণ্ডল একটা কণার মতো। এই সৌরমণ্ডলের বাহিরে যাইবার সাধ্য এখনো কোনো মানবের নাই। কিন্তু সেই সৌরমণ্ডলের মধ্যে আমাদের ২৫ হাজার মাইল মেখলাপরা এই পৃথিবীকে কোনোরূপে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না। মাত্র দুই শত (২০০) কোটি বৎসর আগে তাহার জন্ম—হয়ত সে সূর্যের বুক হইতে খসিয়া পড়া একটা নির্বাপিত স্ফুলিঙ্গ মাত্র, সৌরমণ্ডলের আলোকিত [illegible] এর কণা নাই। সেই সূর্যের আলোও ক্রমে বিকীর্ণ হইতে হইতে আপনার তাপ হারাইয়া ফেলিতেছে। এই ছাই এর কণার চারিদিকে এর [illegible] সংখ্যার ম্লান অন্ধকার ক্রমশঃই ঘনাইয়া আসিতেছে এমন আশংকাও চলিত আছে। এমনি ভাবে দেখিলে মনে হইবে বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে পৃথিবীর নিয়তিও [illegible] বড় করুণ, বিজ্ঞান যেন পৃথিবীর এবং সূর্যের অন্তিম ক্ষণের আভাস দিতেছে। আবার দিকে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন—এই কোটি কোটি নক্ষত্রের কেবল একটির চারিদিকে [illegible] বৃহৎ সৌরমণ্ডল নাই সেই সৌরমণ্ডলে এরূপ প্রাণধারণযোগ্য বায়ুমণ্ডল নাই, কোনো চেতন [illegible] প্রাণী জন্মে নাই বা জন্মিবে না, তাহাই বা ভাবি কেন [illegible], মানববুদ্ধি যে এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বেই [illegible] প্রাণধারণের ব্যবস্থাও করিয়া ফেলিতে পারিবে না তাহাই বা কে [illegible] সেই পরমাণুর প্রমাণ যেমন মানুষের কাছে আজ বড় বিস্ময়ের, তেমনি বিরাটের প্রমাণও বড় বিস্ময়ের। দুই দিকের কোনো প্রমাণই মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয় এই কথা—এই আপেক্ষিক সত্য—পৃথিবী চলিয়াছে, তাহার বুকে এই পরম বিস্ময়ের বিশ্বের পরিচয় লইবার জন্য পরম বাস্তব এক জীবজগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেই বিশ্বের মহানাট্যশালায় মানুষ নামক একটি জীব এখন নিজেও এর বিস্ময় নাট্যের স্রষ্টা, এবং তাহার সেই জীবনও এক মহানাটক। কিন্তু মহাবিশ্বের অন্য কোথাও প্রাণ ও চেতন প্রাণী ছিল না বা নাই, ইহাও বলা যায় কি [illegible] না। [illegible] পর্যন্ত মানুষই আমাদের জ্ঞাত প্রধান সচেতন সত্য।

প্রাণি-বিজ্ঞানের জগৎ

পৃথিবীর যখন দেড়শত কোটি বৎসর বয়স এমন সময়ে নাকি তাহার কারখানা ঘরে কোথা হইতে জন্মিয়াছিল প্রাণ। সেই প্রাণের মহানাটক অগ্রসর হইতেই জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল আবার মন। দুই দুই বারে প্রাকৃতির ধারা [illegible] জীবনযাত্রায় এই যে বিপ্লব ঘটিল আধুনিক বিজ্ঞান সবে তাহার অর্থ বুঝিতে শুরু করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়া উঠিতেছে 'জড়'-প্রকৃতির সঙ্গে জীব প্রকৃতির দ্বন্দ্ব সমন্বয়, আবার মানব-প্রকৃতির সঙ্গে জীব প্রকৃতির ও জড়-প্রকৃতির নানা ঘাত প্রতিঘাতের অর্থ, বারে বারে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের এই ইতিহাস।

কোথা হইতে প্রাণ আসিল, এই প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্য আজও হয় নাই, তবু এই প্রশ্ন যে বারে বারে উঠিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। প্রাণহীন বস্তুর সীমা ও প্রাণবান্ বস্তুর সীমার মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা প্রায় এক অর্ধ-স্পষ্ট সেতুর সন্ধান পাইয়াছেন—এই জাতীয় বস্তুর নাম ভাইরাস্, আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ষ্ট্যানলি ইহার প্রথম গবেষণা করেন; ইংলণ্ডে উহার গবেষণা করিয়াছেন পিরি, বডেন ও বের্নাল। সেই সন্ধান আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে সোভিয়েত দেশে, এবং আরও

অনেক দিন তাহা চলিবে। কারণ, প্রাণ ও নিষ্প্রাণের সীমারেখা এখানে। কেহ বলিবেন ভাইরাস্‌গুলি বাঁচে ও বাড়ে; কেহ বলিবেন ভাইরাস্‌গুলি আছে ও ছড়াইয়া পড়ে। কার্যত কথাটা প্রায় এক। কারণ, প্রাণ নিষ্প্রাণের এইখানে যেন যুগ-সন্ধি; তাই দুইরূপে বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়, দ্বন্দ্বের সমন্বয় তাহার মধ্যেও অনুস্যূত।[১] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে প্রাণের উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৭ খ্রীঃ এর আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক প্রাণ রসায়ন সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য ছিল এই বিষয়। তাহাতে সোভিয়েতের অ্যাকাডেমিসিয়ান্‌ ওপারিন-এর গবেষণা এই বিষয়ে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছে, বলা হয়।

প্রাণের এই উন্মেষটিই এখনো মানুষের অগোচর, না হইলে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত প্রাণীর ইতিহাস আজ আর প্রশ্নের বিষয় নাই —ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ শুধু বিজ্ঞানের জগতে সর্ববাদিসম্মত নয়, সাধারণ মানুষেরও জীবন সম্বন্ধে চিন্তায় তাহা সহজ সত্য হইয়া উঠিতেছে। উহার মূল কথা লইয়া আজ আর বিবাদ নাই। জীবাণুকোষ প্রথম ছিল একা সম্পূর্ণ—যেন এক একটি প্রাণ পরমাণু, তাহার পর একত্রিত হইল স্পঞ্জের মত প্রাণপুঞ্জে, তাহারও উচ্চস্তরে এক শাখা দেখা দিল সামুদ্রিক-এনিমোনের মধ্যে, আর এক শাখায় কেঁচোর মত জীব, আর একটু পরে খোলসময় জীব—যেমন চিংড়িমাছ বা বিছা, আর এক শাখায় দেখি মলাস্ক বা গুগলি, বা ঝিনুক প্রভৃতি, আর এক শাখায় মেরুদণ্ডবান প্রাণী। ইহাদের প্রত্যেকের শাখা প্রশাখারও শেষ নাই সেইখানেও মনে হয় কত সহস্র সৃষ্টি ধারা।

প্রাণিবিজ্ঞান যেইভাবে মানুষের জীবনকে কার্যত সংহত করিতেছে তাহা পুনরুল্লেখ না করিলেও চলে—কৃষি ও ফসলের উন্নতির পিছনে ইহার আবিষ্কারই কার্যকরী হইয়াছে। সেইরূপে ব্যাকটেরিয়ার জগৎ পাস্তুর আবিষ্কার করায় পীড়া প্রতিষেধ আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে।[২] আসলে, মানুষের সমস্ত সমন্বয়ের প্রেক্ষাপট রচনা করিয়াছে প্রাণীবিজ্ঞান। জীবনের এই বৃহৎ পটভূমিকা এখন মানুষের কাব্য ও দর্শনের এক প্রধান উপজীব্য—যেমন, বের্গসঁর চিন্তার, বার্নার্ড শ'র রবীন্দ্রনাথের বিচারে। এই প্রকাণ্ড পট সাধারণ মানুষেরও মনকে প্রসারিত, প্রশান্ত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে—এত বৈচিত্র্য, এত সৌন্দর্য, এত বিনাশ, এত বিস্ময়, এমন সংঘাত অথচ এমন সহযোগিতা, প্রাণহরণের এমন অনন্ত প্রয়াস অথচ প্রাণদানের এমন দুর্নিবার আগ্রহ, দিনরাত্রির মত এমন জন্মমৃত্যুর আলিঙ্গনবদ্ধ যাবতীয়তা, দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়,—ইহা পদে পদে আসিয়া মানুষের চিত্তকে সচকিত ও সচেতন করিয়া তুলিতেছে। ইহার মধ্য দিয়া যে কয়েকটি ধারণা ক্রমেই সংস্কৃত হইয়া পড়িতেছে তাহা মোটামুটি এই:[৩] (১) মানুষ শুধুমাত্র যন্ত্র নয়—যদিও কতকাংশে দেহযন্ত্র যে এক জটিল যন্ত্র তাহাও সত্য। (২) জীব-জগতের ইতিহাসের ধারায় না দেখিলে মানুষকেও যথার্থ দেখা হয় না—জীবমাত্রেরই সেই বাস্তব ইতিহাস মানুষের মধ্যেও জীয়াইয়া আছে। (৩) সেই ইতিহাস আবার নতুনও হইয়া চলিয়াছে। কথাটা একেবারে দৈহিক (germ-plasm) হিসাবেও সত্য। (৪) "জীব-ক্রিয়া পরিবেশ" (Organism-Function Environment) এই তিনে জীবনের গড়া-পেটা চলিয়াছে (তাহারই সহিত মানুষের সমাজে যোগহয় "জাতি-কর্ম-দেশ"—এই নতুন বৈচিত্র্য: আর বাড়ে তাহার ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়)। (৫) এমনি প্রাক্তনের ও সদ্যতনের ঘাত-প্রতিঘাতে নিত্য নতুন বৈচিত্র্যের (Variation) আবির্ভাব ঘটিতেছে, জীবের জন্ম ধারা শেষ হয় নাই,—নবতন জীবরূপে সর্বদাই আসিতেছে। এইরূপে জীবের দেহবস্তুর সমাবেশ ও সমন্বয় দেখা যায়। (১) পরিবর্তনের মধ্যে প্রোটিনের অক্ষুণ্ণ অস্তিত্ব, কলোডয়েল প্রোটোপ্লাজমের ভাঙা-গড়া; প্রতি জীবের মধ্যে তাহার প্রোটিনের নিজস্বতা (Specification)। (২) এই দেহবস্তুতে জীবের জীবন-ক্রিয়ারও তিনটি লক্ষণ স্পষ্ট:—বৃদ্ধি (Growth) সংখ্যাবৃদ্ধি বা বংশবৃদ্ধি (Multiplicty),

১ The Marxist Philosophy and the Sciences, J. B. S. Haldane. The Origin of the Life on Earth, A. I. Oparin, 3rd Edn. 1957.

২ দ্রষ্টব্য Applied Biology. N. M. Pirie.

৩ Biology, Patrick Geddes, Biology and Human Progress J. Aurther Thompson

খণ্ডের পরিণতি (Development)। (৩) আর জীবের অন্য তিন চিহ্নও তেমনি স্পষ্ট—অতীতের সংরক্ষণ (Enregistration), বিকাশের সম্ভাব্যতা (Evolvability) ও সচেতন প্রাণীর পক্ষে সচেতন ভাবে ব্যবস্থা আয়ত্তীকরণের শক্তি।

ডারুইনের পরে এই প্রাণবিজ্ঞানের চর্চাতেও যে ডারুইন বিরোধী দ্বন্দ্ব জাগিয়াছিল তাহার ছায়াও অবশ্য এই গবেষণাক্ষেত্রে পড়িয়াছিল। যথা যন্ত্রযুগের আধিপত্যে মানুষকে প্রথম দিকে শুধু একটা দেহযন্ত্র বলিয়াই প্রমাণ করা চলিয়াছিল (Mechanist)। উহার প্রতিবিধানে আসিলেন প্রাণবাদীরা (Vitalists), রবীন্দ্রনাথ, বের্গস্‌ঁ প্রমুখ অপর মনস্বীরা ইহার সাহিত্যিক [illegible] বহন করিতেন। কিন্তু দেহযন্ত্রকে একেবারে উড়াইয়া দিবার শক্তি বা সাহস প্রাণবাদীদের নাই। বরং পাভ্লভ, ওয়াটসন ও তাঁহাদের শিষ্যদের গবেষণায় দেহকে যন্ত্র হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিত। ডারুইনের পরেকার বিবাদের পরে আবার সমন্বয় দেখা দিতেছে। ঠিক এই দিক হইতেই পরিবেশ ও প্রাণীর সম্বন্ধ লইয়া বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাও। প্রকৃতির ঝাড়াই বাছাইয়ে (Natural Selection) সেই প্রাণীই টিকে যে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। জীবজগতের সংগ্রামে (Struggle for Existence) উহাই বাঁচিবার পথ—ডারুইন তাহা দেখাইলেন। এখন কি বংশানুক্রম বিজ্ঞানের গবেষণায়ও দেখা যাইতেছে জন্মের গোড়ায় যে স্ত্রীপুরুষের জোড়া জীন (Gene) বা জীববীজ থাকে তাহার আদান প্রদানের বৈচিত্র্যই বিচিত্র জীব জন্মায়, নতুন জীব দেখা দেয়। কিন্তু প্রায়ই সেই নতুন জীব বাঁচে না কারণ পরিবেশের পক্ষে তাহারা উপযোগী হয় না। তবু [illegible]—জীবজগতের বিকাশ শুধুই ধারাবাহিক নয়—ডারুইন যেমন ধারাবাহিক মনে করিয়াছিলেন, জীবেরও বিকাশ হয় দমকে দমকে, লাফে লাফে। তাই জীবের ক্রমোন্নতি (Evolution) হইয়াছে—এখন তাহাকে 'আকস্মিক অভিব্যক্তি'ই ('Emergent Evolution'—Lloyd Morgan) বলি, [illegible] ক্রমবিকাশই বলি। ইহাও ডারুইন হইতে এক নতুন বিরোধ।

আরো বিরোধ পরিবেশ সম্বন্ধে। ডারুইনের পূর্বে লামার্ক বলিয়াছিলেন মানুষের কোনও গুণ অভ্যাস প্রভৃতি হইতে হইলে তাহাও পুরুষানুক্রমে মানুষে বর্তায়। এবং পরিবেশের প্রভাবে নিত্যই নতুন সব গুণ মানুষের মধ্যে জন্মিতেছে, তাহাতেই পুরুষের পর পুরুষে বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব আসিতেছে। ডারুইনের ঝোঁক ছিল পরিবেশের পরিবর্তনের দিক দেখাইবার দিকে এখনকার ঝোঁক জীবের পরিবর্তনের দিক দেখাইবার দিকে। ইহাই প্রাণবিজ্ঞানের তৃতীয় এক বিতর্ক। মোটের উপর নতুন জীবের জন্মের কারণ জীববীজ। কিন্তু ভ্রূণ অবস্থা হইতেই সেই বীজ বাহিরের প্রভাবে, ধাক্কায় ঘাতপ্রতিঘাতে জীব রূপ লইতে থাকে। ডারুইন দেখিয়াছিলেন—জীবের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জীবের বিকাশ, উহা অনেকাংশেই যেন আত্মধ্বংস। অন্যদিককার মতে জীবের আসল দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় পরিবেশের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, সেই প্রকৃতিরই অংশ তাহার প্রাণ। এই পরিবেশের উপর যে পরিমাণে যে জীব আপন অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছে, সেই পরিমাণেই সেই জীব হইয়াছে জীবন সংগ্রামে জয়ী—অর্থাৎ উন্নত জীব। নিজেকেও তৎপর সে নিয়ন্ত্রণ করিয়া লইতে পারিয়াছে, নিজের চেতনার সাহায্যে বাহিরকেও সে নিজের উপযোগী করিতে পারিয়াছে। এইখানেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ধারায় আসিয়াছে চিন্তার উদ্ভব, অর্থাৎ মনের কৃতকার্যতা। প্রাণ ও পরিবেশের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে মনই শ্রেষ্ঠ উপায়। তাই বুদ্ধির সৃষ্টি, বিজ্ঞানেরও বিশেষ কার্যকারিতা এই পথে দিনের পর দিন বাড়িবার সম্ভাবনা। তাই মনস্তত্ত্বকে এখন মনোবিজ্ঞানে পরিণত করার প্রয়োজন।

মনোবিজ্ঞান

মন লইয়া মানুষের মন বরাবরই ভাবনায় পড়িয়াছে। সংবেদনা, জ্ঞান অনুভূতি ইত্যাদি লইয়া দর্শনের শাখা হিসাবে 'মনস্তত্ত্ব' তাই অনেক দিনই চলিত ছিল। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের জন্ম

১ Heredity and Politics, J. B. S. Haldane, Genetics and Social Order, Max Graubard, The Science of Life, H. G. Wells, Julian Huxley, G. P. Wells, Animal Biology J. B. S. Haldane and Julian Huxley প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে অত্যন্ত অল্প দিন। ইতিমধ্যেই তাহাতে দুই এলাকা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—যেমন মনস্তত্ত্ব (Psychology) ও মনোবিকলন বা গূঢ় মনস্তত্ত্ব (Psycho-analysis বা 'Depth' Psychology).

ডারুইনের পর হইতে মনের হিসাবও নতুন করিয়া করিতে হইয়াছে। জীব-জীবনের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করিয়া হর্বর্ট স্পেনসার মনের সহযোগিতা সূত্রে (association) ক্রমবিকাশ আবিষ্কার করিলেন। ইহার বিস্তৃবাদ গাল্টনে দেখা যায়। ডারুইনের মতে বৈচিত্র্য (variation)' নির্বাচন (selection) ও পরিগ্রহণের (adoption) সূত্রে ব্যষ্টিই অগ্রসর হয়। ব্যষ্টিমনের বৈশিষ্ট্য তাই গাল্টন মানিয়া লইলেন। মনে রাখা দরকার তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। গাল্টন বাহির করিতে বসিলেন বিবিধ ব্যষ্টিমনের ও মনের বিবিধ বৃত্তির পরস্পর সম্পর্কের হিসাব (co-efficient correlation)। আবার, জীব ও অনুন্নত শিশু ও বিকৃতচিত্তদের মনের তুলনামূলক বিচারও ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ হইতেই শুরু হইল। এইরূপে পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বও (Experimental Psychology) মনোবিজ্ঞানের স্তরে উঠিয়াছে—শ্রমশিল্পে (Industrial Psychology) অ্যাভেলিং প্রভৃতি, বিদ্যাশিক্ষার (Behaviourist Psychology) ওয়াটসন, ডিয়ুই আদি দার্শনিক এবং শেষে সামাজিক ক্ষেত্রে (Social Psychology) ম্যাকডুগাল প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনের ক্রিয়া প্রক্রিয়া, নিয়ম অনিয়ম, বিশেষ গবেষণার বিষয় করিয়া তোলেন। শিল্পাগারের ও পুঁজিপতির প্রত্যক্ষ তাগিদে 'শিল্প-সহায়ক মনোবিজ্ঞানের' জন্ম - শ্রমিকের মনের ক্লান্তিতে হাতের কাজ যাহাতে কমিতে না পারে, ক্রেতার মনে যাহাতে পণ্যের বিজ্ঞাপন দাগ কাটিতে পারে,—এই সবই তাহার বাস্তব উদ্দেশ্য। "আচরণবাদী" মনোবিজ্ঞান মনের প্রকাশ দেখিল "আচরণে"। তাহার গবেষণায় মনই আর নাই; আছে মস্তিষ্কের কোঠায় স্নায়ুতে ও পরিবেশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘাত-প্রতিঘাত আর সেই ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত প্রতিলিপি (conditioned reflex)। এই তত্ত্ব প্রথম যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতা (mechanistic)-বাদের নতুন বিকাশ, মানুষের চিন্তা-ভাবনা হইতে সমাজ নিয়ামন-পর্যন্ত ইহার উদ্দেশ্য। রুশদেশে শারীর বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পাভ্‌ভ্ কুকুরের উপর প্রথমদিকে এইরূপ ধারায় গবেষণা চালান, পরে তাঁহার ধারণা কিছু পরিবর্তন করেন। আমেরিকায় ওয়াটসনের অনুসরণে প্রসিদ্ধ মনস্বী ডিয়ুই শিক্ষার ক্ষেত্রে আচরণবাদী নীতির প্রয়োগ করেন। মার্কিন পুঁজিপতিরা ইহা প্রয়োগ করিতেছেন বিজ্ঞাপন প্রচারে। প্রচারকের হাতে মানুষের মন যে প্রায় যন্ত্র—এই কথা গোয়েবেলস-হিটলার হাতে হাতেই প্রমাণ করিয়াছেন; আর মন যে পরিবেশের পরিবর্তনে পরিশীলিত হয় তাহাও সোভিয়েত ভূমিতে প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু পাভ্‌লভের মতে এই স্নায়বিক আবিষ্কারের এত একবোখা সরল ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। সোভিয়েতের মত এই যে মনও পরিবেশকে আবার প্রভাবিত করে, পরিবর্তিত করে। অর্থাৎ মনও মিথ্যা নয়, তবে তাহাই আদিবস্তু নয়—বস্তুর যাত্রাপথে প্রাণের প্রবাহে মন একটা বিপ্লবী বিকাশ। আর তাই মনও বস্তুর প্রবাহের একটা প্রবাহ (process)—নিরেট পদার্থ নয়। তাই সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থার ছায়ায় মনের ধ্যান-ধারণা স্থির হয়। একেবারে আদিযুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত সামাজিক ব্যবস্থার প্রভাব এইভাবে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনায়ও মোটের উপর লক্ষ্য করা যায়। (*The Marxist Philosophy and the Sciences*, J. B. S. Haldane, p. 129 136 দ্রষ্টব্য)। জার্মান টোট্যালিটেরিয়ানিজমের পূর্বাভাস যেমন ট্রিটস্কে বা স্পেংলারএর রাষ্ট্রচিন্তায় পাওয়া যায়, তেমনি তাহা জার্মান "সামগ্রিক মনস্তত্ত্ব" বা 'গেস্টাল্ট সাইকোলজি'র (Gestalt Psychology) প্রবক্তা কোহলের, কোফ্‌কার মতবাদেও পাওয়া যাইবে। 'সমগ্র' যাহা তাহা শুধু অংশ-সমূহের এক যোগ ফল নয়, তাহা নিজেও একটা নতুন জিনিস। এইমতে মন শুধু একের পর এক যোগ করে না, উহাদের সংযোগের ফলেও জন্মে না; মন খণ্ডকে সমগ্র করিয়া তোলে। দেহের স্নায়ুর মধ্যেও তেমনি এক একটি সমগ্রের প্যাটার্ণ রহিয়াছে,—তাহাই বাহিরের প্রয়োজনে আবার সাড়া দেয়। স্পেনসারের সময় হইতে যে 'সংযোগবাদ' দেখা দিয়াছিল, এইভাবে ইঁহারা তাহারই প্রতিবাদ করিলেন। ইঁহারা বলেন, সম্মুখস্থ উদ্দেশ্যের তাগিদেই এই সমগ্রতাও সাধিত হয়; উদ্দেশ্যও পূর্বেই নিহিত থাকে। যেমন, নাৎসি সামগ্রিকতাবাদও হয়ত উদ্দেশ্যের তাগিদেই দেখা দিল—তাহাতে 'আর্য' জাতির, অর্থাৎ জার্মান জাতির, প্রাধান্য স্থাপনই সেই উদ্দেশ্য।—হিটলারের জন্য ল-কোফ্‌কাও পথ তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

কিন্তু আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটাইয়াছে মনোবিকলন—বিশেষ করিয়া ফ্রয়েড। বলা হয় নিউটনের পরে বৈজ্ঞানিক চিন্তায় এমন বিপ্লব নাকি আর কেহ সাধন করিতে পারেন নাই। অবশ্য গত বিশ বৎসরে তাহার সংশোধন চলিতেছে। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের মূলসূত্র আজ কলেজের ছাত্র মাত্রেরই মুখে মুখে ফোটে—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা মনোবিকলনের ভুল কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। মোটের উপর এইরকমই শিক্ষিত জগতে ফ্রয়েডের অপ-প্রভাব। ফ্রয়েড অবশ্য প্রাণবিজ্ঞানের এবং সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষক ছিলেন, কিন্তু মানুষের চক্ষে তিনি শুধু মাত্র যৌন মনস্তত্ত্বের (Sex Psychology) প্রবর্তক হইয়া রহিলেন। লোকের এই ধারণা একেবারে ভুলও নয়। সত্যই ফ্রয়েড মনে করিতেন—মানুষের মন ছাইয়া আছে আসঙ্গলিপ্সা; তাহারই ছলনা তাহার নানা ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে। কারণ, সমাজের অনুশাসনে সেই লিপ্সার তো স্পষ্ট প্রকাশ সম্ভব নয়। অতএব, মানুষের কথা-কাজ সবই 'প্রতীক' (Symbol),—ধোঁয়ার ছল করিয়া কাঁদা। কিন্তু মজা এই, এই ছল সে নিজেই জানে না; ভাবে সত্যই ধোঁয়ার জন্যই কাঁদিতেছে; অথচ কান্না জমিয়া থাকে বুকের তলায় 'নির্জ্ঞানে' (Unconscious)। মানুষের যতটুকু মন জানা (conscious) ততটুকুই সভ্য মন, পোশাকী মন, সমাজশাসিত মন,—তাহা লইয়াই এতদিন মনস্তত্ত্বের কারবার চলিয়াছে। মনের অতল সমুদ্র অজানা, সেই 'নির্জ্ঞানের' সমুদ্রেই বন্দীবাসনার ক্ষুব্ধ গর্জন। ফ্রয়েড ব্যক্তির মনের তিনতলায় তিন দেবতা দাঁড় করাইলেন—আদিম উদ্দাম কামনা বা ইদ্ (Id), যে স্বার্থ-সর্বস্ব ও তাই কাম-সর্বস্ব। 'অহং' (Ego), যে বাহিরের সঙ্গে কামনার সন্ধি সমন্বয় করিতেছে। তাহার প্রহরীরা (Censor) পরাস্ত হইলে বা ঘুমাইয়া পড়িলেই 'ইদ্' অপদেবতা ঘুমের রাজ্য ও মানব রাজ্য ছারখার করিয়া ফেরে—মানুষ বিকৃত-চিত্ত হইয়া পড়ে। আর মনের তৃতীয় প্রদেশে কর্তা 'পরাহং' (Super Ego)। তাহার শাসন আসলে আদর্শের দোহাই, 'ইদ্' এর বাড়াবাড়িরই উল্টো পিঠ। বাস্তবের সহিত 'পরাহং'এরও সমন্বয় করিতে থাকে 'অহং'। ইদ্ ও পরাহং এই দুই চাপে পড়িয়া 'অহং' প্রতি নিমেষেই হারিতেছে, কিন্তু মোটের উপর তবু বাস্তবের শাসন টিকাইয়া রাখিতেছে। তবে যতই আদর্শের দোহাই বাড়ে ততই বাস্তবের বাঁধন খসিয়া পড়ে, তখন 'অহং' আর মনের সাম্য টিকাইয়া রাখিতে পারে না। মনে তখন নানা নিউরোসিস, নানা বিকৃতি দেখা দেয়। খাড়া থাকিতে পারিলে 'অহং' শেষ পর্যন্ত ইদের প্রচণ্ড শক্তিরও উন্নয়ন বা রূপান্তর (sublimation) করিতে পারে। আবার অহং খাড়া থাকিলেও তাহাকে নানাভাবে ফাঁকি দিয়া কামুক ইদ্ কখনো মানুষকে করিয়া তোলে 'ভেরোরির সহিষ্ণু বৈষ্ণব' (masochist) আর কখনো বা হিংস্র অত্যাচারী (sadist)। মানুষের যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি পরপীড়ন এবং নানা তপশ্চর্যায় আত্মপীড়ন—সেই একই নির্জ্ঞান কামলিপ্সার দুইরূপ, বিকৃত প্রকাশ।

ফ্রয়েডের গবেষণার সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই নির্জ্ঞানলোক। কিন্তু এই নিজেরই অজ্ঞাতে নিজের বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া—নূতন আবিষ্কার নয়। নিজের মনকে জানিয়া না জানিয়া চোখ ঠারিতে অনেকদিন হইতেই মানুষ শিখিয়াছে। না শিখিয়া উপায় ছিল না—বৈষম্যময় সমাজে বাস্তব জীবন-যাপন দুঃসহ হইত। বাস্তব প্রয়োজনে মানুষ নিজেরই অগোচরে যুক্তি-যোজন (Rationalisation) করে; আর সেই বাস্তব প্রয়োজন বাস্তবিকই সামাজিক। তবে ফ্রয়েড বলিয়াছেন—এই তাড়না বাঁচিবার অর্থাৎ কামনার তাড়না, আর আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান বলিবে—তাড়না মূলত বাঁচিবার, আর তাই খাইবার-পরিবার, যৌন-কামনার অপেক্ষাও ক্ষুৎপিপাসা জীবজগতে বেশি আদিম, ব্যাপক এবং প্রচণ্ড। এই আহার্য ও জীবিকার জন্যই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রেণীমনোভাব জন্মে, আর শ্রেণী-মনোভাব প্রয়োজনানুরূপ যুক্তিও আপনা হইতেই জোগায়। সামাজিক দিক হইতে "নির্জ্ঞানের" এইরূপ আবিষ্কার তাই পঞ্চাশ বৎসর পুরাতন: "All the driving forces of actions of any individual must pass through his brain, and transform themselves into motives of his will in order to set him into action." (*Feurbach and German Philosophy* Engels, 1885), ইহার উপরই এক অর্থে মার্কসের মতবাদ গঠিত। দ্বিতীয় কথা, ফ্রয়েডের গবেষণা-বিষয় ব্যক্তি-মন তাঁহার সমস্ত চিন্তায় তিনি এই কথা মূল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন,—ব্যক্তিমন

ও সমাজের দাবীতে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। ব্যক্তিমন স্বার্থান্ধ, কামান্ধ, আর সমাজ চায় দশ জনের প্রয়োজনে স্বার্থত্যাগ, কামনা-সংযম ; অতএব ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। এই কথাটা বড় ভুল। ব্যক্তি যদি সমাজ-দ্রোহীই হইত তাহা হইলে সমাজের আদৌ বিকাশ হইত না, মানুষের অ-সামাজিক প্রবণতাগুলি (স্বার্থান্ধতা, কামান্ধতা যা 'ইদ্'-এর শক্তি এবং অ-সামাজিক আদর্শবাদিতা, যা 'পরাহং' এর অত্যাচার) অপেক্ষা মানুষের সামাজিক চেতনা (সমন্বয় শক্তি, বিপ্লবী শক্তি, যা 'অহং' এর কাজ) মোটের উপর বেশী শক্তিশালী—তাই সমাজের জন্ম সম্ভব হইয়াছে। মনোবিকার এই সামাজিক-ধর্মচ্যুতিরই (de-socialisation) নাম ; আর sublimation অর্থ জৈব প্রবৃত্তির সামাজিকতাসাধন, অর্থাৎ সমন্বয়-সাধন। আসলে এই ভুলের কারণ—ধনবৈষম্য পীড়িত সমাজে মানুষের কাছে সমাজকে ব্যক্তির প্রপীড়ক বলিয়াই ঠেকে। ফ্রয়েড লক্ষ্য করেন নাই—সামাজিক বৈষম্যে ব্যক্তি-মন কতটা বাঁকিয়া চুরিয়া যায়। দেখেন নাই ব্যক্তিবিশেষ যদি বা—ইলেকট্রন বিশেষের মত—স্বশ্রেণীর বন্ধন কাটাইয়া উঠে, সাধারণ মানুষ—সাধারণ ইলেকট্রনের মতই—চালিত। ফ্রয়েডের নিজেরও এই মূল বিষয়ে ভুলই তাহার প্রমাণ; এবং যদিবা পৃথিবীর অপরিমিত দুর্দশার—এবং ফ্রয়েডেরও নিজেরও দুর্দৈবের—কারণ কোনো এক নিউরোটিক হিটলার, ভুলিলে চলিবে কেন তাহারও পশ্চাতে আছে সমস্ত জার্মান জাতির চিত্তবিকার ও আর্থিক বিকার ভার্সেঈর সন্ধি, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, পুঁজিবাদের গভীর সংকট। মনোবিজ্ঞান তাই অনেকাংশে সমাজ বিজ্ঞানেরই একটি প্রদেশ। এই কথাই বিজ্ঞানের সাক্ষ্য। তবে এখনো পর্যন্ত তাহার সমস্ত এলেকার সন্ধান কমই মিলিয়াছে। মানুষের ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য এখনো আছে কাণ্টের কথিত সেই বিস্ময়—উপরের মহাকাশ আর মনের মহাবিশ্ব।

তবে এইবার বিজ্ঞান যে দিক নির্দেশ করিয়াছে সেখানে তাহার 'প্রবেশ নিষেধ'। মানব-প্রয়াসের নানা ক্ষেত্র যখন বিজ্ঞানের প্রয়োগে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে তখনি বুঝা গেল—এক নতুন জগতের জন্ম হইতেছে। উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে অনিবার্যরূপে বিজ্ঞান অগ্রসর হইতে চাহিল সামাজিক ক্ষেত্রে—বৈজ্ঞানিক সমাজ-সম্পর্ক তাহার প্রয়োজন। আর তাহা হইলেই বৈজ্ঞানিক-মন তাহার আবেষ্টনীতে সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারিবে, বিজ্ঞানের দান মানুষের মানসলোকে স্বচ্ছন্দে পেঁৗছিবে। কিন্তু এইখানেই বিজ্ঞান ঠেকিয়া গিয়াছে। শ্রেণীর 'ইদ্' নানা ওজরে আপনার রাজ্য অক্ষুন্ন রাখিতে দৃঢ়-সংকল্প। মাত্র পৃথিবীর একটি দেশে বিজ্ঞানসম্মত সমাজ-সংগঠনের সজ্ঞান প্রয়াস প্রথম ১৯১৭ এর পরে লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে বিজ্ঞানের বিপ্লব স্পষ্ট হইল। তাহার পর এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবী বৈজ্ঞানিক সমাজ গঠনে ব্রতী। বাকী পৃথিবী আমেরিকা-ব্রিটেন চালিত পথে পূর্বতন সমাজকে বৈজ্ঞানিক পথে মেরামত করিয়া চলিতে সচেষ্ট হন। সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে স্বীকার করিতে তাহারা কুণ্ঠিত আর কতকটা তাহারা মানব সমাজের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগে অস্বীকৃত। তবু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান গ্রহণে তাহারাও বিমুখ নন—তাহাদের আশা টেক্‌নোলজির বা কারু-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজও অক্ষুন্ন থাকিবে।

গ্রন্থপঞ্জী

পঠিতব্য গ্রন্থগুলির নাম প্রবন্ধ মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে। যে দুই একখানা গ্রন্থ এই সব বিষয়ে অবশ্য পাঠ্য ও সহজলভ্য এখানে তাহারই শুধু নাম করা হইল।

Marxist Philosophy and the Sciences, J. B. S. Haldane.

The Science of Life, Julian Huxley, H. G. Wells.

Outline of Modern Knowledge (Gollancz).

Science for the Citizen, L. Hogben.

Social Functions of Science, J. D. Bernal,

Social Relations of Science, J. G. Crowther.

Plastics. V. and E. Earsley, E. G. Couzens. (Pelican Books Reprint 1945-63)

নবম অধ্যায়

ভারতে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা

পৃথিবীতে মানুষের যাত্রা সমছন্দে চলে নাই, তাহা পরিষ্কার। মানুষের সংস্কৃতিতে তাই তালেরও তফাৎ ঘটিয়াছে, মানেরও তফাৎ ঘটিয়াছে। তাহা লইয়াই আমরা সংস্কৃতির মধ্যে জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া বসি। আসলে মূলত যে এক বিরাট ঐকতান মানুষের সমস্ত ইতিহাস জুড়িয়া সমুত্থিত হইতেছে—প্রকৃতির হয়ত ইহাই পরিহাস যে, মানুষ তাহাই শুনিতে চায় না। যে মানুষ দিনের পর দিন প্রকৃতির রাজ্য জিনিয়া লইতেছে, সে-ই সচেতন নয় যে, কত বড় বিরাট তাহার সাধনা। তাই নিজের ইতিহাস-জোড়া সে প্রকাশকে কেবলি খণ্ড করিয়া দেখে, খণ্ড করিয়া ফেলে; তাহার মধ্যে জাতিভেদ বর্ণভেদ সৃষ্টি করিয়া বসে—বৈশিষ্ট্যকে জানে বিভেদ বলিয়া। এমন কি, খণ্ডকে সমগ্রের সহিত মিলাইয়া বুঝিতেও সে চায় না।

খণ্ডকেও অবশ্য দেখিতে হইবে,—কারণ, মানুষের যাত্রা সমছন্দে চলে নাই, সংস্কৃতির বিকাশ সমতালের নয়। ইহার কারণ এই যে, বিকাশও অসমান। নানা কারণেই এই অসমানতা আসিয়াছে। আমাদের মতো প্রাচীন দেশ একদিন সংস্কৃতির পুরোধা ছিল; আজ তাহা পিছাইয়া-পড়া দেশের কোঠায়। যেমন সম্রাট আকবরের কাল পর্যন্তও ধরিলে মনে করিতে পারি, উহা এলিজাবেথের যুগ হইতে গৌরবে ম্লান নয়। ভারতবর্ষ পৃথিবীতে তখনো তাহার আসন খোয়ায় নাই—মানুষের যাত্রায় তাহার স্থান পিছনে নয়। অবশ্য সেক্সপীয়র আছেন—আর একা সেক্সপীয়রই আবহমান মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অতুলনীয় মহিমা। কিন্তু ফৈজী, আবুল ফজল, কিংবা বিচক্ষণ তোডরমল আর আকবরের সভায় জৈন, খৃষ্টান, পারশী, হিন্দু, মুসলমান সকল ধর্মের সেই আলোচনা—ইহাতে সংস্কৃতির যে পরিচয় লাভ করা যায়, তাহা তখনকার যে কোনো দেশের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের হইত। তবু এক শতাব্দী পার হইতেই দেখি—ভারতবর্ষ একেবারে ম্লান।

ইহার কারণ অবশ্য অনেক আছে। কিন্তু যে কারণটি সহজেই চোখে পড়ে তাহা এই—বিজ্ঞানের জন্ম। আকবর এলিজাবেথের যুগের তুলনা হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপের বাস্তব জীবনযাত্রা তখন জীবিকার সাধনায় চঞ্চল, তাহা পৃথিবীব্যাপী ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহার সম্মুখে এক Brave New World। তাহার চক্ষে মানুষ এক পরম বিস্ময়, তাহার দৃষ্টিতে তাই বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্য। গেলিলিও-বেকন সে যুগের জন্মদাতা। উহার তুলনায় মনে হয় আমাদের তখনকার সমস্ত চেষ্টাই যেন "ভারতীয় মস্তিষ্কের অপব্যবহার"। তাই শতখানেক বৎসরের মধ্যে ইউরোপ যখন মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র হইতে নতুন বণিকতন্ত্রে নবজন্ম লাভ করিল আমরা তখনো রহিলাম সেই সামন্ত যুগেই। ইহার ফলে আমাদের জীবনে বিজ্ঞানও স্বাভাবিকভাবে আসিল না, আসিল পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে; আমরাও স্বাভাবিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অধিকারী হইতে পারিলাম না, বিজ্ঞানকে পাইলাম পরের সম্পত্তি হিসাবে।

আমাদের জীবনযাত্রার পক্ষে ইহার ফল যে কত গুরুতর তাহা হয়ত স্পষ্ট করিয়া আমরাও বুঝি না এবং আমাদের বৈজ্ঞানিকগণও বুঝিয়া দেখেন না। কারণ, এই বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টির বিকাশের অর্থ—বৈজ্ঞানিক মনের বিকাশ। জীবনের প্রধানতম ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রবেশলাভের অর্থ—জীবন-বোধে নতুন উপকরণ লাভ। হয়ত জীবন-অভিজ্ঞতা ইহার ফলে হইত তীক্ষ্ণতর, জটিলতর ও বিচিত্রতর, এবং তাহা হইলে মানুষের রূপসৃষ্টিতে (Creative Art), অর্থাৎ অভিজ্ঞতার প্রকাশ-কলায়ও, সেই সূক্ষ্মতর বিচিত্রতর বেদনার ছাপ পড়িত। কিন্তু এই কথা আজও সত্য যে, বিজ্ঞান এখনো আমাদের জীবনবোধে বিশেষ নূতনত্ব দান করিতে পারে নাই। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের সেবা করিয়াছেন দূর হইতে। ইহার কারণ তো ছিলই—এদেশে বিজ্ঞানের জন্ম হয় নাই—পাশ্চাত্যদেশে

হইয়াছে। সত্য বটে, এক কালে এই দেশেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইত। কিন্তু ভুলিবার উপায় নাই, চরক-সুশ্রুত-নাগার্জুন হইতে আলেকজেন্দ্রিয়ার য়ুনানী বা আরব্য গবেষকমণ্ডলী পর্যন্ত যে ধারা অনুসরণ করিয়াছেন, বর্তমান বিজ্ঞানকে তাহারই বিকাশ বলা চলে না। মানুষ চিরদিন জ্ঞান আহরণ করিয়াছে, চিরদিনই নতুন কৌশলে (technique) জীবনকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই বলিয়া সব জ্ঞানই সমমূল্যের বা এক গোষ্ঠীর নয়; সব কৌশলই সমান কার্যকরী হয় নাই। পুরাতন জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নের সহিত আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রসায়নের তফাৎ এই হিসাবে মৌলিক। তখনকার দিনের গবেষণার মূলে ছিল তখনকার সামাজিক জীবন—সেই মন, সেই ব্যবস্থা, তাহার আবিষ্কৃত জীবন প্রণালী। সেদিনকার বৈজ্ঞানিকের চিন্তার ও চেষ্টার পুঁজি ছিল সেই সব কৌশল; তাহার গবেষণাগারও ছিল তেমনি সামান্য যন্ত্রে পরিপুষ্ট। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের এই দিকে যে সম্পদ আয়ত্ত হইয়াছে, তাহা তখন ছিল কল্পনার অতীত।

ভারতে বিজ্ঞান আমদানী

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের দেশে এইরূপেই আমদানী হয়—বিলাতী পণ্যের মত। আমাদের সামাজিক পরিবেশে তাহার উদ্ভব হইতে পাবে নাই। তাই, আমাদের দেশে বিজ্ঞানেব গবেষণাও তাহার স্বাভাবিক রূপ এখনো লাভ করে নাই। সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় এই দেশে শিল্প-প্রয়াস চাপা পড়িয়া থাকে, কল-কারখানা গড়িয়া উঠিতে পাবে না। সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব শিল্প ও বিজ্ঞানের গবেষণা তাহার নিজের ঘরে বিলাতেই চলে—সেখানকার বৈজ্ঞানিবেরাই সাম্রাজ্যের ধনিক-শ্রেণীর সেই তাগিদ মিটায়। এই দেশ শাসনের জন্য যদি বা কোনো বৈজ্ঞানিবের দরকার হয়, শাসকগণ সেই বৈজ্ঞানিক ও গবেষক বিলাত হইতে আমদানী কবিত। লোকেব অভাবও হয় নাই; কারণ বৃত্তি তাঁহাদের স্বভাবতই বেশি মিলিত; আব বিচিত্র ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগও তাহাদের অফুরন্ত ছিল। অবশ্য বৈজ্ঞানিক কৌতূহলেই এদেশের ইউরোপীয়দেব মধ্যে সার উইলিয়ম জোন্সের মতো মনস্বী এদেশে খৃীঃ ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাই ভারতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রথম উৎস। উহারই প্রেরণায় ভারতে বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় খৃীঃ ১৯১৪ তে। তারপর ক্রমশঃ গড়িয়া ওঠে ন্যাশন্যাল ইন্স্টিটিউট্ অব সায়েন্স ১৯৩৫-এ এবং সরকারী কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এ্যাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ১৯৪১-এ। ঊনবিংশ শতাব্দের ভারতবর্ষে সরকারপুষ্ট সাহেব বৈজ্ঞানিকদের ভূগোল, (সার্ভে অব ইণ্ডিয়া খৃীঃ ১৮০০ তে প্রতিষ্ঠিত) ভূতত্ত্ব, বৃক্ষতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, আবহাওয়াতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের গবেষণা আজও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। উহা শ্রদ্ধারই যোগ্য, কিন্তু তাহার পিছনকার ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত।

ইহাদেরই তত্ত্বধারবূপে তথাপি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী আবির্ভূত হইতেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে ভারতীয় বিজ্ঞানানুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাই (ইং ১৮৭৬) বোধহয় প্রথম নিজস্ব আয়োজন—সে কীর্তি আজ গবেষণাগার রূপে বর্ধিত শ্রী লাভ করিয়াছে। ক্রমে অবশ্য দেশীয় শিল্পপতিরা (industrialists) যখন একটু একটু করিয়া বোম্বাইতে ও অন্যত্র কল-কারখানা গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন, তখন বিংশ শতাব্দে পৌঁছিয়া তাঁহারা বুঝিলেন, বিজ্ঞানের সাহায্য না পাইয়া তাঁহাদের শিল্প-প্রয়াস অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বাঙ্গালোরে ১৯১৯-এ টাটার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট্ অব সায়েন্স ব্যবহারিক দিকে এক প্রধান চেষ্টা। কিন্তু দেশীয় শিল্পপতিরা এদেশে তখনো নগণ্য। ধনবানেরা বাঙলাদেশে অন্ততঃ ছিলেন জমিদার। তাঁহাদের উচিত ছিল কৃষিবিজ্ঞানে সাহায্য করা। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলে কৃষির উন্নতি ও গবেষণা ভূস্বামীদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ভারতীয় বিজ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগী হন

একজন মধ্যবিত্ত চিকিৎসক। অবশ্য সেই সমিতির পুষ্টির অভাবের অন্যতম কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ করিয়াছিলেন—উহার আলোচনা মাতৃভাষায় হইত না। দেশের অধিকাংশ বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানই তখন ছিল সরকার প্রতিপালিত। তাহারা দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার কথা কল্পনাও করে নাই; দেশীয় শিল্পের জন্ম চাহে নাই, সাম্রাজ্য শিল্পের পুষ্টি চাহিয়াছে। এইরূপে নিজেদের শিল্পোন্নতিতে সহায়তা না পাইয়া নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে নানা অধ্যয়নশালায়, গবেষণা গৃহে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করিতে চাহিলেন,—তাহা ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। সেইখানেই নানা বাধার মধ্যে সি, ভি, রামন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মতো অগ্রণীদের আবির্ভাব সম্ভব হয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এক গবেষকমণ্ডলীকেও উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু ইহার ফলে বিজ্ঞান ভারতবর্ষে গবেষণার বিষয়ই হইয়া রহিল—শিল্পক্ষেত্রে নামিয়া যাইতে পারে নাই, শিল্প-কৌশল (technique) ও শিল্পযন্ত্র (machinery) চাহে নাই, পারিপার্শ্বিক জীবন-যাত্রার সঙ্গে যোগসূত্র পায় নাই—বিজ্ঞানের অনুশীলনে একটা "ধ্যান" ও "আরাধনার" (subjectivism) চিহ্নও দেখা দিল। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরেও এই লক্ষণটিই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বেতারবার্তার উদ্ভাবনা করিতেছিলেন, পৃথিবীতে মার্কনির সঙ্গে তাঁহার নামও উল্লেখযোগ্য হইত—শুধু যদি গবেষণাগারে বৃহত্তর সুযোগ তাঁহার জুটিত, অর্থাৎ পরাধীনতার আওতায় যদি জগদীশচন্দ্রের দিন না কাটিত। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সুযোগ কোথায় ছিল?

পরাধীনের বিজ্ঞান চর্চা

এই পরাধীনতা ও বাস্তব প্রযুক্তির সুযোগের অভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এমনি একটা জীবনোত্তর, বাস্তবোত্তর লোকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রবণতা দেখা দেয়। বিজ্ঞানের সত্য যেন ধ্যানের বস্তু, ভাবগত সাধনার জিনিস, বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ।—জীবনের ধূলিময় পথে বৈজ্ঞানিক পদচারণা করিবেন না—সমাজের পরিবর্তমান স্রোতের উপর, বিলীয়মান চিন্তাভাবনার বহু ঊর্ধ্বে এই বিজ্ঞানের নিত্য শাশ্বতলোক; সেখানকার তত্ত্ব চিরন্তন সত্য, চির অম্লান। এই মনোভাবের কারণ বুঝিতে আমাদের এখন আর বেগ পাইতে হয় না। প্রথমত, দেখিয়াছি আমাদের দেশে বিজ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, আমদানী হইয়াছে। আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিকাশ হয় নাই। দেশীয় ভাষার সহায়ে সেরূপ সম্পর্ক স্থাপনেরও চেষ্টা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এদেশের দেশীয় শিল্প ও তাহার সহোদর দেশীয় বিজ্ঞান দুইই স্বাভাবিকরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়ত, সাম্রাজ্য-শিল্পের ও সাম্রাজ্য বিজ্ঞানের ছায়ায় আমাদের দেশে যে বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিল তাহার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অমনি গবেষণা-মন্দিরে গণ্ডী টানিয়া 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের' ধ্যান করা ছাড়া পথ ছিল না—বিজ্ঞানও যে সামাজিক পরিবেশের (social environment) প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে, ভাঙ্গিয়া পড়ে, বাঁকিয়া-চুরিয়া যায়, এই সত্য আমাদের পক্ষে তখন বুঝা অসম্ভব। আর ইহার চতুর্থ কারণ এই যে, আমাদের এই বৈজ্ঞানিকেরা অনেকাংশে ইউরোপীয় বিদ্যাগারে (academic) বৈজ্ঞানিকদের ছাত্রত্ব করিয়া আসেন; পরে দেশে সেই বিদ্যাগার-সুলভ (academic) মনোভাব পোষণ করেন; শিল্পাগারের (industry) সংস্পর্শেও বিশেষ আসিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই 'ধ্যানী' মনোভাবটা (subjectivism) শুধু ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক পরিবেশে ভারতবর্ষেই জন্মিয়াছে, এমনও মনে করা আর উচিত নয়। ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দের এই প্রথম পাদে এইরূপ চিন্তা ইউরোপেও বিদ্যাগারী (academic) বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ক্রমশ প্রকট হইয়া উঠে। জীবিকার প্রত্যক্ষ পীড়া হইতে এইরূপ বৈজ্ঞানিকগণ মুক্ত; তাই ইঁহাদের নিকট বিজ্ঞান একটা মুক্তি-মার্গ স্বরূপ। বিশেষত বাহিরের জীবনে তখন নানা জটিলতার সূত্রপাত হইয়াছে; যন্ত্রপরিপোষক বিজ্ঞান এক নির্মম তাণ্ডবতার ও আবিলতার সৃষ্টি করিয়াছে; বৈজ্ঞানিকদের বৈজ্ঞানিকবুদ্ধি ও শৃঙ্খলাবোধ তাহাতে আহত হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিলেন, "বিজ্ঞান কোথায়? ইহা

অবৈজ্ঞানিক অরাজকতা মাত্র।" অতএব এই 'ফলিত বিজ্ঞান', 'ব্যবহার্য বিজ্ঞান' (applied science), 'শিল্প বিজ্ঞান' (industrial science) প্রভৃতি ইঁহাদের চক্ষে বিজ্ঞানের অস্বীকৃত বলিয়াই প্রতিভাত হইল। তাঁহারা দেবমার্গের পথিক, শুক্রাচার্যের দানব-প্রয়াস তাঁহাদের নয়। অথচ সেই দানব-বিদ্যা ও দানব-প্রয়াসকে ঠেকাইবার মত উপায়ও তাঁহাদের নাই। কারণ, শিল্পপতিরা ধনৈশ্বর্যের মালিক। বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞানাগার তাঁহাদের প্রসাদে চলিতেছে; বিজ্ঞানের ধ্যান-জীবনও গির্জার ধ্যান-জীবনের মতই শিল্পপতির কৃপায় পালিত ও পুষ্ট। অতএব পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের পক্ষেও তখন দুই পথ মাত্র অবলম্বন করা সম্ভব হইল—হয় আপনাদের বিজ্ঞানের গবেষণা-ফল ধনিক শ্রেণীর হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করা এবং তাঁহাদের শোষণ-নীতিতে প্রত্যক্ষ সহায়ক হওয়া; নয় ধনিকদেরই প্রতিপালিত বিজ্ঞান-মন্দিরে 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে'র ধ্যান করিয়া পরোক্ষে এই শোষণ-ধর্মী অরাজক সমাজ ব্যবস্থাকে সাহায্য করা। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও জানিয়া-না-জানিয়া অনেকেই 'বিশুদ্ধ বিজ্ঞান' নামক অবাস্তব বিদ্যাকে এইভাবে বড় করিয়া আসিতেছিলেন। বিজ্ঞানের জন্ম যে সামাজিক প্রয়োজনে, বিস্তার যে সামাজিক প্রেরণায়, বিজ্ঞানেরই আধার দায়িত্ব যে সামাজিক সমন্বয়—তাহা তাঁহাদের মনে উদিত হইল না।

পরাধীনের চিন্তাসঙ্কট (১৯১৮-১৯৩৮)

যে অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বীক্ষণাগারে সাধনার বস্তু হইয়া উঠে, তাহারই আর এক কোঠায়, বিজ্ঞানের জন্মভূমিতে, অনারূপ সামাজিক অসামঞ্জস্যে বিব্রত বৈজ্ঞানিকদল ক্রমশ বিজ্ঞানের মন্দিরে আপনাদের বন্দী করিয়া তোলেন। একদিন যে ক্রমবর্ধিত বণিক ও ধনিকদের তাগিদে বিজ্ঞান পৃথিবীজয়ে বাহির হইয়াছিল, আরদিন সেই বণিক ও ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কই বিজ্ঞানের বন্ধন-রজ্জু হইয়া পড়িল। তখন দেখা গেল, বিজ্ঞানের আবিষ্কার আর ধনিকদের কৃপা লাভ করে না। যন্ত্রের পরিবর্তন ব্যয়সাধ্য বলিয়া আর নূতনতর উন্নততর যন্ত্র প্রবর্তিত হয় না। ধনিক-গোষ্ঠী নতুন নতুন আবিষ্কার কিনিয়া লইয়া তাহা বন্ধ করিয়া রাখে, ধ্বংস করিয়া ফেলে। গবেষণাগার হইতে বিদ্রোহী বৈজ্ঞানিক বরং বহিষ্কৃত হয় তথাপি নতুন উদ্ভাবনায় সাহায্য পায় না। বিজ্ঞানের অবলিপ্ত দানে এখন প্রচুর কৃষিজাত খনিজাত ও শিল্পজাত ঐশ্বর্য মানুষের ভোগে আসিতে পারে, অথচ মুষ্টিমেয় ধনিকের তাহাতে লাভ নাই বলিয়া সেই সব বৈজ্ঞানিক-বিদ্যা প্রযুক্ত হয় না। এখন একদিকে অভাবগ্রস্ত নরনারী ক্রন্দন করিতেছে, অন্যদিকে সহস্র সহস্র মণ গম, চা, কফি, রবার, তুলা সস্তায় বিক্রয় করিবার ভয়ে ধনিক-শ্রেণী ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। একদিকে মানব সমাজের প্রভূততম অংশ দৈন্যে, পীড়নে, রোগে, অজ্ঞানতায় তিমিরাচ্ছন্ন, অন্যদিকে অগ্রগামী অংশ বিজ্ঞানের মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রকে মারণ ষড়যন্ত্রে প্রয়োগ করিয়া আপনাদের ঐশ্বর্য ফাঁপাইয়া তুলিতে ব্যস্ত। বুঝা গেল বিজ্ঞানের এক যুগসন্ধ্যা সমাগত—তাহার আর অভ্যস্ত পরিবেশে অভ্যস্ত দৃষ্টি লইয়া চলা সম্ভব নয়। এই কারণে দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যেই (১৯১৮-১৯৩৮) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে দুইটি ধারা দেখা দিয়াছিল—জিনস্ এ্যাডিংটন প্রমুখদের বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবাদ; আর জে, বি, এস্, হলডেন্, অধ্যাপক বের্নাল প্রমুখদের বৈজ্ঞানিক সামাজিকতাবাদ।

ধ্যানী বৈজ্ঞানিকের দল বস্তুর (matter) বিশ্লেষণ করিয়া যখন দেখিলেন, তাহার প্রকৃতি সর্বাংশে এখনও সুনিশ্চিত জানা যায় না,—যখন বুঝিলেন বস্তু স্থূল নিরেট জড়পিণ্ড নয়, এক সূক্ষ্ম চঞ্চল শক্তি—তখন তাঁহারা এক অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় লইয়া বলিলেন, বস্তু নাই, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অথবা (জিন্সের ভাষায়) সর্বং খল্বিদং ম্যাথেমেটিক্স্; অথবা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগতের বাস্তব দাবী, সমাজের সমাগত সংকট এবং পৃথিবীর ভয়ঙ্কর জটিলতাময় আবর্তের সম্মুখে এমনি করিয়াই পলায়নপর প্রতিভা আপনার সামাজিক দায়িত্বকে অস্বীকার করে, কঠিন কর্তব্য হইতে নিজের মুক্তি খোঁজে; আর তাঁহাদের বিভ্রান্ত মনীষার চমকপ্রদ আলোকে পথচারীদেরও বিভ্রান্ত করিয়া

তোলে। না হইলে এই অধ্যাত্মবাদী বৈজ্ঞানিকগণের যুক্তিতেও নূতনত্ব নাই, আবিষ্কারেও অধ্যাত্মবাদের সমর্থক কিছু নাই। বস্তুকে নিরেট বলিয়া কেহই আর মনে করে না ; কিন্তু তাই বলিয়া বস্তু অস্তিত্বহীন বা 'ভাবের সমষ্টি' বলিয়াই বা কি করিয়া প্রমাণিত হইল ? বস্তুর জটিলতর গঠন, জটিলতর নিয়ম-প্রণালী বিজ্ঞানই আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাতে বিজ্ঞানের অক্ষমতা অপেক্ষা তাহার সার্থকতারই পরিচয় মিলে। আসলে এই মহামনস্বী বৈজ্ঞানিকদল নিজেদের ক্ষেত্র হইতে দর্শনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আর পথ খুঁজিয়া পান নাই—অতি সাধারণ দার্শনিক তথ্যকেই সেখানকার বৃহৎ সত্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। ফলে, সাধারণ মানুষ—যাহারা বিজ্ঞানে ও দর্শনে নিতান্তই পথহারা—তাহারা ইঁহাদেরই দার্শনিক কল্পনাকে 'বিজ্ঞান সম্মত দর্শন' মনে করিয়া আবার ইঁহাদের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিল। কিন্তু এই পথ পিছনেরই পথ—সম্মুখের পথ নয়, বৈজ্ঞানিক পথ ত নিশ্চয়ই নয়।

হলডেন ও বের্নাল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ কিন্তু বিজ্ঞানের জন্ম ও জীবন সামাজিক কারণের (social cause) দ্বারা নিয়মিত দেখিয়া বিজ্ঞানকে সামাজিক অরাজকতা (social anarchy) হইতে উদ্ধারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন ; আর তাই চাহেন সমাজের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস (organisation)। এই পথ বস্তুবাদীর পথ। ইঁহারা জানেন, চেতনা ছাড়াও বাস্তব ঘটনা ঘটিয়াছে, এখনো ঘটিতেছে,—জগতে চেতনা-উন্মেষের পূর্বেও তাহা ঘটিত। অতএব 'চেতনা' আদি নয়, বরং 'বস্তু' আদি। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংশয় মোটামুটি জাগিয়াছে দুইটি ভুল ধারণায়। তাহার একটি দেখা দিয়াছে—বস্তু সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আর খাটিতেছে না বলিয়া, অর্থাৎ বস্তু 'জড়পিণ্ড' নয়, বলিয়া। অন্য ধারণা এই যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা বস্তুর আর নাগাল পাওয়া যায় না ; কারণ, তাহা 'অনিশ্চিত' (indeterminate)। এই কথার ভুল কোথায় তাহা বুঝা দরকার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান অবলম্বন কার্য-কারণ সূত্র (law of causality)। শতাব্দীর গোড়া হইতে বিজ্ঞান দেখিতেছে, বস্তুর কোনো কোনো কাণ্ড ধরা যাইতেছে না, তাহা সুনিশ্চিত নয়। কিন্তু এই অনিশ্চয়তার আসল অর্থ দাঁড়ায় এই যে—বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য বিষয় শেষ হইয়া যায় নাই—বিজ্ঞান থামিয়া পড়িবে না,—ইহা স্থির নিশ্চিত হইয়া 'ধর্মে' পরিণত হয় নাই। বরং আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এই জাগ্রত জিজ্ঞাসাই বিজ্ঞানের প্রাণ, আর সেই জিজ্ঞাসার পদ্ধতিও এই কার্য-কারণ সূত্র। আসলে ভাবময়, মনোময় পথ কোনো বিজ্ঞান গ্রহণ করে নাই ;—বৈজ্ঞানিকও নিজের জীবনযাত্রায় পর্যন্ত তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র নহেন। জীবনযাত্রায় বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক সবাই সমান বাস্তবপন্থী—মোটেই বস্তুকে "ভাবের ফানুস" মনে করেন না, বা কার্য-কারণ সূত্রকে অবজ্ঞা করিয়া অনিশ্চয়তাবাদ (Indeterminism) আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকেন না। তথাপি ভাবের ঘরে তাঁহারা যে কেহ কেহ এইরূপ চুরি করিতেছেন তাহার কারণ—তাঁহাদের এই চুরির পিছনে আছে তাঁহাদের সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকারের চেষ্টা—যুক্তিহীন সামাজিক বিন্যাসকে যুক্তি-বিরোধী চিন্তাদ্বারা টিকাইয়া রাখিবার প্রয়াস। এই কারনেই "আদর্শবাদী বিজ্ঞান" (?) মোটামুটি কার্যত প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদ্‌গামী।

'আধ্যাত্মিকতা' বনাম বিজ্ঞান

এই বিজ্ঞান-বিরোধিতা যে আমাদের দেশে স্বভাবতই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি সহজ কারণ অবশ্য এই যে, বিজ্ঞানকে আমরা বিলাতের জিনিস বলিয়া গণ্য করি ; এবং তাহার অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হইলেই মনে করি আমাদের প্রাচীন চিন্তা ও ভাবনার সম্পূর্ণতা প্রমাণিত হইল। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান-বিরোধিতার প্রধান কারণ শুধু এই মিথ্যা 'স্বাদেশিকতা'ও নয়। ইহার প্রধান কারণ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি,—বিজ্ঞান আমাদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক পরিবেষ্টনীতে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হইতে পারে নাই। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা আমাদের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে খর্ব করায় আমাদের মনও পরোক্ষভাবে খর্বিত হইয়াছে। তাই

আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে যেমন আমরা আপনার বলিয়া জানি না, বৈজ্ঞানিক মনকেও তেমনি আপনার করিয়া লইতে পারি না। ডাক্তার মেঘনাদ সাহা এইদিকে গতানুগতিক 'ভারতীয়তা'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আমাদের অধ্যাত্মজ্ঞানীরা বিচলিত হন। কারণ, আমাদের বৈজ্ঞানিকদের মুখ হইতেও আমরা এতদিন অনারূপ 'বুলি'ই শুনিয়াছি—শুনিয়াছি, একদিকে প্রাচীন ভারতে 'বিজ্ঞান-চর্চার' কথা (অর্থাৎ 'সব বেদে আছে'); অন্যদিকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কথা (অর্থাৎ ইহা নিতান্তই অবিদ্যা; তবে "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে")। প্রধানত এই অস্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক পরিবেশের জন্যই পরাধীন ভারতে আমাদের বিজ্ঞান-চর্চা স্বাভাবিক হয় নাই, বৈজ্ঞানিক মন বিকশিত হইতে পারে নাই—বিজ্ঞানাগারের বাহিরের জীবনের সঙ্গে আমাদের বৈজ্ঞানিক তাঁহার গবেষণার ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির স্বাভাবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন নাই। এখনো যে সর্বাংশে পারিয়াছেন তাহা নয়। তাই, বৈজ্ঞানিকেরাও ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানের সাধনা করিয়া উহার বাহিরে আসিয়া গতানুগতিক জীবনযাত্রাই মানিয়া লন। তাই দেখি সূক্ষ্ম গবেষণা-শেষে বাহিরে আসিয়া যে কোনো 'গুরুজী' বা 'সাধু বাবা'র পায়ে মাথা লুটাইয়া দিতে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের বাধে না। সার্থক-কীর্তি ডাক্তারের চক্ষে গঙ্গার জলে আশ্চর্য রকমের প্রকৃতিদত্ত সম্পদ্ ভাসিয়া উঠে—রোগের জীবাণু চক্ষেই ঠেকে না। বিজ্ঞানের শেষ ডিগ্রী নামের পিছনে লিখিয়া বিজ্ঞানাগারের মধ্যেই আমরা করকোষ্ঠি বা গ্রহ-বিচারে বসিয়া যাই—গ্রহ-উপগ্রহের সেই আধ্যাত্মিক তেজে ফট্‌কার বাজার ও ঘোড়দৌড় হইতে পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলি। পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকায় ও গঙ্গাজলে অমোঘ আরোগ্য-শক্তি আবিষ্কার করি, আর রিফ্রিজিরেটরে তাহারও পবিত্র শীতলতা পবিত্রতর করিয়া তুলি। মাদুলীর সাহায্যে অলক্ষিত শত্রুর অলক্ষিত 'বাণ' ব্যর্থ করি, আর দৈবজ্ঞের নিকট হাত পাতিয়া জানিতে বসি প্রধান মন্ত্রিত্বের শিকা আমার ভাগ্যে কবে ছিঁড়িবে। আশ্চর্য নয় যে, এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব জিন্‌স্-এডিংটন-ওলিভার লজ্‌কে নিজেদের অকাট্য যুক্তি করিয়া তুলিত, তাঁহাদের কথায় 'ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা'র নতুন নজির খুঁজিয়া বাহির করিত, আর আধুনিক সাইকোলজি ও 'অলিভার-লজ' এই অধ্যাত্মবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে শেং-অস্ত্রের মতো হইয়া উঠিত। ইঁহাদের কথার সঙ্গে তন্ত্র ও বিজ্ঞানের বুক্‌নি মিশাইয়া নতুন অধ্যাত্মবাদীরা আমাদের এখনো শোনান,—"সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম স্নায়ুর (neuron ?) ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দেহে-মনে কত না অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। কত না উপায়ে গ্রন্থিরস (ductless gland secretions) জীবন ও চিন্তাকে নিয়মিত করে! অতএব জাগাইয়া তোলো 'কুণ্ডলিনী-শক্তি'কে, যোগ-বিভূতিতে ত্রিভুবন বিজিত হইবে। শোনো নাই, সামান্যতম পরমাণুর মধ্যে যে শক্তি রহিয়াছে তাহাতেও পৃথিবীকে উড়াইয়া দেওয়া যায়?—আবিষ্কার করো সেই শক্তিকেন্দ্র। বিজ্ঞানে তাহা নাই; ভৌতিক সে বিজ্ঞান তো নিম্নস্তরের পদ্ধতি—'প্রজ্ঞানে', তন্ত্রের প্রক্রিয়ায়, যোগের প্রকরণে,—অথবা গীতায় কিংবা বেদে—সেই শক্তির সন্ধান মিলে।" —কথা বাড়াইয়া লাভ নাই, যেখানে শ্রেষ্ঠ মনস্বীদেরই এইরূপ মধ্যযুগীয় মনোভাব সেখানে প্রত্যেক কলেজের ছাত্র যদি ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের আশ্চর্য গবেষক হয় তাহাতেই বা বিস্ময় কি? আর সাধারণ মানুষ যদি বিজ্ঞান ও যাদুতে গোল পাকাইয়া ফেলে এবং নিজেদের জীবনকে এক দৈব-নিপীড়িত দুর্ভাগ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়, তাহাতেই বা বিস্ময় কি? কারণ আমাদের শিক্ষাধ্যক্ষগণ বলিয়া দিয়াছেন, বুদ্ধির অতিরিক্ত চর্চা ও বাস্তববাদ ('...over-intellectualism of modern education and the over-emphasizing of materialism to the neglect of the spiritual' : দ্রষ্টব্য ***Report of the All India Education Committee***) না কমাইলে আমাদের উপায় নাই।

এই ট্রাজি-কমিক অবস্থার পিছনে যে কারণ ছিল তাহা স্মরণ করিলে বুঝি এই সম্পর্ক কাটিতে দেরি হইতেছে কেন। এক অস্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থার জন্যই বিজ্ঞান আমাদের মাটিতে এতকাল শিকড় গাড়িতে পারে নাই, বৈজ্ঞানিক চিন্তাও আমাদের মনে বহুকাল স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই—আমাদের নিকট বিজ্ঞান আসিয়াছে ল্যাবরেটরির গবেষণা বিষয় হিসাবে। বিদেশীয় শিল্পপতির চেষ্টায় যেটুকু 'ফলিত বিজ্ঞান' আমাদের দ্বারে আসিয়াছে—রেল, কল, বিজলী, গ্যাস, স্টিম এবং

শিল্পজাত পণ্যের রূপ ধরিয়া,—তাহা অবশ্য আমাদের গ্রহণ করিতেই হয়। কিন্তু মূলত তাহার উৎপাদনে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া এইসব যন্ত্রের পশ্চাদস্থ বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বা পদ্ধতিও আমাদের নিকট অপরিচিতই ছিল।

ভারতে বিজ্ঞানের তাগিদ

বের্নাল সত্যই বলিয়াছিলেন (ইং ১৯৩৯) যে, ভারতে বিজ্ঞানের স্বপক্ষে তাহারাই প্রধান কর্মী যাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত। কারণ, দেখা গেল গান্ধীজীর বিজ্ঞান-বিরোধিতা সত্ত্বেও (রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-আগ্রহও স্মরণীয়) সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, জওহরলাল হন সেই কমিটির নায়ক।[১]

চাহি বা না চাহি—ইতিমধ্যে সামাজিক কারণেই আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের তাগিদ আসিয়া পৌঁছিল। যে মুষ্টিমেয় বণিকগণ বিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ করিয়া বিজ্ঞানগত ব্যবসায় ও মুনাফা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও লোভের লড়াই ক্রমে দ্বিতীয় মহাসংগ্রামে পরিণত হইল (ইং ১৯৩৯)। সাম্রাজ্যবাদের এই পরিণতি অনিবার্য। আর তাই নিজেদের ব্যবসায় ও লাভ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায় তখন এই ধনিকেরাই আবার বিজ্ঞানের দুয়ার খুলিয়া দিলেন, বলিলেন: "অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও।" ইঁহারাই একদিন চাহিয়াছিলেন আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গবেষণাগারেই নিবদ্ধ থাকুক; ইঁহারাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংকটে আমাদের নিকটও ব্যবহারিক-বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞানের প্রচুরতম প্রসার যাজ্ঞা করিলেন। সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইঁহারা ভারতের বিজ্ঞান-পূজারীদেরও তখন ডাক দিলেন: "মন্দির ছাড়িয়া বাহির হও। কল-কারখানার দাবী মিটাও। অস্ত্রাগারের ভাণ্ডার পূর্ণ করো। বিজ্ঞানের স্থান আর মন্দিরে নয়—শিল্পাগারে, কৃষিক্ষেত্রে, খনিতে, আকাশে, মাটির তলে।"

এই ডাক আমাদের বৈজ্ঞানিকদের কানে পৌঁছিতেই আমাদের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী তাহাতে সমস্বরে সাড়া দিতে সচেষ্ট হইলেন। যে সাম্রাজ্যবাদ তাঁহাদের ধ্যাননিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল—ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের স্বাভাবিক উদ্ভব ঘটিতে দেয় নাই,—সেই সাম্রাজ্যবাদই সংগ্রামের দায়ে বৈজ্ঞানিকদের শিল্পনিষ্ঠ গবেষক করিয়া তুলিতে বাধ্য হইতেছিল, ভারতবর্ষেও বিজ্ঞানকে মুক্তি দিতে চাহিল। যে অস্বাভাবিক কারণে আমরা বৈজ্ঞানিক হইলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অধিকারী হই না, এইভাবেই তাহাও লোপ পাইতে থাকে।

আর তারপর সেই সাম্রাজ্যবাদের আসন টলিয়া গেল—ভারত যখন (ইং ১৯৪৭) স্বাধীন হইতে চলিল—তখন তাহার প্রথম এক চেষ্টা হইল আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে আধুনিক রাষ্ট্র গঠন। ইং ১৯৫১ হইতে গৃহীত হইল প্রথম পরিকল্পনা—উহার নীতি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বেই ১৯৩৮ এ কংগ্রেসে স্বীকৃত হয়।

স্বাধীনতার বিজ্ঞান-সাধনা

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে সদ্‌বুদ্ধিরও প্রকাশ আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না—তাহার প্রমাণ স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনায় স্পষ্ট। 'আধ্যাত্মিকতার' সেই আত্ম-সান্ত্বনার প্রয়োজন ঘুচিয়া

---

১ যুদ্ধকালে প্রকাশিত সার্জেন্ট রিপোর্ট, কিংবা তাহারও পূর্বে প্রকাশিত ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা কিন্তু বিজ্ঞানবিরোধী দৃষ্টির সমর্থন করে নাই। ঐ দুই পরিকল্পনারই ত্রুটি ধরা যাইতে পারিত, যথা—যথেষ্ট বৈপ্লবিক চেতনা দ্বারা তাহা অনুপ্রাণিত নয়; কিন্তু উহাতে বিজ্ঞান-চর্চাকে তুচ্ছ করিবার চেষ্টা নাই, তাহাও স্মরণীয়।

গিয়াছে। এখন বিজ্ঞানের, বিশেষ করিয়া ফলিত বিজ্ঞান ও কারুবিজ্ঞানের সহায়তা, গ্রহণ করিতে আমাদের কাহারও দ্বিধা নাই। ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেক্নিক্যাল স্কুল যে আজ ছাত্রের প্রধান আরাধ্য বিদ্যালয় তাহা স্পষ্ট ;—অবশ্য জীবিকা ও উপার্জন উহাদের প্রধান আকর্ষণ। চিরদিনই তো মানুষের আকর্ষণ জীবিকা, তারপর কাঞ্চন-প্রধান সমাজে অর্থার্জনই মোক্ষলাভ। তাই, ইঞ্জিনীয়ারিংএ ভীড় অস্বাভাবিক নয়। উহার বিকৃতিও তাই স্বাভাবিক—যখন সমাজ চিনে একমাত্র টাকা। সত্য বটে, এখনো আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানের ইহ-সর্বস্বতা এবং আমাদের ভারতীয় মানসের অধ্যাত্মমুখিতার দোহাই শোনা যায়। কিন্তু তাহা অনেকটা প্রথাগত 'পেট্রিয়টিজম্', খানিকটা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে জাত আশঙ্কা ও সংশয়। এই মতের লোকেরাও কেহ আর বলেন না—বিজ্ঞানের দান অগ্রাহ্য। এদিকে গান্ধীবাদের (ভ্রান্ত ?) ব্যাখ্যাও আর কার্যকরী হয় না। ক্ষমতা হাতে পাইতেই গান্ধী-ভক্ত জাতীয় নেতৃত্ব নিঃসংশয়ে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের ও ফলিত বিজ্ঞানের সহায়ে ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নত দেশে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। মনে রাখিতে পারি—আমাদেরও বাস্তব বিদ্যার প্রতি আস্থার ঐতিহ্য আছে, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি হইতে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমের বিজ্ঞান-আলোচনা পার হইয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের সুদৃঢ় বিজ্ঞান-আগ্রহে এইরূপ একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এদিকেও উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করিয়াছি ; ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হইতে এই নব পর্যায়ের মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু প্রমুখ খাঁটি বৈজ্ঞানিকদের কথা বলাই বাহুল্য।

বিজ্ঞান-চর্চার উদ্বোধন এশিয়াটিক সোসাইটিতে (ইং ১৭৮৪) আরম্ভ হইলেও সত্যই জাতীয়-জীবনে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসিয়াছে স্বাধীনতা লাভে (ইং ১৯৪৭)। প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার সাহায্যে আর্থিক জীবন গঠন আরম্ভ হইয়াছে পরিকল্পনাগত আর্থিক উন্নয়ন হইতে (ইং ১৯৫১)। বিজ্ঞান-সাধনার অনেকটাই আজ তাই পরিকল্পনাগত প্রকল্প ও উদ্যোগের কথা। সেই আর্থিক উপযোগিতার দৃষ্টিতেই সেই সব প্রয়াস বিচার্য। এই সকলের মধ্যে যাহা বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এক একটি আয়োজন, তাহারই নাম শুধু এখানে স্মরণীয়। পরাধীনতার যুগেও আমরা কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়াছিলাম (যেমন, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স), তাহা দেখিয়াছি। কিছু কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠানও আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি (যেমন, 'সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠান সমূহ), আর কিছু কিছু অধিকারও করিয়াছি (যেমন, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা)। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বিজ্ঞানেরও বহু সোসাইটি (সমিতি) ইনষ্টিটিউট (অনুশীলন পরিষদ) গঠিত হইয়াছে। নানা বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হইতেছে। জাতীয় প্রয়োজনের সুস্থ আবহাওয়ায় আজ ইহারা বহু দিকে সঞ্জীবিত। তবু যে উহা সকল দিকে আশানুরূপ ফলদায়ী হইয়া উঠিতে পারে না, তাহাও আমাদের জাতীয় ত্রুটিরই জন্য। সাধারণ ভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনার মহাসম্মেলন 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস'—(প্রতিষ্ঠিত ইং ১৯১৪) —ইহা অনেকটা বৈজ্ঞানিক কুম্ভ মেলায় পরিণত হইয়াছে। দেখাদেখি অন্যান্য বিদ্যার কংগ্রেসগুলি ছোটখাটো মেলা হইয়া যাইতেছে ; আলোচনার ক্ষেত্র হইতেছে না। 'ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট্ অব্ সায়েন্স' (ইং ১৯৩৫এ প্রতিষ্ঠিত) প্রধানত সরকারী বেসরকারী নানা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ সহযোগিতা রক্ষার কাজে নিযুক্ত। আর সরকারী কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক্ এ্যাণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ (যুদ্ধকালে ইং ১৯৪১ এ প্রতিষ্ঠিত)-এর কাজ এখন স্বাধীনতার আমলে বিরাট, ক্রমবর্ধমান, এবং আমাদের জাতীয় ত্রুটির ফলে কিছুটা তালমাত্রাহারা। এই বিভাগের পরিচালিত 'ন্যাশনাল লেবরেটরিজ ও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্', (নয়া দিল্লীর ন্যাশানাল লেবরেটরি প্রভৃতি) ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ (বিহারের জীয়লগড়ার সেণ্ট্রাল ফ্যুয়েল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্ প্রভৃতি) আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান-চেতনার সাক্ষ্য। স্বাধীনতা যে কী সুযোগ, তাহার জ্বলন্ত ঘোষণা এইসব সংস্থা। কিন্তু সে চেতনা যে সামাজিক রাষ্ট্রিক অপটুতায় খর্বিত হইতেছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। অধ্যাপক ব্ল্যাকেট্ ও অধ্যাপক স্টেপান দেদিয়ার দিল্লীর ফিজিক্যাল লেবরেটরির প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, উহাতে জাতীয় নীতি অনুযায়ী ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণায় বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া বহুদূরস্থিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হয় ; কিন্তু ভারতের প্রয়োজন এখন ফলিত

বিজ্ঞানের গবেষণা। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চায় এখনো আমরা (দু' একজন রামন, বসু ব্যতীত) উচ্চ পটুতা ও উচ্চ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারি নাই। উহা সঞ্চয়ের পরে সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ। এই মন্তব্য সাধারণভাবে প্রতিটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ-যোগ্য যে, বিজ্ঞানের গবেষণার মান কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে (চাকুরীর প্রতিযোগিতার জন্য ?) নিচু করা হইতেছে,—কেন্দ্রীয় লেবরেটরিজ সমূহেও কী ঘটিতেছে, তাহায় এখনো প্রমাণ নাই। তৃতীয় কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা যেমন অধ্যাপনা অপেক্ষা চাকরির পলিটিক্‌সে ঝুঁকিতেছেন, এসব বিজ্ঞানাগারেও কতকটা তাহা ঘটিতেছে শোনা যায়। অন্ততঃ বড় বৈজ্ঞানিকরা কেহ কেহ গবেষণা অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কর্মে অধিক জড়াইয়া পড়িতেছেন। বিদেশাগত কৃতী যুবক বিজ্ঞানীরা অনেকে এইসব স্থলে সযোগাভাবে বিদেশে ফিরিয়া যাইতেছেন—অর্থলোভই উহার একমাত্র কারণ নয়। অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবন এখনো অসংগঠিত, বিজ্ঞান চেতনা সক্রিয় হইলেও উক্ত প্রভাবে সম্পূর্ণ সার্থক হইতে পারিতেছে না।

সরকার পক্ষ হইতে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তিবিদ্যার গবেষণার বিশেষ লক্ষ্য (তৃতীয় পরিকল্পনার কথায়) বলিয়া এইরূপ উল্লেখিত হয়ঃ (১) এইসব গবেষণাগার ও সংস্থার উন্নয়ন, প্রসার ইত্যাদি ; (২) বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দান, (৩) বিশেষ করিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনোলজির গবেষণায় উৎসাহ দান, (৪) গবেষক তৈয়ারি করা, ফেলোশিপ বৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা, (৫) বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্পের উপযোগী যন্ত্রনির্মাণের গবেষণা ব্যবস্থা, (৬) সরকারী বেসরকারী নানা গবেষণা সংস্থার গবেষণার মধ্যে সংযোগ সাধন, এবং (৭) ছোট ছোট প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক উদ্যোগের দ্বারা গবেষণা ফল পরীক্ষা করিয়া উহার ব্যাপক প্রয়োগ।

কাজে ও কথায় আমাদের যে এ যুগে বিপুল পার্থক্য থাকে, এক্ষেত্রেও তাহা ভুলিবার নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখিতে পারি স্বাধীনতালাভের পূর্বে বিজ্ঞানের এই ধরণের প্রয়োগের কথা চিন্তা করিবারই কি সুযোগ আমাদের ছিল ? না, সেদিন বিজ্ঞানের এই বিপ্লবী শক্তিতে আমাদের এমন বিপুল আস্থা দেখা যাইত ?

আসল কথা—ত্রুটি মূলে। বিপ্লবের যুগে পুঁজিতন্ত্রী লাভ ও লোভের প্রাধান্য আমরা সমাজে চালু করিয়াছি ; বিজ্ঞান-সাধনায় বৈজ্ঞানিক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হইবে কিরূপে এই সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যাহত বিন্যাসে ?

সমাজ মানসের রূপান্তর

বিজ্ঞানের সুস্থ বিকাশ ঘটিলে যে সামাজিক ও মানসিক বিপ্লব অনিবার্য হইয়া পড়িবে, আমরা হয়ত তাহা এখনো ভাবিয়া দেখিতে চাহি নাই। অথচ তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিলে আমাদের যাত্রাপথে আমরা স্থিরপদে অগ্রসর হইতে পারি। স্মরণ করিতে হইবে, বিজ্ঞান শুধু কতকগুলি জ্ঞানের সংগ্রহ নয়—উহা এক নতুন জীবনচর্যা (Way of Life)। সমাজে কৃষিবিদ্যার আবিষ্কারে যেমন অকল্পনীয় বিপ্লব ঘটিয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের ও কারু-বিজ্ঞানের প্রবর্তনে তেমনিতর বিপুল পরিবর্তন আজ সংঘটিত হইতেছে। সমাজের সেই সমাগত পরিবর্তন ও সুসঙ্গত রূপের ইঙ্গিত বৈজ্ঞানিকের চক্ষে সুস্পষ্ট। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নির্ভয়ে তাই এই জীবনযাত্রার রূপান্তরের সঙ্গে মানসিক ও সাংস্কৃতিক ভঙ্গীকেও পরিবর্তিত করিতে স্থিরসংকল্প হইবে, আশা করিতে পারি।

প্রশ্ন হইবে এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ব্যবহারে মানসিক রূপ কেন পরিবর্তিত হইবে ?—দেখিয়াছি, জীবনযাত্রায় মৌলিক পরিবর্তন আসিলে চিন্তায় কল্পনায়ও তাহার ছাপ পড়ে। কৃষির প্রবর্তনেও তাই সমাজের রূপ বদলাইয়াছে আর চিন্তার গড়নে নূতনত্ব আসিয়াছে। তেমনি বৈজ্ঞানিক জীবনধারার প্রচলনেও সমাজ পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে—তাহাকে বাধা দেওয়া অসাধ্য ;—আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তায়ও নূতনত্ব আসিতেছে। মানুষের সভ্যতা বিজ্ঞানের প্রয়োগে নব কলেবর ধারণ

করিতেছে ; মানুষের সংস্কৃতিও সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হইয়া চলিয়াছে। তাই ভবিষ্যতের পথে মানুষের প্রধান অস্ত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ; আর বিজ্ঞানই মানুষের সেই নতুন জীবন-বেদ।

যে পৃথিবী আদিকালের মানুষ দেখিতে পাইত, তাহা আর নাই। মানুষের চোখে তাহার রূপই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। মনে হইবে, সেইতো সূর্য উঠে, সূর্য ডুবে ; সেইতো মানুষ জন্মে-মরে ; সেই প্রাণলীলা তেমনিইতো চলিয়াছে। সত্য। তথাপি আমরা জানি—মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আর তেমনটি নাই। বিজ্ঞান তাহার পরিচিত জগৎ ও পরিচিত ধ্যান ধারণা বদলাইয়া দিতেছে। এখনো বিজ্ঞানের সব শিক্ষা ও তত্ত্ব আমরা সজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারি না। জীবনের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি না। ইহার কারণ আমাদের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক নয়, তাহা নানাভাবে মুনাফা ও শিক্ষার বিশৃংখলায় ও পরিবেশের প্রভাবে আচ্ছন্ন। আমাদেরই সেই সজ্ঞান মনের অগোচরে তবু আমরা নতুন দৃষ্টিশক্তিও পাইতেছি। না পাইয়া উপায় নাই ; কারণ, পৃথিবীই যে নতুন হইতেছে—বিজ্ঞানের জগৎ যে আমাদের জ্ঞান ও চেতনার নিকট একেবারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানের সাধনা এই বাস্তব ও আধ্যাত্মিক রূপান্তরের সাধনা— ভারতবর্ষেও সংস্কৃতির নব-রূপায়নের সাধনা।

গ্রন্থ-পঞ্জী

'বিজ্ঞানের ইতিহাস'—(ডাঃ সমরেন্দ্র সেন লিখিত বাংলায় ও সম্ভবত ইংরেজিতেও বই আছে। ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চার বিষয়ে কোনো ইতিহাস বা বিবরণ লিখিত হইয়াছে কিনা জানি না। সরকারী নানা বিভাগীয় বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট ও সরকার প্রকাশিত গ্রন্থাদি ছাড়া, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রকাশিত গ্রন্থাদিই এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার পক্ষে প্রধান অবলম্বন। বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত নানা গবেষণা ও প্রবন্ধাদি সর্বদাই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হয়। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এদেশে বিজ্ঞান চর্চার অবস্থা জানা সম্ভব—(১) Indian Science Congreessএর প্রকাশিত গ্রন্থ ও পুস্তিকাদি হইতে (যেমন, An Outline of Field Sciences in India Ed. S. L. Hora, 1928, Silver Jubilee Session উপলক্ষ প্রকাশিত), এবং উহার অধিবেশনের অভিভাষণ ও প্রবন্ধাদি হইতে ; (২) সাধারণ-বোধ্য বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রাদি হইতে। ইহার মধ্যে সহজলভ্য Science and Culture, কলিকাতা ৯২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্বকার 'প্রকৃতি' লোপ পাইয়াছে। তবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' সুপরিচিত পত্র। বিলাতী Popular Science প্রভৃতি [illegible] বিজ্ঞানের [illegible] চুটকির গল্প বাংলা মাসিকপত্রের দেওয়া নিয়ম [illegible] এবং পড়া অপেক্ষা না পড়াই সঙ্গত [illegible]

একাদশ অধ্যায়

কথা-শেষ

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছিয়া আমরা মানুষের ভাগ্য পরীক্ষা চক্রের সম্মুখে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেছি। ধনিকতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছিতে, শোষণবাদী সমাজ হইতে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে উত্তীর্ণ হইতে দুই-এক শতাব্দী লাগিলে বেশি সময় লাগিল বলা চলিবে না, এই কথা বিশ বৎসর পূর্বে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে) যতটা আশার সঙ্গে বলিয়াছিলাম, আজ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বিশ্বাস লইয়াই বলিতে পারি—বিশ্ববিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে সোভিয়েত শক্তির জন্মে, বৈজ্ঞানিক সাধনায় এবং সাম্যবাদ গঠনের সংকল্পে। তাহা অগ্রসর হইয়াছে পৃথিবীব্যাপী জনশক্তির জয়যাত্রায়, সুনিশ্চিত হইতেছে ধনিকতন্ত্র-সমাজতন্ত্র সকল সমাজ-ব্যবস্থারই বিজ্ঞানের বিশ্বজয়ী শক্তির নিকট নতিস্বীকারে। আর উহাই অপ্রতিরোধ্য হইবে বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবতার সমন্বয়ে, সংস্কৃতির সেই সমারব্ধ রূপান্তরে। বলা কি অন্যায় যে, বিংশ শতকের এই শেষভাগে বিশ্বশান্তি ও সকল জাতির সহাবস্থান নীতিকে রূপায়িত করিবার সাধনায় এই মানুষের ভাগ্যপরীক্ষাও চলিয়াছে?

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাক্‌লের লেখা 'ইংলণ্ডে সভ্যতার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭—আমাদের সিপাহী যুদ্ধের বৎসর, ভারতবর্ষে পুরাতন সামন্ততন্ত্রের অবসান কাল। বিলাতে তখন ধনিক-তন্ত্রের দীপ্ত মধ্যাহ্ন, ঐশ্বর্যের অশেষ সমারোহ। বিলাতের সভ্যতার গোড়াপত্তন করিতেছে তখন বিজ্ঞান। বাক্‌লে বলিলেন—এতকাল সভ্যতা জলবায়ুর বশ ছিল। কিন্তু এইবার বিজ্ঞানের আবির্ভাবে সভ্যতাই প্রকৃতিকে নিয়মিত করিতে পারিতেছে।

ষাট সত্তর বৎসর পরে ইংলণ্ডের হিসাব হইতে দেখি,—লাখ ত্রিশেক লোক বরাবরের মতো বেকার; ওয়েল্‌সের খনি অঞ্চলে আর স্বচ্ছলতার সম্ভাবনাও নাই; ল্যাঙ্কেশায়েরের কাপড়ের কলে আর সুদিন ফিরিয়া আসিবে না। অথচ ইংলণ্ডের ক্রয় বাণিজ্য তখনো সাত-সাগরের পারে ছুটিতেছে, অর্ধেক পৃথিবী তাহার সাম্রাজ্যের জালে ঘেরা; ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং আফ্রিকারও প্রায় অর্ধাংশ তাহারই শাসন ও শোষণের কবলে। ইংলণ্ডের ঐশ্বর্যের জোয়ারে তবু সত্তর বৎসরের মধ্যেই ভাটা পড়িয়াছিল—সভ্যতা এখন শোষণমুক্ত জাতিকে পরস্পরের সহযোগীরূপে ঐশ্বর্য সৃষ্টিতে ডাক দিয়াছে। 'সহাবস্থান' তাহারই নাম; উহার অর্থ শোষক-শোষিতের সহাবস্থান নয়; প্রত্যেকটি জাতির আপন-আপন পথে শোষণমুক্ত সমাজ-বিন্যাসের অধিকার ও সাধনা।

বিংশ শতকের এই বৎসরগুলি বিশেষ করিয়া তাই বিশ্বশান্তির সাধনারই বৎসর। সেই সাধনা যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলে মানুষের ইতিহাসও আপাততঃ ব্যর্থ হইবে। বিশ্বশান্তির রূপায়ণেই আজ সংস্কৃতির সার্থকতা।

যুদ্ধ যে অবাঞ্ছিত, তাহা তো ধনিকতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র, কোনো তন্ত্রই অস্বীকার করিতে পারে না। ধনিকতন্ত্রী শক্তিরা কেন তাহা হইলে প্রায়ই শান্তির প্রতিকূল, আর সমাজতন্ত্রী শক্তিরা কেন শান্তিতে উৎসাহী? অবশ্য বলিতে পারা যায়—এই কথাটা সত্য নয়; ইহা সমাজতন্ত্রীদের একটা 'প্রচার';—তাহারা স্বদেশের ও সর্বদেশের মানুষের কাছে নিজেদের শান্তিকামী বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত। কথাটা মানিয়া লইলেও উহার মধ্যে যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহাও অর্থপূর্ণ। যুদ্ধ বাধায় রাষ্ট্রনেতারা, যুদ্ধ পরিচালনা করে সামরিক নেতারা। কিন্তু জনসাধারণ সর্বদেশেই যুদ্ধবিরোধী। বর্তমানকালে যুদ্ধ সামগ্রিক যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে—সৈনিকই শুধু যুদ্ধ করে না—শ্রমিক-কৃষকও সাহায্য না করিলে যুদ্ধ অসম্ভব। তাই জনসাধারণ আজ পরোক্ষে যুদ্ধের নিয়ন্তা হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে কোনদিন জনশক্তি যুদ্ধে এইরূপ অপরিহার্য হইয়া

উঠিতে পারে নাই, নিজের এই শক্তি সম্বন্ধেও এত সচেতন হইতে পারে নাই। শান্তির পক্ষেও তাই প্রথম কথা—সর্বাপেক্ষা বড় লাভ আজ—জনশক্তির এই অভ্যুদয়।

দ্বিতীয় কথা, প্রত্যেকটি পরাধীন জাতির স্বাধীনলাভের সঙ্গেই জাতিতে জাতিতে শাসন-শোষণের সম্পর্ক দূর হয়, সাম্রাজ্যবাদী বিরোধের পথ বন্ধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে শান্তির পথও প্রশস্ত হয়।—সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যেকটি পরাজয়ে শান্তির শক্তিলাভ। সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরে যদি জনশক্তি জয়ী হয়, তাহা হইলে শান্তির শক্তিই আরও দৃঢ়তর হয়, যুদ্ধবাদীরা আরও দুর্বল হয়। বলা বাহুল্য, এই জনশক্তির জয় সুদৃঢ় হইতে পারে সামাজিক বিন্যাসে, সামন্তশক্তি ও ধনিকশক্তি প্রভৃতি শোষণবাদী শক্তির অবসানে, অন্ততঃ জনায়ত্ত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায়।

আভ্যন্তরীণ এই বিকাশ সম্পূর্ণ না হইতে স্বাধীনতার রূপায়ণে শান্তি ও সহাবস্থান নীতিকে সামগ্রিক ভাবে প্রধাননীতি বলিয়া স্বীকৃত করাই তাই যথার্থ স্বাধীনতাকামীদের স্বার্থ। তাঁহাদের নিজস্ব আর্থিক বিকাশের জন্যও বিশ্বশান্তি একটা প্রয়োজনীয় নীতি। স্বাধীনতালাভের সঙ্গেই এই উদার সত্য ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন—দুই দিক হইতেই, মানবতার দিক হইতে ও আপন জাতীয় বিকাশের দিক হইতেও। বিশ্বশান্তির আদর্শকে ভারতের রাষ্ট্রনেতারা পৃথিবীর কাছে অকুণ্ঠিত ভাবে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন। সেই হিসাবে ভারতের শান্তি ঐতিহ্যের প্রতিও পৃথিবীর শান্তিকামী জাতিদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইয়াছে; ভারতের রাষ্ট্র চেতনার সম্পর্কেও তাঁহারা গভীর বিশ্বাস পোষণ করিয়াছেন। চীনা-আক্রমণের পরেও ভারতের শান্তিকামী ঐতিহ্যের জন্যই সোভিয়েত প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী শক্তি ভারতের প্রতি আস্থা হারায় নাই। নিশ্চয়ই জাতীয় স্বাধীনতার মতোই জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রত্যেক জাতির সশস্ত্র আয়োজনেও রক্ষণীয়—সেরূপ যুদ্ধ বিশ্বশান্তির প্রতিকূল নয়। কিন্তু এই প্রতিরক্ষার উন্মাদনায় যুদ্ধবাদিতায় ও সংকীর্ণ জাতীয়তার পথে যাঁহারা পদার্পণ করেন,—সামরিক জোটে জুটিয়া পড়িবার জন্য চীৎকার জুড়িয়া দেন—তাঁহারা ভারতের বন্ধু-বিচ্ছেদের, নৈতিক আদর্শত্যাগের ও রাজনৈতিক অপঘাতের দূত হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়ত, যতক্ষণ প্রতিরক্ষা প্রয়োজন ততক্ষণ সমস্ত আয়োজনে যথাসম্ভব আত্মনির্ভর হইবার চেষ্টাও প্রধান কর্তব্য। সেই আয়োজন সুসম্পন্ন করিবার জন্য চাই যেমন সামরিক প্রস্তুতি তেমনি শিল্পোন্নয়ন, জনসাধারণের ধনবল, মনোবল ও আত্মবুদ্ধি,—এই সব কথা এখানে না বলিলেও চলে। বুঝিবার মতো মূল কথা এই—যুদ্ধ কাহারও পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষতঃ ভারতের মতো, এবং যত দূর বুঝি চীনের মতো, দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে আধুনিক যুদ্ধ সর্বনাশের কারণ না হইয়াই পারে না। চীনেরও তাই এমন দুর্বুদ্ধির কারণ আছে কি? তাইওয়ানে, কোরিয়া ও ভিয়েৎনামেই তাহার (সামরিক শক্তি থাকিলে) প্রথম উদ্যোগী হইবার কথা। অবশ্য নিজ পূর্ব সীমান্তে পথঘাটের জন্য কোনো কোনো অঞ্চল চীনের পক্ষে নিজ আয়ত্তে রাখাও প্রয়োজন। কিন্তু সেজন্য ভারত আক্রমণ করিলে তাহা মূঢ়তাই হইবে। চীনেরও তো আর্থিক উন্নয়নই এখন প্রথম প্রয়োজন—যুদ্ধ বা রাজ্যজয় নয়। ভারতেও পরিকল্পনামূলক আর্থিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আমরা স্বাধীনতার রূপায়ন করিতে চাই। এবং সে রূপায়ণে নানাবিধ অপটুতায় দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। যুদ্ধের জন্য পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। অতএব, স্বার্থ ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শান্তির পথে এই বিরোধের সমাধানের জন্য আমরা যদি প্রস্তুত থাকি তাহা হইলেই আমাদের এই আর্থিক স্বাধীনতার আয়োজন অগ্রসর হইতে পারিবে। আর আর্থিক স্বাধীনতা যদি না থাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতারই বা তাহা হইলে থাকিবে কী?

সোভিয়েত সংস্কৃতিও যে বিশ্বশান্তির উদ্যোক্তা রূপে আজ পৃথিবীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিয়াছে তাহারও কারণ ইহাই। শান্তি সোভিয়েতের পক্ষে অপরিহার্য নিজস্ব স্বার্থ। শান্তির অভাবে সাম্যবাদ নির্মাণ সোভিয়েতে আরও পিছাইয়া যাইতে বাধ্য। তাহা ছাড়া, বিশ্বশান্তি মানবতারও দাবী। সেই মানবতার দাবী সত্য করিয়া না তুলিতে পারিলে সাম্যবাদও সাধ্য হইয়া উঠিতে পারে না। সাম্যবাদ নিশ্চয়ই অবশ্য আর্থিক উপযোগিতাতে নতুন এক ঐতিহাসিক বিকাশ। কিন্তু আর্থিক বিকাশকে অন্য সমস্ত নৈতিক-আধ্যাত্মিক বিকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একান্ত করিয়া,

দেখাও যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নয়। দেখিয়াছি সমাজতন্ত্রে ইতিহাসের আর্থিক বিন্যাস ঘটিতেছে; ইতিহাসের নৈতিক-আধ্যাত্মিক বিকাশকে অবজ্ঞা করাও নিশ্চয়ই ইতিহাসের বিরোধিতা। সাম্যবাদী মানবতাকে বুর্জোয়া যুগের মানবতার অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ও অধিকতর সমৃদ্ধ হইতে হইবে, তাহার অপেক্ষা নিম্নতর তো নিশ্চয়ই নয়। বুর্জোয়া মানবতা শতকরা ৫ জনকেই মাত্র 'মানুষ' বলিয়া গণ্য করে,—সাম্যবাদী মানবতা শতকরা একশত জনকেই 'মানুষ' করিতে চাহে। সমগ্র অতীত ইতিহাসের আগামী পরিণতি যেমন সাম্যবাদ, 'অতীতের সমস্ত উত্তরাধিকারই (entire inheritance of humanity) যেমন সাম্যবাদীদের আপনার, তেমনি সমস্ত মানুষের ভবিষ্যতের মহৎ দায়িত্ব তাহাদের। মানুষের আর্থিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত সৃষ্টিকে পূর্ণতর করিয়াই সাম্যবাদ সার্থক :—এই নিকষেই সোভিয়েত-শাসনের দোষ-ত্রুটী, সংগ্রামকালীন ভ্রম, পরীক্ষাকালীন অপূর্ণতা-বিচ্যুতি সব ধরা পড়ে,—তাহার আপেক্ষিক অক্ষমতাও বুঝিতে পারা যায়। এই কারণেই স্তালিনের ত্রুটি বা বিকৃতি বা দুস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন বা চূড়ান্ত করিয়া দেখাও আবার ভুল। সেই সঙ্গে দেখিতে হইবে একদিকে রুশিয়ার জার আমলের পটভূমি, স্বৈরাচারী শাসন ঐতিহ্য, ধনিকতন্ত্রী সুদীর্ঘ যুদ্ধ, অবরোধ-চক্রান্ত, প্রভৃতি। অন্যদিকে স্তালিনযুগের সমস্ত বিকৃতি বিচ্যুতির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে হয় স্তালিন ব্যবস্থার কার্যগত কৃতিত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েতে পূর্বাপর বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন প্রয়োগ, সংস্কৃতির সার্বজনীন বিস্তার, বহুজাতিক মিলন, নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা,—এক কথায় মানুষের নবরূপায়ণের (Remaking of Man) সেই সব কৃতিত্বে মানব সংস্কৃতির রূপান্তর আরম্ভ হয় সেই স্তালিনের আমলেই। না হইলে, শুদ্ধ বিজ্ঞানের সাধনায় ও ফলিত বিজ্ঞানের কৃতিত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তো পৃথিবীতে অগ্রগণ্য। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে—মুষ্টিমেয় লোকের উচ্ছিষ্টের তাহা অবশেষ হইলেও—এখনো মার্কিন দেশের জীবন-মান সর্বোচ্চ। ব্যক্তিগত মনীষার ও মহদাশয়ের দৃষ্টান্তও নিশ্চয়ই সেই মার্কিন সমাজে সামান্য নয়। কিন্তু কি স্বদেশে কি ভিন্নদেশে বিজ্ঞানের সকল ফল সার্বজনীন উন্নয়নে প্রয়োগ করিতে মার্কিন নেতৃত্ব আগ্রহান্বিত নন। পৃথিবীর ধনৈশ্বর্যকে সমাজায়ত্ত করিতে, বা শোষণহীন ও কল্যাণব্রতী করিতে তাহাদের আপত্তি। আপনার শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-সম্পদকেও মানুষের মধ্যে বিলাইয়া দিতে তাহাদের অনিচ্ছা। এবং একদিনকার মানবাধিকারকে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির সেই মহৎ দানকে, মার্কিন নেতৃত্ব আজ সমস্বরে মর্যাদা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। তাহাও 'অন-আমেরিকান্ কাজ' রূপে মার্কিনবিচারে দণ্ডনীয়। এমন কি, পৃথিবীর বহুজাতির জাতীয় উন্নয়নের পরিপন্থী যত পঙ্গু ও কলঙ্কিত নায়ককেই (স্মরণীয় তাইওয়ান, কঙ্গো, কোরিয়া, ভিয়েৎনাম ইত্যাদি) ধনবলে অস্ত্রবলে সৈন্যবলে নিজ নিজ জাতির বিরুদ্ধে দাড় করাইয়া রাখাই আজ মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়—এত প্রতাপ ঐশ্বর্য সত্ত্বেও কেন বুর্জোয়া সংস্কৃতির এই ক্ষয় দশা, আর সাম্যবাদী সংস্কৃতিই বা কেন বুঝায় উৎকর্ষ।

শেষ কথা :—নিছক সেনা রূপার গণনায়, বা ভোগবিলাসের আতিশয্যে, নিশ্চয়ই সংস্কৃতির মান স্থির হয় না। আর্থিক বিকাশের সঙ্গে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ অপরাজেয় হইতেছে বলিয়াই তো সভ্যতার উৎকর্ষ। সংস্কৃতির বনিয়াদ আর্থিক ব্যবস্থাতেই বটে, কিন্তু 'রুটি ও সার্কাসে' সংস্কৃতির পরিচয় হইলে সেই সংস্কৃতির অপঘাত অনিবার্য। ভিত্তি রুটি হইলেও প্রথম অভীষ্ট আনন্দ ও চৈতন্যের প্রকাশ ও বিকাশ। মূলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আয়ত্ত হইলে পর বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক সুসমন্বিত সৃষ্টিসম্পদেই সংস্কৃতির পরিচয়। তাহার অর্থ অবশ্য পারত্রিক বা অলৌকিক কোনো ভাব বা কর্মকাণ্ড নয়। লৌকিক, মানবীয় কর্ম, মানবীয় ভাবনা। 'বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ' এই মানবাদর্শেই বৈজ্ঞানিক সাধনার সিদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার সার্থকতা। লৌকিক অর্থেই 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। ইহাই সোভিয়েত মানবতার লক্ষ্য। এই বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ মানবতাই আধুনিক সংস্কৃতির বাণী।

পরিশিষ্ট

[প্রথম ও অন্যান্য সংস্করণের 'কথারম্ভ']

কথাটা উঠিয়াছিল এইরূপে—উঠিয়াছিল ১৯৫০ সনের মে-জুন মাসে—মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন কাবারুদ্ধ হইয়াছেন ; 'জীবন-সাহিত্য' নামক একখানি ক্ষুদ্র হিন্দী মাসিকপত্রে পণ্ডিত বানারসী দাস চতুর্বেদী রাহুলজীর একটি জীবনী-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যাঁহারা হিন্দী সাহিত্যের খবর রাখেন তাঁহাবা জানেন যে, চতুবেদীজী এই বিষয়ে সিদ্ধহস্ত—বাঙলায়ও তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। কিন্তু কথাটি এইদিকে গেল না, গেল অন্য দিকে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'জীবন-সাহিত্যে'র সেই চৈত্র-সংখ্যা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দেখুন, রাহুল সাংকৃত্যায়নেব ফটো, আর তাঁব পাশে'—যাব জন্য এই পত্রখানা আপনাকে দেখাচ্ছি—দেখুন তো কি, কার চিত্র ?"

দেখিলাম মাতৃ-আলিঙ্গন-নিবদ্ধ এক ক্ষুদ্র শিশু। নীচেকার লেখা পড়িলাম—"মহাপণ্ডিত শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়নকী পত্নী শ্রীমতী এলেন স্মের্তোল্না, অপনে নবজাত পুত্র ইগোব রাহুলোভিচ্ সাংকৃত্যায়নকে সাথ।"

কৌতুক ও কৌতূহল দুইই প্রচুর বাড়িয়া গেল। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন সম্পর্কে আমার যাহা জানা ছিল তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সংবাদ যথেষ্টই পাইয়াছিলাম। তাহার উপর জানিতাম—এই অশান্ত মানুষটি যখন সোবাব রুশিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, পূর্ববর্তী জীবনেব বৈষ্ণব মোহান্তেব পরিচ্ছদের মতোই পরবর্তী এই বৌদ্ধ শ্রমণের বেশবাসও পরিত্যাগ কবিয়া, কিসান কর্মী হিসাবে বিহাবের অগ্নিগর্ভ কিসান আন্দোলনেব মধ্যখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বিহাবের জমিদার-প্রভাবিত কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহাকে এক প্রবল শত্রুরূপে গণ্য করিতে বাধ্য হন। লোকচক্ষে তাঁহাকে হেয় করিবাব প্রধান অস্ত্ররূপে সেদিন বিহারেব সেই মন্ত্রিমণ্ডলী প্রয়োগ কবিয়াছিলেন রুশিয়ায় রাহুলজীর এই পরিণয়-সংবাদটি। বলা বাহুল্য, সংবাদটি মিথ্যা নয় ; রাহুলজীও তাহা অস্বীকাব কবেন নাই। কিন্তু শুধু সংবাদের মধ্যেই প্রচার নিবদ্ধ রহে নাই। আর সেই প্রচার কিরূপ ক্রমবর্ধিত স্ফীত হইয়া উঠিল তাহাও সহজেই অনুমেয়। যে দেশে ব্রহ্মচর্যের এত সমাদর যে, বিবাহ না কবিলেই মানুষের চক্ষে মহৎ হইয়া উঠা যায়, সে দেশে সন্ন্যাসী বা শ্রমণের পক্ষে দার-পরিগ্রহ করিলে কি আর প্রশ্ন আছে ? রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও তাই রাহুলজী যে 'পতিত' এই কথাটি প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে ছিল তাঁহার রুশ-পত্নী ও পুত্রের চিত্র প্রভৃতি ডাকযোগে প্রাপ্ত এই সব প্রমাণ। অতএব, 'জীবন-সাহিত্যে'র ক্ষুদ্র ফটোটি সকৌতুকে ও সকুতূহলে দেখিলাম।

কিন্তু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ঔৎসুক্য সেদিকে নয়। তিনি বলতে লাগিলেন—"নামটি দেখলেন ?—রাহুল-পুত্র ইগোর। এই ইগোর নামটির জন্যই আপনাকে এই ছবি দেখানো ; ইগোর ছিলেন রুশ দেশের রুশ বীর। তিনি ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাতার আক্রমণ থেকে রুশদের রক্ষা করেন। রুশের বীরত্ব-গাথায় তাঁর আসন হচ্ছে তাই জাতীয় বীরের আসন। সাড়ে সাত শত বৎসর আগে রুশ দেশের উপরে, ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, তাতার-তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ছিল ; বীর ইগোর তা রোধ করতে যান। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে রুশের তখনকার এক স্যাগা। মোটামুটি জাতীয় মনে ইগোর হন জাতীয় বীর। রুশিয়া তো এখন সাম্যবাদী ; আর সেই হিসাবে জাতীয়তাবাদ ও 'জাতীয়-মনের' অস্তিত্বই স্বীকার করে না ; স্বীকার করে শুধু উৎপাদন-সম্পর্কে-নির্ণীত সামাজিক সম্বন্ধ আর তেমনি পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তনশীল ব্যক্তি-মানস। কিন্তু যা-ই বলুক যে, ধীরে ধীরে আবার জাতীয় মন ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি রুশ শাসকদের দৃষ্টি পড়ছে ; আবার তারা একটা রুশ-বৈশিষ্ট্যের

বাদের বিরোধী ধারার বিকাশই দেখিতেছেন। ইগোর 'রাহুলোভিচ' নামটি তাঁহার নিকটে রুশ জাতীয়-ধারার জয়চিহ্নরূপেই উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

মস্কোর তখনকার (১৯৪০) আর একটি সংবাদ—

"আজুরবাইজানের মহাকবি নিজামী গানজেবীর (১১৪২-১২০৩ খৃঃ অঃ) 'অষ্টশতাব্দ জন্মজয়ন্তী' আগামী বৎসরে (১৯৪০-১) সমস্ত সোভিয়েত রুশিয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে আজুরবাইজানের সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের প্রধান নগর বাকু হইতে নিজামী ও তাঁহার কাব্যাবলী বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।"

নিজামী দ্বাদশ শতাব্দীতে গানজায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন আজুরবাইজান, আরব ও পারসিক আক্রমণকারীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছে। গানজার বর্তমান নতুন নাম কিরোভাবাদ। নিজামীর নামও আমাদের নিকট অপরিচিত নয়। মস্কোর সংবাদটি বলিতেছে, "নিজামীর কাব্যে প্রাচ্যের সমৃদ্ধিশীল সংস্কৃতি রূপগ্রহণ করিয়াছে।" পাঁচখণ্ডে তাঁহার কাব্যমালা বিভক্ত যথা—রহস্য-ভাণ্ডার, খোসরো-শিরীণ, লায়লা-মজনু, সপ্তসুন্দরী এবং সেকান্দর নামা। বংশীয় ও সমীপপ্রাচ্যের পরবর্তী কবিকুল এই পঞ্চকাব্যের আখ্যায়িকা, রীতি, শব্দ ও বাগ্-ভঙ্গী লইয়া আপনাদের কবিতা রচনা করিয়াছেন। 'মস্কো নিউজ' বলিতেছেন—"নিজামী মানব প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার কাব্যে মানুষ ও মানুষের জীবনের সকল প্রকাশভঙ্গির প্রতি এক সুগভীর প্রেম পরিদৃষ্ট হয়। অগণ্য কাহিনীতে তাঁহার স্মৃতি সঞ্জীবিত হইয়া আছে। নিজামীর কাব্য কালের বিচারে জয়লাভ করিয়াছে—বিশ্বসংস্কৃতিতে আটশত বৎসর পরেও তাহার মূল্য রহিয়াছে অক্ষুণ্ণ।"

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি মস্কোর এই অনুরাগকে এই ক্ষেত্রে শুধু মাত্র 'রুশ জাতীয়তাবাদ' বলিবার উপায় নাই। কারণ, নিজামী রুশ কবি নহেন, তিনি আজুরবাইজানের কবি। 'রুশ জাতীয়তাবাদ' বা "জারের সাম্রাজ্যবাদ" এই অবজ্ঞাত দেশের কবির প্রতি সমগ্র ইউ. এস এস. আর-এর এইরূপ সম্মান প্রদর্শনের আয়োজন সমর্থনও করিত না, সহ্যও করিত না। তাহা হইলে বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি সোভিয়েত চিন্তার সশ্রদ্ধ অনুরাগই কি ইহাতে সূচিত হইতেছে না?[১]

সোভিয়েত চিন্তার গতি নির্ধারণ করিতে হইলে সোভিয়েত সৃষ্টি-প্রয়াসের আরও দুই একটি বিষয় অনুধাবন করা উচিত। মস্কোর ১৯৩৯ সনের সাহিত্য সৃষ্টির একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতে দেখি—পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যে যেই সব জাতি ছিল অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত আজ তাহাদের জীবন কথাই রুশেরা সগর্বে বলিতে শুরু করিয়াছেন। য়ুরাকি ও চুকচি জাতি প্রায় মেরুমণ্ডলের অধিবাসী, ল্যাপল্যাণ্ডের যাযাবর জাতি। তাহাদেরই কাহিনী রচনা করিয়া ক্রাৎ ও মেনশিকফ্ নামীয় দুইজন ঔপন্যাসিক রুশদেশের সম্মুখে ল্যাপল্যাণ্ডের জীবনধারা তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহাদের লেখার ভঙ্গিতে কৃপার দৃষ্টি নাই, তাহাতে আছে সহযাত্রীর ও সহকর্মীর প্রাণময় স্পর্শ। রুশ লেখক বলিতেছেন, "গত বৎসরের (১৯৩৯) রুশ সাহিত্যে আর একটি লক্ষণও সুস্পষ্ট। তাহা এই যে, ইউ. এস্. এস্. আর. এর (সোভিয়েত-সংঘের) নানা জাতির (১৯৩৯ সনের আগে ১১টি দেশের এবং ছোট বড় ১৮৫টি জাতির সমবায়ে গঠিত ছিল এই সংঘ) তরুণ ও বর্ষীয়ান্ লেখকেরা আজ নিজ নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা তো পোষণ করেনই, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির বিষয়েও আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছেন। উহাদের জীবনধারাকে জানিবার ও জীবনপ্রণালীকে রূপ দিবার জন্যও তাঁহাদের অশেষ আগ্রহ। সোভিয়েত লেখকেরা সোভিয়েত-সংঘের জাতিসমূহের ঐতিহাসিক অতীতকে মোটেই অবহেলা করিতে চান না। এই এক বৎসরেরই মধ্যে গুর্জী (জর্জিয়ান) জাতির বীর 'সা কাদ্জে'র স্মৃতিতে আন্না অন্তোনোভোস্কা এক পাঁচশত পৃষ্ঠার উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। মুখ্তার আউজোফ্ রুশীয়দের বিরুদ্ধে নিজ কাজাক জাতির বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন

১ এই সম্বন্ধে গত বিশ বৎসরে এত প্রমাণ হস্তগত হইয়াছে যে তাহা লইয়াই এক বিপুল গ্রন্থ লেখা চলে। এযুগের ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা সোভিয়েততন্ত্রে বিভিন্ন জাতির, বিশেষত এশিয়াখণ্ডের অবজ্ঞাত জাতিদের এই সাংস্কৃতিক বিকাশ। এ বিষয়ে যে কোনো প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ করাই যথেষ্ট। যুদ্ধকালেও সোভিয়েত দেশে 'মহাভারত' ও 'তুলসীদাসের রামায়ণ' প্রভৃতির অনুবাদ চলিয়াছিল,—ইহাও স্মরণীয়।

নাটক! মধ্য এশিয়ার জাতীয় বীর খোজা নাসিরুদ্দীনের বীরত্ব-গাথাকে অবলম্বন করিয়া লিউনিদ্ সলোভিয়ফ রচনা করিয়াছেন তাঁহার কল্পনা-কুশল গ্রন্থ।"

মোটের উপর কথাটি এইবার পরিষ্কার—সোভিয়েত ভূমিতে রুশ জাতীয় বীর, আজুরবাইজানের জাতীয় লেখক এবং গুর্জী (জর্জিয়ান) বা অন্যান্য জাতির লেখকদের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বাধা নাই। এই নতুন 'জাতীয়তাবোধ' যে সোভিয়েত 'জাতি-বিধানের' অনুযায়ী, এবং অসহিষ্ণু "রুশ জাতীয়তাবাদ" বা জার-যুগের সাম্রাজ্যবাদ নয়, সংস্কৃতিগত সাম্রাজ্যবাদও নয়, তাই তাহাও স্পষ্ট। আর, সোভিয়েত সংঘে নিজের দেশের প্রতি অনুরাগ যে কত আদরণীয় তাহার প্রমাণ পাই সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শলোকফ-এর কথায়। And Quiet Flows the Don ও Virgin Soil Upturned প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক এই কসাক সাহিত্যিক আমাদেরও অনেকের সুপরিচিত। রাহুল সাংকৃত্যায়নের হিন্দী গ্রন্থ "সোভিয়েত ভূমি"তে শলোকফ্-এর যে একটি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; তাহাতে দেখিতে পাই—শলোকফ্ সোভিয়েত পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচনকালে বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন—"আমি আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করছি। কারণ, আমি ডনের এক নির্বাচন-ক্ষেত্র থেকে নির্বাচন-প্রার্থী হয়েছি। ডনের তীরে আমি জন্মেছি, ডন আমায় লালন-পালন করেছে, এখানেই আমি শিক্ষালাভ করেছি। এখানেই যুবক হয়েছি, লেখক হয়েছি, হয়েছি আমার নিজ মহান্ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। আমার মহান্ ও অনুপম মাতৃভূমির আমি ভক্ত—সগৌরবে আমি বলতে চাই, আমার জন্মধাত্রী ডন ভূমির আমি ভক্ত।" ভারতভূমির সাম্যবাদীরা এই বাক্যে অবশ্য চমকিত হইবেন না। কিন্তু বৈষম্যবাদীদেরও উল্লাসের কারণ নাই। কারণ এই দেশপ্রেমই সার্থক। গোটা দেশই সেখানে দেশের সকল মানুষের—বিশেষ কয়জন মুষ্টিমেয় লোকের নয়। তাই, বিকাশোন্মুখ সাম্যবাদী-সংস্কৃতি ও সোভিয়েত-সংস্কৃতি বুঝিবার পক্ষে এই সব তথ্য দিগদর্শন-স্বরূপ।

[নিম্নবর্তী অংশ ১৯৪৮-এ সংযোজিত]

১৯৪৮-এর জুলাই মাসেও কিন্তু কথাটা চুকিয়া যায় নাই। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মুখে প্রশ্ন শুনিলাম—'কমিউনিজম উইদাউট রুশিয়া' হয় না'—রুশদের বাদ দিয়া কি সাম্যবাদ গড়া চলে না?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ভারতের বহু পণ্ডিত ও বহু নেতার সমস্ত গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া হিটলার মুসোলিনী-তোজোর দল পরাজিত হইয়াছে, এবং মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েত জাতিসংঘ সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছে; এমন কি, এই যুদ্ধান্তের পর্বে সেই সোভিয়েত সংঘ পুনঃসংগঠনের কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষায়ও এখন উত্তীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ, কি যুদ্ধের পরীক্ষায় কি শান্তির পরীক্ষায়, কোনো পরীক্ষাতেই সোভিয়েত ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে নাই। সেই সময়কার ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন সোভিয়েত দেশ হইতে সম্প্রতি (১৯৪৭) আবার ফিরিয়াছেন; ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হইতেও তিনি বাহির হইয়া গিয়াছেন; বর্তমান ভারতের হিন্দী প্রতিষ্ঠাকামী রাজনীতিবিদদের দ্বারা আবার মহাপণ্ডিতরূপে তিনি সংবর্ধিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে মুখে এই কাহিনীও নানাভাবে প্রচারিত—এবার সোভিয়েতে বাসকালে রাহুলজীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক আদর্শের নানা স্বপ্নই ভাঙিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমারের কানেও তাহা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাহুলজীর মুখে অবশ্য সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধে উল্টা কথাই শোনা গিয়াছে, বারে বারে তিনি সোভিয়েত ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও অগ্রগতির কথাই সর্বত্র বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই কাহিনী ষোল আনা সত্য হইলেও বিস্ময়ের কিছু হইত না। কারণ, যাহা 'স্বপ্ন' তাহা ভাঙাই প্রয়োজন। আর, সোভিয়েত দেশ কেন, কোনো দেশই 'স্বপ্ন দিয়া গড়া' চলে না। সোভিয়েত দেশটাও মাটির এবং মানুষের; তবে নতুন মানুষের। অধ্যাপক মহাশয় কিন্তু আর একটা স্বপ্নের খোঁজ করিলেন,—'রুশদের বাদ দিয়া কি সাম্যবাদ গড়া চলে না?'

কথাটার উত্তর এই: কোনো জাতিকে বাদ দিয়াই সাম্যবাদ গড়া চলে না। রুশিয়ার মত বিপুল দেশ ও বিশাল জনসমাজকে বাদ দেওয়ার তাই কথাই উঠে না। ঠিক এই কারণেই সাম্যবাদ

ভারতবর্ষ বা চীনকে (তখনো চিয়াং কাই শেক শাসিত) বাদ দিয়াও গড়া চলে না। সম্ভবত আমেরিকাকে বাদ দিয়াও গড়া সম্ভব নয়। কারণ সাম্যবাদ তো নৈয়ায়িকের তর্কের বিষয় নয়; উহা যে একটি বাস্তব সমাজ-পদ্ধতি। এই জন্যই আজিকার বাস্তব পৃথিবীতে প্রধান প্রধান জাতিগুলিকে বাদ দিয়া সাম্যবাদের সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়। অবশ্য তেমন বড় দুই একটা দেশ পাইলে সেখানে সম্ভব হয় শুধু সাম্যবাদের গোড়াপত্তনের—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ও তারপর সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতির। রুশিয়া নামক একটি দেশে শুধু নয়, সোভিয়েত সংঘের ষোলটি জাতির দেশে এইরূপে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হইয়েছে। এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তাই এখন রুশিয়া ও অন্য সেই পনেরটি দেশের অভিজ্ঞতা,—তাহাদের ভুলত্রুটি, সার্থকতা, শিক্ষা-দীক্ষা এই সবই হইল পৃথিবীতে যে-কোনো দেশে সাম্যবাদ গড়িবার পক্ষে এক অপরিহার্য উদাহরণ, উহার আদর্শ ও অবলম্বন। তাই পৃথিবীতে সাম্যবাদ গড়িবার পক্ষে রুশিয়াকে বাদ দিলে আজ চলে না; চলে না যেমন সোভিয়েত সংঘের পক্ষেও 'পশ্চিম ইউরোপকে' বাদ দিয়া রুশিয়াতে কমিউনিজম্ পুরাপুরি গড়িয়া ফেলা। এই মুহূর্তে বাস্তবক্ষেত্রে চীনকে বাদ দিয়া, কিংবা ভারতবর্ষকে বাদ দিয়াই, কি স্থায়ীভাবে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা যায় ইউরোপের বা এশিয়ার কোথাও? কিংবা ধনিকতন্ত্রই কি বেশিক্ষণ টিঁকিয়া থাকিতে পারে চীন ও ভারতবর্ষ যদি এখন ধনিকতন্ত্রীদের করচ্যুত হইয়া যায়?

অধ্যাপক সুনীতিকুমারের উক্ত প্রশ্নে এই বাস্তব সত্যের ও সাম্যবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। তাঁহার মতো অনেকেরই সংশয় এখন এই নয় যে, 'রুশিয়া' স্বজাত্য বর্জন করিয়াছে, এখন তাঁহাদের ধারণা—রুশিয়া উৎকট রকমের 'স্বদেশী' হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি সাম্যবাদের নামে মধ্য এশিয়ার ছোট ছোট জাতিদেরও গিলিয়া খাইয়াছে। তাঁহাদের মতে ইহার প্রমাণ—সেই সব দেশে রুশভাষী অনেক অধিবাসী রহিয়াছে এবং সেই সব দেশের মানুষের নাম পর্যন্ত রুশ-ধরনের হইয়া উঠিতেছে—যেমন, 'রহিম' হইয়াছেন 'রহিমফ', শ্রীমতী 'মোক্‌সদা হাজী' হইয়াছেন 'মোক্‌সদা হাজীয়েভা'। বলা বাহুল্য, মার্কিন-ইংরেজ প্রমুখ ধনিকতন্ত্রীদেরও একটা প্রধান প্রচার এই যে, সোভিয়েত রাজ্য-বিস্তার করিতেছে, ইহাই 'নতুন সাম্যবাদ'। ১৯৪০-এও এই সন্দেহ সুনীতিবাবুর মনে ছিল। তখন তার দিনে উহার উত্তর লাভ তখনকার একটি সংখ্যা 'মস্কো নিউজ' হইতেও সংগ্রহ করিতে পারা যাইত, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ১৯৪৮ এ সেই সন্দেহের নিরসন হইতে পারিত। (১) কারণ যুদ্ধকালে ফ্রান্স ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির ভাগ্য দেখিয়া ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, আজিকার পৃথিবীতে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, প্রাণ দেয় প্রধানত প্রত্যেক দেশের শ্রমিক শ্রেণী, বিশেষ করিয়া সাম্যবাদী শ্রমিক সাধারণ; আর নিজের দেশের স্বাধীনতাকে শ্রেণীর স্বার্থে অকাতরে বিকাইয়া দেয় ফ্রান্সের 'দুই শত পরিবার' ও তাহাদের শ্রেণীর ফরাসী "জাতীয়তা-বাদী" ভদ্রলোকেরা। অন্যদিকে সোভিয়েত সংঘের অন্তর্ভুক্ত উজবেগ, গুর্জী, আর্মানী প্রভৃতি পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদেরও এদেশে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইচ্ছা করিলে সোভিয়েত ভূমি সম্পর্কেও আরও অধিকতর তথ্যও সংগ্রহ করিতে পারা যায়—সম্প্রতি এই সুযোগও আজ আছে। মার্কিন সাম্রাজ্যের প্রচার, নানা দেশের মালিক নেতার মন-ভুলানো ছড়া গল্প সংগ্রহ করিয়া আজ আর তবু এ দেশেও কোনো অনুসন্ধিৎসু-মন তৃপ্ত হইতে পারে না, উহাতে শুধু আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতে পারে। অবশ্য সেই আত্মপ্রবঞ্চনার উপযোগী কাগজ পত্র ও সুযোগ আজ ভারতবর্ষে ভারতের বিকৃত ধনিকতন্ত্রের কৃপায় আরও অনেক গুণ বেশি। না হইলে এদেশ হইতেও সোভিয়েত সম্বন্ধে সংবাদ এখনো সংগ্রহ করা যায়—সোভিয়েত সংঘে রুশদের সংখ্যা ১১ কোটির

(১) ১৯৪৮-এর পরে পৃথিবীতে এই বিরাট পরিবর্তনই ঘটিয়াছে। চীন ও ভারতবর্ষই শুধু নয়, এশিয়া আফ্রিকা ও প্রায় সম্পূর্ণতঃ দক্ষিণ আমেরিকার কিউবা এখন সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত। অন্যদিকে সোভিয়েত দেশেও সাম্যবাদ গড়িবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও দুইবার (১৯৫৮।১৯৬০ এ) সোভিয়েত দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। যতদূর জানি তিনি ভালোমন্দ শুদ্ধই সেই দেশকে বিচার করেন। তিনি মোটেই সাম্যবাদী হন নাই; কিন্তু ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সভাপতি।

(১৯৬০) উপরে, উজবেগীর সংখ্যা ৮০ লক্ষও (১৯৬০) নয় ; অতএব রুশরা জাতে, সংখ্যায় ও শিক্ষায় প্রধান। তাহাদের প্রভাবও যে সর্বাধিক তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু প্রভাব মাত্রই কি বৈশিষ্ট্য-বিনাশী ? সোভিয়েত রুশিয়া ও উক্রেইনীদের প্রভাবে কি উজবেগী বা তাজিকদের আর্থিক, রাষ্ট্রিক বা আধ্যাত্মিক বিনাশ ঘটিতেছে, না বিকাশ ঘটিতেছে, তাহাই প্রথম প্রশ্ন। সোভিয়েত বিরোধীদের 'প্রমাণগুলি' কি সত্যই প্রমাণ, না ছুটা ছাটা কয়েকটি দৃষ্টান্ত ? আর কতটুকুই বা সেই প্রমাণের গুরুত্ব ? ঐসব ছুটা ছাটা দৃষ্টান্ত অস্বীকার না করিয়াও এইভাবে তাহা যাচাই করিয়া দেখিতে পারি। কারণ পুঁথিপত্র না ঘাঁটিয়াও অনুরূপ তথ্য এবং আরও অনেক অনেক বেশি, আরও অনেক ভাবী দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। তাহা দিয়াও সেই দেশের সাধারণ অবস্থার বিচার করিতে হইবে।

উজবেগ কবি জাম্বুলের নাম সমস্ত সোভিয়েত ভূমিতে উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য দেশেও তাঁহার নাম শুনিয়াছে অনেকে। ১৯৪৫এ শতবৎসরের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া জাম্বুল দেহত্যাগ করিয়াছেন। উজবেগিস্তানের স্বাধীনতায় ও অগ্রগতিতে উদ্বুদ্ধ এই বৃদ্ধ চারণকবি লেনিন ও স্তালিনের কীর্তিগাথা গাহিতে কোনোদিন শ্রান্তি বোধ করেন নাই। মৃত্যুর পূর্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রিয় পুত্রের মৃত্যুশোকে আহত কবি বুক ভরিয়া গাহিয়াছেন সোভিয়েতের নব রচিত বিজয় গান। হয়ত না হইলে—এই কারণেই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ। রুশগণ তাঁহার নাম রটাইয়া বেড়ান। কিন্তু উজবেগ নয়। আলীশের নভোই সোভিয়েত যুগের মানুষ নন। তিনি জন্মিয়াছিলেন মধ্যযুগে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এখানেও তিনি উজবেগীদের কবি, দার্শনিক, মানব-মর্যাদার উদ্গাতা। সেকালের রীতি মেনে তিনি ফারসী বা ফার্সি ভাষায় কাব্য-রচনা করেন নাই কবিতা লিখিয়াছেন উজবেগী ভাষায়। তুলনা করিয়া ফার্সি অপেক্ষা নিজের উজবেগী ভাষার গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। প্রায় হাজার পঞ্চাশেক শ্লোকে তাঁহার 'খামসা' (পঞ্চাধ্যায়ের কাব্য লেখা ; উহা শিরীণ ফরহাদ, লয়লা মজনু প্রভৃতি প্রেম-গাথা নভোই'র কবিত্বের, তাঁহার দার্শনিকতার, তাঁহার মানব মমতার অজস্র প্রমাণ রহিয়াছে শিরীণ ফরহাদ, লায়লা মজনু প্রভৃতি প্রেম-কাহিনী ব্যাখ্যায়। জাতিতে জাতিতে মৈত্রীবন্ধনের, সাধারণ মানুষের জন্য মমতার, অত্যাচারী শাসককুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভের ও ব্যক্তিহৃদয়ের প্রেমপ্রীতির প্রতি মর্যাদার বহু ইঙ্গিত রহিয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর উজবেগ কবির নিকট এই দৃষ্টিভঙ্গি একটু অপ্রত্যাশিত। নভোই'র পাঁচশত বৎসরের জন্মোৎসব এবার (১৯৪৮) মে মাসে পালিত হইতেছে সমস্ত সোভিয়েত দেশে—মস্কো, লেনিনগ্রাদ কিয়েফ্ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বড় শহরে ১৫ই মে এইজন্য নানা অনুষ্ঠান হয়। উজবেগ রাজধানী তাশখন্দে এই জয়ন্তী উৎসবে বহুদিন ব্যাপী উৎসব চলে। সোভিয়েতের নানা জাতির কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এর সম্মেলনে সমবেত হন। রুশ কবি কনস্টানটিন সিমনেভ্ তাহাতে পৌরোহিত্য করেন। তাশখন্দে সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় অপেরার নাম এখন হইতে হইবে 'নভোই অপেরা।' নভোই'র নামে সেই গৃহে একটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহারই মর্মর পাদপীঠে স্থাপিত হইতেছে কবির ব্রোঞ্জের নব নির্মিত প্রতিমূর্তি। উজবেগিস্তানের বহু সমবেত কৃষি প্রতিষ্ঠান, থিয়েটার, ইস্কুল ও লাইব্রেরির নামকরণ হইতেছে নভোই'র নামে। সমরখন্দে কবি যৌবন কাটাইয়া ছিলেন তাই সমরখন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও উজবেগ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারেরও নাম রাখা হইল তাঁহার নামে। উজবেগ বিজ্ঞান-পরিষদের এবার 'সার্ধ-শত উৎসব' হইতেছে, উহারও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে কবির স্মৃতিতে। পাঁচ শত বৎসরের পূর্বেকার এই উজবেগী ভাষার কবিকে লইয়া সোভিয়েত জগতের এই যে উৎসব, সোভিয়েতময় কবিপূজা, ইহা কি উজবেগী সংস্কৃতি বিনাশের ষড়যন্ত্রের প্রমাণ, না, উহার বিকাশের প্রয়াসের দৃষ্টান্ত ?

এইরূপ ছুটা ছাটা দৃষ্টান্ত অবশ্য উদ্ধৃত করিয়া শেষ করা যায় না। সেই কারণেই আর বেশি বাস্তব তথ্য তুলিয়াও লাভ নাই। বিশেষত তথ্য পরিবর্তিত হয়, নতুন তথ্য প্রতিনিয়ত যোগ হয়। সোভিয়েত পদ্ধতিতে সে পরিবর্তনের গতি আবার এত ক্ষিপ্র যে তাহার সহিত তাল রাখিয়া লেখকের চলা সহজ নয়। কিন্তু সেই সব তথ্যের মধ্য হইতে উজবেগ জাতির (ও সোভিয়েতের অন্যান্য জাতির) গতিপথের যে আভাস অভ্রান্ত হইয়া উঠে তাহা স্মরণীয়—আর তাহাই আসলে উজবেগ সংস্কৃতির

অবস্থা বিচারের প্রধান প্রমাণ। যেমন, প্রথম কথা হইল, উজবেকিস্তান শুধু জারের শাসন-মুক্ত হয় নাই, মোল্লা ও ওমরাহদেরও সমস্ত রকম শোষণ-মুক্ত হইয়াছে। আজ উজবেগ রাষ্ট্র (ইউ. এ. এস. এস. আর) সোভিয়েত সংঘে রুশ রাষ্ট্রেরই (আর. এস. এফ. এস. আর) সমতুল্য ও সমকক্ষ ; দুইই সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের সভ্য ; উজবেগীদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ; আর নিজ রাষ্ট্রে আজ উজবেগী জনসাধারণই ভাগ্য-নিয়ন্তা।

এই 'রাষ্ট্রীয়' কথাটাই হয়ত কেহ কেহ মানিবেন না। মানিলেও বলিবেন, এই অধিকারের আড়ালে উজবেগ-জাতি অপরাপর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারাইতেছে।

আর্থিক তথ্যের সাক্ষ্য তাঁহাদিগকে দেখানো যাইতে পারে। কিন্তু আর্থিক জীবনের হিসাবপত্রে হয়ত প্রয়োজন নাই। সংশয়বাদীরা বলিবেন, আসল কথা হইল, উজবেক সংস্কৃতি কতটা ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে এই নতুন সোভিয়েত ব্যবস্থায় ?—উহারও প্রমাণ সুবিদিত—যেখানে ১৯২৬এ ছিল শতকরা ১০·৬ জন মাত্র অক্ষরজানা, সেখানে সেকালের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছাড়া সকলেই এখন অক্ষরজানা। উজবেগী অধ্যাপক, উজবেগী বৈজ্ঞানিক, উজবেগী গবেষক হইতে উজবেগী রাষ্ট্রবিদ্ আজ সে রাজ্য চালান। তাঁহারা অনেকেই আজ মস্কোতেও যান সসম্মানে ; আবার রুশ বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞও আসেন তাশখন্দে। শুধু রুশ নয়, উজবেগী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে প্রতিবৎসর উজবেগ, তাজিক, কিরঘিজ, তুর্কমেন, কাজাক প্রভৃতি প্রায় ২০টি জাতির ছাত্রছাত্রী পড়িতে আসে। উহার অধ্যাপক গবেষকদের মধ্যেও নানাজাতির লোক আছেন ; নাম শুনিলেই বুঝা যায়—রসায়নের মহোপাধ্যায় (ডীন্) হইলেন সাদিকভ্, টি, কারি নিয়োজভ্ গণিতের ; আবদুল্লায়েভ্ ভূ তত্ত্বের ; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ (রেক্‌টর) হইলেন ওমরভ (প্রত্যেকটি মুসলিম নামের পিছনে আছে রুশ প্রত্যয় 'অভ্')। চোখ মেলিলে হয়ত সেই গৃহে মধ্যএশিয়ার চন্দ্রমুখীদের সঙ্গে দেখিব সেখানকার গোলমুখ, অনুচ্চনাসা, তির্যক নেত্র সেই চ্যাপ্টা টুপি-পরা উজবেগ তুর্কদেব, এবং দুই একটি ইউরোপীয় নাক মুখ রঙও দেখিব।

হয়ত এই শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কারুবিদ্যার (টেকনোলজির) বিবিধ উজবেগ ব্যবস্থাও উজবেগ সংস্কৃতির সমুত্থানের সম্পূর্ণ প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে না। কিন্তু সমরখন্দের উজবেগ মিউজিয়ামে যে প্রাচীন ভাস্কর্যের, কারু শিল্পের, পুরাতত্ত্বের ও ইতিহাসের এবং জীবন্ত শিল্পকলার অজস্র নিদর্শন এখন সুরক্ষিত হইতেছে, বিশেষত ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার যে নতুন সূচনা সেখানে সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, তাহাও কি উজবেগ সংস্কৃতির পরিপোষক নয় ? যে উজবেকিস্তানে 'থিয়েটার' ছিল না, যে উজবেগী ভাষায় ১৯১৮ এর সময়ে উজবেগ নাট্যগুরু হামজা হাকিমজাদা নিয়াজী নামে মাত্র নাটক লিখিতেছিলেন, (এইরূপ ধর্মদ্রোহিতার জন্যই তিনি নিহত হন গুপ্ত প্রচেষ্টায়), সেখানে আজ ৪০টির উপর নাট্যশালা। অপেরা নৃত্যমঞ্চেরও অভাব নাই। নতুন কালের উজবেগী বেতারকেন্দ্র ও উজবেগী ফিল্‌ম বা ছায়াচিত্রতো সর্বত্রই গড়িয়া উঠিতেছে ; উজবেগীরা ফিল্‌মের গবেষণারও শিক্ষাপরিষদ্ স্থাপন করিয়াছেন। উজবেগ নট-শিল্পীরাও আজ সুপ্রতিষ্ঠিত—সোভিয়েত দেশের অন্য রাষ্ট্রেও সুপরিচিত।[1] আর নিয়াজীর সময় হইতে অনুবাদ ছাড়াইয়া কামাল ইয়াশেম, তুইগুন্, ইজ্জৎ সুলতানভ, সবির আবদুল্লা প্রভৃতির হাতে উজবেগ নাট্যসাহিত্যও গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাদের কোনো নাটকের বস্তু উজবেগী ধারার কথা, কোনটির কথাবস্তু বিপ্লবী যুগের উজবেগী কৃষকের জীবন, তাহার আশা ও প্রয়াস। আবার আধুনিক নাটকে অনিবার্যভাবে আসিয়াছে উজবেগীদের এই মহাযুদ্ধকালীন বীরত্ব ও বিজয়ের আখ্যায়িকা। অর্থাৎ প্রাচীন হোক, আধুনিক হোক, বিষয়বস্তু মূলত উজবেগী জীবনের ; কিন্তু রচনাকলায় তাঁহারা সযত্নে গ্রহণ করিয়াছেন শেক্‌স্‌পীয়র, শিলর হইতে চেখভ্, গর্কি প্রভৃতির রুশ নাটকের রীতি-পদ্ধতি পর্যন্ত। রঙ্গশালাও জন্ম লইয়াছে আধুনিক রঙ্গশালার নিয়মে, অনুসরণে। বাঙলা নাটকেই কি আমরা কৃষ্ণ যাত্রা কিংবা

---

১ উজবেগ তরুণী রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্য শান্তিনিকেতন হইতে শিখিয়া গিয়াছেন (রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' নাট্যাকারে (গঙ্গার মেয়ে নামে) উজবেগ ভাষায় বহু বহুবার অভিনীত হইয়াছে—এসব কথা আজ এতই সুপরিচিত যে এ কথ্যাবলী সংক্ষেপিত হইল।

'শকুন্তলা' 'মৃচ্ছকটিকের' ধারায় চলিয়াছি? না, চলিয়াছি ঐ জগদ্বরেণ্য, মহানাট্যকারদের প্রদর্শিত পথে ও আধুনিক রঙ্গশালার নিয়মে?

কিন্তু সংশয় ইহাতেও নিরাকৃত হইবার কারণ নাই।—সমাজতন্ত্রী সভ্যতার অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন আজ বিশেষ করিয়া রুশ জাতি,—যেমন ধনিকতন্ত্রী পৌরোহিত্য লাভ করিয়াছিলেন এক দিন ইংরেজ জাতি এবং বিংশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব হইতে করিয়াছেন মার্কিন জাতি। কিন্তু এই দুই ব্যবস্থার মূলগত নীতি ও স্বভাবে আকাশ পাতাল পার্থক্য। তাহা না জানিলে স্বভাবতই মনে হইবে 'প্রভাবের' মধ্য দিয়া 'প্রাধান্যই' ক্ষুদ্রতর জাতিদের উপর চাপানো হয়। কারণ, এত দিন পর্যন্ত ইহাই ছিল ধনিক সভ্যতার নিয়ম। কিন্তু সমাজতন্ত্রী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঠিক এই চিরকালের 'প্রাধান্যের'ই অস্বীকৃতি; সভ্যতার মৈত্রী-বন্ধনেরই উহা আয়োজন। উহার মূল কথা আধিপত্য বিস্তার নয়, আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সূত্রে সহযোগিতা। স্বভাবতই এই রাজনৈতিক সত্য না বুঝিলে বিশ্বাস করা দুরূহ হয় যে, এক বড় জাতি অন্য ছোট জাতির উপর আধিপত্য করে না।

অবশ্য মানুষের সভ্যতার ও মানুষের মনুষ্যত্বে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে যদি সত্য-সত্যই কেহ সোভিয়েত ব্যবস্থার স্বরূপ জানিতে আগ্রহান্বিত হন; শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত ধ্যান-ধারণার বশীভূত না থাকিতে চান; তাহা হইলে তিনি দুই দিক হইতে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে যাচাই করিতে অগ্রসর হইবেন। যথা, হয় তিনি মানব-বিদ্যার দৃষ্টিতে সোভিয়েত জীবনের মূল্য যাচাই করিয়া দেখিবেন। তখন ডীন অব ক্যাণ্টারব্যারির মত তাঁহার মনে হইবে—এই সভ্যতাতেই মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার সত্যকারের পাদপীঠ রচিত হইয়াছে। নয় তিনি এই ব্যবস্থাকে যাচাই করিতে চাহিবেন সমাজবিজ্ঞানের নিস্পৃহ নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া;—তখন সিডনি ও বিয়েট্রিস ওয়েবের মত তাঁহারও সংশয় কাটিয়া যাইবে, মনে হইবে 'নতুন সভ্যতা' আবির্ভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তখন এই বৃহত্তর সত্যও বুঝা যাইবে যে, এই সংস্কৃতি-সৃষ্টিতে সোভিয়েত-কৃতি এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে যাহাতে উহার ত্রুটি-বিচ্যুতিও ধরা পড়ে, আদর্শ-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া আসে। এইখানেই সোভিয়েত সংস্কৃতির আসল এক শক্তি—উহা এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও চালিত, আপনার বিচ্যুতিকেও যাচাই করিতে সমর্থ।

অবশ্য এই দুই পথেরই নিকট ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠে এই সত্য যে, সংস্কৃতি জিনিসটা শুধু 'সংস্কার' নয়—অপরিবর্তনীয় রীতিনীতি ধ্যানধারণা নয়, এবং তাহা শুধু সংস্কৃত-চিত্তদেরই 'শাশ্বত' ও 'একচেটিয়া' বিত্ত নয়। আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও শিল্পগত যে বিপ্লবের মধ্য দিয়া পশ্চাৎপদ ও পুরাতন জাতিরা সোভিয়েতে নবজন্ম লাভ করিতেছে, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করিতে পারেন তাহাতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারে তাহাদের 'কালচার' বিনষ্ট হইতেছে। কিন্তু কাহার সেই 'কালচার' যাহা বিনষ্ট হয়? অবসর বিলাসী মোল্লা আমীর শ্রেণীর (লেজর ক্লাশের) দুই চার জনের, না পরিশ্রমজীবী (টয়েলিং মাসেস) পঁচানব্বই জনের? আশ্চর্য নয়, সংস্কৃতি বা কালচার বলিতে শুধু অবকাশেরই সূক্ষ্ম ও স্থূল রচনাই আমরা বুঝিতে চাই। সেই অবসরভোগীদেরই আমরা তাই স্বতঃসিদ্ধরূপে সংস্কৃতির স্রষ্টা ও ভাগ্যনিয়ন্তা বলিয়া ধরিয়া লই। তাঁহাদের ছাড়াও যে সংস্কৃতি থাকিতে পারে, তাঁহাদের বিলোপেও যে সংস্কৃতির সমুত্থান সম্ভব, এই কথা আর তাই ভাবিয়া উঠিতেও পারি না। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরা তাই ভাবিয়া দেখিতে চাহেন না—সোভিয়েত ব্যবস্থায় কোন্ শ্রেণীর সংস্কৃতি অবজ্ঞাত হইয়াছে?—লোক-গীতি, লোক-কবিতা, লোক নৃত্য, এক কথায় লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতির এমন গবেষণা, এমন অভ্যুত্থান, এমন প্রাণময় প্রেরণা ইহার পূর্বে কোথায় পাইয়াছিল উজবেকিস্তান, বুরিয়াৎ মঙ্গোলিয়া বা ইয়াকুটস্কের মানুষ?—সোভিয়েত-ভূমির ১৫০ এর অধিক জাতি-সমূহের সাধারণ নর-নারী? আর কোথায় শতকরা ৯৫ জন পাইয়াছে এইরূপ সংস্কৃতির স্বরাজ?

কিন্তু সোভিয়েত সংস্কৃতির স্বরূপ লইয়াই শুধু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন ইহাও যে সংস্কৃতি কি? কি তাহার স্বরূপ, মানুষের প্রাচীন স্মৃতি কি চিরায়ু? না তাহার দেহান্তর আছে, রূপান্তর ঘটে? সংস্কৃতি কি শুধু শাসক শ্রেণীরই সম্পদ, অবসরের রচনা? শতকরা পঁচানব্বই জনকে, সৃষ্টিশীল জনতাকে, সংস্কৃতি-বঞ্চিত না রাখিলেই কি সংস্কৃতি মরে? না, অবসরের কৃত্রিম বিলাসে বরং সংস্কৃতি আয়ুহীন হয়?

—সাম্যবাদের অবশ্য মূল কথা হইল এই যে, মানব-সমাজ পরিবর্তিত হয় আর মানুষের সংস্কৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে খাত বদলায়। তাই, যখন এতদিনকার শ্রেণীশাসিত সমাজ রূপান্তরিত হইয়া শ্রেণীহীন সমাজে রূপ পরিগ্রহ করিবে তখন এই শ্রেণীগত সংস্কৃতিরও শ্রেণীহীন সংস্কৃতিতে রূপান্তর অনিবার্য হইবে। এই মূল কথাটিকে লইয়া ভুল যে কত বড় হইতে পারে তাহাও সোভিয়েত ইতিহাসে আছে—ভবিষ্যতেও থাকিতে পারে।[১] প্রথম যুগে সাম্যবাদীরা যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই শ্রেণীগত, অতএব অগ্রাহ্য বলিয়া স্থির করেন। শিল্পে সাহিত্যেও এ আজব সৃষ্টির উম্মাদনায় তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠেন। উগ্র 'বামপন্থী সাম্যবাদী' বিকৃতিরই সংস্কৃতিগত রূপমাত্র। এই উৎকট 'নতুনওয়ালারা' ভুলিয়া যান—শ্রেণীহীন সমাজ এখনো আসে নাই। যেই সমাজে আমরা নিঃশ্বাস লইতেছি তাহার বাস্তবরূপ না দেখিয়া কাল্পনিক শ্রেণীহীন সংস্কৃতি সৃষ্টি করা এক কল্পনা-বিলাস, তাহা সাম্যবাদের বিরোধী। ভারতীয় লেখকদের অনেকের 'কম্যুনিজম্' গল্পও অনেকদিন পর্যন্ত ফ্যাসানগত কল্পনা-বিলাস মাত্র ছিল; আজ তাঁহারা অনেক পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ হইয়াছেন। অবশ্য অনেকে শুধু 'ভোল' বদলাইয়া জিতিতে চাহেন। তবু মোটের উপর ভারতীয় সাহিত্যিক বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে এখন দৃঢ়-সঙ্কল্প। তাঁহাদের এই গোড়ার কথাটি আজ মনে জাগিতেছে—সাম্যবাদ ঐতিহাসিক বনিয়াদের উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে; তাহার দৃষ্টি ঐতিহাসিক। ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় বিশ্বাস করেন বলিয়াই সাম্যবাদী জানেন—মানুষের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির অনুবর্তন মাত্র হইবে না, হইবে রূপান্তর। তেমনি তাঁহার ঐতিহাসিক-বোধ অমোঘরূপেই তাঁহাকে বুঝাইয়া দেয়—মানবেতিহাসের কোন স্তরই অবজ্ঞেয় নয়,—মানব-প্রগতির পথে তাহা ঐতিহাসিক কারণে প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক কারণেই তাহার অবসান হইয়াছে। ইতিহাসের প্রাচীন স্মৃতি সেই কারণ-পরম্পরার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া গিয়া মানব-প্রগতিধারাকেই স্পষ্ট করিয়া তোলে, চিহ্নিত করিয়া দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দেয়—এই স্মৃতির সৌরভ যেমনি সংরক্ষণ-যোগ্য তেমনি ভাবী সংস্কৃতির সুমহৎ সম্ভাবনাও অশেষ আগ্রহে সংগঠন যোগ্য।

আসল কথা, সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারের পুনরাবর্তন নয়;—সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্তন। সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষ ক্রমেই বেশি করিয়া 'মানুষ' হইতেছে, প্রাচীন সংস্কৃতিও হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্ব সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত।

সমাপ্ত

১ এই কথা ভুলিয়া গেলে স্তালিন আমলের নিন্দিত আতিশয্য ও বর্তমান বিস্তালিনীকরণের তাড়না দুইটিই বড় হইয়া চোখে পড়ে। রুশ জাতীয় চরিত্রের একটি ঝোঁক সব কিছু চূড়ান্ত করিয়া করা, সেই প্রসঙ্গে তাহাও মনে রাখা দরকার।

বাঙালী সংস্কৃতির রূপ

১৩৫১—১৩৫৩

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

কথা-সূত্র

বাঙালী সংস্কৃতি বলতে সাধারণত আমরা বুঝি—বাঙালী জাতির জীবনযাত্রা আর তার সংস্কৃতিকে। অবশ্য 'সংস্কৃতি' কথাটা খুব ব্যাপক; আমরা ইংরেজি 'কাল্‌চার' কথাটির মতই ব্যাপক অর্থে তা প্রয়োগ করি। তাই সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তি ও কর্ম, তার জীবনযাত্রার আর্থিক ও সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান; তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া আর নানা শিল্পসৃষ্টি—সমস্ত কারুকলা ও চারুকলা এই হল সংস্কৃতির স্বরূপ (দ্রষ্টব্য ঃ 'সংস্কৃতির স্বরূপ')।

ভদ্রলোকের ভিত্তিভূমি

কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণত ইংরেজ আমলের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী সমাজের জীবনযাত্রা ও তার বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টিসমূহকেই বুঝি। এই শিক্ষিতদের বাইরেও বাঙালী জন-সমষ্টি রয়েছে। তাদের সেই লোক-সংস্কৃতির ধারাকে আমরা এ-হিসাবের মধ্যে সাধারণত গ্রহণ করি না। আবার, ইংরেজ আমলের পূর্বে বাঙালী জাতি প্রথম যুগে (মোটামুটি পালরাজত্ব থেকে তুর্কবিজয় পর্যন্ত) কিংবা মধ্যযুগে (মোটামুটি মুসলমান আমলে) যে জীবনযাত্রা ও যে সংস্কৃতি উদ্ভাবনা করেছে, তাও এই বাঙালীর সংস্কৃতির হিসাবে আমরা বিশেষ গণনা করি না। একালের "বাঙালী কাল্‌চারের" সঙ্গে বাঙলার একালের লোক-সংস্কৃতির যোগ প্রায় নেই; প্রথম যুগ ও মধ্যযুগের বাঙলার সংস্কৃতির দানও এর প্রধান বস্তু নয়; এমন কি প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও এ কাল্‌চারের যোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ নয়। কারণ, এ বাঙালী কাল্‌চার এক নতুন শ্রেণীর ও নতুন ধরনের বাঙালীর সৃষ্টি! (দ্রষ্টব্য ঃ 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ-রেখা') ইংরেজ শাসন-কালে বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে, সে ব্যবস্থার ও তার প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙলার সমাজ প্রায় নতুন রূপে গড়ে উঠল। কর্নওয়ালিসের তৈরী জমিদারী-তন্ত্রে জমির মধ্যস্বত্ব ও বিদেশী শাসকের চাকরি-বাকরি জীবিকার প্রধান অবলম্বন রূপে লাভ করে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত "ভদ্রলোকদের" এক নতুন অভ্যুদয় হল। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় ও নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা চিন্তায় ও সৃষ্টিতে নিজেদের এক অদ্ভুত পরিচয় দান করলেন। মোটামুটি তাই বাঙলার কাল্‌চার, বা আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি—সাম্রাজ্যবাদের আওতায় মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু ভদ্র-লোকেদের দান। মধ্যবিত্তের সেই পরাশ্রয়ী জীবনে তখনো হেরফের কম ছিল না (দ্রষ্টব্য ঃ 'রিনাইসেন্সের হেরফের'), তাঁরা সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের ধনিকতন্ত্রী জীবনাদর্শে।

কালান্তরের সূচনা

কিন্তু এই "এ কালেরও" কালান্তর এবার ঘটছে। সে কালান্তরের সূচনা হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪—১৮) শেষেই। তখনই বোঝা গেছল—সাম্রাজ্যবাদই যে শুধু আপনার বিরোধে আপনি বিনষ্ট হতে যাচ্ছে তা নয়, তার চাপে তারই সৃষ্ট বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজও নিঃশেষ হতে চলেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের ও জমিদারী-তন্ত্রের নানা শোষণে আর পেষণে বাঙালী সমাজের কৃষি-

বনিয়াদই ধ্বসে যাচ্ছে। জমির উপস্বত্ব-ভোগীদের বোঝা তা আর বহন করতে পারছে না। অন্যদিকে চাকরির বাজারেও শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা আর সকলে স্থান করতে পারছে না—সেখানে তাদের সংখ্যা বেড়েছে। উল্টো, ইংরেজের শিক্ষা-দীক্ষার রাজটিকা নিয়ে সেখানে স্থান দাবি করছে নিম্নবর্ণের ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নতুন মধ্যবিত্তরা।

ভদ্রলোকের জীবন-যাত্রায় সংকট দেখা দিলে ভদ্রলোকের সংস্কৃতিতেও সংকট দেখা দেবে—সঙ্গে সঙ্গে না হোক, একটু আগে কিম্বা একটু পরে। (দ্রষ্টব্য: 'বাঙালী সংস্কৃতির সংকট') আসলে বাঙালী সংস্কৃতির সে সংকটের প্রথম আভাসও দেখা দিয়েছিল তখনি—প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে। মুসলমান সমাজের থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদয়ের সঙ্গেই দেখা গেল বাঙালীর এ-কালের সংস্কৃতির দুর্বলতা কত বেশি। হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে চাকরির বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে অতি সহজেই বাঙালী মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এ সংস্কৃতিকে প্রতিযোগীর সংস্কৃতি বলে, হিন্দুর সংস্কৃতি বলে, গণ্য করতে চাইলেন; তাঁরা খুঁজতে লাগলেন মধ্যবিত্ত মুসলমান সংস্কৃতির কোনো স্বতন্ত্র যাত্রাপথ। সেইজন্যেই মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর যুক্ত-সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে নিজের বলে গ্রহণ না করে, বাঙালী সাধারণ মুসলমানের লোক-সংস্কৃতিকেও গণ্য না করে, নতুন মধ্যবিত্ত মুসলমান আরব্য-ঈরানী মুসলিম সংস্কৃতির পুরনো ও হারানো ধারাকেই খাত কেটে বাঙলায় বহাবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। (দ্রষ্টব্য: 'বাঙালী মুসলমান ও মুসলিম সংস্কৃতি', 'বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি' এবং 'বাঙালী মুসলমানের কাব্য-সাধনা')। নন-কো-অপারেশনের পর থেকে বাঙলার সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় যতই তাঁদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে লাগলেন ততই নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দু "বাবু কাল্‌চারের" প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে মুসলিম "মিঞা কাল্‌চার" গঠনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে যে বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্র-লোকের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার সমস্যা ও সংকট এ-ভাবেই দুই মহাযুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে (১৯১৮—১৯৩৯) ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—যদিও তখনো বাঙলার এ-কালের কাল্‌চার তার সংকট সত্ত্বেও সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে নতুন সৃষ্টির শক্তি খোয়ায়নি। সংস্কৃতিক্ষেত্রের বাইরে জীবনক্ষেত্রে কিন্তু তখন বাঙালী বনিয়াদে অনেক বেশি ফাটল ধরেছে। কিন্তু কি বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত, কি মুসলমান মধ্যবিত্ত কেউ সেই প্রথম মহাযুদ্ধ শেষের শিল্পোদ্যোগে তবু বিশেষ পা বাড়ালেন না, আঁকড়ে রইলেন সেই মধ্যবিত্তের চিরবেলে বনিয়াদ।

বরং বাঙলাদেশের পুরনো ধরনের মারোয়াড়ী বণিক-ব্যবসায়ীরা এ সুযোগে ধনিক শিল্পপতি হয়ে উঠছে। প্রথম যুদ্ধ পর্যন্ত বিলাতী মালের আমদানী-রপ্তানী ও শেয়ার মার্কেটের দালালি ছিল তাদের কাজ। সঙ্গে সঙ্গে তারা এখন হয়ে উঠছে ক্রমে বাঙলায় কল-কারখানার উদ্যোক্তা, মালিক আর পুঁজিপতি। বাঙলাদেশে গুজরাটী, সিন্ধী, ভাটিয়া, মেনন, খোজা, বোেড়া সকলে এসে নতুন কালের উপযোগী কল-কারখানা, ব্যবসা-পত্র প্রভৃতির পত্তন করছে। আজ ইংরেজ কলওয়ালার উত্তরাধিকারও তারাই আয়ত্ত করবার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা বাঙালী বিত্তবান শ্রেণী নিজেদের জীবন-যাত্রার জমিদারী চাল ও জমিদারতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গির বদলে এই শিল্পোদ্যোগে তখনো যোগ দিতে পারল না। বাঙালীর ছোটখাটো ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানি প্রভৃতি দু' যুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে বাঙলায় গজিয়ে উঠেছে; এ সূত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালীর কারো কারো উদ্যোগের পরীক্ষা হয়েছে, তাতে সন্দেহ সেই। কিন্তু কয়লার খাদে, পাটের ব্যবসায়ে, এবং আরো অনেক স্থলেই এ-সময়ে বাঙালী স্থানচ্যুত হয়েছে—তাও স্মরণীয়। মোটের উপর এ-কথা প্রত্যক্ষ—প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাঙালী ভদ্রলোকের আর্থিক জীবন অচল হয়ে উঠতে থাকলেও বাঙালী "ভদ্রলোক" তার আর্থিক জীবনকে নতুন করে সংগঠন করতে পারেনি। তার আর্থিক-সামাজিক জীবনে ফাটল ধরতে লাগল। নতুন সৃষ্ট মুসলমান মধ্যবিত্তও সেই বনিয়াদেরই উপরে দাঁড়াতে গেল—পুরনোদের সঙ্গে সংখ্যার জোরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; আর সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রেই খুঁজতে লাগল এই হিন্দু ভদ্রলোকের সংস্কৃতির মত কোনো মুসলিম কাল্‌চার ও বাঙালী মুসলিম কাল্‌চারের ভিত্তিভূমি, ঐতিহ্য ও প্রেরণা।

এদিকে ১৯২৯-৩০ থেকে এল ব্যবসায়ে সঙ্কট। ফসলের দাম পড়ে গেল, দেনার দায়ে বাঙলার কৃষক জমি খোয়াতে লাগল,—বাঙালী সমাজের আসল মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ল তখনি।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এল, এল তার ফাঁপানো টাকার জোয়ার। বাঙলার জীবন-যাত্রা পদ্ধতি ভেসে গেল। যা বাঁচল তাও গুঁড়িয়ে গেল মহাযুদ্ধের দান মন্বন্তর ও মহামারীতে। তখন দেখা গেল—কর্নওয়ালিসের তৈরী জমিদারী-তন্ত্র বাঙলাদেশের মূলে জীবন-পদ্ধতিকেই কতটা অসার, কতটা জরা-জর্জর করে রেখেছিল যে, যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারীর ধাক্কায় সেই ফাটল ধরা সমাজ দেখতে না দেখতে চুর-চুর করে ফেটে পড়ল। কালান্তর একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল এবার তেরশ' পঞ্চাশের সঙ্গে সঙ্গে। (দ্রষ্টব্য : 'বাঙালীত্বের ভাঙা বনিয়াদ')।

দ্বিধা-বিভক্ত মধ্যবিত্ত

চিরকালের বাঙালী ভদ্রলোকদের জীবন-যাত্রার বর্তমান রূপও আজ তাই পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের শ্রেণী একেবারে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। দু'এক জনা মাত্র যুদ্ধের সুযোগে হঠাৎ ফেঁপে উঠে উচ্চ-মধ্যবিত্তের বা বিত্তবানের স্তরে উঠে গিয়েছেন, তাঁরা হয়ত ছোটখাটো ব্যাংক, ইনসিওরেন্স বা অন্য ব্যবসায়ের মালিক। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী ভদ্রলোক আজ গিয়ে ঠেকেছেন নিম্ন-মধ্যবিত্তের শেষ পৈঁঠায়। জমির এই উপস্বত্বভোগী পরিবার বাঙলায় মোট ৬ লক্ষের মত। এদের মধ্যে ৫ লক্ষ 'ভদ্রলোক' পরিবারের আসলে জমির থেকে মাসে পরিবারপিছু গড়ে আয় মাত্র ১২৷৷ টাকা। কাজেই জমির উপর আজ বাঙলার ১৫ আনি ভদ্রলোক পরিবারই নির্ভর করেন না; তাঁরা নির্ভর করেন চাকরি-বাকরি, ভদ্র পেশা, ছোটখাটো ব্যবসা-পত্রের উপরে ;—এ তথ্যটা যদিও ভদ্রলোকেরা জানেন না। আজ তাঁরা স্ত্রী-পুরুষে রোজগার করেন, তবু অন্নের সংস্থান করতে পারছেন না। আসলে আজ তাঁরা নেমে এসেছেন শ্রমজীবীর স্তরে, বেতন-দাসের বা ওয়েজ-স্লেভের পর্যায়ে। তবু 'ভদ্রলোকি মেজাজ' এখনো তাঁরা অধিকাংশেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মুসলমান নতুন মধ্যবিত্ত বাঙালীও এখন পর্যন্ত স্বপ্ন দেখেন লীগ-মন্ত্রিত্বের প্রসাদের ; সরকারী চাকরি থেকে সাপ্লাইর কনট্রাক্ট, এখনো তাঁদের সকলেরই আশা। পুরনো মধ্যবিত্ত হিন্দুরাও অনেকেই পুরনো দেমাকে এখনো তাদের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী এই মুসলমান ও নিম্নবর্ণের প্রতি বিরূপ। কিন্তু রেলের, ডাকের ও তারের, ব্যাংকের ও ট্রামের হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান 'ভদ্রলোক' কর্মচারী আজ ছত্রিশ জাতের মুটে-মজুরের, মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিজেদের মজুরির লড়াই চালান। তাই একেবারে বলা চলে না যে, বাঙালী 'ভদ্রলোক' এখনো সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত রয়েছেন।

অবশ্য এটাও ঠিক, তাঁদেরই মুখপাত্র যারা বরাবর—বাঙালী নেতারা, বাঙালী কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ও লীগের কর্তৃপক্ষ, আর বাঙালী সংবাদপত্রের মালিক ও পরিচালকবর্গ,—তাঁদের ঘোষণায় ও প্রচেষ্টায় বাঙালী ভদ্রলোকের এই আর্থিক-মানসিক বিপর্যয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে না। সেদিক থেকে 'আজাদ', 'আনন্দবাজার' একই যোগে ক্লাইভ স্ট্রীটের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রন্ট তৈরী করে হরতালের বিরোধিতা করে। এ্যাসেমব্লিতে একই যোগে হিন্দু-মুসলমান বিত্তবানরা দাঁড়ায় শাদা মুখের পাশে জমির উপর কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য। আর একই যোগে তারা পাস করে দিল্লীতে শ্রমিক-বিরোধী আইন। অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত ও তাদের নেতাদের মধ্যকার পার্থক্য আজ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে—সে দূরত্ব আজ পরিণত হয়েছে শ্রেণীগত বৈষম্যে স্বার্থের পার্থক্যে। ভদ্র শ্রেণীর অধিকাংশ আজ বেতন-দাস, আর নেতৃশ্রেণীর অধিকাংশ আজ মালিক বা কায়েমি স্বার্থের পক্ষে। ভদ্রলোকের অধিকাংশের পক্ষে বিপ্লব আজ প্রয়োজন, আর তাদের নেতাদের অধিকাংশের পক্ষে বিপ্লব আজ বিভীষিকা। 'ভদ্রলোক' এই পুরনো নামটির মোহ বিস্তার করে কায়েমি স্বার্থের হিন্দু-মুসলমান পাণ্ডা ও পণ্ডিতেরা এখনো অবশ্য ভদ্রশ্রেণীর নাম ভাঙিয়ে খায়, আর ভদ্রলোকের ঐতিহ্য, ভদ্রলোকের

সংস্কৃতির দোহাই পেড়ে এখনো তারা সহজেই ভদ্রশ্রেণীর মন ভাওিয়ে নেয়। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রমজীবীর এরূপ দুর্দশা সকল দেশেই কম-বেশি দেখা যায়। কালান্তরের মুখেও তাঁরা নিজেদের রূপ ভুলে থাকতে চান। এই দুর্দশার কারণ তাই তাঁদের দুর্বুদ্ধি—বাস্তব দৃষ্টির অভাব ও অভাব সুস্থ চেতনার। জীবনের ক্ষেত্রে যেখানে বাঙালী ভদ্রলোক এসে পৌঁছেচে সেখানে আজ তার সতীর্থ আর ভদ্রতা-বিলাসীরা নয়, তার স্বার্থ আজ দেশের শোষিত জনতার সঙ্গে। আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাঁরাই তার সগোত্র; সৃষ্টিতে, কল্পনারও তাঁদেরই সঙ্গে তার আত্মীয়তা; সৃষ্টির অধিকার ও দায়িত্ব আজ তাঁদেরই সঙ্গে তার সমভাবে প্রাপ্য।

সংস্কৃতির সঙ্কট

কালান্তর যখন এই পথে ঘটছে তখন তার আঘাতে বাঙলার সংস্কৃতিরও এরূপ রূপান্তর অনিবার্য। কিন্তু পরিবর্তন সকল ক্ষেত্রে সমান তালে ও একই কালে ঘটে, এমন নয়। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ও সাংস্কৃতিক সৃষ্টি-ক্ষেত্রে একটু ব্যবধান আছে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজে নতুন শক্তি জন্মে; কিন্তু তখনো চোখে পড়ে না। সমাজ জীবনের সেই সুপ্ত শক্তি অনেক সময়েই প্রথম পড়ে সৃষ্টি-প্রতিভার চক্ষে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেই হয়ত তার আগমনী রচনা হয় নানা শিল্প-কলায় ও চিন্তা-ভাবনায়। যেমন, ফরাসী বিপ্লবের আগমনী রচনা হয়েছিল রুশো, ভলতেয়ার ও এনসাইক্লো-পিডিস্টদের চেষ্টায়। আর তাতে করেই সামাজিক জীবনের শক্তি সমাজ-ক্ষেত্রে আরও সচেতন হয়ে ওঠে,—যেমন হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের কালে। সেই সামাজিক চেতনা তখন আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। তার ছাপ আবার পড়ে তাই সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও। কিন্তু সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে তার সুপ্রতিষ্ঠা একটু সময়-সাপেক্ষ: আর্থিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মত নতুন শক্তি ওখানে সরাসরি আপনাকে স্থাপিত করতে পারে না। তাই, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক জীবনে যখন হয়ত কালান্তর সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে তখনো দেখতে পাওয়া যায় সংস্কৃতিক্ষেত্রে সে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি—সেখানে তার রূপ পরিস্ফুট হচ্ছে না, সৃষ্টিশক্তির যারা নতুন বাহক তারা হয়ত তখনো সৃষ্টির রূপায়ণ ও কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে পারেনি, উদ্ভাবনা করবার মত অবকাশ ও শিক্ষাও লাভ করেনি। উপযুক্ত প্রয়াস, উপযুক্ত পরিকল্পনা, উপযুক্ত সংগঠন না লাভ করতে সেখানে তাঁদের দান অস্পষ্ট হয়, সে-সব প্রয়াস অনেকাংশে থাকে পরীক্ষামূলক। বরং দেখা যায় আগের যুগের জের টেনে হয়ত কোনো কোনো সুনিপুণ রূপকার সেখানে তখনো বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন—এবং এ-ভাবে কালান্তরকে করতে পারেন অস্বীকার। বাঙলারও তেমন কলা-কুশল লেখকের অভাব নেই। কায়েমি স্বার্থও এই কায়েমি রূপকলাকেই মুদ্রা-প্রসাদে পরিপুষ্ট ও পরিতুষ্ট করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আর সেই 'সনাতনী' রূপ স্রষ্টারাও—হয়ত আন্তরিক বিশ্বাস নিয়েই—নাম করবেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের; বলবেন, তাঁদেরই পদাঙ্কের অনুবর্তী তাঁরা।

এঁদের কথা হয়ত আক্ষরিকভাবে সত্য; কিন্তু কালান্তর তাঁদের থেকেও স্বীকৃতি আদায় করবে নানা পথে। বাঙলা সংস্কৃতির চলতি ধারায় (দ্রষ্টব্য: 'বাঙালী সংস্কৃতির চলতি হিসাব') এই স্বীকৃতিও দেখা যায়—কেউ তা দিচ্ছেন জেনে, কেউ তা দিচ্ছেন না জেনে, কেউ দিচ্ছেন ইচ্ছায়, কেউ দিচ্ছেন—বা দিচ্ছেন না—অনিচ্ছায়। অধিকাংশ স্রষ্টাই সাধারণত ঘোরপাক খান মধ্যখানে—কেউ কখনো এগোন, কখনো পিছোন; বর্তমানের বিপর্যয়ে কখনো বিচলিত, কখনো বিরক্ত; কখনো অর্ধচেতন ভাবেই ঘোষণা করেন বিদ্রোহ, কখনো আবার অর্ধচেতন ভাবেই খোঁজেন কোনো আর্টের বা দর্শনের আশ্রয়-কেন্দ্র। বিশেষ করে পরাধীন জীবনের পরিবেশে এই দৃষ্টিবিভ্রম খুবই স্বাভাবিক (দ্রষ্টব্য: 'পরাধীনের দৃষ্টিবিভ্রম')। কারণ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় আমরা পেয়েছি বড়জোর কেরানীগিরি। কালচারের বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কর্মশালায় আমরা কর্মচারী—আমরা সেখানেও মালিক

তো নই-ই, বড় সাহেবও হতে পাই না, হতে পাই বড়জোর "বড় বাবু"। সাম্রাজ্যবাদের আমলে সাধারণ-ভাবে আমাদের পণ্ডিত ও স্রষ্টাদেরও এটাই বিধিলিপি। তবু তাঁরা কেউ কেউ দেন শিক্ষা, কেউ দেন আনন্দ। একমাত্র মহৎ স্রষ্টা যিনি তাঁরই চেতনায় প্রতিফলিত হয়ে ওঠে যুগের অন্তর্নিহিত সত্য, আর মহৎ যে সৃষ্টি তাতেই রূপ গ্রহণ করে সেই যুগের বাণী, তাতেই জনসমাজ পড়ে নিজের স্বাক্ষর, দেখে নিজের ভবিষ্যৎ। কিন্তু এরূপ মহৎ সৃষ্টি স্বভাবতই সহজলভ্য নয়। আসলে মহৎ স্রষ্টাও সহজে জন্মে না। তবু 'মহৎ' না হোন, সচেতন স্রষ্টা যিনি, তিনিও স্পষ্ট করে হন তাঁর যুগের সাক্ষী। আর যতখানি তিনি সচেতন ততখানিই সত্যের স্বাক্ষর বহন করে তাঁর সৃষ্টি। এ সত্যই হল সৃষ্টির নিরিখ।

সংস্কৃতির সংগঠন

শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের সচেতনতা—এ হল তাই সংস্কৃতির দাবি। এ সচেতনতা অবশ্য জীবন-ক্ষেত্রের সাক্ষ্য থেকেই তাঁদের পক্ষে লাভ হতে পারে। কিন্তু জীবন-ক্ষেত্রের সে সাক্ষ্য তাঁদের নিকটে তুলে ধরার দায়িত্ব হল সংস্কৃতির কর্মীদের। আর সংস্কৃতির কর্মী শুধু ছাত্র বা শিক্ষক নন, সে কর্মী দেশের সকল মানুষ, বিশেষ করে আবার সেই মানুষ যারা জানে সংস্কৃতির অর্থ কি, যারা বোঝে সংস্কৃতি শুধুমাত্র সমাজের রূপ কর্ম নয়,—তা সমাজকে রূপান্তরিত করে; শুধুমাত্র তা সমাজের সৃষ্টির পরিচয় নয়, তা নবতর সৃষ্টির প্রেরণাও।

এ সত্য মনে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা স্বীকার করি, সংস্কৃতিরও সংগঠন দরকার—যেমন সংগঠন দরকার সমাজের। সমাজ যে নিয়মহীন নিয়মে চলে না, তার যে পরিকল্পনা ও পরিচালনা সম্ভব, এ কথা আজ সকলেই বোঝেন। তাই সংস্কৃতির সংগঠনও যে সম্ভব আর প্রয়োজন, এ কথাও আজ বুঝতে অনেকের দেরি হয় না। বলা বাহুল্য, এ সংগঠনও স্থির করতে হয় বর্তমানের অবস্থা বুঝে ও স্ফুটনোন্মুখ সত্যকে স্মরণে রেখে। এজন্য একদিকে তাই হিসাব করে দেখতে হয়—পূর্বতন সমাজের বনিয়াদ ও আর্থিক-সামাজিক অবস্থা, পূর্বতন সেই জীবনযাত্রা ও তার বাস্তব-মানসিক রীতি, আচার ও অনুষ্ঠানসমূহ, পূর্বতন আবিষ্কার ও শিল্পকলার নানা সৃষ্টি-ধারা। আর দিকে লক্ষ্য করতে হয় আর্থিক-সামাজিক নতুন সংকটের ও সংগ্রামের সাক্ষ্য, লক্ষ্য করতে হয় নতুন বাস্তব ও সামাজিক শক্তির জন্ম, নতুন বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-সৃষ্টির তাড়না ও সম্ভাবনা। আর শেষে নতুন সংগঠনে গতিপথ রচনা করতে হয় নতুন সংস্কৃতির ও নতুন সমাজের (দ্রষ্টব্য: 'বাঙালী সংস্কৃতির সংগঠন')।

এই হল একালের সমাজ কর্মীর ও সংস্কৃতি-কর্মীর দায়িত্ব—অতীতকে রূপান্তরিত করা ভবিষ্যতে, ঐতিহ্যকে বিবর্তিত করা ইতিহাসে (দ্রষ্টব্য: 'কালচার ও কমিউনিস্ট-এর দায়িত্ব')।

যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারীর মধ্য দিয়ে যে বাঙালী জীবনের বিপর্যয় ঘটতে থাকে আজ যুদ্ধান্তের গণ-অভ্যুত্থানে, স্বাধীনতার সংগ্রামে, জমির দাবিতে, মজুরির লড়াইতে সেই বিপর্যস্ত বাঙালী জীবন ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনযাত্রার সঙ্গে পা ফেলে চলেছে, অগ্রসর হচ্ছে বিপ্লবের দিকে। বিপর্যয় থেকে বিপ্লবের পথে এই যাত্রায় বাঙালী জীবন ও বাঙালী সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান ও তার নতুন সংগঠনের কথাও তাই আলোচ্য হয়ে ওঠে তাঁদের পক্ষে যাঁরা জানেন বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নয়, যাঁরা মানেন সংস্কৃতি শুধু ভাববিলাস নয়, তা এক সক্রিয় শক্তি। সেই চেতনা ও উপলব্ধি থেকে বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, তার দুর্বল বনিয়াদ, তার স্বরূপ, তার সংকট, আভ্যন্তরীণ বিরোধ, দৃষ্টি-স্বল্পতা, সমাগত সংকট আর তার চলতি রূপ ও ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবনযাত্রায় তার ভবিষ্যৎ যোগাযোগ—আর সর্বোপরি তার সম্ভাব্য সংগঠন ও সে সংগঠনের দায়িত্ব সম্বন্ধে—এই কালান্তরের মুখে যা আমরা সংস্কৃতি-কর্মীরা তেরশ' পঞ্চাশের সময় থেকে আলোচনা করেছি—তা'ই এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হল। সে আলোচনা কখনো হয়েছে মুখে, কখনো কোনো উপলক্ষে—পরে তা সংক্ষেপে অনুলিখিত হয়। তাই, অনেকখানে দ্বিরুক্তি ঘটেছে, অনেকখানে সেইরূপ বক্তব্য বিশদও করা হয়নি। বিবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে—কালান্তরের বাঙালী কালচারের কথাই ছিল সাধারণভাবে এ প্রবন্ধসমূহের আলোচ্য।

২৭-২-৪৭

সংস্কৃতির স্বরূপ

মানুষের সৃষ্টিশক্তির মোট পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। এই সৃষ্টিশক্তির জন্যই মানুষ মানুষ-অন্য জীবের থেকে স্বতন্ত্র। অন্য জীব প্রকৃতির বশ, কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকেও বশ করে। কারণ, মানুষ গড়তে পারে, সৃষ্টি করতে পারে। যে 'কৃতি' বা সৃষ্টির সহায়ে মানুষ—মানুষ, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী— তাই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি বলতে তাই বোঝায়—সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান (sciences) ও সমস্ত সৃষ্টিসম্পদ (arts) ; অর্থাৎ যা আমরা জেনেছি (প্রকৃতির নিয়ম নীতি প্রভৃতি), যা আমরা করেছি (যন্ত্র-শিল্প, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ; মানসিক প্রয়াস, চিন্তা ভাবনা, নৃত্য, গীত, চিত্র, কাব্য প্রভৃতি)। আর্ট বা শিল্প এই সংস্কৃতিরই একটি এলেকা ; আর শিল্প বলতে বোঝায় বাস্তব সৃষ্টি আর মানস-সৃষ্টি দুই-ই কারণ দুই-ই, সৃষ্টি ; কারুকলা (crafts) ও চারুকলা (arts) দুই-ই তাই সংস্কৃতির পরিচয় দেয়।

নতুন সংস্কৃতির মানে কি ?

সংস্কৃতির গোড়ার কথা হল সৃষ্টি, নতুন প্রকাশ, নতুন প্রয়াস। আর সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হল—প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে জয়ী করা, অগ্রসর করে দেয়া, শক্তিশালী করে তোলা। আর মানস-সৃষ্টিরও সার্থকতা তাই বাস্তব সৃষ্টিতে, বাস্তব সৃষ্টিরও প্রয়োজন তাই মানস-সৃষ্টির সহায়তা করা। বাস্তবক্ষেত্রে যারা সৃষ্টিশীল তাদের পক্ষে দরকার তাই মানসিক ক্ষেত্র থেকে নিজেদের সৃষ্টি-শক্তিকে সঞ্জীবিত করে নেয়া, সেখান থেকেও নিজেদের পুষ্টি সংগ্রহ করা, আর মানসক্ষেত্রে যারা সৃষ্টিশীল তাদেরও পক্ষে দরকার বাস্তবক্ষেত্র থেকে নিজেদের সৃষ্টিপ্রেরণাকে সবল করে নেয়া নিজেদের সৃষ্টিশক্তিকে দৃঢ়মূল করা। বাস্তবক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল আজ শ্রমিক ও কৃষক। তাই তাদের থেকে চাই চারুকলার সহায়তা। বা চারুকলার স্রষ্টাদের (শিল্পী, সাহিত্যিক, নৃত্যশিল্পী, গায়ক প্রভৃতির) নিজেদেরই দায়ে চাই এই শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে নিবিড়তর যোগাযোগ। তাতেই নতুন সংস্কৃতি গঠিত হয়ে উঠবে। নতুন সংস্কৃতির মানে তাই সমাজের সৃষ্টিশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করা—একালে তার মানে শ্রমিক কৃষকের বাস্তব স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, আর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির স্বরাজ।

সংস্কৃতির স্বরাজ

সমাজের সৃষ্টিশক্তির অকুণ্ঠিত প্রকাশেই সংস্কৃতির স্বরাজ সম্ভব হয়। সমাজে বরাবরই অবশ্য যখন যে-শ্রেণী সৃষ্টিশীল,—চারুকলা তাদেরই জোগায় প্রেরণা, শক্তি ; তাদের জয়কে নিশ্চিত করে তোলে, তাতেই তার সার্থকতা। কিন্তু সমাজে সৃষ্টিশক্তি এতকাল অকুণ্ঠিত প্রকাশলাভ করতে পারেনি। কারণ সমাজে শ্রেণীভেদ আছে, শাসক ও শাসিত আছে, শোষক ও শোষিত আছে। শাসক ও শোষকেরা চায় সমাজে নিজেদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখতে। সৃষ্টিশক্তি পরিবর্তন আনে—পরিবর্তনে শাসকদের স্থান বদলে যেতে চায়। তাই সৃষ্টির দাবি শাসকেরা মানতে চায় না ; মানলে তাদের পক্ষে শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়, তাদের শোষণ অব্যাহত থাকে না। তাই, তারা নতুন

সৃষ্টিধর্মী শ্রেণীকেও চায় চেপে রাখতে; আর চায় সৃষ্টিধর্মী শিল্পীদেরও নিজেদের আজ্ঞাধীন রাখতে। সংস্কৃতিকে তারা সৃষ্টিধর্মী হতে দিতে চায় না, শাসকশ্রেণীর অনুগামী করে রাখতে চায়। তার মানে, শাসকেরা বিজ্ঞান, কারুকলা ও চারুকলা, সব কিছুকে শোষণ করে—শাসক-আওতায় সংস্কৃতি আর বিকাশলাভ করতে পারে না; মানে, সংস্কৃতি স্বরাজলাভ করে না।

শোষণ-ধর্মী সমাজে এই নিয়ম,—সংস্কৃতিও সেরূপ সমাজে একদিকে শোষণের বস্তু হয়, অন্যদিকে আবার হয় শোষণের এক হাতিয়ার। ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে। কবি, শিল্পী, নট প্রভৃতি ছিলেন রাজার প্রসাদজীবী। তাদের দেখি কখনো রাজার পরিষদে, কখনো সামন্ত-মুরুব্বির (patron) মোসাহেব। তারপর, ধনিকতন্ত্রের (গণতন্ত্রের) যুগে তাঁরা হয়েছেন ক্রেতার বা বাজারের (market) মুখাপেক্ষী। অবশ্য ধনিকতন্ত্র শিল্পীদের মুক্তি দিয়েছে মুরুব্বির খোশামুদী থেকে। তবু শিল্পীদের এখনো ধনিকরাই অনেকাংশে পোষণ করে। তারাই শোষণও করে—শোষণ করে কাঞ্চন-মূল্যে ধনিকদের রুচিমত স্বার্থমত রসরচনার জন্য, ধনিকতন্ত্রের জয়গান গাইবার জন্য। সে শোষণ কখনো হয় একটু স্থূলে, প্রত্যক্ষ, উগ্র ও ইতরতাপূর্ণ (যেমন ফাসিস্ট দেশে দেখি); কখনো হয় একটু সূক্ষ্ম, পরোক্ষ, মেলায়েম ও ভদ্র (যেমন তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে চলে)। কিন্তু তার উদ্দেশ্য একই—সংস্কৃতিকে শোষণের সহায়ক করা—সৃষ্টিধর্ম ও সৃষ্টিকর্ম থেকে সংস্কৃতিকে বিচ্যুত করা।

"সংস্কৃতির স্বরাজ" সম্ভব তাই একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজে। যেখানে শোষণ নেই—সংস্কৃতিরও শোষণের বা প্রতারিত হবার কারণ নেই। তাই শ্রেণীহীন সমাজের কর্মীরা, বিপ্লবীরাই চায় শিল্পীর ও বৈজ্ঞানিকদের পূর্ণ স্বাধীনতা।

শ্রমিক ও কৃষকের আসল স্বার্থ তাই সংস্কৃতিকে শোষণ করা নয়,—শোষণ ধনিকের নীতি। শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ হল শিল্পী ও বৈজ্ঞানিককে সৃষ্টির অবাধ স্বাধীনতা দেয়া। কারণ সমাজে আজ সৃষ্টিধর্মী কে? বাস্তব কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষক; মানসিকক্ষেত্রে শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি। সৃষ্টির নিয়মেই শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক তাই শ্রমিক-কৃষকের সৃষ্টি-শক্তিকে উজ্জীবিত করবেন, শিল্পী ও সাহিত্যিক নিজেদের সৃষ্টির তাগিদেই হবেন শ্রমিক ও কৃষকের সহযোগী, সহযাত্রী, সহস্রষ্টা। এভাবেই নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

সংস্কৃতির বিকৃতি

কিন্তু সমাজে যতক্ষণ পর্যন্ত ধনিকশ্রেণী পরাজিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধনিকেরা নানাভাবে চাইবে সংস্কৃতি-স্রষ্টাদের নিজের মুনাফা গড়ার কাজে লাগাতে এবং নিজের দলে টানতে। টাকাকড়ি, সুখসম্পত্তি, মানমর্যাদা, ভয়-ভীতি এ সবই হল সংস্কৃতিকে বিপথে চালিত করবার জন্য ধনিকতন্ত্রের নানা উপায়। তাতে সংস্কৃতি বিকৃত হয়—তা বিকাশলাভ করে না, নানাভাবে তার বিনাশ হয়। মানে, ব্যবসাদারের হাতে পড়ে (commercialised হয়ে), শিল্পের দুরকম বিকৃতি হয়—vulgarisation of art ও perversion of art।

শ্রমিক কৃষকের হাতেও এখন পর্যন্ত সুবিধা নেই। তার দাবিও আরো বড় দাবি—তা সৃষ্টির দাবি। কিন্তু সংকটের তাগিদে শ্রমিক-কৃষক অনেক সময় ঠিক তার এই মুখ্য সত্যটি শিল্পীদের নিকটেও পরিষ্কার করে তুলতে পারে না। সাময়িক প্রয়োজনে তাঁরাও দাবি করে বসেন—সাময়িক কথাটাই শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা প্রচার করবেন। কাজের প্রোগ্রামই শিল্পের প্রতিপাদ্য হবে; তার মানে এভাবে শ্রমিক-কৃষকও সৃষ্টির দাবির বদলে করে বসেন প্রচারের দাবি—ধনিকদের দেখাদেখি তাঁরাও চান শিল্পকে নিজেদের কাজে খাটাতে, বিকৃত করে তুলতে। শিল্পকে প্রচারকাজে এভাবে সরাসরি ব্যবহার করাটা ধনিকতন্ত্রেরই একটা ছোঁয়াচে রোগ; কিন্তু তা শ্রমিক-কৃষককেও আক্রমণ করে।

প্রচার ও প্রকাশ

শ্রমিক-কৃষক এ ভুল করেন, কারণ ধনিকতন্ত্রের আওতায় তাঁরা বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের মূল কথাটি পরিষ্কার করে ধরতে পারেন না। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য পার্টি-প্রোগ্রাম রচনা নয়—সমাজ-নিয়মকে জানা, আর সেই জ্ঞানের দ্বারা প্রোগ্রাম যাচাই করা, বুদ্ধিকে মার্জিত করা, সমাজের বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের পথ নির্দেশ করা। চারুশিল্পের কাজও পার্টি-প্রোগ্রাম রচনা নয়—প্রেরণা জোগানো, কর্মীদের প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, আবেগকে দৃঢ়তর করা, চেতনাকে গভীরতর করা; মার্জিত বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করা প্রাণের শক্তি। অবশ্য শিল্পকলাও বুদ্ধিকে একেবারে অস্বীকার করে না, বুদ্ধিবৃত্তিকে সাধারণভাবে মেনে নিয়েই শিল্প শক্তিশালী হয়। বুদ্ধিবৃত্তিও আবার তেমনি শিল্পের দান গ্রহণ করেই কর্মশক্তিতে রূপলাভ করে। দুই-ই পরস্পরকে পুষ্ট করে, তবু শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সৃষ্টি এবং মানুষের অন্তরাবেগকে সৃষ্টিমুখী করে তোলা—প্রোগ্রাম রচনা নয়, পার্টি লাইনের প্রচার নয়।

একদিক থেকে দেখলে সব শিল্পই কিছু না কিছু প্রচার করে; কারণ, তা কিছু না কিছু বলে। কিন্তু শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রকাশ,—প্রচার নয়; আর প্রেরণা জোগানো,—কোনো সূত্র প্রমাণ করা নয়। শিল্পকে প্রত্যক্ষভাবে প্রচারের কাজে লাগালে শুধু শিল্পকে শোষণ করা হয় না, শিল্পের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়—মানে, শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী কর্মীরা নিজেদের অন্তরাবেগের শক্তিকে তা হলে ঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ ও সংহত করতে পারে না। তার ফলে তাদের সৃষ্টিশক্তি দুর্বল থেকে যায়। যেখানে শিল্প অন্তর স্পর্শ করে না, সেখানে শিল্প রসোত্তীর্ণ হয় না। তাই শিল্প সেখানে ব্যর্থ।

শ্রমিক বিপ্লবের যুগে শ্রমিক-কৃষকের চোখে শিল্পের উদ্দেশ্য হবে তাই প্রোগ্রাম প্রচার নয়, পার্টির লাইন বাৎলানো নয়—সমসাময়িক জীবনসত্যকে প্রকাশ করা, সংঘাতের রূপ চিত্রিত করা। অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক বলবে—"শিল্প সত্যকারের সৃষ্টি হোক এবং সৃষ্টির দাবিতেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হোক।"

১৭-১-৫২

বাঙালী সংস্কৃতির রূপরেখা

'বাঙালী সংস্কৃতি' কথাটিকে আমরা সাধারণত 'বাঙলার কাল্‌চার' কথাটির প্রতিশব্দ রূপেই প্রয়োগ করে থাকি। সে হিসাবে 'বাঙালী সংস্কৃতি' বললে বোঝাতে চাই—আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি বা ইংরেজ আমলের 'বাঙলার কাল্‌চার।' নইলে বাঙালী সংস্কৃতি বললে বোঝানো উচিত যে-দিন থেকে বাঙালী জাতি জন্মেছে সেদিন থেকে আজ এই প্রায় হাজার খানেক বছরের বাঙালী সংস্কৃতিকে,—বাঙালী সমাজের হাজার বছরের রূপ ও তার বাস্তব ও মানসিক সমস্ত সৃষ্টিকে।

নানা দিক থেকেই সে বাঙালী সংস্কৃতিরও বিচার-বিশ্লেষণ চলে ; অনেকেই তা করেনও। কেউ প্রধানত বৈজ্ঞানিক নৃ-তত্ত্বের দিক থেকে তা বিশ্লেষণ করেন, কেউ জাতি-তত্ত্বের দিক থেকে তার বর্ণনা করেন ; আর কেউ অধ্যাত্ম সম্পদের নানা দিক থেকে তার মূল্য বিচার করেন। তাঁদের অনেকের নিকটেই বাঙালীত্ব একটা সুস্থির ও অপরিবর্তনীয় ধর্ম ; তার গতি থাকতে পারে, কিন্তু তার পরিবর্তন নেই। তাঁদের মতে, বাঙালীত্বের স্বরূপ হল এই যে, তার রূপ আছে, সে রূপের স্ফুরণও নানাভাবে হয় নানা কালে ; কিন্তু সে রূপ চিরন্তন, তার রূপান্তর নেই। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু না কিছু থাকে, এ-কথা সত্য। বাঙালীরও বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তাই বলে কোনো জাতির একটা রূপই শাশ্বত, 'রক্তের দোহাই' দিয়ে এ-কথা মহানেতারা ঘোষণা করলেও বিজ্ঞান তা মানবে না। আর, ভৌগোলিক পরিবেশ ও জাতীয় ঐতিহ্যের নামে এ-কথা দাবি করলেও ইতিহাস তা স্বীকার করবে না। ঐতিহ্যকে ইতিহাস অগ্রাহ্য করে না ;—বরং করে পূর্ণতর। কারণ, ঐতিহ্য হচ্ছে পরিচিত খাতে প্রবহমান স্রোত। আর ইতিহাস উজান-বাহী নদী,—যে নদীতে ঢল নামে, যাতে সাত-সাগরের আহ্বান নিয়ে আসে জোয়ারের জল, যা মহাসমুদ্রের দিকে ভেসে চলে আবার ভাটার টানে ;—যে নদী পাড় ভাঙ্গে, দু'কূল ভাসিয়ে দেয়, ধুয়ে-মুছে ফেলে তীরের ক্ষেত আর গ্রাম আর অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা ;—যে নদী খাত বদলায়, পথ করে ছোটে নতুন নতুন খাতে ; হয়ত পথ হারায় এখানে ওখানে শুষ্ক পৃথিবীর বালুকার শয্যায়, আর হয়ত নতুন গৌরবে পথ কেটে নেয় নতুন জনগণের বুক চিরে।

একথা যে মিথ্যা নয়, তারই প্রমাণ আমাদের এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতি বা বাঙলার কাল্‌চার। সে-ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে না, অতীতকে সে-ও বর্তমানের মধ্যে জীইয়ে বহন করছে। কিন্তু তবু কথা এই—সে নতুন খাতের স্রোত, আর এ খাত ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বার বলে উন্মুক্ত হয় বাঙালী জাতির সামনে। এ কালের বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে তার পূর্ববর্তী যুগের বাঙালী সংস্কৃতির তফাৎ শুধু কালগত নয়, অনেকাংশে তা বস্তুগত আর গুণগত। এর বুনিয়াদ, রূপ ও ধর্ম একেবারে আলাদা।

বাঙালী সংস্কৃতির এ কালের রূপকে আমরা চিনি—তাই বলে তার স্বরূপ বুঝি, এ-কথা সর্বাংশে বলতে পারি না। তবু সে স্বরূপ বুঝতে আমরা চেষ্টা করি (ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরা এ-দিকে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পথে সাহায্য দান করেন ; লেখকের 'সংস্কৃতির রূপান্তরের' 'বাঙলার কাল্‌চার' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)—এ দাবি আমরা যারা সংস্কৃতি-কর্মী তাঁরা করতে পারি। এ-চেষ্টা এখনো শেষ হয়নি—হয়ত তার স্বরূপ-বিশ্লেষণও এখনো সর্বাংশে সম্পূর্ণ হয়নি। শুধু তার মোটামুটি রূপটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তার বাস্তব পাদপীঠ, আর তার সত্যকার তাৎপর্য বা **significance.**

---

* ১৯৪৪-এর ৯ই নভেম্বর প্রগতি লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘের সংস্কৃতি কর্মীদের নিকট কথিত 'বাঙালী ঐতিহ্য" নামক বক্তৃতার নোট অবলম্বনে লিখিত।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙালীর সংস্কৃতি

এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতি যে পূর্ববর্তী যুগের বাঙলার সংস্কৃতির থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র, এ-কথা এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম-কথা ও তার এই দেড়শ' বৎসরের মোট ইতিহাসের দিকে তাকালেও অনেকাংশে বোঝা যায় (দ্রষ্টব্য ঃ "সংস্কৃতির রূপান্তর")। আসলে তা হচ্ছে সাম্রাজ্য-বাদের ছায়ায় উদ্ভূত 'পরাধীন জাতির সংস্কৃতির' কথা, "colonial culture"-এর এক বিশেষ পাতা। বাঙলাদেশেই ব্রিটিশ শাসকরা তাদের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে (মাদ্রাজ তাদের কেন্দ্র হয়নি, বোম্বাইয়েও নয়)। তাই ভারতবর্ষের মধ্যে এখানেই সেই 'ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির' রূপ প্রথমত ও প্রধানত প্রকটিত হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে এ-কারণে, এবং অন্যান্য স্থানীয় নানা কারণে, তাদের সংস্কৃতি একালে ততটা পরিস্ফুট হতে পারেনি—পারলে তাও এই "বাঙালী সংস্কৃতির" অনুরূপ সংস্কৃতিই হয়ে উঠত ; এখনো তা'ই হয়ে উঠছে। এ-দিক থেকে দেখলে এ কালের বাঙালী সংস্কৃতিকে বলতে পারি—"ঔপনিবেশিক" অবস্থার, সাম্রাজ্যবাদী আমলের, ভারতীয় সংস্কৃতিরই মুখ্য নিদর্শন।

এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতির প্রেরণা আমরা হিন্দী বা মারাঠী বা গুজরাঠীদের জীবনযাত্রা বা সংস্কৃতি ধারা থেকে সংগ্রহ করি না, বরং সংগ্রহ করি প্রধানত ইংরেজি ও ইংরেজির মারফত পাওয়া পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি সংবাদ থেকে। কিন্তু তবু আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রার সঙ্গে ইংরেজ বা মার্কিন বা ঐরূপ জাতিদের জীবনযাত্রার পার্থক্য একেবারে মৌলিক,—তারা শ্রমশিল্পে সমুত্তীর্ণ (industrialised) সাম্রাজ্যাধিকারী (imperialist) জাতি, আর আমরা শ্রমশিল্পে প্রত্যাহত সাম্রাজ্য-শোষিত জাতি। আমরা ভারতবর্ষের সকল জাতিই বাস্তব জীবনযাত্রায় এই ঔপনিবেশিক জীবনের গণ্ডীতে আবদ্ধ—কেউ এর মধ্যে প্রথম সঞ্চয়ের সুযোগ পেয়েছি, কেউ তা পাইনি,—তবু আসলে সকলেই প্রায় সমাবস্থ, মূলত এ-কালেও আমরা 'ঔপনিবেশিক অবস্থার' ভারতীয় সংস্কৃতির ছোট-বড় নিদর্শন। আর সাম্রাজ্যবাদের বিলোপের সঙ্গেই আসলে আমাদের বাঙালী, হিন্দি, মারাঠী প্রভৃতি এ-কালের এসব জাতীয় সংস্কৃতির সুস্থ ও স্বাধীন বিকাশ সম্ভব। তেমনি তার বিলোপেই আবার সম্ভব হবে ভারতীয় মহাজাতির সংস্কৃতির এক সামগ্রিক বিকাশ,—তার সুস্থ রূপান্তর। এমন কি, সে-দিন যদি বাঙলা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বতন্ত্রও হয়ে থাকতে চায় তা হলেও তার বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টির টান—তার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তাকে বারে বারেই অন্তর্ভুক্ত করবে সেই ভারতীয় জগতের মধ্যে—অসমিয়া, ওড়িয়া, হিন্দুস্তানীর সঙ্গে সংস্কৃতির সূত্রে একত্র করবে।

কিন্তু এই কথাটিও স্মরণীয়—বরাবরই বাঙালী সংস্কৃতি আসলে ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটি বিশেষ ধারা। তার অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল, এখানো আছে ; তার নিজস্ব রূপ ছিল, এখনো আছে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির থেকে তাই বলে বিভিন্ন করে তাকে দেখা চলে না। বাঙালী জাতিকে যেমন ভারতীয় মহাজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়, বাঙালী সংস্কৃতিকেও তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতি-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। সত্য বটে, যা আমাদের পক্ষে বুঝবার তা হচ্ছে এই যে, প্রথমত, কোনো জাতির সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গিমার যেমন পরিচায়ক তেমনি তার বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গিমাও গড়ে ওঠে আবার সেই সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়ত, এই মানসিক-ভঙ্গিমা ও সংস্কৃতিও আবার তাদের বিকাশের জন্য নির্ভর করে সেই জনসমাজের আবাস-ভূমি, তাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, আর বিশেষ করে তাদের আর্থিক সামাজিক জীবন-পদ্ধতির উপর। সংস্কৃতির বাস্তব পাদপীঠ তো তা'ই—এই বিশেষ স্তরের জীবনযাত্রা, জীবন-পদ্ধতি—সমাজের আর্থিক রূপ, তার বিন্যাস, তার উৎপাদনের বিশেষ পদ্ধতি, তার বিনিময়ের বিশেষ ধরন, তার অন্তর্ভুক্ত নানা শ্রেণীর সেই উৎপাদন-পদ্ধতিতে যোগাযোগ। এরূপ আর্থিক বিন্যাসের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে সমাজের নানা প্রতিষ্ঠান, ফুটে ওঠে নানা আচার-অনুষ্ঠান ; সেই মূলেরই সঙ্গে দৃশ্য ও অদৃশ্য নানা সূত্রে তবু

যোগ থাকে একেবারে উপরতলার মানসিক সৃষ্টিসমূহের—জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্যান-ভাবনা এবং নানা শিল্পকলার।

এ-সব কথা আমরা জানি। বাঙালী সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝতে হলেও এসব মূল সূত্র দিয়েই যে তার মূল রূপ বুঝতে হবে, তা-ও আমরা মনে রাখব। এখন এখানে যা স্মরণীয় তা হচ্ছে একটি সহজ কথা—জাতি গঠনে ও সংস্কৃতি গঠনে ভাষার স্থান ও দান। যাদের ভাষা এক, নিতান্ত ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা আর্থিক কারণে তারা পৃথক না থাকলে তাদের একজাতি হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। আর প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আবার প্রধানত নির্ভর করে এই নিজস্ব ভাষার উপরে। নিজের একটি ভাষা যে-দিন থেকে কোনো মানব-সমাজ লাভ করতে থাকল সে-দিন থেকেই নিজস্ব সংস্কৃতিরও সে অধিকারী হতে চলল।

হাজার খানেক বছর ধরে বাঙালী জাতিও ভারতবর্ষের অন্যান্য আধুনিক জাতিদের সঙ্গে একটা বিশিষ্ট সত্তা লাভ করেছে—এ-সত্তা তারা লাভ করেছে প্রধানত স্ব স্ব ভাষাকে অবলম্বন করে। মোটের উপর জাতিগঠনের ইতিহাসে এই ভাষা একটি প্রকাণ্ড ও অপরিহার্য উপাদান, তা আমরা জানি ;—জাতিগঠনের পক্ষে অন্যান্য উপাদান যেমন বিশিষ্ট এক আবাসভূমি, বিশিষ্ট এক আর্থিক-সামাজিক জীবনযাত্রা, বিশিষ্ট এক ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আর বিশিষ্ট এক মনের ভঙ্গিমা—যাতে তার সংস্কৃতিও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

জাতীয় সংস্কৃতির জন্মকাল

প্রায় হাজার বছর আগে বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতি ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে শুরু করল—তখন গুপ্তযুগ শেষ হয়েছে, পালযুগ চলছে, সেনযুগ আছে সামনে। এই সময়েই বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম ; (মোটামুটি প্রায় ৮০০ খ্রীঃ)। তার প্রথম যুগ শেষ হল মোটামুটি তুর্কীবিজয়ে (১২০৩ খ্রীঃ)। তারপর থেকে শুরু হল তার মধ্যযুগ।

কিন্তু তার মধ্যেও নানা পর্ব রয়েছে। মোটামুটি বলতে পারি এই মধ্যযুগ শেষ হল মুসলমান রাজত্বের শেষে—১৭৫৭ ছাড়িয়ে ১৮০০র কাছাকাছি এসে। তারপরে এল তৃতীয় যুগ—মোটামুটি ১৮০০ থেকে যা চলে এসেছে ১৯৪০ পর্যন্ত, আর আজ যা আবার পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এই তৃতীয় যুগের সঙ্গে আগের দু'-যুগের বাঙালী সংস্কৃতির যোগাযোগ আর তত অব্যাহত নেই তা আমরা জানি। তবু কিছুটা অব্যাহত নিশ্চয়ই আছে—যতটা চোখে দেখি, তারচেয়ে বেশিও হয়ত আছে ; উপর স্তরে যতটা স্বীকৃত, তার চেয়ে বেশি হয়ত বাঙালী সংস্কৃতির পূর্বধারা নিম্নস্তরে এখনো প্রচলিত, নানা পরিবর্তনের মধ্যেও নিচের এলাকার লোক-সমাজের জীবনে, আচারে-অনুষ্ঠানে, মানসিক ভঙ্গিতে তা' টিকে আছে। অবশ্য তার সঠিক হিসাব নেয়া সহজ নয়। কারণ, প্রথম যুগের বাঙালী সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝবার মত তথ্য আমাদের হাতে এসে বেশি পৌঁছেনি। যা পৌঁছেছে তারও মূল্য নির্ধারণ গবেষণাসাপেক্ষ। মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির তথ্য আমরা সে তুলনায় অনেক বেশি পাই—আর তা' এ-কালের জীবনযাত্রার মধ্যেও বেশি উত্তীর্ণ হবার কথা। কিন্তু তবু সেই তথ্যসমূহের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নির্ণয় করা এখনো আলোচনাসাপেক্ষ।

সেই গবেষণা ও আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আপাতত এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতির পূর্ব-ধারাবলে সেই পুরনো বাঙালী সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত একটা হিসাব আমরা মনে রাখতে পারি—এ হচ্ছে মোটামুটি হিসাব, গবেষকের বিবেচনায় হয়ত যা ভুলে-ভরা।

বাঙালী সংস্কৃতির পূর্বযুগ

প্রথম যুগ : ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ

মোটামুটি এ-সময়কেই বলতে পারি বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম ও শৈশব কাল। এ-সময়ের জীবনযাত্রার তথ্য পণ্ডিতদের সংগ্রহ করতে হয় নানা অনুশাসন থেকে,—তা থেকে তাঁরা রাজা-অভিজাতদের কথা জানেন, সাধারণ লোকের অবস্থাও জানেন, বুঝে নেন। আবার সংস্কৃত নানা গ্রন্থাদি থেকে তাঁরা পান প্রধানত উচ্চবর্গের মানুষের কল্পনা, ভাবনা ও জীবনযাত্রার সন্ধান, আর স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি থেকে নেন খানিকটা সাধারণ মানুষেরও জীবনের আভাস। সেকালের নানা শিল্পকলা থেকেও মোটামুটি সমাজের উচ্চকোটির সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাষার ও ভাবনার আচরণের পরিচয় পাওয়া যায় চর্যাপদ ও দোহাকোষ প্রভৃতির মত গীত-গান থেকে। প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসই[১] এ-যুগের জন্য আমাদের সম্বল (যেমন, History of Bengal, Vol. I, Ed. R. C. Mazumdar; 'বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতি'—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন; 'বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ'—নীহাররঞ্জন রায়, বিশ্বভারতী, ইত্যাদি)। কিন্তু তা থেকেও আমরা আসলে সমাজের আর্থিক জীবন বা সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বেশি সংবাদ পাই না—তা না পেলে কতটুকু চেনা যায় এই প্রথম যুগের বাঙালী সংস্কৃতিকে?

তবু পরবর্তীকাল ও সমসাময়িক বাতাবরণ থেকে অনুমান করতে পারি—তখন বাঙালীর জীবনযাত্রা ছিল কৃষিপ্রধান, পল্লীগত; আর সেই পল্লী-বৃত্তিতে জীবিকা সংগ্রহ করত জেলে, ডোম, বাগদী, মাঝি প্রভৃতি। 'রাষ্ট্রে' একরকমের সামন্ততন্ত্র চলছিল; ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হয় প্রচুর। কিন্তু (বৌদ্ধ?) বণিকের নতুন উন্মেষও হয়ত দেখা দিয়েছিল বৌদ্ধ পাল-সম্রাটদের সহায়তায়—(হিন্দু?) সামন্তদের ও ব্রাহ্মণদের ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ রাখবার দায়েই। বাণিজ্যের জন্য সাত সমুদ্র পাড়ি দিত সেসব বণিকদের নৌকা। আর সেনরাজত্বে এই বণিক-শক্তিকে খর্ব করেই বোধ হয় স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল এক জবরদস্ত রাজতন্ত্র—কৌলিন্যের সূত্রে যে-অত্যাচার পাবা হল বণিকদের উপরে, বিরোধী জাতিদের করলে ছোট বা পতিত। সমাজের ভেতরে এই শ্রেণী-বৈষম্য ও সংগ্রামে যে সেনরাজত্বই পরিণামে অন্তঃসারশূন্য হয়ে উঠেছিল তাও বোঝা যায়। আর শেষ দিককার শাসকশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতার ও অকর্মণ্যতার কাহিনী তখনকার কাব্যকথায় যথেষ্ট রয়েছে।

আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে অনুমান করতে পারি—ব্রত, পার্বণ প্রভৃতি লোকাচার যথেষ্ট ছিল; নাথ, (শৈব ও বৌদ্ধ) তন্ত্রের খুব প্রচলন ও মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়-ফুঁকের খুব প্রসার ছিল।—সমাজের মধ্যে আজও এসব যা আছে হয়ত তা তখনো ছিল, এমন কি হয়ত তা আরও পুরনো।

বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যযুগ

প্রথম পর্ব : ১২০০ থেকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ

মধ্যযুগের বাঙলা মোটামুটি শুরু হয় তুর্ক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর তার প্রথম পর্ব শেষ হয় ১৪০০-এর কাছাকাছি। এ-যুগের গৌড়-বাঙলার অনেক কথাই নানা সংস্কৃত শাস্ত্র আর কুলজী গ্রন্থ

১ এ বিষয়ে ১৯৪৬ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র যে ছ'টি সুদীর্ঘ ও অসামান্য বক্তৃতা দেন তা ছাড়া বোধ হয় আর কোথাও বাঙলার ইতিহাসের এ যুগের এমন তথ্যপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে সে বক্তৃতা মুদ্রিত হয়নি। কিন্তু তার অনুলিখিত সংক্ষিপ্তসারও যদি মুদ্রিত হয় তা হলে এরূপ আলোচনার গোড়াপত্তন হবে। লেখক ২৮-২-৪৭।

থেকে জানা যায়, জয়দেবের কবিতা আর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থও আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখায় রাষ্ট্রীয় চিত্রও লাভ করা যায়। কিন্তু বাঙালীর পক্ষে এ-যুগের চিত্রের জন্য উল্লেখযোগ্য হল 'সেখ শুভোদয়া'র (হৃষীকেশ সিরিজে প্রকাশিত ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত) ও 'শূন্যপুরাণের' মত বই। আর বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে অবশ্য 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' মূল্য অসামান্য। কিন্তু তুর্কী বিপ্লবে সামাজিক বিপর্যয় ঘটলেও মূলত সেই কৃষিপ্রধান সমাজের জীবন-যাত্রার কী পরিবর্তন ঘটল? বিশেষ নয়, বনিয়াদ প্রায় ঠিকই রইল।

দ্বিতীয় পর্ব : ১৪০০—১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ

পাঠান রাজত্ব ও বারভূঞার কালে আমরা পৌঁছে সামন্ত বাংলার ছবি পাই। মোটামুটি বাঙলা সাহিত্যের আসর বসতে থাকে—হুসেন শাহের দরবারে, পরাগল খাঁ, ছুটিখাঁর সামন্তসভায়, রোসাঙ্গের রাজসভায়। মুসলমান-হিন্দু সমভাবে বাঙলা কাব্যরসে তখন আনন্দিত। ওদিকে নবদ্বীপে নৈয়ায়িকদের প্রতিষ্ঠা বেড়ে চলে; বৈষ্ণব যুগের প্রারম্ভ ও প্রসার শুরু হয়। বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজসভায় বৈষ্ণব ধর্মের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে বাঙলাদেশের মনপ্রাণ টলমল করে উঠল; সাহিত্যে, শিল্পকলায় কোনো দিকেই এ যুগের নিদর্শনের অভাব নেই। কবিকঙ্কণ চণ্ডী হল যুগের চিত্র হিসাবে উৎকৃষ্ট। তবু কিন্তু দেখি—সেই পূর্বযুগের মত জায়গীরদার সামন্ত পদ্ধতিতেই জীবনযাত্রা মোটামুটি ব'য়ে চলেছে।

তৃতীয় পর্ব : ১৬৫০—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ

মোটামুটি এই তৃতীয় পর্বের শুরু মোগল বিজয়ে। বাঙলার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ তাতে নিকটতর হল; আর টোডরমল্লের আসল তুমার জমার বন্দোবস্তে নতুন ভূম্যধিকারী সামন্ত সৃষ্টি হল, সামন্ততন্ত্রের একটু নতুন ভঙ্গি দেখা দিল। ওদিকে তৎক্ষণে বিদেশী বণিক আবির্ভূত হয়েছে—দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় সওদাগর শ্রেণীর প্রভাব বাড়তে বাধ্য, পুরনো গণ্ডী ও গণ্ডীবদ্ধ দৃষ্টিও ঘুচে যেতে বাধ্য। তা ছাড়া এল শেষ দিকে বর্গীর হাঙ্গামা, আর সামন্ততন্ত্রের সংকট তাতে ঘনিয়ে এল। অবশ্য এরই মধ্যে দরবারী সভ্যতার বিকাশ দেখা দিল মুর্শিদাবাদে, ঢাকায়; পরে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় দেখা গেল তার নকলনবিশী। সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে বিষ্ণুপুর ক্রমে বিনষ্ট হতে লাগল, নাটোর বর্ধমান বেঁচে রইল।

এই দ্বিতীয় যুগে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক কাব্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য—পদাবলী, জীবনী-কাব্য, রসশাস্ত্র, কীর্তন এবং শেষ দিকে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতকলার যথেষ্ট অনুশীলন চলে। উচ্চকোটির বাঙালী সমাজ স্রষ্টারা অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন, কেউ কেউ মুসলমানও (আলাওল, দৌলত কাজী প্রভৃতি), কিন্তু মুসলমান শাসকরা হিন্দু রাজাদের মতই মোটামুটি সবাই এই সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। দুই-চারিটি শহরে তাদের দরবারী কায়দার প্রাথমিক প্রচলন হয়েছে, নইলে পল্লীসভ্যতাই অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

শহরের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কারুশিল্পীরও আবির্ভাব হয়েছে। অবশ্য জীবনযাত্রায় অব্যাহত রয়েছে কৃষিপ্রধান, জায়গীরদারী ও টোডরমল্লের নতুন ভূমি-ব্যবস্থা। মোটামুটি মধ্যযুগের উচ্চকোটির বাঙালীর এসব দান আমাদের হাতে কম-বেশি এসে পৌঁছেছে। বর্তমানকালেও মধ্যযুগের অনেক আচার-অনুষ্ঠানে সেই পূজা, পার্বণ, মেলা, খেলা, বাইচ দৌড়, ব্রত নিয়ম সবই গতানুগতিকভাবে চলছে।

কিন্তু মধ্যযুগের এই উচ্চকোটির সৃষ্টিধারাই ছিন্ন হয়ে যায় ইংরেজ রাজত্বে বাঙালী সংস্কৃতির নতুন বিকাশে। বরং মধ্যযুগের লোক-সংস্কৃতির দান অবজ্ঞাত হলেও টিকে থাকে আমাদের পল্লীতে জনসাধারণের মধ্যে। এই লোক-সংস্কৃতির নিদর্শনের মধ্যে পাই "ময়মনসিংহ গণ-গীতিকা"র মত অপূর্ব কাব্য ও গাথাসমূহ (রোমান্টিক কাহিনী হলেও এসবের মধ্যে সামাজিক সত্যও আছে); মুসলমান লেখকদের লেখা মুসলমানী পুঁথি-সাহিত্য (এর উপরে আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাসের-

জিন-পরী-হুরী, আর নানা বুজর্গের নানা কেরামতির ছাপ সুস্পষ্ট) ; বৈষ্ণব কীর্তন ছাড়াও আউল বাউল সহজিয়া প্রভৃতি ভারতীয় ধারার গান, দেহতত্ত্বের গান ; সুফীদের প্রাণাবেগ ও সাধনায় প্রদীপ্ত মর্সিয়া ও মারফতি গান ; নানা ধর্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কীর্তন, যাত্রা, তরজা, কথকতা, ঝুমুর, ধামালি, গম্ভীরা প্রভৃতি গান ; আর একেবারে সাধারণ মানুষের প্রাণ যাত্রার গান—জারি, সারি, ভাটিয়ালী, বেদে গান, আগমনী, নবমী, বিয়ের গান।

আধুনিক বাঙলার লোক-সংস্কৃতি

এ সবই আজও আমাদের লোকজীবনে সচল—একালের "বাঙালী সংস্কৃতি" এদের পাশ কাটিয়ে গিয়েছে ; কিন্তু এ-সব সংস্কৃতি-নিদর্শন মধ্যযুগ থেকে আমাদের লোক-জীবনে বাসা বেঁধে রয়েছে। মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির রূপ আজও তাই দেখতে পাই আমাদের আধুনিক বাঙলার লোক-সংস্কৃতির দিকে তাকালে (দ্রষ্টব্য : 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)।

বাঙলার লোক-জীবনে আজও সেই পুরনো (১) **বাস্তব সভ্যতার দান** রয়েছে ; যেমন, টিন আসছে, টালি আসছে গ্রামে-গঞ্জে, কিন্তু এখনো বাস্তুশিল্পে সেই খড়ের ঘর, বাঁশের ও বেতের কাজ সেই কাঠের কাজ, সেই ইটের মন্দির রয়েছে। ভাস্কর্যে বিলাতী পুতুল আসছে কিন্তু পোড়ামাটির মূর্তি পাথরের দেবমূর্তি, হাতীর দাঁতের কাজ, শাঁখার কাজ, শোলার কাজ, কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল চলছে। চিত্রবিদ্যায় কালীঘাটের পট নষ্ট হলেও বাঁকুড়া বীরভূমের পটুয়ার পট, লক্ষ্মীর সরা, কুলা-চিত্র, পিঁড়ি-চিত্র, ঠাকুরের চাল-চিত্র প্রভৃতি উঠে যায়নি। সোনা ও রূপার নানা কাজ, নকশী তোলা, মীনার কাজও রয়েছে। কাঁসা, পিতলের বাসন-কোসন থেকে বিগ্রহ পর্যন্ত টিকে আছে—এলুমিনিয়ম, এনামেলের দিনেও। তাছাড়া পোলাও, কালিয়া, চপ্-কাটলেট, আইস্‌ক্রিম্ প্রভৃতির সঙ্গে শাক, শুক্তানি, ঘণ্ট থেকে মাছ ও ছানার মিষ্টান্ন টিকে রয়েছে ; রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি বাঙালী বালচারের বাহন হিসাবে বরং দিগ্বিজয় করছে। বস্ত্রশিল্পে মুর্শিদাবাদের রেশম গেল, তসর যেতে বসেছে, তবু ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি এখনো চলছে। শ্রীহট্টের পাটি দুর্লভ হয়ে উঠছে—জাপানী মাদুর বাজার প্রায় ছেয়ে ফেলেছিল। (২) অবশ্য **আচার অনুষ্ঠান** তো লোক-জীবনে প্রায় অব্যাহতই রয়েছে—সে বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতিই হোক, পূজা পার্বণ প্রভৃতিই হোক, ভাইফোঁটা, জামাই ষষ্ঠী, নবান্ন, নতুন খাতা প্রভৃতিই হোক কিংবা মহরম, ঈদ, শাহ মাদারের উৎসবই হোক। আলপনা, কাঁথা সেলাই পূর্ববঙ্গে এখনো মরেনি, লাঠি খেলা, কালিকাছের নাচ, রাইবেঁশে নাচও অচল হয়নি। (৩) অবশ্য **আধ্যাত্মিক ও মানসিক সংস্কৃতির** উচ্চকোটির ক্ষেত্রে টোল-চতুষ্পাঠীর কেন্দ্রসমূহ কিংবা তাদের পুরনো বিদ্যা-চর্চার ঐতিহ্য আজ আর সে শ্রদ্ধা পায় না। লোক-গীতি, লোক-সাহিত্য যা টিকে আছে, টিকে আছে লোক-জীবনের মধ্যে। ইংরেজ আমলের নতুন বাঙালী সংস্কৃতি লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ; লোক-সমাজ ও এই শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংস্কৃতির রসাস্বাদনে অক্ষম। তারা গান, কীর্তন প্রভৃতি নিয়েই সান্ত্বনা পেয়েছে। কিন্তু এ-যুগে সে-সবে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে না পারায় ক্রমেই সে-সব লোক-শিল্পও ক্ষীণায়ু হয়ে পড়েছে।

কিন্তু যে একটি বড় কথা প্রথম যুগ ও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির সম্বন্ধে মোটামুটি সত্য,—এবং এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতি সম্বন্ধে সত্য নয়,—তা এই যে : ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য ছিল—উচ্চকোটির লোক উচ্চাঙ্গের শিল্প ও কারুকলার চর্চা করতেন, নিম্নকোটির লোকও তাদের নিজস্ব লোক-সংস্কৃতি নিয়ে আনন্দলাভ করতেন। কিন্তু এই দুই বর্গের মধ্যে যত তফাৎ থাকুক, তাদের মধ্যে আদান-প্রদান ছিল সহজ এবং স্বাভাবিক। উচ্চবর্গের সংস্কৃতির দান সহজভাবেই বয়ে নামত নিম্নবর্গের সংস্কৃতির মধ্যে। আর নিম্নবর্গের জারি গান, সারি গান, কীর্তন প্রভৃতিও উচ্চবর্গের নিকট অখাদ্য হয়ে ওঠেনি—তারও সারল্য ও স্বাভাবিকতা সহজ সূত্রে উচ্চকোটির স্রষ্টারা আয়ত্ত করে নিতেন। একদিকে যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, পালা গান প্রভৃতির মধ্যদিয়ে,

আর অন্যদিকে আউল-বাউল, দরবেশ ও সুফীদের মারফত এ দুই বর্গের জীবনে ও সংস্কৃতিতে সর্বদাই লেন-দেন চলত। অর্থাৎ পল্লী-সভ্যতার ও কৃষিপ্রধান সভ্যতার বাতাবরণে মধ্যযুগের সামন্ত জীবনেও "ভদ্রলোকে"-"ছোটলোকে", আর "ভদ্র"-সংস্কৃতিতে ও 'লোক'-সংস্কৃতিতেও এত বড় তফাৎ ঘটেনি, যেমন তফাৎ ঘটল সাম্রাজ্যবাদী শাসনে একালের বাঙালী সংস্কৃতিতে ও এখনকার লোক-সংস্কৃতিতে। তার কারণ সাম্রাজ্যবাদের যুগে বাঙালী সংস্কৃতি হয়েছে (ক) মধ্যবিত্তের সৃষ্টি বাবু কালচার; (খ) ইংরেজি শিক্ষিতের সৃষ্টি; (গ) শহুরে লোকের সৃষ্টি; (ঘ) চাকরে ভদ্রলোকের সৃষ্টি। আবার সেই মুসলমান শাসনে জীবনক্ষেত্রে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানে এমন দূরত্ব ও বিবাদ ঘটেনি যেমন ঘটেছে এই সাম্রাজ্যবাদী শাসনে শাসিত হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর মধ্যে। তারও কারণ সাম্রাজ্যবাদী আমলে প্রথমে এই চাকরে ও মধ্যস্বত্ব-ভোগী মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত শহুরে ভদ্রলোকরা ছিলেন হিন্দু, মুসলমান তখনো বিজেতার সংস্পর্শে আসতে উৎসুকই ছিল না। আর আজ সেখানে মুসলমান মধ্যবিত্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন হিন্দু মধ্যবিত্তদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে।

শত দোষ সত্ত্বেও তাই মনে রাখা দরকার – মধ্যযুগের বাঙালী জীবনযাত্রা যেমন অনেকাংশে (সর্বাংশে নয়) অখণ্ড ছিল, তেমনি পূর্বযুগ ও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতিও ছিল অনেকাংশে অখণ্ড।

ইংরেজ শাসনে বাঙালীর জীবনে ও সংস্কৃতিতে একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল—পুরনো বাঙালী সংস্কৃতির অতি অল্প অংশই টিকে রইল তারপরে। তাই বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির এই তৃতীয় যুগে হল খণ্ড বিকাশ।

ইংরেজ রাজত্বের বিপর্যয়

ইংরেজের রাজত্ব-লাভে যে বিপর্যয় রাষ্ট্রে ও সমাজে সূচিত হল প্রথমে তাই একবার স্মরণ করা দরকার।

পুরনো শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হলে নবাবী আমলের পরিপুষ্ট অভিজাত শ্রেণী, বিশেষ করে মুসলমান অভিজাত শ্রেণী বিনষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বাঙালী সংস্কৃতি হারাল তার পৃষ্ঠ-পোষকদের। খাজনার লোভে দেশ চলে গেল খাজনা-আদায়ী ইংরেজের একদল অনুচরের হাতে, ক্রমে ইংরেজের তাঁবেদার এই দালাল, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি হয়ে বসলেন জমিদার। পুরনো সংস্কৃতির প্রতি এদের দরদ ও দৃষ্টি থাকবার কথা নয়। এরা অনুসরণ করতে চেয়েছে কখনো সেই আধা-নবাবী চাল, কখনো সেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফিরিঙ্গির জীবনযাত্রা। দেশের শিল্পে-বাণিজ্যে ইংরেজ বণিক অধিকার স্থাপন করে দেশের ধনী লোকদের পথ সেদিকে একেবারে বন্ধ করে দিলে, জমিতেই তারা দেখলে মুনাফা। তাই, আগেকার বড় বড় ব্যবসায়ীরা ক্রমেই জমির মালিক হয়ে বসতে লাগল। জমিদারী প্রথার সুযোগ (১৭৯৩) নিয়ে নানা মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে তারা জমির খাজনা আদায়ের ভারও ক্রমেই তালুকদার, পত্তনিদার প্রভৃতির হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। এভাবে জমিদার বনে গিয়ে তারা উদ্যোগ-উদ্যম খুইয়ে ফেলল—ফলে এদেশে ব্যবসায়ী বণিকদের পক্ষে শিল্পপতি, পুঁজি-পতি হবার মত আগ্রহ ও উদ্যম ক্রমেই কমে গেল। জমির উপস্বত্ব পেয়ে নানা ধাপের মধ্যবিত্তও তখনকার মত কৃষ্টির উপর চেপে বসল। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি কুঠীর দাদন ও অত্যাচারের চাপে এ-দেশের কারুশিল্প ও পল্লী-শিল্প ১৮০০ খৃীঃ পূর্বেই লোপ পাচ্ছিল। বিলাতে কল-কারখানার যুগ এলে, (১৮০০-১৫ এর সময়) শ্রম-শিল্পের যুগ এলে, এদেশের হাতের কাজের শিল্পীর দিন শেষ হল। তারা বাধ্য হয়ে চাষী হয়ে কৃষির দিকে ঝুঁকে পড়ল। অন্যদিকে ব্রিটেনের শোষণে, জমিদার ও নানা মধ্যবিত্তের শোষণে, কৃষক ক্রমশ গিয়ে পড়ল মহাজনের কবলে। সেচের ব্যবস্থার অভাবে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিতে কৃষির অবনতি ঘটতে লাগল। আর টুকরো টুকরো জমিতেই ক্রমেই যত 'কৃষিজীবী'র

ভিড় বাড়ল ততই কৃষি হল লোকসানের কাজ—অথচ জীবিকার অন্য পথও কারও নেই। তখনকার মত বাঁচবার পথ রইল জমিদারের, মধ্যবিত্তের ও মহাজনের,—কিন্তু কৃষি ও কৃষকের যদি মৃত্যুই ঘটে তা হলে তাদের মৃত্যু ক্রমে ঘনিয়ে আসবে। কালক্রমে তা আজ এসেছেও। এই হল ইংরেজ রাজত্বের বিধ্বংসী কাজ।

কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের ঘাত-প্রতিঘাতে আর একটি আবার নতুন সম্ভাবনার দিকও সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায়—দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়সূত্রে গণ্ডীবন্ধ জীবন ভেঙে গেল। অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে পুরনো পদ্ধতির এদেশীয় পল্লী-শিল্প আর টিকিয়ে রাখা যায় না। বিলাতী শিল্পজাত নিয়ে আসবার জন্য রেলপথ বসে, তাই কয়লার খনি দরকার হয়, লোহার কারখানাও খুলতে হয়। ফলে শিল্প-যুগের দিকে দেশ এগিয়ে যেতে চায়। নিতান্ত জমিদারী প্রথায় বাঁধা না পড়লে উদ্যোগী ও সম্পন্ন পুরুষেরা এগিয়ে যেত তখন ব্যক্তিগত কারবারে, বিদেশী বাণিজ্যে (যেমন পার্শীরা গেল), শেষে স্থাপন করতে কল-কারখানা। ফলে সামন্ত-যুগ আর তার জীবনযাত্রা শেষ হত। তাই হল পশ্চিম উপকূলে, কিন্তু বাঙলায় জমিদারীতন্ত্রের জন্য তাই হয়নি। দ্বিতীয়ত. ভারতবর্ষে একই শাসনব্যবস্থায় একটা একতা গড়ে ওঠে, আর ইংরেজি জীবনাদর্শের প্রভাবে গড়ে ওঠে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের, স্বাধীন মতবাদের ও গণতন্ত্রের আদর্শ। তৃতীয়ত, ইংরেজের রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে ইংরেজীর মারফত পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা প্রবর্তিত হলে একমুহূর্তে সেই শিক্ষার্থীর সামনে উন্মুক্ত হল—পৃথিবীর তখনকার উন্নততম জাতির ও উন্নততম সভ্যতার চরম দান, জ্ঞান-বিশ্বাস, শিল্প ও সংস্কৃতি। তার ফলে এই শিক্ষিতদের মানসিক জীবনে একেবারে বিপ্লব ঘটে গেল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের চেতনা একদিকে তাদের উদ্বুদ্ধ করল আর দিকে তারা উদ্বুদ্ধ হল সেই নতুন জীবনাদর্শে, নতুন সৃষ্টিতে। একালের বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম হল প্রধানত এই প্রেরণার বশে, এই চেতনায়। এর স্রষ্টারা হল ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী।

বাঙালী সংস্কৃতির পাদপীঠ

কিন্তু এ প্রেরণা ও এ চেতনা বাস্তব ক্ষেত্রে দাঁড়াবার ভূমি পেল কি করে? পেল এইজন্য যে প্রথমত, জমিদারীতন্ত্রের আওতায় দেশে মধ্যস্বত্বভোগী একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আপাতত জীবিকার, একটা প্রশস্ত পাদপীঠ মিলল—যদিও তাতে অগণিত কৃষক ও শিল্পজীবীর ঘাড়ে আরও বড় বোঝাই চাপল। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পেলে ইংরাজের দপ্তরখানায় শিক্ষিতদের তখন সহজেই চাকরি মিলত—আর সে চাকরিতে যেমন আয় ছিল, তেমনি ছিল আবার সম্মানও। অতএব শিক্ষিত বৃত্তি—চাকরি থেকে মাস্টারি, ডাক্তারি, ওকালতি এ-সবই হল মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার দ্বিতীয় আশ্রয়।

এই দুই আশ্রয়ই যে অত্যন্ত কাঁচা তা আজ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ১৮০০ থেকে ১৯০০ কেন, প্রায় ১৯২০ পর্যন্ত আমাদের বাঙালী ভদ্রলোক অন্য সব জীবিকার পথ বর্জন করে এই দুই পথ আশ্রয় করেই দাঁড়ায়। আর তখনো তার ভাগ্যে এতটা অবকাশ মিলে এই জীবনক্ষেত্রে যে, সে ব্রিটিশ বুর্জোয়া সভ্যতার শ্রেষ্ঠ জীবন-দর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তেমনিরূপে রাষ্ট্রে সমাজে শিল্পে নিজেকে প্রকাশিত করবার জন্য নিজেকে ঢেলে দেয়। তার এই প্রায় দেড়শ বৎসরের দানই এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতি—অত্যন্ত কাঁচা আর্থিক সামাজিক বনিয়াদের উপর সৃষ্টি মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকদের এক সুতীব্র, বর্ণোজ্জ্বল কুসুম—বাস্তব জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যারা বুর্জোয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, স্বাধীনতা, আর্থিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত হয়ে আবদ্ধ হল জমিদারীতন্ত্রের আধা-সামন্ত গণ্ডীতে, তারাই বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রেরণায় মেতে উঠল মানসিক সৃষ্টিতে। দেহমন নিগড় বন্ধ রইল সাম্রাজ্যবাদী শাসনে—এমন কি, নিজেরা তারা সংযোগ হারাল দেশের পূর্বসংস্কৃতির সঙ্গে, সংযোগ হারাল দেশের জীবন্ত জনতা ও জন-জীবনের সঙ্গে—অথচ তারাই প্রাণ-মনে চাইল সৃষ্টি করতে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় সংস্কৃতি। ফলে, এ সৃষ্টির মধ্যে যেসব

লক্ষণ দেখা দিতে বাধ্য তাও আমরা বুঝি—অতিরিক্ত ভাবাবেশ ও আত্মকেন্দ্রিকতা, বাস্তববিমুখিতা, তথাকথিত "আধ্যাত্মিকতা", আর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মে অক্ষমতা, অস্থিরতা।

কালানুক্রমিক বিকাশ

তবু এইকালের মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতি কয়েকটি পর্বে সমুত্তীর্ণ হয়ে যায়, তা এখানে সংক্ষেপে স্মরণে রাখতে পারি (দ্রষ্টব্য : Notes on Bengali Renaissance, Amit Sen)।

প্রথম পর্বে (১৮০০—১৮৪০) রামমোহনের উদয়। আমাদের রিনাইসেন্সের প্রভাতের শুকতারা রামমোহন। তাঁরই মধ্যে পূর্ব ও পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চা, ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার থেকে রাজনৈতিক চেতনার প্রথম স্ফুরণ আমরা দেখতে পাই। আর এ-পর্বে সে-সঙ্গে দেখতে পাই শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের বাঙলা চর্চা ; ডেভিড্ হেয়ারের শিক্ষাদান ব্রত, ডফ্ প্রভৃতি পাদ্রীদের চেষ্টা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নতুন বাঙলা গদ্যের প্রথম বিকাশ। দ্বিতীয় পর্ব এরই মধ্যে শুরু হয় হিন্দু কলেজকে অবলম্বন করে। কিন্তু এ পর্বের প্রধান নায়ক হল সেদিনের ইয়ংবেঙ্গলেরা। তাঁরা বিদ্রোহী হলেন পূর্ব সংস্কারের বিরুদ্ধে। তৃতীয় পর্ব চলল ওয়েলেস্লি-ডালহৌসির আমলে—সামন্ত ব্যবস্থা ভাঙায় আর রেল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির পত্তনে তার বাস্তব ভিত্তি রচনা হয়। চতুর্থ পর্বে একদিকে সিপাহী বিদ্রোহ ও সামন্ত যুগের অবসান ; অন্যদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু হয়ে দেখল সত্যকারের বাঙালী সংস্কৃতির বিকাশ—১৮৪৯—৬০-এর কাছাকাছি থেকে সেই বাঙালী রিনাইসেন্স শুরু হল মধুসূদন, দীনবন্ধুকে নিয়ে। এদিকে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সংস্কার আন্দোলন 'বাঙালী রিফর্মেশন' রূপলাভ করলে কেশবচন্দ্র ও পরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে ; পাশাপাশি জেগে উঠল হিন্দু পুনর্গঠনের চেষ্টা 'কাউণ্টার রিফর্মেশন'—বঙ্কিম-ভূদেব থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত। আর রাজনৈতিক চেতনা রূপ গ্রহণ করতে লাগল জাতীয় আত্মবোধে দৃপ্ত হয়ে হিন্দু মেলায় আর উদারনৈতিক যুক্তিবাদ অবলম্বন করে ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন। রিনেইসেন্স রিফর্মেশনের ফল রিভোলিউশন—রাজনৈতিক বিপ্লব, কংগ্রেস প্রভৃতির মধ্যে। এধারার চরম পরিণতি স্বদেশী যুগে (১৯০৫—১৯১১)—তখন বাঙালী মধ্যবিত্তের সমস্ত চেতনা একেবারে শতদিকে আপনাকে মেলে দিলে। জন্মাল নতুন তীব্র স্বাধীনতাবাদ, বিপ্লবী প্রেরণা। জাতীয় শিক্ষাদীক্ষা সম্পদের নতুন স্বপ্ন জাগল : রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুন সঙ্গীতকলা নতুন করে গড়ে উঠতে লাগল ; নতুন ভারতীয় চিত্রকলা জন্মাল,—আরও কত কি যে হল, তা হিসাব করে দেখবার মত। তারপর এল মহাযুদ্ধের দিন। আর মহাযুদ্ধের শেষে স্পষ্ট হল এই কথাই যে, বাঙালী ভদ্রলোকের চাকরি দুর্লভ : বাঙলার মধ্যস্বত্ব ও জমিদারীতন্ত্রের চাপে। কৃষিমূলক জীবনযাত্রা ভেঙে যেতে বসেছে, আর মধ্যবিত্ত বনিয়াদ ধসে না গিয়ে পারে না। এই সংকটকে আরও স্পষ্ট করে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনক্ষেত্রে আবির্ভূত হল মুসলমান মধ্যবিত্ত—আশা তার অনেক কিন্তু পথ তার কই ? রিনেইসেন্স রিফর্মেশন তার লাভ হয়নি, অথচ সে রাজনৈতিক শক্তি। সমস্ত চেতনাই তার খাপছাড়া। আর সেই চাকরির দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব অনেকটা তাই আচ্ছাদিত করে রাখল মূল সত্যটি—সাম্রাজ্যবাদী আওতায় বাঙালীর এই জীবনযাত্রাই আজ অচল। তবু এই সমস্যার যুগেও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বাঙালী সৃষ্টিতে আপনার দান অব্যাহত রেখে যেতে পারে—আরও অনেকদিন—তার প্রমাণ মিলেছে।

সংক্ষিপ্ত হিসাব

কিন্তু তার পূর্বে এই ১৮০০ থেকে ১৯২০-এর মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতি যে বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে আমরা এখানে তা মাত্র উল্লেখ করতে পারি (দ্রষ্টব্য : "সংস্কৃতির রূপান্তর"—'বাঙলার কালচার')।

রিনেইসেন্সের দিক থেকে দেখি ঃ

(১) আমাদের রিনেইসেন্সে আমরা নতুন করে সংস্কৃত ভাষার সম্পদকে আবিষ্কার করলাম,— আমরা ভারতের অতীতকে আবিষ্কার করবার চাবি খুঁজে পেলাম। অবশ্য আমাদের রিনেইসেন্সের আসল প্রেরণা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি।

(২) বাঙলা গদ্য জন্ম নিলে, প্রথমত তা শিক্ষার বাহন হয়ে উঠল, দ্বিতীয়ত, তা হল মানসিক আবেগময় সাহিত্যের বাহন। আর বাঙলা কাব্যে এক বিপ্লবী বিকাশ ঘটল। বাঙালীর প্রধান গৌরবই তার এই শিক্ষাবিস্তার ও সাহিত্যসৃষ্টি।

(৩) ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলায়ই গড়ে উঠতে লাগল এক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ আর এক নাট্য-সাহিত্য। পরবর্তীকালে (১৯২০-এর পরে) সূচনা হয় নতুন ফিল্‌ম ও নতুন নৃত্য-কলার।

(৪) আমরা নতুন সঙ্গীতকলা আবিষ্কার করলাম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে।

(৫) নতুন ভারতীয় চিত্রকলার উদ্বোধন হল, (তারও পরে জন্ম নিয়েছে নূতনতর চিত্রশিল্পী যেমন যামিনী রায়)।

(৬) বিজ্ঞানে (জগদীশচন্দ্র হতে), চিকিৎসাশাস্ত্রে (ডাঃ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি), অর্থনীতিতে (রমেশচন্দ্র) ইতিহাসে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে) নতুন গবেষণার সূচনা হয়।

সংস্কারান্দোলনের দিক থেকে দেখি ঃ

(৭) হিন্দু সমাজসংস্কারের বিপুল আন্দোলনের ধারা, রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত উজান গতিতে চলে।

(৮) ধর্মে ব্রাহ্মসমাজ এক নতুন সূচনা।

(৯) রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ থেকে নব্য বৈষ্ণবধর্ম বা শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত হিন্দু সাধনার এক নতুন বিকাশ।

রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক থেকে দেখি ঃ

(১০) ভারতবর্ষের জীবনে বাঙালীর সর্বাপেক্ষা বড় দান রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলন। দেশবন্ধু পর্যন্ত বাঙালীই সেদিকে অগ্রণী।

রামমোহনের মধ্যে যে সূত্র ছিল সে সূত্র অবলম্বন করেই উনিশ শতকে বাঙালী জীবনে দুটি ধারা—পরস্পরের পাশাপাশি—আমাদের রিনেইসেন্স, রিফর্মেশন ও রাজনীতিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে ঃ

(ক) "উদারনৈতিক" সংস্কারবাদী—যাঁরা প্রধানত ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের শিক্ষা অবলম্বন করে "ব্যক্তি-স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের" আদর্শ গ্রহণ করেন। এটিই ইয়ংবেঙ্গল, মধুসূদন প্রভৃতি, কেশব, আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ধারা।

(খ) "জাতীয়তাবাদী" স্বাধীনতাকামী—প্রধানত জাতীয় মর্যাদা, জাতীয় গৌরব ও জাতীয় আত্মশক্তিকে অবলম্বন করেই এঁরা দাঁড়াতেন—যেমন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু ও হিন্দু মেলার প্রবর্তকগণ; বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের মত ভারতীয় সাধনার প্রচারকেরা।—বাঙলার বিপ্লবীরা এঁদেরই দেশপ্রেমের প্রেরণাকে অবলম্বন করে।

এই দুই ধারারই সমন্বয় ঘটে রাজনীতিক্ষেত্রে আর স্বদেশীতে আর সংস্কৃতিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও দর্শনে।

সংকটের মুখে

এই বাঙলী সংস্কৃতিতে তবু সমস্যা ও সংকট ঘনিয়ে উঠতে বাধ্য, যখন প্রথম মহাযুদ্ধের পরে

দেখা গেল বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনের বনিয়াদ আর টিকে না। তবু কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতি তৎক্ষণাৎ বন্ধ্যা হয়ে গেল না। তার প্রমাণগুলি আমরা গণনা করতে পারি—প্রধানত এ সময়েই আমরা দেখি—(১) 'সবুজপত্র' ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ, 'নারায়ণ' ও বাঙলার রূপ-বাদ ; (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যাহত বিজ্ঞানের গবেষণা (মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি) ইতিহাসের গবেষণা, ভাষাতত্ত্বের গবেষণা প্রভৃতি ; (৩) অসহযোগের সঙ্গে মুসলিম বাঙলার জাগরণ ও তার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ; (৪) রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী স্থাপনা ; (৫) তাঁর প্রচেষ্টায় বাঙলা কাব্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা ও নৃত্যের নবজন্ম ; (৬) 'বিদ্রোহী' কবি থেকে নজরুলের গজলের, গানের কবি হিসাবে বিকাশ ; (৭) তৃতীয় দশকের 'অতি-আধুনিক সাহিত্য' (অবাস্তব 'বস্তি সাহিত্য' ; ভাবালু 'যৌন-সাহিত্য', অসুস্থতার কথা-সাহিত্য, প্রভৃতি) ও তার নাতি-আধুনিক প্রতিবাদ ; (৮) শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে বাঙালী মধ্যবিত্তের আত্ম-পরিচয় এবং তার অক্ষমতার পরিচয় (যেমন 'পথের দাবী', 'বিপ্রদাস') ; (৯) শিশিরকুমারের নাট্যকলার উদ্বোধন, নতুন সবাকচিত্রের জন্ম ; (১০) যামিনী রায়ের নতুন আবির্ভাব শিল্পে ; (১১) আর রবীন্দ্রনাথের (ও সমসাময়িক অন্য সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্য দিয়ে) সাহিত্যের কালান্তরের সূচনা ; (১২) বাঙালী মধ্যবিত্ত পলিটিক্সের অচলতা ও বাঙলার বিপ্লবী কর্ম ও প্রেরণার সাম্যবাদী চিন্তা ও প্রয়াসে রূপান্তর ; এবং (১৩) এই যুদ্ধকালে যুদ্ধ-ব্যবসা ও সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে চোরা কারবার, মুনাফাতন্ত্রের বিকৃত বিকাশ।

বাঙালী জীবনে সমস্যা যে কত ঘনিয়ে উঠেছে আর একালের বাঙালী সংস্কৃতির বনিয়াদ যে কত সংকীর্ণ ও দুর্বল ভিত্তিভূমির উপর গাড়া হয়েছিল এই দুই যুদ্ধের মধ্যকালে ক্রমেই তা পরিস্ফুট হয়। আর শেষে এই মহাযুদ্ধ কালের আঘাতে তা একেবারে নির্মমভাবে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে কলিকাতার পথের হাজার হাজার বাঙালী চাষী আর দরিদ্র কারুকর্মীর মৃতদেহের সাক্ষ্য নিয়ে। এ-কথা আর বুঝতে বাকী নেই—বাঙালীর জীবনের মূল আর্থিক বনিয়াদই অচল, তার জমিদারীতন্ত্রে, তার মধ্যস্বত্বের ভারে, তার শ্রমশিল্পের অভাবে, মহাজনের ঋণভারে, জমিদারের চালে, সেচের ব্যবস্থার অভাবে, লাঙলের অভাবে, ভালো বীজের অভাবে, পাটের দামের অভাবে,—স্বাস্থ্যের অভাবে, শিক্ষার অভাবে, অন্নের অভাবে সমস্ত কৃষি-জীবন ভেঙ্গে পড়েছে। অপরদিকে তার পাট, তার চা, তার কয়লা কিছুরই উপর তার মালিকানা নেই। বাঙলার এতবড় শিল্পায়োজনে সে না মালিক, না মজুর—সে শুধু কেরানী ও চাকুরে। বলা বাহুল্য মুষ্টিমেয় "ভদ্রলোকের" বা চাকরের সংস্কৃতির দিন ফুরিয়েছে —বাঁচতে হলে তাকে নতুন সুস্থ বনিয়াদের উপর বাঁচতে হবে, জন-জীবনকে সংগঠিত করে, জন-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগস্থাপন করে। হিন্দু মুসলমান সকল বাঙালীর দানে তখনই তা আসলে বাবু-সংস্কৃতি থেকে হবে "বাঙালী সংস্কৃতি"।

বাঙালী মুসলমান ও মুসলিম কালচার

তীক্ষ্ণবুদ্ধি একটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল, বাঙালী মুসলমান কি করে সংস্কৃতিক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবেন, তা নিয়ে। যুবক বন্ধু ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়টের আলোচনা থেকে আভাস সংগ্রহ করে নিয়ে যা বললেন তা সংক্ষেপে এই: "বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতির উৎস মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা থেকে উজ্জীবিত হবে। বর্তমান পাশ্চাত্য (বা খ্রীষ্টান) সংস্কৃতির প্রাণ যেমন, এলিয়ট বলেছেন, ক্যাথোলিক চার্চ ও ক্যাথোলিক সংস্কৃতি, মুসলমানের সংস্কৃতিরও প্রাণ তেমনি সেই মুসলিম আরবী কালচার।"

এলিয়টের এসব মতবাদ নিয়ে আলোচনা এখানে নিরর্থক। কঠিন বাস্তব ইতিমধ্যেই তাঁর সাধের মুসোলিনি-হিটলারদের প্রতিক্রিয়ামূলক প্রয়াসকে চুরিয়ে দিয়েছে। সমস্ত পাশ্চাত্যদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি মধ্যযুগের ক্যাথোলিক খাদে ফিরে না গিয়ে বরং এগিয়ে চলেছে; নিজ নিজ খাদেই তা চলেছে; আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও সংগঠনে বিপুলতর হয়েছে,—বিশ্বসংস্কৃতির সাগরসঙ্গমের দিকে তার গতি। এসব আমরা বুঝি। কিন্তু আমাদের পক্ষে ভেবে দেখা দরকার 'মুসলিম সংস্কৃতি' সম্বন্ধে আমাদের মুসলিম বন্ধুর এই ধারণা। হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই তা সমভাবে বুঝবার জিনিস। অবশ্য এ আলোচনায় হিন্দুদের পক্ষে বাধা আছে। আমাদের জ্ঞানেরও অভাব থাকে, আবার মুসলমানদের দ্বারা ভুল বোঝারও আশঙ্কা থাকে। তবু বিষয়টি হিন্দু-মুসলমান আমাদের সকলেরই আলোচনার যোগ্য; কারণ, এলিয়টের দৃষ্টান্তটা বিশেষ কিছু নয়। মুসলমান বন্ধুর মতবাদের যুক্তি এলিয়ট থেকে সংগ্রহ করা বটে, কিন্তু তাঁর মতবাদের শক্তি আসলে আমাদের শিক্ষিত মুসলমান বন্ধুদের এক মনোভাব। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এদেশে তাঁরা এখনও অনগ্রসর, তাই তাঁদের মনে একটা আশঙ্কা ও ব্যর্থতাবোধ আছে। তা থেকেই তাঁরা ধাবিত হন এলিয়টের মতোই সুদূর অতীতের উৎসের দিকে—এমন কি, মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান বা ভারতীয় মুসলমানের সৃষ্টিও ততটা আপনার বা ততটা কার্যকরী 'ঐতিহাসিক ধারা' বলে তাঁদের মনে হয় না। তাঁরা মুসলিম কালচার বলে অর্ধেক কল্পনা ও অর্ধেক সত্য একটি সৃষ্টি-উৎসের দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'মুসলিম কালচার' কথাটার অর্থ তাঁরাও হয়তো পরিষ্কার করে বলেন না, আমরাও পরিষ্কার করে বুঝি না। তাই তার রূপ বোঝা আমাদের ও তাঁদের সমান দরকার।

'মুসলিম কালচার' কি এক?

গোড়াতেই অবশ্য সংশয় জাগে, 'মুসলিম কালচার', 'খ্রীষ্টান কালচার' এসব কথা কতটা ঠিক। সত্যই এসব কথা বড় ঝাপসা। 'খ্রীষ্টান সভ্যতা'র তো বলতে গেলে খ্রীষ্টের সঙ্গেই সম্পর্ক ক্ষীণ; তার গৌণ সম্পর্ক বিভিন্ন চার্চের সঙ্গে ক্যাথোলিক, অ্যাংলিকান্, গ্রীক অর্থোডক্স্ ইত্যাদি। এমন কি প্রাচীন সিরীয় খ্রীষ্টান মতবাদ আমাদের দেশে কেরলে এদেশের একটা কেরলী রূপ গ্রহণ করেছে। অথচ 'খ্রীষ্টান সিভিলিজেশন' দিয়ে পোপ-ফ্রাংকো-হ্যালিফেক্স্ আর্চবিশপরা সাধারণত বোঝান ইউরোপ-আমেরিকার পাশ্চাত্য সভ্যতা। 'খ্রীষ্টান সভ্যতা'র মুখ্য সম্পর্ক সেই পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে। ইসলাম ধর্ম অবশ্য সেরূপ অস্পষ্ট মতবাদ নয়। সীয়া-সুন্নী কলহ আছে; শাফেয়ী-হানাফী তফাৎ আছে; সুফী, দরবেশ, পরীদেরও বিভিন্ন সাধনাপদ্ধতি রয়েছে; নতুন নতুন মতবাদ ও সাধনাধারা এখনো মুসলিম সমাজে জন্মাচ্ছে। তবু মুসলিম ধর্মমত খুব পরিষ্কার, সুস্পষ্ট, তার

নড়চড় হওয়াও শক্ত। মুসলিম ধর্মমত অনেকাংশেই অবশ্য একরূপ রয়েছে। কিন্তু কথা হল—মুসলিম কালচার কি তেমনি একরঙা একটা জিনিস? তা হলে 'মুসলিম কালচার'-এর অর্থ শুধু মুসলিম তত্ত্ববিদ্যা, বড়জোর তার আনুষ্ঠানিক জীবনযাত্রা (রোজা, নমাজ প্রভৃতি পাঁচ ঈমান)। অনেকে হয়ত বলবেন—হাঁ, তাই। অনেকে বলবেন—না, আরো আছে। সাধারণভাবে 'মুসলিম কালচার' বলতে আমরা বোঝাই মুসলিম-জগতের এই ধর্মমত, জীবনযাত্রা (আচার-অনুষ্ঠান) ও তাঁদের নানা সৃষ্টি (চারুশিল্প, কারুকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি)। কিন্তু চীন, জাভা, মালয় থেকে বোখারা, মরক্কো, ইস্তাম্বুল, আলবেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত 'মুসলিম জগতে' যে একই জীবনযাত্রা ও সৃষ্টিধারা অব্যাহত নেই, অব্যাহত হয়নি, তা স্পষ্ট। এমন কি খাঁটি আরবেও তা বরাবর এক থাকেনি। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আরব সমাজের ও তখনকার আরব সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিম ধর্ম-মতের ছিল প্রাণের যোগ, কিন্তু সেই সপ্তম শতাব্দীর আরব সংস্কৃতি আজ কোথাও অব্যাহত নেই—সৌদী আরবে সেই বিশুদ্ধ ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনেকটা চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এ-কালের সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দান, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিয়ো, এরোপ্লেন সবই তাদেরও মেনে নিতে হয়। আজ 'কলে কথা কয়', 'মানুষ ওড়ে'—সপ্তম শতাব্দীর ইসলামের দৃষ্টিতে এ যে 'গজবের দিন'।

আসলে, কালগতিতে কালচার বদলায়, ধর্মমতও বদলে যায়। আবার দেশভেদেও কালচার, এমন কি ধর্মের অনুশাসনও কিছু-না কিছু বদলায়। সেই প্রথম দিককার খাঁটি ইসলাম যখন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে তখনো ইসলামী আরব সংস্কৃতি এক এক নতুন দেশে পদার্পণ করেই আবার কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। কালক্রমে সেই পরিবর্তন আরো বেড়ে গেল। দেশকাল ব্যতীত শ্রেণীভেদেও যে কালচার বিভিন্ন হয়, তাও স্মরণীয়। ধর্মমতে ইসলাম সমদর্শী; কিন্তু মুসলমান চাষী ও শোষিত মুসলমান আর শোষণবাদী মুসলমান আমীর-ওমরাহের জীবনযাত্রাও এক নয়, উভয়ের কালচারও কোথাও এক নয়।

প্রকাণ্ড 'মুসলিম জগতের' পরস্পরের মধ্যে যে মিল সে মিল প্রধানত এক কালচারের নয়, এক রিলিজিয়নের। সে মিল ইসলামের—ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু কিছু নিয়মনীতির।

রিলিজিয়ন ও কালচার

এই কথাটিই প্রথম বোঝা দরকার—কালচার ও রিলিজিয়ন এক নয়; বরং সম্পর্কিত হলেও দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। বিভিন্ন অর্থে আমরা কালচার (বা তার অনুবাদে 'সংস্কৃতি') শব্দটি প্রয়োগ করি। কিন্তু কালচার চিরপরিবর্তনীয়, চিরবিবর্তনশীল। কালচারের প্রকৃতিই হল গতি। জীবিকার তাগিদে মানুষ হাতিয়ার তৈরীর আর বাক্যরচনার আশ্রয় নিয়ে প্রথম এ পথে নিজেরই অজ্ঞাতে পা বাড়ায়। হাতিয়ার শক্তি বাড়ায় হাতের, আর বাক্‌কৌশল আরো শক্ত করে সামাজিক বন্ধন; প্রকৃতির হাতের পুতুল না থেকে এভাবেই মানুষ করতে থাকে জীবিকার্জন। তারপর সেই সংগ্রামের প্রয়াসের সূত্রে নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জীবনধারার নানা স্তর পেরিয়ে সে চলেছে—বন্য অবস্থা থেকে পৌঁছল সভ্যতার ক্ষেত্রে, সভ্যতার ক্ষেত্রেও কৃষি আর পশুপালনের বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক স্তর পেরিয়ে আজ সে এসে পৌঁছেছে শিল্পপ্রধান সভ্যতার স্তরে। সবখানে অবশ্য সব মানুষ একতালে এগোয়নি—কেউ আজও প্রায় সভ্যতার প্রথম স্তরে, কেউ এখনো কৃষিপশুচারণার স্তরে। কিন্তু শিল্পী-জীবনের ক্ষেত্রেও অনেকেই এসে পৌঁছেছে—আর তারাই দুনিয়ায় প্রধান। অন্যদের জীবনযাত্রার মুখ সেদিকে—প্রত্যেকেরই কালচার বিকাশ-পথে। এই হল তাই কালচারের মূল কথাঃ কালচার সর্ব-ব্যাপক—তার বুনিয়াদ বাস্তবক্ষেত্রে জীবনযাত্রায়; সেই জীবনের তাগিদেই সে আচার-অনুষ্ঠান গড়ে, ভাঙে, বদলায়, সে মানবসম্পদও রচনা করে বর্জন করে, সৃষ্টি করে। অর্থাৎ কালচার সর্বব্যাপক (all comprehensive), গতিধর্মী (dynamic) এবং সৃষ্টিশীল (creative)।

'রিলিজিয়ন'-এর (যাকে 'ধর্ম' বলা ঠিক সঙ্গত নয়, তবু তা বলেই আমরা কাজ চালাব) প্রকৃতি কিন্তু ভিন্নরূপ। 'রিলিজিয়ন' অবশ্য কালচারের একাংশ। মানুষের জগৎ ও জীবনবোধ হল তার ইডিয়লজি। সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা মানুষের মনে জাগে, মোটামুটি তারই নাম হল 'রিলিজিয়ন'; খানিকটা তা তার ইডিয়লজির অন্তর্গত, খানিকটা আচারগত। এই উত্তরে থাকে তাই সমসাময়িক জগৎ ও জীবন-চেতনানুযায়ী তত্ত্বাংশ (জ্ঞানকাণ্ড creed, theology), থাকে সমসাময়িক শ্রেণী-সমাজের উপযোগী আচার-অনুষ্ঠান (কর্মকাণ্ড, rites, rituals) সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা (অর্থাৎ laws, socio-political ও personal) ইত্যাদি। এ-সবের সহায়ে সমাজের তখনকার মত বিকাশ সুস্থির ও সুচিন্তিত হয়, প্রায়ই তা দেখা যায়।

কিন্তু জগৎ ও জীবন-জিজ্ঞাসা কালে-কালে বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে বদলায় সৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণা। সভ্যতার এক স্তরে যা নিয়ে মানুষের প্রশ্নের ও বিস্ময়ের সীমা থাকে না, অন্য স্তরে পেঁৗছে দেখা গেল তা আর বিস্ময়ের নেই। একদিন জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যা জ্ঞান ছিল তাতে মনে করতাম—সূর্যই বুঝি স্রষ্টা, নদী বুঝি দেবী। আবার, পিতৃতান্ত্রিক কোনো কৌমসংঘে হয়তো সকলেই একসময়ে বুঝতেন—স্ত্রীলোক তুচ্ছ পদার্থ, পুরুষের একখানা হাড় দিয়ে সে গড়া; কিংবা, গাছ-লতার বুঝি প্রাণ নেই। সভ্যতার সেরূপ এক স্তরে তাই সূর্যবন্দনাই ধর্ম, নদীপূজাই ধর্ম। স্ত্রীলোকের যখন 'রুহ্' নেই তখন সে 'নাপাক' বলেই গণ্য। তেমনি কোনো স্তরে প্রাণী আঁকা বা রূপায়ণ করা যখন হারাম বলে গণ্য তখনো গাছ-লতা-পাতা আঁকাও ইসলামের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিষয়ে ধারণা বা 'রিলিজিয়ন' জীবনযাত্রার বা কালচারের এক-একটা স্তরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা; এমন কি, বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক ও মানবীয় পরিবেশের দ্বারাও প্রভাবিত। অবশ্য সভ্যতার সে স্তর উত্তীর্ণ হলে তার ইডিয়লজি বা জগৎ-ও-জীবনবোধও ক্রমশ বদলে যেতে বাধ্য—কালচারের তাই তাগিদ। কিন্তু 'রিলিজিয়ন' চায় সেই বিশেষ এক স্তরের জগৎ ও জীবনবোধকে চিরন্তন করে রাখতে। কালচারের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার রিলিজিয়ন নামক এই অংশের ঝোঁকটা হল কালচারেরই গতিকে অস্বীকার করে একটা বিশেষ জগৎ-ও জীবনবোধকে 'শাশ্বত', 'সনাতন', 'ধ্রুব সত্য' বলে আঁকড়ে থাকা। কোনো একটা অতীন্দ্রিয় বা অ-পার্থিব 'সত্যের' নামে রিলিজিয়ন তাই সমসাময়িক কালচারের ধারাকে চায় নিয়ম-কানুন (codification) দিয়ে বাঁধতে।

রিলিজিয়নের লক্ষ্য হল তাই সৃষ্টি নয়, স্থায়িত্ব (conservation), রিলিজিয়ন হল স্থিতি-ধর্মী (static)। রিলিজিয়ন এই উদ্দেশ্যে জগৎ-চিত্র তৈরী করে, নিয়মনীতি রচনা করে, 'কোড্' বানায়, সমাজকে সেই বনিয়াদে বেঁধে স্থাণু করতে চায়—যেন কিছুতেই মানুষ 'সনাতন সত্য' থেকে ভ্রষ্ট না হয়। কিন্তু কালচার তার এই প্রয়াসকে অস্বীকার করে এগিয়ে চলে। ফলে এক যুগের রিলি-জিয়ন পরবর্তী যুগের কালচারকে চায় বাধা দিতে, ঠেকিয়ে রাখতে। কিন্তু জীবিকা ও জীবন-যাত্রার তাগিদে জগৎ ও জীবন-চেতনা নতুন হয়, কালচার এগিয়ে চলে—খানিকটা হয়তো রিলিজিয়নকে পাশ কাটিয়ে যায়, ফাঁকি দিয়েও চলে। কিন্তু মোটের উপর সমাজ কোনো স্তরে স্থির হয়ে থাকে না। বরং রিলিজিয়নের পক্ষেই তার সেই বাঁধা কোড্, বাঁধা জগৎ-চিত্র, বাঁধা জীবনযাত্রা বদলাতে হয় বেশি। নানাভাবে জীবন্তকালের সঙ্গে তাল রেখে রিলিজিয়ন নিজের পুরনো কথাকে ব্যাখ্যার জোরে টিকিয়ে রাখতে চায়—এভাবেই হাদিস্ তৈরী হয়, এটাই স্মৃতিকারদের কাজ, এতেই তাদের বাহাদুরী—অচল কোড্কে ব্যাখ্যার জোরে টেনেবুনে চালিয়ে-বানিয়ে নেয়া। বিশেষ করে যে রিলিজিয়ন যত বেশি স্পষ্ট সে তত বেশিই কোড্-বাঁধা-জিনিস, তার সঙ্গে কালচারেরও তত বাধে দ্বন্দ্ব। তাই যে-ধর্ম আসলে রিলিজিয়ন নয়,—যেমন হিন্দুধর্ম, মূলত তা ভারতবিকশিত বিবিধ ধারার কালচারের একটা সম্মিলিত নাম—তার এদিকে স্থিতিস্থাপকতা বেশি। কিন্তু তবু তার মধ্যেও যে কতটা গতিবিমুখিতা আছে তা আমরা বেশ জানি।

যা তাই আমাদের স্মরণীয়, তা এই—রিলিজিয়ন ও কালচারের মধ্যে একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। রিলিজিয়ন অপরিবর্তনীয়, আর কালচার হল বিকাশশীল।

অতএব অস্বীকার করে লাভ নেই, রিলিজিয়ন দিয়ে কোনো কালচারের নামকরণ ঠিক বিজ্ঞান-সম্মত নয়।

আরবী কালচারের বিকাশ-ধারা

যে-অর্থেই কালচার কথাটির প্রয়োগ করি, একটা কথা আমরা দেখতে পাব যে, তা আর্থিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি বাস্তব পরিবেশের তাগিদে চিরদিনই পরিবর্তমান। আরব দেশের কথাই ধরা যাক। আরবের বিশেষ পরিবেশে ইসলামের উদ্ভব। সেই আরবী সংস্কৃতি ইসলামের প্রেরণায় অভূতপূর্ব বিকাশলাভ করে। শুধু আরবজাতির অভ্যুদয় দিয়েও যদি ইসলামের প্রাণশক্তির বিচার করা যায়, তা হলেও বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

হজরত মুহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীঃ) একশ' বৎসরের মধ্যে পূর্বে ও পশ্চিমে আরব-বিজয়ের ঢেউ যে-ভাবে সমস্ত রাজা, রাজ্য, সভ্যতাকে ভাসিয়ে দেয়, পৃথিবীতে তার তুলনা কম মিলে। নিশ্চয়ই ইসলাম সপ্তম শতাব্দীতে আরবী কৌমগুলোকে একত্র করে নতুন প্রেরণা দেয়, তার সংগঠন জোগায়, প্রগতির দুয়ার আরব-সমাজের পক্ষে উন্মুক্ত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে পারে—ইসলামেরও এই উৎপত্তির ও প্রসারেরও যথেষ্ট বাস্তব কারণ সেই সময়কার সেই সমাজের অবস্থাতেই ছিল। অবশ্যই ইসলামের একেশ্বরবাদের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব পড়েছিল আরবের হানিফদের, সেম-জাতীয় য়িহুদীধর্মের, আর তখনকার খৃষ্টধর্মেরও। কিন্তু ইসলামের বাস্তব পরিবেশও স্মরণীয়। স্মরণীয়—দক্ষিণ-আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও বিকাশ। তীর্থযাত্রীর ও বাণিজ্যের কেন্দ্র মক্কা ও মদিনার প্রভাব। নিকট-প্রাচ্যে গ্রীকো রোমক শাসনপদ্ধতির চরম দুর্বলতা ; সেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব ও অন্যান্য জাতির বিক্ষোভ (আরব-অভ্যুদয়ে তাই এক নিমিষে সেই সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে গেল) ইত্যাদি। তা ছাড়া, এই ইসলামের ক্রমরূপায়ণের পক্ষে শা'ম ও ফিলিস্তিনের সঙ্গে মক্কা-মদিনার বাণিজ্য-সম্পর্ক ; আরব কৌমদের (যেমন কোরেশদের) কৌমী নিয়ম-কানুন, স্বজনবাৎসল্য প্রভৃতিও হজরতের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। আর যুদ্ধবিগ্রহ যখন বাধল তখন উন্নত সামরিক বিদ্যা ও সংগঠন গ্রহণ করতে তিনি একটুও বিলম্ব করেননি—দুর্গ বা কেল্লা গঠন আরবেরাও সেই প্রথম তখন শুরু করে। চীন ও পারস্যের থেকে যুদ্ধে অশ্বারোহী সেনার প্রয়োজন বুঝে তিনি সওয়ার-বাহিনীর উন্নতি করলেন। আর সব থেকে বড় তাঁর দান হল—ইসলামির সংগঠনের জোরে তিনি এই দুর্ধর্ষ বেদুঈন দস্যুদের সুশৃঙ্খলিত ও সুগঠিত সৈন্যে পরিণত করতে পারলেন। অর্থাৎ ইসলাম আল্লার নিকট আত্মনিবেদন তাঁর প্রেরণা ছিল সঙ্গে সঙ্গে he kept his gunpowder dry। [দ্রষ্টব্য : The Material Bases of Islam. The Social Relations of Science—J. G. Crowther.] কিন্তু আমাদের এখানে যা লক্ষণীয় তা এই—এই যে ইসলামের বাস্তব ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ, আরব-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমেই যেমন বদলে যেতে লাগল তখনকার নতুন দীক্ষিত মুসলিম-সমাজেরও সেই পরিবর্তন মেনে নিতে হল, এমন কি ইসলামকেও তদনুযায়ী রীতি-নিয়ম ছেঁটে-কেটে নিতে হল। মরুভূমির বিজেতা আরবেরা শুধু য়িহুদী-খৃষ্টান ধর্ম নয়, নানা জাতির সম্পর্কে এল। গ্রীক-রোমক সভ্যতার সমৃদ্ধি ও সুলভ্য পৌর জীবন-যাত্রার সৌন্দর্য দেখতে পেল, শহুরে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজ পেল ; এসব শহর ও সভ্যতার মারফত পেল সেদিনের ইরানী ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতারও দান, এমন কি, পেল ভারতবর্ষেরও শিল্প ও বিজ্ঞানের খোঁজ। ফলে, মরুভূমির সংগ্রামী ইসলাম তত উগ্র রইল না, অনেকটা পরমতসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বিজিত-বৈভব হাতে পেয়ে আরব রাষ্ট্র নতুন পথঘাট, প্রাসাদ প্রস্তুত করতে লাগল ; নতুন বিজয়ের উপযোগী রাষ্ট্র ও শাসন-পদ্ধতিও (Polity) প্রণয়ন করে চলল। হাদিসের ব্যাখ্যায় ইসলামের এরূপ রূপায়ণ বা রূপান্তর

তখনই শুরু হয়ে গেছল—কালচারের তাগিদে রিলিজিয়ন নিজের নিয়ম-কানুনও তখনি সংশোধন করতে থাকে। তবু তো তখন পর্যন্ত (৬৬১ খ্রীঃ—৭৬১ খ্রীঃ) আরবজগতের কেন্দ্র ছিল দামস্কাস্।

৭৬২ থেকে মনসুরের আমলে যখন বোগদাদে আরবীয় রাজধানী স্থাপিত হল তখন তো আরবীয় সভ্যতায় আর-এক জীবন আরম্ভ হল। তখন শুরু হয় মুসলমানের বিজ্ঞান-বিজয়। তার অর্থ, ইসলাম-ধর্মাবলম্বী আরবদের-ই বিজ্ঞান-অনুশীলন। আব্বাসী আরবদের এই সভ্যতার নিকট পৃথিবী এত ঋণী, আর সে-ঋণ এতভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, আমরা সকলেই তা ইংরেজী লেখার মারফতেও কিছু কিছু জানি (যেমন, The Cambridge Medieval History Vol, II. Chaps. X1—XII ; The Legacy of Islam, ed. Sir Thomas Arnold, ও Alfred Guillaume ; এবং Amir Ali'র History of the Saracens প্রভৃতি)। তখন সেখানে য়িহুদী, মুশা, আল্লাহু, ইরানী জ্যোতির্বিদ্ নওবক্স্ ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ মামকা প্রভৃতি সাদরে সংবর্ধিত হন। রোজা-নমাজের নিয়ম রাখতে গিয়ে, চান্দ্র মাস ও সৌর বৎসরের মধ্যে খাপ খাওয়াতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও মানমন্দিরের প্রসার আরব-জগতে বাড়ে। রোগ-পীড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি-জমা, হিসাব-পত্র এ-সব নিতান্ত বাস্তব কারণেই তখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয়—উনানীর (হেকিমীর) ঔষধ, ভেষজ, পীড়া, নিদান, এমন কি, চক্ষু-বিজ্ঞানের পর্যন্ত চর্চা চলল। এলজেব্রা বা বীজগণিত প্রণীত হতে লাগল। জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি প্রভৃতির প্রসার হল। আলকেমি বা রসায়নের পরীক্ষা চলল (বিশেষ করে এ বিদ্যার পেছনে স্বর্ণের লোভ ও আয়ুর লোভ Transmutation ও Elixir ছিল বড় তাগিদ)। পূর্তবিদ্যায়, স্থাপত্যে, পুর-নির্মাণে সাম্রাজ্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং ঐশ্বর্য ব্যয়িত হতে লাগল। ভূগোল ও ইতিহাসের আদর হল। আর বিস্ময়কর উন্নতি হতে লাগল গণিতের (বোগদাদের প্রধান পণ্ডিত আবুল খোয়ারিজিমি ভারতবর্ষ পর্যন্ত ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন—ব্রহ্মগুপ্তের সময়ে ৮৩০ খ্রীঃ-র কাছাকাছি)। মুসলিম উত্তরাধিকারের বাঁটোয়ারার সমস্যা আর টাকাকড়ি, জমিজমার মাপজোখ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাবই ছিল গণিতচর্চার এক প্রধান ব্যবহারিক কারণ। 'অত্যন্ত কাজের কথা' তাদের ভাবতে হত যেমন, "৩০০ দরহম মূল্যের একটি বাঁদীকে একজন নিজের রোগশয্যায় দান করলে অন্যকে, আরো ১০০ দরহম সে বাঁদীর পণ। গ্রহীতার সঙ্গে বাঁদী সহবাস করে; পরে গ্রহীতার পীড়া হলে গ্রহীতা আবার বাঁদীকে দান করলে দাতার নিকটে। দাতাও তার সঙ্গে সহবাস করছে। কিন্তু এই বাঁদীর সঙ্গে কত দরহম তখন সেই দাতা ফিরে পাবে, কতটা ফিরে পাবে না?" গণিতের সূত্র কষে দেখা গেল —আরবী আইনে দাতা গ্রহীতাকে দেবে ১০২ দরহম, আর গ্রহীতা দাতাকে ২১ দরহম। [এ-রকম প্রয়োজনের স্বীকৃতি ভাস্করাচার্যের (১২শ খ্রীঃ) গণিতেও পাওয়া যায়। যেমন "দাসীর মূল্য ষোড়শ বর্ষেই সর্বাধিক"। তারপর তার বয়স যেমন বৃদ্ধি পায় তার মূল্য সেই অনুপাতে হ্রাস পায়। ষোড়শ বৎসরে তার মূল্য ছিল ২ বৎসরের ৮টি বলদ,—সঙ্গে সঙ্গে কষতে হয়েছে খাদ্য ও পারিশ্রমিকের হিসাব; জানা যায় তখন সুদ ছিল শতকরা ২ থেকে ৩।। গুণ হারে। এভাবেই আরব-সভ্যতায় ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, হুণ্ডি, চেক প্রভৃতি প্রচলিত হয়, যৌথ কারবার দেখা দেয়। এরূপেই আর্থিক প্রয়োজনে আরব-জগতে বিজ্ঞানানুশীলন এগিয়ে যায়।

রিলিজিয়ন হিসাবেও ইসলামের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অনেক রিলিজিয়নের মত এরূপ বিজ্ঞান-চর্চায়, বাস্তব জীবনের বিকাশে সমাজকে ইসলাম তখন বাধা দেয়নি। তবু ইসলামও বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী বিকাশের সহায়ক তখন হয়নি। আরবীয় কালচার তখনো সেই আরবীয় রিলিজিয়নের থেকে বাধাও পেয়েছে। ইসলামের 'তাবু' ছিল শরীর-ব্যবচ্ছেদে, প্রাণী-চিত্রাঙ্কনে বা মূর্তি-নির্মাণে। তাই শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞানের গবেষণা আরবসমাজে প্রায় হয়নি। আর চিত্রে, স্থাপত্যে আরব-জগৎ, দরিদ্র হয়ে রইল (ইরানী, তুর্কী, মুঘল শিল্পীরাই মাত্র তসবির ও পট আঁকতে সাহসী হন)। তা ছাড়া, আরব সাম্রাজ্য পূর্বেকার রোমের মত ক্রমেই ক্রীতদাসের উপর বনিয়াদ স্থাপন করলে, আর ক্রমেই 'সভ্য' আরবদের বিরাগ জন্মাতে লাগল কায়িক পরিশ্রমের উপর, হাতের কাজের উপর। অন্যদিকে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও সৃষ্টিতে উদ্যোগী পুরুষের সমাদর ও স্থান রইল না। এমন কি মোটের উপর এই

কথাটা সত্য যে, সভ্যতার ক্ষেত্রে আরবরা ছিল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী মাত্র—পূর্ব ও পশ্চিমের সভ্যতার তারা আড়তদারী করেছে, সৃষ্টি বেশি করেনি ; সেদিকে তাদের উদ্যোগ ছিল কম।

মুসলিম জগতে আরবী সভ্যতার প্রভাব

বোগদাদের এই আরব সভ্যতাও অবশ্য নিছক আরবী নয়—কোনো সভ্যতাই তেমন 'নিছক' কোনো জাতির নয় তা মনে রেখে বলতে পারি, আমরা এই বোগদাদী সভ্যতার ভাবনা-কল্পনার এক ছবি দেখতে পাই 'আরব্য উপন্যাস' থেকে। তা ছাড়া নানাদিকে দেখতে পাবি, বোগদাদের উপরে প্লেটো বা আফ্লাতুন ও গ্রীকো-রোমক জগৎ, ভারতীয় জগৎ, ইরান-ব্যাবিলনের দর্শন ও চিন্তার দান কেমন ভীড় করে আসছিল। মুসলিম আরব-সভ্যতাও যে 'খাণ্ড' ছিল না, তা এসব থেকে আমরা বুঝতে পারি।

প্রধানত এই আরবী কালচারই আরবী ভাষার মারফত নানা দেশের মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে—অবশ্য আরব কালচারের অন্য কেন্দ্র ছিল স্পেনে (কর্দোভা-গ্রানাডা), সীরিয়ায়, মিশরে, এবং পরবর্তীকালে নানা ছোট-বড় কেন্দ্রেও যে তার অন্যান্য রূপ বিকশিত হয়, তা আমরা জানি। এই কথাও আমরা বুঝি, ভারতবর্ষের মুসলমানরা এই 'নিছক' আরবী কালচারের উত্তরাধিকার পাননি, ইরানী ও তুর্কী জাতিদের হাতে কিছুটা ইরানী-তুরানী মিশ্রিত হয়ে সেই ইসলামী আরব-সভ্যতা মিশে তরঙ্গের পর তরঙ্গে নানা পরিবর্তিত রূপে ভারতবর্ষে এসেছিল। তারপর এ-দেশের বিবিধ ক্ষেত্রে তা বিবিধ স্থানীয় দানকেও গ্রহণ করেছে, আবার যুগে যুগেও পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় মুসলমানদের দরবারী কালচারের রূপটিও ছিল এরূপ আরবী-ইরানী-তুর্কী মিশ্রিত ভারতীয় রূপ—প্রধানত তা ফার্সি। আর তার লৌকিক রূপ ছিল আরো সহজ, এবং ভারতের প্রত্যেক ভাষা ও প্রদেশের ছাঁচে আরো বেশি ঢালা। তার একদিকে ছিল সুফী ও সাধকদের অধ্যাত্মপ্রভাব, অন্যদিকে জীবনের দশ আনা জুড়েই ছিল গতানুগতিক লোক-জীবনের আচার নিয়ম অনুষ্ঠানের চিরাগত ধারা—যাতে পিতৃপূজা হয়ে উঠে স্তূপ-পূজা, আর স্তূপ হয়ে থাকে পীরের দরগা ; যাতে সত্যপীর আর সত্যনারায়ণ মিলে যান ; কালুরায় ও দক্ষিণরায় পূজো পান ; মুসলমান এসে দেয় গাছতলায় তেল সিঁদুর, আর হিন্দু এসে নেয় মসজিদের জলপড়া ; ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেখানে লৌকিক হিন্দুধর্মে ও লৌকিক ইসলাম ধর্মে তফাৎ ছিল কতটুকু?

কিন্তু বহিরাগত মুসলমানের মারফৎ ভারতীয় সমাজ কি ভাবনায় বা বাস্তব সম্পদ লাভ করে, কিংবা এই বহিরাগত ইসলাম ধর্ম ভারতের প্রান্তে প্রান্তে কি নতুন নতুন রূপ গ্রহণ করল, এখানে তার বিশ্লেষণ বা বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। আমার বক্তব্য শুধু এই—সেই তথাকথিত 'মুসলিম কালচার' স্থান ও কালভেদে নানা দেশে নানারূপে বিকাশ পেয়েছে। আরব জাতিদের মধ্যেও তা পেয়েছে, ভারতীয় জাতিদের মধ্যেও পেয়েছে। আরব জাতিদের মধ্যেও বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে আরবী ভাষার বন্ধনে তাদের একটা সুদৃঢ় বন্ধন ছিল ; তাই মোটামুটি বোগদাদ, কাইরো কি সুদূর মরক্কো বা প্রাচীন স্পেনের কালচারকে একই আরবী কালচারের বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন স্তর বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলিম জগতের পশ্চিমভাগে মোটামুটি এই আরবীমণ্ডলের ছায়া এখনো অটুট আছে অনেকাংশেই আরবী ভাষার মূলবন্ধনে।

অবশ্য ইসলামের সূত্রে সেই আরবী কালচারের প্রভাব মুসলিম জগতের অন্যান্য দেশের মুসলমানদের উপরও পড়েছে—ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে লেগেছে আরবীয় সভ্যতার ছাপ। তবু বলা উচিত, মুসলিম-ইরানের কালচারই মুসলিম-জগতের মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণাংশে ব্যাপ্ত হয়—সেদিকটা তার ইরানীমণ্ডল। নিশ্চয়ই মুসলিম ইরানের কালচার আরবী কালচার থেকে স্বতন্ত্র—তা ফিরদৌসীর পাতা থেকেও বুঝতে পারা যায় ; ইরানমণ্ডলের চিত্রকলার ও ললিতকলার বিকাশ থেকেও উপলব্ধি

করা যায় ; আর 'সিয়া'মতবাদকে কেন্দ্র করে বা সুফীসাধনাকে আশ্রয় করে যে-ইরানী সভ্যতা গড়ে উঠে তার থেকেও আমরা বেশ প্রত্যক্ষ করতে পারি। সমস্ত মধ্য-প্রাচ্যের তুর্কিস্তানে তুর্কিজাতিক পাঠান-মুঘলদের মধ্যে এই ইরানী ভাষার ও ইরানী কালচারের প্রসারই মধ্যযুগে বাড়ে, তুর্ক আজার-বাইজানের নিজামী এই ভাষাতেই লেখেন তাঁর কাব্য। এই মধ্যপ্রাচ্যকে সে-যুগের কালচারের ইরানী-মণ্ডল বললেও তাই অন্যায় হবে না। কিন্তু আরবী ও ইরানী এই দুই মণ্ডলেরই অনেকাংশে বাইরে তবু যবদ্বীপের, মালয়ের, চীনের মুসলমান-জীবন, তাও স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, ইস্তাম্বুলকে কেন্দ্র করে তুর্কীরা আরবী-ছোপানো ইরানী-প্রভাবিত কালচার নিয়ে বহু বৎসরের মত ঘোরপাক খায়। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগে সেই আরবী-ইরানী কালচারের উত্তরাধিকার গিয়ে পড়েছিল 'রুমের' এই তুর্কভাষী ওস্মান-আলী খলিফাদের হাতে। এই ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন-ভাষাভাষীদের মধ্যে মধ্যযুগীয় আর্থিক-মানসিক গণ্ডীতে আবদ্ধ সে কালচার স্বভাবতই আধুনিক সভ্যতার সম্মুখে ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এল। যা-কিছু তার বিকাশ একালে ঘটে, প্রধানত তা ঘটে আরবীভাষী জগতে—মিশরে এবং আংশিকভাবে সীরিয়ায়। আরবী-ইরানীর বিকাশ ঘটে ইরানে, তুর্কিস্তানে, এমন কি ভারতেও মুঘলযুগে।

আধুনিক মুসলিম সংস্কৃতি

মধ্যযুগ পর্যন্ত সমাজে রিলিজিয়নের প্রাধান্য থাকে। মধ্যযুগ শেষ হয় জাতীয় চেতনা জাগলে। তখন ধর্মগত কালচার ছেড়ে জাতিগত কালচারেরই বিকাশ আরম্ভ হয়। অথচ তুর্কীতে তুর্কের স্বকীয় কালচার এই ধর্মগত কালচারের আওতায়,—সেই ভাব-সংকটে,—তুর্ক জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তুর্করা সৃষ্টি করতে বিশেষ পারেনি—ইসলামের মাধ্যমে তৈরি আরবী-ইরানী ভাব-নিগড়ে তাদের মন তখনো নিবদ্ধ। মধ্যযুগের সেই 'মুসলিম কালচারের' সেই মোহপাশ কাটিয়ে কামালের নতুন তুর্কী আধুনিককালের উপযোগী তুর্ক-কালচারের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে আজ চেষ্টা করছে। আধুনিক-কালের এই স্তরে প্রায় প্রত্যেক মুসলিম জাতিই তার স্ব স্ব জাতিগত কালচারের বনিয়াদ নতুন করে স্থাপিত করছে—মিশর-মরক্কো থেকে ইরান পর্যন্ত এটাই ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মুসলিম-জগতের মুসলিম কালচারের সবচেয়ে বড় লক্ষণ—সচেতনভাবে জাতির বনিয়াদে আরবী-ইরানী-তুরানী প্রভৃতি জাতির নিজ নিজ নতুন সংস্কৃতি সংগঠনের প্রয়াস।

সে লক্ষণ বেশি প্রস্ফুট হতে পেরেছে মধ্য-এশিয়ার তুর্ক ও ফারসীভাষী জাতিদের সোভিয়েট বিপ্লবের ফলে স্বাধীনতালাভে, আত্মপ্রতিষ্ঠায়। তাতার-উজবেক-কাজাক, আজারবাইজানী এমন কি তাজিক, তুর্কমেন, কিরঘিজ, দাগিস্তানী প্রভৃতি মুসলমান জাতিরা নিজেদের ভাষার মারফত নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের তখন সুযোগ লাভ করলে ; আর নিজ নিজ জাতীয় সংস্কৃতি তারা গড়তে পারলে আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের বনিয়াদের উপরে, বিজ্ঞানসম্মত সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়। 'মুসলিম কালচারের' সবচেয়ে সম্ভাবনাময় নির্দেশ ও সত্যকার সাক্ষ্য মুসলিম জগৎ দেখতে পায় আজ সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার এসব মুসলমান জাতির জীবন ও এদের বিকাশের ধারা থেকে—সে ইঙ্গিত যে মুসলিম জাতিদের চক্ষে বৃথা হয়নি তারই প্রমাণ দেখছি ইরানের আজরবাইজানী ও মধ্যপ্রাচ্যের কুর্দিস্তানের কুর্দদের বর্তমান জাগরণ থেকে।

রিলিজিয়ন ও কালচারের মূলগত সম্পর্ক ও বিরোধ, মধ্যযুগের বিভিন্ন মুসলিম কেন্দ্রের বিভিন্ন কালচারের সাক্ষ্য, এবং মুসলিম জাতিসমূহের এই বর্তমান গতি-লক্ষণ, এসব দেখে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারি ভারতবর্ষেও বাঙালী মুসলমানের তাহলে নিজস্ব কালচার কি,—তা আরবীর কালচারও নয়, উর্দু কালচারও নয়। তা এই বাঙলা কালচার—তার মধ্যদিয়েই বাঙালী মুসলমান আপনাকে বিকাশ করতে পারবেন, আর তাকে বিকশিত করে তোলা তাঁরও দায়িত্ব—যেমন দায়িত্ব তা বাঙালী হিন্দুরও।

যে কারণে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম-দেশের সামাজিক অগ্রগতির দৃষ্টান্ত ভারতীয় মুসলমান-

বন্ধুদের উদ্বুদ্ধ করলেও এ-দেশে তাঁদের কর্মে সে সামাজিক বিপ্লবী শিক্ষা প্রযোজ্য হয়ে ওঠে না, আমি তা বিস্মৃত হইনি। কারণ, ইরানে, তুর্কিস্তানে, মিশরে মুসলিম-ধর্মীরাই প্রায় শতকরা পঁচানব্বই জন; কিন্তু ভারতবর্ষে সাত শত বৎসরেও ইসলাম হিন্দুধর্মীদের সংখ্যা বা প্রভাব খর্ব করতে পারেনি। এখানকার মুসলমান বন্ধুরা সেই আশংকার বশেই,—"ফিয়ার কমপ্লেক্স"-এর প্রভাবে, হিন্দুদের আর্থিক মানসিক প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়ে—ইসলাম বা 'মুসলিম কালচারের' উপর অতটা জোর দেন—নিতান্ত আত্মরক্ষার দায়ে, আশঙ্কার বশে। এজন্যই তাঁদের সংস্কৃতি-সংকট আরো জটিল হয়ে উঠেছে। তাঁরা একই-কালে মধ্যযুগের আরবীয়-সভ্যতাকে গ্রহণ করতে চান, ইরানী-সভ্যতাকেও গ্রহণ করতে চান, ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে মুসলমান শাসনে ভারত-সভ্যতা যে বিভিন্ন বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে তাও গ্রহণ করতে চান—আবার সেই সময়েই গ্রহণ করতে চান ইউরোপের বুর্জোয়া জ্ঞানবিজ্ঞান। কিন্তু এ-কথাই বা তাঁরা অস্বীকার করবেন কি করে যে, বাঙালী-মুসলমান বাঙালীর কালচারেরই উত্তরাধিকারী, তারই ধারক, তারই বাহক—তারই স্রষ্টা সে ছিল কালেও, থাকবে আগামীকালেও।

মুসলমান বাঙালীর কালচার

সাতশ' বৎসর হলে ইসলাম ধর্ম বাঙলাদেশে এসেছে। তখন থেকেই বাঙলার ইতিহাসে মধ্যযুগ শুরু হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, বিজয়ীর ধর্ম হিসাবে এলেও বিজয়ী বিদেশীরা সংখ্যায় নিশ্চয় মুষ্টিমেয় ছিলেন। আসলে বাঙালী মুসলমান বাঙলাদেশেরই মানুষ; যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাদের সন্তানসন্ততি। নানা কারণেই বাঙালী জনসাধারণের এক বৃহদংশ এ ধর্ম প্রথমাবধি গ্রহণ করেন। সেসব কারণের কিছু কিছু প্রমাণ আমরা পাই পুরনো পুঁথিপত্র থেকে, যেমন, শূন্য-পুরাণে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'। মোটামুটি বুঝতে পারি—বিজেতার ধর্মের স্বাভাবিক মর্যাদা দরিদ্রদের আকৃষ্ট করেছে; তখনকার হিন্দু অভিজাতদের আধিপত্য ও হিন্দু সমাজের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র নিপীড়িতরা এই রাজধর্ম গ্রহণ করে মুক্তিপথ খুঁজেছেন। বিশেষত, ধর্ম হিসাবে ইসলাম সাম্যের পক্ষপাতী, অন্যদিকে হিন্দুধর্ম বৈষম্য ও অধিকারভেদের উপর গঠিত। কিন্তু তখনকার হিন্দু সামন্ত অভিজাতরা কিছু কিছু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকবেন। তার প্রমাণও আছে। ইসলাম তখন রাজধর্ম—জায়গীরদার, আমীর ওমরাহের ধর্ম; মুসলমান অভিজাতদের সঙ্গে অভিজাতদের হিন্দু শ্রেণীগত মিল ও এ ক্রমেই তাদের পরস্পরের নিকট করে তোলে; ধর্মগত ভেদ এই উভয় জাতির অভিজাতদেরপরস্পরের নিকট মোটেই দুস্তর মনে হয়নি।

মধ্যযুগের বাঙালী শ্রেণী-বিন্যাস

ইসলাম সেদিন মুসলমান মাত্রকেই কতকগুলো খাওয়া-পরার আচার বিচারের কড়াকড়ি (টোটেম, তাবু) থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং ধর্মের খাস জমায়েতে সকল মুসলমানকে সমতা দিয়েছে। "সব্বই জুঠ জবেই খাই" ('কীর্তিলতা') দেখে বিদ্যাপতি নিশ্চয় ঘৃণা বোধ করেন। "এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়" এ দৃশ্য দেখতে দেখতে বোধ হয় রূপরাম (১৭শ শতকে) একটু হিংসাই করতেন। কিন্তু ইসলাম সুলতান, জায়গীরদার, আমীর ওমরাহের ধর্ম, যতই ধর্মক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানকে সমান দেখুক, বৈষয়িক ব্যাপারে দরিদ্র মুসলমানদের রক্ষার বিশেষ উপায় তা করেনি। তাই জীবনযাত্রায় মুসলমান নিম্নশ্রেণী হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মতই নিচের তলায় পড়ে থাকত, মুসলমান অভিজাত যেমন থাকত হিন্দু অভিজাতেরও একধাপ বেশি উপরতলায়।

আর-একটা কথাও বোধ হয় সত্য। বাঙালী মুসলমান সমাজে একদিকে ছিল এই সামন্ত অভিজাতরা, অন্যদিকে ছিল এই সাধারণ মুসলমানরা। এদের মধ্যখানে মধ্যবিত্ত মুসলমান বোধ হয় বেশি বিস্তারলাভ করতে পারেনি। হয়ত হিন্দু সমাজের মধ্যে সে তুলনায় মধ্যবিত্তের সংখ্যা ও প্রভাব সে যুগেও বেশি ছিল। কারণ, মুসলিম কোনো কারণে (যেমন রাজকার্যের, বিচার, দপ্তর, ফৌজের ছোট আমলা হয়ে, ব্যবসাসূত্রে) মধ্যবিত্তের কোঠায় উঠলে সহজেই অভিজাতের পদবীতেও উঠে যেতে পারত। হিন্দু ছোট কর্মচারী বা বৃত্তিধারীরা (দোকানী, পশারী ও কবিরাজ, পণ্ডিত, ছোট মুন্সি, কেরানী 'কায়স্থ' প্রভৃতি) অত সহজে সে পর্যায়ে উঠতে পারত না। দ্বিতীয়ত, মুসলমান উত্তরাধিকার আইন ও অনেকাংশে মুসলমানী জীবনযাত্রা পদ্ধতি, আয়েসি মনোভাব ও অভ্যাস সহজেই অবস্থাপন্ন মুসলমান মধ্যবিত্তকে টেনে নিচে নামিয়ে আনত। এই মধ্যবিত্ত মুসলমান যাঁরা থাকতেন, তাঁরাও ফার্সী চর্চা করতেন। তাই মধ্যবিত্ত মুসলমানের অভাবেই (মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র, ঘনরাম থেকে কাশীরাম দাস পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে যাদের দেখতে পাই) বাঙালী মুসলমানের মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতিতেও প্রাধান্য লাভ না করার একটি বড় কারণ।

আসল কথা বাঙালী মুসলমান সমাজেরও মোটামুটি রূপটি ছিল এরূপ—প্রধানত অভিজাত ও জনগণ, শাসক ও শাসিত নিয়েই সে সমাজ। মধ্যযুগের সকল শাসিতের মত মুসলমান জনগণেরও অত্যাচার সইতেই হত। উপরতলার শাসকরা তো ছিলেনই, এমন কি, তাঁদের অনুচর ও সহচররাও ছিল। যেমন দেখি, তুরুক সওয়ার "চলল হাট ভমি ফের মাঙ্গই" ('কীর্তিলতা')—হাটে এসে ঘুরে ঘুরে তোলা তোলে; দরবেশরা 'দোয়া' জানায়, তার বদলে ভেট না পেলেই গাল দিয়ে যায় ('কীর্তিলতা'), ইত্যাদি।

বাঙালী জীবনযাত্রায় মুসলমানের স্থান

সমাজের আর্থিক কাঠামো তখন এরূপ। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে উৎপাদক হিসাবে শ্রমসাধ্য অনেক কাজেই তখনো সম্ভবত এই মুসলমান জনগণ অগ্রগণ্য ছিলেন। পূর্ববর্তী হিন্দুযুগেও হিন্দু নিম্নবর্ণ বা বৌদ্ধ নিম্নবর্ণ হিসাবে তাঁরাই সমাজের এ ভার বইতেন, মুসলমান আমলেও তাঁরাই সে ভার বহন করতেন। বরং মুসলমানরা কোনো কোনো নতুন কারিগরী কাজ যা প্রচলিত করেন (যেমন দর্জির? সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের?) তাতে এই পরিশ্রমী সাধারণ মুসলমানই (জোলা, রাজমিস্ত্রী, খালাসী, সূচী-শিল্পী ইত্যাদি) নিজেদের শ্রম ও দক্ষতার পরিচয় দিতেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, অনেক শিল্প ও কারুকার্য আবার হিন্দু (যেমন তাঁতী, কামার, মিস্ত্রী, কাঁসারি, শাঁখারি ইত্যাদি) কারিগরদেরই একচেটিয়া থেকে যায়।

তবু বাস্তব ধনসৃষ্টির ক্ষেত্রে, কৃষি ও কারুশিল্পে, শ্রমসাধ্য কর্মে মুসলমান জনগণ এখন বাঙলার জীবনে মুখ্যস্থান জুড়ে আছেন। মধ্যযুগেও সম্ভবত শ্রমসাধ্য কারুশিল্পে তাঁরা প্রধান ছিলেন। কিন্তু মানস-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সাহিত্য ও চারুশিল্পে বাঙালী হিন্দু যতটা প্রাধান্য অর্জন করেন বাঙালী মুসলমান মধ্যযুগেও ততটা প্রাধান্য অর্জন করতে পারেননি, এরূপেই মনে হয়। তার কারণ, তখনকার দিনে মুসলমান জ্ঞানী ও গুণীরা আরবী-ফার্সিরই বেশি চর্চা করতেন। আরবীর থেকেও ফার্সিরই চর্চা বেশি হত; বিশেষ করে ফার্সির মারফতই তাঁরা রসিক সমাজে নিজেদের পরিচয় দিতে চাইতেন। কিন্তু এ-কথা গুণী ও 'দানেশমন্দ' এবং অভিজাত মুসলমানদের সম্বন্ধেই সত্য। পরবর্তী সময়ে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাও ফার্সি চর্চা করতেন, যেমন মালাধর বসু, রূপ সনাতন। তবু তাঁরা যেমন বাঙলা লিখতেন তেমনি আলাওল, দৌলত কাজী প্রভৃতিও বাঙলা লিখেছেন,—তাও স্মরণীয়। তখন জানি ব্রাহ্মণেও দাড়ি রাখছে, ফারসী পড়ছে, মোজা পায় দেয়, কামান ধরে, কেউ বা মসনবিও আবৃত্তি করে (জয়ানন্দ)। অর্থাৎ অভিজাতদের জীবনযাত্রা যেমন আসলে একই ধরনের হয়ে ওঠে, শাসিত ও শোষিতের জীবনযাত্রাও তেমনি আবার একই পল্লীসভ্যতায়, কৃষি-জীবনের কারু-কর্মে ব্যবসায়ে আসলে একই ধরনের হয়ে উঠত। নিশ্চয়ই পীর, কাজী, মওলবী, দরবেশদের চেষ্টায় এরূপ সাধারণ মুসলমানও ইসলামের মূলতত্ত্বে খানিকটা অধিগত হতেন; তাঁরা ক্রমেই বেশি করে সে তত্ত্ব অবগতও হচ্ছিলেন। অবশ্য শিক্ষাদীক্ষায় ইসলামের যে ভাষ্য তারা বেশি পেত—হানিফী সুন্নী হলেও, সে ভাষ্য হচ্ছে ইরানী বা ফার্সি-ইসলামের ভাষ্য। কিন্তু জীবনযাত্রায়, আগেকার পার্বণের, উৎসবের অনুষ্ঠানের মায়া তাঁরা একেবারে কাটাতে পারেননি; এমন কি মুসলমান অভি-জাতরাও তা খানিকটা মানতেন। 'আদর্শ' মুসলমান গ্রামের চিত্র মুকুন্দরাম অঙ্কিত করেছেন, কিন্তু সে হচ্ছে আদর্শ হিন্দু গ্রামের মতই 'আদর্শ'। কারণ, সাধারণ মুসলমান 'অনুদিন কোরান পড়ত' না, সকলেই 'বড়ই দানেশমন্দ' যে ছিল তাও না, তা বলাই বাহুল্য। তাঁরাও সাধারণ হিন্দুর মত ছিলেন নিরক্ষর, অত্যাচারিত; গাইতেন জারি, সারি, ভাসান, কীর্তন প্রভৃতি।

মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতি

মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির মোট রূপটা এখন লক্ষ্য করি। প্রথম কথা, তখনকার বাঙালী সমাজ ছিল কৃষিজীবী, পল্লীসমাজ,—ভারতবর্ষের একটি প্রাদেশিক 'কৃষ্টির' অধিকারীমাত্র। (১) স্থাপত্যে তার দান গৌড়-পাণ্ডুয়ার পরে আর মুসলমান রাজশক্তিও বেশি রেখে যাননি। (২) ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় মুসলমানী যুগে ইসলামের প্রতিকূলতায় স্বভাবতই রূপ-অনুশীলনে মন্দা দেখা যায়। (৩) সঙ্গীতে-নৃত্যেও (এক বিষ্ণুপুরে ছাড়া) বাঙলায় কোনো বৃহৎ কিছু গড়ে ওঠেনি। ইসলামের প্রভাব এদিকে বাঙালী সঙ্গীত ও বাঙালী নৃত্যকলার পক্ষে বাধাই হয়ে থাকত—যদিও লোক-সঙ্গীত ও লোক-নৃত্য লোকসমাজে চলছিল; কীর্তন বৈষ্ণব সমাজে প্রসারলাভ করছিল। (৪) বাঙলা সাহিত্যেই আসলে মধ্যযুগের বাঙালী মানসসৃষ্টির বেশি পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে দেখি যে, এ-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশি পার্থক্য নেই। সাধারণত এই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দুরাই অগ্রণী। কিন্তু লোকসাহিত্যে মুসলমানেরা প্রধান, আর আউল-বাউলের অধ্যাত্ম সঙ্গীতেও তাঁদের দান প্রচুর। (৫) জ্ঞান-বিজ্ঞানে অন্য চর্চায় বাঙালী জাত তখনো মুখ্য কিছু করেনি—হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃতের মারফত ন্যায়ের চর্চা হত, স্মৃতির তর্ক হত, জ্যোতিষ-ব্যাকরণও ছিল। মুসলমানদের মধ্যেও আরবী-ফারসীর মারফত কোরান, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, তাদের দর্শন, তাদের ইতিহাস, এ সবের চর্চা হত। কিন্তু ফার্সি সভ্যতার ঐতিহ্য নিয়েই যা কিছু চর্চা হত, আরব সভ্যতার সেই বিজ্ঞানানুশীলনের ঐতিহ্য কিংবা ভূগোলের, ইতিহাসের জ্ঞানসংগ্রহের চেষ্টা বাঙলাদেশে তখন কতটা বা কোথায় ছিল

মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলমানের দান

মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধানতম সৃষ্টি পাই সে-যুগের বাংলা সাহিত্যে। তার প্রধান ক্ষেত্র ছিল তিনটি: (১) স্বভাবতই দরবারে ফার্সিনবিশ ও ফার্সি কলাকৌশল ফার্সি-জানা গুণিজনদের আদরণীয় হত। দরবারেও এ সবেরই ছিল প্রসার। কিন্তু মুসলমান দরবারী কেন্দ্র থেকে বাঙলা অনেক দূর; দিল্লী, জৌনপুরের হাওয়াও এখানে অনেক দেরিতে পৌঁছত। বাঙলার সুলতান আমীর ওমরাহদেরও তাই বাঙালী বনে যেতে হত। তাই গৌড়ের দরবারে, রোসাঙ্গের রাজসভায়, লস্কর পরাগল খাঁর বৈঠকে মুসলমান শাসকও এ দেশের মহাভারত, রামায়ণ ও নানা পুরাণ ইতিহাসের চর্চায় উৎসাহ দিতেন। হিন্দু গুণীরা তাতে যোগ দিলেন, মুসলমান গুণীরাও তা উপেক্ষা করলেন না। অবশ্য দু-এক জনেই তেমন গুণী ও দরবারী লোক বাঙলা ভাষারও এরূপ চর্চা করেছেন, যেমন দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, মোহম্মদ খান ইত্যাদি। তাঁদের কল্পনা ফার্সি জিন-পরীদেরও ক্রমে ক্রমে এ দেশের দেবদেবীর মত স্বচ্ছন্দ করে তুলল। এঁরা বাঙলা সাহিত্যের নমস্য লোক। এঁদের কাব্য মধ্যযুগের কাব্যের সুরে বাঁধা—হিন্দু বা মুসলমানী বলে বিশেষ আখ্যা সে মধ্যযুগের কাব্যকে দেয়া নিরর্থক। তেমনি এই দরবারী সাহিত্যসেবীদের ছাড়াও নানা অদ্ভুত বীরত্ব ও রোমান্সকে কেন্দ্র করে চলে পুঁথি-সাহিত্য। ক্রমশই তাও বড় হয়েছে। (২) দ্বিতীয়ত, কবিসাধকদেরও সৃষ্ট একটা কাব্যধারা ছিল। তাঁরা সুফীবাদ থেকে প্রেরণা নিচ্ছিলেন। আরবী-ফারসী-সুফী কবিতার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকার কথা। আবার অনেকের যে এ-দেশীয় রহস্যবাদের (শৈব ও বৈষ্ণবতন্ত্র সহজিয়া) ও যোগরহস্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল তাও স্পষ্ট। যেমন, সৈয়দ মুর্তজা, আলীরাজা প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে পারি—মধ্যযুগেই ইউরোপ-এশিয়ার বহু দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষরা পৃথিবীর অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে স্বভাবতই এই আধ্যাত্মিক পথে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সন্ধান করতেন। সেদিনের বাস্তব দুঃখের বিরুদ্ধে এই ছিল মানব-চিত্তের একমাত্র পরিচিত ও স্বাভাবিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথ। খৃষ্টান মিষ্টিক, মুসলমান সুফী আর ভারতের নানক, কবীর থেকে বৈষ্ণব আউল, বাউল দরবেশ প্রভৃতি সকলে আসলে সমস্ত মধ্যযুগের ভেতরকার বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ। এঁরা প্রত্যেক 'অর্থোডক্স্' রিলিজিয়ন-এরই বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী—আধ্যাত্মিকতার কারণেই। সুফী-বাদ সেই ইসলাম-বিদ্রোহী মানুষেরই দান। তাঁদের এই ইরানী-হিন্দী ধারা এসে মেশে এ-দেশের পুরনো সহজিয়া (বৌদ্ধ, শাক্ত ও বৈষ্ণব) ঐতিহ্যের সঙ্গে। বাঙলার মধ্যযুগের কবিতায় একটি প্রধান দানই এঁদের—আর এঁদেরও অনেকেই মুসলমান, লালন শাহ থেকে মদন বাউল পর্যন্ত। মধ্যযুগের এই কবি-সাধকদের ধারায়ও হিন্দু-মুসলমান ভেদ করতে যাওয়া অসম্ভব। (৩) এ ছাড়াও বাঙলা সাহিত্যের একটি ক্ষেত্র ছিল লৌকিক গান, কবিতা, ছড়া। বলা বাহুল্য, এই হিন্দু-মুসলমান জনগণ লৌকিক জীবনযাত্রায় এতই অভিন্ন ছিলেন যে, এসব ব্যালাড, বা সারি, জারি, ভাটিয়ালী প্রভৃতি রচনার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান বলে কোনো তফাৎ করা যায় না। বরং যতদূর মনে হয়—জন-সাধারণ যখন প্রধানত মুসলমানই ছিলেন (হঠাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙলায় মুসলমান সংখ্যায় বেড়ে যায়নি নিশ্চয়ই) তখন এই লোক-কাব্য, লোক-সঙ্গীত ও লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তাঁদেরই হাত থাকত বেশি—এখনো তাই আছে অনেকখানে, অনেক দিকে।

মধ্যযুগের ত্রিধারা

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি হিন্দু মুসলমানের দানে মোটামুটি যে রূপ গ্রহণ করে-ছিল এবার তা স্মরণ করতে পারি : (১) হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সৃষ্টিতে বাঙলী সংস্কৃতি গঠিত, বিকশিত ; মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধানাংশ তাই যৌথ সৃষ্টি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এরই দু'টি গৌণ ধারাও আছে ; (২) যেমন, একদিকে "মুসলিম ঐতিহ্যের" ধারা। কোরান ও হাদিস নিয়ে এবং আরবী-ইরানী-তুরানী প্রভৃতি মিশ্রিত ধর্মকাহিনী নিয়ে এই ঐতিহ্য। তবে বিশেষ করে ইসলাম, শরিয়ৎ তার আচার-বিচার সম্পর্কিত কথাই তাতে প্রধান। (৩) আবার যৌথ সংস্কৃতির অন্যপার্শ্বে তেমনি ছিল "হিন্দু ঐতিহ্যের ধারা"ও। হিন্দু দর্শন, পুরাণ, আচার-বিচার প্রভৃতি নিয়ে এই ঐতিহ্য গঠিত। কিন্তু প্রধান কথা এই : মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান ও প্রশস্ত কোঠাটি সমস্ত বাঙালীর যৌথ সৃষ্টি ; তার বনিয়াদ সমস্ত বাঙালী জনতার যৌথ-জীবন।

বাঙলার এই মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেল ইংরেজ-বিজয়ে ; সঙ্গে সঙ্গে এই বাঙালী সংস্কৃতিরও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই যৌথ-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার যা, তা অবজ্ঞাত হল ; বৃদ্ধি পেল আপাতদৃষ্টিতে শুধুমাত্র হিন্দু ঐতিহ্যের সংকীর্ণ ধারা। আসলে বিচার করলে দেখব, তাও সত্যই বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু তার পূর্বে বুঝা দরকার—ইংরেজ-বিজয়ে ও ইংরেজ-শাসনের সময়ে বাঙলার সমাজযাত্রায় কি পরিবর্তন ঘটল। তা'ই আধুনিক বাঙালী কালচারের জন্ম-বিচার। এখানে সংক্ষেপে তার জন্মপত্রিকার চিত্রটুকু দিলেই যথেষ্ট হবে।

ইংরেজ শাসন ও মুসলমান বিক্ষোভ

প্রথমত, নবাবী আমল যখন শেষ হয়ে গেল তখন মুসলমান-মাত্রই আহত হয়েছেন ও ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পোষণ করেছেন। সে-ক্ষোভের বৈষয়িক কারণও ছিল ; নবাবী আমলের সঙ্গে সঙ্গে

মুসলমান অভিজাতের এক বৃহদংশের সৌভাগ্য শেষ হল ; মুসলমান কাজী-মোল্লা প্রভৃতি ধর্ম-নেতাদেরও প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুন্ন হল। ১৭৯৩ সালে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সুস্থির হল তখন পুরনো মুসলমান অভিজাত প্রায় দেউলে হয়ে গেল। হিন্দু দেওয়ান-মুন্সীরা তখন নতুন জমিদার হয়ে বসলেন। ১৮৩৩ (?) সালে আয়মা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ঐতিহ্যের ভার বহন করবার মত বৈষয়িক বনিয়াদ আর মুসলমান সমাজের রইল না। ভাগ্যবানদের এই ভাগ্য-বিপর্যয়ে মুসলমান জনগণও এই সব কারণে ক্ষুব্ধ হল। অবশ্য মধ্যযুগের জমিদার-জায়গীরদারের হাতে বিশেষ কোনো সুবিধাই তারা পায়নি ; তবু নবাবী আমলকে তারা কোম্পানির আমলের থেকে নিজেদের বেশি আপনার বলে ভাবতে লাগল। যতই কোম্পানির শোষণ বাড়ল—আর 'নবাবী আমল' অতীত হয়ে গেল—আর ইংরেজের কৃপায় হিন্দুর সৌভাগ্য বাড়ল, ততই এই নবাবী আমলের সম্বন্ধে মোহ তাদের বৃদ্ধি পেল। অর্থাৎ ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল সমস্ত বাঙালী মুসলমান সমাজেই পরিব্যাপ্ত।

অপরপক্ষে হিন্দু অভিজাত বা নবাবের ফার্সিনবিশ হিন্দু আমলা মুন্সীরা ইংরেজ আমলে ততটা ক্ষুব্ধ হল না ; তারা ইংরেজকেও পাঠান-মোগলের মতই মেনে নিলে। ইংরেজ বণিকের দেওয়ান মুন্সি হিসাবে সৌভাগ্যলাভ করে, পরে তার তৈরি জমিদার হয়ে, তারা বরং ইংরেজ আমলের ভক্তই হল। হিন্দু মধ্যবিত্ত তাই এ সময়ে বৈষয়িক কারণেই ইংরেজি শিখতে গেল ; শিখতে গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি ও ইংরেজের শক্তিরও মূল কারণ বুঝতে পারল। তখন উনবিংশ শতকে ইংরেজের ভাষা ও জীবনকে আশ্রয় করে বুর্জোয়া সভ্যতা দ্রুতগতিতে মধ্যাহ্নদীপ্তিতে বিকশিত হচ্ছে—কী আশ্চর্য তার তেজ, দীপ্তি, মহিমা ! বাঙালী হিন্দু এই ইংরেজ শাসন ও শিক্ষার মধ্যদিয়ে মানব-সভ্যতার সৌন্দর্য ও শক্তিরও সন্ধানলাভ করলে। এক নতুন শক্তি, নতুন কল্পনায় সে উদ্বুদ্ধ হল, মাতাল হয়ে উঠল। উনিশ শতকের বাঙালী জীবন তার এই নতুন জাগরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী তখন শুধু ইংরেজের চাকরি ও ইংরেজের জমিদারি পেয়েই খুশি রইল না—নতুন কিছু সৃষ্টি করতে কোমর বেঁধে লাগল।

উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমান

কিন্তু উনিশ শতকের মুসলমান বাঙালীর অবস্থা কি ? একমাত্র ওদিকে শেষদিকে নবাব আবদুল লতিফের নাম চোখে পড়ে। তার পূর্বে কি হয়েছিল তা জানতে হলে জানতে হবে হাণ্টারের "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্" থেকে ; আর বুঝতে হবে বিংশ শতকের বাঙালী মুসলমান সমাজের অবস্থার দিকে তাকিয়ে। সেই যে মুসলমান সমাজ রাজ্য হারিয়ে আহত ক্ষুব্ধ হয়ে রইল তারপরে সে হল বিদ্রোহী—শুধু বিধর্মীর শাসনের বিরুদ্ধে না, সমস্ত পরধর্মের বিরুদ্ধেও শুধু নয়—একেবারে কাল-ধর্মের বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহী হল। পরাজিত মুসলমান নেতারা ভাবলেন, পরাজয়ের কারণ—তাঁরা সত্যকার ইসলামকে জীবনে যথার্থভাবে রূপ দেননি, তাই তাঁদের পতন ঘটেছে। অতএব, বিশুদ্ধ ইসলাম, বিশেষ করে, ওহাবি পিউরিটানিক মতবাদ হল তাঁদের তখনকার জীবনের আদর্শ। এই দৃষ্টিতে দেখলে শুধু প্রথম দিক্‌কার উম্‌মাইয়া আরবদের ইসলামই ইসলাম। অন্য সব হচ্ছে ভ্রষ্টাচার। বিশেষ করে ফার্সি সংস্কৃতির মারফত পাওয়া ইসলাম অগ্রাহ্য। ওহাবি প্রেরণা রাজনীতি-ক্ষেত্রে কি ঝড় তুলল তার প্রমাণ হাণ্টারের রিপোর্টে আছে। বিদ্রোহ হিসাবে সে এক আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন সম্প্রদায়ের গৌরবের কথা। পরবর্তী সময়ে আমির খাঁর ওহাবি মামলা সেদিনকার ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদেরও স্বাধীনতা-স্পৃহাকেও প্রেরণা দেয়, হিন্দুর মনেও ইংরেজ-বিরোধ বাড়িয়ে তোলে। আর্থিক ক্ষেত্রেও বাঙলার ওহাবি আন্দোলন দেশের অত্যাচারিত প্রজা-রায়তের, সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সহায়তা পেয়েছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে তার সামাজিক সাংস্কৃতিক ফলাফল নিয়ে।

এদিকে বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ওহাবি মনোভাব মারাত্মক দুর্ভাগ্যের কারণ হল—আর আরও দুর্ভাগ্যের কারণ হল সমস্ত বাঙালীর ও বাঙলার সংস্কৃতির পক্ষে। কি করে, তা বলছি।

ওহাবি জীবনাদর্শ সপ্তম শতাব্দীর ইসলামকে উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের জীবনে মূর্ত করতে চাইল। এমনিতেই আমরা জানি তা কত অসম্ভব। রিভাইভ্যালিজম-এর ঝোঁক স্থাণুত্বের দিকে, প্রতিক্রিয়াপরায়ণতার দিকে। কালচারের প্রকৃতি গতিশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা। কাজেই ধর্মের পুনরুজ্জীবনে অনেক ক্ষেত্রে কালচারের গতি বন্ধ হয়। এই ওহাবি দৃষ্টিভঙ্গিতে আবার শুধু সপ্তম শতাব্দীর আরব ঐতিহ্যই পবিত্র ও গ্রাহ্য, অন্য সব প্রায় ত্যাজ্য—ইংরেজি সভ্যতা শাসন তো নিশ্চয়ই, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিও, এমন কি, ফার্সি সভ্যতা এবং ভারতীয় মুসলমানের অনেক সৃষ্টিও অগ্রাহ্য। এই দৃষ্টিতে মধ্যযুগের বাঙালী 'হিন্দু ঐতিহ্যের' কোঠা তো অপবিত্রই, এমন কি, বাঙালীর যৌথ-সংস্কৃতিও বর্জনীয় হল। সেটুকু বাঙালীর 'মুসলিম ঐতিহ্যের' ক্ষেত্র তাও অনেকাংশে, পরিত্যাজ্য হয়ে থাকে; তার উপরে চাপানো দরকার হল ওহাবি পরিশোধিত সেই বিশুদ্ধ ইসলামের তত্ত্ব, নিয়ম-কানুন, আচার বিচার।

এ কথা ঠিক, বাঙলার ওহাবি নেতা হাজি শরিয়তুল্লাহ, ফরিদপুরের [illegible] বা তাঁর ছেলে দুদু মিয়া কিংবা ওহাবি বিদ্রোহী তিতু মিয়া (২৪ পরগণার) বাঙালী মুসলমান সমাজের ধর্মগত নেতৃত্ব লাভ করতে পারেননি—'ফরাজীদের' সঙ্গে পুরনো মওলবী মোল্লার ফতোয়ামত সাধারণ মুসলমান একসঙ্গে নমাজ পড়তেও অস্বীকার করতেন। বাজেই মতবাদ হিসাবে ওহাবি মতবাদ বাঙলায় মোটেই সর্বগ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু এই মতবাদকে ঠেকাতে গিয়েও পুরাতন মওলবী মোল্লাদের পক্ষে কোরান, হাদিস ও শরিয়তী বিধি বিধানের উপরই জোর দিতে হল, মুসলমান সাধারণকে বলতে হয়—শরিয়তী ইসলাম থেকে বিচ্যুতিই এ দেশের ও সকল দেশের মুসলমানের পতনের কারণ। অতএব, কার্যক্ষেত্রে আসলে ওহাবি মতবাদ যে-মনোভাবকে বাড়িয়ে তোলে ওহাবি বিরোধী মওলবীরাও সাধারণ মুসলমানের সেই মনোভাবকেই প্রশ্রয় দেয়—ফিরে চল বিশুদ্ধ ইসলামে—পাশ্চাত্য সভ্যতা ও স্কুল-কলেজ, শিক্ষা দীক্ষা নয়, ভারতীয় বা বাঙালী যৌথ উত্তরাধিকার (common inheritance বা সংস্কৃতির অনুশীলনও আর নয়, এমন কি, সংশোধন করে না নিলে 'বাঙালী মুসলিম ঐতিহ্যও' (typical Muslim tradition) নিবো না। বলা বাহুল্য মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রায় বারো আনা উত্তরাধিকারই এভাবে অবহেলিত হল। আর অন্যদিকে বাঙলার মুসলিম সমাজের তখন থেকেই আসল শরিয়তী ইসলামের উপর ঝোঁক বাড়ল। এখানে ওখানে মাদ্রাসা-মক্তব পত্তন হল, শরিয়তী নিয়মকানুন আর আচারের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমান প্রথম "খাঁটি মুসলমান" হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু না হয়ে উঠতে লাগলেন বাঙালীর ধারাবাহিক যৌথ সংস্কৃতিকে পাশে সরিয়ে রেখে, নতুন কালের নতুন যা সংস্কৃতিকেও একেবারে অস্বীকার করে।

অবশ্য দুটি অত্যন্ত বাস্তব কারণও সাধারণ মুসলমানের ইংরেজি শিক্ষা বর্জনের কারণ হয়েছিল। বাঙলাদেশে মুসলমান পল্লীবাসী। প্রথম যুগে ইংরেজি বিদ্যালয় কলেজ পশ্চিম বাঙলার বড় বড় শহরেই আবদ্ধ ছিল—কাজেই পল্লীবাসীর পক্ষে এ শিক্ষা দুর্ঘট ছিল। তাই আবদুল লতিফ বা আমীর আলী যদি বা সুযোগ পেলেন, মুসলমান সাধারণের পক্ষে এ সুযোগ দুর্লভ হত। তা ছাড়া, অধিকাংশ মুসলমান কৃষকই আর দরিদ্র ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যবিত্ত মুসলমানও ছিলেন প্রায় নগণ্য। অথচ ইংরেজি শিক্ষা ব্যয়সাধ্য. এই সব কারণে মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষিতরা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারে আরও বেশি সুযোগলাভ করলেন।

একই কালে বাঙালী মুসলমান এসব কারণে মিলে বিদ্রোহ করলেন তার অতীতের বিরুদ্ধে আর সমাগত যুগধর্মের বিরুদ্ধে. গ্রহণ করতে গেলেন সপ্তম শতকের আরবী প্রেরণা ও ব্যবস্থাকে—যার অনেকাংশই একালের সৃষ্টির পক্ষে আর তাকে উজ্জীবিত করতে পারে না। কাজেই উনিশ শতকের মুসলমান জীবন অভিমানে বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত, ধর্মান্দোলনে আলোড়িত—আর সৃষ্টি চেতনায় তা এমন বন্ধ্যা হয়ে রইল। সমস্ত বাঙলা দেশে উনিশ শতকের জ্ঞানে বিজ্ঞানে, সামাজিক সংস্কারে,

আর প্রগতিমূলক জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানের তাই কোনো স্থান নেই। উত্তরভারতে স্যার সৈয়দ আহমেদের অভ্যুত্থানে যে "মুসলিম জাগরণ" এল তার বাহন হয় উর্দু, তার সৃষ্টি-কেন্দ্র উত্তর-ভারত। বাঙালী মুসলমান প্রত্যক্ষভাবে সেই "জাগরণেরও" সুযোগ পায়নি।

হিন্দুর সৃষ্টি ও হিন্দুর ভুল

মুসলিম-জীবনের এই বিদ্রোহী ধারা হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সাধারণের নিকট পর্যন্ত দুর্জ্ঞের দুর্বোধ্য হয়ে রইল। মুসলমান কোনো নেতা তা ইংরাজি বা বাঙলায় ব্যাখ্যাও করলেন না। তাই হিন্দু ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে, জমিদারী প্রথা চাকরি-বাকরির মারফত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ জীবন-যাত্রায় একটা বড় স্থান অধিকার করলে; আর এই শিক্ষিত হিন্দু-সাধারণই নতুন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হতে হতে উনিশ শতকে ধরে নেন—ভারতীয় মুসলমান এদেশের শিক্ষা-সভ্যতা ও অতীতকে শ্রদ্ধা করেন না; এদেশের সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানকে আপনার বলে মনে করেন না; এ দেশকেই তাঁরা মনে করেন না নিজেদের 'স্বদেশ'। কাজেই ইসলাম ধর্ম যেমন বিদেশীয়, মুসলমানকেও হিন্দুরা মনে করে নিলেন বিদেশীয়; এবং হিন্দুত্ব ও হিন্দু রীতিনীতিকে সহজভাবে মনে হল "জাতীয়" ধারা। এ এক শোচনীয় ভুল। মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালীরা হিন্দু-মুসলমান জনগণের থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন বলেই এ ভুল হল। সমস্ত উনিশ শতকের নবজাগ্রত প্রগতি আন্দোলন এই মারাত্মক ভুলের বশে এক 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' আশ্রয় গ্রহণ করলে। আর হিন্দু শিক্ষিত সাধারণ, আমাদেরই কবি, ঔপন্যাসিক সকলেই তখন 'হিন্দু ঐতিহ্যের' কাঠামোকে আশ্রয় করে সৃষ্টিতে অগ্রসর হলেন—তাঁদের নিকটেও হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর যৌথ সংস্কৃতি বেশি মর্যাদা পেল না। মর্যাদা পেল বরং তার পার্শ্ববর্তী সেই "হিন্দু ঐতিহ্যের" অংশ। বাঙালী হিন্দুর সেই সংকীর্ণ কাঠামোকে অবশ্য ভারতীয় দর্শন, চিন্তা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিসরে ফেলে তাঁরা এ সময়ে বড় করে নিলেন—নতুন বেদ-বেদান্ত উপনিষদ চর্চায়, দর্শনের অনুশীলনে, সংস্কৃত শাস্ত্র প্রকাশে স্মার্ত ও নৈয়ায়িক বাঙালী হিন্দুর মনের কাঠামো প্রশস্ত হল। রামমোহন রায় থেকে রাজ-নারায়ণ, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই সর্বভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের প্রবল ধারাকে বাঙালী হিন্দু ঐতিহ্যের খাতে বহাতে সাহায্য করেছেন, তাও উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য একটি বিশেষ সত্য লক্ষণীয়। এই উনিশ শতকের বাঙালা সংস্কৃতির কাঠামোই হিন্দু, তার প্রাণ কিন্তু বুর্জোয়া সংস্কৃতির। মাইকেলের তো কথাই নেই, বঙ্কিমও দেখি প্রাণপণে চাইছেন মিল, স্পেনসার, কোঁৎ-এর বাণীকে এই স্বদেশীয় কাঠামোতে রূপ দিতে। এই বুর্জোয়া সভ্যতার মূল সত্য হল মানবতাবাদ—হিউম্যানিজম্; অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্বের তাই লক্ষ্য। বঙ্কিম উপন্যাসে, প্রবন্ধে চেয়েছেন এই সত্যকে—বুর্জোয়া প্রাণশক্তিকে এই "হিন্দু কাঠামোতে" পুরতে। ব্রাহ্ম ও "উদারনৈতিক" সংস্কারবাদীরা এ-কাঠামোকেও এতটা গুরুত্ব দিতেন না। তাঁদের ধর্মান্দোলনে ও কর্মান্দোলনে তা স্পষ্ট। কিন্তু "জাতীয়তাবাদীরা" চাইতেন সেই জাতীয় আধারে অর্থাৎ হিন্দু আধারে, নতুন প্রাণ সঞ্জীবিত করতে।

কিন্তু যা প্রধান কথা তা এই: বাঙালীর যৌথ-সংস্কৃতি ইংরেজ-শাসনের কালে মুসলমানের দ্বারাও অবহেলিত হয়, হিন্দুর দ্বারাও অবহেলিত হয়। আর এইটিই এ কালের বাঙালী জীবনের ও সংস্কৃতির ট্র্যাজিডি। তারই জন্য বর্তমান বাঙলার সংস্কৃতিকে মুসলমান বাঙালী আপনার বলে মানতে এত ইতস্তত করেন। কারণ, তাঁর চক্ষে এ যে শুধু 'হিন্দু ঐতিহ্যে'র উপর গঠিত বাঙালী সংস্কৃতি।

বাঙালী কালচারের ভাবী ভিত্তি

অপরপক্ষে এ কথাও সত্য যে, সেই উনিশ শতকের হিন্দু জাগরণের হিন্দু কাঠামো তখনি ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। কারণ মানবতাবাদ হিন্দুত্বের কাঠামোয় বাঁধা পড়ে না; এবং "মুসলমান-

সম্মেহের" আবহাওয়ারও নিঃশ্বাস টানতে পারে না। এমন কি এই "বাবু কালচারের" বাবুদের চক্ষেও তার সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা গোপন রইল না। দিনের পর দিন বাঙালী সংস্কৃতি তাই সচেতন হচ্ছে তার সেই উনিশ শতকের ত্রুটি সম্বন্ধে, বুঝছে দুটি সত্য—এই সংস্কৃতি সমস্ত বাঙালীর সংস্কৃতি নয়, শুধুমাত্র শতকরা পাঁচজন বাবুর সংস্কৃতি হয়েছে—"ভদ্র সংস্কৃতি" হয়েছে, বাঙালীর লোক-জীবনের থেকে তা বিচ্ছিন্ন। বাঙালী সংস্কৃতির আসল কাঠামো (form) হওয়া চাই বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের সেই যৌথ সংস্কৃতি ; বাঙালী হিন্দু-মুসলমান জনগণের সমসূত্রে গাঁথা লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতি হওয়া চাই তার ভিত্তি ; আধুনিককালের জাগ্রত জীবন হবে তার উপকরণ (content) আর এই নতুন বাঙালী সংস্কৃতির প্রাণ হবে—শুধু বুর্জোয়া মানবতাবাদ নয়—আধুনিক বিপ্লবী মানবতাবাদের নতুন প্রেরণা ও সত্য।

এখানেই বাঙালী মুসলমানের দানের সে প্রতীক্ষা করবে। আবার সমস্ত বাঙালীর যৌথ সংস্কৃতি গঠন করতে হবে, নতুন মানবতার সাধনায় হিন্দু-মুসলমান একত্র হতে হবে। বাঙালী মুসলমানেরও সেই সাধনায় সে-দান আজ জোগাতে হবে। উনবিংশ শতকের উগ্র ও সংকীর্ণ ওহাবি প্রেরণায় তার সৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। বিংশ শতকে এখনো তার জের চলেছে। যেমন দেখি—মুসলমান বাঙালী তার আপন সংস্কৃতিক্ষেত্রের সন্ধান না পেয়ে, শক্তিকেন্দ্র না বুঝে, বাঙলার মুসলমান জনগণের লোক-গীতি, লোক-নৃত্য প্রভৃতি অনেক প্রয়াসকে "অনৈসলামিক" বলে এই শতকেও চাপা দিচ্ছেন। সেই ওহাবি ঝোঁক তার বেটে যায়নি, হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তি দেখে বরং তা বেড়েছে। এবং অকস্মাৎ রাজনৈতিক শক্তির সহায়তালাভে এই দেশের আজ বাঙালী মুসলমান সমাজেও "শিক্ষিত মধ্যবিত্তের" উদয় হচ্ছে। তালকানা হয়ে উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দুর মত তারা "মুসলিম ঐতিহ্যের" কাঠামোতে আরবী-ফার্সীর ধারায় নতুন সংস্কৃতি গড়বারও কল্পনা করছেন। "বাবু কালচারের" পাল্টা তাঁরা গড়তে চান "মিঞা কালচার"। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকেই যা হিন্দুর ভুল ছিল বিংশ শতকে তা মুসলমানের পক্ষে হবে আরও মারাত্মক। হিন্দুর সেই ভুল দেখে বরং বাঙালী মুসলমানের বোঝা উচিত—তাঁকে আপনার সংস্কৃতি গড়তে হবে গড়তে হবে বাঙালী যৌথ-সংস্কৃতির কাঠামো (form) নিয়ে বাঙালী গণ জীবনের ভিত্তিতে (base) আর তা গড়তে হবে বিপ্লবী মানবতার বাণী ও প্রেরণাকে প্রাণস্বরূপ ভাব-বস্তু-রূপে (content) গ্রহণ করে।

তা হলেই হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর সাংস্কৃতিক স্বরাজলাভ সম্ভব।*

* ১৯৪৬ সনের ২রা মার্চ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের মুসলমান ছাত্রদের ছাত্রাবাস জিন্নাহ্ হলে, তাদের একটি সম্মেলনে 'মুসলিম কালচার' বিষয়ক বক্তৃতা থেকে 'বাঙালী মুসলমান ও মুসলিম কালচার' ও 'মুসলমান বাঙালীর কালচার'—এই প্রবন্ধ দু'টি ৪৬-এর জুলাই মাসে লিখিত হয়। কলিকাতার দাঙ্গার পরে (১৬ই আগস্ট ১৯৪৬) গত (১৩৫২-এর) শারদীয় সংখ্যা 'বসুমতী' ও 'যুগান্তরে' বর্তমানাকারে লেখা দু'টি প্রকাশিত হয় এবং নোয়াখালির শোচনীয় ঘটনাবলীর পরে 'শনিবারের চিঠির' সুযোগ্য সম্পাদকের কাছ থেকে অপাংক্তিকভাবেই এই মন্তব্যটুকু লাভ করে : যখন অবাধ তাণ্ডব চলিয়াছে "তখন নোয়াখালির শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের মত মন এমন শক্ত করিতে পারি নাই যে, মুসলিম কালচার ও সংস্কৃতি লইয়া পাঁচ ঘাটে পাঁচটি প্রবন্ধের তর্পণ ভাসাইব।" সুযোগ্য সম্পাদকের অবশ্য অজানা ছিল না যে, দেহ শক্ত করতে না পারায় নোয়াখালির-ফেরৎ "নোয়াখালির গোপাল হালদার" তখন নিতান্তই অশক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

বাঙালী মুসলমানের কাব্য সাধনা

বাঙালী জাতির মধ্যে মুসলমানেরাই সংখ্যায় বেশি, হিন্দুরা সংখ্যায় তাদের তুলনায় কম। এ কথা হয়ত ভারতবর্ষের অন্য আরও কয়েকটি জাতির সম্বন্ধেও খাটে। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আর-একটি কথা এত বেশি খাটবে না—তা এই ঃ বাঙলা—বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা, নিজের ভাষা। গুজরাতী মুসলমানও হয়ত গুজরাতী পড়েন, পাঞ্জাবী মুসলমানও হয়ত পাঞ্জাবীর চর্চা করেন। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁরা আবার উর্দুকে বা হিন্দুস্তানীকে নিজেদের ভাষা বলে মনে করেন। বাঙালী মুসলমানের তা মনে করা দুঃসাধ্য। বাঙলাই সাধারণভাবে তাঁদের মাতৃভাষা, নিজেদের ভাষা। আশ্চর্য এই যে, বাঙলা সাহিত্যে তবু বাঙালী মুসলমানের দান এখনো তত বেশি নয়!

তর্কের অবকাশ থাকবে, তবু মোটামুটি বলতে পারি তার কারণ পূর্বযুগে ছিল এরূপ ঃ বাঙালী মুসলমানের মধ্যে পূর্বযুগে শিক্ষিত মধ্যস্তর বোধ হয় বিশেষ ছিল না। বাঙালী মুসলমানের প্রধান স্তর ছিল দুটি ঃ একটা উপরকার শাসক স্তর—কেউ বা তাঁরা ছিলেন মূলত অবাঙালী কেউ বা আধা-বাঙালী। দ্বিতীয়টি নিচেকার স্তরের গরীব বাঙালী—যাঁরা নানা কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সে-সূত্রে কতকগুলো অসুবিধা ও অবিচার থেকে মুক্তি পেলেও মোটের উপর তাঁরা দরিদ্রই থেকে যান। উন্নত রকমের জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতি-চর্চার সুযোগ দরিদ্র ও নিম্নস্তরের হিন্দু-মুসলমান কারো ছিল না। সে সুযোগ মধ্যযুগে স্বভাবতই থাকে সম্ভ্রান্তদের হাতে ও জোটে তাদেরই আশ্রিত গুণীদের ভাগ্যে। উপরস্তরের মুসলমানেরাও সেদিন দেশী কবিতা, গান, পাঁচালি শুনতেন, তা আমরা ভালো করেই জানি। না শুনে উপায় ছিল না। কারণ ইরান-তুরান কেন, তখনকার দিনে জৌনপুর-দিল্লীও সত্যই দূর ছিল। আরাকানের দরবারে তাই বাঙলা কবিতার আসর বসে; বঙ্গে পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ মহাভারত শুনতে থাকেন, গৌড়ে ইউসুফ্ শাহ, হোসেন শাহের উৎসাহে বাঙলায় কাব্যচর্চা জেঁকে ওঠে। কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁদের কাজকর্মে দরবারে-দফ্তরে ফার্সিও কম চলত না, আর ফার্সি চর্চায়ও শাসক-শ্রেণীর উৎসাহ কম ছিল না। তখনকার গুণী ও শিক্ষিত মুসলমানরা সে ভাষার দিকেই আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন, তাতে আশ্চর্য কি? অবশ্য আলাওল বা দৌলৎ কাজীর মত কবিও থাকতেন, কিন্তু মধ্যযুগে উঁচুস্তরের মুসলমান বাঙলা কবিতা বিশেষ লিখতেন কি?

মধ্যস্তরের মুসলমান তখনো কিছু ছিলেন যাঁরা কাজী মুন্সি হতেন; তারা ছিলেন ফার্সি-নবিশ। ফার্সি-নবিশের পক্ষে আবার বাঙলা কাব্যে নিজেদের কথা, ভাব ও চিন্তাকে পরিবেশন করা সম্ভবত অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য ছিল। হিন্দু বাঙালীর হাতে বাঙলা কাব্যের পদ্ধতি তাঁর আগেই সংস্কৃতের ঢঙ্ অনুসরণ করে একটা বিশেষ রূপ (প্যাটার্ন) পেতে শুরু করেছিল। তাই দেখি, যেসব মুসলমান কবি নিজের দেশের ভাষায়, নিজের জীবন ও ভাবনার কথা লিখছেন তাঁদের কবিতা হিন্দু বাঙালীর কবিতার থেকে ভাষায় এবং ভাবে তত ভিন্ন প্রকৃতির নয়। প্রথম থেকেই বাঙালী মুসলমান কবির কবিতায় এর প্রমাণ মেলে। সে কবিতার বিষয়বস্তু যদি বা "রসুল বিজয়ের" (শেখ চান্দের) বা "জঙ্গনামার" (মোহাম্মদ এয়াকুবের) মত জিনিস হয় তবু দেখি তার মোট রূপটি (প্যাটার্ন) যে-কোনো হিন্দু কবির কবিতার থেকে আসলে স্বতন্ত্র নয়। অবশ্য বিষয়বস্তুর দায়েই শরা-শরিয়ৎ, মারফৎ-হকিকতের কথা যথানিয়মে আসবেই, না এলেই তা অস্বাভাবিক হত। কিন্তু

কাব্য মালঞ্চ। আবদুল কাদের ও রেজাউল করীম সম্পাদিত। (নুর লাইব্রেরী, দাম ৫ টাকা)। এই সংগ্রহ-গ্রন্থের সমালোচনায় এ প্রবন্ধটি 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়।

তবু মোহাম্মদ খানের "ছহি মক্তাল হোসেনের" মত 'মর্সিয়া কাব্যের' মধ্যেও বাঙলা কবিতার সেই রূপ যথেষ্ট পরিষ্কার।

অবশ্য যেখানে বিষয়বস্তু—মানে, কথাবস্তু ও ভাববস্তু—এ দেশীয়, সেখানে লেখক অনেক স্বচ্ছন্দ। গাথা, ভাটিয়ালী, বাউল বা মুর্শিদী গান, এমন কি, গাজীর গান, মাণিকপীর, সত্যপীর প্রভৃতির বিষয়ে গান রচনা সেজন্যই অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। আর সাধারণ স্তরের হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে যেমন উচ্চ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় সমান বাধা ছিল, তেমনি লোককাব্যে, গাথায়, গানে দু'এরই সমান আকর্ষণ ছিল—বাঙলার লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর গরীবদের তফাৎ ছিল না। তা ছাড়া, অনেক মুসলমানই সেদিনে সৈয়দ মর্তুজার মত কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হতেন, আলী রাজার মত সুফী ও বৈষ্ণবসাধনায় তন্ময় হতেন, আর মদন বাউল বা লালন শাহ্‌র মত বাউলের সাধনায় মজতেন। এসব জানা কথা। কিন্তু, একটি কথা: এসব কথা ও ভাবের প্রকাশ-পদ্ধতিটা সুপরিচিত বলেই কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমান কবি সেসব কথাবস্তু ও সেসব ভাববস্তু অবলম্বন করতেন না?

মোটের উপর কথা এই: সমস্ত মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান কবির ও বাঙালী হিন্দু কবির লেখার মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। পার্থক্য যা আছে তা গৌণ, মিল যা আছে তাই প্রধান।

রেজাউল করীম সাহেবের রাজনীতিক ইঙ্গিত না মানলেও তাঁর এ কথা মানা উচিত। অবশ্য এ মিল একদিকে মধ্যযুগের চিন্তা-ভাবনার সাধারণ মিল, এবং মধ্যযুগের জীবনযাত্রায় মোটামুটি দু'সম্প্রদায়ের নৈকট্যের প্রমাণ। তবু তা প্রমাণ এই সত্যেরও যে, বাঙলার হিন্দু মুসলমান একই "নেশন", এবং বাঙলার লোক-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য দুই ই ছিল হিন্দু-মুসলমানের তখন পর্যন্ত সম্মিলিত সম্পদ—যদিও সেই সাহিত্যে শিল্পে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুসলমানের দান কম পড়ছিল। কেন কম পড়ছিল, তার একটা অনুমান আমরা উপরে উল্লেখ করেছি—মুসলমান মধ্যবিত্ত বিশেষ ছিল না বলে।

কিন্তু প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের সাধনায় বাঙালী মুসলমানের কি তবু বিশিষ্ট কোনো দান নেই? নিশ্চয়ই আছে। আর সে দানের তুলনা নেই। প্রথমত, "বাঙলার মুসলমান কবিগণই প্রত্যক্ষভাবে মানবীয় প্রেমকে আদর্শ করে কাব্যপ্রণয়নের নতুন ধারা প্রবর্তন করেন।" কারণ হিন্দুর থেকে মুসলমান বাঙালী কবিতায় চিন্তায় অধিকতর জীবননিষ্ঠ। দ্বিতীয়ত, "সুফীচিত্তের আগ্নেয় অনুভূতি মারফতী গানের সুরে সঞ্চারিত করিয়াছে আশ্চর্য তীব্রতা।"—"কাব্য মালঞ্চের" অন্যতম সম্পাদক কাদের সাহেবের এ-দু'টি কথাই মূলত সত্য। অবশ্য তিনিও মানেন, ব্রিটিশ পূর্ব যুগের বাঙলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মোটামুটি হিন্দু-মুসলমান এক ও অবিচ্ছেদ্য। "কাব্য মালঞ্চের" এই মুসলমান কবিদের চমৎকার কাব্যসংকলন থেকেও তাহ দেখতে পাই।

কিন্তু ব্রিটিশ যুগে বাঙলা সাহিত্যের একেবারে নবজন্ম হল, তা আমরা জানি। বাঙলার সে-সাহিত্যে মুসলমান বাঙালীর দান আরও কমে গেল। কেন এমন হল, এ-প্রশ্নের উত্তর আজ আমরা মোটামুটি জানি—"ওহাবী-প্রতিবাদ, আমিরী আয়েস, দারিদ্র্য ও গ্রাম্যতার ফলে বাঙালী মুসলমানের মধ্য হইতে তেমন (হিন্দুদের মত) 'মধ্যস্থ শ্রেণী' তখন (উনবিংশ শতকে) উঠিতে পারে নাই। আজ (১৯২০-এর পরে) তাহার উত্থান ঘটিতেছে, নানা সুবিধালাভে তাড়াতাড়িই এই উত্থান ঘটিতেছে।" ('সংস্কৃতির রূপান্তর' বাঙলার কালচার)। "কাব্য মালঞ্চের" কবিতাসংগ্রহ, এজন্য আরও উল্লেখযোগ্য; নতুন কবিদের কবিতা পাঠে এ বিষয়ে সংশয় থাকে না যে, বাঙালী মুসলমান কাব্যজগতে প্রবেশ করছেন। আবদুল কাদের সাহেব যথেষ্ট দরদ ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের শক্তির পরিমাপে। তবু তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই, "শেখ ফয়জুল্লাহ্ হইতে ফররুখ আহম্মদ পর্যন্ত আমাদের যে কাব্যসাহিত্য তাহাতে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বেশি নাই।" তাই তাঁর সঙ্গে আবার দ্বিধাভরে প্রশ্ন করতে হয়, "বাঙালী মুসলমানদের সমাজগঠন কি শিল্পপ্রতিভার আবির্ভাবের পক্ষে বাস্তবিকই প্রতিকূল?"

অনধিকার না হলে এ-সম্বন্ধে আমরা সাধারণ দু একটি কথা বলতে চাই। প্রথমত, শিল্প-সাহিত্যে নিজেকে প্রকাশিত করতে হলে নিশ্চয়ই বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ওহাবী-উগ্রতার মায়া কাটিয়ে উঠতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেমন করে অন্যত্র জাগ্রত সংস্কৃতির স্রষ্টারা আধুনিককালের জীবন-সত্যকে স্বীকার করছেন তেমনি করে বাঙালী হিন্দু মুসলমান মধ্যবিত্ত স্রষ্টাদেরও জন-জীবনকে স্বীকার করতে হবে। নইলে যে নিজস্ব বাঙালী ঐতিহ্য নিয়ে বাঙলার মুসলমান সমাজ গর্ব করতে পারেন তাও তাঁরা এই ওহাবী ঝোঁকে ও নতুন মধ্যবিত্ত "মিশ্রা কালচারের" মোহে অবজ্ঞা করতে শিখবেন। এদিকে মুসলমান সমাজের ভুল সম্ভাবনা যথেষ্ট। চিত্রবিদ্যা ও নৃত্যবিদ্যা মুসলমান সমাজে কোনো দিনই বিশেষ প্রশ্রয় পায়নি ; যদিবা সাধারণ মুসলমান গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন তাঁরা কম। আর গত কয়েক বছরের মধ্যে বাঙালী মুসলমান পালা গান, বাউল গান প্রভৃতি বাঙলার লোকসংস্কৃতির অনেকগুলো নিজস্ব পদবেই নব্য ওহাবী-উগ্রতায় বর্জন করতে উৎসাহী হয়েছেন। এমন কি, সেই "সুফীচিত্তের আবেগ্ন অনুভূতি" ও দৌলৎ কাজীর নিছক "নর" ও "মানবীয় প্রেমও" তেমনি স্বচ্ছন্দভাবে আর বাঙালী মুসলমানের লেখায় প্রকাশলাভ করছে না। অবশ্য একথা বুঝতে পারি যে, বাঙালী মুসলমান উত্থিত হচ্ছে আজ অনেক বিক্ষোভ বুকে নিয়ে। সংখ্যায় সে-ই বাঙালী হিসাবে মুখ্য অথচ বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে সে গৌণ। সর্বদাই নিজের এই আপেক্ষিক খর্বতায় সে ভীত, শঙ্কিত এবং সেই কারণেই উগ্র ও বিক্ষুব্ধ। স্বাভাবিক ও সবল আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি না পেলে হয়ত সে সুস্থ হতে পারবে না। একটা আত্মপ্রত্যয়ের অভাব পরাধীন হিসাবে বাঙালী মাত্রেরই আছে—বাঙলা সাহিত্যকেও আছে। সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার জন্য সেই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আরও বেশি আছে বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকের, আধুনিক বাঙালী মুসলমান কবিদের লেখায়ও এরই স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই ওহাবী মনোভাব হয়ে উঠেছে বাঙালী মুসলমানের আত্মরক্ষার কবচ। কিন্তু এই মনোভাবই তার সাংস্কৃতিক আত্ম-প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী নয় কি? অথচ, এ সত্য কি বাঙালী মুসলমান বোঝেন না—তার ভবিষ্যৎ তো আজ বাধামুক্ত, তা উজ্জ্বল হতে পারে তার চিন্তার, ভাবনার ও জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দ দানের শক্তিতে, জনতার জীবনের সঙ্গে তার সহজতর যোগাযোগের ফলে।

'কাব্য মালঞ্চের" মারফত তাঁর সুযোগ্য ও সুবিদ্বান সম্পাদকদ্বয় হিন্দু-মুসলমান সকল বাঙালীর নিকট বাঙালী মুসলমান কবিদের কাব্যসাধনার ধারার যে পরিচয় উপস্থিত করেছেন, আমাদের মনে হয় তাতে এই কথা কয়টিই পরিষ্কার হয়ে ওঠে: বাঙালী জাতি হিসাবে মোটের উপর এক ; বাঙলার প্রাচীন সংস্কৃতিও মোটের উপর হিন্দু মুসলমানের দানে এক হয়ে উঠেছে ; বাঙলার বর্তমান সংস্কৃতিতে মুসলমানের দানে যে ঘাটতি পড়েছে তার কারণ ঐতিহাসিক ; সে ঘাটতি পূরণের জন্য আজ নতুন মুসলমান কবিরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন ; কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসের নানা বিক্ষোভে এদিকে তাঁরা সুস্থ-সবল আত্মবিকাশের সুযোগলাভ করছেন না ; আর তা না করাতে বাঙলার বর্তমান সংস্কৃতিও সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারছে না। কারণ, হিন্দু-মুসলমান দুই মধ্যবিত্তই তাদের 'বাবু-কালচার' ও 'মিশ্রা কালচারে'র মোহ ছাড়িয়ে, জনজীবনের বৃহত্তর সত্যকে গ্রহণ করতে না পারলে বাঙালীর সংস্কৃতি কি সত্যই সবল বা সম্পূর্ণ হতে পারে? আর এ-বোধও কি হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে আজও জন্মেছে?

পরাধীনের দৃষ্টিবিভ্রম

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। কিন্তু আমরা সকলেই জানি—শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব,—এক কথায় মানবসংস্কৃতির এমন দিক নেই যাতে তাঁর আগ্রহ নেই, তাঁর জিজ্ঞাসা জাগে না। তাঁর মন অসম্ভব রকমে তথ্য-সমৃদ্ধ; তাঁর স্বভাবও অকপট বা sincere; আর লেখায়, বক্তৃতায়, আলাপ-আলোচনায় তিনি অকৃপণ। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ কয়খানিও সেই সাক্ষ্য অজস্র বহন করছে।* এই গ্রন্থ তিন খানিতেও পাঠক পরিচয় পাবেন একজন সবল মানুষের, দেখতে পাবেন তাঁর বহুমুখীন চিত্তকে, আর লাভ করবেন দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির অজস্র সংবাদ।

এখানেই পাঠকের একটি দুঃখও থেকে যাবে। কারণ, সমস্ত গ্রন্থ কয়খানিতে যত তথ্য, তত্ত্ব ও আলোচনা আছে সম্ভবত তা দু'একমাস বসে পড়া, ভাবা, আর আলোচনা করা চলে। এখানে অবশ্য দু'পাতায় তার আভাস দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু মোট প্রায় সোয়া পাঁচশ পৃষ্ঠার এই ছোট অক্ষরের তিনখানি বই পড়েও পাঠকের আফশোষ থেকে যায়—আরও বিস্তারিতভাবে এসব বিষয়ে না শুনলে এসব কথার সম্পূর্ণ মূল্য সে মনে মনে গ্রহণ করতে পারে না। মনে হয়, এসব বই 'বিশ্বকোসের' মত তথ্যবহুল। কিন্তু বিশ্বকোষের মত যে তা ক্লান্তিকর বা ভারী হয়ে উঠল না তার কারণ—এসবের মধ্যদিয়ে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় একটি মানুষেরও। এত তথ্যবহুল গ্রন্থও বিশ্বকোষের মত নৈর্ব্যক্তিক নয়, তাই নীরস হয়নি। এই কথা কয়টি মনে রেখে আমরা বই ক'খানির পরিচয় ও সে প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন মনে জাগে তা এখানে উপস্থিত করছি। কারণ, এই গ্রন্থ তিনখানিকে আমরা এ-যুগের কৃতবিদ্য ও অকপট বাঙালী পণ্ডিতদের জীবন-দৃষ্টিরও একরূপ পরিচয়পত্র হিসাবে গণ্য করতে পারি। সকল শিক্ষিত বাঙালী যে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত বিদ্বান, বহুদর্শী ও উদ্যমশীল নন, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মোটের উপর এ-যুগের অনেক কালচারড্ বাঙালীই যে তাঁর অনুরূপ ভাবনার ভাবুক, তা বলা চলে। অর্থাৎ আমরা সকলেই বিদেশের শিক্ষা-দীক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করি, সম্ভব হলে বিলাতকে "গুরুকুল" করি (অনেকে সেই কৌশলে আর কিছু না হোক- আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে কালচার-কৌলিন্য লাভ করতে চাই); সকলেই 'বিদেশীয় ভাববাদে' পুষ্ট হয়ে স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে নতুন করে নিই, তারপর হই—হিন্দু সভার বা মুসলিম্ লীগের সমর্থক। সে হিসাবেই শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর এই তিন খানা বই বুঝে দেখবার মত। তাতে বাঙালী মনীষার ঐশ্বর্যেরও পরিচয় আছে, আবার বাঙালী কালচারের অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতার সম্বন্ধেও প্রশ্ন মনে জাগে।

প্রথমেই দেখছি: "বৈদেশিকী'তে আটটি বিদেশী জাতির মর্মমূল সুনীতিবাবু উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। সেজন্য বিবৃত করেছেন তাদের আদিম গাথা, কাহিনী, পুরাণ প্রভৃতি, কিংবা তাদের শিল্পকলা ও সংস্কৃতির কাহিনী। যেমন, আইরিশ জাতিকে বুঝবার জন্য তিনি দের্‌দ্রিউর কাহিনী বলেছেন; ব্রুন্‌হিল্‌ডের কাহিনীতে তিনি জার্মানদের মর্মমূলের সন্ধান পাচ্ছেন; 'আরব্য উপন্যাসে' পাচ্ছেন সাত শত বৎসরের আরব নাগরিক সভ্যতার রূপ; চীনাদের দেবতার কাহিনীতে চীনজাতির, রাজা গেসরের কাহিনীতে বর্মীদের; নানা শিল্প ও পুরাণ থেকে পশ্চিম আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ য়োরুবা জাতির; আর সমসাময়িক কালের মেক্‌সিকোর 'জাতীয় পুনরুজ্জীবনের' চেষ্টায় সে দেশের চার শত বৎসর পূর্বেকার তোল্‌তেক-আস্তেক জাতির মূল প্রেরণার পুনঃপ্রতিষ্ঠার তিনি পরিচয়

*বৈদেশিকী—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স, ৩৷০
ইউরোপ, ১৯৩৮, প্রথম খণ্ড—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মিত্রালয়, ৪৷৷
ভারত-সংস্কৃতি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গুপ্ত প্রকাশিকা, ২৷৷

পাচ্ছেন। এর মধ্যে য়োরুবাদের, মেক্সিকোর ও আরবা উপন্যাসের প্রসঙ্গ পাঠককে যতটা তৃপ্তি দান করে অন্য দু'একটি প্রসঙ্গ তা করে না। তার কারণ, সেখানে অনুবাদাংশ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু এই আটটি প্রসঙ্গের যে-কোনো একটি নিয়ে নানা দিক থেকে আলোচনা করা চলে; আর তা করা উচিতও। তবু এই আটটির মধ্য দিয়েই যে একটি কথা সুনীতিবাবু বলতে চান তারই অর্থ স্পষ্ট করে বোঝা আরও বেশি প্রয়োজন।

'রক্ত' ও 'জল'

কথাটা এই, Blood is thicker than water, বা Old gods never die. মানে, 'জাতির' একটা 'সনাতন' প্রবৃত্তি আছে। কি অর্থে এই কথাটা বুঝব, তাই প্রশ্ন। 'রক্ত জলের থেকে ভারী' এখানে 'রক্ত' শব্দটিরই বা অর্থ কি, 'জল' শব্দটিরই বা অর্থ কি? 'রক্ত' বলতে যদি বায়লোজিকাল বা জৈব সংস্কার বুঝায়, তা হলে তাতো সকল জাতের মানুষেরই এক,—কোনো বিশেষ জাতের মানুষের কোনো বিশেষ 'জৈব প্রবৃত্তি' নেই, তা বলাই বহুল্য। 'জল' বলতে কি বুঝব? আহৃত বা অর্জিত সম্পদ? যা প্রয়োজনীয় পুষ্টিবর? 'কালচারাল' রূপ বা সংস্কৃতি—শিক্ষাদীক্ষা, কালক্রমে লব্ধ মানব সম্পদ? তা হলেও তার নানা ভঙ্গি আছে, সে ভঙ্গিমা বদলায়, এবং জৈব সংস্কারের থেকে দুর্বল হলেও এই সংস্কৃতি আবার জৈব প্রবৃত্তিরও প্রকার ভঙ্গিমা কিছু না কিছু নিয়মিত করে। এই অর্থ ঠিক না হলে 'ব্লাড' মানে কি, বিশেষ জাতির কোনো 'রক্তগত বৈশিষ্ট্য'? বৈজ্ঞানিকরাও তা মানেন না; ডাক্তাররা তো আরও তা নাকচ করে দেবেন। কোন জাতিরই বৈশিষ্ট্য রক্তগত নয়, কারণ রক্তবিশুদ্ধি কোনো জাতির কোনোকালে ছিল না। ব্লাড্ ট্রেনসফিউশন স্বাভাবিকভাবেই চলেছে চিরকাল জাতিতে জাতিতে। তবু রক্তের দোহাই আমাদের সনাতন সমাজে আমরা দিই; আর আধুনিককালে আমাদের সে দোহাই পুষ্ট করেছে সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতেরা। তারা বোঝাতে চেয়েছে—রক্তের গুণে তারা শাসক, রক্তের দোষে আমরা শাসিত। এই কথাটাকে একটু আচড়ালেই এই সনাতন মতবাদ থেকে বেরিয়ে আসে 'Race Theory', তারই পরিণতি হিটলারী 'Blood Theory'তে। সভ্যতা মানলে মানতে হবে সংস্কৃতি বিকাশধর্মী। কিন্তু 'রেস' বা 'ব্লাড'-এর সনাতনী ব্যাখ্যা করলে বলতে হবে—বিকাশ নেই, সংস্কৃতিও নেই, আছে সনাতন ধর্ম, আছে শাশ্বত সংস্কার, বড় জোর চক্রাকারে ঘোরা। যতদূর বুঝি, ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক সুনীতিবাবু এরকম অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মোটেই সমর্থন করেন না। বরং জাতিমিশ্রণে ও সভ্যতার মিশ্রণেই সভ্যতার বিকাশ, তাই তিনি মানেন। অথচ সনাতন-বাদে বিশ্বাসের বশে সুনীতিবাবুর Old gods never die প্রভৃতি অস্পষ্ট কথায়, অস্পষ্ট ও অবৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রশ্রয় পায় তাও দেখছি। 'বৈদেশিকী'র আটটি কাহিনীর উদ্দেশ্য তা নয়। তথাপি, সুনীতিবাবুর পক্ষে পরিষ্কার করে বলা দরকার—এই সব জেনারেলিজেশন বা মোটা কথা কি অর্থে সত্য, আর কি অর্থে মিথ্যা। ইতিহাস শুধু চক্রাকারে আবর্তন নয়; তা স্পাইরেলের গতিতে অভ্যুদয়, অগ্রগতি। তাই মেক্সিকোর নতুন জাগরণও শুধু পুরাতনে প্রত্যাবর্তন নয়, এক নতুন জীবনাদর্শ ও জীবনবিন্যাসের পরিচায়ক, যার পরিচয় পাওয়া যাবে প্রেসিডেন্ট কার্ডেনাসের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠন দেখলে; এবং তারও আদর্শস্থানীয় সোভিয়েট রাষ্ট্রের সংস্কৃতি-বিষয়ক দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা থেকে।

কিন্তু সমসাময়িককালের এই রাজনৈতিক সাক্ষ্য সুনীতিবাবু যেন দেখতে চান না—গুরুত্ব দেন না বর্তমান ইতিহাসের এই প্রধান রাষ্ট্রীয় সত্যে। 'ইউরোপ, ১৯৩৮' প্রথম খণ্ড পড়ে এই সংশয় মনে জেগে ওঠে।

রাজনীতি-নিস্পৃহতা

১৯৩৮ সালের ইউরোপ। সুনীতিবাবু আন্তর্জাতিক ধ্বনিতত্ত্বের সম্মেলনে চলেছেন বেলজিয়মের গেন্টে (১৮ই—২২শে জুলাই)। কলকাতা ছাড়েন তিনি ২৬শে জুন। আর ঝড়ের

বেগে ইতালি, ফ্রান্সের উপর দিয়ে ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক হয়ে দেখি নরওয়ে সুইডেন শেষ করে তিনি ১২ই আগস্ট চলেছেন ফিনল্যাণ্ডের দিকে। তাঁর ইচ্ছা ছিল — পরে যাবেন রুশ দেশে। কিন্তু সে দেশ থেকে অনুমতি পাওয়া যায় নি, তাই তিনি দেশে ফিরে আসেন। আবার ইউরোপের পথে—সেসব কথা জানা যাবে পরবর্তী খণ্ডে।* কিন্তু তবু ১৯৩৮-এর ইউরোপ—একটু পরেই "মিউনিকের" অধ্যায় সংঘটিত হবে, ইউরোপে হিটলার তখনি তার উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ করছেন। ইউরোপের পথে পথে সুনীতিবাবুর জাগ্রত দৃষ্টি তা লক্ষ্য না করে পারছে না—ইতালি দেখছেন, ১৪ই জুলাইর প্যারিসের ছায়াছন্ন উৎসব দেখছেন; কিন্তু আরও অনেক বেশি দেখছেন তিনি ইউরোপের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা— তার লোকশিল্প, তার লোকজীবন। আর দেখেও দেখেন না —১৯৩৮-এর ইউরোপ, অর্থাৎ, সভ্যতার সংকট সমাগত। ইউরোপীয় সমাজ এক সংগ্রামের মুখে এসে ঠেকেছে—ইউরোপের সংস্কৃতি বাঁচবে কি মরবে তারই ঠিক নেই। যিনি এই সংস্কৃতিকে অত ভালোবাসেন তিনি যেন তার সেই মৃত্যুর সংকট দেখতে পাচ্ছেন না—অন্তত তাকে শুধু একটা রাজনীতির সংকট বলেই একপাশে ফেলে চলে যেতে চান, সংস্কৃতির সংকট বলে সম্পূর্ণ বুঝতে চান না। হয়ত মনে করেন —'সংস্কৃতি অমর, পুরাণো দেবতারা মরেন না।' রাজনীতিকে এমন সংকীর্ণ করে দেখলে সংস্কৃতিবোধই অসম্পূর্ণ থাকে। আর শিল্প, সাহিত্য, লোককলা এমন কি, লোকজীবনকেও জীবন্ত সমস্যা থেকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সে-দৃষ্টিকেও সীমাবদ্ধই বলতে হবে। 'ইউরোপ ১৯৩৮'-এর অসংখ্য কৌতূহলজনক কাহিনী পড়তে পড়তে আর অসংখ্য তথ্যে ব্যাকুল হতে হতে এই কথাই মনে পড়ে—এমন বহুমুখী বাঙালী মনস্বীও যেন রাজনীতিক দৃষ্টির অধিকারী নন, বুঝতে চান না এ ইউরোপ ১৯৩৮ নয় ইউরোপ—১৯৩৮ এর —যে কালে তাঁর মত পণ্ডিতকেও সোভিয়েট রাষ্ট্র নিজ দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয় না কেন, সাধারণভাবে তা Mission to Moscow থেকে বুঝতে পারি), সে-কালে দেশে দেশে ঘুরছে গোয়েবল্‌স্-গোয়েরিং ও জাপানের নানারকম চর অনুচর, গুপ্তচর অধ্যাপকরূপে ও ভ্রমণকারী বা টুরিস্টবেশে, এমন কি প্রাচ্যদেশে পর্যন্ত সে জাল ছড়িয়ে ফেলছে জার্মান আর্যামি ও জাপান। 'সহার্যের' ('Honorary Aryans') চক্রান্ত।

"ভারত সংস্কৃতির" অন্য দিক

কিন্তু 'আর্যামি' সুনীতিবাবুর চক্ষুশূল। তিনি যাকে সংস্কৃতি বলে মনে করেন তা আসলে শুধু কোনো জাতিবিশেষের 'প্রভুত্ব' নয় এমন কি সভ্যতার বিশেষ একটা রূপকে আঁকড়ে থাকা মাত্র নয়। তাঁর মতে মানুষের আত্মবিকাশের পথ বিচিত্র, আর ভারত-সংস্কৃতির আসল কথাই হল 'যত্র জীব তত্র শিব'—'যত মত তত পথ'। বহুদিন থেকে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হিন্দু ও আদর্শ হিন্দু সংস্কৃতির এরূপ অর্থই করে আসছেন। সে সময়ে অবশ্য হিন্দু মহাসভার বর্তমান কর্ণধারগণ অনেকে তাঁর লেখায় বা কাজে কৌতুক অনুভব করতেন। কারণ তখনো বাঙলায় নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, শতকরা ৫৩ জনের প্রতিনিধিরা মন্ত্রিত্ব করবার জন্য বসেননি, বিশেষত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা কর্পোরেশনের দিকে তাঁরা হাত বাড়াননি—আর তাই বর্তমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালী হিন্দুর মাথায় টনক নড়েনি। সুনীতিবাবু তখনো হিন্দুসভার সভ্য ছিলেন—এ-থেকেই তাঁর অকপটতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ভারত সংস্কৃতি বিষয়ে দৃষ্টি যে আর্যামি বা নব্য-সনাতনী—অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও পলিটিকাল চাল মাত্র নয় তা মানতে বাধা নেই। কিন্তু তাঁর মতবাদের মধ্যে যে সত্যটি আছে, তা আংশিক—সে কথায় তাঁর মত বিজ্ঞানবিদ্ মনস্বীর অবজ্ঞা করা আশ্চর্যজনক।

---

* অবশ্য ১৯৫৮ এবং তৎপরে বহুবার সুনীতিবাবু রুশ ও সোভিয়েত দেশে গিয়েছেন, তা সুপরিচিত। (১-৩-৭৪ ই.)

যত বড় বড় কথায় হিন্দুশাস্ত্র মানুষের সমতা ঘোষণা করে থাকুক, আপামর সাধারণ সত্যই কি এদেশে জীবনযাত্রায় তেমন মর্যাদা পেয়েছিল কোনোদিন ? এখনি কি পায় ? সুনীতিবাবুর কথিত মোটা মোটা আধ্যাত্মিকতার কথাগুলো মিথ্যা নয়। এসব ভালো ভালো কথা যে তবু কত অবাস্তব তা বুঝতে পারি এখনো, যখন দেখি—এই বাঙলাদেশেই বর্তমান সময়ে ভারত-সংস্কৃতির সেই চিরদিনকার মার-খাওয়া অন্ত্যজেরা পথে-ঘাটে, ঘরে-দুয়ারে কেমন করে মরল, কেমন করে মরছে। কোনো কালে পেয়েছে তারা হিন্দুধর্মের স্বরূপের খোঁজ ? কিংবা পেয়েছিল এই ভারত সংস্কৃতির আস্বাদন ? না, তাদের জন্য ভারত-সংস্কৃতির প্রবক্তারা এখনো অনুভব করেন কোনো মানবীয় মমতা ? আসল কথাটা মানতেই হবে,—অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতির মত' এই ভারত-সংস্কৃতি ও সমাজের অল্প লোকের সংস্কৃতি ছিল, সমাজের অধিকাংশ মানুষ ছিল তা থেকে বঞ্চিত। এমন কি, আজ পর্যন্ত ভারত-সমাজের সেই নিম্নস্তর যে তিমিরে সে তিমিরে রয়েছে।

মুসলিম ভারতের ভীতি

দ্বিতীয় কথা ঃ ভারত-সংস্কৃতি কি শুধুই বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দু বা বড় জোর বৌদ্ধদের সংস্কৃতি ? ভারতীয় ইসলামেরও কি কোনো স্থান নেই এই ভারত-সংস্কৃতির মধ্যে ? তর্কটা জটিল, তার অনেক উত্তর আছে, তাও জানি। সুনীতিবাবু নিজে ভারতীয় ইসলামের নানা রূপে মুগ্ধ, ইরানের সুফীবাদের রসগ্রাহী, আরবী সভ্যতার রোমাঞ্চকর দিকও তাঁকে বিমুগ্ধ করে, এসব জানি। কিন্তু আটটি নিবন্ধে তিনি ভারত-সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করলেন, তবু ইসলামের 'ভারতীয়' নিদর্শনকে 'ভারতীয়' বলে গণ্য করলেন কি না, এ সংশয় নিশ্চয় মুসলমান পাঠকের থাকবে।* আর, যতই তর্ক করি না কেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁরা মনে করবেন—আসলে অখণ্ড ভারত অর্থ এমনিতর এক ভারতীয় সংস্কৃতির সাম্রাজ্য, যাতে ইসলাম-অবলম্বী ভারতবাসীর সংস্কৃতি নগণ্য হয়ে যাবে, ডুবে যাবে, তলিয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, এরূপেই জানা-অজানায় 'অখণ্ড ভারত'বাদই পাকিস্তানবাদকে জাগিয়ে ও পুষ্ট করে তুলেছে। এ বিষয়ে আজ তর্কেও লাভ হবে না। ইরানী, তুর্কী, মিশরী প্রভৃতি জাতির বর্তমান জাতীয়তাবাদের নজির তুলে ফল নেই। মনে রাখা দরকার—সে-সব দেশে মুসলমানরা প্রায় সর্বত্রই, সংস্কৃতিতে বা আর্থিক ক্ষেত্রে অন্য ধর্মীয় কোনো প্রতিযোগীর ভয় তাদের নেই। ভারতবর্ষে ইসলামধর্মীদের সে-সৌভাগ্যলাভ হয়নি, এদেশে তাঁদের পরাজয়ের ভয় অত্যন্ত বেশি ও বাস্তব। তাই তাঁরা স্পেনের কথা তোলেন ; প্যালেস্টাইনের কথা বলেন। তাঁরাও সুনীতিবাবুর ভারত-সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় সহজেই আশ্বস্তবোধ করতে পারতেন—গৌরববোধও করতেন—যদি আজ ইসলামই ভারতের জনসাধারণের একমাত্র ধর্ম হত ;—ইরানের মত, মিশরের মত এ-দেশের মুসলমানরাও তখন অজন্তা-মোহেঞ্জোদরো নিয়ে গর্ব করতেন ! সে অবস্থা তাঁদের এদেশে নয়, অতএব তাঁরাও ভারতীয়তা-বর্জিত ইসলাম-কীর্তি নিয়েই এদেশে বাড়াবাড়ি করেন। এটি তাঁদের ভয় ও ব্যর্থতার, fear and frustration বোধেরই মুখোশ-পরা রূপ। অবশ্য পাকিস্তান যখন ভারতভূমিরই অন্তর্গত ভূভাগ বলে তাঁদের ধারণা, তখন ভারতীয় মুসলমানদের ঐ দাবিতেই প্রয়োজন—ভারত-ইতিহাসে ও ভারত-সংস্কৃতিতে ভারতীয় মুসলমান কি ঐশ্বর্য দান করেছেন, তা ব্যাখ্যা করা, এদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলকে তা বুঝানো।

এটি অবশ্য প্রধানত হবে ভারতীয় মুসলমান মনস্বীদের কাজ। কিন্তু এভাবে এই তিনখানা বই পড়তে পড়তে যে-কথা মনে জেগে ওঠে তা এই—এমন অকপট ও জ্ঞানবান পণ্ডিতের পক্ষেও এরূপ বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না কেন ? কেন তিনি মেক্সিকোর পুরানো দেবতার পুনর্জন্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছেন, তিনি কার্ডেনাস-এর রাষ্ট্র-নীতি ও রাষ্ট্র-দর্শনের কথা একবারও স্মরণ

* একথা এখন আর খাটে না। পরবর্তীকালে সুনীতিবাবু বহু প্রবন্ধে-গবেষণায় ভারতীয় জীবনে ইসলামের দান ব্যাখ্যা করেছেন। (১-৩-৭৪ ইং.)

করলেন না, উল্লেখও করলেন না? কেন তিনি ১৯৩৮-এর ইউরোপের উপর দিয়ে এমন নিরপেক্ষচিত্তে চলে যেতে পারেন—সমাগত রাষ্ট্রীয় সংকটকে গৌণ বলে জ্ঞান করেন? কেন আবার ভারত-সংস্কৃতির আলোচনায় অগ্রসর হয়ে তিনি বুঝতে চান না এই সহজ সত্য যে, প্রশ্নটা শুধু বিশুদ্ধ সংস্কৃতিগত প্রমাণপত্রের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা আজ প্রধানত ভারতীয় মুসলমান সাধারণের ভয় ভরসার প্রশ্ন, অধিকার ও ক্ষমতার প্রশ্ন?—যে দেশ বহু-জাতিক দেশ সে দেশে ইরান তুর্কীর নজির খাটে না; মিশর-মেক্সিকোর নজিরে সেখানকার সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু জাতি আশ্বস্ত হবে না, রাষ্ট্রীয় চেতনা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারা বরং ক্রমেই বুঝবে যে, মূলত রাষ্ট্রগত আত্মস্বাতন্ত্র্য না থাকলে সংস্কৃতিগত স্বরাজও রক্ষা করা যায় না। এই সহজ ও বাস্তব সত্যও এমন মনস্বীরা বুঝবেন না কেন?

কলোনির বর্ণান্ধতা

এই তিনখানা বই থেকে তাই মনে উদিত হল এই প্রশ্ন—কেন আমাদের মনস্বীরাও রাষ্ট্রবিষয়ে উদাসীন হন, বর্ণান্ধ হন? গত কয় বছরে যুদ্ধ সম্বন্ধে ও বৈদেশিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের অন্যান্য পণ্ডিতদের কথাবার্তা শুনেছি তাতেও এ প্রশ্ন বার বার মনে উদিত হয়েছে। তাঁরা কেউ রাজনীতির অধ্যাপক, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ আর্টিস্ট, কেউ সাহিত্যিক,—সকলেই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাঁদের যুদ্ধ ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি, কৌতুকও অনুভব করেছি। সে সম্বন্ধে অবশ্য একটা মোটা উত্তরও শেষে খুঁজে পেয়েছি। উত্তরটা সহজ হলেও সত্য, তবে বিশদ বলে না। তবে তা ছাড়া অন্য কারণ থাকবে জানি। আমার বিবেচনায়, এ জন্য দায়ী—সাম্রাজ্যবাদী অভিশাপ। এই 'কলোনির বেনোজীবনে' আমরা বিশেষ সচেতন না হলে রাষ্ট্রদৃষ্টিতে খাটো ও রাষ্ট্রচিন্তায় পঙ্গু হতে বাধ্য। এদেশে আমরা শাসক নই, আমরা শাসনযন্ত্র চালাই না, আমরা শাসনযন্ত্রের কলের জাঁতাই—বড় জোর যাঁরা শাসক তাঁরা, রাষ্ট্রের নীতি তারাই প্রণয়ন করে, তারাই পলিটিক্স ভাবে। দশদিকের দশদিকের কথা ভেবে তারা পলিসি ঠিক করে, আমরা তাদের হুকুম তামিল করি—কেন কি করি, তা না জানলেও হয় না—জানা কেরানীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, এমন কি না জানা কেরানীর পক্ষে নিরাপত্তার। সরকারী ও সওদাগরী অফিসে আমরা এই একই কাজ করি। শাসনযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় দপ্তর মারফৎ, অক্ষর ও সংখ্যার মধ্য দিয়ে; ব্যবসায়ের বা রাজ্যের পলিসি ও পলিটিক্স দুই-ই ভাবনা উপরওয়ালা কর্তৃপক্ষের; সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের তা চিন্তনীয়। এই কথাটা আমাদের বাঙালী সাংস্কৃতিক নেতাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই সংস্কৃতি মাত্র এক মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে আমাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি যেমনই কল্পনাকুশল তেমনি বাস্তববিমুখ। আমরা সাহিত্যশিল্পে যে-কৃতিত্ব দেখাই বিজ্ঞানে সে-কৃতিত্ব দেখাতে পারি না—জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র আর মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু থাকা সত্ত্বেও আমরা জীবনে, চিন্তায়, সমাজবিন্যাসে, এমন কি আধুনিক কালের ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল গবেষণা-মূলক নানাদিকে অগ্রসর হই না—আমাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক মূল গবেষণার পাদটীকা রচনা করেন, ঘর ভরতি করেন। ভারতবর্ষে আর্থনীতিক চিন্তার সূত্রপাত করেন এদিকে রমেশচন্দ্র দত্ত, ওদিকে রানাডে, দাদাভাই নওরোজী প্রভৃতি। পশ্চিম উপকূলে দেশীয় শিল্পপতিদের অভ্যুদয়ে আজ তাঁদের চাহিদা মেটাতে একদল জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্ গড়ে উঠছেন, মাদ্রাস প্রদেশেও গড়ে উঠছেন বস্তুনিষ্ঠ গবেষক। কিন্তু রমেশচন্দ্রের পরে বাঙলায় আর্থনীতিক গবেষণা প্রকৃতপক্ষে বানচাল হয়ে আছে। কারণটা এই—জমিদারীতন্ত্রের দেশে কৃষির উৎপাদনের জন্য জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী শিক্ষিতশ্রেণী, কারও মাথাব্যথা নেই। তাঁরা খাজনা পাবেন, সরকারেরও রাজস্ব বাঁধা, তাই তারও মাথাব্যথা নেই। অতএব, কৃষি সম্পর্কিত আর্থিক গবেষণাও বাঙালী পণ্ডিতেরা করেন না।

আবার বাঙলার শ্রমশিল্প বিদেশীদের দখলে। সেই শোষণের স্বার্থে—সেদিকে যতটুকু গবেষণা দরকার বিদেশীয় পত্রিকা (ক্যাপিটেল) ও পণ্ডিতদের মারফত বিদেশীয় শোষকগণ তা সমাধা কেরান। বাঙালী পণ্ডিতেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এসব বস্তু-প্রধান ক্ষেত্রে করেন ফাইল তৈরী, যার নাম রানীগিরি। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নকলের নাকাল'।

সমা। তাই আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মীদেরও প্রয়াস ও চিন্তাও অনেক সময় বড় জোর এরূপ 'বড় সাহেবের' তব্‌ আলোচনা হয়ে দাঁড়ায়—আমেরি কি বললে, কিংবা চার্চিল কি করলে, এই হয় আমাদের আলোচ্য। 'বড়বাবু' এ তো পলিটিক্‌স্‌ থাকবেই—তবে সে পলিটিক্‌স্‌ প্রধানত হয় অন্য রকমের। যেমন, আজ কেমন তার শ্যালাকে কেমন করে আমাদের উপরে প্রমোশন পাইয়ে দিয়েছে' অথবা, 'মেজ গিন্নী হচ্ছে চাকরিনতুন গয়না গড়িয়ে ছোট গিন্নীকে দেমাক দেখিয়ে গেল'। এই প্রমোশনের পলিটিক্‌স্‌ পলিটিক্‌স্‌ র পলিটিক্‌স্‌—যথা,—রেশনের দোকান কত পার্সেণ্ট কে পেল ; এবং 'গিন্নী-গয়নার আর' হচ্ছে গ্রামের ঘোটপাকানো 'হিন্দুকোড্‌' বা 'শ্রী পদ্মের' পলিটিক্‌স্‌।

কেরানী [illegible]াদের সমস্ত পলিটিক্‌স্‌ই প্রায় সেই দুই ধরনের দৃষ্টি বিন্দুর পলিটিক্‌স্‌। 'কলোনির এইটা' বক্তে' যে-গঞ্জনা মিশিয়ে থাকে, আমাদের শ্রেষ্ঠ মনস্বীরাও তার থেকে মুক্ত হতে পারছেন না—এই সাম্রাজ্যবাদের বড় অভিশাপ।*

*[illegible] ১৩২. [illegible] প্রকাশিত।

বাঙালীত্বের ভাঙা বনিয়াদ

পঞ্চাশে (১৩৫০ বাং) বাঙলায় মন্বন্তর গিয়েছে। একান্ন শেষ হল, যুদ্ধও শেষ হচ্ছে, ভাঙা বাঙলা যুদ্ধ, মন্বন্তর ও মহামারীর এ ক'বৎসরে কোথায় গিয়ে ঠেকল? আর, কোথায় গিয়ে ঠেকছে আমাদের এ-কালের বাঙলার সংস্কৃতি?

পঞ্চাশ তখনো শেষ হয়নি, কর্তৃপক্ষ বললেন 'বাঙলা মোড় ঘুরেছে'। আগেও বহুবার শুনেছি, তখনো আবার শুনলাম—'অবস্থা মুঠোর ভিতর এসেছে', 'আয়ত্তের মধ্যেই আছে'। তারপর একান্ন এগিয়ে চলল। কর্তৃপক্ষ সগর্বে শোনালেন, 'কই, দুর্ভিক্ষ কই এবার? দ্যাখো, অবস্থার উন্নতি হয়েছে'।

মন্বন্তর আর নেই। একান্নতে মন্বন্তর আসেনি। অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তা স্পষ্ট। কলকাতার পথে পথে মানুষ মরে পড়ে নেই, পায়ে পায়ে জীবন্ত নর নারীর কঙ্কাল ফুটপাথে, পার্কে, ঠেকে না; লঙ্গরখানা বন্ধ হয়েছে, ফ্যান ফ্যান বলে কেউ দুয়ারে হানা দেয় না; যারা ছিল তারা চোখের আড়ালে 'শ্রমকেন্দ্রে' ঠাঁই পেয়েছে; ডাস্টবিনে কুকুরে মানুষে মারামারি নেই; দেশী-বিদেশী কারো আর সেই 'অসহ্য' দৃশ্য চোখে পড়ে না; খবরের কাগজে তাদের ছবি দেখেও কাউকে বারে বারে শিউরে উঠতে হয় না; তার এককোণে লেখা থাকে সামান্য ক'জন দুস্থ হাসপাতালে এসে মরেছে। মফঃস্বলেও অবস্থার উন্নতি হয়েছে—বাজারে-বন্দরে, পথে ঘাটে আর গ্রাম ছাড়া ও ঘর ছাড়া লোক মরে পড়ে নেই, ঘাটে পথে স্টেশনে আর তাদের ভিড় নেই, মাঠে-প্রান্তরে মড়ার উপর শকুনি পড়ছে না,—দাহ করবার লোক জোটে, কবর দেওয়া হয়, ঘর থেকে মৃতকল্প মানুষকে শেয়াল টেনে বের করে না; গ্রামের মানুষ গ্রামে ফিরে গিয়েছে—শহরে ফিরে আসেনি। এখানে-ওখানে সরকারী 'শ্রমকেন্দ্রে' হাসপাতালে যা থাকবার তা আছে, নইলে "দুঃস্থ" আর নেই। বে-সরকারী রিলিফ সমিতিগুলোও তাদের কেন্দ্র বন্ধ করেছেন—দরকার নেই, অবস্থার উন্নতি হয়েছে। চালের দর কমেছে, কলকাতায় ও তার আশেপাশে ৪০ লক্ষ লোকের রেশনিং হয়েছে—চাল ডাল তারা পায়, চিনিও পায়। বাইরেও অনেক স্থানে বাঁধাদরে চাল পাওয়া যায়, দর নামছে। ধানের দর তো মাঝখানে অগ্রহায়ণ মাসে এত নামল যে মনে হল আগেকার দিন বুঝি ফিরে আসছে। সত্যই তাই কর্তৃপক্ষ গর্ব করতে পারেন—কই? একান্নতে দুর্ভিক্ষ এল কই?

পঞ্চাশের পরে

একান্নতে দুর্ভিক্ষ ঠেকানো গিয়েছে। কি করে এ সম্ভব হল তা বোঝা দরকার। প্রথমত, পঞ্চাশে আমন ফসল অপর্যাপ্ত ফলেছিল; তা উধাও না হলে একান্নতে বাঙলার দুর্ভিক্ষ হবার কারণ ছিল না। দ্বিতীয়ত, কলকাতা আর তার চারদিককার শিল্পকেন্দ্রের ৪০ লক্ষ নর-নারীকে এ বৎসর খাইয়ে রাখে ভারত সরকার; এজন্য বাঙলার বাইরে থেকে তারা ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টন আরও খাদ্য-দ্রব্য বাঙলায় আমদানি করেছিল। তৃতীয়ত, কলকাতা ও এই শিল্পকেন্দ্রে পঞ্চাশের শেষভাগ থেকেই রেশনিং চালু হয়—তাতে চাউল নিয়ে 'ফটকাবাজী'র সবচেয়ে বড় একটা সুবিধা মুনাফাদাররা হারায়। একান্নতে তখন তাদের একমাত্র ভরসা থাকে মফঃস্বলের বাজার—সেখানে রেশনিং চালু হয়নি। বাঙলা সরকার সেখানকার বাজারে 'বাঁধাদর' চালু রাখবার জন্য সামান্যই খাদ্য সংগ্রহ করবে (procurement) ঠিক করে; বাজার মোটের উপর ছেড়ে দেয় 'স্বাধীন ব্যবসায়ের' হাতে—যাদের হাতে ছিল তা

পঞ্চাশেও। আবার, সরকারের পক্ষে কিনবার জন্য যে এজেন্ট ও কর্মচারীদল নিয়োগ করা হয় তাতে মফঃস্বলের বাজারে সেই ফটকাবাজারী মুনাফাদারদের দুয়োর খোলাই থাকে। এজন্যই একান্নতেও মফঃস্বলে চালের বাজার ঠিক 'বাঁধা' থাকেনি—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে চট্টগ্রামের মত অনেক জায়গায় তা আগুন হয়ে ওঠে; আবার কার্তিক-অগ্রহায়ণে বহু জায়গায় সাধারণ কৃষক সস্তায় ৩ ৪ টাকা দরে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তারপরে যেই ভারত সরকার কলকাতাকে আর খাওয়াবে না জানা যায় অমনি ফড়েরা চালের দর খানিকটা বাড়িয়েও ফেলে। মোটের উপর, কলকাতায় রেশনিং থাকতে চালের মুনাফাদারদের অসুবিধা ঘটে এবং মফঃস্বলে রেশনিং না থাকাতে তাদের বাঙলাদেশে যথেষ্ট ফাঁকও থাকে—চালের বাজার তাই স্থির হতে পায়নি।

একটা কথা তা'হলে মনে রাখতে পারি : 'রেশনিং এদেশে চলে না'—এই ছিল গোটা ঊনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ জুড়ে সরকারের বুলি। আমরাও অনেকে তাতে অপরোক্ষে সায় দিয়েছি; কারণ, 'রেশনিং' মানে সরকারের কর্তৃত্ব; আর এ সরকার বিদেশী, আমাদের বিশ্বাসভাজন নয়। তবু রেশনিং কলকাতায় চালানো শেষ পর্যন্ত সরকার স্থির করে। বাঙলাদেশে ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর বিনিময়ে, কলকাতার পথে ঘাটে অনেক 'অসহ্য' দৃশ্য দেখে—রেশনিং মেনে নিতে হয়। ৪০ লক্ষ লোকের রেশনিং চালু হতেও চলল। বোঝা গেল—যুদ্ধের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় 'রেশনিং' ছাড়া অন্য পথ নেই; যতক্ষণ অস্বাভাবিক অবস্থা থাকবে ততক্ষণ রেশনিংকে চালু রাখাই হবে সাধারণের বাঁচবার উপায়। তবু এখনো মফঃস্বলে তা সরকার চালু করতে চায় না। সেই পুরনো কথা—"হয় না।" ৪০ লক্ষ লোকের জন্য তা হয়েছে, ৭৭টি শহরের ২০ লক্ষ লোকের জন্য 'রেশনিং' হবে না কেন তবে? হয়ত, আরও কয়েক লক্ষ না মরলে তা হবে না।

একান্নর:মহামারী

একান্নতে দুর্ভিক্ষ আসেনি কিন্তু আমরা বেশ জানতাম—দুর্ভিক্ষ গেলেও তার জের চলবে কিছুদিন। পঞ্চাশে পথে বেরিয়ে পড়েছিল যারা তারা সবাই বেঁচে নেই। যারা বেঁচে আছে তারা সবাই ঘরে ফিরে যেতে পারেনি,—ঘরই তাদের অনেকের নেই। অনেকেই ঘর-পরিবার বন্ধনের মমতা আর রাখেনি। অনেকে না খেয়ে আর অখাদ্য খেয়ে কর্মশক্তি হারিয়েছে; তাদের খেটে খাবার সামর্থ্যও নেই; জমি নেই, হালের গরু মরে গেছে, লাঙলের ফাল নেই, লোহা নেই, বীজ নেই ইত্যাদি। অর্থাৎ বাঙলার গ্রাম-জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দরকার, জীবনে এদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একান্নতে সরকার ঠিক করে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করবে। তাতে সারা বাঙলায় চলে ২৬৮টি'র মত এদের 'শ্রমকেন্দ্র', ৬৭টির মত 'দুঃস্থনিবাস', ৮৮টি 'শিশু হাসপাতাল'। তারপর সরকারের নতুন স্কিম হয়—এসবের স্থলে ৬০টি 'কেন্দ্রীয় শ্রমশালা' খোলা হবে, তাতে ৬ হাজার দুঃস্থ খেটে খাবে। মনে রাখবার মতো কথা এই—'দুঃস্থেরা' চোখের আড়ালে গিয়েছে, কিন্তু বাঙলাদেশে একান্নতে দুঃস্থের সংখ্যা ৬ হাজার ছিল না, ছিল প্রায় ৬০ লক্ষ; আর যাও বা টাকা সরকার এই 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার' (Rehabilitation) কাজে খরচ করছে তার অনেকটাই যাচ্ছে নৌকো-তৈরীর ঠিকাদারী যারা পেয়েছে, 'শ্রমকেন্দ্রের' ভার যারা নিয়েছে, সেসব লোকের উদরে। মন্বন্তরের শেষে আসে মহামারী। তার জন্য সরকার খোলে ১০০-করে রোগীর হাসপাতাল ৫২টি, ৫০-করে রোগীর হাসপাতাল ৫০টি; ২০-করে রোগীর হাসপাতাল ৪৪১টি। মোট, ২৯,৬২০টি রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে। ডাক্তার বিধান রায় থেকে সবাই বলছিলেন রোগীর সংখ্যা আজ হাজার বা লক্ষ নয়, ২ কোটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরাও বললেন— তাই। একান্ন-র বাঙলা হল মহামারীর বাঙলা।

চোরাবাজারের রাজত্ব

'পঞ্চাশের শেষেই মহামারী এসেছিল—'একান্ন জুড়ে তার ধ্বংসলীলা চলে। পঞ্চাশেই মানুষ মরবার পথে এগিয়েছিল—তবু মন্বন্তরে যা মরেছে, মহামারীতে, শোথে, আমাশয়ে, কলেরায়, বসন্তে আর ম্যালেরিয়ায় তার চেয়েও অনেক বেশি মানুষ মরল একান্নতে। 'অবস্থার উন্নতি হয়েছে' যখন কর্তৃপক্ষ বলছিলেন, তখনই না খাওয়া এবং অখাদ্য-খাওয়া মানুষ মরছিল। এরূপে পঞ্চাশ মন্বন্তর গিয়ে একান্ন মহামারীতে কালো হয়ে উঠেছিল। একান্নর প্রারম্ভেই মনে হয়েছিল এরূপ হবে। তখনই যা পরিষ্কার হয়ে উঠল তা এই—ঔষধপত্র নেই, কুইনাইন কম, কিন্তু তা অদৃশ্য হল; তার যতরকমের নতুন রূপ বের হল, যা-কিছু বিতরিত হল কিছুই রোগীর হাতে পৌঁছল না; এমন কি, কুইনাইন মিষ্টি হয়ে উঠল। এক কথায়, যা চালের ব্যাপারে পঞ্চাশে ঘটেছিল তাই ঔষধপথ্যের ব্যাপারে একান্নতে ঘটল—ঔষধ নেই, কোনো ঔষধই নেই, যত ঔষধই বাজারে ছাড়ুন, তা আর পাওয়া যাবে না।

কিন্তু শুধু ঔষধও নয়, একটার পর একটা জিনিস বাজার থেকে পালাতে লাগল। কাগজ, কয়লা, চিনি, সর্ষের তেল, কেরোসিন, এসব আগেই দুষ্প্রাপ্য হয়েছিল, একান্নতে বাজার থেকে সব ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল। সুতোর কনট্রোল হল, সুতা আর বাজারে নেই। লবণ কমাসের মত মানুষ-গরুর ভাগ্যে জুটল না, অথচ কাস্টম্স্ বিভাগের হিসাবে বলবে—এসময়ে বাঙলাদেশে যত লবণ আসছিল আগে কোনো সময়ে তত লবণ আসেনি। তাদের মতে তার কারণ—কেনা-দরের উপরে বিক্রয়ের যে দর সরকার বেঁধে দেয়, তাতে ব্যবসায়ীদের প্রচুর লাভ হচ্ছিল, তাই এত লবণ তারা আমদানি করছিল। কিন্তু তবু সে-দরে—এবং তার দ্বিগুণ দরেও—লবণ বাজারে মিলছিল না মানুষের। অর্থাৎ যা বাঁধাদরের লাভ তার অপেক্ষাও বহুগুণ মুনাফার নেশা তখন পেয়ে বসেছে ব্যবসায়ীদের, লবণ তাই যাচ্ছিল চোরাবাজারে। পঞ্চাশে চোরাবাজারের প্রধান আশ্রয় ছিল চাল; চিনি, কাগজ, কয়লা, কেরোসিন ছিল তার অন্যান্য গৌণ উপকরণ। এখন দেখছি কাপড়েও সুতার চোরাকারবারীর লুণ্ঠনোৎসব। একান্নতে চোরাবাজার ভাত-কাপড় ছাড়াও বাঙলার সমস্ত পণ্যদ্রব্যের উপরে রাজত্ব বিস্তার করলে—লাঙলের খুর, ঘরের বাঁশ খড়, তাঁতীর সুতা, কামারের লোহা, কুমোরের মাটি পর্যন্ত ক্রমে চোরাকারবারীরা হাত করে বসেছে! একান্নর প্রধানতম সত্য এই—বাঙলাদেশে অন্য বাজারই আর নেই—চোরাকারবারী তার কবলে নিয়ে এসেছে প্রায় সমস্ত বাজার, এমন একটি জিনিস আর বাঙলায় নেই যা সহজ পথে ন্যায্যদামে কিনতে পারে কেউ।

'ন্যায্যদাম' মানে আগেকার দাম বলছি না—সে দাম তো বাঙলাদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। চোরাকারবারীর চাপে সরকার ধাপে ধাপে দাম বাড়িয়ে গিয়েছে; অর্থাৎ চোরাকারবারীর স্পর্ধাকে বাড়িয়ে তুলেছে, আগেকার সাধু কারবারীকে চোরা বাজারে ভর্তি হতে বাধ্য করেছে, সাধারণকে বাধ্য করেছে সেই অন্যায় দামকে 'ন্যায্যদাম' বলে মেনে নিতে। এক মাসে যা ছিল চোরাবাজারের দাম, পরমাসে সরকার থেকে তাকেই করা হল 'বাঁধা দর', 'কন্ট্রোলের দর'; তা'ই তখন 'ন্যায্য দর'। তাই পঞ্চাশে যা ছিল চোরাবাজারের দর একান্নতে তা'ই হল বাঁধা দর, কনট্রোলের দর- তাকেই তখন বলি 'ন্যায্য দর।'

জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা

একান্নতে জিনিসপত্রের এই অসম্ভব দর, চোরাকারবারীর total victory বা সর্বগ্রাসী বিজয়ের প্রধান সাক্ষ্য ও তার স্বরূপ বোঝা দরকার। গরীব বা মধ্যবিত্ত বাঙলাদেশে এমন কেউ নেই আজ

যারা এই বিক্রয়দরের দাপটে ওষ্ঠাগতপ্রাণ নয়। কলকাতায় মাস ছয় আগে "স্টেটস্‌ম্যান" এই খাদ্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্যের দরের তুলনামূলক হিসাব বের করে। তাতে আমরা দেখি—কাপড়ের হিসাব বাদ দিয়েই দেখি—পঞ্চাশের তুলনায় একান্নতে মাছের দর বেড়েছে শতকরা ১১১ হারে, দুধের দর বেড়েছে ৮৫ হারে, আর তরকারি ১১৮ হারে, মোটামুটি খাদ্যদ্রব্যের দর দুর্ভিক্ষের সময়কার তুলনায়ও বেড়েছে শতকরা ১০৪ হারে—যদিও রেশনিং-এর ফলে শহরে চাল-ডাল, চিনির দর তখনকার দর থেকে কম।

গরীবেরা দুধ, মাছ ছেড়েছে অনেকদিন, কাপড়ও পরতে পায় না। যুদ্ধের আগে তাদের চাল কিনতে হত ৩ টাকা মণ, সে চালের বাঁধাদর একান্নতে হল ১২ টাকা ৫ আনা, ডাল কিনতে হত ৭ পয়সা সের, বাঁধা দর হল সোয়া ৮ আনা; তেল ছিল সাড়ে ৬ আনা সের, বাঁধা দর হল ১ টাকা পৌণে দশ আনা; লবণ ছিল ৫ পয়সা সের, বাঁধাদর হল সওয়া ৪ আনা; গুড় ছিল ১০ পয়সা সের, হল সোয়া ৯ আনা। দেখা গেল যুদ্ধের আগে যেসব জিনিসের দর ছিল ১০০ টাকা এখন সেখানে তাদের দর হয়েছে ৩৯৭ টাকা। গ্রামের গরীবেরা আগে যেখানে ২০ টাকায় সংসার চালাত, আজ সেখানে সংসার চালাতে হলে চাই অন্তত ৭৫ টাকা।

সত্য কথা, আগে দেশে চলত ২০০ কোটি টাকার নোট, আজ সেখানে চলছে ৮০০ কোটি কাগজের টাকা। অথচ জিনিসপত্র যে চারগুণ তৈরী হচ্ছে, উৎপন্ন বেশি হচ্ছে, মোটেই তা নয়। আমরা চোখে দেখছি কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন বাড়েনি, পাটের, ধান-চালেরও উৎপাদন বাড়েনি। নতুন নতুন জমি আবাদী হয়েছে সামান্য, বরং পুরনো জমিও এবার অনেকখানে অনাবাদী পড়ে রয়েছে—কোনো ফসলই বেশি বাড়েনি। শিল্পজাতের অবস্থাও তাই। চোখে অবশ্য দেখছি যুদ্ধের জন্য কত নতুন জিনিসের চাহিদা। কিন্তু লক্ষ্য করছি না কত আগেকার শিল্প নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই, সত্য কথা এই যে, কোনো কোনো বিশেষ শিল্পে উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু মোটামুটি এখন যুদ্ধের আগের তুলনায় জিনিস দেশে কম উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ জিনিসের তুলনায় বাজারে টাকা চলছে চতুর্গুণ। তাই জিনিসপত্রের দরও বাড়তে বাধ্য—"মুদ্রাস্ফীতির" অবশ্যম্ভাবী ফল তাই। কিন্তু তার ফলে জনসাধারণ জিনিসপত্র বিক্রি করে বেশি দাম পায় না। কারণ মুনাফা করে ঠিকাদার, ব্যবসাদার, মালদার প্রভৃতি তারাই, যারা সরকারের সঙ্গে সরাসরি কারবার করে, যারা যুদ্ধের সরবরাহে সংযুক্ত। এসব মুনাফাদারদের হাত থেকে কিছু মুনাফা বিশেষত গড়িয়ে পড়ে মাঝখানকার ব্যবসায়ী কারবারীদের হাতে। কিন্তু এই মধ্যব্যবসায়ীর ঘাঁটির পর ঘাঁটি পেরিয়ে গরীব মজুর, গরীব কৃষক, গরীব কারিগর, মাস্টার, কেরানী এদের হাতে সেই কাগজের টাকা পৌঁছতে বেশি পায় না। এ কৌশলে গরীবের আয় তাই বাড়ে না, অথচ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। তাদের ভাগ্য আরও খারাপ হয়, বাঙলাদেশের মত প্রদেশে—যেখানে যুদ্ধের চাহিদায় এরূপ টাকার কাগজের স্রোত বইয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ উৎপন্ন ফসল বা শ্রমজাত বাড়েনি। এসবের ফলে জিনিসের দর বাড়ে, কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় সে-তুলনায় বাড়ে না। এমন কি, সামরিক কাজে গেলেও যে মাইনে তারা পায় তা-ও হয় জীবনধারণের পক্ষে ক্রমে অপর্যাপ্ত। এই কথারই প্রমাণ দেখা গেল একান্নতে। সুস্থ দেহ লোকেরা যে কেউ পারে সমস্ত বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে যুদ্ধের কাজে—সেখানে মাইনে বেশি। কিন্তু সে মাইনের তুলনায়ও জিনিসপত্রের দর বেড়ে গিয়েছে আরও বেশি। কাজেই তাদের সংসারের অভাব ঘোচেনি, তাদের পরিবারের অনাহার শেষ হয়নি। এদিকে শ্রমিকদের মাগগী ভাতা এ বছরে আর বাড়েনি। গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক তেমনি আছে। হাই স্কুলের শিক্ষকেরা এ-আর-পি'তে এখানে সেখানে পালিয়েছে। যুদ্ধ থামলেই এসব লক্ষ লক্ষ লোক আবার বেকার হবে। অন্য দিকে কেরানীরা ধুঁকছে, ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল, মোক্তার—নিজের পায়ে আর দাঁড়াতে পারে না। কৃষক চাষীর কথা, গ্রামের কারিগরের কথা আর বলা নিরর্থক; এ দরে জিনিসপত্র কেনবার মত আয় এদের কারো নেই।

মুনাফার ফাঁস

এ সময়ে তাই গরীবেরা আরও গরীব হয়েছে। অথচ দেশে টাকার জোয়ারও চলেছে—তাতেই ধনীরা আরও ধনী হয়েছে। হিসাব করলে দেখব—যুদ্ধের পূর্বে যেখানে মালিক বছরে ১০০ টাকা লাভ করেছে, আজ সেখানে চটকলের মালিক লাভ করেছে ৯২৬ টাকা, বস্ত্রশিল্পে ৬৪৫ টাকা, চা-এ ৩৯২ টাকা, চিনিতে ২১৮ টাকা, কয়লায় ১২৪ টাকা—অতিরিক্ত মুনাফা-কর ফাঁকি দিতেও আজ তাদের ভাবতে হয় বেশি। [দ্রষ্টব্য যুদ্ধ থামতেই (১৯৪৫-৬) অতিরিক্ত মুনাফা উঠে গিয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফা ও চড়া দর ঠিকই রয়েছে। লেখক, ২০। ২। ৪৬] এ মুনাফা অবশ্য উৎপাদন বাড়িয়ে তারা করেনি—উৎপাদন কমিয়েই বরং তারা করছে। কাপড়ের মতো কোনো কোনো জিনিসে উৎপাদন কমিয়ে তারা চোরাবাজার ফাঁপিয়ে তুলেছে—তাতে মাল তৈরী করতে হচ্ছে কম, অথচ মুনাফা হচ্ছে বেশি। যেমন, কাপড়ে গজপিছু সুতার পরিমাণ কমিয়ে দিলে আরও লাভ বাড়ে। এসব চোরা-কারবার থেকে বাঙালী-অবাঙালী কোনো মালিক আজ বাইরে নেই। সকলেই ভাবে, টাকার জোয়ার চলেছে, সবাই বেরিয়ে পড়েছে—"এ বেলা যা পারি করে নিই।"

তাই যে গরীবদের আয় বাড়েনি—'একান্নতে যাদের ১০ টাকার সংসার খরচ ৭৫ টাকায় উঠেছে—তারা সহজভাবে সেই "ন্যায্যদামেও" কোনো জিনিস এখন কিনতে পারে না। চোরাবাজারে ছাড়া জিনিস নেই—সমস্ত ব্যবসাপত্র আজ চোরাকারবারীর কবলে ; আর, যারা এই চোরাকারবারীর সঙ্গে কোনোরূপে জুটতে পারছে না—তারা অসহায়, জীবনযাত্রায় আজ অক্ষম,—তারা মনে করছে—চোরাকারবারীই রাজা, তারই নিয়মকানুন সরকারও মেনে নয়।

যুদ্ধের মধ্যদিয়ে এভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিকৃত পরিবেশে চোরাবাজারে গড়ে উঠেছে এক বিকৃত ধনতন্ত্র।

চোরা-কর্মচারীর দৌরাত্ম্য

চোরাবাজার রাজাবাজার হল - তা দেখেছি। তার দরই হয় বারে বারে বাঁধা দর। কিন্তু কেন চোরাবাজার দমন হয়নি, তা বোঝা দরকার।

এমনিতেই বিদেশী শাসন কোনোদিন জনসাধারণের মুখচেয়ে কাজ করে না। তাদের দ্রষ্টব্য হয় প্রথমত সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ, দ্বিতীয়ত সাম্রাজ্যবাদের দেশী তাঁবেদারদের তুষ্টি। কায়েমী দেশী স্বার্থকে তাই এই শাসনতন্ত্র একটু পথ ছেড়ে দেয়—রাজা, উজীর, জমিদার এবং বস্ত্রমালিক কয়লা-মালিক, চিনির-মালিক, চালের-রাজা প্রভৃতির মুনাফা বাড়িয়ে তাদের তুষ্ট করে ; শ্রমিক, কৃষক, গরীব কারিগর, এমন কি, মাস্টার, কেরানী, চিকিৎসক প্রভৃতি উৎসন্ন গেলেও ফিরে তাকায় না। তৃতীয়ত, সাধারণ সময়েও এই আমলাতন্ত্র বেশি কর্মপটু ছিল না, তার অব্যবস্থা ছিল সুপরিচিত। চতুর্থত, তাদের সাধুতার সুনাম বিচারবিভাগ ও ডাকবিভাগ ছাড়া অন্যত্র কোথাও ছিল না। এই পথ-ধরা বিদেশী আমলাতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে এসব কারণে দুর্বিপাকে পড়লে একেবারে দেউলে হয়ে পড়ে, তার শাসনতন্ত্র শুধু শোষণযন্ত্রেই পরিণত হয়, হয়ে পড়ে নতুন-ধনী 'চোরা-কারবারীর' হাতের অস্ত্র। পঞ্চাশের মন্বন্তরেই তা স্পষ্ট হয়েছিল। দিল্লীর এসেম্বিলতে আজ সেই 'ভিটে-ছাড়াবার' দিনের হিসাব-শূন্য চুরি নিয়ে কথাকাটাকাটি হচ্ছে। একান্নতে আত্মসমর্পণের গরজে এই শাসকসমাজের দুর্নীতির কথা লাট সাহেব স্বীকার করলেন। দুর্ভিক্ষ কমিশনের কাছে বারে বারে তা উল্লেখিত হল। এমন কি, বাঙলা সরকারও আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিশন বসিয়ে তা মেনে নিয়েছে। চোরাকারবারীর জন্ম বা প্রসার এতটা সম্ভবই হত না—যদি বাঙলার শাসনকার্যে কিছুমাত্র কর্মিষ্ঠ বা সৎ কর্মচারী থাকত। তাদের অকর্মণ্যতার কথা বলে লাভ নেই—মন্বন্তরের

পরেও 'খাদ্য ফসল বাড়ানোর' আন্দোলন তাদের কৃপায় এতদূর এগিয়েছে যে, সাধারণ বছরের ফসলের তুলনায় একান্নতে আমন ফসল উৎপন্ন হয়েছে শতকরা ১০ ভাগ কম—অথচ তামাক, সুপারি, সব জিনিসের উপর ট্যাক্স বসেছে, তা আদায়ও হচ্ছে। কিন্তু বলদের জন্য বাজেটে ধরা হয়েছিল ২ কোটি টাকা, তার দু'দশ লক্ষও কৃষকেরা চেয়ে চেয়ে পেল না—টাকা খরচও হল না। সেচবিভাগের জন্য খরচ বরাদ্দ হয়েছিল ১০ কোটি (?) টাকা। তার ৪০ লক্ষও খরচ হয়নি—কৃষকেরা ছোট বড় যে-কোনো স্কিম করলে সরকারের তা মনঃপূত হল না; সরকারের নিজেদের স্কিমও তৈরী হয় না। পঞ্চাশের অভিজ্ঞতার পরেও গুদামে গুদামে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য পচে শেষ হল—কারো কোনো দায়িত্ব নেই। 'বাঁধা দরের' জন্য চাউল কিনে একান্ন সালে বাঙলা সরকার সাড়ে একুশ কোটি টাকা ঘাটতি দিলেন। এই ঘাটতির টাকাটাও এসেছে দেশের গরীবের দেওয়া রাজস্ব থেকে—টাকাটা গেল অবশ্য ন্যায়বান এজেন্ট সাব-এজেন্ট প্রভৃতির পেটে—চোরাকারবারীর তহবিলেই তা জমা হল। এসব শুধু অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতা নয়—তার থেকেও বেশি কিছু। প্রত্যেক বড় আমলাই এই অবস্থার পিছনে ও সঙ্গে জড়িত। ঘুষ ছাড়াও আবার আছে কুব্যবস্থা—আত্মীয়পোষণ। চাল থেকে কাপড় পর্যন্ত সমস্ত ব্যবসায়ী নিয়োগের মধ্যে লাইসেন্সদানের পিছনে এই নীতি রয়েছে। খাদ্য-সমিতি-গুলো সাধারণের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের চোর প্রেসিডেন্ট ও চোর সরকারী কর্মচারীর অস্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে। সরকারী কর্মচারীরাও মনে করছে—স্বনামে, বেনামে এ বেলা করে নিই যা পারি—তারও কি দৃষ্টান্ত দিতে হবে আর? তৃতীয় লক্ষণও এমনি স্পষ্ট। এমন ঘুষের রাজত্ব—অন্যায়ের, উৎকোচের, চরিত্রহীনতার উৎকটতা বোধ হয় নবাবী আমলে বা কোম্পানীর আমলের প্রথম যুগে ছাড়া দেখা যায়নি। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে, নিজের গরজেই কর্তাদের এখানে ওখানে দু'একটি ছোট বড় কর্মচারীকে অভিযুক্ত করতে হয়েছে। কিন্তু সে নামে মাত্র—'পুকুর চুরি' বন্ধ করবারও ইচ্ছা নেই তাদের। থাকলে যারা চোরাকারবারের রাজা তারাই কি করে স্বনামে বেনামে সরকারের নানা বোর্ডে আসন পায়, সরকারের নানা অর্ডার ও লাইসেন্স পায়, সাজা পেলেও তাঁরাই থাকেন কাপড়ের, কাগজের, চাউলের, কয়লার ভাগ্যবিধাতা? দুর্নীতি দমনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকলে—কেন এমন আইন পাস হয় না যে, হাইকোর্ট থেকে একটা বিচার কমিশন বসুক—তাঁরা যে-কোনো মন্ত্রী, সেক্রেটারী, সরকারী কর্মচারীর স্বনামী-বেনামী জমা-খরচ তলব করবেন, তারপর বিচার-বিবেচনা করবেন যে-কোনো কর্মচারী বা মন্ত্রী মরলে বা পেন্সন নিলেও তার দশ বৎসরের মধ্যে তাদের ওয়ারিশদের সম্পত্তি ও অনুরূপভাবে হাইকোর্টের কমিশনে বিচার করে দেখতে পারবে?

আসলে দমন করবার ইচ্ছা থাকলে নানারূপে সে পথে কর্তৃপক্ষ অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু আমরা বুঝি—তা সাধ্য ও তাদের পার্টির হয়েছে। বাঙলার মন্ত্রিপক্ষও যেমন চোরাকারবারীর প্রভাবে আচ্ছন্ন, বাঙলার মন্ত্রি-বিরোধী পক্ষও তেমনি চোরাকারবারীর দ্বারা চালিত। তারা একত্র হতে পারে চোরাকারবারের সপক্ষে—কন্‌ট্রোলের বিরুদ্ধে রেশনিং এর বিরুদ্ধে, তাদের সাধ্য নেই দমন করে চোরা কর্মচারীদের। আর চোরাকারবারীর সর্বাপেক্ষা শক্তিমান সহকারী আজ এই চোরা কর্মচারী। মিলিটারি সাপ্লাই এর নাম করা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন, সিভিল সাপ্লাই ও পুলিশবিভাগ আজ সমপর্যায়ে পড়ে, বাঙলাদেশে এমন বিভাগই কম যেখানে আজ ঘুষ ছাড়া কাজ হতে পারে—ঘুষ ছাড়া রেলের লাইনে দাঁড়িয়ে টিকেট পাওয়া যায় না, গাড়িতে চাপতে পারা যায় না, স্টেশন থেকে সদর রাস্তায় বেরুনো যায় না, বিলফের মাল নিয়ে চলা যায় না, ঘুষ ছাড়া গরীবেরা রেশন পায় না, রেশন কার্ড পর্যন্ত পায় না।

এ কালের সবচেয়ে বড় সত্য তাই এই যে, বাঙলার আর্থিক ও সামাজিক জীবন এক নতুন শক্তির দ্বারা কবলিত হয়েছে। সে শক্তি চোরাকারবারী আর তার সহকারী চোরা কর্মচারী।

নৈতিক ও মানসিক পরাজয়

এই কথার অর্থ যে কি আমরা এখনো সম্পূর্ণ বুঝি না। কিন্তু পঞ্চাশের পরে একান্ন থেকে তা ক্রমে স্পষ্ট হল। এই নতুন কুগ্রহের উদ্ভবে বাঙলার নৈতিক মানসিক রূপও পরিবর্তিত হচ্ছে,—

তার উপরে চেপে বসেছে চোরা-কারবারীর নৈতিক মানসিক আদর্শ—মানে তাদের আদর্শহীন, হৃদয়হীন আত্মসর্বস্ব বর্বরতা।

কথাটা সংক্ষেপেই বলি :—প্রথমত এই চোরাকারবারী বাঙলার সমাজে এল কোথা থেকে? যুদ্ধের ঠিকাদার, নানা ব্যবসায়ী আড়তদার, মালিক যুদ্ধের মধ্যে এসে জুটেছেন টাকা লুঠবার লোভে। তারা পূর্বের মতো কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীর নয়—তাই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর যা চিরদিনকার আদর্শ ছিল, যেমন, ব্যবসায়ে ন্যায়নিষ্ঠা, ইণ্টানিস্টবোধ, স্বজাতির জন্য মমতা, দেবদ্বিজে ভক্তি, দরিদ্র সেবা, জাকাৎ ঈমান,—এসব কোনো বালাই তাদের রইল না। তারা এসেছে শুধু একটি মন্ত্র নিয়ে—'যা পারি করে নিই এ বেলা'। এ মন্ত্রের সামনে দয়া নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, পারিবারিক পবিত্রতা নেই, কোনো মানবধর্মই নেই, আছে শুধু লোভ ও আত্মসর্বস্বতা—'যা পারি করে নিই এ বেলা'। তাই পঞ্চাশে তারা মানুষকে মরতে দেখেছে, পরিবার সংসার ছারখার হতে দেখেছে, স্ত্রীলোকের দেহ বিক্রয় হতে দেখেছে—কিন্তু চালের মুনাফা ছাড়েল না। বরং জমিজমা যেখানে পারল কিনতে লাগল, যেখানে দরকার নারী-বিক্রয়ের ব্যবসাও চালাল। সেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের শেষে একান্নতে বাঙলার সমাজে যখন চোরাকারবারী ও চোরা কর্মচারীর রাজত্ব স্থাপিত ছিল তখন কি দেখছি?—ক্ষুধার জ্বালায় যারা একদিন আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্য মানমর্যাদা, স্নেহ-মমতা ভুলে পথে বেরিয়েছিল তারা আর অনেকে সংসারধর্মে, পারিবারিক আদর্শে ফিরে যেতে পায়নি—চায়ও না। অভাব রয়েছে—কিন্তু স্বভাবও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারা দেখছে সব জিনিসের দাম আছে, দাম নেই শুধু মানুষের, মনুষ্যত্বের, মায়া-মমতার, মান ইজ্জতের। তারা বুঝল—সমাজে রাজা আজ চোরাকারবারী—তারই দুর্নীতি তাই "ভদ্রলোকদেরও" ক্রমে গা-সহা হয়ে উঠেছে, অভাবে-অনটনে তাঁরা চোরাকারবারীকেই এখন 'বাহাদুর' মনে করেন।"

দেড়শ' বছর ধরে চেষ্টায় বাঙালী ভদ্রলোক একটা জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তার বনিয়াদ খুব পাকা নয়। তবু তার সৃষ্টি ও আদর্শ ও ঐতিহ্য গৌরব করবার মত। কিন্তু সেই ভদ্রতাবোধ, ভদ্রলোকের আদর্শ—সেই স্বজাতিপ্রীতি, দেশপ্রেম, সেবাধর্মে নর নারায়ণের সেবা--সবকিছুতে সে আজ আস্থা হারাচ্ছে। মাস্টার, কেরানী, শিক্ষিত ভদ্রলোক—কোথায় তাদের আজ সম্মান বা বাঁচবার শক্তি? চোরাকারবারীর দিকে কে না তাকায় সহিংস ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে? আর হতভাগ্য নিম্নবর্ণেরা—জেলেরা, যোগীরা, কামারেরা-কুমরেরা, ঋষিরা, বাদাকরা, গ্রামের মালী, গ্রামের মুচি, গ্রামের ডোম, হাড়ি?—যাদের মেয়েরা পঞ্চাশে শতে শতে আত্মবিক্রয় করেছে, আজ কি বলতে হবে তাদের কথা? কে না জানে লেবারকোরের কথা, তার অর্থ "শ্রমকেন্দ্রে" যে সরকারী-বেসরকারী কর্তাদের পাপ-ব্যবসা চলেছে, কে জানে না তার কথা? গ্রামে গ্রামে যে জঘন্য বৃত্তি আজ চোখসওয়া হয়ে গিয়েছে, কে শোনেনি সে সংবাদ? এক এক জেলায় আজ শতকরা ৫ থেকে ১০ জন যৌন ব্যাধিতে ভুগছে, বেশ্যালয় ছড়িয়ে পড়ছে যেখানে-সেখানে, প্রকাশ্যে দেহ-বিক্রয় চলছে, 'অবাধমিলন' শুধু একটা কথার কথা নেই, জারজ সন্তান শুধু একটা ব্যতিক্রম নয়—আর মনে করতে পারি কি—এ শুধু অঞ্চলবিশেষে বা নিম্নবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ? আমরা কি কলকাতায় কিছু দেখি না? জানি না—এই ভ্রষ্টাদর্শ বাঙালী "ভদ্রসমাজে' কি নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে?

এই নীতিই চোরাকারবারীর দান—তার মন্ত্রই পেয়ে বসেছে বড় ছোট সকলকে—'যা পারি করে নিই এ বেলা'; 'নিজে তো বাঁচি আগে'। প্রথম তাদের নীতি দেখে আমরা ভদ্রলোকেরা চমকে উঠেছি ঘৃণাও করেছি। তারপরে আমাদের ভদ্রলোকদের তা গা-সহা হয়ে উঠল। তারও পরে আমরা ভাবছি—'এই তো নিয়ম'—কিংবা 'সভাই বাহাদুর এরা'। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি—'যে করে পারি করে নিই এ বেলা, যে করে পারি নিজে তো বাঁচি'। এইখানেই বাঙলাদেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরাজয় সংঘটিত হল—চোরাকারবারীর ও চোরাব্যবসায়ীর আদর্শ এবার জয়ী হচ্ছে। বাঙালী ভদ্রলোকের ঐতিহ্য তলিয়ে যাচ্ছে।

তার বাস্তব ফল যে কত ভয়াবহ—এই একান্নতে আমরা তারও আভাস পেয়েছি। দেখলাম সমাজে সবাই ভাবছে 'করে নিই এ বেলা যা পারি'। তার ফলে সমাজে যে-ভাঙন পঞ্চাশে ধরে আজ তা বেড়েই গেছে। যৌনব্যাধি, বেশ্যাবৃত্তি, দয়ামায়ার অভাব, পারিবারিক টানের লোপ—এসব দেখছি। দেখছি, ভাঙন-ধরা বাঙলাদেশের সমাজ থেকে নিম্নবর্ণের জেলে, মালো প্রভৃতিরা লোপ পেতে বসেছে। মধ্যবিত্তের একাংশ একেবারে নিঃস্ব হয়েছে, তারা কেউ কেউ বাদুড়-ঝোলা ঝুলেছে যুদ্ধের নানা বিভাগে—কারিগরী ও কেরানীবৃত্তি করে। অন্য একাংশ উঠে গেছে উচ্চস্তরে—চোরাকারবারের ফলে। বাঙলায় মধ্যবিত্ত রইল না। দেখছি ভাঙন-ধরা সমাজে স্তরে স্তরে বিরোধ এবার ছড়িয়ে পড়ছে। পঞ্চাশে জোতদার-মহাজন কৃষকের জমি কিনে নেয়, এখনো সে তা ফেরত দিলে না। কিন্তু মন্বন্তরে, মহামারীতে আজ জনমজুর কম। তাই ক্ষেতমজুর হাঁকল—'মজুরি চাই দিনে ৫ টাকা'। ফলে জোতদার তার জমি চাষও করালে না। আবার সাধারণ কৃষকও এ কারণেই পেল না ক্ষেতে খাটবার মানুষ—তারও ক্ষেত প্রায় অনাবাদী যায়। অন্যদিকে আবার বড় জোতদার-মহাজন জমিশূন্য চাষীকে কিনে নেয় অগ্রিম ধান-চাল দিয়ে। শর্ত এই—ফসলের দিনে চাষীকে মজুর খাটতে হবে এক আনা মজুরিতে। কিংবা এ কর্জ শোধ করতে না পারলে তার বিক্রী করতে হবে স্ত্রীকে। মানে "ভূমিদাসের" দিন ফিরে এল—কৃষক আর কৃষক রইবে না। কাপড়, খাদ্যদ্রব্য, লবণ, কেরোসিন, কাঠখড়—এমনি করে জেলায় জেলায় দেখা গেল গুটিকয় চোরাকারবারী, জোতদার, ঠিকাদার ব্যবসাপত্র, জমিজমা সব একচেটিয়া করে নিচ্ছে। অথচ ছোট কৃষকে বড় কৃষকে, তাঁতীতে, কামারে, কুমোরে—পরস্পরে সকলেই লড়াই করছে, সকলেই ভাবছে—'নিজে তো বাঁচি'। ভাঙন ধরেছে সমাজের মূলে। এক জাতের মধ্যেও আর স্বজনবোধ নেই। দু'ঘর তাঁতী হয়ত ভালো করে খাচ্ছে এখন—যেখানে ছিল আগে পনের ঘর তাঁতী—আট ঘর মরে গেছে। বাকী সর্বস্বান্ত পাঁচ ঘর তাঁতীকে সেখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করা হল। অমনি পূর্বের দু'ঘরের আপত্তি—তাদের লাভের অঙ্কে ভাগ বসবে আবার। তারা ভাবছে—আগে নিজেরা বাঁচি। এক-একটা অঞ্চলে দেখা গেল—দলবদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত ডাকাতি করে ফিরছে আগেকার কারিগর ও কৃষকেরা। সে দলও আবার চালায় এক-এক চোরাকারবারের কর্তা। মানে আমাদের গ্রামের আর্থিক বিন্যাস ভেঙে গেছে, শত খণ্ডে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—সেই জীবনযাত্রা আর সমাজবোধ। এরই আর এক অংশে দেখতে পাই—গ্রামের লোকেরা লবণ পাচ্ছে না বলে তারা মাছ-দুধ সরবরাহ করতে অস্বীকার করছে শহরে। শহরে কারবারীরা গ্রামের লোকের কাপড়, কেরোসিন, লবণ আটকে রেখে ভাবছে মুনাফার ভাবনা। মানে, শহর ও গ্রামে বেধে গেছে কলহ—ভাঙন-ধরা বাঙলার জীবন এ-ভাবে আরও ভাঙতে শুরু করছে। পরিবার-প্রধান জাতি আমরা বাঙালী। শুধু স্ত্রী-পুত্র নয়, অনেক সময়েই একান্নবর্তী পরিবারে দশজনকে নিয়ে থাকি—ভাই, বোন, ভ্রাতৃবধূ, পিসী মাসীও থাকেন। সেই পরিবার ভাঙছে। একান্নবর্তী পরিবারের স্থানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার যে স্থাপিত হচ্ছে, তাও নয়। আর্থিক ও নৈতিক বিপর্যয়ে মূল পরিবারবোধই ধ্বংস হচ্ছে—স্বামী, স্ত্রী, মাতা, কন্যা, পুত্রবধূ, শাশুড়ী—প্রত্যেকেই ভাবছে—'আগে নিজে ত বাঁচি।' প্রত্যেকেই আত্মসর্বস্ব হতে চলেছে।—আর্থিক অভাব আছে, সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক আধ্যাত্মিক সংস্কারও ক্ষয়ে যাচ্ছে—স্বভাব নষ্ট হতে চলেছে।

এই ভাঙনের দাগ আরও স্পষ্ট আমাদের রাষ্ট্র আন্দোলনে ও রাষ্ট্রচিন্তায়। কি কংগ্রেস, কি মোসলেম লীগ—সবতাতেই তা সুস্পষ্ট। চোরা নেতৃত্ব কেমন করে সেখানে জাতীয় আন্দোলনকে নিঃশেষিত করছে এখানে তার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন—তার উল্লেখই যথেষ্ট। তেমনি উল্লেখই কি যথেষ্ট নয়, এই ভাঙনের আঘাতে বাঙলার সংস্কৃতি আজ ফেটে পড়ছে নানা খণ্ডে?

তবু আমরা দেখেছি—পঞ্চাশের কঠিন সত্যকে রূপ দেবার জন্য অগ্রসর হন কতকাংশে পঞ্চাশ একান্নতে বাঙলার সাহিত্যিক ও শিল্পীরা। অভিশাপের সমস্ত রূপ তাঁরাও তখন পর্যন্ত সচেতন দৃষ্টিতে দেখে উঠতে পারেননি। তবু তাঁরা অনেকেই সাড়া দিয়েছেন প্রাণ দিয়ে, আবেগ দিয়ে। একান্নতেও তাঁদের প্রয়াস নিঃশেষ হয়নি। তবু দেখছি ঠিক এই সৃষ্টিক্ষেত্রেও ভাঙন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের ও সাংবাদিকের ব্যবসায়ে চোরাকারবারের ছায়া পড়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাঙনধরা বাঙলার জীবনের পট—চোরাকারবারের দুর্নীতি ও ছলনা—নানা বড় বড় বুলির মারফত সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করেছে। বাঙলার সংবাদপত্র জগতে তাকালেও এই কথার সমর্থন পাই না কি? কোনো সংবাদপত্র একালের চোরা কারবারী ও চোরা কর্মচারী, দেশী-বিদেশী সামরিক ও বেসামরিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলল না। ইতিহাসের কাছে এই লজ্জা কি আমাদের রাখবার মত? অথচ বাঙলার সংবাদপত্রের ঐতিহ্য কত অসাধারণ। রামমোহন থেকে মতিলাল ঘোষ ও দেশবন্ধুর নাম তার সঙ্গে জড়িত। একটা কাগজও কি আজ দু-দশ হাজার টাকার সরকারী বেসরকারী বিজ্ঞাপন হারাতে স্বীকৃত নয়? দু'এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে পারত না তারা কেউ এই অভিশাপের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলে?

হয়ত দিত,—কিন্তু পঞ্চাশের পরে একান্নতে যে-শক্তি বাঙলার জীবনকে কবলিত করছে তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হতে আমরা পারিনি। তাই সংস্কৃতির বাহকদেরও এই আত্মত্যাগ ও কর্তব্য পালনের সঙ্কল্প জাগেনি। আসলে, এটাও সেই ভদ্রলোকের নৈতিক আধ্যাত্মিক পরাজয়েরই আর এক দিক। এই পরাজয়ক্ষণেও—ভাঙনের মুখেও—বাঙলার ভদ্রসমাজ, শিক্ষিত সমাজ,—বাঙালী সাধনার যারা বাহক, ঐতিহ্যের রক্ষক—তারা কঠিন বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না, জীবনসত্যকে অঙ্গীকার করতে সঙ্কুচিত, আত্মসমর্পণেই আত্মরক্ষার পথ সন্ধান করছে। আমরা দেখছি না—বাঙলার ভদ্রলোক ডুবছে—ডুবছে তার ভদ্রতা, শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, সংস্কৃতি। আর্থিক জীবনে যে চোরা বালির উপর কর্ণওয়ালিস্ বাঙালী ভাগ্যের পত্তন করে সেই জমিদারীতন্ত্রের সৌভাগ্য দেড়শ' বৎসরে আজ দেউলে হয়ে গিয়েছে—জমির উপস্বত্ব থেকে আজ মধ্যবিত্তের জীবন চলে না, সরকারী বা বেসরকারী চাকরিও আর মিলে না; অথচ এই আধা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তার ভাগ্য বাঁধা; তাই কৃষির অধোগতি হয়েছে, দেনায় ডুবেছে কৃষক, নতুন যুগের কল-কারখানায় বাঙলা দেশে বাঙালী মালিকও নয়, শ্রমিকও নয়, তারা হয়েছে জনকয় কেরানী ফড়ে দালাল। জমিদারীতন্ত্রের পতন-ফলেই বাঙলার জীবনক্ষেত্রে পঞ্চাশ-একান্ন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চোরাকারবারী আর চোরা কর্মচারী—আর তাদের চোরা নীতি।

এই বাস্তব চেতনা নিয়েও যদি আজ আমরা পা বাড়াই—তা হলেও হয়ত এই ভাঙন রোধের চেষ্টা আমরা করতে পারি—নতুন আর্থিক বনিয়াদ স্থাপন করে, জমিদারীতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করে আর শ্রম-শিল্পের গোড়াপত্তন করে, বিজ্ঞানের ও শিল্পের নতুন সংগঠন করে—বাঙালী সংস্কৃতির রূপান্তর করে।

বাঙালী সংস্কৃতির সংকট

শিল্পকর্মের একটা আভ্যন্তরীণ সমস্যা বরাবরই আছে। খাঁটি সৃষ্টিতে শিল্পের বস্তু (কথাবস্তু theme বা ভাববস্তু idea) এবং রূপায়ণকলা, (form) এ দুয়ের সম্পূর্ণ সমন্বয় (synthesis) ঘটে। তা'হলেই সব শুদ্ধ লেখা, গান বা নৃত্য একটা অখণ্ড রূপ লাভে করে। এরূপ সমন্বয় লাভ না করলে কোনো শিল্পনিদর্শনই শিল্প হিসাবে সত্য হয় না, অর্থাৎ তা 'সৃষ্টি' হয় না। তাই শিল্পের বরাবরকার সমস্যা ও সাধনা হল এই বিষয়বস্তু ও রূপায়ণকলার দ্বন্দ্ব ও তার সমন্বয়।

সংকট কালের সংস্কৃতি

এ-দ্বন্দ্ব আরও জটিল হয় যখন সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র হয় তখন শিল্পীর নিকট বিষয়বস্তু রূপায়ণকলা সব অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। কারণ, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শিল্প শাসক শ্রেণীর মত ও রুচিমত কথা বলতে অভ্যস্ত হয়েছে। শিল্পী তাঁর বিষয়বস্তু, তাঁর রচনাপদ্ধতি সবই সেই উচ্চশ্রেণীর দাবি মত গ্রহণ করেছেন, গড়ে তুলেছেন। অবশ্য সে শাসক শ্রেণী যখন সমাজে সৃষ্টির অগ্রদূত ছিল তখন তাদের দানে শিল্পেরও প্রসার ঘটেছে; তাতে রচনারীতির ও রূপায়ণকলারও অনেক উন্নতি হয়েছে। যেমন ধনিকতন্ত্র বাস্তব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনেক কল-কারখানার উন্নতি করেছে, মানসসৃষ্টির ক্ষেত্রেও গত এক শতাব্দীতে শিল্পীরা রূপায়ণকলায় অনেক বৈচিত্র্য এনেছেন।

কিন্তু এখন সেই ধনিক শাসকশ্রেণী সমাজে সৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে, অথচ তারা শিল্পকে ছাড়বে না। শিল্পও এ অবস্থায় বাস্তব নতুন শক্তিকে, বিপ্লবী গণ-শক্তিকে কি ভাবে গ্রহণ করবে, তা বুঝতে পারছে না। শিল্পীরা দিশাহারা হয়ে তাই নানাভাবে 'পলায়নী বৃত্তির' আশ্রয় নেন। এজন্য দুদিকেই তাদের সংকট দেখা দেয়। প্রথমত, শিল্পীরা এই নতুন বাস্তব স্রষ্টাদের জীবন ও জীবনবস্তু চেনেন না। দ্বিতীয়ত, নতুন বিষয়বস্তু বলবার মত নতুন ভাষা বা কলাকৌশল দরকার, শিল্পীরা তাও হাতের কাছে তৈরী পান না। এযুগে মুশকিল হয়েছে তাই এই যে, এযুগের শিল্পের বিষয়বস্তু (content) ও তার রূপায়ণকলার (form) সম্পূর্ণ খোঁজ শিল্পীরা এখনো পাননি। তাই দুয়ের সমন্বয়ও তাঁরা প্রায়ই করে উঠতে পারেন না। Tradition বা পুরোনো নজিরও এদিকে তাঁদের বেশি কাজ দেয় না। তাই নতুন বস্তু ও নতুন কলাকৌশল নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করতে থাকেন। এ জন্যই তাঁদের সৃষ্টি অনেক সময় সার্থক হয় না, আর এজন্যই তাঁদের প্রয়াসে পরীক্ষা এত বেশী দেখা যায়; আর সে পরীক্ষা অনেক সময়ই উদ্ভট হয়।

অবশ্য তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রকৃতির জগতেও অধিকাংশ পরীক্ষাই নিষ্ফল ও উদ্ভট। কিন্তু সেই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই নতুন সৃষ্টি বিকাশ লাভ করে, নতুন জীব জন্মে, জীবজগতে বিবর্তন ঘটে। অনেক পরীক্ষা, অনেক ঝাড়াই-বাছাই করে এরূপে এক-একটি নতুন ধারা আবিষ্কৃত হয়। আজ শিল্পের জগতেও সেইরূপ পরীক্ষা, ঝাড়াই-বাছাই চলছে। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই নতুন সমাধান, নতুন সমন্বয়ের দিকে শিল্পীরা অগ্রসর হচ্ছেন—এইটাও ভুলবার কথা নয়।

সংস্কৃতি বিভেদ

যে সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে জীবনযাত্রায় ও জীবনবোধে যত বেশি তফাৎ সে সমাজে শিল্পীদের পক্ষেও তাই অভ্যান্তরীণ সমস্যা তত বেশী। শিল্পের মূলস্থ অভ্যান্তরীণ সমস্যা সেখানে

জটিলতর হয়ে ওঠে সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভেদের জন্য। কারণ, শাসকের ও শাসিতের জীবনযাত্রা একরূপ নয়, দু'শ্রেণীর আদর্শ, ধ্যান-ধারণায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায়ও তফাৎ থাকে প্রচুর। শাসকের সংস্কৃতি চায় শাসকশ্রেণীর সেই জীবনের ও ভাবনার প্রয়োজন মেটাতে; উচ্চস্তরের লোকদের এ দাবিকে জেনে না-জেনে মেনে নিয়ে তা গড়ে উঠে উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতিরূপে। তার বিষয়বস্তুও প্রায়ই উচ্চশ্রেণীর; তার রূপায়ণও উচ্চকলার। শাসিতদের জীবনযাত্রা কিন্তু থাকে তার থেকে দূরে। শাসিতদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছাপ "শাসক-সংস্কৃতি"তে প্রায়ই পড়ে না, কিংবা পড়লেও পড়ে পরোক্ষে। তবু শাসিতেরও জীবনযাত্রা আছে, তারও প্রাণ খোঁজে আনন্দ। আর তার জীবনবস্তুও সেই প্রেরণার তাগিদে সৃষ্টি হয় শাসিতেরও গাথা, গান, নৃত্য, চিত্র, নানা কারুকলা। অবশ্য তার রূপায়ণে সূক্ষ্ম অলংকরণের চিহ্ন থাকে না প্রায়ই, কিন্তু থাকে প্রাণের সরস ছাপ, সহজ চেতনার সবল প্রকাশ, এমন কি, অনেক সময় স্থূলে মোটা মোটা দাগ। কিন্তু কথাটা এই, যে-সমাজে শ্রেণীভেদ যত বেশি সে-সমাজে তার এ দু-সংস্কৃতির মধ্যেও বিভেদ তত অনিবার্য হয়। সমাজ যখন বিভক্ত সংস্কৃতিও তখন বিভক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। মোটামুটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এরকমের একটা সংস্কৃতি-বিভেদ (dichotomy) দেখা যায়; যেমন শাসকের সংস্কৃতি ও শাসিতের সংস্কৃতি বা লোক-সংস্কৃতি।

এ যুগে লোকজীবন (folk) ও শাসকজীবনে (ruling class) এই তফাৎ আমাদের দেশে বাঙলায় নানা কারণে খুব বেশি বড় হয়ে পড়েছে,—ভারতবর্ষের অন্যত্র কিন্তু ততটা হয়নি। বাঙলার সংস্কৃতি-সংকটের ও শিল্প-সংকটের মূলে আছে বাঙলার এই অদ্ভুত সমাজ-সংকট।

ভারতবর্ষ ও বাঙলার বিভিন্নতা

ভারতবর্ষেও বরাবরই শাসকে-শাসিতে তফাৎ ছিল। সামন্ত যুগের আসল রূপ ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলার বাইরেই অন্যত্র বেশী প্রকট হয়। সে সব দেশে তাই একদিকে একটা ছিল রাজসভা, আর একদিকে লোকজীবন। একদিকে দরবারী আর্ট বা courtly-art আর দিকে লোক-শিল্প বা folk art। দু'এতে অবশ্য কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল; কিন্তু দুএর পার্থক্যও ছিল সুস্পষ্ট। মুসলমান যুগে সেই দরবারী আর্ট শহুরে (urban) ব্যাপার হয়ে পড়ল। কিন্তু লোকশিল্প তাতে বাধা পেল না—পল্লীতে তার স্থান পল্লী-শিল্পরূপে (rural) অব্যাহত রইল। বাঙলাদেশে দরবারী আর্ট ততদিন পর্যন্ত খুব বেশি বিকাশ লাভ করে নি। ভারতচন্দ্রের মত একআধজন শেষ দিকে আবির্ভূত হয়েছেন, একআধটুকু ওস্তাদি গানের আসর হয়েছে বিষ্ণুপুরের মত কোথাও কিংবা বারেন্দ্র জমিদারদের আশ্রয়ে। কিন্তু বাঙলার জমিদাররাও থাকতেন পল্লীতে। মোটের উপর তাই জমিদার বা Patron-এর পোষিত বাঙালী শিল্পীদের সঙ্গে বাঙলার পল্লীর ও লোক-শিল্পীরও যোগাযোগ নিকটতর ছিল। বাঙলার মুসলমানও প্রধানত শহুরে নন, পল্লীবাসী; আর বাঙলার সভ্যতা ছিল মোটের উপর পল্লী সভ্যতা। মঙ্গল গান, ভাসান গান, গাথা রচনা, কীর্তন, কথকতা, যাত্রা, কবি, আউল বাউলের গান এসব পল্লীশিল্প মোটামুটি অব্যাহত চলেছে—বিশেষ অঞ্চলে তার বিশেষরূপে প্রকটিত হয়েছে, যেমন গম্ভীরা, ঝুমুর ইত্যাদি। বাঙলার লোকজীবন একদিক থেকে তাই পূর্বে অনেকটা অবিভক্ত ছিল। তাই এখানে সামন্ত শাসকের ও শাসিত জনেরও জীবনবোধে তফাৎ ছিল অন্য দেশের তুলনায় অল্প।

ইসলামের অনুশাসন

কিন্তু এই তফাৎ যেমন আগেকার দিনে কম ছিল তেমনি পরের দিকে ইংরেজ আমলে কিন্তু অন্যরূপ তফাৎ বাঙলার লোকজীবনে ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে লাগল। প্রথম এক তফাৎ ক্রমশ দেখা

দিল বাঙলাদেশে, বিশেষ করে পূর্ব বাঙলায়, শরিয়তি ইসলামের প্রসারে। ইংরেজ আমলেই তা বেশি করে ঘটতে থাকে। বেশি তা প্রসারিত হয়েছে গত দেড়শ' বৎসরে। তার ফলে (১) বাঙলাদেশ থেকে লোকনৃত্য খুব দ্রুত লোপ পেয়ে গেল। (২) পালাগান ভাসানগান ইত্যাদি রইল বটে,—আজও তা চলছেও—কিন্তু মুসলমান ধর্মমতে তা অন্যায়, এ বোধ মুসলমান সাধারণের ক্রমশই বাড়ছে। (৩) চিত্রকলা প্রায় বর্জনীয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য বাঙলার লোকজীবনের আর্থিক বনিয়াদ একই। বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের জীবনযাত্রা জমিদারীতন্ত্রের চাপে একই স্তরে চলেছে। কিন্তু ধর্মগত কারণে ও লোকানুষ্ঠানে সে-জীবনও দুরকম হয়ে পড়েছে—একই স্তরের জীবনযাত্রার মধ্যে একটা খাড়া বেড়া ক্রমশ গড়ে উঠেছে। আর তার ফলে সেই বেড়ার বাধায় লোক-শিল্পের ধারা আর স্বচ্ছন্দ বা ব্যাপক বইতে পারছে না। বাঙলার লোক-জীবনে ও তার সংস্কৃতিতে আগেকার যুগের অখণ্ডতা এভাবে ভেঙে গেছে—এই একটি কারণে গত দেড়শ' দু'শ বছরের মধ্যে।

ব্রিটিশের শাসন

বাঙলার জীবনে দ্বিতীয় তফাৎ ঘটল ইংরাজ আমলে জমিদারী প্রথার প্রচলনে, শেষে "ভদ্রলোকদের" আধিপত্য বিস্তারে এবং "বাবু-কালচারের" অভ্যুত্থানে। বাঙলার জীবনযাত্রায় এ প্রথায় একটা স্তরগত তফাৎ ঘটল—মধ্যস্তর বলে একটা স্তর দেখা দিল, জনজীবনের উপরে তা একটা ডাঙার মত জেগে উঠল। ঠিক এমনতর একটা 'ভদ্রলোক' শ্রেণী ভারতবর্ষের অন্যত্র নেই। এবং বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে "বাঙলার কালচার" গড়ে উঠেছে—তার নিজস্ব সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা শেষে নৃত্যকলা পর্যন্ত নিয়ে—তার মত জিনিসও ভারতবর্ষের অন্যত্র সৃষ্ট হয়নি। এরই নাম বাঙলার কালচার। এই বাঙলার কালচার অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে বাঙলার নয়, মানে, বাঙলার লোক-জীবনের থেকে তা স্বতন্ত্র। তার বাহনরা ভদ্রশ্রেণী, খানিকটা exotic। সে সংস্কৃতিও eclectic, তার প্রেরণার উৎস পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও শিল্পাদর্শ, মাত্র দু'এক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের চিত্র বা অন্য প্রদেশীয় নৃত্য। এ-কালচারের বস্তুও বাঙলার ভদ্রজীবন, লোকজীবন নয়। মোটের উপর এই শিল্পের সঙ্গে বাঙলার লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। অথচ বাঙলার লোক শিল্পও এর আওতায়, এর পরোক্ষ প্রভাবে আরও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। তার জীবনীশক্তি আরও হ্রাস পেল। যেমন ভদ্রলোকের আধিপত্য বিস্তৃত হল তেমনি আগেকার যুগের লোক-সংস্কৃতি, লোক-শিল্প পল্লীতে পল্লীতে ম্লান হয়ে যেতে লাগল।

"লোক-সংস্কৃতি" বনাম "বাঙলার কালচার"

এভাবে কতকটা শরিয়তি ইসলামের আক্রমণে কতকটা "ভদ্রলোকি" সংস্কৃতি বা "বাঙলার কালচারের" উদ্ভবে—বাঙলার লোকজীবন আর অখণ্ড নেই, তা খাড়া ও পাশাপাশি দু'ভাবেই ভাগ হয়ে পড়েছে। আর বাঙলার লোক-শিল্পও এই কারণে অব্যাহত নেই, প্রাণবান নেই।

অবশ্য বাঙলার এই খণ্ডিত লোকজীবনও ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে, প্রাচীন শিল্পরূপ দেখে লোক আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। তারা নূতনতর, উন্নততর, রূপ খুঁজছে। আমাদের বাঙলার কালচার লোকসাধারণের সে দাবি মেটাতে জানে না, মেটায়ও না। অবশ্য জনগণেরও রসবোধ অতটা গঠিত হয়নি, মার্জিত হয়নি। তাদের রসবোধ ও তৃষ্ণাকে কিন্তু ব্যবসাদারী বণিক দল অবজ্ঞা করে না। তারা ব্যবসায়ের সুযোগ ছাড়ে না—ব্যবসায়ের দায়ে তারা এই জনসাধারণকে টানে। তাদের তৃষ্ণা মেটায় এখন ব্যবসাদারী শিল্প—সিনেমা, দেশী ও বিলাতী ছবি, পুতুল প্রভৃতি। এরূপে ব্যবসায়ীরা ধনিকতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী লোক-সমাজের এই চাহিদাকে কাজে লাগাচ্ছে—ব্যবসা

চালাচ্ছে, আর নিজের স্বার্থে শিল্পকে বিকৃত করছে। কিন্তু মানতে হবে এভাবেও লোকের কতকটা ক্ষুধা মিটছে। কারণ, মনে রাখতে হবে—"বাঙলার কালচার" সেই ক্ষুধাকেও গ্রাহ্য করে না, সে দাবিও মেটায় না। ফলে বাঙলার লোক-সংস্কৃতির অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে ইংরেজ আমলে এইরূপ :—(ক) তা আপন ধারায় বেড়ে উঠতে পারেনি, শুকিয়ে যাচ্ছে; (খ) বেড়ে উঠতে না পারাতে তার টেক্‌নিক সামন্ত-যুগের রয়েছে, 'সেকেলে' ও স্থূল থেকে গেছে—তা নতুন বস্তু গ্রহণের মত নমনীয়তা বা শক্তিলাভ করছে না; (গ) আর নতুন বুর্জোয়া ব্যবসাদারী শিল্প (commercialised art) সুযোগ পেয়ে দু'ভাবে তাকে শোষণ করছে (এক) লোকসঙ্গীত প্রভৃতির টেক্‌নিক্‌কে বিকৃত বা pervert করে যেমন, ভাটিয়ালী গানে সিনেমার ঢং দিয়ে দিলে। (দুই) ভদ্র-সংস্কৃতির কথা ও টেক্‌নিক্‌কে vulgarise করে, যেমন, রবীন্দ্রনাথের গান ও সুরে সিনেমার রং চড়িয়ে দিলে।

তাই বাঙলার সংস্কৃতি-সংকট এই যে বাঙলার জীবন অত্যন্ত মোটামুটি দু'টা স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে—লোক-সংস্কৃতির ধারা যা নিষ্প্রাণ; ভদ্র-সংস্কৃতির ধারা যা নিরালম্ব বা যার মূল মাটিতে নেই। আর এই দু'এর মাঝখানে দাঁড়িয়েছে শিল্পের নতুন বুর্জোয়া ব্যবসাদারেরা,—যারা দু'এরই শিল্পানুরাগকে শোষণ করে মুনাফা করতে চায়; তারা এ-দু'-এর একটা জোড়াতালিও দেয়, কারণ দু'স্তরের মানুষই তাদের পক্ষে ব্যবসায়ের ক্রেতা শোষণের ক্ষেত্র।

এই সংকট সমাধানের উপায় অবশ্য বাঙলা সংস্কৃতির প্রশস্ত গণ-বনিয়াদ রচনা; আর এইখানেই আসে শ্রমিক-কৃষকের ও বুদ্ধিজীবী বিপ্লবীর দায়িত্বের কথা—যাঁদের কাজ হবে এই দ্বিখণ্ড শিল্পধারাকে পুনঃ সংযুক্ত করা, আর শিল্পকে ব্যবসাদারী শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা, তাকে স্বরাজ দেওয়া আর তার সমন্বয় করা।

২৪-১-৫২ বাং

অন্য প্রদেশের লোক-সংস্কৃতি

বাঙলাদেশে যে-ভাবে হয়েছে সে-ভাবে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে শিল্পের সংকট প্রকট হয়নি। তার কারণ, অধিকাংশ প্রদেশে লোক-জীবন এভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েনি। দক্ষিণ ভারতে জীবন এখনো অবিভক্ত homogeneous. উত্তর ভারতের (ও নিজাম রাজ্যের ?) শহরে দরবারী (প্রধানত মুসলিম) জীবন ও শিল্প এবং পল্লীর লোক জীবন ও লোকশিল্পে তফাৎ ঘটেছিল। কালচারেল দ্বিধা বা dichotomy সেখানে স্পষ্ট। হয়ত মুসলিম সংস্কৃতিরূপে উর্দু সাহিত্য ও ওস্তাদী সঙ্গীত আশ্রয় করে সেই courtly art আরও চলতে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু নতুন ইংরেজি আমলে সেই সামন্তযুগের অবসান ঘটেছে। বুর্জোয়া জীবনযাত্রা ও শিল্পাদর্শের আঘাতেও সেই দরবারী আর্ট ও আদর্শ ম্লান হয়েছে; ফলে তা পরিবর্তিত হচ্ছে—তবে তা কি রূপ নেবে বলা যায় না। এ যুগের উপযোগী শিল্পাদর্শ গ্রহণ করতে না পারলে সামন্তযুগের সেই দরবারী শিল্প ক্রমশই আরও artificial নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। বরং ততক্ষণে লোক-শিল্পই লোক-জীবনের ও জন-জাগরণের সঙ্গে তাল রেখে নতুন হয়ে, প্রাণবান হয়ে, বেগবান হযে উঠবে। যাই হোক, আপাতত দেখা যাচ্ছে—এ-সব প্রদেশে লোক-জীবন লোক-সংস্কৃতি বাঙলার লোক-জীবন ও লোক সংস্কৃতির মত খণ্ড ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েনি। লোক-জাগরণ হলে সেই লোক সংস্কৃতি আবার বেগবান হবে। এরই আভাস দিচ্ছে অন্ধ্রের গণ-আন্দোলন ও অন্ধ্র লোক-সংস্কৃতি বা renaissance. অন্ধ্রের কৃষক আন্দোলনকে অবলম্বন করে তা প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমানের গতিহীনতা

বাঙলার সংস্কৃতি সংকট আমরা দেখেছি আমাদের মোটামুটি কর্তব্যও বুঝেছি। সেদিক থেকে আমরা করতে পারি কি ?

কয়েকটা কথা স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। প্রথম কথা—গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগঠন দুই-ই চলছে; চলবে—বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হলে শ্রমিক-কৃষক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজের স্থান নিতে পারবে না, নিজের দানও দিতে পারবে না। দ্বিতীয় মূল কথা হচ্ছে—শ্রমিক-কৃষকের চোখে সংস্কৃতি শোষণের বা ব্যবসায়ের জিনিস নয়, বিকাশের একটা পথ; সৃষ্টির পথ ও সৃষ্টিকর্মের পাথেয়। তৃতীয় কথা—বর্তমান সমস্যা। সংস্কৃতির দুই ধারা বাঙলায় আছে—তা অস্বীকার করা যাবে না। দুয়ের স্বরূপও মনে রাখা দরকার। যেমন, লোক-সংস্কৃতির বিষয়বস্তুও অনেকটা ধরাবাঁধা, তার টেক্‌নিক অনেকটা স্থূল—আর এ-সংস্কৃতি কতকাংশে পুরোনো সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, না পরিবর্তিত হলে তা ধনিকতন্ত্রের যুগের কথাও ঠিকমত বলতে পারে না, শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী বাণীকেও বহন করতে পারবে না। অন্য দিকে ভদ্রসংস্কৃতি—অনেকাংশেই মূলহীন eclectic, তা প্রধানত পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের শিল্পাদর্শ ও শিল্পপ্রেরণা থেকে গৃহীত। সে-ধনতন্ত্রও আজ পতনের মুখে, তাই তার পতনের ছাপও বাঙলার ভদ্রসংস্কৃতিতে আজ প্রতিফলিত হচ্ছে সেই সূত্রেই। এই ভদ্রসংস্কৃতির বিষয়বস্তু ও রূপকলা ধনতন্ত্রের যুগের বটে—অর্থাৎ দুই-ই একটু উন্নত। কিন্তু ধনতন্ত্রের পতনের যুগের ছাপও এই ভদ্রসংস্কৃতিতে এখন পড়ছে—কাজেই ভদ্রসংস্কৃতির বিষয়বস্তু (content) পাশ্চাত্য শিল্পের বিষয়বস্তুর মতই sophisticated হয়েছে, তার রূপকলাও (form)

পাশ্চাত্য শিল্পের রূপকলার অনুকরণে নানারকমে বেঁকে-চুরে যাচ্ছে ; আর তার দৃষ্টি পাশ্চাত্য শিল্পের দৃষ্টির মতই বিভ্রান্ত, নিরাশায় অবসন্ন—'পলায়নের' পথ সন্ধানে ব্যস্ত।

সংস্কৃতি সমন্বয়ের পথ—সংযোগের নীতি

বাঙালী সংস্কৃতিধর্মীর পক্ষে এই অবস্থায় দুই ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে হবে। মানে, বাঙলার মুমূর্ষু লোক-সংস্কৃতি ও ঘুণেধরা ভদ্র-সংস্কৃতি—এই দুই ধারাকে এক জন-সংস্কৃতিতে সমন্বিত করবার জন্য দু'দিক থেকেই অগ্রসর হতে হবে—লোক-সংস্কৃতিকেও উন্নত, জীবন্ত করে তুলতে হবে, ভদ্র-সংস্কৃতিকেও সহজ, স্বচ্ছন্দ করে তুলতে হবে। যে লোক-সংস্কৃতি শুষ্কপ্রায় তাকে জীইয়ে তুলতে হবে—অর্থাৎ তা যুগোপযোগী করতে হবে, নইলে তা বেঁচে উঠবে না। তা যুগোপযোগী করতে হবে দু'ভাবে—লোক-শিল্পের আধেয় বা বস্তু (content) এ-যুগের জনগণের উপযোগী (popular) রাখতে হবে আর তার আধার বা রূপকলা (form) স্বাভাবিক ধারায় বিকশিত (develop) করে তুলতে হবে।

লোক-সংস্কৃতির প্রধান শাখাগুলোকে এই নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত করতে গেলে তার পথ এই ঃ

জনসঙ্গীত—জারি, সারি, ঝুমুর, গম্ভীরা, পাঁচালি প্রভৃতি যে-অঞ্চলে যা লোক-গীতি আছে সে-অঞ্চলের সে-সব গায়কদের উৎসাহ দিতে হবে—(১) এজন্য তাদের নতুন কথাবস্তু জুগিয়ে দিতে হবে। দেখতে হবে যেন এ-কথাবস্তু এমন হয় যা লোকের কাছে 'পরের জিনিস' বলে না ঠেকে, কিংবা দলের সূত্র বা শ্লোগান মাত্র না হয়, লোকের ভাষার, লোকের আশা ও অনুভূতির কথা হয়—(যেমন হতে পারে. দুর্ভিক্ষের কথা, নেতাদের জেলের কথা, মুক্তি-সংগ্রামের কথা, স্বাধীনতার কথা ইত্যাদি) —আবার শুধুমাত্র সম্প্রদায়-বিশেষের কথাবস্তু বা অনুষ্ঠানের জিনিস যেন না হয় ; যেমন 'মনসার ভাসান' আজ হয়ে উঠেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে—(২) পুরানো রূপকলা একটু নতুন করে তুলতে, স্বাভাবিক ধারায় তা বিকশিত করতে, এই শিল্পীদের উৎসাহ দিতে হবে। তবে দেখতে হবে তা যেন সিনেমার সুরের মত চটকদার না হয়—শিল্পকে vulgarise না করে। সম্ভব মত এদিকে ভিন্ন প্রদেশের জন-সঙ্গীতের সুর আমদানী করা সহজ। (৩) দেখতে হবে একটি জিনিস— যেন কথা ও সুর দুই মিলে, অখণ্ড হয়। কথা মাথায় যায়, সুর প্রাণে যায় ; তাই কথা ও সুরে বিরোধ বাধলে বুদ্ধিতে ও অন্তরাবেগে বিরোধ বাধবে, তা আর সৃষ্টি হবে না। over-elaboration, subtlety, conceit একদিকে, vulgarisation অন্য দিকে,-- এই দুয়ের মধ্যদিয়ে এই সৃষ্টিধারা প্রবাহিত হবে।

নৃত্য—সাঁওতালী নাচ, মণিপুরী লাইছাবি নাচ, রায়বেঁশে নাচ বা নতুন প্রচলিত নৃত্য, ভিন্ন প্রদেশের জন-নৃত্য যা আমরা গ্রহণ করেছি—সে সব সম্বন্ধেও ওপরের ওই মূলনীতি প্রযোজ্য—তার বস্তু যুগোপযোগী হবে, রূপকলা বিকাশধর্মী হবে, আর বস্তু ও রূপ দুয়েতে দ্বন্দ্ব থাকবে না—দুয়ে মিলে হবে একটা নতুন সৃষ্টি।

জননাট্য—যাত্রাগান, অভিনয় প্রভৃতির সম্বন্ধেও এই একই চেষ্টা করতে হবে। সিনেমা এখনো পুঁজির নাগপাশে বাঁধা, কিন্তু তার জনশিল্প হিসাবে সম্ভাবনা প্রচুর।

সাহিত্য—সত্যসত্যই জনগণের জন্য কিছু লেখা সহজ নয়—তারা অধিকাংশেই লিখতে পড়তে পারে না। গণ-সাহিত্য হবে তাই গান মেশানো পাঁচালি কি ওইরূপ। পড়বার সাহিত্যও লিখতে হবে নতুন বিষয়ে ছড়ার ছন্দে ; পাঁচালির ছন্দে—কিন্তু সুরে-ছন্দে নতুনত্ব ও elasticity দিয়ে নতুন বিষয়বস্তু বলতে হবে।

বলা বাহুল্য এই লোক-সংস্কৃতি আবার সৃষ্টিময় করে তুলতে পারেন তিনিই যাঁর জন্মগত-ভাবে সৃষ্টি-প্রতিভা আছে। সঙ্গে সঙ্গে যিনি নিজে এই লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্যে ও শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন।

ভদ্র-সংস্কৃতিকে লোকাভিমুখী করার কাজ চালাতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। ভদ্রসংস্কৃতির প্রধান বাহন হল—সাহিত্য, সঙ্গীত (ওস্তাদি শাখা ও সহজ হতে পারে এরূপ শাখা), নাট্যকলা, আর নৃত্য। এসব দিকে আমাদের নীতি হতে পারে এরূপ : এই সব শিল্প কলার (১) কথাবস্তুতে জন-জীবনের বিষয় ও প্রেরণা সঞ্চার করা—popular content দেওয়া sophisticated, subtle, over-elaborate বিষয়বস্তু ও বিশেষত্বহীন vulgarised বা sensationalised বিষয়বস্তু—দুই-ই বুর্জোয়া সভ্যতার বিকৃতির ফলে সাহিত্যে আজ এসেছে। দুই-ই বর্জনীয়। বিষয়বস্তু হবে জনগণের কথা, (popular, যা simple and great) (২) রূপকলায় ভদ্র-সংস্কৃতি উন্নত স্তরে উঠেছে—উন্নত কারুশিল্পের অধিকারী আজ যেমন ধনিক সভ্যতা। তার টেক্‌নিক যেমন শ্রমিক শ্রেণী গ্রহণ করে তেমনি জনগণও গ্রহণ করবে ধনিকতন্ত্রের উন্নত চারুশিল্পের খাঁটি টেক্‌নিককেও। ভদ্র-সংস্কৃতির সেই উন্নত টেক্‌নিক সংরক্ষণ করতেই হবে। কিন্তু এই টেক্‌নিকে যে-সব কথার কসরৎ, ভাবের মারপ্যাঁচ দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে বুর্জোয়া সভ্যতার মরণকালীন বিকৃতি, সে-সব অলস শ্রেণীর ব্যসনের উপকরণ মাত্র। টেক্‌নিকের সেই মিথ্যাচারও তাই বর্জন করতে হবে—টেক্‌নিক্ সহজ স্বচ্ছন্দ হবে, এমন কি নতুনও হবে, শোভনও হবে ; হবে না কসরৎ, মারপ্যাঁচ, অকারণে ভাঙা-চোরা শিথিল গ্রন্থি। উন্নত টেক্‌নিক্ চাই, কিন্তু টেক্‌নোক্রাসিতে সমস্যার সমাধান হয় না। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রেও (৩) কথাবস্তু ও রূপকলার পরম সুসঙ্গতি ও সমন্বয় ঘটাতে হবে—যাতে সত্যই তা অখণ্ড সৃষ্টিতে পরিণত হয়।

অবশ্য, এ জাতীয় সৃষ্টিও করতে পারেন তিনিই সত্য সত্যই সৃষ্টি প্রতিভার যিনি অধিকারী (creative genius) ; এই ভদ্র-সংস্কৃতির ঐতিহ্য, তার স্বরূপ ও সমস্যা সম্বন্ধেও শিক্ষালাভ করেছেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক-জীবন ও লোক-মনের সঙ্গে সংযোগ রেখেছেন সকল রকমে।

সাহিত্য—এদিক থেকে অবস্থাটা এখন নিম্নরূপ।

সাহিত্যিকদের পক্ষে এদিকে সমস্যা কম নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিয়েছে। যুগ-সমস্যা সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের সচেতন করে তুলতে পারলেই সাহিত্যের দিকে আমাদের কর্তব্য সহজ হয়ে ওঠে। সচেতন সাহিত্যিক সচেতন সৃষ্টিতে আপনা থেকেই অগ্রসর হবেন। তাঁর চেতনাকে কিভাবে রূপ দেবেন, তা তিনিই জানেন—সংস্কৃতিকর্মীরা নয়।

সঙ্গীত—সঙ্গীতের দিকে ওস্তাদি গান যেমন আমরা অবজ্ঞা করব না, তার চেয়ে বেশি দরকার হবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে সহজ ধারা উৎসারিত হয়েছে তা আরও প্রশস্ত ও বেগবান করে তোলা। এ ধারাই কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি জন-সঙ্গীতের ধারার নিকটতম আত্মীয়, হয়ত এ-ধারা জনগণও গ্রহণ করবে, করছেও।

নাট্যকলা—নাট্যকলায় আমরা খোলা মাঠের (open air theatre) অভিনয় রীতি ও তদুপযোগী রীতি-পদ্ধতি (technique) গ্রহণ করলে তা জনসমাজ সহজে উপভোগ করতে পারবে—সেরূপ অভিনয় অনেকটা যাত্রার মত হবে, অথচ রঙ্গমঞ্চের উন্নত জিনিস এবং কৌশলও তাতে কতকাংশে গ্রহণ করা যায়। যেমন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশে, প্রস্থানে একটা নতুনত্বের চমক থাকে, তা যাত্রায় থাকে না। এসব ক্ষেত্রে তা থাকতে পারে।

নৃত্যকলা—নৃত্যে আমরা অভিনয়ের মত কৌশলই গ্রহণ করতে পারি, তারও বস্তু non-communal ও popular হবে, রূপকলা হবে উন্নত পদ্ধতির। আমাদের মিছিলে আমরা নৃত্য দেখাতে দেখাতে যেতে পারি কি ? যেমন কীর্তনে মহরমে অনেকটা আমরা দেখতে পাই, ভাসানেও প্রায় চল হয়েছে, সেরূপ কোনো নৃত্য পদ্ধতি গ্রহণ করলে তাতে জনগণের পরিচিত রীতির কাছাকাছি আমরা পেঁছিতে পারব।

এ-ভাবে দু'দিক থেকে অগ্রসর হলে প্রথমত বাঙলার দুই সংস্কৃতিতে আমরা সংযোগ স্থাপন করতে পারব—তারই ফলে এক নতুন সংস্কৃতি সমন্বিত হবে।

সংগঠনের কথা—প্ল্যান—কিন্তু এ-সব হল সংস্কৃতিধর্মীর শিল্পদৃষ্টির ও শিল্প-নীতির আলোচনার দিক। তা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি প্রয়োজন এই শিল্প আন্দোলনের সংগঠন। সেদিকেও বাঙলাদেশে আমরা বড়ই ঢিলেঢালা নিয়মে চলি। আমরা এদিকে কি করতে পারি ? সব দিকেই চাই

নীতি (principle) স্থির হলে পরে ভালো পরিকল্পনা (plan)। এইটা বড় দরকার। মোটামুটি তার খসড়া এখনও আমরা একটা দাঁড় করাতে পারি (১) সাহিত্যিকরা পরিকল্পনা স্থির করে (ক) ব্যক্তিগত-ভাবে সৃষ্টি করতে পারেন সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প ; (খ) অন্য সাহিত্যিকদের সচেতন করবার জন্য লিখতে পারেন, এই মতবাদ পরিষ্কার করবার জন্য আলোচনা গ্রন্থ ; (গ) চালাতে পারেন এজন্য সাময়িকপত্র। তাতে সংস্কৃতির বিবিধ বিভাগের কথাই থাকবে, বিশেষ করে তাতে থাকবে সংস্কৃতির রূপান্তরের নানা ধারার সংবাদ। (২) সঙ্গীতের জন্য (ক শিক্ষা-গ্রহণ, (খ) শিক্ষাদান দুই সমান প্রয়োজন ; গ্রামোফোনে উপযুক্ত রেকর্ড করানো দরকার। (৩) অভিনয়ের জন্য নাট্যকলা রচনা, শিল্পী সংগ্রহ, রেডিও ও সিনেমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগস্থাপন, গ্রামোফোনে উপযুক্ত অভিনয় রেকর্ড করানো দরকার—আর বলা বাহুল্য শিক্ষা গ্রহণও দরকার। (৪) নৃত্যের জন্যও শিল্পী সংগ্রহ, নতুন নৃত্য রচনা ইত্যাদি কাজ করতে হবে। সবচেয়ে সত্য কথা ১) এ-সব শিল্পের জন্য প্রত্যেক শিল্পীকেই প্রাণমনে ট্রেনিং গ্রহণ করতে হবে, বুঝতে হবে শিল্প শুধু প্রেরণার মাথায় বেরিয়ে আসে না, inspiration-এর পিছনে বহু perspiration থাকেই থাকে। প্রত্যেকটি অভিনয়ের জন্য বহুবার মহড়া দেওয়া দরকার। (২) সঙ্গীত, অভিনয় ও নৃত্যের জন্য ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষকদের আহ্বান করে ও নিজেদের প্রদেশের উপযুক্ত গুণীদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয়-সংস্কৃতি-শিক্ষাকেন্দ্র সাময়িকভাবে চালানো দরকার। (৩) মফঃস্বলে এ-সব শিল্পীদের আরও বেশী প্রদর্শনী দেওয়া দরকার। (৪) ভিন্ন প্রদেশের শিল্পোৎসবে এ-সব শিল্পী ও শিক্ষকদের আরও বেশি যাওয়া দরকার।*

৩১-১-৫১ বাং

* কলিকাতার 'আর্টিস্ট এসোসিয়েশন্' একটি সবল প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এদিকে আমরা অনেক কিছু আশা করতে পারি। লেখক, ২০-২-৫৭ ইং

ভাবী ভারতবর্ষ ও বাঙলার সংস্কৃতি

আজ নববর্ষ। ১৩৫২ নেই, ১৩৫৩ এসেছে। তার অর্থ, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু শান্তি আসেনি। পৃথিবী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মুক্তি পেয়েছে, মুক্তিক্ষেত্রে পৌঁছয়নি। আমরা বাঙালীরা আজ এই সময়ে আমাদের নববর্ষকে অভিনন্দন করছি।

এই 'নববর্ষ' আমাদের ইতিহাসে নতুন—অনেক সম্ভাবনায় আজ আমাদের মন আন্দোলিত—ভারতবর্ষ শুধু নতুন বছরের দুয়ারে নয়, ভারতবর্ষ আজ নতুন ইতিহাসের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই সমস্ত ভারতবাসীকে আজ আমরা আমাদের এই শুভ নববর্ষের অভিনন্দন জানাচ্ছি—আমরা সকলে নতুন ইতিহাসের পথে সহযাত্রী, একসঙ্গে আমরা এই নতুন ইতিহাস গড়ছি,—গড়ব।

আজ নববর্ষ বাঙালীর। বাঙালী ছাড়া অন্য ভারতবাসী পয়লা বৈশাখকে 'নববর্ষ' বলে মানে না। আবার অন্য প্রদেশের অনেকেরই গণনায় আজ পয়লা বৈশাখও নয়। বাঙালী মাত্রেরই হিসাবে আজ নববর্ষ—বাঙালী হিন্দুর, মুসলমানের, স্বদেশের বাঙালীর, প্রবাসী বাঙালীর। বিশেষ করে, প্রবাসে এই নববর্ষের উৎসব পালন করতে গিয়ে এই সত্যই আমরা আরও স্পষ্ট করে বুঝি :—ভারতবাসী হলেও বাঙালী একটা বিশিষ্ট জাতি। হিন্দু বাঙালী ও মুসলমান বাঙালী দুয়ের মধ্যে পার্থক্য থেকে মিল বেশি। কারণ, একই দেশ, একই জীবনযাত্রা, একই ভাষা ও সংস্কৃতির আমরা উত্তরাধিকারী। সেই বাঙলাকে আর খণ্ড করা যায় না—১৩১২ তেও যায়নি, ১৩৫৩ তেও যাবে না।

ভারতীয় ঐক্যের সংগঠক

এই নববর্ষের উৎসবে যে প্রথম কথাটি তাই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তা এই :

(১) ভারতবর্ষ বহুকে নিয়েই এক ; (২) ভারতবর্ষ শুধু দুই জাতির দেশ নয় ; (৩) শুধু অখণ্ড এক জাতির দেশও নয়।

অবশ্য ব্রিটিশ শাসনের ছুরি বাঙলাকে ও বাঙালীকে টুকরো করে রেখেছে। শিলেট, কাছার, গোয়ালপাড়া, মানভূম, সিংহভূমের বাঙালী বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু একটা কথা তবু আমরা বুঝি, বাঙালীও শুধু তার আপনার গৃহে বসে নেই। জীবিকার তাগিদে, বর্তমানকালের অনিবার্য টানে আমরা বাঙলার গৃহাঙ্গন ছাড়িয়ে বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, উড়িষ্যায়, আসামে আশ্রয় নিয়েছি। আবার, বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্যে, কলকারখানায় অবাঙালীরা আরও বেশি ভিড় করেছেন। এই গতায়াত বন্ধ করবার নয়। সভ্যতার প্রধান কথাই এই যে, বিচ্ছিন্নতা সে সহ্য করে না। আধুনিককালে তার বিচিত্র যোগসূত্রে পৃথিবীই এক হয়ে উঠতে চলেছে। ভারতবর্ষের ভেতরে তাহলে আমরা প্রাচীর তুলব কি করে? আসলে কথাটা বোঝা উচিত—পৃথিবীর সেই বৃহৎ ধারারই তাগিদ তাড়না জেনে না-জেনে সার্থক করে তুলেছেন এই অভিযাত্রী বাঙালীরা—যাঁরা নানা কর্মসূত্রে দেশ-দেশান্তরে জীবিকা অর্জন করেন—তাঁরা রেলের চাকুরে, পোস্টাফিস-টেলিগ্রাফের চাকরে, নানা শিল্প-বাণিজ্যের ছোট-বড় কর্মী। ভারতবর্ষের ঐক্যধারাকে তাঁরাই প্রাণবন্ত ও প্রশস্ত করে তুলছেন দিনের পর দিন—এই ভারত-গোষ্ঠীর অন্যান্য জাতিদের আত্মীয় করবার দায় ঘাড়ে নিয়ে, নতুন কালের জীবনযাত্রা, জীবিকা-প্রণালীকে গ্রহণ করতে এগিয়ে গিয়ে। তাঁদের পক্ষেও ভুলবার উপায় নেই যে, একই কালে তাঁরা বাঙালী হয়েও ভারতবাসী, আবার তাঁরা পৃথিবীর সকল শ্রমজীবীর স্বশ্রেণী, নতুন সমাজবিন্যাসের দায়িত্ব ও গৌরব তাঁদের।

এই ১৩৫৩-এর নববর্ষের দিনে তাঁরা তাই যেমন বাঙালী হিসাবে উৎসব করবেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হিসাবও করবেন তাঁদের নতুন ভাগ্যলেখা কি হবে, আর এই ভারতবর্ষের আত্মীয়তার বন্ধন কি-ভাবে তাঁরা আজ দৃঢ়তর করবেন, কি-ভাবে এ-যুগের সভ্যতার ইঙ্গিতকে করবেন সুস্পষ্ট সত্য।

যুদ্ধান্তের হালখাতা

যুদ্ধান্তের পৃথিবীতে আমরা আজ ইতিহাসের নতুন হালখাতা খুলছি। পুরনো বছরের জমা-খরচ নিয়েই শুরু হবে নতুন ইতিহাস।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখছি—যুদ্ধে ফ্যাশিজমের পরাজয় ঘটেছে। তার মানে প্রতিক্রিয়ার সামরিক পরাজয় ঘটেছে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ হয়নি। এখনো তার চেষ্টা রয়েছে ছলে-বলে-কৌশলে নিজের স্বার্থ টিকিয়ে রাখার। মোটামুটি এ যুদ্ধের আগে ফ্যাশিজম ইউরোপের দেশগুলিতে জেঁকে বসেছিল; কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে সেসব দেশে জনশক্তিই প্রাধান্যলাভ করেছে। অবশ্য মালিকেরা তাদের প্রভুত্ব পুনরুদ্ধার করবার সমস্ত চেষ্টা সেসব দেশেও ছেড়ে দেয়নি। তবু তারা বুঝতে পেরেছে যে, এশিয়ার জনশক্তিই অপেক্ষাকৃত দুর্বল; কাজেই এশিয়াতে প্রতিক্রিয়ার আসল ঘাঁটি বাঁধবার সুযোগ রয়েছে—সেখান থেকেই ভাবী দিনে আবার চক্রাকারে বেষ্টন করা যাবে সোভিয়েট ব্যবস্থাকে। আজ গ্রীস, মিশর, সিরিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া-চীন-জাপান পর্যন্ত ব্রিটিশ-মার্কিন মালিকতন্ত্র সেই জন্য নানাভাবে আস্তানা গাড়ছে। আর এই নতুন চেষ্টায় মালিকতন্ত্রের নতুন ভরসা ভারতবর্ষ আর চীন। কারণ, এসব দেশে আছে কোটি কোটি মানুষ আর অফুরন্ত বস্তু-সম্পদ। সেসব হাতে রাখতে পারলে আর প্রতিক্রিয়ার পুনর্জাগরণ ঠেকায় কে? চীনে মার্কিন মালিকেরা চুংকিং-এ মাঞ্চুরিয়ার সেই খেলাই খেলছেন। আর ভারতবর্ষে এ্যাটলি-ওয়াভেলের এই খেলাই চলেছে সিমলা থেকে একেবারে দিল্লী পর্যন্ত।

কিন্তু খেলাটা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও আর আগের চালে চলতে পারে না—এ-যুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদের নতুন করে ছক সাজাতে হচ্ছে, নতুন করে তার চালও ঠিক করতে হচ্ছে। কারণ, সকল দেশের মত, ভারতবর্ষেও খেলা অনেক পাল্টে গিয়েছে।

বিদ্রোহের পথে ভারত

আমরা জানি ভারতবর্ষের রাজনীতিক জীবনে আজ কত বড় আলোড়ন দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ-বিদ্বেষ আজ দেশের চারিদিকে ফেটে পড়ছে। এমন করে স্বাধীনতার জন্য পাগল দেশের ছোট-বড় সকল সাধারণ মানুষ আর কোন দিন হয়নি। সৈনিকেরা এমন করে স্বাধীনতার আন্দোলনে আর ছুটে আসেনি। আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্যে দেশের যে পূজা হোম ভক্তি উৎসর্গ হতে লাগল তাতে এ-দেশের ব্রিটিশ তাঁবের অন্যান্য সৈনিকেরাও নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ হয়েছে—নৌ সৈনিক, বিমান সৈনিক, সাধারণ সৈনিক কেউ আজ ব্রিটিশ হুকুম ও হুকুমত মানতে চায় না। এই ১৩৫২-তে আমরা জানি ভারতবর্ষ এক "সিপাহী বিদ্রোহের" মুখে এসে পৌঁছেচে। আর এবারকার সিপাহীরা জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং জনতার বিদ্রোহের আগুনেই তাদের মনেও আগুন ধরেছে। যেখানে জনগণের ও সেনাবাহিনীর এমন বন্ধুত্ব ঘটে সেখানে বিপ্লবের মূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলা যেতে পারে—এইটেই ভারতবর্ষের রাজনীতিক জীবনের আজ সর্বপ্রধান কথা।

কিন্তু তবু বিপ্লবের আগুন জ্বলে জ্বলে নিবে যাচ্ছে। তার কারণ যা তাও আমরা বুঝি;—তা এই রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় সত্য। ভারতের জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগঠন ও নেতৃত্ব গঠিত

হয়নি। স্পষ্টই বোঝা যায়, এমন কোনো একটি সংগঠন আজ এ-দেশে নেই যে, একা এ-দেশের এই বিপ্লবকে সংগঠিত করতে পারে। অন্তত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর ঐক্য এ উদ্দেশ্যে চাই। কিন্তু দেখা গেল, জনতার যে দু'টি প্রধান সংগঠন (কংগ্রেস ও লীগ) এ-দেশে এই বিপ্লবমুখী জনতা ও সেনাদের চালিত করতে পারত তারা এই বিপ্লবের দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত নয়। এই দুই প্রতিষ্ঠান গৃহযুদ্ধের আয়োজনেই বেশি পাঁয়তাড়া করছে, ঐক্যের জন্য প্রস্তুত নয়। তারা পরস্পরের এই বিরোধের জন্য সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির খেলারই সুযোগ করে দিচ্ছে, তবু একত্র হতে পারছে না।

অবশ্য শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবকে সমর্থন করবার জন্য উদ্যত ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু যতই জনসাধারণ তাঁদের ঝাণ্ডাকে অন্য দুই ঝাণ্ডার সঙ্গে একত্র করে বিপ্লব পথে এসে দাঁড়াক, কংগ্রেস বা লীগ নেতারা তাদের দাবি গ্রাহ্য করবে না, কমিউনিস্ট পার্টিকেও বরদাশ্‌ত করবে না। বরং কংগ্রেসের ও লীগের নেতারা দেশের সমস্তগুলো বিদ্রোহের ও বিক্ষোভের স্ফুরণকে 'গুণ্ডামি' ও 'কমিউনিস্টের কাজ' বলেই এই আগুনকে ছাই-চাপা দিলেন। অবশ্য এর একটা কারণ—এই দুই সংগঠনের নেতৃত্ব সত্যকারের গণবিপ্লবের পক্ষপাতী নয়। এই দু'নেতৃত্বের উপর এ-দেশের ধনিক শ্রেণীর প্রভাবই প্রবল। আর এই ধনিক শ্রেণী জানে একবার জন-গণ বৈপ্লবিক পথে পা বাড়ালে জনসাধারণ শুধু সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করেই থামবে না, তারা ধনিকতন্ত্রের হাত থেকে ক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ করতে চাইবে। কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্ব এ-জন্যই গণ-বিপ্লবকে সমর্থন করে না, এমন কি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানকেও নানা সূত্রে চায় চূর্ণ করতে। এ-জন্যই তারা এ্যাটলি-ওয়াভেলের হাত থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তি সুবিধাজনক মনে করে, বিপ্লবী চেষ্টাকে মনে করে বিপজ্জনক। ১৩৫২-র ভারতবর্ষের রাজনীতিতে দ্বিতীয় সত্য তাই এইঃ—ভারতীয় নেতৃত্বের পরাজয়। যেমন, ওয়াভেল-এ্যাটলীর নিকট তাদের আত্মসমর্পণ, জন-বিপ্লবের বিপথচালনা, এবং গৃহযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব।

ওয়াভেল-নীতির জয়

আমাদের রাজনীতির তৃতীয় সত্য তাই এইঃ—ওয়াভেল নীতির জয়। যুদ্ধশেষে ইংরেজের নতুন সাম্রাজ্যতন্ত্রনীতি হল, ভারতবর্ষে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়ার সামরিক ও আর্থিক ঘাঁটি পাকা করা। সেই উদ্দেশ্যে এখন তারা ভারতীয় মালিকতন্ত্রকে নিজেদের সহযোগীরূপে চায়। তাদের ইচ্ছা ভারত শোষণে ভারতীয় মালিকদের অংশীদার করে নেওয়া, এবং সেই সহযোগিতা সম্ভব করার জন্য খানিকটা রাষ্ট্রীয় অধিকার ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়া। এই ইঙ্গ-ভারতীয় এজমালী সম্পত্তির নমুনা হল বিড়লা-নুফিলডের সহযোগিতা। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের চেষ্টা হল কত কম ক্ষমতা হস্তান্তর করে কত বেশি ক্ষমতা হাতে রাখা যায়। সেদিকে ওয়াভেলের হাতে আছে দুটি অস্ত্র—একটা এ-দেশীয় মালিকদের মনে বিলাতে জমানো ভারতবর্ষের স্টার্লিং ব্যালান্স হারানোর ভয়; অন্যটি ভারতবর্ষের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেদ-বিভেদের সুযোগ। সিমলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত ১৩৫২-তে এজন্য এই ওয়াভেল-নীতিরই জয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওয়াভেল আমাদের জন্য পরিকল্পনা করছেন একদিকে "মিশরী স্বাধীনতা", ও অন্যদিকে ইংরেজ খবরদারীতে "ফিলিস্তিনী স্বতন্ত্রী রাষ্ট্রের" —পাকিস্তান, হিন্দুস্থান ও রাজস্থানের।

আর্থিক বিপর্যয়

ভারতীয় নেতৃত্বের কতটা পরাজয় ঘটেছে তা দেখা যায় আমাদের আর্থিক অবস্থার দিকে তাকালে। যুদ্ধে ভারতবর্ষের আর্থনীতিক জীবন একেবারে চুরমার হয়ে গিয়েছে—কংগ্রেস বা লীগ

তার জন্য কোনো সত্যকার ভাবনা ভাবতেও অসমর্থ ; অন্যদিকে ওয়াভেলের আমলাতন্ত্র ভবিষ্যতের প্ল্যান ভবিষ্যতের কর্তাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। এত বড় 'ক্রিমিন্যাল' কাজ যুদ্ধশেষে আর কোনো সরকার করেনি। দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজ কি? প্রথমত, দেশে দুর্ভিক্ষ আসছে। তারপরে প্রায় ৭০ লক্ষ সামরিক কাজের লোক বেকার হচ্ছে, তারা অনেকেই মজুর ও মধ্যবিত্ত। হাজারে হাজারে নানা কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট করছে, ডাক বিভাগের লোকেরা পর্যন্ত ঠাণ্ডা থাকেনি। ছোট ছোট মাস্টাররা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে, রেল কর্মচারী ও মজুরদের ধর্মঘটের 'ব্যালট' নেওয়া চলছে। বেকার বাড়ছে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম রয়েছে আড়াই গুণ, তিন গুণ। এ যুদ্ধকালে কলকারখানা বাড়েনি, যন্ত্রপাতি আসেনি। সাধারণের ব্যবহার্য উৎপাদন বরং কমেছে, অন্যদিকে এই কম উৎপাদন সত্ত্বেও মালিকদের মুনাফা তিন গুণ, চার গুণ বেড়ে গেছে। তাদের হিসাবপত্রেই দেখি তারা এ-যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে গিয়েছে, দেশের মানুষের ধনপ্রাণ কোনো কিছুর জন্য তারা পরোয়া করেনি, কিন্তু মজুরের মজুরি ভাতা বাড়েনি শতকরা ষাট টাকাও। অন্যদিকে কৃষকের হাত থেকে ফসল চলে গিয়েছে জোতদার, মজুতদারের হাতে, কৃষক কিছুই পায়নি। কিন্তু এই আড়তদার-মজুতদার দেশকে লুঠ করেছে, অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক দিন কাটাচ্ছে। এ-ভাবে সমস্ত দেশের উপর চেপে বসেছে শোষণের দুই শক্তি—চোরাকারবারি ও চোরা কর্মচারী। গ্রামের কৃষকজীবনের উপর পুরোনো জমিদার ও মহাজনের সঙ্গে এরাই জোতদার, আড়তদার, মজুতদাররূপে এসে জুড়ে বসেছে। শহরের জীবনের উপর এরাই চেপে বসেছে পুরোনো মালিক ও শোষকদের সঙ্গে কন্ট্রাক্টার, মুনাফাদার, নানা রকম ব্যাংক ও ব্যবসায়ের মালিকরূপে। আর পুরনো পথধরা আমলাতন্ত্রের ছোট-বড় কর্মচারীরা এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গলা টিপে মারছে সমস্ত দেশের গরীবদের,—গরীব কৃষককে, মজুরকে, গরীব মধ্যবিত্ত স্ত্রী-পুরুষকে। যুদ্ধশেষে দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে তারা ধুকছে। অথচ দেশে টাকার অভাব নেই। অজস্র টাকা বিলাতেও জমা রয়েছে, কোটি কোটি টাকা বাড়তি মুনাফার মালিকদের উদরে। তবু দেশে কল-কারখানা বাড়াবার প্ল্যান নেই, দেশের মানুষের কাজ নেই। বরং দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে আমাদের নেতারা ওয়াভেলের প্ল্যানেই ঢেড়া-সই দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন—এমন কি, মজুরের রেশন-বাটাও সমর্থন করে গেলেন।—অথচ এখনো "১৩৫০ এর মন্বন্তরের" সরকারী নীতির কন্ট্রোল, রেশনিং, প্রকিওরমেণ্ট প্রভৃতির এরাই হয়ে বসেন বড়া সমালোচক। ভারতীয় নেতৃত্বের রাজনৈতিক পরাজয়ই শুধু নয়, আর্থনীতিক ক্ষেত্রেও পরাজয় এভাবে সুসম্পন্ন করছেন ওয়াভেল-এ্যাটলি। "দুর্ভিক্ষ" সম্বন্ধে, "বেকারী" সম্বন্ধে, শিল্পগত প্ল্যানিং সম্বন্ধে কোনো সত্যকারের পরিকল্পনা বা চিন্তাও করেনি কংগ্রেস বা লীগ—তারা সেই দায়িত্বও ছেড়ে দিয়েছে দায়িত্বহীন সাম্রাজ্যবাদের উপর।

এমন করে আজ ১৩৫৩ সনে আমরা যে নতুন ইতিহাসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি—তাতে এ প্রশ্নই সম্ভবত আমাদের মনে জাগে, আজ কি আমাদের স্বাধীনতার নববর্ষ? না, আমাদের গৃহযুদ্ধের নববর্ষ? জনসাধারণের অধীরতা ও প্রেরণার দিক থেকে দেখলে মনে হবে স্বাধীনতার। আর সংগঠন ও নেতৃত্বের দিক থেকে দেখলে মনে হবে—গৃহযুদ্ধের।

ভারতের ভাবী যোগসূত্র

১৩৫২ এই প্রশ্ন রেখে গিয়েছে। ১৩৫৩ তার উত্তর দেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা যে দু'একটি বিষয়ে ইঙ্গিত পাচ্ছি তাতে ভারতবর্ষের ভাবী রূপেরও খানিকটা কল্পনা করতে পারছি। সেই ইঙ্গিতের সূত্র ধরেই আজ বলতে পারি—কংগ্রেসের, লীগের বা ওয়াভেলের, যারই পরিকল্পিত ভিত্তির উপর এই নতুন ইতিহাস গড়ে উঠুক, ভাবী ভারতবর্ষ আর কেন্দ্রীকৃত এক রাষ্ট্র থাকবে না। দুই বা তিন ভগ্নাংশে বিচ্ছিন্ন না হলেও তা হবে যৌথ রাষ্ট্র বা রাজ্যসংঘ, (কনফেডারেশন বা ফেডারেশন)। অর্থাৎ রাষ্ট্রের হিসাবে তার ইউনিট বা অখণ্ড বস্তু হবে এক একটি ভাষার ভিত্তিতে গঠিত এক একটি জাতি, যেমন বাঙালী, বিহারী প্রভৃতি। এটাই কংগ্রেসের "অখণ্ড হিন্দুস্থানের" নতুন সংস্করণ। অর্থাৎ (১) কার্যত মানতে হল ভারতবর্ষ এক জাতির নয়, বহু জাতির দেশ ; (২) সাম্রাজ্যবাদের গড়া ভারতবর্ষের শাসনগত ঐক্য এখন থেকে শিথিল হবে—ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্পর্কও এসব ভারতবর্ষীয়

জাতিগুলি রাখতে বাধ্য হবেই। এখনকার মতই রেলওয়ে, টেলিগ্রাম বা গতায়াতের বন্ধন তো অটুট থাকবেই; শুল্ক বাণিজ্য আর বৈদেশিক ও দেশ রক্ষার ব্যবস্থাও হয়ত এরূপ একযোগেই চলবে। তবু (৩) আধুনিক সভ্যতার যে-সব আর্থনীতিক ও বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ আমাদের ভারতবাসীদের ঘনিষ্ঠ করেছে তা আরও দৃঢ় করলেই এই সাম্রাজ্যবাদী অখণ্ডতা ভগ্ন হওয়াতে যে দুরন্ত ঘটার সম্ভাবনা তা নিবারণ করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব, এ কথা মনে রাখা দরকার। আর যোগাযোগের দ্বিতীয় পথ থাকবে আমাদের সংস্কৃতির,—যে-পথ চিরদিনই ভারতবর্ষের সকল প্রান্তকে সংযুক্ত রেখেছে।

কথাটি তাই এই:—ভারতবর্ষের ইউনিট যখন হতে চলল বাঙালী, বিহারী প্রভৃতি জাতিগুলি, প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে তখন আর বাঙালী থাকলে চলবে না, হতে হবে সেই প্রবাসেরই ভাইদের স্বদেশী। এবং ভারতবর্ষের শাসনগত বন্ধন যখন শিথিল হতে চলল তখন ভারতবর্ষের সকল জাতির যোগাযোগকে ঘনিষ্ঠতর করার দায়িত্ব আজ এসে পড়ল এই প্রবাসীদের উপরই বিশেষ করে। সেই মিলনের পথ দু'টি দিকে খোলা আছে—এক, সর্বভারতীয় যোগাযোগ (communication)-এর পথ। বৈজ্ঞানিক ও কারুজীবী হিসাবে রেলওয়েতে, জাহাজে, বন্দরে যারা জীবিকা অর্জন করেন এই ভার তাদের উপর। সেখানে সমস্ত জাতির শ্রমিক ও সহকর্মীর সঙ্গে তাদের গড়তে হবে ব্যক্তিগত ঐক্য ও বন্ধুত্ব। দ্বিতীয় পথ, সংস্কৃতির। বাঙলার সংস্কৃতির নিকটে প্রবাসী বাঙালী এনে পৌঁছে দেবে অন্য সংস্কৃতির বার্তা। আবার বাঙলা সংস্কৃতিকে নিজেদের সর্ব-ভারতীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা করে তুলবেন মহাজাতিক সংস্কৃতির প্রধান ধারা।

বাঙালী কালচারের হিসাব

কথা হবে, বাঙলার সংস্কৃতির এদিকে কতটা শক্তি ও সম্ভাবনা আছে। আমরা বাঙলা সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু একেবারে অন্ধভাবে গর্ব করি না। গর্ব করবার মত বেশ কিছু কারণ নিশ্চয়ই আছে। **খুব কম করে হলেও একবার আমরা মনে করতে পারি এই সোয়া শত বছরে আমরা যা সৃষ্টি করেছি কোনো পরাধীন জাতি সম্ভবত এমন সৃষ্টি এত অল্প সময়ে করতে পারেনি।** আমরা এযুগে শিল্পে, ললিতকলায় ভারতবর্ষে (১) একটা বড় সাহিত্য সৃষ্টি করেছি; (২) অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত ভারতের শিল্পকলার জগতে আমরাই অগ্রণী—বাঙালীই ভারতের অন্যত্রও শিল্পকলার এযুগে উদ্বোধন করেছে। (৩) রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে এদেশে এক নতুন আধুনিক সঙ্গীত ধারা আমাদের দান। (৪) ভারতবর্ষে নাট্যজগতে আমাদেরই সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য; এমন কি গণ-নাট্যের এক নতুন উন্মেষও প্রধানত বাঙলায় চলছে। (৫) আমরা নতুন করে নৃত্যশিল্পও উদ্বোধন করেছি। (৬) সিনেমা-রেডিওতে আমাদের শিল্পও আমাদের সৃষ্টির সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন ধনিককেন্দ্রে ভারতবর্ষের একালীন ঐক্য রূপ নিচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও (১) আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা এখনো উল্লেখযোগ্য; চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আমাদের দান এখনো স্মরণীয়; (২) নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতির গবেষণায় আমাদের কৃতিত্ব স্বীকার্য।

ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতিই একদিকে এ পরিমাণ সৃষ্টি এখনো করতে পারেনি, আমাদের দান প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রবুদ্ধ করেছে। আজ যখন তারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চেষ্টা করবে, তখন এই পূর্বজদের সাহায্য ও সহযোগিতা তারা আরও স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করবে, এবং নিশ্চয়ই অনেক ক্ষেত্রে তাদের সৃষ্টি অধিকতর কৃতিত্বপূর্ণ হবে। কারণ শত সত্ত্বেও আমাদের সৃষ্টিতে যে বহুদিকে ত্রুটি রয়েছে, বহু দিকে আমরা এখনো অনগ্রসর তাতেও ভুল নেই। খুব বিশদভাবে—হিসাব না করেও বলতে পারি—সাধারণত বাঙালী সংস্কৃতি মানস সম্পদেরই সৃষ্টি করেছে বেশি, বাস্তব সম্পদ সে তুলনায় সৃষ্টি করেছে কম। যেমন, আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যতটা কৃতিত্ব দেখিয়েছি ব্যবহারিক বিজ্ঞানে, ও technological প্রয়াসে সে পরিমাণে কৃতিত্ব দেখাতে পারিনি সেদিকে ভারতবর্ষে অন্যত্র নানা প্রতিষ্ঠান ও গবেষক আজ বেশি অগ্রসর হচ্ছে। তার কারণ আমরা আর্থিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শ্রমশিল্পে স্বদেশে ও প্রবাসে পিছিয়ে পড়ে গেছি। এযুগের বাণিজ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাই আমরা ততটা এগুতে পারি না। এজন্য রেডিও, সিনেমা, সংবাদপত্র—এযুগের এসব

গুরুতর প্রভাবশালী ক্ষেত্রে আমাদের এখন প্রাধান্য নেই। আবার টেক্‌নোলজির ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ না হলে ক্রমশই আধুনিক কালের উৎপাদন-ক্রিয়ায় ও বণ্টন-ক্রিয়ায় আমরা পিছিয়ে পড়ব। অর্থাৎ, রেলের কাজে, যান-বাহনের কাজে, শিল্প সংগঠনের কাজে শুধু "কেরানী" হলে আমরা ক্রমশই পরাস্ত হব।—ভারতের বাস্তব যোগাযোগের ক্ষেত্রে কেরানীগিরির দাম খুব বেশি হতে পারে না; তার চেয়ে হাতে-কলমে কাজ করা মিস্ত্রি মজুরেরও দাম বেশি। বাঙালীর সংস্কৃতির মধ্যে এদিকে একটা বড় রকমের ত্রুটি যে ঘনিয়ে উঠছে, তা কি আমরা বুঝি না? আমাদের ভদ্রলোকের সংস্কৃতি বড় শ্রমবিমুখ—বাস্তববিমুখ।

অবশ্য বাঙলা সংস্কৃতির মূলের যা গলদ তা'ই তার এ ত্রুটির কারণ। তা এই: মূলত আমাদের বাঙালী সংস্কৃতি ইংরেজের আওতায় জমিদারীতন্ত্রের মধ্যে গড়ে ওঠে। তার বাহক হচ্ছি আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা, বিশেষ করে হিন্দু ভদ্রলোকেরা। তাতেই আমাদের সংস্কৃতির গোড়া থেকেই ত্রুটি থেকে গিয়েছে: যেমন (১) এ সংস্কৃতি বহুলাংশেই হিন্দুর সংস্কৃতি, হিন্দু ঐতিহ্যও তাই যথেষ্ট পরিমাণেই আমরা গ্রহণ করেছি, কিন্তু মুসলিম ঐতিহ্য তাতে ততটা গ্রাহ্য হয়নি। এজন্যই বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান আজ একে অস্বীকার করে নিজেদের বাঙলা সংস্কৃতি গড়বারও কথা ভাবেন। (২) এ সংস্কৃতি বিশেষ করে মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি, হিন্দু-মুসলমান সাধারণ শ্রমিকের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়, অর্থাৎ এ সংস্কৃতি হয়ে রয়েছে "বাবু কালচার।" (৩) এ সংস্কৃতি বিশেষ করে শহরে জন্মেছে; পল্লীজীবনের প্রভাব তাতে কম। তাই লোক সংস্কৃতিকে এমন কি কৃষি-সমাজের মূল রূপকেও, এ সংস্কৃতি বিশেষ করে স্বীকার করেনি। অর্থাৎ বাঙলায় সংস্কৃতির সংকট তিন রূপে প্রকাশিত হয়েছে: মানস-সম্পদের তুলনায় বাস্তব-সৃষ্টিতে আমাদের পরাঙ্মুখিতায়; 'বাবু কালচার' ও 'মিঞা কালচারের' নতুন দ্বন্দ্বে; আর বাঙলার 'ভদ্র কালচার' বনাম লোক-সংস্কৃতির পার্থক্যে।

ব্যাপারটা কতদূর শোচনীয় হয়ে উঠেছে তা আমাদের নববর্ষ উৎসবগুলোর দিকে তাকালেও দেখা যাবে। এ সব উৎসবে প্রায়ই মুসলমান যোগদান করেন না, আর বাঙালী গরীব শ্রমজীবী, মজুর, কৃষকের তাতে স্থান নেই। বাঙালী সংস্কৃতি থেকে এই ত্রুটি দূর করতে না পারলে তা সুস্থ হবে না, বাঙলার এসব উৎসবও সর্বাংশে বাঙালীর উৎসব হবে না, তা বলাই বাহুল্য; আর এটি দূর করবার উপায় হচ্ছে এই মধ্যবিত্ত কালচারকে জন সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা, জমিদারীতন্ত্রের ভাঙা বুনিয়াদ ছাড়িয়ে তাকে এ-কালের শিল্প ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

বাঙলা সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি

কিন্তু তা সত্ত্বেও যা সত্য তা এই,—বাঙলা সংস্কৃতি এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও কোনো সংকীর্ণ নীতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। তার ভিত্তি ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু দৃষ্টি ছিল ব্যাপক। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের এই সংস্কৃতির এই দৃষ্টিভঙ্গির খোঁজ নিলে দেখতে পাই—সত্যই তাতে "প্রাদেশিকতা" ছিল না, তা "বাঙালীয়ানা" বা "Bengali chauvinism" প্রশ্রয় দেয়নি। তা দেওয়ার কথাও নয়: কারণ প্রথমত এ-সংস্কৃতির জাগরণের কারণ কোনো "বাঙালী প্রেরণা" নয়—পাশ্চাত্য সভ্যতা বা বুর্জোয়া জীবন ও তার সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাত। সে সভ্যতা বাস্তবক্ষেত্রে জমিদারিতন্ত্র সৃষ্টি করলেও মানসক্ষেত্রে কোনো পঙ্গুতার বা সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেয়নি। আমাদের সংস্কৃতি তার পাশ্চাত্য রূপের বিরুদ্ধেও যখন রক্ষা কবচ খুঁজতে গিয়েছে তখন তা খুঁজেছে সর্ব-ভারতীয় সভ্যতার ভাণ্ডার থেকে,—বাঙালীর সাজি থেকে নয়। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশেষ করে ভারতীয় ঐতিহ্যকে বাঙলার কালচার গঠনে উপাদানরূপে গ্রহণ করেন। রামমোহন রায়ের তন্ত্রসাধনা "বাঙালীত্বের" প্রমাণ নয়;—বড় জোর তা'র দৃষ্টিশক্তি যে বাঙালীর সাধনাকেও বিস্মৃত হয়নি, এ তারই প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাকুল হয়েছিলেন বাঙালী জাতির জন্য। কিন্তু কোৎ, মিল, স্পেনসর, সীলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সম্বল ছিল গৌড়িয় বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ নয়, গীতার সর্ব-

ভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ ; অনুশীলনতত্ত্বের আশ্রয় বাঙালীর তন্ত্র নয়, ভারতীয় সাধনার জ্ঞান-ভক্তি-বহুল কর্মযোগ। এ-ভাবেই বাঙালীর সংস্কৃতি গোড়া থেকে একটা সর্বভারতীয় (অবশ্য প্রধানত হিন্দু) মর্মবাণীকে আপনার করে নিয়েছে—কোনো বাঙালী ভিত্তিকে আশ্রয় করেনি। প্রমথ চৌধুরীর মত বাঙালী পেট্রিয়টিজমের প্রচেষ্টাও মনোজগতে সেই প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপের মিশ্রজগতের বাসিন্দা। পরবর্তীকালে আমরা বৈষ্ণব পুনরুত্থান বা তন্ত্রের মধ্যে একটা বাঙালী সাধনার বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছি, রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণকে আশ্রয় করে তার প্রসার ঘটে। বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন এ-বাঙলার রূপ আরও স্পষ্ট করে গেলেন। কিন্তু বাঙালীয়ানা বা বাঙালী chauvinism যতক্ষণ পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতি বেশ সবল ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মোটেই আমাদের কোনো লেখককে বা ভাবুককে বিচলিত করতে পারেনি—ও-জিনিসটার শুরু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় থেকে, আর বেশি কাটতি হয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতির যা দৃষ্টিভঙ্গি তা মোটেই অমন সংকীর্ণ নয়, বরং তার এক চোখ ভারতীয় সাধনার দিকে, অন্য চোখ ছিল আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতার পাশ্চাত্য প্রয়াসের দিকে। এ-জন্যই আমরা বলতে পারি—বাঙালীর শিল্প-সৃষ্টি ভারতের অন্য জাতিদেরও পথপ্রদর্শন করেছে ; আর বাঙালীর সেই সংস্কৃতি ভাবীদিনেও ভারত-গোষ্ঠীর মহাজাতির দূত প্রাণের বন্ধনকে দৃঢ় করতে পাববে।

ভারতীয় গোষ্ঠীর এই যোগাযোগের বন্ধন কি করে নিবিড় হবে, এই নববর্ষে প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে তা স্বভাবতই ভাবনার বিষয় হয়েছে। এখন থেকে প্রবাসে আর তাঁদের বাঙালী বলে রাষ্ট্রীয় পরিচয় দেবার অধিকার থাকবে না—পরিকল্পিত যৌথরাষ্ট্রে তারা নিজেদের বিহারী, উড়িয়া, অহমিয়া, হিন্দুস্থানী বলেই মানতে বাধ্য হবেন। ভবিষ্যতে ভারতীয় মহাজাতি গঠন তাই এবার তাদেরই পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বেশি আর তারাই ভাবী মহাজাতির রাজদূত। সেই মহাজাতি গঠনের জন্য ভারত-গোষ্ঠীর জাতিদের যোগাযোগের সূত্র (communication) পথ প্রশস্ত করাই হবে প্রবাসীদের নতুন সাধনা। ভাবতেব এ-যোগাযোগ অবশ্য বাস্তব আর মানসিক দুইই, অথবা অনেকক্ষেত্রেই দুইয়ের মিশ্রিত পথ। অর্থাৎ একদিকে তাদের এ কালের টেক্‌নিক্ বা কারুবিদ্যা আয়ত্ত করে রেলে-জাহাজে, বাজারে-বন্দরে, সেনা-বিভাগে শিল্পায়োজনে জীবিকাসূত্রে এই যোগাযোগের সাধনা গ্রহণ করতে হবে ; অপর দিকে তাঁদেরই আবার সেই সঙ্গে নিতে হবে বাঙালী সংস্কৃতির মর্মবাণী প্রচারের ভার। মনে রাখা দরকার সিনেমা, রেডিও, কলের গান, এসবই এই যোগাযোগের পক্ষে নতুন শিল্প-পথ। এ-ক্ষেত্রে অর্থকরী বনিয়াদ যারই থাক, শিল্পগত কৃতিত্ব বাঙালীরও হতে পারে। তাছাড়া নতুন ভারতে শিল্পপত্তনে ও শিল্পপ্রসারে বাঙালী শিল্পীও নিশ্চয়ই আদব লাভ করতে পাবে।

অবশ্য, এ কথাই বলা বাহুল্য তার সঙ্গে সঙ্গে আজ ভালো করেই মনে রাখতে হবে—আমাদের বাঙলায় বাঙালী সংস্কৃতি এখনো খণ্ড, ভগ্ন, অসম্পূর্ণ, সে-সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের সমবেত সংস্কৃতিতে পরিণত হওয়া দরকার। 'বাবু কালচার' ও 'মিঞা কালচারের' দ্বন্দ্ব মিটলেই শুধু হবে না, বাঙালী কৃষক ও মজুরেরও কালচারে তার পরিণত হওয়া চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চাই লোক-সংস্কৃতির দান ও ঐতিহ্য গ্রহণ করে তার বিস্তার ও ধারাবাহিকতাকে সম্পূর্ণ করা। সেদিকে বাঙালী সংস্কৃতি সম্পূর্ণ না হলে ভারতেব যোগবর্ধন তো দূরের কথা বাঙলারও অখণ্ডতা বজায় রাখবে না।

নতুন ইতিহাসেব দুয়ারে আজ নববর্ষে ভারতের সমস্ত ভারতবাসীই দাঁড়িয়েছে। বাঙালী সংস্কৃতির নতুন ইতিহাস গড়ার দায়িত্ব আজ বাঙলার। তার আভ্যন্তরীণ বিরোধের সমন্বয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একালে এই ভারতীয় যোগাযোগের ধারা প্রশস্ত করার দায়িত্ব বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালীর—সেই পরিশ্রমী, জীবিকান্বেষী, শ্রমজীবী ও শিল্পজীবী সকল বাঙালীর। ভারতীয় মহাজাতির রাজসভায় তারাই বাঙালীর দূত—আর ভারতের ভাবীসমাজের তারাই সংগঠক।*

---

* বাংলা ১৩৫৩ সালের ১লা বৈশাখ, খগোল (দানাপুর) নববর্ষ সম্মেলনের বক্তৃতার মর্মাবলম্বনে লিখিত।

রিনেইসেন্সের হেরফের

কে জানে যুদ্ধেরই একটা ফল কি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মনস্বীদের জগতে একটা নতুন লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে। পুরনো জীবন-চিন্তায় তাঁরা বর্তমান সভ্যতার ব্যাধিকে বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই, বোধ হয়, পণ্ডিতেরা আগে যেভাবে নতুন জীবন-চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতেন তেমন-ভাবে আর তাঁরা নতুন চিন্তাকে অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। তাঁরা বুঝছেন, পৃথিবীর পুনর্গঠন করতে হলে তাকে পুরনো ছাঁচে ঢালাই করলে আর চলবে না। তাই তাঁদের পুরনো জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ছাঁচও এবার বদলানো দরকার। এই বোধের একটা প্রমাণ যেন মিলছে 'ইণ্টারন্যাশনাল লাইব্রেরী অব্ সোশিওলজি এণ্ড সোশ্যাল-রিকনস্ট্রাক্শন' নামক সিরিজের নতুন প্রকাশিত গ্রন্থাবলী থেকে। সিরিজের নামটায় একটা বিশেষ অর্থ আরোপ করতেও এজন্য লোভ হচ্ছে। সে-অর্থটি এই—সোশিওলজি, সমাজ-বিজ্ঞান, এখন বর্তমানে সমাজের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন নয়; সোশ্যাল রিকনস্ট্রাক্শনের মানে সামাজিক পুনর্গঠনের সেই দায়িত্ব এ-বিজ্ঞান মেনে নিতে চায়। মানে, এ যুগের সমাজ-বৈজ্ঞানিকরা শুধু সভ্যতার রূপ জানতে চান না, এবার সভ্যতাকে রূপান্তরিত করতে চান। আর্থিক পরিকল্পনা, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে এই সিরিজে যে নতুন গ্রন্থাবলী বেরুচ্ছে তা দেখে মনে আশার সঞ্চার হয়।

রিনেইসেন্সের হেরফেরের কথা বুঝি ইতালির রিনেইসেন্স সম্বন্ধে এদের একখানি গ্রন্থ থেকে।*

ছোট বই। মূল লেখা বই জার্মান ভাষায় ১৯৩২-এ—হিটলারের আবির্ভাবের পূর্বমুহূর্তে। লেখক ফন্ মার্টিনের আলোচ্য বিষয় রিনেইসেন্সের যুগধর্ম। সেজন্য ইতালির রিনেইসেন্সকে তিনি বিচার করেছেন। ইতালির রিনেইসেন্সের আসলরূপ ফ্লোরেন্সেই আবার পরিস্ফুট হয়, এই তিনি মনে করেন। কারণ, ফন্ মার্টিনের মতে জার্মানী যেমন 'মধ্যযুগ' বা 'রোমাণ্টিক পুনর্জীবনের' লীলাভূমি; পশ্চিম ইউরোপ যেমন 'যুক্তিযুগের' লীলাভূমি, 'রিনেইসেন্সের' লীলাভূমি তেমনি ইতালি। দেশে দেশে জলবায়ু, ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এই খাঁটি যুগধর্মের একটু প্রকারভেদ হয়। ইতালির রিনেইসেন্স আর তার ইংরেজি সংস্করণে যে কত তফাৎ, তা আমরাও জানি। কিন্তু লেখক ইতালির রিনেইসেন্স বর্ণনা করতে বসেননি; সেজন্য বুর্কহার্ড্ট্-এর গ্রন্থই এখনো পাঠ্য—যাঁদের তত কৌতূহল আছে। ফন্ মার্টিন করেছেন যুগধর্মের ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যায় তিনি ম্যাক্স্ ভেবর-এর পথ ধরেছেন, অনেকটা 'পরিবেশবাদী' পথ। মানুষকে যে পরিবেশ বদলায় তা এ-মতে ততটা প্রকট নয়। ফন্ মার্টিন আলোচনা করেছেন—কি সামাজিক কার্যকারণে রিনেই-সেন্সের "যুগধর্ম" এই বিশেষ রূপ গ্রহণ করলে; আর সেই যুগকেও সেই যুগধর্ম আবার কি নতুন রূপ দান করলে। তাঁর এ আলোচনা-পদ্ধতির গোড়ার সূত্র এই যে, এই যুগধর্মের রূপ-নির্ণীত হয় যারা আর্থিক, রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী তাদের দ্বারা। কিন্তু ভোলা উচিত নয় যে, ম্যাক্স্ ভেবর প্রমুখ আলোচকরা আসলে মানুষকে পরিবেশের পুতুল হিসেবেই দেখছেন বেশি। মানুষ যে পরিবেশকে বদলায়, নিজেকেও বদলায় সেই সূত্রে, এ-দিক এই পণ্ডিতেরা ভুলে যান। ফন্ মার্টিনেরও গবেষণায় এ-কারণে ত্রুটি রয়েছে। তিনি যেন পরিবেশের নিকট রিনেইসেন্স-চেতনার পরাজয় দেখতেই উদ্যোগী। তার মূল ধারাটি তবু আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে অন্য নানা কারণে।

* Sociology of the Renaissance—Alfred von Martin,
(Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. London. 8/6)

ধনিকতন্ত্রের বীজাবস্থা

মধ্যযুগ থেকে বর্তমান যুগে যাত্রার পথে ইতিহাসের প্রথম ঘাঁটি এই ইতালীয় রিনেইসেন্স। কাজেই সেই প্রথম পর্বেও নিশ্চয়ই কিছু কিছু মধ্যযুগের চিহ্ন থাকবে—তা ভুললে চলবে না। কিন্তু তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়। গুরুত্ব আরোপ করতে হয় নতুন সামাজিক লক্ষণগুলোর উপর—যা পরে আরও প্রকাশিত হবে, বিকশিত হবে, যার সূচনা দেখা দিয়েছিল তখন রিনেইসেন্সে। আমাদের যুগে ধনিকতন্ত্রকে দেখছি আমরা বহু পল্লবিত; কিন্তু রিনেইসেন্সের যুগে ধনিকতন্ত্র সবে জন্মাচ্ছে বণিক্‌বেশে। তবু তার ভ্রূণ জীবনেই তার যে-সব চাল-চলতি দেখা যায় তা এ-যুগের ধনিকতন্ত্রের গতিবিধি বুঝবার পক্ষেও বেশ কার্যকরী। সেদিক থেকে এ-গ্রন্থ সকলেই পাঠ করে উপকৃত হবেন, বেশ তীক্ষ্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ দেখতে পাবেন।

'মানি-ইকোনমি'

মধ্যযুগের সমাজ-জীবনের ভিত্তি ছিল জমি। সমাজে জমির মালিকের ক্ষমতা ছিল প্রচুর। সম্পত্তি হিসাবে জমি স্থাবর সম্পত্তি, তার ফলে মধ্যযুগের জীবনধারা ছিল স্থাণু। তখনকার এম্পায়ার বা রাষ্ট্রশক্তি এবং চর্চ বা ধর্মসংস্থা সেই সমাজ-বিন্যাসকে আরও অনড় বলে ঘোষণা করত; বলত, কারিগর, ব্যবসায়ী, শিল্পীরাও যার যেখানে স্থান সেখানেই থাকবে। কিন্তু এই জীবন-যাত্রার মধ্যেও বাজার বন্দর বেড়ে উঠতে লাগল, শহরগুলো ফেঁপে উঠতে লাগল, শহরের বুর্গার বা ব্যবসায়ীরা ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হতে লাগল তাদের হাতে টাকাকড়ি জমতে লাগল। এ-ভাবে "মুদ্রা-প্রধান" জীবন-যাত্রার গোড়াপত্তন হল, অর্থাৎ 'মানি-ইকোনমির' দিন শুরু হল। মুদ্রা বা টাকাকড়ি অস্থাবর সম্পত্তি, বড় তাড়াতাড়ি তা হাত বদলায়। তাই, টাকার তাড়ায় মধ্যযুগের স্থাণু সমাজ আর স্থাণু রইতে পারল না, ক্রমেই তা সচল হয়ে উঠল। সমাজের সনাতন ঠাট তখনো বজায় রাখতে চাইল ধর্ম, রাষ্ট্র ও আর আর সব প্রাচীন প্রাচীন শক্তি, তাদের সেই বাধা অগ্রাহ্য করে প্রসারলাভ করতে চাইল বণিক্ ব্যবসায়ীরা। এইভাবে বণিক্‌তন্ত্রের প্রথম সূচনা হল, তার **প্রধান গুণ হল সচলতা**। এই সচল দলে প্রধান উদ্যোগী ছিল মুদ্রাবলে সচল বণিকেরা, আর তাদের সঙ্গে ছিল বুদ্ধিবলে সচল বুদ্ধি-জীবীরা। এদের সংযুক্ত বিদ্রোহে মধ্যযুগ শেষ হল। এই বিদ্রোহই রিনেইসেন্স, মানে বণিক্‌যুগের প্রথম পর্ব। সে পর্বের যে-দিকটিতে বুদ্ধির মুক্তি, নানা মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা অনুসন্ধান, আর্টের অপূর্ব বিকাশ, মানুষের মহিমাবোধ—আমরা সে-দিকটিকেই বিশেষ করে বলি "রিনেইসেন্স"।

এই বুদ্ধিজীবীরাও মোটামুটি বণিক্‌তন্ত্রের প্রয়োজনকে মেনে নিয়ে সমাজকে নতুন করে গঠন করতে লাগেন; বণিক্‌তন্ত্রও আবার নতুন সমাজপত্তনে এই গুণী ও জ্ঞানীদের স্থান ও দান স্বীকার করে নেয়। কারণ, দু-দলই ছিল সহযাত্রী, সমাজ-প্রগতির স্বপক্ষে মধ্যযুগের বিপক্ষে। সচলতা বা গতিশক্তি সমাজে যখন দেখা দিল তখন "সমাজের নতুন বিন্যাস" শুরু হল প্রথমত ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল "উদ্যোগনিপুণ পুরুষেরা", ইন্‌ডিভিডুয়েল্ আঁত্রেপ্রেনুর। তারা কেউ বণিক্, কেউ বা যোদ্ধা, রাষ্ট্রবিদ্। তৃতীয়ত দেখা দিল—"নতুন চিন্তা পদ্ধতি",—অর্থবান বা শক্তিমানদের সমাজ-সম্ভ্রম, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সমাদর, সময়ের মূল্যবোধ; মিতব্যয়িতার আদর, ধর্মচিন্তায় পর্যন্ত যুক্তির প্রতিষ্ঠা। চতুর্থ গুণ দেখা গেল—"ব্যবহারিক জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞের জন্মে",—লিওনার্ডো ও মেকিয়াভেলি তারই দৃষ্টান্ত। সমাজের পুনর্গঠনের থেকে আবার উদ্ভূত হল "নতুন শিল্পকলা"। যতই পুরনো ঐতিহ্যের বন্ধন শিথিল হয় ততই নতুন শিল্প প্রচেষ্টা সাহসী হয়ে

ওঠে, গতিমান হয়ে ওঠে—শিল্পী আত্ম-চেতন হয়ে ওঠেন। শহরের প্রাধান্য ফুটে ওঠে শিল্পীর শিল্পে—বণিকের মিতাচার হয় মহত্ত্বের সঙ্গে সম্মিলিত, বাস্তব হয় বিরাটের চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত। ষষ্ঠস্থলে দেখি "পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার কাজ"। বিদ্যা ও জ্ঞানার্জন ছিল এতদিন চর্চের একচেটিয়া; কিন্তু এবার আবির্ভূত হল অন্য দল। 'হিউম্যানিজম্' বা মানব জ্ঞানের জন্ম হলে বুদ্ধিজীবীরা বুঝলে সব মানুষই মানুষ, আর 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—তা ছেড়ে পরমার্থও নেই। সেই যুগের শাস্ত্রপড়া পাণ্ডিত্যের বা স্ক্যালাস্টিসিজ্মের বিরুদ্ধে এই 'হিউম্যানিস্টরা' দাঁড়ান। বুদ্ধির মুক্তি, মানুষের মুক্তি তাদের কামা; তাঁরা মনে করেন, তাঁরাই তো প্রাচীন গ্রীক-রোমক জ্ঞান-গরিমার উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার করছেন। বুদ্ধিজীবীদের এ-সব কাজে তাই ব্যক্তির আর্থিক প্রতিষ্ঠার পথ খুলে গেল। বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাও ছিলেন নিজ নিজ ব্যক্তিগত বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে গর্বিত, অর্থাৎ আত্ম-সচেতন।

বুদ্ধিজীবী ও অর্থজীবী

কিন্তু সব চেয়ে কৌতুকজনক হল এই 'বুদ্ধিজীবী আর বিত্তজীবীদের সম্পর্ক'। টাকার মত বিদ্যারও সম্মান-সম্ভ্রম নতুন সমাজে বাড়ল। তাতে ক্রমেই বিদ্বানরা বিত্তবানদের শ্রেণীতে স্থান লাভ করলেন। সালুতাতির মতো অনেকেই তাতে হয়ে পড়লেন বণিকশ্রেণীর সমধর্মী। কিন্তু পেত্রার্কার মতো কেউ কেউ তা হলেন না, আত্মসচেতন বলে হয়ে উঠলেন স্বতন্ত্র। বুর্জোয়ার চাল-চলতি, ধ্যানধারণা, সাধারণ বন্ধন, এমন কি, পারিবারিক বন্ধনেও এই 'স্বতন্ত্র' বুদ্ধিজীবীদের অনেকের শ্রদ্ধা ছিল না। এরাই পরবর্তী ধনিকতন্ত্রের যুগের সাহিত্যের 'স্বাতন্ত্র্যবাদীদের' অগ্রদূত। কিন্তু দু'দল বুদ্ধিজীবীই পুরনো পণ্ডিতদের আর "ইতর" মানুষদের সমান ঘৃণা করতেন; সে-সময়ে তাঁদের মনে থাকত না—'সবার উপরে মানুষ সত্য'। আবার বণিকেরাও টাকার আভিজাত্যে সাধারণ মানুষকে আর মানুষ মনে করতেন না। বুদ্ধিজীবী আর অর্থজীবীদের কাজেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। অর্থ ও বুদ্ধি দুই হল প্রগতি-পথের দুই শক্তি। এই সঙ্গে চললেও দুদিকে কিন্তু এদের মুখ। তাই একই সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও এদের পার্থক্যও লুপ্ত হতে পারে না। 'মানি ইকোনমির' উপর গঠিত সমাজে মননশক্তি দীপ্তি পাবে কতক্ষণ? বণিকেরাই বা সম্পূর্ণরূপে মননশক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কি করে? বুদ্ধিজীবীরাই বা কি করে বিসর্জন দেবেন তাঁদের 'অধ্যাত্ম' সম্বল, তাঁদের আত্মা, তাঁদের মিশন? কেউ কাউকে তব ছাড়তেও পারে না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা যেন ব্যবসায়ী বণিকশ্রেণীর মধ্যে মিশে গেলেন না; শ্রেণীর অভ্যন্তরে শ্রেণী হয়ে স্বতন্ত্র নিরবলম্ব হয়ে উঠতে লাগলেন। পেত্রার্কার সময় থেকেই হিউম্যানিস্টদের এই সংকটও শুরু হয়—তাঁরা কখনো কখনো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পেত্রার্কার মতোই পুরনো অভিজাত সম্ভ্রান্তদের থেকেও সাহায্য গ্রহণ করতেন। আর শেষে যখন মেডিচিদের মত বণিক্রাজদের আবির্ভাব ঘটল,—যাঁদের বিদ্যাও আছে, বিত্তও ছিল, শক্তিও লাভ হল—তখন বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এই বণিক্ পূজায় বাধা আরো কমে গেল।

মধ্যবিত্তেরা কোন্ পথে?

বণিক্ ও বুদ্ধিজীবীর এই মিলন-বিরোধের দ্বৈত লীলার মতই কৌতুকজনক 'রিনেইসেন্সের' উদয়াস্ত। বণিকতন্ত্রের প্রথম পর্ব রিনেইসেন্স বটে, কিন্তু তারও ভিতরে উত্থান-পতনের কাহিনী আছে। আর্টের আলোচনায় তিন ভাগে তা বিভক্ত হয়, আদি, মধ্য, অন্ত। এরূপ বিভাগের মূলে আছে সামাজিক বিকাশের তিন অধ্যায়। রিনেইসেন্স আরম্ভ হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতিতে। নিজের

এই অধিকার সেই বণিকশ্রেণী আয়ত্ত করলে গণতন্ত্রের নামে, তারা নিজেরা কর্তৃত্বের অধিকারী হল। তখন আরম্ভ হল মধ্যলীলা। পুরনো সামন্ত অভিজাতদের সঙ্গে এবার বণিকশ্রেণী নানা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হতে লাগল; 'ভিলা' বা বাগানবাড়িতে তারাও নানা অভিজাতসূচক আচার আলোচনা জমিয়ে তুলল। চর্চের সঙ্গেও তারা এরূপ বুঝাপড়া করে নিলে, চর্চও তাদের মেনে নিলে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী বণিকশ্রেণী এরূপে শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্রমেই তখন সনাতন আচার-বিচার, ধ্যান-ধারণা, 'শিষ্ট' জীবনযাত্রা গ্রহণ করলে। বুদ্ধিজীবীদেরও বরাবরই টান ছিল এই 'শিষ্ট' সমাজের উপর; তাই তারাও এ-পথেই অগ্রসর হয়। অর্থাৎ মধ্যবর্তীরা কেউ নিম্নমধ্যবর্তীদের সঙ্গে যোগ রাখল না; তাই গণতন্ত্রের দাবীও আব তুলল না। ক্রমে তাই এল অন্তঃপর্ব। চর্চ ও আভিজাত্যের সামনে আগেকার গণতান্ত্রিক চেতনা লোপ পেল—এল অধিনায়কদেব, ডিক্টেটরের যুগ। ফন্ মার্টিন্ বলেছেন, মধ্যবিত্তদের এরূপ পরিণতি যে শুধু ধনতন্ত্রের সেই প্রথম স্তরেই ঘটে গিয়েছে তা নয়। আর এ-কথা পাঠক মনে রাখলেই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে করবেন। ইউরোপের গণতন্ত্রের নতুন রাহুগ্রাস আজ শেষ হতে যখন যাচ্ছে তখন এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখবার মতো—কতবার গণতন্ত্রের নামে ধনিকতন্ত্র সভ্যতাকে প্রতিক্রিয়াশীল নায়কতন্ত্রের নিকট বলি দিয়েছে। কারণ সত্যকারের গণতন্ত্র আর্থিক বৈষম্যবাদের উপর গড়ে উঠতে পারে না।

ওদেশে আর এদেশে

কিন্তু ইউরোপ কেন, বণিকশ্রেণীর এই অভিজাতবর্গে প্রমোশন পেয়ে অচল হয়ে বসা, কিংবা বুদ্ধিজীবীদের এই বণিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলন-বিবোধ,—তাঁদেব আসরে স্থান পেয়ে অচল হয়ে বসা,—এ-সব কি আমাদের দেশেও আমাদের আধুনিক ইতিহাসে আমরা দেখিনি? তফাৎ ভুলবার কারণ নেই। ইতালির রিনেইসেন্সের থেকে ইংলণ্ডেব রিনেইসেন্সেরও তফাৎ ছিল, আমাদেব উনবিংশ শতাব্দীর রিনেইসেন্সের তো তফাৎ থাকবেই। আমাদের রিনেইসেন্স বরং বিলিতী ধনিকতন্ত্র ও তারই বুদ্ধিজীবীদের ছাপ বহন করবে; তাই করেছেও। স্থান ও কালের এত বড় তফাতে অনেক বিষয়েই মৌলিক তফাৎ ঘটে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আমাদের রিনেইসেন্স এসেছিল সাম্রাজ্যবাদের আওতায়; তার উপবে আমাদের 'চর্চ' নামে কিছু ছিল না; নিজেদের রাষ্ট্র ছিল না; খাঁটি সম্ভ্রান্ত শ্রেণী প্রায় ছিল না, আবার তেমনি খাঁটি বণিকতন্ত্রও ছিল না। বেনিয়ন-মুৎসুদ্দিরা ইংরেজ রাজের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্তই হতে পারে না; তাদের আসল মুরুব্বিই বিদেশী সাম্রাজবাদী কর্তারা। পুরনো জমিদার জায়গীরদারদের এই ইংবেজ রাজাই তাড়ায়, আর সেই অভিজাতের স্তরে স্থান করে দেয় মুন্সী, দেওয়ান মুৎসুদ্দিদের; ব্যবসায়ীরাও ক্রমে তাদের সঙ্গে গিয়ে বসল। মানে, জমিদার-তন্ত্র শেষ হল না, জমিদারি হাত বদলালো। অবশ্য এ দেশেব নতুন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা এই ইংরেজ রাজ ও তার শিক্ষা-দীক্ষার ফল, তার কেরানীগিরির উমেদার। ইংরেজ-পুষ্ট অভিজাতদের 'ভিলায়', বৈঠকখানায় তাঁরাও একটা স্থান লাভ করেন নিজেদের প্রতিভার বলে। ধর্মে, সমাজে, শেষে রাষ্ট্রে এই বুদ্ধিজীবীরাই হলেন বিদ্রোহের নেতা। যুদ্ধের সঙ্গে এদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত আজ এসে গিয়েছেন 'বেতন-দাসের' কোঠায়। কিন্তু আজও এই বুদ্ধিজীবীদের নেতৃদল—যতই তাদের বিরোধ থাক ধর্ম ও রাষ্ট্রের কর্তাদের বিরুদ্ধে—দেশীয় ধনিক ও অভিজাতদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনেই উন্মুখ। তাঁদের টান রয়েছে এই উচ্চশ্রেণীর এই 'ভদ্র' জীবনের উপর—গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ মানে তাঁরা বুঝতে চান না।

কোনো দেশের রিনেইসেন্সেই হুবহু অন্য দেশের রিনেইসেন্স-এর মত হয় না। সাম্রাজ্যবাদের চাপে আমাদের রিনেইসেন্স-এর স্বাভাবিক বিকাশ একেবারেই হল না। তবু যেমন সেই সাম্রাজ্যবাদের চাপেই ধনিকতন্ত্র গড়ে ওঠে বেঁকে-চুরে, তেমনি একটা বাঁকা-চোরা রিনেইসেন্সও দেখা দেয় সেই ধনিক-তন্ত্রের জন্মের প্রথম পর্বে। আর তারও সামাজিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ সত্যই অতি শিক্ষাপ্রদ

হবে। সেদিকে তথ্যসংগ্রহও এখন হয়েছে। অতএব ফন্ মার্টিনের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখন তার বিশ্লেষণও করা সম্ভব। অবশ্য কোন মনীষী তাতে প্রবৃত্ত হলে দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা পরিষ্কার করতে হবে। ফন্ মার্টিন তা করেননি—একশ' পৃষ্ঠায় তিনি বিশ্লেষণটুকু উপস্থিত করেছেন। তাঁর আলোচনা-পদ্ধতি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি সত্যিও। আমরা যারা ফ্লোরেন্স-এর রিনেইসেন্সে-এর কথা তত বেশি জানি না, তারা আরো বিশদ ও স-দৃষ্টান্ত আলোচনা পেলে আরো সহজে এ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য কথা বুঝতে পারতাম। এখনো যা বুঝতে পারি তা হচ্ছে এই—লেখকের মতে রিনেইসেন্স-এর গবেষক, শিল্পী সবাই যেন একেবারেই পরিবেশের নিকট আত্মসমর্পণ করে বসলেন, পরিবেশকে তাঁরা বেশি বদলাতে চাইলেন না। নিজেরাই বদলে গেলেন—স্বার্থ ও সুবিধা পেয়ে। এ কথায় পরিবেশবাদিতারই অবশ্য শক্তি প্রমাণিত হয়। এ তত্ত্বের ভুল তো আমরা জানিই। আমাদের দেশের রিনেইসেন্সকে বিশ্লেষণ করতে গেলে তাছাড়াও, সে "নবযুগকে" একটু বুঝিয়েই বলতে হবে; আর ভুললে চলবে না তার ভাগ্য মূলত নির্ধারিত করেছে উপনিবেশের সাম্রাজ্যবাদ।

মাঘ, ১৩৫১

কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব

কালচার বলতেই আমাদের দেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের মনে কিছুদিন পূর্বে একটা কৌতুকের বা সন্দেহের উদয় হত। তারা কৌতুক বোধ করত এই ভেবে—'কালচার মানে তো কবিতা, সাহিত্য, নৃত্য, গান, চিত্র এসব জিনিস, ওসব আমাদের মত কাজের মানুষদের জন্য নয়'। সন্দেহ বোধ করত এই ভেবে যে, 'কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প এসবে মানুষ সাড়া না দিয়ে পারে না। আমরা কাজের লোকের হাজার 'কাজের কথা' লিখে ও চেঁচিয়ে যা বলি, ওসব বাজে জিনিসের প্রভাবে তা অতি সহজে ধুয়ে-মুছে যায়।' এসব বিপ্লববাদীরা কেউ তাই কালচার শুনলে রুখে দাঁড়াত, কেউ মুচকি হেসে তার পাশ কাটিয়ে যেত। আর কেউ বা গম্ভীরভাবে তত্ত্ব কথা শোনাত—"আমরা হলাম কাজের মানুষ, আমরা কি হাসতে পারি, নাচতে পারি?"

রাজনৈতিক কর্মীদের মনে এভাবে একটা ধারণা জন্মেছিল যে, কালচার বা সংস্কৃতি বুঝি তাদের ভাববার মত ও বুঝবার মত জিনিস নয়। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রয়াস আগেকার যুগে কালচারের সঙ্গে তেমন নিঃসম্পর্কিত ছিল না। তার কারণ সহজেই বুঝতে পারি। আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ঠিকভাবে রূপ নিতে থাকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের দিকে। তার আগেই কিন্তু আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বাজাত্য বোধ জন্মলাভ করতে শুরু করে। রামমোহন রায়ের পরে ধীরে ধীরে যে কালচারাল্ রিনেইসেন্স বা "সংস্কৃতির নবজন্ম" দেখা দেয়, এই দেশপ্রীতি ও স্বজাতিকতা তাতেই আমাদের মনে রূপলাভ করতে থাকে। একটা সংস্কৃতিমূলক নতুন চেতনা আমাদের মনে হিন্দু স্কুলের পর থেকে ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষায় জাগতে থাকে। তারই ফল মাইকেল-মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি, আর শেষে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেম, নবীন প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা। এই চেতনাই প্রথম দিকে ধর্ম-সংস্কারে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ, পরে শ্রীরামকৃষ্ণে) সমাজ সংস্কারে (কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দে) দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাব্যে (মধুসূদনে), গানে (প্রথম দিকের হিন্দু মেলার স্বদেশী গান, কিংবা সেদিনের ধর্ম-সঙ্গীত ব্রহ্ম-সঙ্গীত প্রভৃতিতে) উপন্যাসে নাটকে (বঙ্কিমে, দীনবন্ধুতে), নানা ঐতিহাসিক রচনায় প্রবন্ধ সাহিত্যে (রাজনারায়ণ বসু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ে) এই সংস্কৃতির চেতনা ফুটতে থাকে। এঁদের রীতি, লেখা, প্রেরণা থেকেই আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বজাত্যবোধ ক্রমেই পরিষ্কার রূপ গ্রহণ করতে পারে।

এইরূপে সামাজিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্র থেকে নতুন শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে এই চেতনাই ক্রমে ১৮৮০ এর পর থেকে রাজনৈতিক কর্মে দানা বেঁধে ওঠে। তাই, সে প্রথম যুগ থেকেই দেখি আমাদের রাজনৈতিক সভা-সমিতি আরম্ভ হত গান দিয়ে; তাতে কবিতা আবৃত্তি হত, পাঠ হত। সেদিনে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সংস্কৃতি কর্মীরা সে-সব সভার উদ্বোধনে সাহায্য করতেন। তারপরে এল স্বদেশী যুগ। তখন তো বাঙলাদেশে অন্তত রাজনীতি আর সংস্কৃতির প্রয়াস সমান তালে চলেছিল। কাব্যে, গানে, নাটকে, চিত্রে সমস্ত দিক দিয়ে যেন বাঙালী সেদিন ফুটে উঠতে চেয়েছিল। সেদিনকার সে-সব কথা মনে রাখলে এদেশের রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে 'কালচারকে' অন্তত দূরের জিনিস বলে ভাবা চলত না। কিন্তু সেই জোয়ারে একদিন ভাটা পড়ল। রাজনৈতিক কর্মীরা এমন কি বিপ্লবীরাও তারপর থেকে সংস্কৃতি সেবকদের আর নিজেদেরই সহযোগী বলে তত সহজে ভাবতে পারেননি। একবার মাঝখানে নজরুলকে পেয়ে বাঙালী বিপ্লবীরা উৎসাহিত হন। এখনো সভা-সমিতির উদ্বোধনে গান হয়, স্বদেশী কবিতাও হয়ত আবৃত্তি হয়, কিন্তু তা যেন খানিকটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

আমরা কমিউনিস্টরাও যে এ-মনোভাব একেবারে কাটিয়ে উঠেছিলাম, তা নয়। আমাদের পক্ষে এ-রকম ভুল করবার কারণ ছিল আরও বেশি। কারণ আমরা জানতাম, আমরা 'শ্রমিক শ্রেণীর

পার্টি,' বিপ্লবী পার্টি"। অথচ আমরা দেখতাম আমাদের গল্পে, কাব্যে, সাহিত্যে, গানে, চিত্রে, কালচারের নানা কথায় যা চলেছে তাতে সত্যই বিপ্লবের বড় কিছু নেই। গরম গরম কথা থাকতে পারে, কিন্তু আসলে বিপ্লবী চিন্তা নেই এসব গানে, কবিতায়, গল্পে, নাচে, নাটকে। শ্রমিকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তো নেই-ই, তাদের অস্তিত্বের কথাও প্রায় নেই। আছে মধ্যবিত্ত ও বড় লোকদের মন ভাঙ্গাভাঙ্গি আর মান নিয়ে কান্নাকাটির কথা। এসব কারণে আমরাও তখন (১৯৪০ পর্যন্ত) ভাবতাম কালচার একটা সৌখীন ব্যাপার।

তবু আমাদের কমিউনিস্টদের মধ্যে কালচার সম্বন্ধে ততটা বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দেয়নি। আমাদের ঐতিহাসিক বোধ স্পষ্ট বলেই তা হয়েছে। কিন্তু কালচার বা সংস্কৃতির আসল মানে তাই বলে আমরা সকলে ঠিকমত বুঝেছি এবং বুঝে তা গ্রহণ করেছি,—একথা এখনো বলা চলে না। পার্টির যাঁরা নেতা তাঁরা এসব দিকে খুব মনোযোগ দেওয়ায় কমিউনিষ্ট কর্মী ও মতবাদীদের কালচারের উপর শ্রদ্ধা বেড়েছে। তাছাড়াও কয়েকটা বড় বড় জিনিস থেকে সবাই আমরা বুঝেছি—কমিউনিস্টগণ তাদের সংস্কৃতি বাহিনী ও কালচারমূলক প্রয়াসের দ্বারা এদেশেও কতকটা শক্তিশালী হয়েছে। যেমন, আমাদের সামান্য স্কোয়াড গানে, নাচে, অভিনয়ে, চিত্রে পাঞ্জাব থেকে হাজার হাজার টাকা বাঙলার দুর্ভিক্ষ সাহায্যে তুলে আনল। তাতে পিপলস্ রিলিফ কমিটির কাজের খুব সুবিধা হল। দ্বিতীয়ত দেখছি—আমরা হাজার চেঁচিয়ে আর কাগজ ছড়িয়ে যা বুঝাতে চেষ্টা করি আমাদের সামান্য নাচ, গান, অভিনয়, ছবি তা সাধারণ মানুষকে কত সহজে বুঝিয়ে দেয়। পাঞ্জাবে তারও প্রমাণ পেয়েছি। বেজওয়ারা কৃষক সম্মেলনে রাত্রি সাড়ে তিনটায় যখন কমরেড উষার 'ম্যায় ভুখা হুঁ' নৃত্য শেষ হল তখন সেই ষাট-পঁচাত্তর হাজার নরনারীর দেখেছি বাঙলাকে বাঁচাবার আন্তরিক ইচ্ছা। তৃতীয়ত দেখছি, এই সব সংস্কৃতিমূলক চেষ্টার মধ্য দিয়ে জ্ঞানী এবং গুণীদেরও আমরা আমাদের পার্টি সম্বন্ধে খানিকটা শ্রদ্ধান্বিত করতে পেরেছি। বোম্বাই-এ আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির (স্কোয়াড) গোষ্ঠীর অভিনয় দেখে সেখানকার শিল্পীরা আকৃষ্ট হন, সেখানকার বিত্তবানদের মধ্যেও শ্রদ্ধা জাগে, কংগ্রেস নেতারাও আমাদের সম্বন্ধে আশ্বস্ত বোধ করেন। কলকাতায় ও বাঙলার অন্যান্য জায়গায় যেখানে আমরা সত্যি আমাদের প্রয়াস ফুটাতে পেরেছি, সেখানেও দেখেছি জ্ঞানী ও গুণীরা আমাদের সমাদর করেছেন। তাই দেখছি পার্টির সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনে দুর্ভিক্ষে সাহায্য আসছে, সাধারণ লোকে আকৃষ্ট হচ্ছেন, জ্ঞানীগুণীরা আকৃষ্ট হচ্ছেন, গণস্বার্থের শত্রুরাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, এবং এ সবের সূত্রে কমিউনিস্ট মতে আবার নতুন নতুন শিল্পীরাও আসছেন, আর সাধারণ মানুষও আসছেন।

এ হল নগদ হিসাবের দিকে কিন্তু আসলে লাভ আরও বড়। সে লাভ এই : প্রথম কথা, আমাদের কৃতিত্ব দেখে সমাজের বুদ্ধিজীবীর দল বুঝতে পারছেন, তাই তো কমিউনিস্টরা যে শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। তাতে করে এসব গুণী লোকদের শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে যেসব পুরনো ধারণা ছিল তা ভাঙতে শুরু করছে। আবার কমিউনিজম্ সম্পর্কে ভুল ধারণা বদলে যাচ্ছে। অন্যদিকে ধনীদের সঙ্গে এই গুণী ও জ্ঞানীদের মানসিক তফাৎ বাড়ছে—গুণীজ্ঞানীরা ক্রমেই কমিউনিস্ট মতের নিকটবর্তী হচ্ছেন। দ্বিতীয় কথা : আমাদের সংস্কৃতি উৎসব দেখে শ্রমজীবী ও কৃষকেরা বুঝছে, তাইতো, আমাদের জনশিল্পের নিদর্শনগুলো তো বাজে নয়। আর, তার থেকেও সত্য কথা আমরা দেখছি আমাদের শ্রমিক-কৃষকেরও শিল্পশক্তি বাড়ছে, যদি তারা চর্চা করে তা ক্রমেই ফুটে উঠবে। অর্থাৎ Culture for the people, of the people, by the people-এরও চেতনা আসছে।

এইটিই কমিউনিস্ট কর্মীদের পক্ষে আসল কথা। আমরা তো জানি সভ্যতা আজ বানচাল হয়ে পড়েছে! তার হাল ধরে রাখতে পারবে ধনিকদের এমন শক্তি নেই। সেই হাল তাই এ-যুগের শক্তিধরদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। সেই শক্তিধর আজ কারা? আমরা তো জানি, সমাজে শক্তি তারাই যারা উৎপাদক, স্রষ্টা। এ যুগে এই উৎপাদনের শক্তি, সৃষ্টিশক্তি শ্রমিকদের হাতে, কারুবিদদের হাতে, শিল্পীদের হাতে। আর সেই সৃষ্টিশক্তিকেই মূলত চাপা দিতে চায় শাসকশ্রেণী

ও শোষকশ্রেণী ; কারণ তা নইলে তাদের কায়েমী স্বার্থ টিকে থাকবে না। যারা শাসক ও শোষক তারা এভাবে সভ্যতাকে বাধা দিতে চায়, নতুন সৃষ্টিশক্তিকে দাবিয়ে রাখতে চায় ; আর শ্রমিক ও কৃষক নতুন উৎপাদন শক্তির ও সৃষ্টিশক্তির অধিকারী, তারা চায় সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, নতুন সৃষ্টিতে সভ্যতাকে বাড়িয়ে তুলতে। এ যুগের আসল স্রষ্টা তাই শ্রমিক ও কৃষক। সভ্যতাকে বাঁচাবার ভার আজ তাই ধনিকশ্রেণীর নয় ; আজ তা শ্রমিকশ্রেণীর উপর। তার অর্থ এই, **সমস্ত সভ্যতার উত্তরাধিকারও তার, দায়িত্ব তার।** বাস্তবক্ষেত্রে এই দায়িত্ব সে গ্রহণ করছে,—সে ফসল ফলায়, সে-ই পণ্য উৎপাদন করে ;—মুনাফার লোভে অন্য শ্রেণীরা তাতে বাধা জোগায়। মনের ক্ষেত্রেও এই দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর স্বীকার করতে হবে ; কিন্তু সেখানে শোষকশ্রেণী তাকে আরও বেশি বাধা দিতে চায়।

কারণ, যতই শোষকেরা দেখে বাস্তবক্ষেত্রে তারা হটে যাচ্ছে, ততই তারা ভাবে মানসক্ষেত্রে, নানা ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করে, নিজেদের আসন সেখানে পাকা করা চাই। তা পাকা করে রাখতে হলে প্রথমত সেখান থেকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে শ্রমিকশ্রেণীকে আক্রমণ করা যাবে,—আর এই ধোঁয়ায় অচেতন শিল্পী ও লেখকদের ছলনা করা সহজ। আর জ্ঞানীগুণীদের মারফৎ ধনিকতন্ত্রের এই আক্রমণ সভ্যতার ভবিষ্যতের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ।

দ্বিতীয়ত, শোষকশ্রেণী চায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারা যে শোষণ চালায় তা অব্যাহত রাখতে। কারণ সংস্কৃতিও তাদের একটা মুনাফার পণ্য। তারা সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, নাট্যশালা, সিনেমা, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সব শিল্পই মুনাফার বাজার হিসাবে চালায়। এইখানেই তাদের জোর। এই জোরে তারা টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম, আরাম-আয়েস দিয়ে লেখক ও শিল্পীদের হাত করে।

কিন্তু আসলে এইখানেই তাদের আসল দুর্বলতাও। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধনিকেরা উৎপাদন করে না, তারা করে ব্যবসাদারি। বাস্তবক্ষেত্রে যেমন তারা উৎপাদকদের বঞ্চিত করে মুনাফা বাবে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি তারা শিল্পী ও লেখক প্রভৃতিদের বঞ্চিত করে মুনাফা তোলে। ধনিকরা হচ্ছে আসলে শিল্পী ও লেখকদেরও শ্রেণী শত্রু। কাজেই মূলত শিল্পী ও লেখকদের সঙ্গে শ্রমিকদের ও কৃষকদের বন্ধুত্বই থাকা উচিত। আর এই বন্ধুত্ব এ-যুগে হচ্ছে স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কারণ কালচারের আসল উত্তরাধিকারী আজ শ্রমিক-কৃষক তা আমরা জেনেছি ; সভ্যতার ক্ষেত্রে আজ তারাই স্রষ্টা। তাছাড়া, একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে, সংস্কৃতি ধনিকদের মনোপলি হয়ে থাকার জন্য কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণকে এতকাল ধরে মানব-সভ্যতার শিল্প সংস্কৃতি থেকে তফাৎ করে রাখা হয়েছিল। ফলে জনগণের সৃজনী শক্তি অনেকাংশে চিরসুপ্তই থেকে গেছে। আজ বর্তমান যুগের শিল্পীদের সঙ্গে তা যোগ হলে সেই বিরাট সৃজনীশক্তি জাগরূক হতে মোটেই দেরী হবে না।

কিন্তু এই মূল সত্যটা, যারা সচেতন নয় তারা বুঝতে পারে না। আমরা কমিউনিস্টরা সর্বাধিক সচেতন কর্মী। আমরা এই মূল সত্য জানি—আমরা সকলকে প্রমাণ করাব তার সত্যতা।

কিন্তু এদিকেও আমাদের কয়েকটি কথা বুঝবার আছে। আমরা সচেতন হয়েছি বলেই আমরা শিল্পী হয়ে উঠেছি তা মনে করা হবে হাস্যকর। আমরা তো দেখেছি শোষক শ্রেণীকে বিপ্লবের দ্বারা পরাজিত করলেও তখন তখনি কমিউনিজম্ গড়ে ফেলা যায় না। "অক্টোবর বিপ্লবের" পরেও সোশ্যালিজম গড়তে সোভিয়েট দেশে প্রায় সতের-আঠার বছর লেগেছে ; আসল কমিউনিজম্ তারা গড়ে তুলছে এখন। তাই রাতারাতি কোনো দেশ যেমন কমিউনিস্ট হতে পারে না, রাতারাতি কোনো দেশ তেমনি কমিউনিস্ট কালচার বা নতুন সভ্যতাও গড়ে ফেলতে পারে না। এজন্য পরীক্ষা আর প্রাণপণ প্রচেষ্টা করতে হয় দিনের পর দিন, কিন্তু সে প্রয়াস সচেতনভাবে আরম্ভ করতে হবে শ্রমিক পার্টিকে এখনি। যেমন বিপ্লব গড়তে চেষ্টা করছি তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে বিপ্লবী সংস্কৃতি গড়তে। এই হবে প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা এই, বিপ্লব সার্থক হলেও যেমন আমরা কল-কারখানা ভেঙে ফেলব না, মুনাফা-বাদই শেষ করব, আর ধনিকতন্ত্রের উৎপাদন-যন্ত্রগুলো আরও ভালো করে কাজে লাগাব, ঠিক সংস্কৃতি

ক্ষেত্রেও আমরা তেমনি এইরূপ নীতিতেই চলব। উন্নত এবং সার্থক অনেক "টেক্‌নিক্‌" শিল্পী ও লেখকরা এখন যা আয়ত্ত করছেন আমরা তা নষ্ট করব না; বরং তার আরও সার্থক প্রয়োগ করব, তার কার্যকারিতা এই সব গুণী ও জ্ঞানীদের থেকে শিখে নেব আরও বাড়িয়ে তুলব। যখন নতুন সংস্কৃতি গড়তে চাই তখন আমাদের কাজ হবে তাহলে এরূপ ঃ—

শিল্পী ও লেখকদের পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করা। সচেতন হলে সেই জীবন-সত্য কিভাবে শিল্প-সাহিত্যে রূপ দিতে হবে, তা তাঁরা নিজেরাই ভালো জানেন। আমরা শুধু শিল্পী ও লেখকদের জোগাব সত্য—তা হলেই হবে।

আবার আমাদের মধ্যে যে-সব লোকের শিল্পশক্তি বা সৃষ্টিশক্তি আছে তাদের কর্তব্য হবে এই অভিজ্ঞ শিল্পী ও লেখকদের কাছে শিক্ষানবিশী করা। শিল্পীদের ও লেখকদের থেকে সংস্কৃতি পদ্ধতি আমাদের বুঝে নিতে হবে, তারপর তা আবার লাগাতে শিখতে হবে নতুন সৃষ্টিতে।

তাই কমিউনিস্ট কর্মীর পক্ষে দরকার—১) বর্তমান সভ্যতায় তার দায়িত্ব বোঝা ও স্বীকার করা, (২) নিজেকে নতুন সংস্কৃতি গড়বার অধিকারী জেনে নিজের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে সৃষ্টি কর্মে এগিয়ে চলা, (৩) আবার বর্তমান সভ্যতার জ্ঞানী ও গুণীদের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থের একতা বোঝা: এবং (৪) জ্ঞানী ও গুণীদের উপর শ্রদ্ধা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া তাঁদের জানাতে বাস্তব সত্য, তাঁদের থেকে গ্রহণ করতে সংস্কৃতি কর্মে তাঁদের শিক্ষা ও তাঁদের উপদেশ, তাঁদের সাহায্য।

এই হল আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে মূল দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা কমিউনিস্টরা বাঙলাকে কি চোখে দেখব তার মূল কথা। তারপর বাস্তব কর্মী হিসাবে আমরা বাঙলাদেশের কমিউনিস্টরা বলে নেব আমাদের দেশের কালচারাল সংকট বা সংস্কৃতি সংকট ঃ—বাঙলার বাঙালী কালচারে দুটো পথের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখছি। আমাদের শিক্ষিতদের একটা কালচার—ইংরাজী রাজ্য থেকে যা শুরু, এবং ব্রিটিশ আমলে যার চরম স্ফুরণ আমরা দেখি। আর একটা অশিক্ষিত জনসাধারণের কালচার—যা গ্রামে বরাবর চলে এসেছে, এখনো চলে,—তাদের ভাটিয়ালী পল্লী গীতি, জারি গান, সারি-গান, কীর্তন, ঘেঁটু, যাত্রা, কথকতা, ভাসান, পট আঁকা, নানারকম আলপনা ছবি আঁকা ইত্যাদি। শিক্ষিত সংস্কৃতি—চাকরে কালচার বা বাবু কালচার, শহুরে কালচার। আর অশিক্ষিত সংস্কৃতি—জন-সংস্কৃতি বা লোক-সংস্কৃতি, তা চাষী-মাঝি প্রভৃতিদের জিনিস, গ্রাম তার প্রাণ। দুটোই এখন ক্ষীণ হয়ে পড়েছে ভদ্র সংস্কৃতি বাড়তে পারছে না, তার প্রেরণা আসত বুর্জোয়া সৃষ্টি থেকে, কিন্তু আজ বুর্জোয়ার সে সৃষ্টিশক্তি কই? তাই ভদ্র সংস্কৃতির দরকার এ-যুগের সৃষ্টিশালী শ্রমিক-মজুরের সঙ্গে প্রাণের মনের কর্মের যোগসাধন। অন্যদিকে আমাদের লোক-সংস্কৃতিও বাড়তে পারছে না—লোকে সেই জারি গানে আর তত খুশি হয় না—ভিড় করে আসে থিয়েটারে, সিনেমায়। এ লোক-সংস্কৃতি বাঁচতে পারে যদি তা নতুন সভ্যতার সত্যকে গ্রহণ করতে পারে, আবার নতুনতর রূপে যুক্ত রূপে আয়ত্ত করতে পারে, তার পুরনো পদ্ধতিকে আবার এ-কালের উপযোগী করে দিতে পারে।

এইটাই হল বাঙলার নিজ কালচারাল সমস্যা- ভদ্র-সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন না রেখে জনতার সঙ্গে যুক্ত করা, আর জন-সংস্কৃতিকে উন্নততর কালের সত্যে ও ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ করা। ভদ্র-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে লোক-সংস্কৃতির বিষয়বস্তু দিয়ে, আর তার প্রকাশকে করতে হবে সহজ ও লোক-বোধ্য। আর জন-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে নতুন বিষয়বস্তু দিয়ে আর তার প্রকাশকে করতে হবে আরো উন্নত বিকশিত। দুই সংস্কৃতিতে স্থাপন করতে হবে সমন্বয়।

এ-কাজ বড়দরের শিল্পীর কাজ। কিন্তু ছোট-দরের শিল্পীরা তার জন্য পথ তৈয়ার না করলে সেই বড়দরের শিল্পী জন্মাবার পথও পাবেন না। তাই বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট কর্মীর কাজ হল এই পথ তৈরী করা, কোদাল কুপানো, মাটি কাটা, মাটি টানা,—বাঙলার জন-জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, গুণী-জীবনকে সচেতন করা। আর এজন্য চাই কমিউনিস্ট কর্মীর তরফ থেকে কালচারাল স্কোয়াড এবং প্রত্যেকখানে সত্যিকারের উপযুক্ত কর্মীদের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে সে-কাজে নিযুক্ত করা।

এজন্যই বলতে হয় এই যে, কালচারের মানে কি, সেদিকে কমিউনিজমের কি ভূমিকা এবং কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব কতটা; বাঙলাদেশে কালচারাল সংকটের স্বরূপ কি, তা কতটা জটিল, কতটা জরুরী—এসব কথা বুঝা দরকার। এসব কথা বুঝি না বলেই আমরা কর্মীরা নানাপ্রকার ওজর-আপত্তি তুলে কালচারাল ক্ষেত্রের কাজকে উপেক্ষা করি।

আর এসব কারণেই দেখি—আমাদের যেসব শিল্প বা সাহিত্য আমরা কমিউনিস্ট সৃষ্টি করছি তা প্রায়ই নিষ্প্রাণ হয়। কমিউনিস্টরা সংস্কৃতিকে একটা বিশেষ শ্রেণীর শোষণ ও বন্ধন থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত করতে চায়। জনগণের স্বাভাবিক বাস্তব সৃজনীশক্তির বিশাল দুয়ার একেবারে খুলে দিতে হবে। আমাদের কাজ হল—শিল্পী ও সাহিত্যিককে তথ্য জোগানো; শিল্পী ও সাহিত্যিকই ভালো জানেন কি করে সে তথ্যকে শিল্পে রূপ দিতে হবে। তথ্যের তাগিদেই তাঁর মনে শিল্পরূপ গ্রহণ করবে শিল্পের নিয়মে।

তা করা হয় না বলেই আমরা মজুরদার নিয়ে, দুঃস্থ নিয়ে, পঞ্চমবাহিনী নিয়ে বা দেশপ্রেমিক নিয়ে যে শিল্প রচনা করি তা সবই একটা abstract বা গত-বাঁধা মজুতদার, গত-বাঁধা দুঃস্থ, গত-বাঁধা পঞ্চমবাহিনী ও গত-বাঁধা দেশপ্রেমিক হিসাবে আঁকি। তাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, পোশাক, এমন কি আকৃতি পর্যন্ত সে বাঁধাধরা গতে চলে তাতে একজনকেও মানুষ বলে সত্য বলে চোখে ঠেকে না। কিন্তু শিল্প মানে কোনো নীতি, বা আইডিয়া বা শ্লোগান আওড়ানো নয়। শিল্পীর কাজ হল বাস্তব (concrete) নিয়ে—মানুষ নিয়ে। সে মানুষ নানাসূত্রে বাঁধা, তার 'মনুষ্যত্ব' জটিল বিচিত্র, ভালোবাসায়, দেশভক্তিতে লোভে. ভয়ে সব জড়িয়ে সে এক একটি বিশেষ মানব—individual। তাই আমাদের শিল্পীরা এই পার্টি শ্লোগান বলবার ঝোঁকে শিল্পের উদ্দেশ্য ভুলে যান. মানে রূপ-সৃষ্টি করতেই ভুলে যান। তাঁদের গান, ছবি, নাটক, কবিতা তাই অনেক সময় হয় নিষ্প্রাণ, নীরস। অথচ কমিউনিজম্-এ জ্ঞান থাকলে এ ভুল ঘটতেই পারে না। কমিউনিজম্-এ জ্ঞান থাকলে শিল্পের মূল সত্য অনুধাবনে আরও অনেক বেশি সাহায্য হয়। *

* এ লেখাটি (অক্টোবর ১৯৪৪ এ) কমিউনিস্ট কর্মীর উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু ১৯৪৭ সালেও 'কালচার ও কমিউনিজম্' সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন শুনতে হয় বলে এখানে সন্নিবিষ্ট হল। এখানে এ প্রসঙ্গে যা উল্লেখযোগ্য তা এই যে এ প্রবন্ধ রচনার পরে কয়েকটি বড় ঘটনা এদিকে ঘটেছে: (১) বাঙলা ও ভারতে গণনাট্য সঙ্ঘের জন্মে গণনাট্য ও গণনৃত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গণসংস্কৃতির প্রথম সূচনা হয়েছে। (২) কংগ্রেস কর্মীদের তরফ থেকেও কালচারের প্রতি (অনেকখানি কমিউনিস্ট প্রচেষ্টার প্রতিবাদে) দৃষ্টি পড়েছে। (৩) যুদ্ধান্তে সমস্ত পৃথিবীর কমিউনিস্ট সমাজে 'কালচার ও কমিউনিজম্' সম্বন্ধে গবেষণা আলোচনা চলেছে। তার এক পীঠস্থান মস্কো—যেখানে ঝাদানেভের নেতৃত্বে রুশ সাহিত্য আত্মসমালোচনা করছে। অন্য পীঠস্থান প্যারিস,—সেখানেই পিকাসোকে উপলক্ষ্য করে কমিউনিস্ট নেতা গারদি ও এর্ডে এবং কমিউনিস্ট কবি আরাগোঁর মধ্যে চলেছে সৌন্দর্য-তত্ত্ব ও কমিউনিজমের সম্বন্ধ বিচার। সে বিচার শেষ হতে দেরি আছে। কিন্তু পিকাসো, মাতিস, জুলিও কুরি, লাঁজেভাঁ ড্রেসার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের কমিউনিস্ট দলে যোগদানে বোঝা যায় কমিউনিজমের হাতেই যে কালচারের মুক্তি এ সত্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। ২৫-৩-৪৭

বাঙালী সংস্কৃতির চলতি হিসাব

(১৩৫১ বাং—১৩৫৩ বাং)

"এখন এক পণ্ডিত এসে জুটে গেলেন—চাকরি চাই। আমি বললুম, 'বেশ লেগে যান, রোজ আমাদের মহাভারত-রামায়ণ পড়ে শোনাবেন।' আমাদের বাল্যকালের পণ্ডিত মশায়, নাম রজনী পণ্ডিত, সেই পণ্ডিত রোজ এসে রামায়ণ মহাভারত শোনাতেন। আর তাই থেকে ছবি আঁকতুম।

" 'নন্দলাল বললে, কি আঁকব?' আমি বললুম, 'আঁকো কর্ণের সূর্য স্তব।' ও-বিষয়টা আমি চেষ্টা করেছিলুম, ঠিক হয়নি। নন্দলাল এঁকে নিয়ে এল। আমি তার উপর দু'তিনটে ওয়াশ দিয়ে দিলাম ছেড়ে—হাতে ধরে দেখিয়ে আমি কখনও ওকে শেখাইনি। ছবি করে নিয়ে আসত, আমি শুধু কয়েকটি ওয়াশ দিয়ে মোলায়েম করে দিতুম. কিংবা একটু-আধটু রঙের টাচ্ করে দিতুম, যেমন ফুলের উপর সূর্যের আলো বুলিয়ে দেওয়া—সূর্য নয় ঠিক, আমি তো আর রবি নই. নানা রঙের মাটির প্রলেপ দিতেম। তখন আমাদের আঁকার কাজ তেজে চলেছে। নন্দলাল সূর্যের স্তব আঁকল তো সুরেন এদিকে রামচন্দ্রের সমুদ্র-শাসন আঁকল. এই তীর-ধনুক বাঁকিয়ে রামচন্দ্র উঠে রথে দাঁড়িয়েছেন। নন্দলাল এঁকে আনল একটি মেয়ের ছবি, বেশ গড়নপিটন টানা টানা চোখ ভুরু। আমি বললুম 'এ তো কৈকেয়ী, পিছনে মন্থরা বুড়ি এঁকে দাও।' হয়ে গেল কৈকেয়ী ও মন্থরা। ছবির পর ছবি বের হতে লাগল। চারদিকে তখন খুব সাড়া পড়ে গেল, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। ইণ্ডিয়ান্ আর্ট শব্দ অভিধান ছেড়ে সেই প্রথম লোকের মুখে ফুটল।" *

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হল, কিন্তু সমস্ত 'জোড়া সাঁকোর ধারে' (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রানীচন্দ) উদ্ধৃত করবার লোভ হবে তাঁরই যিনি অবনীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব কাহিনী পড়েছেন। এখানে তার একটি আশ্চর্য অধ্যায়ের কথাই উদ্ধৃত হয়েছে—ইণ্ডিয়ান আর্টের আবির্ভাবের কথা ; তাও উদ্ধৃত হয়েছে তার শ্রেষ্ঠ কৃতীর আবির্ভাবের কথা বলে। বাঙলাদেশের ইতিহাসে সে এক শুভমুহূর্ত—যখন অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে পেলেন। তারপর বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশে হয়ে গেছে, ভারতীয় শিল্পের বয়সও চল্লিশ হতে যাচ্ছে—আজ তার পরিচয়ের জন্য অভিধান খুঁজতে হয় না, আমাদের মত সাধারণের কাছেও তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। আমরা জানি, বর্তমান পৃথিবীর শিল্প-জগতে যাঁরা ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য এঁরা দু'জন—অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল।

কিন্তু আমাদের চোখে ও বিবেচনায় সাধারণত 'নব্য ভারতীয় শিল্পকে' আমরা কি বলে জানি? অনেকেই তা জানি এই বলে যে, একটা বিশেষ ভঙ্গির তা পুনরাবৃত্তি। তার সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক দেহরূপের মিল বড় নেই,—আঙুল হবে সরু সরু, হাত পা হবে লম্বা-লম্বা, চোখগুলো হবে টানা-টানা। দ্বিতীয়ত, এ শিল্পের বিষয় হবে রোমাণ্টিক—মানে পৌরাণিক কিংবা পুরাতন ; নইলে এ কালের যে জীবন-যাত্রা অপরিচিত ;—ঠাকুর-দেবতা, বৌদ্ধ কাহিনী, মোগল রাজপুতের জীবন আর শেষে সাঁওতাল কি পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ এই শিল্পের বিষয়। এ অবশ্য অত্যন্ত স্থূল ধারণা, আর অত্যন্ত ভুল ধারণা ;—সাধারণ লোকের ধারণা সেরূপ হওয়া আশ্চর্য নয়। বুঝে-না-বুঝে 'নব্য ভারতীয় শিল্পকে' এই বলেই আমরা ধরে নিই। কিন্তু কেন? এরূপ ধারণা যে জন্মাল তারও কারণ আছে। একটা কারণ বোধ হয় এই যে, প্রাণ দিয়ে একদিন যে-সত্যকে আবিষ্কার করা হয় আরদিন পুনরাবৃত্তির ঝোঁকে তার প্রাণ হারিয়ে ফেলা হয়। সত্যের তখন খোলসটা থাকে ; তা দিয়েই তার রূপে আমরা চিনি, আর মনে করি—সেই সত্যকে চিনলাম, বুঝলাম, পেলাম। চল্লিশ বছর হয়নি, তবু মনে হয় ভারতীয় শিল্পের ভাগ্যে এমনি দুর্দশা ঘটছে—পদ্ধতি দিয়েই তার পরিচয় ও বিচার সাধারণত শেষ হয়।

---

* শিল্পকথা, শ্রীনন্দলাল বসু (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী) নিরীক্ষা, নন্দলাল সংখ্যা।

কিন্তু কি সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তার প্রথম দ্রষ্টারা? অবনীন্দ্রনাথ সে সত্য বলেছেন অনেকবার, বলেছেন তাঁর আবিষ্কারের কাহিনীও। তাঁরই কথায় আবার আমরা তা শুনি নতুন করে:
'পুরাতন ছবিতে (আর্ট স্কুলের আর্ট গ্যালারির মোগল-পার্শিয়ান ছবি) দেখলুম ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে সোনা রূপো সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা, তা হচ্ছে ভাব। সবই দিয়েছে ঐশ্বর্য ভরে, কোথাও কোনো বাধা নেই, কিন্তু ভাব দিতে পারেনি। মানুষ আঁকতে সবই যেন সাজিয়ে গুজিয়ে পুতুল বসিয়ে রেখেছে। আমি দেখলুম, এইখানে আমার পালা। ঐশ্বর্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জানলুম এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে।
বাড়ি এসে বসে গেলুম ছবি আঁকতে। আঁকলুম 'সাজাহানের মৃত্যু'।
নন্দলালের শিল্পেরও যে এই মন্ত্রেই বোধন চলেছে, তা অনুমান করতে পারি। কিন্তু তাঁর নিজের [illegible] কঠিন। তিনি লিখতে এবং বলতে স্বভাবতই কুণ্ঠিত। এবার 'শিল্পকথায়' শিল্পী নন্দলালের সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি কখনো বা তিনি মুখে বলেছেন, কখনো বা তিনি লিখে দিয়েছেন,—[illegible] আমাদের পক্ষে সহজলভ্য করেছে। অনেক কথাই মনে হয় সংক্ষিপ্ত যেন এ্যাফোরিজম্‌-এর রূপে কথা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা শক্ত হয়, তাদের ভুল বুঝবারও কারণ থাকে। কিন্তু এ গ্রন্থে অধিকাংশ কথাই সাধারণ লোকদের ই শিল্পী বলেছেন, কিংবা বলেছেন শিল্পী শিক্ষার্থীদের। তাতেই আমরা সাধারণ লোকেরাও এসব কথা থেকে নিজেদের শিক্ষার [illegible] পাই আর নিজেদের স্থূল ও ভুল ধারণাগুলোকে শোধরাবার সুযোগ পাই। কি শিল্প সম্বন্ধে কি নানা ভাবনায় শিল্প সম্বন্ধে—আমাদের দৃষ্টি তাতে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। নন্দলালের [illegible] কথা উদ্ধৃত করতে গেলে খণ্ডিত করা হতে পারে। জ্ঞানত [illegible] করে তবু দু' একটি বিষয়ে তাঁর কথা এখানে উদ্ধৃত করা যাক।
[illegible] তিনি বলেছেন:
"সকল শিল্পের লক্ষ্য এক। কাব্য, মূর্তি, চিত্র, গান সবই [illegible] ছন্দকে আপন [illegible] চায়। সে হিসাবে যোগসাধনার সঙ্গে শিল্পসাধনার [illegible]। অধ্যাত্ম-সাধনায় সৃষ্টির [illegible] ঐক্য সন্ধান করা হয়—[illegible] জানলে সব কিছুকেই জানা যায়। শিল্পেও ঠিক ঐভাবেই [illegible]। এক চীনা আর্টিস্ট বলেছেন 'যে [illegible] দূর্বার অঙ্কুর যথার্থ আর্টিস্টের [illegible] মূল্য, এবং [illegible] শক্তি [illegible]।' এতেই বোঝা যায়, শিল্প [illegible] ধারণা করা কতখানি সম্ভব। অবশ্য দেবমূর্তির প্রতি অশ্রদ্ধার কোনো কথা হচ্ছে না [illegible] দূর্বার অঙ্কুরের প্রতি [illegible] শ্রদ্ধা প্রয়োজন।"
নন্দলালের দৃষ্টিতে শিল্প এমনি একটা সাধনার পথ—রূপের [illegible] উপলব্ধি। কিন্তু রূপই [illegible] আশ্রয়। সম্পর্কটা তিনি স্পষ্ট করেছেন বোধ হয় এই কথায়: শিল্পী বস্তুকে গুণ সহিত দেখেন। সাধারণ বস্তুর রূপে উদাসীন অনামনস্ক মন দিয়ে দেখে কাজেই তারা গুণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয় না—রূপে রূপে প্রভেদটুকু মাত্র দেখে, অথবা রূপে গুণে সম্বন্ধটি ঠিক না [illegible]। রূপের প্রতি, কখনো বিচ্ছিন্ন গুণের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। শিল্পী জানেন, আসলে রূপে ও গুণে তফাৎ নেই, রূপের সবটাই গুণ এবং গুণের জন্যই রূপ। শিল্পীর পক্ষে বস্তুর কোনো একটি বিশেষ গুণে আকৃষ্ট হওয়াটাই প্রধান কথা। (একেবারে এক মুহূর্তে বস্তুর সব গুণের ধারণা কোনো মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়।) শিল্পীও প্রথমে বাহ্যিকরূপের দ্বারা আকৃষ্ট হন, পরে গুণের ধারণা হয়। এই আকর্ষণের কারণ নির্দেশ করা যায় না, জনে জনে তা বিভিন্ন।"
বাহ্যরূপ থেকে গুণে পৌঁছোন, গুণটি বুঝে যখন রূপে আবার ফিরে আসেন তখনই শিল্পের রূপে শিল্পীর চোখে নির্দিষ্ট ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই বাহ্যরূপের রূপান্তর হয়, কিন্তু একেবারে রূপছাড়া গুণের কোনো চিত্র বা মূর্তি হয় না। অবিচ্ছিন্ন (abstract) রূপের ধারণা বিচারবিশ্লেষণে কাজে লাগে, এবং ধ্যান জ্ঞানের অধিগত হলে কাজেও বিশেষ দৃঢ়তা

আনে। অনেক শিল্পী বিচ্ছিন্ন গুণের সূক্ষ্ম বা অপরোক্ষ অনুভব থেকে (intuitively) বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করেন ; বিশেষ গুণের উপর ঝোঁক দেওয়াতে, না জানতেই, আপনা থেকেই রূপের বদল হয়ে যায়—গড়নের মাপজোপে কম-বেশি হয়।"

'নব্য ভারতীয়' শিল্পের মূল ভাবাদর্শ নিয়ে অনেক বাগ্-বিস্তার হয়। সম্ভবত এখানে সে-আদর্শের কথাই তার সবচাইতে বেশি অধ্যাত্মবাদী শিল্পী বলেছেন। যা অপরোক্ষ অনুভব, কিংবা যে গুণ অবিচ্ছিন্ন, তা সাধারণের পক্ষে সহজ নয়, এমন কি শিল্পীর পক্ষেও সুলভ নয়। কিন্তু যা সত্য তা হচ্ছে এই যে, শিল্পীর জগৎ রূপের জগৎ ; রূপ থেকেই তার যাত্রা, আর রূপেই আবার তাঁর সৃষ্টির প্রমাণ। অবশ্য রূপ মানে ফটোগ্রাফির রূপ নয়, তা বলাই বাহুল্য। রূপসৃষ্টি মানে কোনো শিল্পী বলবেন, আসলে বস্তুরই সত্তাকে অধিগত করা, বাস্তবের মানেকে রূপের মধ্যে ধরে তোলা ; আর কোনো শিল্পী বলবেন—রূপসৃষ্টির মানে আসলে সত্তাকেই বস্তুর মধ্যে অধিগত করা, মানে, অরূপকে রূপের মধ্যে লীলায়িত করা। কারও মতে "গুণের জন্যই রূপ" ; কারও মতে "রূপের জন্যই গুণ" ; কারও মতে ভাব আগে, কারও মতে আগে বস্তু। কিন্তু সেখানে বোধ হয় মতভেদ নেই তা এই যে, রূপ-সৃষ্টিই আসল।

'নব্য ভারতীয় শিল্প' এই ভাববাদ থেকে যাত্রা শুরু করে পরম্পরার (tradition) খোঁজ করে—তার পিছনে ছিল আমাদের 'স্বদেশী' যুগের জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ আর হ্যাভেল, নিবেদিতা, ওকাকুরা প্রভৃতি বিদেশীয় মনস্বীরা। পরম্পরার সিঁড়ি বেয়ে সেদিনকার সাধকরা একটা পদ্ধতিও নিজেদের মতো চিনে নেন। কিন্তু সেখানেই কি তাঁরা ঠেকে গেলেন ? না এঁদের মনে ছিল ওকাকুরার সমস্ত উপদেশই—nature, tradition, originality এই তিন নিয়ে হয় সর্বাঙ্গসুন্দর আর্ট ? তাঁরা জানতেন না, আধ্যাত্মিকতা আর পদ্ধতি নিয়ে ভারতশিল্পের চোরাবাজারও আবার বসবে। নন্দলাল বলছেন, "হিন্দু ঘরে জন্মে হিন্দুর শিক্ষাদীক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি। এককালে বিশেষ করে দেবদেবীর ছবিই এঁকেছি। [তারও সেদিনকার পরিবেশ আয়োজন অবনীন্দ্রনাথের কথায় আমরা পেয়েছি, লেখক।] এখন কিন্তু দেবতার ছবি যেমন আঁকি সাধারণের ছবিও এঁকে থাকি ; উভয়েতেই আনন্দ পেতে যত্ন করি।"

শিল্পী নন্দলালের যে বিচিত্র বিকাশের কথা এখানে রয়েছে তার পরিচয় তাঁর সৃষ্টিতে। সেই পরিচয়ই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে 'নিরীক্ষার' 'নন্দলাল সংখ্যা।' এদিনে চিত্র ও প্রবন্ধ শুদ্ধ এমন সামগ্রিক পত্র বের হল তা এক বিস্ময়। কিন্তু না বের হলে বাঙালীর লজ্জা থাকত তার শিল্পীর পরিচয় না নিতে চাওয়া। 'নিরীক্ষায়' দেখি "যে নির্দিষ্ট অঙ্কনপদ্ধতিকে তিনি (নন্দলাল) স্বদেশী বলতে পারেন একমাত্র তাহাই সকল ভারতীয় শিল্পী আত্মসাৎ করুক ইহা তাঁহার দৃঢ় মত" (নিরীক্ষা, নন্দলাল সংখ্যা, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী) ; "কিন্তু তিনি নব নব অভিযানে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার নিকট সুন্দরের রূপ ফর্মাস-দেওয়া কোন বিশেষ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকে নাই।" 'পৌরাণিক' পর্ব কাটিয়ে নন্দলাল এসেছেন 'আধুনিক' পর্বে।" "এযুগ হল 'পরীক্ষার যুগ' "—কোন শৈলীতে তিনি আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না। তাঁর আধুনিক চিত্রে যে ফরাসী পোস্ট ইম্প্রেশানিজম্-এর প্রভাব পড়িয়াছে তাহাও লক্ষ্য করার বিষয়।" (নিরীক্ষা, ঐ, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত)। রাজপুত, মোগল, অজন্তা তাঁর প্রথম প্রেরণা জুগিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে তেমনি চীনা ও জাপানী চিত্রকলা। কিন্তু প্রেরণা জুগিয়েছে আবার বাঙলার লোকশিল্প—পট ও পুঁথির পাটা, পোড়া-মাটির খোদাই, মাটির বাসনের লেখার ও তুলির কাজ ; নানা দেশের লোকশিল্প মিশরীয়, আসীরিয়, গ্রীক, চীনা, বাইজেণ্টাইন, গথিক, প্রভৃতি নানা শিল্পকলা। বাধা তিনি পান না কোথাও—নাটকের মঞ্চসজ্জা, পোশাকের পরিকল্পনা, স্থাপত্য, অলঙ্করণ এচিং, কাঠখোদাই, চামড়ার কাজ থেকে হরিপুরার কংগ্রেসের মণ্ডপ-মণ্ডন—আর দৈনন্দিন জীবনের সহজ রূপ—কুণ্ডলী-করা কুকুর, পশু, ফল গাছ, নর-নারী—সব তাঁর তুলি ও কলমের টানে যেন গীতি-কবিতার মত রূপ ধরে উঠছে। আর এসব দেখতে দেখতে বুঝি নব্য ভারতীয় শিল্পকলা কোন সত্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। তারপর

যখন এসব ছেড়ে আবার একালের নব্য ভারতশিল্প দেখি, তখন বুঝি কোন্ খেদে অবনীন্দ্রনাথ বলেন "আজকাল ভারতীয় শিল্প বলে যারা পরিচয় দেয় ভারতীয় তারা কোন্খানটায় ?" স্পর্ধা না শোনালে বলতাম—তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার চোরা-কারবারে শিল্পই বা আছে কতটুকু ?

অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

বুদ্ধিজীবীর পরীক্ষা

মহাযুদ্ধের এক প্রধান পর্ব শেষ হচ্ছে। এ পর্ব যুদ্ধের সামরিক পর্ব, আর সেই সামরিক আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে চলেছে ইউরোপ ক্ষেত্রেই। সাধারণ ও অসাধারণ কেউ বর্তমান চমকপ্রদ ঘটনাবলীর সম্বন্ধে উদাসীন নেই। ইউরোপে ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধশক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের এই সামরিক পর্বটিই শেষ সত্য বলে মনে করব, এমন সমর শাস্ত্রী আমরা নই। এ যুদ্ধ ইতিহাসের সভ্যতা-সংকটের ফল, এবং যুদ্ধের মধ্যদিয়েই সেই সভ্যতা তার বৈপ্লবিক পরিণতির দিকেও অগ্রসর হতে চলেছে, আমাদের এইরূপই ধারণা। অবশ্য সেদিক থেকেও যুদ্ধের সামরিক পর্ব, বিশেষ গুরুতর পর্ব। কিন্তু রণক্ষেত্রের পরাভবেই সে বিকৃতির সম্পূর্ণ অবসান ঘটবে না, সমাজক্ষেত্রেও বিকৃতির পরাজয় ঘটলেই বিকৃতির অবসান ঘটবে।

ফ্যাশিজমের রণক্ষেত্রে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির মুক্তিলাভের প্রথম সূচনা হয়। ইউরোপের রণক্ষেত্রে সামরিক জয় ঘটতে ঘটতেই আমরা দেখতে পাই—মানুষের জয়ও সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছে। সে জয় সেখানেও সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলছি না; কিন্তু শুরু হয়েছে। ফরাসী, ইতালীয়, ক্রোট, সার্ব, চেক্, পোল্ এমন কি গ্রীক প্রভৃতি ইউরোপের জাতিগুলোর হিসাব নিলেও দেখব, জনশক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চলেছে, শোষক দল পরাহত হচ্ছে। এসব থেকে এ যুদ্ধের স্বরূপ ও তার বৈপ্লবিক সম্ভাবনার কথাও আমরা বুঝতে পারি। সে সম্ভাবনা ক্রিয়-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী রূপ গ্রহণ করে, সভ্যতার সদাজাগ্রত প্রহরীদের পক্ষে তাই হবে প্রতিটি পদক্ষেপে লক্ষণীয়। এশিয়ার শোষিত জাতিগুলোর পক্ষে এই পর্ব আরও গুরুতর। কারণ এশিয়ায় যুদ্ধের সামরিক পর্বও এখনো শেষ হয় নাই।

যুদ্ধের সশস্ত্র ও অশস্ত্র দুই পর্বেই এদিক থেকে হচ্ছে দেশ-বিদেশের কর্মরত বুদ্ধিজীবীদের পরীক্ষা। এ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় আমরা সব ক্ষেত্রে সুবুদ্ধির প্রমাণ দিয়েছি, তা বলতে পারলে খুশি হতাম।

কিষাণ ও শিল্পীর সম্মেলন

সারা-ভারত কিষাণসভার বার্ষিক সম্মেলন এবার বাঙলাদেশে নেত্রকোনায় হয়েছিল। এ সম্মেলনের কিছু কিছু সংবাদ সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে,—যদিও নানারূপ মতবিরোধের জন্য অধিকাংশ সংবাদপত্রই এত বড় সম্মেলনের যথোচিত বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। প্রায় এক লক্ষ লোক যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে দেশের এই অবস্থায় সমবেত হয়, যেখানে গুর্খা, মারাঠী, দ্রাবিড়, পাঞ্জাবী, মণিপুরী, বর্মী—হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান একত্রিত হয়, সে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও তার গৃহীত প্রস্তাব ও আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারা বাঙলার সাংবাদিকদের পক্ষে প্রশংসার কথা নয়। বাঙলাদেশের হিন্দু মুসলমান হাজং মেয়ে-পুরুষ কৃষকদের এই সমাবেশ দেখলে বুঝতে পারা যেত কৃষকসভা এই দুর্দশাগ্রস্ত প্রদেশের মানুষের মনে কি আলোড়ন এনেছে।

এই বিরাট সম্মেলনের নানাদিককার বৈশিষ্ট্য আমাদের পক্ষে এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় বলেই যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল সেই সাধারণ সাংবাদিকদের কর্তব্যচ্যুতির কথা এত করে বলতে হল। তাঁরা দেখতেন, কৃষক সম্মেলন শুধু একটা মামুলী সভা নয়, এদেশের পল্লীজীবন ও সংস্কৃতির এ একটি তীর্থস্বরূপ—এ যেন খাঁটি দেশী মেলা। সে হিসাবেই এ সম্মেলনের দু'একটি দিক উল্লেখযোগ্য : কলকাতায় এখন কলেরা চলেছে, বসন্তও শেষ হয় নাই ; পাঁচ সপ্তাহে ৯,০০০ নরনারী এখানে এই সব ব্যাধিতে মরেছে। মহামারীগ্রস্ত বাঙলায় নেত্রকোনার মত একটি দূর পাড়াগাঁয়ে লক্ষ লোকের সমাবেশ হল, তাই নানা ব্যাধি পীড়ার আশঙ্কা ছিল। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা মাসাধিক পূর্ব থেকে চারিদিকে স্বাস্থ্যনীতির প্রচার চালিয়ে সে একেটি প্রস্তুত করেন। আর সম্মেলনের সময় থেকে প্রস্তুত থাকে তাঁদের হাসপাতাল, ডাক্তার, শুশ্রূষাকারীরা। তাছাড়া প্রতিনিধিরাও গিয়েছিলেন সবাই কলেরা-বসন্তের, টাইফয়েডের টিকা নিয়ে। আমাদের বিশ্বাস, নেত্রকোনার উদ্যোক্তাদের এই সব নতুন শিক্ষা কংগ্রেস-কনফারেন্সের ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তাদের পক্ষে এখন থেকে সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে গ্রাহ্য হবে।

সম্মেলনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, বাঙলার লোকশিল্পের প্রদর্শনী। এটি সত্যই দর্শনীয় হয়েছিল। তার একদিকে ছিল নানা তথ্য ও প্রাচীর-চিত্র দিয়ে কৃষকজীবন ও কৃষক-আন্দোলনের ব্যাখ্যা, অন্য দিকে ছিল হাতের কাজ, পল্লীশিল্প। তার মধ্যে মধ্যখানে, সভাকেন্দ্রের তোরণের সম্মুখে ছিল মাটির তৈরী প্রকাণ্ড কৃষকমূর্তি। এটি কৃষ্ণনগরের এক তরুণ শিল্পী, লক্ষ্মী পালের কাজ। তাঁর 'মডেল' ছিলেন সভার উপস্থিত, স্থানীয় কৃষক আন্দোলনের কৃষকনেতা হৃদয় সরকার। বিশেষ বীরত্ব-ব্যঞ্জক এই মূর্তি। কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের কৃতিত্ব আমরা জানি, কিন্তু কি করে তাঁদের এই নৈপুণ্য সত্য সত্যই একালে বেঁচে থাকবে, কি করে ধারায় আরও বিকাশলাভ করতে পারে, সেই কথাই আমাদের ভাবা প্রয়োজন। তাদের মাটির কাজের কৃষকজীবনের চিত্রও এরূপই উল্লেখযোগ্য। যেসব জিনিসপত্র এসেছিল তার মধ্যে শান্তিনিকেতনের শিল্প ছাড়াও উল্লেখযোগ্য অনেক বস্তু ছিল, যেমন বস্ত্র, বাসনকোসন, তৈজসপত্র, নানা সূক্ষ্ম কাজ যা এখনো দেশ থেকে লোপ পায়নি। এমন কি এখানেই আমরা সত্যই দেখলাম বাংলার বস্ত্র পর্যন্ত। এসব দেখলে এদেশের ব্যবহারিক লোক-কলার উপর শ্রদ্ধা জাগে—এখনো তো এসব বেঁচে আছে, লোকসমাজ তো এখনো দৃষ্টি শক্তি হারায়নি, সৃষ্টিশক্তি একেবারে খোয়ায়নি।

সম্মেলন থেকেই নানা প্রদেশের নাচ-গানের লোকশিল্পের এদিককার নিদর্শনেরও আয়োজন ছিল। কিন্তু অন্ধ্রের ভালো শিল্পীরা দেশে রয়ে গিয়েছেন—গতবার তাঁদের নৃত্য ও অভিনয়ে বেজওয়াড়ায় আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবারকার বাঙলার আয়োজনে ময়মনসিংহের নিবারণ পণ্ডিতের জারির দলই বেশি প্রশংসা অর্জন করেন ; বাউল গায়ক মমতাজ ও রসিদুদ্দীনও জনতাকে খুব মুগ্ধ করেন। কিন্তু লোক-নৃত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উপস্থিত করেন মণিপুরীরা। মণিপুরী লাইছাবি নৃত্য দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সম্মেলনে মেয়েদের নৃত্য হয়নি—হয় ফাগ্‌নাটার 'খাম্বল নৃত্য', মহাদেব পূজার 'লাইহারোবা নৃত্য', আর বর্শা নৃত্য 'ঘোবাক'। এই বর্শা নৃত্যটি দেখে সত্যই মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হতে হয়—মণিপুরীরা প্রাণ দিয়ে নাচে, প্রাণ দিয়ে বাঁচে।

সম্মেলনে দেখা হয়েছিল দু'জন তরুণ শিল্পীর সঙ্গে ; নীরদ মজুমদার ও কাশ্মীরের ব্রহ্ম—দু'জনেই 'ক্যালকাটা গ্রুপের' সঙ্গে সম্পর্কিত। দেখলাম তাঁরা রাতদিন কাজ করছেন, বুঝছিলাম আনন্দ পাচ্ছিলেন তাঁরা এই অভিজ্ঞতায়। তাঁরা বড় তামণ্ডপটিকে মণ্ডিত করেছিলেন কৃষকজীবনের বিবিধ দৃশ্য এঁকে। বৃষ্টি-বাদলে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে বটে, তবে তাঁদের খাতায় দেখেছি অসংখ্য দৃশ্য স্কেচ করা। মনে হয়েছে, দৃষ্টিসম্পন্ন সাংবাদিকেরা নিজেদেরই বঞ্চিত করলেন, কিন্তু শিল্পীরা একটা নতুন চেতনা লাভ করছেন—তাই তাঁদের চোখ খুলে যাচ্ছে, হাতের পেন্সিল নামে না, মনে আনন্দ ধরে না—গতায়াত, বাসস্থানের অসুবিধাকেও তারা গ্রাহ্য করেননি। এই সম্মেলন উপলক্ষ করে বাঙলার সাংবাদিকের ও বাঙলার শিল্পীর দ্বিবিধ পরিণতির ইঙ্গিত আমরা পেলাম কিনা জানি না।

বাঙলার শিল্পপ্রদর্শনী

নেত্রকোনার প্রদর্শনীতে দেখতে পেয়েছি বাঙলার লোকশিল্পের একটি দিক। প্রধানত তা কারুশিল্পের দিক। যে কারুশিল্প এখনো জীবন্ত তা দেখলাম। কিন্তু চেষ্টা করেও কৃষক-সম্মেলনের উদ্যোক্তারা তাদের লোক-শিল্পের প্রদর্শনীতে যেসব শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ করতে পারেননি—পারবেন না—বাঙলার লোক-শিল্পের সেই রূপ-রসময় নিদর্শন সহজভাবেই সংগৃহীত ও সজ্জিত দেখলাম অন্য একটি স্থানে। আশুতোষ মিউজিয়াম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলাভবন, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ব্রতচারী সমিতির গুরুসদয় সংগ্রহ, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ, প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত নিদর্শন একত্রিত হয়েছে লাট-ভবনের 'বাঙলার শিল্পপ্রদর্শনীতে।' লাট-পত্নী মিসেস বোজ শিল্পানুরাগিনী। বাঙলার শিল্পের জন্য তাঁর আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা না থাকলে অনেকের পক্ষে বাঙলার লোক-শিল্পের এই সংগ্রহ একসঙ্গে দেখবার সুযোগও ঘটত না। ভাগ্যক্রমে এই প্রদর্শনীতে তিনি শিল্প-রসিকদের যথোচিত সহায়তাও গ্রহণ করেছেন, তাতেই নিদর্শনগুলির নির্বাচনে ও প্রদর্শনী সজ্জায় দর্শকেরা আরও তৃপ্তিলাভ করছেন। সুলিখিত ও সুমুদ্রিত শিল্পপঞ্জীতে বাঙলা শিল্পের যে ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটি নিদর্শনের যে পরিচয় আছে, তাতেও দর্শকদের বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

বাঙলার শিল্প তার সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ। সে-শিল্পের যোগ রয়েছে ভারতবর্ষের শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে। আবার তার নিজেরও একটি বিশিষ্ট বিকাশ ঘটেছে,—বাঙলার নিজস্ব জীবন আছে। প্রদর্শনীর শিল্পপঞ্জীর ভূমিকায় বলা হয়েছে, "বাঙলার মন এক ও অখণ্ড। মূলত তা সমতলভূমির দান। এই বিশাল বদ্বীপ আর তার আঁকাবাঁকা নদী-খালের মধ্যে বাঙালীর ভাবনা ও দৃষ্টি গড়ে উঠেছে। হিন্দু ও মুসলমান দুজনায় মিলে মৃৎশিল্পে ও সূক্ষ্ম কারুশিল্পে বাঙলার কল্পনা-সমৃদ্ধ শিল্প-ভাণ্ডারে আপনার দান যুগিয়েছেন।" এই কথার মধ্যে যে সত্য আছে, তা অস্বীকার করবার কারণ নেই। তাতে নতুন করে কোনো বাঙালীপনার (সেই বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মানে এর নামে এনভেবনমেণ্টালিজম্ হোক কিংবা 'বাঙালী রক্তের' বিশেষ ধর্ম, মানে 'ব্লাড্ থিওরি'র নামেই হোক) সমর্থন করা হচ্ছে না। প্রদর্শনীতেও বাঙলার শিল্পের এই দুটি দিকেরই নিদর্শন রয়েছে।—যেদিকে ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের ধারা বাঙলায় প্রবাহিত হচ্ছে, তাও আছে। দিন তারিখ নিয়ে তর্ক না করেও বলতে পারি, বাঁকুড়া ও তমলুকের ১নং ও ২নং নিদর্শন বেশ পুরনো, শশাঙ্কগড়ের, পাহাড়পুরের পোড়ামাটির যোদ্ধা ও নর্তকী, ৩নং ও ৭নং) নিদর্শনগুলির বয়স কম নয়, তারপরে পাল ও সেন যুগের মূর্তি তো বাঙলাদেশের পথে ঘাটে মিলে। আরও ভালো নিদর্শন আছে—লোকেশ্বর বিষ্ণু লক্ষ্মী ইত্যাদি। কিন্তু এ-প্রদেশে লোকচিত্ত রাজসভার দাবিতে ধরা পড়েনি; বাঙলা আবার ভারত সভ্যতায় বরাবরই একটু প্রত্যন্ত প্রদেশ। তাই এখানে শিল্পে লোকচিত্তের সহজ প্রেরণা স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ পেয়েছে, শিল্পশাস্ত্রের ঐতিহ্য আমাদের পক্ষে দুর্বার হয়ে ওঠেনি, রাজসভা তাকে আড়ষ্ট করে তোলেনি। পাহাড়পুরের সেই পোড়ামাটির মূর্তি কয়টিতেও লৌকিক জীবনের কথাই স্বচ্ছন্দ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লৌকিক জীবনের প্রতি নিঃশঙ্ক দৃষ্টি ও নিশ্চিন্ত সৃষ্টিই বাঙলার শিল্পের আসল গৌরবের মূলে। তাই লোক-শিল্পেই বাঙালীর মনের ঠিক পরিচয় রয়েছে—তার স্বচ্ছন্দ লীলা ও সহজ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তার বিশিষ্ট রূপদৃষ্টির ও জীবনবোধের প্রমাণ মিলে। এই লোক-শিল্পের নিদর্শনগুলিকে প্রদর্শনীতে উপযুক্ত গৌরব দেওয়া হয়েছে। লাট-ভবনে অভিজাত রুচি শিল্প রসিকদের কাছে পল্লী-বাঙলার লোক-শিল্প তার মর্যাদা আদায় করেছে, এটা ভুলবার নয়।

শিল্প-নিদর্শন না দেখলে তার পরিচয় লাভ করা যায় না, এখানে সেরূপ পরিচয়দানের চেষ্টাও নিষ্প্রয়োজন। অনেক শিল্প-রসিক অন্যত্র তা দিয়েছেন। তবু বলা যেতে পারে, পাহাড়পুরের

নিদর্শন ছাড়াও যশোরের নড়াভাঙ্গার সেই জগদ্ধাত্রী মূর্তি, পোড়ামাটির রামায়ণ দৃশ্য, কুমিল্লার ময়নামতীর পোড়ামাটির ফলক, কিন্নর মূর্তি, কুমিল্লার কাঠের খোদাই দুর্গা ও রামায়ণের দৃশ্য, মালদহের সেই কাঠের কৃষ্ণমূর্তি, তাছাড়া নানা জায়গার পট—কালীঘাটের পটও আছে.—পাটা, কাপড়ের উপর সূক্ষ্ম কাজ—আর সেই খানচারেক কাজ-করা কাঁথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞের এ কাঁথা দেখে গগ্যাঁ মাতিসের কথা মনে পড়ে গিয়েছে, সেসব মহাশিল্পী বাঙলার চিত্র দেখলে নাকি বিশেষরূপে উদ্বুদ্ধ হতেন, তাঁরা একথাও বলেছেন। সাধারণভাবে আমরা বাঙলার এই শিল্প-প্রদর্শনী থেকে যা দেখছি তা হচ্ছে এই—প্রথমত, বাঙলার শিল্প লৌকিক জীবনকে সাগ্রহে ও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছে, তাতে ভয়ও পেত না, ভাবনায়ও পড়ত না; দ্বিতীয়ত, এ শিল্প জীবনযাত্রার যে-কোনো নতুন জিনিসকেও গ্রহণ করতে পারত—সে সাহেবই হোক, আর আমীর-ওমরাই হোক, মানে, তা জীবন্ত ও চলন্ত ছিল। তৃতীয়ত, তার প্রকাশভঙ্গিও ছিল সহজ, অকৃত্রিম, বাহুল্য-বর্জিত।

বাঙলার লোক-শিল্পের এক নতুন বিকাশের চেষ্টা আজ দেখা দিয়েছে। তাই, বাঙলার লোক-শিল্পকে দেখা ও বোঝা আরও বেশি প্রয়োজন। সে সুযোগ যত পাওয়া যায় ততই আমাদের মঙ্গল; আর এ সুযোগ সে সহজে লাভ করা যায় না তাও আমরা জানি।

বৈশাখ, ১৩৫২

'একান্ন'র হিসাব

বাঙলা সাল শেষ হতে চলেছে। স্বভাবতই অবসানপ্রায় বৎসরের দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছা যায়। ১৩৫০ শেষ না হতেই সরকার বলেছিলেন, অবস্থার মোড় ঘুরেছে। তবু ১৩৫১-র দিকে ফিরে তাকিয়ে অবশ্য খুব উৎসাহিত বোধ করব, ১৩৫১ এমন বৎসর নয়। ১৩৫০-এ মন্বন্তর গিয়েছিল, ১৩৫১-তে মহামারী এল ১৩৫০-এ চাল ও খাদ্যদ্রব্যই বেশি করে চোরাবাজারে গিয়েছিল, ১৩৫১-তে সমস্ত দ্রব্যই চোরাবাজারে গিয়েছে। চোরাবাজারই এখন সদর বাজার হয়েছে—আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের মোট দর এখন চতুর্গুণ। মানে যুদ্ধারম্ভের সময় যেখানে জিনিসপত্রের দর ছিল ১০০ টাকা, এখন সেখানে দর উঠেছে ৩৯৭ টাকায়—এই নাকি সরকারী হিসাব। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি—কাপড়, কাগজ, কয়লা, কেরোসিন, সর্ষের তেল শুধু নয়, মাছ, তরকারি, দুধ—যা কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তারই দর অনেক ক্ষেত্রে চতুর্গুণেরও বেশি, এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে তা চোরাবাজারে ছাড়া পাওয়াই যায় না। সহজভাবে ন্যায্য দরে বাঙলাদেশে আজ কোনো জিনিস কেনা সম্ভব নয়। এ হিসাব আমরা বাড়াতে চাই না, মোড় যে কোন্ দিকে ঘুরেছে তা বুঝতে পারি। দেখছি ভূমিছাড়া কৃষকেরা তাদের জমি ফেরত পায়নি, লাঙলের লোহা বাস্তের লোহা তারা কিনতে পারে না, খোল, বীজ, সার কেনা তাদের দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে, সরকারী বাজেটে টাকা নির্ধারিত হলেও বলদ কেনার জন্য চাষী সে ঋণ পায়নি; বাজেটের নির্ধারিত সেচ প্রসারের কোটি কোটি টাকা তহবিলেই জমা আছে, সরকারের মনঃপূত স্কীম তৈরি হয়নি; আর বহু-বিজ্ঞাপিত সরকারী 'খাদ্য ফসল বাড়াও' প্রচারের ফলে বাঙলাদেশে ১৩৫১-তে আমন ফসল ফলেছে সাধারণ বৎসরেরও তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ কম। এছাড়াও দেখছি—তাঁতী ও জেলেরা সুতা পায় না, কামারেরা লোহা পায় না, কুমারেরা মাটি পর্যন্ত পায় না,—বাঙলার গ্রাম্যজীবন ১৩৫০-এর পরে ১৩৫১-তে প্রতিষ্ঠিত হবার মত কোনো অবলম্বনই পায়নি। অন্যদিকে জানি কয়লার অভাবে, আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের অভাবে কল-কারখানায় উৎপাদন কমেছে, অনেক ক্ষেত্রেই সেই শিল্পজাত চোরাবাজারেই নিয়মিতভাবে যায়, আর চোরাকারবারীর সঙ্গেও মালিকের যোগাযোগ নিতান্ত অস্পষ্ট নয়। তাই কলে কাজ কম হয়, মাল কম উৎপন্ন হয়, জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও মজুরের মজুরি বাড়েনি; অথচ মাল কম উৎপন্ন হলেও মালিকের মুনাফা বেড়েই গিয়েছে। এই কথা পাটের বিদেশী মালিক, চালের দেশী ও বিদেশী মালিক, কাপড়ের দেশগতপ্রাণ বাঙালী-অবাঙালী মালিক, চিনির ভারতীয় মালিক, আর

কাগজের ও সংবাদপত্রের বিজাতীয় ও জাতীয়তাবাদী মালিক ও ব্যবসায়ী সকলেরই সম্বন্ধে প্রায় সমান সত্য।

সমস্ত বাঙলাদেশ চোরাকারবারীর কবলে—কাপড়ের, কেরোসিনের, কয়লার লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একথা আমরা যেমন বুঝছি, তেমনি বুঝছি—সমস্ত বাঙলাদেশে আজ ঘুষের রাজত্ব স্থাপিত হয়েছে। একথা আজ নিজের গরজেই কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন, এমন কি স্থলবিশেষে তাঁরা দুই-একটি অসাধু কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমাও পরিচালনা করেন। কিন্তু সেই প্রথমবার 'ভিটে-ছাড়াবার, গ্রাম-ছাড়াবার' দিন থেকে একেবারে আধুনিক দিনের কাপড় বিলির, রেশনের কার্ড বিলির দিন পর্যন্ত সামরিক ঠিকাদারিতে, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগে, সরকারের এজেন্ট, সাব এজেন্ট মনোনয়নে, তাদের কাজকর্মে, সমস্ত দেশ জুড়ে যে 'পুকুরচুরি' চলেছে—তাকে দমন করবার কোনো প্রয়াসই কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। বরং যা লক্ষ্য করা যায় তা এই যে, শুধু অপদার্থতা নয়, শুধু আত্মপোষণও নয়, উৎকোচ এবং অসাধুতা আজ শাসনবিভাগের সর্ববিভাগে, তার উচ্চ-নীচ সমস্ত স্তরে এক্ইরূপে প্রশ্রয় পেয়েছে,—চোরাকারবারীর জুড়ি চোরা-কর্মচারী।

এই কঠিন সত্য ১৩৫১ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছে যে, চোরাকারবারী ও চোরা-কর্মচারী আজ বাঙলার শাসক হয়ে বসেছে, সমস্ত দেশের আর্থিক জীবন তাদের কবলে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু যেটুকু এখনো পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি, যেটা সুস্পষ্ট করে বুঝছি না তা এই যে—বাঙলার সমাজজীবনে এই নতুন শক্তি কীভাবে কি পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেই বা তার ফলে কি লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

০ ০ ০ ০

তিন বৎসর পূর্বে সামরিক ঠিকাদারী থেকে এক নতুন নেশা দেশকে পেয়ে বসে—অবশ্য তারও পূর্বে যুদ্ধের মাল সরবরাহ করে কাপড়ের কলের মালিকেরা শতকরা ৩০০ টাকা মুনাফা করছিলেন। কিন্তু বাঙলাদেশে তিন বৎসর পূর্বেই বিশেষ করে শুরু হয় এই মুনাফার শিকার, শুরু হয় এই সামরিক ঠিকাদারী নিয়ে। দেশের ব্যবসায়ী, সওদাগর সকল শ্রেণী দেখল—তার সম্মুখে [illegible] মুনাফার কোনো পরিমাণ সীমা সীমানা নেই। সমস্ত শ্রেণীতে এই মুনাফার শিকার পরিব্যাপ্ত হল, আবার সমস্ত শ্রেণী থেকেই সামরিক বেসামরিক নানা ঠিকাদারী ও সরবরাহের জোগানে [illegible] মুনাফার খোঁজে নানাবিধ লোক—তাদের মধ্যে দরিদ্র ছিল, ধনী ছিল, উচ্চবর্ণের ছিল নিম্নবর্ণের ছিল, শিক্ষিত ছিল, অশিক্ষিত ছিল, চাকরিজীবী ভদ্রলোক ছিল, বৃত্তিজীবী কারিগরও ছিল, ব্যবসায়ী মালিক মহাজন ছিল, আবার অভিজাত জমিদার ব্যাংকারও ছিল,—এক কথায় সমস্ত শ্রেণীরই তারা ভিড় করে এল—আর এল শুধু একটি লক্ষ্য নিয়ে, 'যে করে পারি—লুটে নিই এখনি।' এই একটি মাত্র মন্ত্র তাদের পেয়ে বসল—আত্মসর্বস্বতা হল তাদের জীবনধর্ম। এ কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নয়, সমাজঘাতী আত্মসর্বস্বতা মাত্র। সমাজে বসবাস মানেই পরস্পরের সহায় সাহায্য, খানিকটা পরস্পরের জন্য বেদনাবোধ, সম্পদে, বিপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানো। সমাজের প্রত্যেক স্তরেই এই মূল সামাজিক গুণ নানাভাবে প্রকাশ পায়—পারিবারিক স্নেহমমতার কেন্দ্র, পরিবারে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়ামায়া, বন্ধু-প্রতিবেশীর সহিত সহজ আদান-প্রদান, পূজায়-পার্বণে দশজনকে নিয়ে উৎসব করা, দশজনের হিতের ব্যবস্থা করা, দরিদ্র নারায়ণের সেবা, জাকাৎ, ইমান অভিজাতদের দয়া-দাক্ষিণ্য এসব নিয়েই সমাজ চলে। আমাদের সমাজও চলেছে আমাদের চাষী-মজুর, ব্যবসায়ী, কারিগর, জমিদার মহাজন কেউ মোটের উপর এই মূল সামাজিক বোধকে একেবারে অস্বীকার করত না। 'মানি ইকোনমি' বা টাকার যুগ এসে তার পুরানো বন্ধন শিথিল করছিল, নতুন মর্যাদাবোধও দিচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে, আর শিক্ষিত ভদ্রলোকের অভ্যুত্থানে সেই সামাজিক গুণেরও নতুন ধারায় প্রবল বিকাশ ঘটেছিল—স্বজাতিপ্রীতি, দেশপ্রীতি, দরিদ্র নারায়ণের সেবা, মানুষের মনুষ্যত্ব, ঝড়ে-বন্যায়, অনাবৃষ্টিতে, দুর্গত সেবায় আত্মনিবেদন—বাঙলাদেশে অন্তত ১৯০৫-এর পর থেকে ভদ্রলোকের জীবন-দৃষ্টিতে এ-সবই হয়ে ওঠে মানুষের কাজ, তার সার্থকতার মানদণ্ড। অবশ্য এই ভদ্রলোকের জীবন-ভিত্তিতেও ভাঙন ধরেছিল ১৯২০-

এর পর থেকে, বিশেষ করে ১৯৩০-এর পরে. কিন্তু তারাও অর্থকে ক্রমেই সার্থকতার মানদণ্ড হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছিল ; তবু ভদ্রলোকের ভদ্রতা, দেশপ্রীতি, দরিদ্রসেবা এসব সম্মানিত হত। কিন্তু ১৯৭২-এর পর থেকে সমাজের সমস্ত স্তর ভেঙে যখন মুনাফার শিকারে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেরিয়ে পড়ল তখন তাদের একটিমাত্র মন্ত্র হল—"যা পারি লুটে নিই এবেলা"। নিজ নিজ শ্রেণীর সমাজের কোনো ধারণা-বন্ধন তারা আর সঙ্গে নিয়ে চলল না—পুরনো ব্যবসায়ী মালিকদের মধ্যে, জমিদার ও ভদ্রলোকের মধ্যে যে দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল, ইন্টারেস্ট ছিল, এমন কি সাধারণ কর্তব্যবোধ ছিল, ধর্মবোধ ছিল—এই মুনাফার শিকারীদের মন থেকে তা লুপ্ত হয়ে গেল। এক সমাজঘাতী আত্মসর্বস্বতা—এক নির্লজ্জ লুণ্ঠনবৃত্তি তাদের পেয়ে বসল।

তাই মন্বন্তরের দিনে তারা দেখতে লাগল তাদেরই পরিজন-প্রতিবেশীর মৃত্যু,- দেখল সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, সংসারধর্ম বিনষ্ট হচ্ছে চিরদিনকার মায়া মমতা, স্নেহ-প্রীতি, ভক্তি বাৎসল্য সব সমাধিলাভ করছে। যা কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে উঠে যা আশ্রয় করে সমাজ প . হয়—সেই মূল সামাজিক বন্ধন অনভূতি সব ক্ষয়ে যেতে লাগল—সে-সবই আবার মুনাফার এক নতুন উপকরণ হল, অন্নহীনের ঘর দুয়ার, বাসন-কোসন, জমি-জমা শেষ পর্যন্ত পর কন্যা এবং সধবা নারীর দেহ পর্যন্ত এই মুনাফা শিকারের বড় পণ্য হয়ে উঠল—মুনাফার মূল্য মানুষের মর্যাদায় পরিণত হল।

দিশাহারা নর-নারীর লক্ষ্য হয়ে পড়ল—যে করে পারি প্রাণটাকে বাঁচাই' এই সমাজ-বিরোধী আত্মরক্ষার বৃদ্ধি, আর মুনাফার কাণ্ডারীদের মত্ত হয়ে উঠল—'যে করে পারি এবেলা লুটে নিই' এই সমাজঘাতী আত্মসর্বস্বতার পথ। চোরাকারবারী ও চোরা কর্মচারী যখনই বাঙলার সামাজিক জীবনে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল তখনই বাঙলা। ভদ্রলোকের অন্যান্য মানদণ্ড পরিত্যক্ত হল শিক্ষকের মানদণ্ড নয়, চোরাকারবার ও চোরাকারবারীর মানদণ্ড সমাজে রাজদণ্ড হয়ে উঠল ১৩৫০ '৫১ এর মধ্যদিয়ে। শিক্ষক, ভদ্রসমাজ প্রথম বিস্ময়ে দেখেছিল এই নতুন শক্তির অভ্যুদয় এবং মুনাফাদারদের অসাধু ব্যবসায়—ঘৃণাও করেছিল, আতঙ্কও হয়েছিল দেখে মন্বন্তরের মধ্যে দয়ামায়া মানমর্যাদার পরাজয় তারপর আত্মরক্ষায় তারাও বিব্রত হয়ে পড়ে, তারাও মেনে নেয় আজ মুনাফার শিকারেই মুক্তি, তারাও সহিংস দস্যুদের দেখল নতুন শক্তির উজ্জ্বল মদগর্বিত সমারোহ—পথে ঘাটে, বাসে, বাজারে—একসাথে পরিবারিক আদান-প্রদানে—তারাও মানলে এই নতুন শক্তিকে, আর একটু একটু করে তারাও সেই নতুন আদর্শের কাছে সমর্পিত হল—সেই শান্তনিধি, সেই ভদ্রতার আদর্শ, সেই দেশপ্রীতির, সেই দুর্গতের সেবার—পরিবারে ও পরস্পরের প্রতি মমত্বের সেই বন্ধন তারাও বিসর্জন দিতে লাগল।

বাংলার সমাজে ভদ্রলোকের জীবনাদর্শ একটু করে ঠিকাদার, মুনাফাদার, চোরাকারবারী ও চোরা কর্মচারীর নিয়ম-কানুনের নিকট,—ভদ্রনীতি চোরানীতির নিকট নত হয়ে পড়েছে—সমাজ-নীতি, সমাজ-বিরোধী আত্মসর্বস্বতার নিকট হার মেনেছে,—এইটিই ১৩৫১-তে দেখতে পাই, আর এইটিই আমরা ১৩৫১-তে সুস্পষ্টরূপে বুঝে উঠতে পারি না। তাই সচেতন হতে পারিনি—আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই চোরাকারবারীর অভ্যুত্থানে—সমাজবিরোধী শক্তির প্রতিষ্ঠায় যেমন করে সমাজের প্রতি স্তরে ভাঙন ধরেছে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তায় ও আদর্শে, কর্মে ও সংঘ-শক্তিতে ; ভাঙন ধরেছে কংগ্রেসের মধ্যে, মোসলেম লীগের বাইরে,—ভাঙন ধরেছে আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও।

০ ০ ০ ০

১৩৫০-৫১-তে সবচেয়ে আশার যে লক্ষণ দেখা যায় তা দেখা গিয়েছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই। মন্বন্তরের আঘাতে বাঙলার সাহিত্যিকরা সাড়া দেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে। সকলে খুব সচেতনভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তা নয়। কারণ যা ১৩৫১-তে ক্রমশ প্রকট হয়, তা তখনো এত সুস্পষ্ট ছিল না—বোঝা যায়নি বাঙলাদেশ কোন্ নির্লজ্জ শক্তির কবলে গিয়ে পড়ছে। স্বাভাবিক সহৃদয়তা ও মানববৃত্তিতেই সেই মন্বন্তরের দিনেও সাহিত্যিকরা সাড়া দেন—তা তাঁদের সুস্থ হৃদয়বৃত্তিরই পরিচয়, তাঁদের জীবন-পূজারই তা সহজ সাক্ষ্য—মানুষের অত বড় দুর্ভাগ্যে, সভ্যতার এমন পরাজয়ক্ষণে—

তাঁরা উদাসীন থাকেননি। ইতিহাস তাঁদের এই পরিচয় স্মরণ রাখবে—যতই সাময়িক হোক তাঁদের সৃষ্টি, যতই অপরিণত হোক তাঁদের প্রয়াস। ১৩৫১-তে দেখলাম—শিল্পীরা এই সাক্ষ্য বহন করে উপস্থিত হয়েছেন। গত বছরে আমাদের দেশে যত শিল্পপ্রদর্শনী হয়েছে ইতিপূর্বে তা এত বেশি হত কি না জানি না। সত্য বটে, এসব প্রদর্শনীরও পিছনে একটা চোরা আশা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হয়েছে—'দেশী-বিদেশী নতুন ভাগ্যবানদের কোনরূপে মুগ্ধ করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে নিই এ বেলা।' কিন্তু মোটের উপর শিল্পীরা নিষ্ক্রিয় থাকেননি—আর অনেক শিল্পীই নতুন জীবন-সৃষ্টির ও নতুন জীবনবোধের প্রমাণ দিতে লজ্জাবোধ করলেন না। যাঁরা শিল্পীর 'সামাজিক চেতনা' দেখলে বিরক্ত হন বা ব্যঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁরাও মানতে বাধ্য হন—এদের শিল্প অসার্থক নয়।

১৩৫১ জুড়ে শিল্পীদের মনে এই সামাজিক চেতনা নানাভাবে প্রকাশপথ খুঁজতে থাকে। তার প্রমাণ নানা নাট্যসংঘের জন্মে, এমনকি, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়। তারই বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মিলে গণ নাট্য-কলার সার্থক জাগরণে এবং গণ-নৃত্যনাট্যের অপূর্বপ্রয়োগে।

এ সময়ের সবচেয়ে বড় আশার লক্ষণ এই বাঙলার লোকশিল্পীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার আবার চেষ্টা হচ্ছে, সেই লোকশিল্প ও শিক্ষিত শিল্পের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে, আর বাঙলার শিল্প-সাহিত্যের বাহকেরা নিজেদের ঐতিহ্য ও দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হননি। "রবীন্দ্রনগরের" সংস্কৃতি উৎসবে এই সত্যই উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যেরও আভাস পেয়েছি, দিনের পর দিন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনতার সুশৃংখল আচরণ ও অকৃত্রিম রসবোধ থেকে জনশক্তি বাঁচবার শক্তি খোয়ায়নি, জাতি এখনো বাঁচতে চায়।

কিন্তু ভুলব না—সমাজক্ষেত্রে যে চোরাকারবারী ও চোরা-কর্মচারী রাজত্ব স্থাপন করেছে ১৩৫১-তে তারা সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তাদের আসন স্থাপন করছে। তাদের চোরা-নীতি বাঙলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে নানা কলহ ও অসূয়ার বেশে আত্মপ্রকাশ করছে। জেনে না জেনে শিল্পী ও সাহিত্যিক দল অনেকেই মিলন অপেক্ষা বিরোধের, ঐক্য অপেক্ষা দ্বন্দ্বের, ভদ্র সামাজিকতা অপেক্ষা অসামাজিক আত্মকেন্দ্রিকতার, শুভ সহযোগিতার অপেক্ষা অশুভ প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন। শিল্পীর রসোপভোগে, সাহিত্যের বিচারে, গণনাট্য ও নৃত্যনাট্যের সমালোচনায় তাই সংস্কৃতিগত আদর্শ, জীবনদৃষ্টি, জীবন-বোধ অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হচ্ছে না, চোরাবাজারী মনোভাব, নিতান্ত বৈষয়িক লাভালাভের খতিয়ান, নিজ নিজ শিল্প-ব্যবসায়ের ও সাহিত্য-ব্যবসায়ের হিসাব—এসবও বহুলাংশে বিচারক-সমালোচকদের প্রভাবান্বিত করছে; মুনাফার এই শিকারের নেশায় সংস্কৃতি-ক্ষেত্রেও বিভেদ-বিচ্ছেদ টানবার আয়োজন হচ্ছে।

এইটিও ১৩৫১ সালেরই এক ইঙ্গিত। বাঙলার সংস্কৃতি-জীবনের একাংশ চোরাকারবারীর ও চোরা-কর্মচারীর ছায়ায় আচ্ছন্ন—বাঙালী সাংবাদিক তাঁর গৌরবময় ঐতিহ্য আর বহন করতে পারছেন না। মুনাফার মৃগয়ায় তাঁরা এতটাই মত্ত যে, দেশী-বিদেশী সামরিক, বেসামরিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলে দু'দশ হাজার টাকা ক্ষতি-স্বীকার করতে আজ তাঁরা অস্বীকৃত, এমন কি, দেশী চোরাকারবারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে—বিড়লা বা ইস্পাহানী, সিংগানিয়া বা থাপর প্রমুখ বণিক্-রাজদের যেসব কার্যাবলী প্রমাণিত হয়েছে, সাধারণের সম্মুখে তা তুলে ধরতেও বাঙালী সংবাদপত্র অনিচ্ছুক। অন্যদিকে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়েছে,—শিক্ষক অনাহারে মরেছেন, জীবিকান্বেষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছেন। এমনি সময়ে বাঙলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে শিল্পী ও সাহিত্যিকরাই একমাত্র ভরসা। বাঙালী সংস্কৃতি, বাঙালী জীবনাদর্শ, বাঙালীর ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব এই শিল্পী ও সাহিত্যিকদের। তাঁদেরই কীর্তির মধ্যদিয়ে নতুন বাঙালী-শক্তির জন-জাগরণের সম্ভাবনা, বাঙালীর দেশপ্রীতির ও সমাজবুদ্ধির মানবধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা। [চৈত্র, ১৩৫৩]

সঙ্গীত উৎসব

গত ৫ই জানুয়ারী থেকে ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত ছ'দিন ধরে কলিকাতায় পূরবী চিত্রশালায় নিখিল ভারতীয় ভারতসঙ্গীত সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছে। উত্তরভারতের প্রধান প্রধান ওস্তাদেরা অনেকেই এসেছিলেন, প্রধান প্রধান 'ঘরানা'দের পরিচয় শ্রোতারা লাভ করেছেন। যেরূপ উচ্চ ধরনের ও বিচিত্র শিল্প-কলার পরিবেশন হয়েছিল তাতে বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয়—সঙ্গীতের প্রতি এদেশের সত্যকারের অনুরাগ আছে, এ শুধু একটা অভ্যাসগত অনুশীলন মাত্র নয়। বোম্বাইর কেশর বাঈ কেরকার ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁর শিষ্যা; খাঁটি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তিনি যেসব পরিচয় উপস্থিত করেন তাতে সঙ্গীতভক্ত মাত্রই মুগ্ধ হন। বোম্বাইর রোশেনারা বেগম গান স্বর্গীয় আবদুল করিম খাঁ সাহেবের পদ্ধতিতে। খাঁ সাহেব কর্ণাটকী ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটা সমন্বয় করেন, রোশেনারা বেগম তা উপস্থিত করেন শ্রোতাদের কাছে—সঙ্গীতরসিকেরা মুগ্ধ হয়ে শোনেন। লাহোরের গোলাম আলী খাঁর খেয়াল, আর তাঁর ঠুংরীও, মুগ্ধ না করেছে এমন লোক নেই। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, পটবর্ধন, গোয়ালিয়রের কৃষ্ণরাও, নারায়ণ রাও ব্যাস প্রভৃতি ভারতবর্ষের নমস্য সঙ্গীত-গুরুদের ভজন, খেয়ালও তাঁদের শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে। তাছাড়াও, খলিফা দবির খাঁর বীণা, গোয়ালিয়রের হাফিজ আলী খাঁ এবং আলাউদ্দীন খাঁর পুত্র আলী আকবর খাঁর সরোদ—নানা গুণী ও কলাবিদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত দু'দিন ধরে ক্রমাগত যা চলে, তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। সমালোচনা করা অবশ্য আরও অসম্ভব, কারণ তেমন শক্তি আমাদের নেই; আর যাঁদের আছে তাঁরাও কাগজের পাতায় লিখে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল বা রসবোধ মিটাতে পারেন না। এখানে সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে আমাদের যা বলবার তাই বলা যেতে পারে। প্রথমত কথা এই, এত গুণীর ও ওস্তাদের সমাগম হয়েছে, কিন্তু ব্যবস্থাপনাতে আরও একটু যত্ন নেওয়া সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় কথা, সঙ্গীতসম্মেলনের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, দেশের সাধারণ লোক ভালো গান শুনবার অবসর পাবে, আর তার ফলে দেশের সাধারণ লোকের রুচির ও জ্ঞানের উন্নতি হবে, তাহলে সম্মেলনের প্রবেশ দক্ষিণাও সাধারণ লোকের অবস্থানুযায়ী করা উচিত। হয়ত ওস্তাদদের দক্ষিণা প্রচুর দিতে হয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোক আজ ওস্তাদদের দক্ষিণা দিতে অসম্মত নয়। আপত্তি তাদের ব্যবসায়ীদের মুনাফাদারীতে। তৃতীয় একটি কথা, ওস্তাদদের আচরণ পরস্পরের মধ্যে এবং শ্রোতাদের সঙ্গেও শোভন হওয়া দরকার—এটাও স্বীকার্য।

"রাজসিক" চিত্রপ্রদর্শনী

অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টসের বার্ষিক শিল্পপ্রদর্শনী চলছে। অ্যাকাডেমি গোড়া থেকেই রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। এখনো ও. সি. -লাটসাহেব তা উদ্বোধন করেন, লাটগিন্নী তাতে চিত্র প্রদর্শন করেছেন (ভাগ্যক্রমে অবশ্য এখনকার লাট-গিন্নী সত্যই শিল্পরসিকা); রাজা-বাহাদুররা তাতে চিত্রাদি ক্রয় করেন—আর এখনকার বণিক্‌রাজেরাও তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছেন। এখানে চিত্রের তাই দাম ধরা হয় এ দেশের তুলনায় উঁচু হারে; চিত্র বিক্রয়ও হয় উঁচু দরেই; এবার নাকি এ প্রদর্শনীতে চিত্রাদি যেমন বিক্রয় হয়েছে তেমন বিক্রয় পূর্বেও হয়নি। এরূপ না হলে আশ্চর্য হতে হত,—দেশে টাকার জোয়ার চলেছে। শিল্পীদের ভাগ্য ভালো—তাঁদের কপালেও তার ছিটেফোঁটা জুটছে। অবশ্য ভাগ্যবান্ শিল্পীরা হয়ত সংখ্যায় দু'একজন। আর যা চিরদিনকার নিয়ম তাই হয়ত হয়েছে—যাঁরা ভাগ্যবান্ ছিলেন তাঁদেরই ভাগ্য হয়ত আরও খুলছে। এসব দেখে-শুনে বলতে পারি

অ্যাকাডেমির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর ভয়ের কারণ নেই। তাই বর্তমান সম্বন্ধেও আমরা নিঃসংশয় হয়েছি।

এবারকার প্রদর্শনীতে গিয়ে যা আশা করেছি তাই দেখেছি। মানে, নতুন বেশি কিছু দেখিনি, তবু এমন কিছু কিছু দেখেছি যাতে আনন্দও পেয়েছি। আশানুরূপই দেখলাম—শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহ ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দের প্রতিষ্ঠা ও কৃতিত্ব। সতীশ সিংহ মহাশয়ের "শকুন্তলা" বড় হলের পূর্ব প্রাচীর জুড়ে আছে—আকাশ, পাতা, রং নিয়ে তাঁর নিজের ধরনের এক খেলা এই ছবিতে। ভালোই লাগল—শুনেছি ভালো দামও উঠেছে। আরও অনেক ছবি তাঁর আছে—'মহাত্মা গান্ধীকেও তিনি বাদ দেননি। আজ 'মহাত্মাজী'র ছবির একটা বাজার দর আছে, শিল্পীদের অনেকের তা ভোলা সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিপত্তি ও তাঁর বর্ণ-বিন্যাস সুপরিচিত। তাঁর একখানা প্রতিকৃতিতো চোখে পড়লোই। দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্তীও প্রাকৃতিক অঙ্কনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাতে সংশয়ের কারণ দেখি না। রমেন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর গুরু নন্দলাল বসুর মতোই নানা পথে নানা পদ্ধতিতে চলতে উৎসাহী। শিল্পী মনের পক্ষে তা স্বাভাবিক বলে ও মানে, বিশ্বাস—বিচিত্র পথে চলতে সে খণ্ডিত হয়ে যায় না, বরং আপনাকেই প্রকাশ করে চলে। আমাদের চক্ষে কিন্তু তাঁর 'প্যারিস ১৯৩৯', তাঁর 'ভারতীয়' পদ্ধতিতে অঙ্কিত 'রামলীলা' বা 'হোলীর' থেকে কম তৃপ্তিদায়ক মনে হল না, আর বিপুবাবুর 'মহাবাজার' প্রতিকৃতিতেও কৃতিত্বের ছাপ রয়েছে। কিন্তু প্রতিকৃতির দিক থেকে শিল্পী অতুল বসুর অঙ্কিত 'লেডি মুখার্জিই' এবার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অতুল বাবু পোর্ট্রেটে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু এরূপ চমৎকার পোর্ট্রেট তিনিও বেশি আঁকেননি। এবার নতুন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ছাপও চোখে পড়ে হনুমিয়া, সমর ঘোষ (ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রের জন্য তাঁর 'শকুন্তলাই' প্রথম পারিতোষিক পেয়েছে), দিলীপ দাশগুপ্ত প্রভৃতির কাজ। ভাস্কর্যের নিদর্শন তেমন ভালো নেই প্রায়ই পুরনোও। কিন্তু কয়েকখানা শক্তিশালী ড্রয়িং প্রদর্শনীতে 'গরীব আত্মীয়ের' মতো কুণ্ঠিতভাবে রয়েছে,—প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ হয়ত তাদের জন্য লজ্জিত,—তা' গরীবদেরই ছবি,—হয়তো আবেদীনের আঁকা। রাজ রাজড়ার প্রদর্শনীতে দুঃস্থদের টানা একটু বিসদৃশ। আমরা কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম জয়নালের বলিষ্ঠ রেখা।

অনেকক্ষণ দেখেও এই প্রদর্শনীতে আর কি দেখলাম তা মনে করতে পারছি না। 'ভারতীয় পদ্ধতিতে'ও দেখলাম সেই একই পঙ্ক্তিতে পুনরাবৃত্তি। শেষটা কি এখানেও 'ছোট, ছোট ভোটসই' চলবে নাকি? কিন্তু ভীড় বেশি অন্য ঘরেই; সেখানেই সমারোহ, ক্রয় বিক্রয়ের আসল কারবার। সেখানে উল্লেখযোগ্য শিল্প-নিদর্শন অপেক্ষাও উল্লেখযোগ্য শিল্প-ক্রেতাদের চক্ষু দেখলাম। বুঝলাম, ইনফ্লেশান মিথ্যা নয় এবং ভারতীয় ধনিকও আবার কাঁচা সোনার দর ও কদরও বুঝে উঠেছেন। সেদিকে অ্যাকাডেমি সার্থক হচ্ছে। শিল্পীদেরও কি ভাগ্য ফিরছে? একজন শিল্প-রসিক বললেন, 'বিশ বছরেও অমুক শিল্পীর জীবন ভেজা কাপড় শুকোল না।' আমাদের একজন বন্ধু জানালেন, 'শুকাবে না—যত দিন রাজা-রাজড়ারা আছে।'

রাজা-রাজড়ার পার্শ্বে পার্শ্বে আজ বণিক্‌রাজারাও এসে গেছেন শিল্পের হাটে। কাপড় আর শুকোবে না। কিন্তু শিল্পীদেরও একটা কথা নিবেদন করতে চাই—বড় লোকের মুখাপেক্ষী না হয়েও শিল্পীরা আজ চলতে পারেন। সেকালে কবি, শিল্পী, ওস্তাদ এঁদের রাজ-রাজড়ার দরবারে প্রসাদ সংগ্রহ করতে হত, সেকাল পশ্চিমে চলে গেছে' এদেশেও যাচ্ছে। এদেশের সাহিত্যিকরা আজ সাধারণ পাঠকের দাক্ষিণ্যকেই শ্রেয় ও প্রেয় মনে করেন, বড় লোকের দাক্ষিণ্য আর কামনা করেন না। সঙ্গীতের ওস্তাদ ও শিল্পীরা অতটা জন-সাধারণের উপর নির্ভর করতে এখনো সাহস পাচ্ছেন না;—এখন পর্যন্ত এদিকে তাঁদের ভরসা বড় লোকের প্রতিকৃতির অর্ডার, দরবারে বা ইস্কুলে চাকরি, কিংবা এমনিতর প্রদর্শনীতে শিল্প বিক্রয়; ওস্তাদদের সম্মেলনে গাওয়া। এখনো চোখ তাঁদের বড় লোকের উপরে—তাই শিল্পীরা ছবির দাম করেন ইচ্ছামতো,—কালে ভদ্রে একখানা কোনো রাজবাহাদুরকে গছাতে পারলেই যাবে কিছু দিন। কিন্তু সস্তা দাম করলে হয়ত একটু রুচিশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা তাঁদের ক্রেতা হতে পারত। আর তাহলে সেইরূপে দেশের সাধারণ শিল্প-রুচিও একটু উন্নত হত—

তাতে দর্শকও সত্যই চিত্রের মর্যাদা বুঝেছে। শিল্পীও তার ফলে পেয়েছেন গুণগ্রাহী দর্শকসাধারণ। সাহিত্যের বেলা এই পরিবর্তনই এনেছে এদেশে. তাতেই সাহিত্যের সত্যই একটা প্রশস্ত সমুন্নত আসর তৈরী হয়েছে। শিল্পের বেলা শিল্পীরা সাহস করে তা তৈরী করতে না লাগলে জন-সাধারণের শিল্প-শিক্ষাও সম্ভব নয়, শিল্পেরও সত্যই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে না। তা মুখ চেয়ে থাকবে রাজা-রাজড়ার, পুরানো বড় লোকের আর নতুন বড় মানুষের।

বনিয়াদী শিক্ষা

সম্প্রতি যেসব উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে ১১ই জানুয়ারী থেকে সেবাগ্রামে "হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের" যে অধিবেশন হয় তাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে। সেখানে তখন "বনিয়াদী শিক্ষা" সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাতে বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক কর্মী আসেন তাঁদের জন্য শিক্ষাশিবির খোলা হয়। সংঘের সেক্রেটারী বিভিন্ন প্রদেশে "বনিয়াদী শিক্ষার" পরীক্ষা, প্রসার, ও প্রচেষ্টা বিবৃত করে ছয় বৎসরের (১৯৩৮-৪৪) রিপোর্ট দেন। বিভিন্ন প্রদেশের "তালিমী সংঘের" প্রতিনিধিরাও নিজেদের কাজের রিপোর্ট দেন—যেমন, বাঙলাদেশে ৯টি বিদ্যালয় চলেছে, ৬টি মেদিনীপুরে, ১টি ঢাকার রাজপুরে, ১টি বর্ধমানে, ১টি ফরিদপুরে বাজবাড়িতে। তাছাড়াও নানা কমিটিতে "প্রাক্-বনিয়াদী", "বনিয়াদী" ও "উত্তর-বনিয়াদী", তিন স্তরের শিক্ষা, এবং বয়স্কদের বিবিধ শিক্ষা বিষয় ও পদ্ধতি নিয়ে নানা আলোচনা হয়। গান্ধীজীর উপদেশ মত এই শিক্ষাকে একেবারে পল্লী উন্নয়ন শিক্ষায় পরিণত করবার প্রস্তাব হয়েছে। সেবাগ্রামে এরূপ শিক্ষকদের শিক্ষাকেন্দ্র চলবে। নানাস্থানে শিক্ষার্থীরা গিয়ে শতখানেক টাকা বেতনে শিক্ষাকেন্দ্র চালাবেন, সেরূপ নিয়ম হচ্ছে,—এসব সংবাদ মোটামুটি আমরা পেয়েছি। তা, বোধহয় বললে অন্যায় হবে না—সাধারণ এই শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের অনেকের কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা নেই। আমরা জানি—এ বুঝি শুধু ধরা-বাঁধা একটা গান্ধীবাদী শিক্ষা পদ্ধতি। তাই ভেবে অনেকে এই শিক্ষা পদ্ধতিকে বিচার বিশ্লেষণ না করেই সরাসরি সমর্থন করি, আবার কেউ কেউ বিচার-বিশ্লেষণ করি না, মনে মনে একটা সংশয় পোষণ করেই নীরব থাকি। অবশ্য, শিক্ষাব্রতীরা অনেকে এই বনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সত্যই চিন্তা করেছেন, তাদের কেউ কেউ এবার সেবাগ্রামে উপস্থিতও ছিলেন। আর গান্ধীবাদ যাঁরা জীবনের আদর্শ করেছেন তারা তো এ শিক্ষাকে গ্রহণ ও প্রচার করবেনই। কিন্তু দুএকটি মোটা কথা এই 'বনিয়াদী শিক্ষার' নিয়ম সম্বন্ধেও আমরা মনে রাখতে পারি—অন্ততঃ শিক্ষার পরিকল্পনায় বা পাঠ্য নির্বাচনে কোনো রকম গোঁড়ামি বা সৃষ্টিছাড়ার চিহ্ন নেই। বনিয়াদী শিক্ষার এই নিয়ম নিয়ে তাই দেশী রাজ্যগুলিও পরীক্ষা করেছে, এবং ভারত সরকারের সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসারি বোর্ডের প্রস্তাবও মোটামুটি এই জাকির হোসেন কমিটির মূল রিপোর্টকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। তবে অবশ্য কার্যক্ষেত্রে এক এক স্থানে এক এক কর্তৃপক্ষ এক এক ভাবে এই নিয়মের প্রয়োগ করবেন, তার উপরেও এই শিক্ষার সফলতা বা বিফলতা বহুলাংশে নির্ভর করবে- সেখানে হয়ত গোঁড়ামি বা আক্ষরিক নিষ্ঠা দেখাও দিতে পারে। মোটামুটি ভাবে এই নিয়মের উদ্দেশ্য বর্তমানে অনেকেই মানবেন। যথা, প্রথম কথা, সাত বছরের মত প্রাথমিক, অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা চাই, দ্বিতীয়ত, সে শিক্ষা হবে কাজের বা কারু বিদ্যার মারফতে, আর সে শিক্ষার সঙ্গে সমাজ ও পরিবেশের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকাও দরকার। তৃতীয়ত, আর্থিক ভাবেও এ শিক্ষাকে স্ব-নির্ভর হতে হবে। এই তৃতীয় কথায় যাঁরা আপত্তি করেন তাঁরা আশ্বস্ত হবেন জানলে যে, এই কথার মানে এ নয় যে, ছাত্রদের ফ্যাক্টরির মজুরের মত খাটিয়ে মুনাফা আদায় করা চাই। তাদের জীবিকার্জনের উপযোগী করার জন্যই এ ব্যবস্থা। অবশ্য নইলে যে টাকার অভাবেই এ শিক্ষা ব্যবস্থা ঠেকে থাকবে তাও সত্য। শেষ উদ্দেশ্য—সত্য ও অহিংসার উপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। এই কথায় কেউ আপত্তি করবেন না; কিন্তু

অনেকেই মনে মনে বিশেষ জোর দেবেন না, এরূপ সন্দেহ হয়। কিন্তু এইটিই গান্ধীবাদের মূল কথা। তার বাস্তব উদ্দেশ্য হল দেশের সাত লক্ষ গ্রামে শিক্ষা-বিস্তার, নতুন করে তাতে জীবনী সঞ্চার, আমাদের পল্লীকেন্দ্র সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য পল্লীকে বাঁচিয়ে তোলা। কে তা না চায়? অবশ্য আমরা জানি, পল্লী বেঁচে উঠলে আধুনিক কালে তা ছোট ছোট সুস্থ এবং শান্ত শহরে প্রায় রূপান্তরিত হবে—যেমন হচ্ছে সেবাগ্রাম।

বনিয়াদী শিক্ষা ও তার আদি, মধ্য, অন্ত প্রভৃতি স্তর ও শিক্ষার বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। মনে রাখা দরকার—শিক্ষা চাই, সমাজ ও রাষ্ট্র যতক্ষণ না বদলাচ্ছে ততক্ষণও চুপ করে থাকতে পারব না, এ বুঝেই,—এই বাস্তব অবস্থা মনে রেখেই—একটা বাস্তব ও সার্বজনীন শিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে। সে পরিকল্পনা নিশ্চয়ই এ সমাজ ও তার মানুষকে আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী করবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতনতম দানকে কার্যত গ্রহণ করতেও তাদের উৎসাহ দেবে, কলকারখানাও অগ্রাহ্য করবে না। বাঙলাদেশে যেটুকু শিক্ষার সুযোগ ছিল, গত দু'বৎসরে তারও অনেকটা ধসে গিয়েছে; ইস্কুল, পাঠশালা কি আছে, কি নেই—তার ঠিকানাই নেই। তাই নতুন করে শিক্ষার গোড়াপত্তন করতে গেলে অনেকাংশেই সে এরূপ একটা 'বনিয়াদী শিক্ষা' এখানকার মত গ্রহণ করতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষত, যে-সব বয়স্ক মেয়ে ও পুরুষ দুঃস্থ হয়েছে তাদের জীবনক্ষেত্রে পুনপ্রতিষ্ঠা করতে হলে একটা না একটা বৃত্তি-বাহন শিক্ষাই দরকার।—অবশ্য সেজন্য শিক্ষা ছাড়াও দরকার অনেক কিছুর। আর, তাছাড়াও, এ শিক্ষাপদ্ধতিরও স্থানকাল ভেদে পরিবর্তন দরকার। কিন্তু মোটামুটিভাবে বলতে হবে—বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের আরও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করাই প্রথম প্রয়োজন। [মাঘ, ১৩৫১]

বাঙালী উর্দু কবিতা

৩১শে ডিসেম্বর, কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে উর্দু কবি হালির ত্রিশতিতম স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। কবি হালি জন্মান সিপাহী বিদ্রোহের বিশ বৎসর পূর্বে ১৮৩৭ সালে; আর ১৯১৪তে গত মহাযুদ্ধের প্রথম দিকেই তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি দেশের এক যুগান্তর ও জাগরণ দেখে যান,—আর উত্তর ভারতে সেই নবযুগের উদ্বোধনে তাঁর দান ছিল সমধিক। উর্দু সাহিত্যের জগতে তিনি এক নতুন যুগের সূচনা করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'মুসাদ্দস্' প্রকাশিত হয়—ইসলামের জোয়ার-ভাটা নিয়ে লিখিত এ কাব্য এখনও উর্দুর মহাসম্পদ—তা পাঠ করে স্যর সৈয়দ আহমদ খাঁ প্রভৃতি মুসলিম নবযুগের প্রবক্তারা উদ্বুদ্ধ হন—উর্দু কবিতা হালির হাতে নতুন হয়ে উঠে পুরানো কৃত্রিম বাকচাতুর্য ছেড়ে দেয়।

এ স্মৃতি-সভার আয়োজন করেছিলেন বাঙলার আঞ্জুমান-এ-তরক্কী-এ উর্দু। এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। কারণ, আমরা বাঙালীরা অধিকাংশেই উর্দু জানি না, অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানও উর্দু জানেন না। দু'চার জন শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান যা জানেন, তাও তত গভীর নয়। কিন্তু উর্দু একটি জীবন্ত ভাষা বিশেষত হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারের চেষ্টায় এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ্য বই যথেষ্ট রচিত হয়—অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় সে সব বই তত রচিত হয় না। তাই এ ভাষার কবি ও লেখকদের সঙ্গে পরিচয় রাখলে আমরা সব রকমেই উপকৃত হব। কিন্তু আমাদের এ পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পারেন উর্দুজানা শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানরাই। কারণ, সাধারণ বাঙালীর পক্ষে এদিকে প্রথম বাধা উর্দু বর্ণমালা, দ্বিতীয় বাধা ফারসী আরবী শব্দের প্রাচুর্য। ইচ্ছা থাকলেও এ সব বাধা উত্তীর্ণ হওয়া আমাদের অনেকের পক্ষে সহজ হয় না। জানি না উর্দু কবিতা ও সাহিত্যের বাংলায় অনুবাদ সম্ভব কি না। মোঃ মুজানুর রহমান-এর ইংরেজিতে লেখা পুস্তিকায় হালির কবিতার যে নিদর্শন দেওয়া হয়েছে, তা মোটেই ভীতিপ্রদ নয়, অনুবাদের অযোগ্যও হতে পারে না। যেমন ঃ

"তুম্ আগার্ চাহ্ তেহো মুল্‌কে্ কি খয়ের্
না কিসি হম বতন্ কো সম্‌ঝো গৈর,
হো মুসলমান উসমে ইয়া হিন্দু
বুধ্ মজ্‌হব্ হো কেহ্ হো ব্রাহ্মো
সব্‌কো মিঠি নেগাহ্‌সে দেখো
সম্‌ঝো আংখুকি পুট্‌লি সবকো।"

কিংবা—

শক্তি ভি শান্তি ভি ভগ্‌তোঁ কে গীত মে হ্যায়
ধর্‌তি কে বাসিও কি মুক্‌তি পিরিত মেঁ হ্যায়।

এই উর্দু ভাষা অবশ্য আমাদের পক্ষেও বোঝা সম্ভব। হয়ত পরবর্তী সময়ে উর্দু আরও ফারসী-আরবীতে ভরতি হয়ে উঠেছে; যাই হোক, এ ভাষার সম্পদকে বাঙালীর নিকট সুপরিচিত করার দায়িত্ব বাঙালী মুসলমানের।

এ প্রসঙ্গে বাঙালী মুসলমান উর্দুর চর্চা করবে কি বাংলার চর্চা করবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। যা তাঁদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক, তাই তাঁরা করবেন, তাঁরা নিজেরাই দেবেন সে প্রশ্নের উত্তর;—আর সে উত্তর তাঁরা দিচ্ছেনও। শখ হিসাবে আমরা অনেক ভাষা চর্চা করতে পারি, প্রয়োজনে ইংরেজীতেও কলম পিশি—কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করতে পারি সেই ভাষায় যে ভাষায় স্বাভাবিকভাবে জন্ম অবধি কথা বলি,—যাকে বলি 'মাতৃভাষা' বা 'স্বভাষা'।

বিজ্ঞানের স্বরাজ

বৎসরে বৎসরে এ সময়ে যে সব সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয় তার মধ্যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন প্রধান বলে গণ্য হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চা ক্রমশই সুস্থ এবং জীবন-নিষ্ঠ হচ্ছে, শুধু মাত্র অ্যাকাডেমিক বা ল্যাবরেটরির গবেষণার বিষয় হয়ে থাকছে না। অবশ্য 'বিজ্ঞানের স্বরাজ' এ দেশে কেন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এখনো সম্পূর্ণ লাভ হয়নি। বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কার অনেকাংশে ধনিকবর্গের স্বার্থেই চলে। এদিকে আমাদের দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হবারই কথা। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় বিজ্ঞানের স্বাভাবিক বিকাশ এখানে সম্ভব হয়নি। দেশ স্বরাজ-লাভ করলে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকরা সত্যই একটা সুস্থ পরিবেশ পেতেন; তখন এ দেশে বিজ্ঞান স্বাভাবিক ধারায় বিকাশলাভ করতে পারত। এই চেতনাও বৈজ্ঞানিকদের মনে বেশ প্রবল ও তীব্র হয়ে আজ দেখা দিচ্ছে। অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর প্রমুখ ভারত-বর্ষের যে বৈজ্ঞানিক দল ব্রিটেন হয়ে সম্প্রতি আমেরিকা গিয়েছেন তাঁদের নানা কথাবার্তা, বক্তৃতা, আলোচনায় তাঁরা এই সত্যকে বেশ সুস্পষ্টভাবেই সে সব দেশে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শান্তি-স্বরূপ ভাটনগরের এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে সভাপতি হবার কথা ছিল। তাঁর লিখিত অভিভাষণ সেখানে পঠিত হয়, তা ছাড়া তিনি আমেরিকা থেকে বিশেষ সন্দেশও এই উপলক্ষে অধিবেশনে পাঠিয়েছেন। তাতে এ দেশের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা আলোচিত হয়েছে। সভাপতি মহাশয়ের দু'একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন "ভারতের নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেতভাবে শিল্প গবেষণা-কাউন্সিল গঠন করা উচিত।" ভারতীয় শিল্পপতিদের এ বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। "ভারতের দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে কৃষিই যথেষ্ট নয়। ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক যদি কৃষি ছেড়ে অন্য ব্যবসা অবলম্বন না করে তাহলে স্বাস্থ্যবান, উন্নত, আত্মসম্মানমূলক ভারত গঠন করা সম্ভব নয়।" কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের চেষ্টা বরাবরই এর বিপরীত—তার লক্ষ্য ভারতবর্ষ কাঁচা মালের দেশ ও বিলাতী শিল্প-জাতের বাজার হয়ে থাক। এ যুদ্ধের পরেও চার্চিল প্রমুখ ব্যক্তিদের সেরূপ চেষ্টাই প্রবল হবার

কথা। স্যার শান্তিস্বরূপ প্রস্তাব করেছেন যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি কমিটির মত আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সভার সঙ্গে একটি 'বৈজ্ঞানিক কমিটি' সংযুক্ত থাকা উচিত। তা হলে আমাদের আইন সভার প্রতিনিধিরা কৃষি, শিল্প, খাদ্য, স্বাস্থ্য, টেকনোলজি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকতে পারেন, অবশ্য যদি সত্যই সদস্যদের তেমন ইচ্ছা থাকে। স্যার শান্তিস্বরূপের অন্য কথা এই, দেশ-বিদেশে বিজ্ঞানের যে উন্নতি হচ্ছে তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য ওয়াশিংটনে, লণ্ডনে এবং সম্ভবত মস্কোতে বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ রক্ষার অফিস প্রতিষ্ঠায় গভর্ণমেণ্টকে রাজী করাতে হবে। দুটি প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু বর্তমান ভারত গভর্ণমেণ্ট তা কতটা গ্রহণ করবে, অন্তত মস্কোর সঙ্গে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকদের যোগাযোগে যে রাজী হবে—তা আশা করা যায় না। এ সরকার সময় মত কিছুই করতে পারে না। যুদ্ধ একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়লে এ দেশে একটি বোর্ড অব্ সায়েণ্টিফিক্ এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ গঠিত হয় সত্য, কিন্তু তারপর থেকে মার্কিন মুলুকে এবং কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকায়ও যে-তালে শিল্পোন্নতি ঘটেছে ভারতবর্ষে তার মত কিছুই ঘটেনি। বরং ও-সব দেশে এরূপ উন্নতি হওয়ায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক গবেষণার জন্য তাগিদ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে কমে গেছে। দিনের পর দিন এ দেশের যে কোন গবেষণায় বিলাতের উদ্বৃত্ত বিশেষজ্ঞ আমদানী করা চলছে। তবু এর মধ্য দিয়েও ভারতীয় শিল্প ও ভারতীয় বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে, আর শিল্পপতি ও বৈজ্ঞানিকরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন, তাতে সন্দেহ নেই। স্যার শান্তিস্বরূপ এ সব বুঝেই বলেছেন, "ভাবতে জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই যে জাতীয় উন্নতির জন্য প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।" জাতীয় সরকারের জন্য যাঁরা তাই সক্রিয়, বৈজ্ঞানিকরা বুঝতে পারছেন যে, তাঁরাও এ দেশে বিজ্ঞানেরই উন্নতির পথ তৈরি করছেন। যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে একজন ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক—জে. ডি বার্ণেল—বলেছিলেন: Probably the best workers for Indian science today are not the scientists but the political agitators who are struggling towards this end আমাদের বৈজ্ঞানিকদের বর্তমান প্রচেষ্টা দেখে মনে হয়, আমরা উপরের কথাটাকে একটু সংশোধন করে বলতে পারি—are also the scientists in addition to the political agitators.

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙালীত্ব

গত ২৬শে চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভা যথানিয়মে পালিত হয়। স্যার যদুনাথ সরকার সভাপতিত্ব করেন। স্যার যদুনাথ তাঁর অভিভাষণে বলেন:

"বঙ্কিম চাহিতেন বাঙ্গালীকে—বাঙ্গালী কেন সমস্ত ভারতবাসীকে সর্বদিকে বড় করিতে—জ্ঞান, বিজ্ঞানে, সংস্কৃতিতে, বাহুবলে ও বুদ্ধিতে, একতাবন্ধনে ও কর্ম করিবার শক্তিতে, রুচি ও শুচিতায় প্রকৃত পূর্ণ মানুষ করিয়া তুলিতে—শুধু গল্প দিয়া, মনোরঞ্জন করিয়া নহে। সত্য বটে বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি। তাঁহার আনন্দমঠ আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বেদ বা আদিগ্রন্থ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ক্ষুদ্রচেতা, কোণঠেসা একজন বিদেশ-দ্বেষী ছিলেন না। মনের সমস্ত দ্বার অবাধে খুলিয়া দিয়া আত্ম-অনুশীলন করা তাঁহার কাছে দেশদ্রোহিতা বলিয়া মনে হইত না, বরং তিনি উহাকে দেশসেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য করিতেন।" আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা সংস্করণ, বুধবার, ২৭শে চৈত্র, ১৩৫২।

কথা কয়টি অত্যন্ত সত্য। তবে এবারকার বৎসরে বঙ্কিম সম্পর্কে এই কথা বলা স্যার যদু-নাথের পক্ষে শুধু সত্যনিষ্ঠার নয়, সাহসেরও পরিচায়ক। নানা কারণে আমাদের "অখণ্ড ভারত" প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে আবার "বাঙালীয়ানার" বা বাঙালী-দর্পের বাড়াবাড়িও এ সময়ে দেখা দিয়েছে। ও'দুটি ভাবের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে, তাও আমাদের চোখে পড়ে না। এ সময়ে বঙ্কিমের জাগ্রত মন, তাঁর জিজ্ঞাসা ও তাঁর প্রতিভার স্বরূপ নির্দেশ করে স্যার যদুনাথ ওরূপ মিথ্যা দর্প ও মোহ থেকে

আমাদের মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। একথা আমরা সবাই জানি, বঙ্কিম পাশ্চাত্য সাহিত্য ও চিন্তার মধ্য দিয়ে নতুন পৃথিবীর পথ দেখতে পান। অত্যন্ত দেশভক্ত বঙ্কিম নিজের দেশাভিমান ও স্বাজাত্যের টানে চাইলেন প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও ঐতিহ্যকে এই নতুন কালের নতুন জীবনযাত্রার সমর্থক ও সহায়ক সত্য রূপে দাঁড় করাতে। তাঁর কৃষ্ণ চরিত্র ও অনুশীলন তত্ত্ব ব্যাখ্যায় তাঁর এই প্রবল দেশভক্তির ও প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়। তত্ত্ব হিসাবেই তা বঙ্কিমের কৃতিত্বের প্রমাণ। কিন্তু তত্ত্ব এক কথা, আর সত্য আর এক কথা। তাই তাঁর শ্রীকৃষ্ণ বা অনুশীলন আমাদের জাতি-গঠনে গ্রাহ্য হয়নি। বরং গ্রাহ্য হয় তাঁর 'বন্দেমাতরম্' বা তাঁর পরিকল্পিত সেই মাতৃরূপ। বলা বাহুল্য, এ দেশমাতা বঙ্কিমের পরিকল্পনায় ছিলেন "বঙ্গ আমার, জননী আমার"—"অখণ্ড ভারত" নয়। অবশ্য এরূপ পরিকল্পনা বিশেষ ভাবে হিন্দু-ঐতিহ্য সম্মত,—আর মুসলমান-ঐতিহ্যে অগ্রাহ্য তাও আমরা মনে মনে বুঝি। তবে তখনকার স্বাজাত্য অনেকাংশেই 'হিন্দু-স্বাজাত্য' ছিল, সেজন্য বঙ্কিমও একা দায়ী নন। কিন্তু যা বঙ্কিমের এ-দিকে কৃতিত্ব তা এই ঃ তাঁর "বাঙালী জাতীয়তাবাদে" ও "হিন্দু স্বাজাত্যে" এরূপ সংকীর্ণ "বাঙালী দর্প" বা "অখণ্ড হিন্দুস্থানী" উগ্রতা ছিল না, তাই বাঙালী বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" সমস্ত ভারতবর্ষের মাতৃরূপের পরিকল্পনা বলে সহজেই ভারতবর্ষের অন্য জাতিদের দ্বারাও গ্রাহ্য হল। এমন কি, হিন্দুর পক্ষে 'বন্দেমাতরম্'কে সমস্ত পৃথিবীরই ধ্যানরূপ বলেও গ্রহণ করতে বাধা হয় না। বঙ্কিম আসলে বাঙালী ছিলেন মনেপ্রাণে, এবং বুঝেছিলেন—বাঙালীকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত দান অঙ্গীকার করেই বাঙালী হতে হবে। [বৈশাখ, ১৩৫৩]

বিক্ষোভের হিসাবনিকাশ

পাঠক মাত্রেই জানেন গত ২১শে নভেম্বর, ১৯৪৫ বুধবার থেকে গত ২৩শে নভেম্বর, শুক্রবার পর্যন্ত কলিকাতার জনসাধারণের মন কতটা অশান্ত ও তাদের জীবনযাত্রা কতটা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। অবশ্য মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে সম্ভবত ঘটনাবলী যথাযথ বোঝা সহজে সম্ভবপর হয়নি। তার প্রধান কারণ বাঙলাদেশের সংবাদপত্র আজ সংবাদ সরবরাহ করে না, সংবাদকে ঢেলে সাজিয়ে ব্যক্তি বা দল বিশেষের প্রচারের উপযুক্ত করে তা পরিবেশন করে। কথাটি সংস্কৃতি-অনুরাগীদের পক্ষে গুরুতর। স্থানাভাবে ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়, আর তা না করলে তর্ক-বিতর্কের অবকাশ থাকে। তথাপি জাতীয় সংস্কৃতির ছাত্র হিসাবে কলকাতার এই কয়দিনের ঘটনার অর্থ আমাদের সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম ও প্রধান কথা অবশ্য এই যে, কলকাতার ছাত্ররা এবার যে সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের এতদিনকার আন্দোলনের ইতিহাসেও তা অসাধারণ। নিরস্ত্র জনতার পক্ষে লাঠির বা গুলির সম্মুখে না দাঁড়াতে পারা আমরা মোটেই অস্বাভাবিক মনে করি না। তবু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। লাঠির সামনে মাথা পেতে দিয়ে, গুলির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে এ দেশের লোক মাঝে মাঝে দেখিয়েছেন তাঁদের স্বাধীনতার প্রেরণা কত তীব্র ও সাহস কত প্রবল। পৃথিবীর অন্য দেশেও তেমন দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। এরূপ তেজস্বিতার ফলে রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন হয়নি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই রাজনৈতিক শক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আরও বর্ধিত হয়েছে। ছাত্ররা বুধবার ও বৃহস্পতিবার আমাদের সেই ইতিহাসেরই আর একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এ-জন্য তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে আমাদের যে ত্রুটি দেখা গিয়েছে, তা এই সঙ্গে পরিষ্কার করে না বুঝলে অন্যায় হবে। নিজেদের ত্রুটির কথাই আমরা বলব, পুলিসের বা সাম্রাজ্যবাদীদের মূর্খতা ও কাপুরুষতার কথা বলব না। কারণ, তারা অন্যরূপ আচরণ করলেই তা হত ব্যতিক্রম। আর তাদের এই নির্বুদ্ধিতা ও অমানুষিকতা পরোক্ষে আমাদের শক্তিকেই সুদৃঢ় করে তোলে। সেই

শক্তি প্রমাণিত হবে এখন এই অত্যাচারীদের শাস্তি বিধানের স্থির ব্যবস্থায়, আর অত্যাচারের মূলোৎপাটনের বৈপ্লবিক আয়োজনে। দুইই হচ্ছে প্রধানত আমাদের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেদের ত্রুটিগুলিও সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রধান ত্রুটি যা এবার দেখা গেল তা হচ্ছে দেশের নেতাদের। গত দু'তিন মাসে তাঁরা দেশের উপর দিয়ে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার প্লাবন বইয়ে দিয়েছেন। তাঁরা কেউ অর্বাচীন নন, কাজেই এ প্লাবন পুলিসের লাঠি ও বন্দুক দেখে উদ্বেল হয়ে উঠলে তাঁদের চমকিত হওয়া সাজে না। ছাত্রদের সেদিনকার বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা যে এত বলিষ্ঠ হতে পারল তার জন্য নেতারাও গৌরব করতে পারতেন; আর তা যে সর্বাংশে সুনিয়ন্ত্রিত রইল না, সে দায়িত্বও নেতারা সঙ্গে সঙ্গে আংশিকভাবে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে নেতার পর নেতা বুধবার ও বৃহস্পতিবারের সমস্ত বিক্ষোভ-প্রকাশকেই 'শুধু প্ররোচকের কান্ড' বলে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন, এবং ছাত্রসাধারণের মাথায় এক মূর্খতার ও গ্লানির বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁর বুধবারের বাণীতে গুলি-বর্ষণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বললেন না, তাতে পরোক্ষে তাই সাম্রাজ্যবাদীদের অপপ্রচারও পুষ্ট হল। তিনি ববং বললেন, প্ররোচকের খেলার পুতুল হয়েছে বুধবারের ছাত্রদল। কিন্তু পরিষ্কার বথা এই, মোটামুটি ছাত্রদের আচরণে গৌববের জিনিসই ছিল, অগৌরবের কিছু ছিল না। এমন কি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন পর্যন্ত কলকাতার বিক্ষুব্ধ জনতা কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি, তখনো শহর একেবারে নানা দায়িত্বহীন লোকেব হাতে গিয়ে পড়েনি। কিন্তু বুধবার থেকেই নেতাদের কণ্ঠে যে সুর ফুটল তা হচ্ছে মূল ছাত্র-বিক্ষোভকেও বিকৃত করে দেখাবার সুর, কারো ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা। স্বভাবতই এই সুবেরই জের দূর থেকে পরে স্বয়ং মৌলানা আজাদও টানলেন, এবং পণ্ডিত জওহরলালও টানছেন—যেন কংগ্রেসের নির্বাচন ও "ভাবী সংগ্রামকে" ব্যর্থ করে দেবার ইচ্ছাতেই বুধবার কলকাতার ছাত্রবা মিছিল বের করেছিলেন, লাঠিব সামনে মাথা নোয়াননি, গুলির সামনেও পালাননি।

সত্য বটে, বৃহস্পতিবারের অপবাহু থেকে ছাত্রদের বিক্ষোভ শেষ হয়ে সাধারণের উন্মাদমতা বাড়ে; কোথাও কোথাও চ্যাংড়া ও বখাটেদের বাঁদরামোও শুরু হয়। শুক্রবারে শহরের গুন্ডা আর বখাটেরাও এই জনবিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করে, জন উদ্দীপনার একটা বিশ্রী পরিণতিও ঘটতে থাকে। তার কারণ, গোড়া থেকেই এই বিক্ষোভের ও নেতাদের পূর্ববর্তী দীপ্ত ভাষণের মধ্যেই ত্রুটি ছিল। সে ত্রুটি মৌলিক—নেতাদের সুচিন্তিত কোন প্ল্যান নেই। ছাত্র মিছিলেবও মাথায় কোনো প্ল্যান ছিল না—বাধা পাওয়াতে হঠাৎ একটা জিদ্ তাঁদের চেপে গেল—"লাল দীঘি।" শুধু তাঁরা একটা সাময়িক উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হতে পারলেন, কিন্তু নেতারা ছাত্রদের এই কৃতিত্বটুকুও স্বীকার করতে রাজী নন। এ ত্রুটিই আমাদের নেতাদেব মৌলিক—স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে তাঁরা সংকল্পে সুনিয়ন্ত্রিত ও কর্মধারায় সফল করতে অভ্যস্ত নন। Spontaneity'র উপর তাঁরা জন-বিক্ষোভকে ছেড়ে দেন, স্বয়ং-চালিত জন-বিক্ষোভ তাই ব্যর্থ আক্রোশে ফেটে পড়ে নিঃশেষ হয়। তখন তার শোচনীয় রূপ ও পরিণতি দেখে নেতারা অপরের ত্রুটি খুঁজতে থাকেন, ভেবে দেখেন না মৌলিক ত্রুটি কোথায়—তা রয়েছে তাঁদের নিজেদের এই স্বতোৎসারণের, Spontaneity'র উপর বিশ্বাসে, নিজেদের চিন্তাশূন্যতায়, সংগঠন শক্তির অভাবে।

বলা বাহুল্য নেতাদের এই অভ্যাস কম-বেশি ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এবাবের এ ঘটনাবলীতে ছাত্ররা নিজেরাও বোধ হয় বুঝতে পারছেন—বিক্ষোভ যত তীব্র ও প্রবল হোক, তা'ই বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ নয়—বিপ্লবের জন্য চাই সংযত আয়োজন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, সংঘবদ্ধ পরিচালনা।

শুধুমাত্র নেতাদের ত্রুটি নিয়ে বিচারে বসলেও ছাত্ররা লাভবান হবেন না, বরং তাতে হয়ত নব নব উপনেতার সৃষ্টি হতে পারে। এদিকেও নেতাদের মধ্যে যে শোচনীয় অবস্থা দেখা গিয়েছে তা দেখে ছাত্ররা সাবধান হতে পারেন। প্রত্যেক নেতাই সে কয়দিনের ঘটনা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবৃতি দিচ্ছেন। তাঁরা অনেকে একই প্রতিষ্ঠানের (কংগ্রেসের) লোক, একই মর্মের কথাও বলছেন

('সব প্ররোচকের কাজ') ; কিন্তু তথাপি একত্র হয়ে তাঁরা একটি বিবৃতিও একসঙ্গে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। অথচ ছাত্রদের মধ্যে অন্তত এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান ও বিভিন্ন রাজনীতিক মতের যুবকদের ঐক্য দেখা গিয়েছে। এমন কি, কলকাতার যানবাহনের সাহসী মজুরেরা পর্যন্ত সরলভাবেই জানিয়েছেন এ ব্যাপারে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের সহমর্মিতা। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রেরণা অনিবার্যরূপে তাঁদের একত্র করেছে। ছাত্র ও মজুরদের এবার সেই সংযোগ ও একতা নিশ্চয়ই দৃঢ় করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে নেতাদেরও বিবাদ-বিভেদ দূর করিয়ে একত্র করতে হবে। নইলে নেতারাই উপর থেকে বসে বিবাদ ও বিভেদ ঘটাবেন—এই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র ও মজুরদের মধ্যেও। বিভিন্ন তাঁবেদার সংবাদপত্র এজন্যই বিকৃত সংবাদ জোগাচ্ছে, তা আমরা জানি। কারণ সংবাদপত্র-গুলো এক-এক নেতার বা এক-একটা নেতৃ-গোষ্ঠীর প্রচারপত্র মাত্র। কেউ শ্যামাপ্রসাদবাবুর কৃতিত্ব প্রচার করে সার্থক, কেউ শরৎচন্দ্রের বীরত্ব ঘোষণায় কৃতার্থ ; অনেকেই পরস্পরের দোষ কাটাচ্ছেন স্বতন্ত্র কোনো দলের ঘাড়ে মিথ্যা দোষ চাপিয়ে দিয়ে।

কিন্তু, ছাত্ররা জানেন—প্ররোচক ছিল কি ছিল না ; আর নেতাদের এই প্ররোচক আবিষ্কারের ফলে কি প্ররোচনা প্রশ্রয় পাচ্ছে। তথাপি এই সূত্রে আমরা আমাদের যে দুটি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি তা এই—প্রথমত, স্বতোৎসারিত নীতিতে, Spontaneity-তে, আন্দোলন আমাদের নেতাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে—ছাত্রদেরও উপর তার প্রভাব পড়েছে। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও সংগঠন-ক্ষমতার অভাবে নেতারা জনজাগরণ দেখলে সহজেই দ্বিধাগ্রস্ত ও বিড়ম্বিত হয়ে পড়েন। তৃতীয়ত, একই সঙ্গে বলবার মত ঐক্যও নেতারা এখনো সঞ্চয় করেননি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখাও দরকার —নেতাদের উপরে দোষারোপ করলেই নেতৃত্ব পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে না। বরং উপনেতৃত্বের সৃষ্টি বাড়াতে পারে। চতুর্থত, বাঙলাদেশের সংবাদপত্র আজ মুনাফাদারীর দৌলতে মালিকদের মুখপত্রই শুধু হয়নি, বিশেষ বিশেষ নেতা ও উপনেতাদের স্বার্থে তা সংবাদ সাজায়, ভাঙে-গড়ে, গোপন করে। তাই সংস্কৃতি অনুরাগীর পক্ষে জনমনের ও জন-আন্দোলনের সংবাদ লাভ আজ দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। অথচ,—যা সব চেয়ে বড় সত্য তা এই,—যুদ্ধের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা আমাদের দেশেও এবার প্রকটিত হচ্ছে। তাকে বলিষ্ঠ ও সার্থক রূপ দানেই আমাদের নতুন জীবনের ও নতুন সংস্কৃতির দুয়ার খুলবে। সেজন্যই চাই ঘটনার সঙ্গে যথার্থ পরিচয়, অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ ; তাতেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সংগঠন সম্ভব। [অগ্রহায়ণ, ১৩৫২]

ভাষার ভিত্তিতে ভারত গঠন

রাজনৈতিক দৃষ্টিতে মন্ত্রী মিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা না করেও (করা অবশ্য অন্যায় নয়) একটি কথা আমরা সেই প্রস্তাবের আলোচনায় স্মরণ করতে বাধ্য হচ্ছি। ভাষার ভিত্তিতে ভারত-বর্ষের বিভিন্ন এলেকাকে একত্রিত করার যে-কথা কংগ্রেস মাঝে মাঝে উত্থাপন করেছিল তা কি কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হল ? কারণ, মন্ত্রী-মিশনের সুপারিশে তার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নেই। বরং যেভাবে ভারতবর্ষকে জোট বাঁধাবার নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন তাতে ভাষা যে জাতি-গঠনে বা সংঘ-গঠনে গণনীয় জিনিস তা-ই মনে হয় না। অথচ আমরা বুঝি, জাতির একটা বড় বন্ধনই ভাষার বন্ধন ; আর জাতীয় সংস্কৃতির যত বিকাশ যেদিকে ঘটুক ভাষাই হল সংস্কৃতির প্রধানতম বাহন। তাই, শ্রীহট্ট ও মানভূমের বাঙালীদের, আর কাছাড়ের পূর্ণিয়ার সিংহভূমের বাঙলাভাষী অঞ্চলকে বাঙলায় প্রবেশের অধিকার না দিলে 'বঙ্গভঙ্গ' শেষ হয় না। পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বিহারের মধ্য থেকে সে-সব অঞ্চলে বাঙালীরা নিজেদের বিহারী বলেই পরিচয় দিতে বাধ্য হবে। জিনিসটা সহজ হবে না। অথচ বিহারের পিছনে নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের যতই শুভেচ্ছা থাক, "বিহার" বাসী বাঙালীরা সহজে এই পরিচয় স্বীকার করে নিতে পারবে না। অবশ্য শ্রীহট্ট হয়ত বাঙলায় আসবে, কাছাড় গোয়ালপাড়াও নিজেদের মত নিজেরা ঠিক করবে। কিন্তু অসমিয়াদের জোর করে বাঙলার সঙ্গে এই জোট বাঁধতে বাধ্য

করলে নিশ্চয়ই তাদের এদিকে বিরোধিতা বাড়িয়ে তোলা হবে। না হলে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে অসমিয়ারা যতই বাঙালী-বিরোধী হোন, বাঙালীর সঙ্গে তাঁদের সংস্কৃতি-গত মিল খুবই বেশি। নিজের ইচ্ছায় জোট বাঁধবার অধিকার পেলে হয়ত পূর্বভারতে বাঙালী, অসমিয়া, ওড়িয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে একদিন মিলিত হতে পারে। কিন্তু তার পূর্বে চাই তাদের ভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবন-প্রতিষ্ঠার অধিকার। মন্ত্রী-মিশন সে অধিকার মানে না। কিন্তু কংগ্রেসও যদি ভাষার ভিত্তিতে অঞ্চল পুনর্গঠনের নীতি ছেড়ে দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে অন্ধ্র, কেরল, কর্ণাটক, মারাঠী, বাঙালী প্রভৃতি জাতি ও তাদের সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে বাধা থেকে যাবে।

দুর্ভিক্ষের রূপ

'ছায়া পূর্বগামিনী'। কিন্তু দুর্ভিক্ষের শুধু ছায়া নয়, দুর্ভিক্ষই আবার এসে যাচ্ছে। কারণ, একে এবার ফসল ফলছে কম, তাতে ভারতবর্ষ জোড়া দুর্ভিক্ষ, আর পৃথিবীরও বহু দেশে নিদারুণ খাদ্যাভাব। তাই বাইরে থেকে খাদ্য বাঙলাদেশ এবার বেশি আশাও করতে পারে না। আর ঘরের ভেতরে বাঙলাদেশের জনসাধারণের মধ্যেও বিভেদ এখন বেশি। কাজেই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তিও এখন আমাদের আরো কম। কারণ, ইতিমধ্যে ১৩৫০'র কোনো ক্ষতই শুকায়নি; কোনো ক্ষতিই প্রায় পূরণ হয়নি। বাঙলার মত জমিদার-তন্ত্রী দেশের যে মূলগত আর্থিক-সামাজিক অসঙ্গতির জন্য দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে তার সেই মৌলিক আর্থিক সুবিন্যাসের কোনো পথই তৈরি হয়নি। বরং সেই গেঁজে-ওঠা সমাজের বুকে ফেঁপে উঠেছে গ্রামে ও শহরে জোতদার, মজুতদার, চোরাকারবারী ও চোরা-কর্মচারী। এসব যে মন-গড়া কথা নয়, তা দুর্ভিক্ষ-কমিশনের রিপোর্ট থেকেও প্রমাণিত হয়। আবও প্রমাণিত হয় সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত রাশি-বৈজ্ঞানিক গবেষকদের একটি রিপোর্ট থেকে। তা বিশদভাবে সকলেরই আলোচ্য—এখানে শুধু তার সার সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করছি:

"১৯৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের পূর্বের যুগ। ইহার ভিতরেও কিন্তু বেশি লোকেরই অবস্থা খারাপ হইয়াছে। অনেকে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহাদের অবস্থা ভাল হইয়াছে, তাঁহারা অনুপাতে কম। ইহাতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে যে দুর্ভিক্ষ আসিবার পূর্ব হইতেই লোকের অবস্থা ভাঙিয়া পড়িতেছিল। দুর্ভিক্ষের সময় শুধু তাহারই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটিল।

"দুর্ভিক্ষের ভিতর লোকের অবস্থা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বদলাইতে লাগিল। পূর্বে যে হারে অল্প কিছু লোকের অবস্থা ভাল হইতেছিল এখন তাহাদের অবস্থা হয়তো দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি ভাল হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সর্বনাশের কথাও দেখিতে হইবে। তিনগুণ তাড়াতাড়ি লোকের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। আগেকার চেয়ে বারগুণ তাড়াতাড়ি লোকে নিঃস্ব হইতে লাগিল।

"এখন তাহা হইলে ছবিটি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। দুর্ভিক্ষের সর্বনাশা নাগপাশ কোন কোন অঞ্চলকে ছারখার করিয়া দিয়া গিয়াছে। কোথাও বা তাহার ধমকটা তত হয় নাই। আবার অন্য কোথাও হয় ত তাহারও চেয়ে কম হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হইয়া যায় যে, সাধারণ অবস্থাতেও দেশের এক এক স্থানের আর্থিক অবস্থা ছিল এক এক রকম। দুর্ভিক্ষের সময় সেই বৈষম্যটা বাড়িয়া গিয়াছিল। দেশের যাঁহারা সবচেয়ে গরীব সেই ভূমিহীন মজুরের দল, সেই মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও গ্রামের সেই শিল্পীরাই এ সময়ে সবচেয়ে কষ্ট পাইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা মাঝামাঝি দরের লোক, যাঁহাদের কিছু জমি ও অন্য দু'এক ছিঁটা সঞ্চিত কিছু ছিল, তাঁহারা কিছুক্ষণ যুঝিতে পারিয়াছেন। উপরের দিকের লোকদের বিশেষ কিছুই হয় নাই। এই তালে তাঁহাদের কেহ কেহ অবস্থা ফিরাইয়া লইয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় (১৯৪৩-এর জানুয়ারী হইতে

,৪৪-এর মে পর্যন্ত) এই উত্থান-পতনটাই আরও দ্রুতভাবে হইয়াছে। তাই ঠিকভাবে দেখিলে, '৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্পের মত একটা আকস্মিক দুর্যোগ নয়। সাধারণ অবস্থাতেও যে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের খেলা চলিতেছিল, ইহা তাহারই পরিণতি।" ("স্বাধীনতা"র অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

এ পরিণতি স্বাভাবিক বটে, কিন্তু সাংঘাতিক। বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি ১৯৪৩-এ বেঁকে-চুরে গিয়েছে। দুর্ভিক্ষের এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, (১) এদেশে জমিদারীতন্ত্র থাকলে দুর্ভিক্ষ ক্রমেই "চিরস্থায়ী" হবে ; এবং (২) দুর্ভিক্ষের ফলেও বাঙলার গত দেড় শ' বৎসরের সমাজ ও সভ্যতায় বিপর্যয় ঘটেছে। [জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩]

বাঙলা ফিল্‌ম-এর গতি

ফিল্‌ম বা বাক্‌চিত্র হচ্ছে পৃথিবীর প্রধান এক লোকশিল্প।

বাঙলা ফিল্‌ম-এর কথাই বিশেষভাবে আমাদের ভাবনীয়। কারণ ফিল্‌ম বাক্‌চিত্রের আবির্ভাবের পরে ফিল্‌ম-এর জগতে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ স্বীকৃত হতে বাধ্য। বাঙালীর ফিল্‌ম হবে এখন থেকে বাঙলা বাক্‌চিত্র। অবশ্য, এ কথাও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ইংরেজি বাক্‌চিত্র (বেশির ভাগই তা মার্কিন), হিন্দুস্তানী বাক্‌চিত্র এসবও আমরা দেখি, বাঙলা ফিল্‌ম তাদের সঙ্গেও নাড়ীতে বাঁধা,—ব্যবসায় সূত্রেও বটে, টেক্‌নিকের নানা সূত্রেও বটে, আর ভাবের সূত্রেও বটে। পৃথিবীর কোনো 'জাতীয় সৃষ্টিই' অন্য জাতির সৃষ্টিকে একেবারে অস্বীকার করে আপনাতে, আপনি সম্পূর্ণ হয় না।

তাছাড়া, রূপমঞ্চের সঙ্গে আবার সব দেশেই নাট্যমঞ্চের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ ; বাঙলায়ও তা আছে, তা স্মরণীয়।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে, এই বাঙলা ফিল্‌ম-এর জগতে হঠাৎ 'উদয়ের পথে' এল এক বহু-প্রতীক্ষিত আত্মীয়ের মত। এক মুহূর্তে বাঙালী জগৎ, আর পরে ভারতীয় জগৎ, তাকে স্বাগত করলে। কারণটা তার কি, সার্থকতা তার কোথায়, এবং কি পরিমাণে ? এ প্রশ্নটি তখন আলোচনা করেছিলেন (আশ্বিন, ১৩৫১-এর 'পরিচয়ে') শ্রীযুক্ত রঙ্গীন হালদার। এখানে বাঙলা ফিল্‌ম-এর চলতি হিসাবে তা পূর্বাপর উদ্ধৃত হল ঃ

"চলচ্চিত্র দেখা ছেড়েই দিয়েছিলাম ; কিন্তু সেদিন 'উদয়ের পথে' ছবিখানি দেখে খুশি হয়েছি। এরকম দেশী ছবি ত আর দেখিনি।

"প্রথমেই বলা দরকার যে ছবির টেক্‌নিক্ পুরাতন ধরনের। চলচ্চিত্র এখনও এদেশে রঙ্গমঞ্চের টেক্‌নিকই অবলম্বন করে রয়েছে। সুতরাং সংলাপই তার প্রধান উপজীব্য ; নতুন টেক্‌নিক্ আবিষ্কার করতে হলে আইনস্টাইন জাতীয় প্রতিভার দরকার ; আর দরকার সিনেমা-শিল্পেও শিল্পগত উন্নতি।

"ছবিখানির বৈশিষ্ট্য তবু আছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য গতি। প্রথম থেকেই ঘটনাপ্রবাহ আখ্যানবস্তুকে এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে প্রবল বেগে টেনে নিয়ে চলে। সংলাপের মধ্যে এমন action বোধ হয় এক 'ষোড়শী' ছাড়া অন্য কোনো নাটকে দেখিনি।

"ছবিখানির themeও পুরাতন, নেহাৎ রোমাণ্টিক। আমাদের দেশে উপকথা থেকে শুরু করে নভেল-নাটকে সকল ক্ষেত্রেই এ-রকমের গল্প দেখা যায়। রাজকন্যা মাল্যদান করেন বীর যোদ্ধাকে অথবা কবিশেখরকে। এ ধরনের স্বপ্ন দেখে মন্দভাগ্য লেখক বা কর্মচারীরা এক রকমের সুখ পায়। 'উদয়ের পথে'র মূল গল্পও তাই ঃ বুর্জোয়া-কন্যা বরমাল্য দিচ্ছে লেখক ও ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী অনুপকে। নতুনকালের লেখকেরা ও দর্শকেরা নিজেদের ইচ্ছাপূরণের পথ খুঁজছেন পুরাতন ধারায়। স্বপ্নরাজ্যে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে নিজেদেরই বাস্তব ক্ষেত্রে বঞ্চিত করেন। অবশ্য এ রোমাণ্টিকতার ব্যাধি এ কালের লেখকদেরও বোধহয় আর টিঁকবে না। শ্রমিককর্মীদের তো তা জন্মাতেই পারে না, তা বলাই বাহুল্য।

"ছবিখানার আখ্যানবস্তু শ্রেণীবৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে, তাই আশা করেছিলুম বাস্তব কিছু দেখব। সেদিকেও একেবারে নিরাশ হইনি। রোমান্সের ফাঁকে ফাঁকে জীবনের প্রতিচ্ছবি সব সময়েই দেখা গেছে। সে-জীবনকে কিরূপে মহত্তর জীবনে পরিণত করা যায় তারও আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। অথচ কোথাও প্রচারের গন্ধ পাওয়া যায়নি। মোট কথা, নব-জীবনবোধই এই ছবিখানির মূল প্রেরণা, তা সত্য।

"ধনিকের কন্যা গোপা তার নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বন্ধু সুমিতাকে ভাইঝির জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করতে এসে সুমিতার দাদা অনুপের ঘর দেখে বিস্মিত হল। সেখানে দেয়ালের গায়ে আঁকা রয়েছে ভারতের দেশপ্রেমিক মনীষীদের রেখাচিত্র গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র। আর অনুপের তক্তাপোশের ঠিক শিয়রের দিকে রয়েছে একটি মাত্র বিদেশীর রেখাচিত্র—কার্ল মার্ক্স্। প্রযোজক-এর বেশি আর কিছু বলেননি। তবু দর্শকরা বুঝে নিলেন নায়ক কোন্ পথের পথিক।

"অনুপ ও গোপা দুই জগতের মানুষ—শরৎচন্দ্রের নায়ক নায়িকার মত সংঘাতেই তাদের পরিচয়। তবু গোপার গান শুনেই অনুপের শিল্পীমন গোপার আকর্ষণ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। এখানেই গল্পের একটা মোড়। প্রযোজক বিশেষ করে বিজ্ঞাপিত না করলেও বুঝতে পারা যায় যে, অনুপ শুধু মননশীল কর্মী নয়, সে একজন রসজ্ঞ শিল্পী। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় যে হতে পারত একজন সাহিত্যস্রষ্টা তাকে বর্তমান অবস্থায় হতে হল একজন সমাজকর্মী।

"আসলে, লেখকের ও প্রযোজকের হয়ত ট্রেড ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই; মজুরদের জীবনের বাস্তব চিত্র তাই এ ছবিতে নেই। মজুরদের সভায় রজনীগন্ধা ফুল থাকে না; যদিও গল্পের জন্য রজনীগন্ধা দরকার। দেয়ালেও নাৎসি-প্রতীক স্বস্তিক থাকে না। অম্বিকা এতগুলি মজুরের সামনে অনুপই যে এ-আন্দোলনের মূল তা মিলের মালিককে নিশ্চয়ই বলত না। মালিক ও মালিক-কন্যার কৃপায় শ্রমিক-সমস্যা মিটছে, তারা 'গোপা দেবী কী জয়', বলে কৃতার্থ হচ্ছে, এ দেখলে মজুরেরা হাস্যসম্বরণ করতে পারে না। এ অসঙ্গতি যে দর্শকের সহ্য হয়, তার কারণ দর্শকেরা মজুর নয়, কর্মচারী। তারা এদেশের ব্যাংকের কেরানী, ইন্সিওরেন্সের কর্মচারী, যারা আপিসের মনিবদেরই দেখে, কলকারখানার মালিককে দেখে না।

শুধু মজুরদের জীবনের চিত্র নয়, বিলাত ফেরত সমাজেরও চিত্র বাস্তব হয়ে উঠেনি। এই বিলাত-ফেরত সমাজের কোনো মূল নেই সত্য; তারা স্বদেশী সমাজের সব কিছুই অবজ্ঞা করে, অথচ বিলাতী সমাজ গড়বার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা বৈঠকখানা ভেঙ্গে ফেলে, অথচ বিলাতী ড্রইং রুমও গড়তে পারে না। দামী বিলাতী ছবি কিনবার মতো অর্থ ও রসজ্ঞান তাদের নেই। তাই তারা কুমারটুলীর বুদ্ধমূর্তি ড্রইং রুমের dummy fireplace-এর উপর রেখে সিগারেটের ধোঁয়ায় তার অর্চনা করে, আর নটরাজের মূর্তির সামনে নৃত্য করে 'oriental' হয়। এক কথায় কিম্ভূতকিমাকার, অসমঞ্জস জীবন, এবং তা দেখলে হাস্যরসের উদ্রেক হবে। তবু সে-জীবনও বাস্তব। এতবড় ইঙ্গ-বঙ্গ অভিজাত পরিবারের বধু রমা আরও মার্জিত, আরও ইংরেজীভাষিণী হলে বাস্তব বলে মনে হত। বিভাসের বাঁদরামিও যেন স্বেচ্ছাকৃত; এ বাঁদরামি যদি তার চরিত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ হত তবে ছবিখানির মূল্য আরও বেড়ে যেত। যাকে খেলো করতে হবে তারও একটা বাস্তব রূপ দেওয়া দরকার। ব্রজেন্দ্রনাথের চরিত্রও ঠিক capitalist-এর চরিত্র হয়নি। প্রেম যদি dividend না দেয় তবে তারও কোনো মূল্য নেই capitalist-এর কাছে। কঠোরতার আবরণে এতখানি স্নেহপ্রবণ মন শুধু feudal lord-এর সম্ভব। এ যেন মনে হয় আধুনিকতার আবেষ্টনে তারাশঙ্করের কোনো জমিদার চরিত্র।

"দেখা গেল, ফুটেছে সবচেয়ে সত্য হয়ে নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন—অনুপের গৃহস্থালি, তার মায়ের স্নেহ, বোনের ভালোবাসা। আর নিম্ন মধ্যবিত্তই যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একপ্রকার বঞ্চিত, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই বঞ্চিত নিম্ন মধ্যবিত্তদের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি স্বাভাবিক,—দর্শকেরাও প্রায়ই নিম্ন মধ্যবিত্ত। ছবিখানির সাফল্যের একটি প্রধান কারণও তা'ই, তা ভুললে চলবে না।

"ধনিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভটা এক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘর্ষ নয়, বঞ্চিত মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ। কিন্তু একটি কথা এই জন্যই আজ আমাদের মনে রাখতে হবে বেশি। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তরা আজ আর মধ্যবিত্ত নেই; আমরা মেয়ে-পুরুষে আজ রোজগার করছি, তবু বাঁচতে পারছি না। জীবনযাত্রায় আমরা বঞ্চিতের দলে। কিন্তু অনেককালের 'ভদ্রলোকের' দেমাক তবু আমাদের মনে। তাই ভদ্রলোকের খোলসটা সম্বল করে থাকি, মালিকের মুখে ভদ্রলোকের মুখোশ দেখলেও বেঁচে যাই। অথচ জীবন-ক্ষেত্রে সত্যই আমরা শ্রমিক শ্রেণীর সগোত্র। তাদের সঙ্গেই আমাদের বন্ধন দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এই কথাটা আমাদেরও বোঝা চাই—আমাদের শিল্পী আর লেখকদেরও। তাদের রোমান্সের জায়গা নেই।

"রোমান্সের ফাঁকে ফাঁকে এই ক্ষীয়মাণ সমাজব্যবস্থার চিত্র এ ছবিতেও অবশ্য দেখা যাচ্ছিল। শুধু মধ্যবিত্ত শ্রীকণ্ঠবাবু নয়, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ও ব্যাংকের মালিকরাও চালের মজুতদারী করে কিরূপে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছিল তারও আভাস পাওয়া গেল।

"চিত্রের সমাপ্তি খুবই রোমান্টিক, তবে অসহ্য নয়। উদয়ের পথে যাত্রা যেন চার্লি'র 'Modern Times'-এর নায়ক-নায়িকার অজানা পথে যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রযোজক অজ্ঞাতসারে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন, তাতে ক্ষতি নেই।

"তবু বলব এরকম দেশী ছবি আর দেখিনি। শুধু থিওরি নয়, জনতার জীবনের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় ঘটলে আমাদের রোমান্টিক আত্ম-বঞ্চনার জায়গা থাকবে না—আমরা সত্য হয়ে উঠব, আমাদের ছবিও সত্য হয়ে উঠবে,—সিনেমার শিল্পীদের 'উদয়ের পথ' সেই ইঙ্গিতই উপস্থিত করেছে।

"এ ছবির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে লেখক, প্রযোজক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই প্রায় নতুন। সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আশা করি তাঁরা আর্থিক সুবিচারও লাভ করবেন, লেখকও তা' থেকে বঞ্চিত হবেন না। নতুন অভিনেতা রাধামোহন অনুপ-চরিত্রের দৃঢ়তা ও মর্যাদা-বোধ যে-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা পুরাতন অভিনেতাদের মধ্যে বড় একটা দেখতে পাইনি। তাঁর শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ শিশিরবাবুকেই মনে করিয়ে দেয়। ছবি দেখে মনে হয় পুরাতন লেখক, প্রযোজক ও অভিনেতা অভিনেত্রীরা পুরাতন ভাবলোক ও অভিনয়-কলায় বাঁধা পড়ে গেছেন। অথচ দর্শকরা যে প্রগতি চায় তাতো স্পষ্ট। ধনিক চিত্রব্যবসায়ীরাই তা পরিবেশন করতে এতদিন নারাজ ছিলেন। তবে তাতে এবার যখন মুনাফার সম্ভাবনা দেখা গেল তখন এদিকেও জোরকরা প্রগতি ও ধার-করা কল্পনার বান না ডাকলে হয়। (পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৫১)

উদয়ের পথের উল্লসিত সংবর্ধনা শেষ না হতেই দেশে এল আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের উচ্ছ্বাস; আর জাতীয় চেতনার নতুন বন্যা। ব্যবসাদারী ফিল্মস্বত্বাধিকারী এটাকে ব্যবসায়ে পরিণত করে মুনাফা তুলবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে, এরূপ অধিকাংশ ফিল্মই কদর্য,—যেমন কদর্য 'আ'মরী' নামক বস্তি জীবনের চোরা-বাজারী ফিল্ম-খানা। তবু এরই মধ্যে 'উদয়ের পথের' ধারাই আবির্ভূত হয়েছে 'অভিযাত্রী' (ফাল্গুন, ১৩৫৩) শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায়ের যোজনায় ও প্রযোজনায়। ত্রুটি তাতে আছে,—অনেকটা ত্রুটিই দেশের ও পুঁজিবাদিতার অবস্থা বৈগুণ্যে,—কিন্তু 'উদয়ের পথে'র মধ্যে যে কথাবস্তু ও ভাববস্তুর দুর্বলতা ছিল 'অভিযাত্রী'তে তা রচয়িতা কাটিয়ে উঠেছেন।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র 'অভিযাত্রী'র যে পরিচয় দিয়েছেন মাঘ, ১৩৫৩, 'পরিচয়') তার প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে একমত হতে সকলে পারবেন না—গল্পাংশে এখনো নানা শিথিলতা আছে, আর ফিল্ম-এর ফটোগ্রাফি ও অন্য বৈজ্ঞানিক ত্রুটিও যথেষ্ট। তবু রাধারমণবাবুর সমালোচনা মোটামুটি সকলের গ্রাহ্য হবে। শ্রমিক আন্দোলনের দিক থেকে শ্রমিক বন্ধুরা এ গল্পের তবু অন্তত তিনটি ত্রুটি উল্লেখ করেন (তাঁরা গল্পাংশকে ব্যষ্টি চিত্র হিসাবে দেখতে সহজে চান না, বলেই): (১) মৃতকল্প শ্রেণী কখনো ক্ষমতা বিপ্লবী শ্রেণীকে আপোষে ছেড়ে দেয় না—ছলনা-সূত্রেও না; (২) শ্রমিক সংঘাতকে রক্ত দিয়ে যাঁরা সার্থক করেন তাঁরা মধ্যবিত্ত চাকুরে নন, তাঁরা প্রায় সর্বাংশেই মজুর। (৩) 'অভিযাত্রী' যেখানে শেষ হল সেখানে নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে স্বীকার করছে;—কিন্তু মতাদর্শগত পরিবর্তন ও

কর্মক্ষেত্রের সহযাত্রিক সাধনার জন্য নয়, একটি শোচনীয় ঘটনার জন্য, নায়িকার পিতার মৃত্যুর জন্য। এসব বক্তব্য মিথ্যা নয়, কিন্তু মূল কাহিনী এসব ভাবের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রচিত হয়নি, যদিও শ্রমিক-শক্তির প্রতি সহানুভূতিতেই তা উদ্বুদ্ধ। বলা নিষ্প্রয়োজন—বাঙলার গণ-আন্দোলন ও বাঙলা ফিল্‌ম 'উদয়ের পথে'র পরে এ ক্ষেত্রে সত্যই আরও এক পদ অগ্রসর হয়ে গিয়েছে 'অভিযাত্রী'র মধ্য দিয়ে।

বাঙলা নাট্যকলার নতুন সূচনা

[বাঙলা নাট্যমঞ্চে এক নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয় গণ-নাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে—'জবানবন্দী'র অভিনয় থেকে। 'নবান্নের' অভিনয়ে তা সকলের কাছ থেকে অকুণ্ঠ-স্বীকৃতি আদায় করে। এখানে শ্রীযুত রঙ্গীন হালদারের লিখিত সে অধ্যায়ের আলোচনা পরিচয় (শ্রাবণ, ১৩৫১) থেকে উদ্ধৃত হল। এ ধারায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এখন দেখা দিয়েছে শ্রীরঙ্গমে দুঃখীর ইমান। লেখক]

বাঙলা নাট্যকলার উপর আমাদের অনেকের দরদ আছে। কিন্তু তা নিয়ে গৌরব করবার মত নিদর্শন আমাদের বেশি নেই। এর কারণ, অনেক তা আমরা বুঝি। যে-সব সামাজিক-রাষ্ট্রিক কারণে নাট্যকলা স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে, আমাদের ভাগ্যে সে সব কারণ জোটেনি। আবার, এক কালে আমাদের দেশে নাট্যকলার যে বিশেষ রূপটি প্রকাশ লাভ করেছিল তার ঐতিহ্য বেঁচে নেই। বাঙলা "যাত্রা"ও মরতে বসেছে, থিয়েটারী ঢং গ্রহণ করে তা কোনো রকমে তবু টিকে থাকতে চায়। অথচ বাঙলা থিয়েটারও খুব শক্তিশালী জিনিস নয়—যদিও সমস্ত ভারতবর্ষে নাকি আমাদের 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চই' প্রধান সাধারণ রঙ্গমঞ্চ।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চ বা বাঙলার নাট্যকলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবার দরকার এখানে নেই। বাঙলার নতুন সাহিত্যের মত বাঙলার নাট্যকলারও নতুন প্রেরণা আসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ে। সেক্‌স্‌পীয়র পড়ে যে বাঙালী মেতে যায়, তারা নাট্যকলা সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকলেই, আশ্চর্য হবার কথা হত। কাজেই নাট্যকলা সৃষ্টির প্রয়াসও প্রথম থেকেই আমরা করেছি। কিন্তু নাট্যকলা বড় বেশি রকম সামাজিক শিল্প—সাহিত্যের মত তা ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, নাট্যকলা সম্মিলিত সৃষ্টি। তাকে এজন্য সমন্বিত শিল্প বলা যায়। নাট্যসাহিত্য, অভিনয় কলা ও প্রযোজন-শিল্প, অন্তত এই তিন কলার সমন্বয় তাতে চাই। আর চাই সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরও সহ-যোগিতা। এ যুগে বাজারের 'ভাও' বুঝে এ সব কলাকেও কাটতে ছাঁটতে হয়। দর্শক সমাজের রুচির উপর তাই নাট্যকলারও রূপ নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আর্থিক কারণেও তাই নাট্যকলা আবার জড়িত। মোটের উপর, এত বেশি পরিমাণে 'সামাজিক জিনিস' বলেই আমাদের পক্ষে নাট্যকলা সৃষ্টি সহজ হয়নি। আর তা না হলে নাট্যসাহিত্যও ঠিক লেখা হয় না—প্রত্যেক কলাই তো অন্য কলার সঙ্গে জড়িত। তথাপি, বাঙলা দেশে 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চ" চলছে ; তার বাইরেও সৌখীন নাট্য পরিষদ অনেক রয়েছে। আর দু' ক্ষেত্রেই গুণীর অভাব হয়নি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাঁরা সংযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ লেখার জন্য, কেউ অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরেও বহু স্মরণীয় নাম রয়েছে। বাঙলার নাট্যকলা জন্মেছিল তাঁদেরই চেষ্টায় বেলগাছিয়ার বাগানে ; ঠাকুরবাড়ি আর শেষ দিকে শান্তিনিকেতন-বিশ্ব-ভারতী তাতে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে ; আর শত শত ছোট বড় সৌখীন অভিনয় ক্ষেত্রে, পাড়ার বখাটে ছোকরারা, গ্রামের বাবুরা, কলেজের ছাত্ররা, তাকে পরিপুষ্ট করেছে।

আমাদেরই জীবনে আমরা বাঙলা নাট্যকলার তবু তিনটা যুগ দেখেছি, আজ তা স্মরণ করতে পারি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তখনো গিরীশবাবুর শেষ যুগ, অমৃতলাল বসু, দানীবাবুর যুগ চলেছে। যে স্তরের অভিনেতা অভিনেত্রী, নিয়ে তাঁরা কাজ চালাতেন, তাঁদের দর্শক সমাজও ছিল যে-স্তরের, তাতে তাঁদের শক্তিকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। রঙ্গালয়ে রঙ্গলোভী আমোদপ্রিয় দর্শকেরা তখনকার

অভিনয় দেখত, শিক্ষিত রুচি প্রায়ই তাতে তৃপ্ত হত না। কিন্তু বাঙলা নাট্যকলার ইতিহাসে এক নতুন ঘটনা 'ফাল্গুনী'র প্রথম অভিনয়, 'ডাকঘরের' অভিনয়। তার নাট্য কথা, তার অভিনয়কলা, বিশেষত তার মঞ্চসজ্জা—সূক্ষ্ম সৌন্দর্য পিপাসাকে তখন পরিতৃপ্ত করেছিল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তত সূক্ষ্ম জিনিস গ্রহণও করতে পারত না, পরিবেশনও করতে পারত না। রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত নাট্যকলা সাধারণের জিনিস হল না। তবে অসাধারণের রসবোধকে তা জাগ্রত করে; আর তাতেই আবার শিক্ষিত সাধারণের রসবোধকে উন্নত করে। সেই শিক্ষিত সাধারণের স্তরে—খাঁটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মধ্যে—তৃতীয় যুগে নেমে এসে দাঁড়ালেন শিশিরকুমার আর তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীরা। তিনি এই মধ্যস্তরে সূচনা করলেন নাট্যবলায় মধ্যবিত্তের যুগ। সেদিন মনে হয়েছিল বাঙলায় সত্যই বুঝি নাট্যকলার নবজন্ম হবে—বাঙলা নাট্যকলার এবার সত্যকাবের আবির্ভাব দেখতে পাব।

তা হল না। কারণ অনেক ছিল। ছোট বড় কারণ হিসাব করে লাভ নেই। মূলের কারণটিই আজ স্পষ্ট। বাঙলার মধ্যবিত্ত কালচারের সঙ্কটকাল তখন এসে গেছে। বরাবরই তার গোড়ায় মাটি ছিল কম। তার প্রেরণা বেশিটাই আমাদের মনোভূমি থেকে নেওয়া;—আর সে মনোভূমি তৈরি হয়েছিল পাশ্চাত্য জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কে, সংঘাতে। বাঙলায় সেই প্রেরণাতে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য মোটামুটি, একজনেই সৃষ্টি করে, শিক্ষিত লোকেরা পড়ে। নাট্যকলা কিন্তু দশজনের জিনিস, তার সৃষ্টি হয় কলাসমন্বয়ে; আর তার সার্থকতা আবার এক বড় দর্শক-সমাজের গ্রহণ শক্তির উপর নির্ভর বরে। এই কারণেই বরাবব আমাদের নাট্য কলা দুর্বল ছিল। শুধু মধ্যবিত্তের আসরও নাট্যকলা-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত আসর নয়। তাতেও আবার শিশিরকুমার যখন এলেন তখন সেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে ভাঙন ধরেছে—বাঙলার মধ্যবিত্তদের তখন নিজের শক্তিতেও আস্থা নেই। আর ইউবোপের যে জীবন ও সৃষ্টিক্ষেত্র থেকে তারা প্রেবণা আহরণ করত, ইউরোপের সেই জীবন ও সৃষ্টিক্ষেত্রেও তখন ভাঙন ধরেছে। শিশিরকুমারের 'মধ্যবিত্ত' বাঙলা নাট্যকলা সৃষ্টির চেষ্টা—শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীর জন্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা —খানিকটাব বেশি তাই সার্থক হতে পারল না। কারণ, নাট্যকলা অমন একটা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সবল ও স্বাভাবিক শ্রী লাভ করতে পারে না—বিশেষত যখন তার আসল সামাজিক পরিবেশ, আগেকার মতই রয়েছে প্রতিকূল, তার সঙ্কীর্ণ আসরেও ভাঙন ধরেছে, অন্যদিকে নতুন কালের সবাক-চিত্র এসে তাকে সকল ক্ষেত্রেই কোণঠাসা করছে।

এই তিন যুগের পরে বাঙলা নাট্যকলা দেখে একটা কথায় আমরা বুঝেছিলাম—বাঙলা নাট্য-কলা সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না। অনেক দেশেই নাট্যকলার এ দশা ঘটছে। কারণ, অনেক দেশেই কলাবিদের সঙ্গে দেশেব জনসাধারণেব যোগাযোগ কমে আসছিল। বাঙলা দেশে এই বাঙলা নাট্যকলার ও বাঙালীর যোগাযোগ বরাবরই ছিল সামান্যতম। তাই দু'একটি নাটক ও দু' একটি অভিনয় ছাড়া সর্বত্রই ছিল একটা রোমান্টিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা। এমন কি, আমাদের সামাজিক নাট্য ও অভিনয়ও বাস্তব জীবনকে বড় স্বীকার করতে চাইত না।

কিন্তু একটা কথা, জনগণ এই নাট্যকলা চায় না—এ কথা বলাও হবে ভুল। গ্রামে নগরে যাঁরা সৌখীন দলের অভিনয় দেখেছেন, তাঁরাই জানেন জনগণ এ সব নাটকের অভিনয় দেখতেও কত উৎসাহ পায়। হয়ত সাজ-পোশাক, আলো-চমক, এ সবই তাদের সরল মনে ভালো লাগে। কিন্তু তারা শুধু 'যাত্রাই' চায়, 'ভাসান গানই' বোঝে, 'কীর্তনেই' আনন্দ পায়, এ কথা বললে ভুল করব। দেখছি সে সব পরিচিত বিষয়বস্তু ও পরিচিত শিল্পপদ্ধতি যতই পরিচিত হোক আজ তাদের সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পারে না। কাল বদলেছে, তাদের রুচি ও দৃষ্টিও জানা-না-জানায় বদলেছে;—সিনেমা গ্রামোফোন কোম্পানি তা বুঝেই ব্যবসা করছে। কিন্তু জনগণেরও রস-পিপাসা আছে, সে রস-পিপাসা নতুন কিছু চায়। সেই জিনিসই আমরা দিতে পারছি না—এমন কিছু যার বিষয়বস্তু (content) তাদের কাছে নিতান্ত "পরের জিনিস" বলে মনে হবে না, এবং যার শিল্প-পদ্ধতিও (form) অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বলে তাদের কাছে ঠেকবে না।

"ভদ্র"-নাট্যের এই বানচাল অবস্থা থেকেই বোধ হয় গণনাট্যের প্রয়োজন আমরা সকলেই উপলব্ধি করেছিলাম। সেই গণনাট্য আন্দোলনের পুঁথিপড়া বিদ্যা নিয়ে অপেক্ষাও করেছি। কৌতূহল ছিল, কৌতুকও বোধ করেছি, একটু বিদ্রূপের ভাবও মনে মনে পোষণ না করতাম তা নয়। তবু বাঙলা নাট্যকলার প্রতি দরদ ছিল। হঠাৎ এবার কলকাতায় বাঙলার 'গণনাট্য সঙ্ঘের' অভিনয় দেখে আমরা কেউ কেউ আশান্বিত হয়ে উঠেছি। মনে হল, বাঙলা নাট্যকলার অন্তত একটা চতুর্থ যুগের সূচনা দেখছি।

এই সঙ্ঘ আর তার অভিনয়কলার নাম শুনেছিলাম। জানতাম এর আরম্ভ বড় এক বাস্তব রাজনৈতিক সংকটের টানে। শুনেছিলাম এব প্রকাশ ঘটছে কঠিনতর এক বাস্তব সামাজিক সংকটের টানে। পড়েছিলাম অনেক রসিক ও গুণীর এঁদের অভিনয়াদি সম্পর্কেও প্রশংসার কথা।

এদেশে গণনাট্য সঙ্ঘের উৎপত্তির ইতিহাস জানতাম। যাঁরা এর প্রথম প্রবর্তক তাঁরা জেনে-না-জেনে দুটা জিনিস বুঝেছিলেন—প্রথমত, নাট্যকলা কলা হিসাবেও জনমুখাপেক্ষী, জন-সংযোগ ছাড়া তার স্ফুরণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য কলার অপেক্ষাও নাট্যকলার সামাজিক প্রভাব বেশি—শুধু মাত্র 'বিশুদ্ধ' রসোপভোগের জিনিস তা নয়। কলকাতায় ১৯৪০ সালে ইয়ুথ কালচারাল ইনষ্টিটিউট্ এই উপলব্ধি থেকে জন্মে। বোম্বাই-এ ১৯৪২ সালে পণ্ডিত জওহরলালের আশীর্বাদ নিয়ে জন্মে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। দু'এরই পিছনে ছিল রাজনৈতিক প্রেরণা, সামাজিক দায়িত্ববোধ আর শিল্পের প্রতি অনুরাগ। কিন্তু বাঙলার শিল্পীদের দৃষ্টি ছিল শিল্প সৃষ্টির দিকে, বাঙলার প্রগতিকামী মধ্যবিত্ত সমাজে তাঁদের একটা আসর ছিল তৈরি। বোম্বাইর শিল্পীরা বিলাতের Unity Theatre-এর কায়দায় শ্রমিক শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি রাখেন, বোম্বাইর শ্রমিকশ্রেণী ছিল তাঁদের লক্ষ্যবস্তু। দুই প্রয়াস পরে সংগঠনের দিক থেকে একত্র হয় এবং ক্রমে শিল্পকলার দিক থেকেও তাদের সংযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙলার শিল্পীরা পল্লী-গীতি, জন-সঙ্গীত প্রভৃতিকে উদ্বোধন করতে অগ্রসর হয়। আর মন্বন্তর এলে তাব সত্যকে আশ্রয় করে অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি পরিবেশন করে। সাহায্যের জন্য তাদের ডাক পড়ে পাঞ্জাবে, নতুন দর্শক সমাজের জন্য নতুন-শেখা হিন্দুস্তানীতে তাঁরা অভিনয় করেন, আর বাঙলার জন্য সাহায্য নিয়ে আসেন প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা। কিন্তু বড় কথা, তাঁদের অভিজ্ঞতার পরিধি এসূত্রে বাড়ে। সে পরিধি আরও বাড়ল যখন জামসেদপুর ছাড়িয়ে তাদের অভিনয়ের জন্য ডাক পড়ল বোম্বাই উপকূলে। নতুন করে তাঁদের শিল্পজ্ঞানকে পুষ্ট করতে হল, যাতে একই কালে সেখানকার গুণী সমাজ তৃপ্ত হয়, আবার শ্রমিক সমাজ অনুপ্রাণিত হয়। তাঁরা বাঙলার দুস্থদের জন্য সাহায্য পান দেড় লক্ষ টাকা। বোম্বাইর শিল্প সমালোচকেরাও বুঝলেন গণনাট্য শিল্প হিসাবেও, দাঁড়িয়েছে।

কলকাতায় অভিনয় দেখে আমাদের যা মনে হল তা এই—বাঙলা নাট্যকলার একটা নতুন আরম্ভ দেখলাম। 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘরে' যে সূক্ষ্ম শিল্প পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছিল, তা নাট্যকলার মূল সত্যকেই যেন ভুলে যেতে চেয়েছিল। জন-সমাজ সে রস গ্রহণ করতে পারে না। 'ফাল্গুনী'তে তাদের চেনা বাউলের মুখে তারা আধ-চেনা সুরের গান শুনছিল। কিন্তু তার কথাবস্তু ও তার অতি হেঁয়ালি কথাবার্তা তারা এক বর্ণও বুঝতে পারে না। বাউল আর সঙ্গীতের কাঠামোতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটককে জনতার চেনা 'যাত্রার' রূপ খানিকটা দিচ্ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাউলও রবীন্দ্রনাথই। অসামান্য সে, অতি সূক্ষ্ম রসের রসিক। বুঝলাম, সে সূক্ষ্মতা সাধারণের জন্য নয়। সে সূক্ষ্ম মঞ্চসজ্জা—যা দেখে তখন বিমুগ্ধ হয়েছিলাম—বুঝলাম, তাও বড় বেশি অসাধারণ। সে নাট্যকলা জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখে। এবার বুঝলাম, বাঙলা নাট্যকলা—সেই শিক্ষিত বাঙালীর নাট্যকলা, 'শিশির যুগও'—জনসমাজের পাশ কাটিয়ে যায়। শিশিরকুমারের 'মধুসূদন' দেখে সেদিনও বিমুগ্ধ হয়ে ফিরেছি। গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় দেখে বুঝছি—কোথায় ছিল মধুসূদনের, শিশিরকুমারের ট্রাজিডি—বাঙলার সমস্ত "ভদ্র" নাট্যকলার ট্রাজিডি। ইউরোপীয় ধনিকতন্ত্রের যুগের নাট্যসাহিত্যও তার অভিনয়-কলা, তার প্রযোজন বিদ্যাকেই সর্বস্ব করে আমরা এদেশে তখন গ্রহণ করেছিলাম। এদেশে মধুসূদন, শিশিরকুমার বা আমরা

কেউ বাস্তবক্ষেত্রে সেই ধনিকতন্ত্রের স্বচ্ছ প্রকাশ দেখিনি। চারদিকে দেখলাম তার সাম্রাজ্যবাদী রক্ষ দৌরাত্ম্য, ঔপনিবেশিক উপদ্রব। পেলাম না বুর্জোয়ার সেই সমাজ, সেই নাট্য সাহিত্য, সেই নাট্যকলা, সেই প্রয়োজনবক্ষতা। তাই মধুসূদনের প্রতিভা তার প্রকাণ্ড প্রকাশ সত্ত্বেও ট্রাজিডি হয়, শিশিরকুমার তাঁর আশ্চর্য শক্তি ও একক সার্থকতা সত্ত্বেও ট্রাজিডি থাকেন। আমরা পথ পাই না-প্রকাশের, না-সার্থকতার। 'ভদ্র' নাট্যকলা তাই হয়ে ওঠে বিদ্রূপের বস্তু।

'গণনাট্য সঙ্ঘের' অভিনয়ে দেখলাম ত্রুটি অনেক, একটা সমন্বিত শিল্প এখনো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে—সমস্ত জুড়ে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। একজন নায়ক বা একজন অভিনেতাকে কেন্দ্র করে আর নাটক ও নাট্যকলা আবর্তিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত অতিরিক্ত রকমের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক (individualistic) অভিনয় কলার পরিচয় রেখে গেছেন। এবার এই প্রথম দেখলাম অভিনয়ে, সঙ্গীতে, সমস্ত জুড়ে একটি ঐকরীতির প্রয়োগ। একজনই শুধু অভিনয় করেন আর সকলে হয় পার্শ্চর ; এ যেন আমাদের দেখা অভ্যাস হয়ে উঠেছিল। অথচ সমস্ত নাট্যকলার মূল সূত্রই তার বিরোধী। সে সূত্র দাবী করে সমন্বয়—সমগ্রের সম-বিকাশ। এবার গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয়ে এই নতুন নীতিরই প্রতিষ্ঠা দেখলাম। প্রযোজন-বিদ্যায়ও টেকনিকের খুঁটিনাটি অপেক্ষা চেষ্টা দেখলাম সমস্তকে পরিপুষ্ট করবার। 'মহামারী নৃত্যে' নেপথ্যে সঙ্গীত আর ক্রন্দন আর মঞ্চে আলো আঁধারের সন্নিবেশ তার সুন্দর নিদর্শন। আর সঙ্গে সঙ্গে কি নাট্যকলায় কি অভিনয়ে, কি মঞ্চসজ্জায় দেখলাম এক বাস্তবতা, জীবনমুখিতা। ফলে সমস্ত অভিনয়ে একটা অদ্ভুত সবলতার সঞ্চার হয়েছে—আগেকার যুগের চমক, চটক ও রোমান্সের স্থানে এসেছে সহজ বলিষ্ঠ জীবন। তার সেই অতি সূক্ষ্মতারই যেন একটা প্রতিবাদ জনতার বলিষ্ঠতা ; স্বাভাবিকতার যেন একটা ইঙ্গিত তাদের এই সামগ্রিক ও বাস্তব অভিনয় কলার মধ্য দিয়ে দর্শকেও সচকিত ও সচেতন করে তোলে—বুঝি, বাঙলা নাট্যকলা বাঙালী জীবনের কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে।

তারই একটা প্রমাণ রয়েছে এই নাট্যকলার সমস্ত পরিকল্পনায়। ঘরে বসেই আমরা অভিনয় দেখছিলাম। তার অর্থ বাইরে থেকে নিজেদের একটু স্বতন্ত্র করে নিয়ে দেখছিলাম অভিনয়। জীবন-যাত্রার থেকে, বাস্তবের থেকে একটু আড়াল রচনা করে দেয় এরূপ ঘরের দেয়াল। তাতে সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। খাঁটি জননাট্য এ আড়াল চায় না, তা মুক্ত প্রান্তরে মানুষের চোখের সামনে ফুটতে পারলে তবেই মনে করে, সার্থক হলাম। বাঙলা 'যাত্রা' আমাদের জনতার এ কারণেই বেশি নিজের জিনিস হতে পারে। এ কালের 'মুক্ত প্রান্তরে অভিনয়' "Open Air Theatre", সেই গ্রীক অভিনয় পদ্ধতি, 'Passion Play' ও আমাদের 'যাত্রা', 'রামলীলা' প্রভৃতির সেই মূল সত্যটিকে আবার উর্ধ্বতর স্তরে স্বীকার করে নিতে চায়, দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করে। ঘরে বসে গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় দেখতে দেখতে বুঝছিলাম, এ অভিনয়ও মুক্ত প্রান্তরের উপযোগী। শুনেছিলাম, সত্যই মুক্ত প্রান্তরে অভিনয় করতে পারলে শুধু এদের অভিনয়ের উদ্দেশ্য যে বেশি সিদ্ধ হয় তা নয়, এদের অভিনয়-কলাও নাকি স্ফূর্ত হয় বেশি। নাট্যকলার এই অবরোধ-মুক্তি বাঙলা নাট্যকলার ইতিহাসে তাই আর এক শুভ সূচনা।

ঠিক এসব ধারণা, নীতি ও রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যে নতুন নাট্যসাহিত্য রচিত হবে, তা না উল্লেখ করলেও চলে। কারণ, নইলে নাট্যকলার মত সমন্বিত শিল্প রূপ লাভই করত না। এই নতুন নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির যে সূচনা দেখলাম তাও তাই লক্ষ্য করতে হয়। দেখলাম—যে নাটক এরা অভিনয় করছেন তা সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা। উদ্দেশ্য তার স্পষ্ট। তাতে ছলনার চেষ্টা নেই। এই উদ্দেশ্য স্বীকার করতে লেখক ও শিল্পীরা কেউ কুণ্ঠিত নয়। তারা বলতে চায় না, 'না, না, আমাদের উদ্দেশ্য নেই। আমরা শুধু শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টি করি।' বরং এইটাই বলতে চায়, 'আমরা শিল্প সৃষ্টি করি ; কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে, আদর্শ আছে।' এই অকুণ্ঠ সত্যের বলেই তারা সাধারণকে তৃপ্ত করে, আর দৃষ্টিবান সমালোচকের মধ্যেও স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। এরূপ সমালোচকেরা বোঝেন—আমাদের 'বিশুদ্ধ শিল্প' পরিবেশনের

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি, তারপর প্রতারিত করা হয়নি প্রচার-দৃশ্য দিয়ে। তাঁরা জানেন, 'এরা দিতে চায় বাস্তব শিল্প ; আমরা দেখব ঠিকমত প্রকাশ হল কিনা জীবন।'

এঁদের নাট্যসাহিত্যে কোথাও তাই ছলনা নেই। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জবানবন্দী'তে তাই নাটকীয় হবার চেষ্টা নেই—গান নেই, হাসি নেই, স্মার্ট কথাবার্তা নেই, আছে একেবারে সহজ, সুস্পষ্ট ঘটনা। গৃহ ছেড়ে একটি কৃষক পরিবার এল শহরে অন্নের খোঁজে, অনাহারে তাদের মধ্যে স্নেহ-প্রেমের বন্ধন দুদিনে ছিঁড়ে যেতে লাগল, ছোট ছেলেটি মরল, কৃষকবধূ দেহ বিক্রয় করলে, আর পরিবারের বৃদ্ধ কর্তা মারা গেল চোখে নিয়ে তার ক্ষেতভরা ফসলের স্বপ্ন। চার দৃশ্যে এক অঙ্কে এক ঘণ্টার মধ্যে এই নাটকের অভিনয় হয়। এ নাটক নাট্যসাহিত্য হিসাবে যে সার্থক তা দর্শকের দিকে তাকালেই বোঝা যায়! নাট্যসাহিত্যের প্রধান মানদণ্ড তা'। এ নাটকের শক্তির উৎস হল তার সত্যনিষ্ঠা, ঘটনা আর বলিষ্ঠ সংলাপ। এর ত্রুটি সম্ভবত এই যে, তাতে নিঃশ্বাস ফেলবার কোনো অবকাশ নেই—হাসি নেই ; গান নেই, ট্রাজিক রিলিফ্ কোথাও মেলে না। হয়ত নাট্যকার দিতেও চান না।

তবু 'জবানবন্দী' পুরো নাটক নয় একে চিত্র বা নক্সা বললেই ঠিক বলা হবে। লেখক নতুন নাটক রচনা করেছেন 'নবান্ন'। তা চার অঙ্কের নাটক, তাতে অনেক দৃশ্য, অনেক ঘটনা। 'অরণি'তে তা ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে। তার-বিষয়বস্তুও এই মন্বন্তরের ক্রমিক প্রকাশ, প্রসার ও পরিণতি তিনি এই নাটকে তুলে ধরেছেন। নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে লেখক যেরূপ দৃষ্টিশক্তির ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, 'নবান্নে' তার স্ফুরণ দেখছি। এবার তা নিশ্চয়রূপে সার্থক হবে অভিনয়ে।

কারণ, আশার কথা আছে। বাঙলার লেখকদের মতই অভিনয়ে শিল্পীরাও অনেকেই 'গণনাট্য সঙ্ঘের' সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই ছিলেন এঁদের সভাপতি। গণনাট্যের মধ্যে তাঁরাও একটা নতুন সম্ভাবনা দেখছেন। সাহিত্যিক ও রঙ্গমঞ্চের কর্ণধারদের এই শুভ সম্মেলন ঘটলে বাঙলার নাট্যকলার এই চতুর্থ যুগের সূচনা ব্যর্থ হবে না। আমরাও দেখব—এবার বাঙলা নাট্যকলা বাঙালীর নাট্যকলা হয়ে উঠল।

গণনাট্য সঙ্ঘের নৃত্যাভিনয়

মাঘ মাসের (১৩৫১) শেষ সপ্তাহ ও এই ফাল্গুনের প্রথমার্ধ জুড়ে যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এ দেশে হয়েছে, তার মধ্যে কলকাতায় 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের' নৃত্যোৎসবটিকেই প্রধান স্থান দিতে হবে। এই নৃত্যোৎসব দেখে আমরা সকলেই ভারতবর্ষের লোক-সঙ্গীত ও লোকনৃত্যের একটা নতুন পরিচয় লাভ করেছি, সকলেই উপলব্ধি করেছি—ভারতের লোক-জীবন কত সুন্দর সম্ভাবনাময়।

কথাটা যে কত সত্য, তা বুঝবার জন্য একদিনকার কথাই বলি। সে দিন দু'জন খ্যাতনামা বন্ধুর পাশে বসে এই নৃত্যোৎসব দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল (১৩ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার)। তাঁদের একজন লেখক-সম্পাদক আর একজন এক প্রধান ঔপন্যাসিক।

অভিনয় আরম্ভের প্রথম দিকে আমরা বিলম্বে আগত দর্শনার্থীদের যাতায়াতে একটু বাধা পাচ্ছিলাম।...

নৃত্যোৎসব আরম্ভ হল। দর্শনার্থীদের বাধা সত্ত্বেও উদ্বোধন-সঙ্গীত বন্ধুদ্বয়ের ভালো লাগল। 'দামামার আহ্বান' দেখে সম্পাদক নিজ থেকে বললেন, 'সুন্দর'। তারপর বললেন, 'দামামা-বাদক আরও একটু পেশী-বহুল হলে আরও ভালো হত'। নিজের মতামত দিয়ে আমি তাঁদের উপভোগে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে চাইনি, তাঁদের স্বতঃউচ্ছ্বসিত মতামতই শুনতে লাগলাম। হায়দ্রাবাদের বেদে নাচ 'লাম্বাডি' নৃত্য' দেখে দুইজন সাহিত্যিকই তন্ময় হয়ে গেলেন। সম্পাদক-বন্ধু তা শেষ হতে বার বার বললেন, 'অপূর্ব'। ঔপন্যাসিক-বন্ধু সানন্দে বললেন, 'চমৎকার'।

এল তারপর শচীন্দ্রশঙ্করের একক নৃত্য—'তার মৃত্যু হল অনাহারে'। বন্ধুদ্বয়ের তা ভালো লাগলো। এলো 'ধোবী নৃত্য'—বুঝলাম বন্ধুরা জমে গেছেন। তারপর হল 'তাঁরা আবার মিলিত হোন'। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার নিয়ে এটি রচিত; সেই সাময়িক কাহিনী পেয়েছে নৃত্যে-গানে রূপ। শেষ হতে সম্পাদকবন্ধুই সপ্রশংস চোখে বললেন, 'ভালো হয়েছে—তবে মঞ্চটা ভালো নয়'। ঔপন্যাসিক বন্ধুও সায় দিলেন সস্মিত মুখে 'হাঁ; তবে হয়েছে ভালো'। তারপর 'যৌথ কৃষির নৃত্য'। সম্পাদক ও ঔপন্যাসিক দুই বন্ধুই তখন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, তাঁদের চোখে-মুখে আর আনন্দ ধরে না।

দশ মিনিট বিরামের পর হল 'রামলীলা'। পশ্চিমের রামলীলার অভিজ্ঞতা আছে ঔপন্যাসিক বন্ধুর। যখন নৃত্যগীত রঙ্গমঞ্চে জমে উঠতে লাগল নিজ থেকেই তিনি বললেন—'এবার রামলীলার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে'। তারপর যখন শেষ হল—হাসিমুখে বললেন,, 'বেশ নিখুঁত হয়েছে'। শেষ নৃত্য 'ভারতের মর্মবাণী'। তা শেষ হল যখন তখন সম্পাদক-বন্ধু যেন উন্মনা হয়ে গিয়েছেন, আর ঔপন্যাসিক-বন্ধু হয়েছেন উল্লসিত।

দাঁড়িয়ে উঠে বেরুতে বেরুতে ঔপন্যাসিক বন্ধু সোৎসাহে বললেন, 'অদ্ভুত'। আমি জানতে চাইলাম—সমালোচক হিসাবে কি খুঁত দেখলেন তাঁরা। ঔপন্যাসিক-বন্ধু বললেন, 'গলা বাড়িয়ে দেওয়া (রামলীলায়?) বোধ হয় লোকনৃত্যে দেখিনি—ঠিক জানি না। তা হলেও খুব ভালো লেগেছে।' সম্পাদক-বন্ধু বললেন, 'ভারতের মর্মবাণীর গান ও নৃত্য ভালো, কথা কিন্তু দুর্বল। আর সমস্ত জিনিসটা সংক্ষিপ্ত মনে হয়। তা ছাড়া, তাতে বাঙলা দেশই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও অদ্ভুত।' ঔপন্যাসিক-বন্ধু কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক পর্বকে দীর্ঘতর করবার পক্ষপাতী নন। বললেন, 'তাতে একঘেয়ে হয়ে উঠবে জিনিসটি।'

সম্পাদক-বন্ধু লেখকও। বললেন, 'ভারতের মর্মবাণীর মত একটি দু'-ঘণ্টার নাটক আমাদের 'সঙ্ঘ' পরিকল্পনা করেছে। আমি লিখেছি গান, আর একজন লিখেছে গদ্যাংশ।' সম্পাদক-বন্ধুর গৃহেই চলেছিলাম—তিনি নিজের লেখা নিয়ে এলেন, পড়ে শোনালেন। দু'টি কবিতার অধ্যায়—একটিতে ইংরেজ আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের পল্লীবাসী, তাঁতী, কুলনারী প্রভৃতিদের গীত—'দিল্লী অনেক দূর'। আরটি ইংরেজ আগমনের পরে তাঁদের গীত—অতিথিকে সম্বর্ধনা, অতিথি উত্তরে খুঁজছে মুনাফার ব্যবসা।* মোটামুটি বেশ কাব্যরস আছে কবিতাগুলোতে। পাঠ শেষ হলে ঔপন্যাসিক-বন্ধু বললেন, 'বেশ, এটা অভিনয় করো না?' সম্পাদক-বন্ধু বললেন, 'আমাদের লোক কই?'

আমি জানালাম—শৃঙ্খলানুবর্তী ও জনশক্তিতে বিশ্বাসী বলে ছ মাসেই গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীরা এ সব শিখেছে। অন্যেরাও নিশ্চয়ই তা পারবেন।

রাত হয়েছে, বিদায় নিচ্ছিলাম। ঔপন্যাসিক-বন্ধু বললেন, 'এই তো নাটকের বিষয়বস্তু। আমরা রামায়ণের মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কবিতা-নাটক লিখি। কেন লিখি? কারণ, লোকের মনে সে জিনিস একটা ক্ষেত্র তৈরি করে রেখেছে। সমস্ত ভারতবাসীর মনে তেমনি তৈরি হয়ে আছে আজ এই রসের ক্ষেত্র—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ও পরাধীনতার বেদনায় সে মন পরিপূর্ণ। এ নিয়েই নাটক লিখব আমি—কিন্তু লিখব কি? নাট্যশালার কর্তাদের জন্য লিখতে ইচ্ছে করে না'।

সেই সমস্যাও জানি। সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তারা আজ 'নবান্ন' অভিনয় করবার জন্য রঙ্গশালা ভাড়া দিতেও চায় না। বলে—নবান্ন অভিনয়ে তাদের ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়। বললাম বন্ধুকে, 'আপনি নাটক লিখুন। গণনাট্য সঙ্ঘ অভিনয় করবে।'

বিদায় নিলাম। দেখলাম লোক-কলায় উদ্বুদ্ধ দু'জন সাহিত্যিককে; একজন একটু উন্মনাও, আর একজন তেমনি উল্লসিত।

পরদিন গণনাট্য সঙ্ঘের দু'একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি, বললেন সম্পাদক?' যা শুনেছি আগে তা'ই বললাম।

---

* কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে অভিনীত 'অভ্যুদয়' পবে এ সব গানই স্থানলাভ করেছে। লেখক।

তাঁরা জানতে চাইলেন, 'কি লিখবেন সম্পাদক ?'

হাসলাম। অনুমান করতে পারি।

অনুমান যে মিথ্যা হয়নি তা দেখলাম 'শনিবারের চিঠি' ফাল্গুন সংখ্যায়। সেই সম্পাদক-লেখক ছিলেন সজনীকান্ত দাস, আর ঔপন্যাসিক-বন্ধু 'বনফুল'।

[ফাল্গুন, ১৩৫১]

নন্দলালের কংগ্রেসের চিত্রমালা

কলিকাতার শিল্প-রসিকদের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্য তাঁরা শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর অংকিত হরিপুরা কংগ্রেসের চিত্রমালা আবার এখানে দেখতে পেয়েছেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে সে চিত্রমালার একটি প্রদর্শনী হচ্ছে শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র চন্দ্রের বাড়ির দোতালার বারান্দায়।

হরিপুরার পূর্ব থেকেই কংগ্রেস গ্রাম-যাত্রী হয়। ফৈজপুরা থেকেই তার বার্ষিক অধিবেশন গ্রামে হয়, হরিপুরায় সেই গ্রামযাত্রা আরও সার্থক করবার আয়োজন হয়েছিল। শিল্পগুরু নন্দলাল গ্রহণ করেন আপনার তুলিকাযোগে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার ভার। গ্রামযাত্রী কংগ্রেসের মর্মকথা তাঁর শিল্পীমনকে স্বভাবতই আকর্ষণ করে। আমরা সকলেই জানি, অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যাঁদের জীবন-দর্শন নন্দলালকে বিশেষ রকমে প্রভাবিত করে তাঁরা হচ্ছেন গান্ধীজী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। এদিক থেকে তাঁর ও রলাঁর জীবন-যাত্রায় একটা মিল আছে—তা ভুলবার নয়। তবে রলাঁর জীবনজিজ্ঞাসা অগ্রসর হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এক আত্মঘোষণায় স্থির হয়—I WILL NOT REST ; সে কথার এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু স্মরণীয় এই যে, গান্ধীজীর সাধনা শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের চিত্তে কিরূপ সাড়া জাগিয়েছে। হরিপুরা কংগ্রেসের চিত্রমালায় নন্দলাল সেই মর্ম কথাকে রূপ দিয়েছেন ঃ—ভারতবর্ষ তো পল্লীবাসীই, তার সাত লক্ষ গ্রামে সে তার আসন বিছিয়ে দিয়েছে। কত রাজা এল, গেল ; কিন্তু ভারতবর্ষের পল্লীকেন্দ্রিক সেই জীবনযাত্রা অব্যাহত রয়েছে—সেই ফল ফুল গাছ, সেই গরু আর ছাগল, সেই পাতার আড়ালে পাখী,—তার সব রয়েছে তেমনি। সেই ঘরের বধূ সহজ প্রসাধন করছে, সেই চাষী করছে চাষ, তাঁতী বুনছে তাঁত, গোদাগি চালাচ্ছে গাঁয়ের মজুর ; ধুনুরি তুলো ধুনছে, বুটী তুলছে বুড়ো ওস্তাদ চোখে চশমা এঁটে, গাই দুইছে আহিরিণী গোয়ালিনী, ধান কুটছে গ্রামের বউ, দঙ্গল হচ্ছে কুস্তীগীরে কুস্তীগীরে, সেই পুরানো দিনের লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালারা খেলা দেখাচ্ছে, বাজনা বাজাচ্ছে,—ঢোল, একতারা, সারাঙ্গি—আমাদের পল্লীর শিল্পী। এইতো ভারতবর্ষ, এই তার চিরদিনকার জীবনযাত্রা—যার উপরে ইংরেজের মার্কা পড়েনি, শহরের ছাপ নেই, শিল্প যুগের কোনো দাগ লাগেনি। এই ভারতবর্ষই গান্ধীজীর প্রিয়, এই ভারতবর্ষকেই নন্দলাল তুলির টানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সৈনিকদের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলতে যত্ন করেন হরিপুরায়।

কি আশ্চর্য সেই তুলির টান। দেখে দেখে যেন দেখা শেষ হয় না। এমন ছন্দোময় রেখার লীলা বড় দেখা যায় না। সেই দেশী রঙও যেন দেশকে ফুটিয়ে তুলছে। 'পাটার' মত ছবি ; অংকন পদ্ধতিতে এক একবার মনে পড়ে অজন্তার চিত্রাবলীর কথা, আবার মনে পড়ে আমাদেরই পটুয়াদের কথা ; কিন্তু মনে না পড়ে পারে না তবু নন্দলালকে। এই চিত্রাবলীতে রয়েছে সেই শিল্পীর অম্লান স্বাক্ষর।

কেউ বলবেন—"তা নয় হল, কিন্তু এই কি ভারতবর্ষের সাক্ষ্য ? শুধু গ্রামই কি ভারতবর্ষ, শহর নয় ? উজ্জয়িনী নেই ? নেই বিদিশা, দশার্ণা, নেই বারাণসী, পাটলিপুত্র, নালন্দা, তক্ষশীলা ? কিংবা কলিকাতা, বোম্বাই ?" আবার কেউ বলবেন, "তাও নয় হল, কিন্তু বিলিতী এমব্রয়ডারী ঘেরা পথ দিয়ে কলকাতার ধনিকগৃহের দ্বিতলে দাঁড়িয়ে সিগারেট-পায়ী আমাদের জন্য খোলা প্রদর্শনী—গান্ধীজীর গ্রামোদ্যোগের সঙ্গে এরই বা কি সঙ্গতি আছে, আর কি করেই বা একে বলা যাবে 'লোকগত

শিল্প?' এমনি ধারা বাঁকা তর্ক না শুনেছি তা নয়। দুঃখের বিষয় তাঁরা বলেন না—লোকশিল্প বলতে তাঁরা কি বোঝেন। নন্দলাল শিক্ষিত শিল্পী বলেই কি লোকশিল্প সৃষ্টি করতে অক্ষম? শহরের লোকদের সামনে আমাদের লোকশিল্পের বা গ্রাম-জীবনের কোনো উপাদান উপস্থিত করলেই কি সে চিত্র বা সঙ্গীত বা নৃত্য আর লোকশিল্প হবে না? তাহলে তো হরিপুরার মতো লক্ষ লোকের সমাবেশক্ষেত্রেও এরূপ চিত্রাঙ্কনের কোনো সার্থকতাই নেই—তার প্রদর্শনী খোলার কথা তো ছেড়েই দিলাম। শুধু পল্লীবাসী পটুয়ার হাতেই কি লোকশিল্প তার গতানুগতিক পথে ফুটবে? তাহলে তো তার প্রাণ শেষ হয়ে যাবে—যেমন গেছে আমাদের পটুয়াদের শিল্পের প্রাণ। বরং পল্লীশিল্পের ভিতরে যে প্রাণ আছে এ কালের শিল্পীর প্রয়াস হবে নতুন করে তাকে মুক্তি দেবার, অতীত ও বর্তমানের রূপদক্ষতায় তাকে পরিপুষ্ট করার,—পল্লীশিল্পের ধারাকে তিনি বইয়ে দেবেন সামনের দিকে—অতীতের আবর্তে আবদ্ধ হতে না দিয়ে এগিয়ে দেবেন বর্তমান থেকেও ভবিষ্যতের দিকে। নন্দলালও অতীত যুগকে এভাবেই এ কালের মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে দিতে চান।

কোনো শিল্পকে 'লোকগত' বলব, না 'পরলোকগত' বলব, 'পল্লীশিল্প' বলব, না 'নাগরিক শিল্প' বলব—এ সব প্রশ্ন অনেক সময়েই উদ্দেশ্যমূলক। তার বিচার-বিবেচনায় অন্তত দেখতে হবে—সেই শিল্প নিদর্শনের মর্মবস্তু (content) লোকের মর্মকথা কি না, তার রূপরীতি (form) লোকগত কি না; আর আসল কথা—কি সেই শিল্পের লক্ষ্য। এ সব দিকে শিল্পের নিজের সাক্ষ্যই যথেষ্ট—দর্শক, বা শ্রোতাদের মনে কি ভাব সে সঞ্চার করে—তাই হোক সে দর্শক। মনে করিয়ে দেয় কি তার লোক-জীবনের কথা, জনতার সুখ দুঃখের কথা, তার বাস্তব রূপ ও ভাবী সম্ভাব্যতার কথা? তাহলে নিঃসন্দেহ তা লোকশিল্প—নিঃসন্দেহ সৃষ্টিশীল সৃষ্টি। [ফাল্গুন, ১৩৫১]

যামিনী রায় ও "জাতীয়" চেতনা

শিল্পাচার্য যামিনী রায়ের চিত্রপ্রদর্শনী বৎসরের পর বৎসর এদেশের শিল্পরসিকদের একটি প্রধান আকর্ষণ-স্থল হয়ে উঠেছে। এবারও (পৌষ মাস, ১৩৫১) যামিনী রায়ের গৃহে খান তিন-চার ঘরে তিনি তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। ছোট ঘরে, আর বারান্দায় সর্বত্র চিত্র আর নানা চিত্রিত শিল্পবস্তু; আলোকে উজ্জ্বল প্রাচীর থেকে সব কথা কয়ে ওঠে। চারিদিকে কত রঙ। রঙ আর রঙ—যেন কোথাও ছেদ নেই। ঢুকতেই এই কথাটা মনে হয় বেশি—যেন কোন দেশী মেলার সুসজ্জিত স্টলে ঢুকছি। হয়ত তার জন্য দায়ী দর্শকেরাও। নানা জাতির নানা দেশের সুবেশ ও সুবেশিনী দর্শনার্থী,—পথে তাদের গাড়ির ভিড়, ঘরে তাদের উৎসাহিত চলাচলের ভিড়—এর মধ্যে নিজেকেই মনে হয় অবান্তর। প্রাচীরে এক রূপ জীবনদর্শনের স্বাক্ষর, এক জীবন-যাত্রার সাক্ষ্য; আর তাদের সামনে জীবন্ত নরনারীর অন্যরূপ জীবন-দর্শনের, অন্যরূপ জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ প্রমাণ: —এর মাঝখানে আমি,—যে প্রাচীরের জীবন-দর্শনকেও আপনার সর্বস্ব বলে বুঝি না; চতুর্দিকের নর-নারীকেও আপনার বলে মানি না। তাই নিজেকে মনে করি একান্ত—মেলার দর্শনার্থীর মত একা। শিশুর সরল বিস্ময় নিয়ে নিজে দেখলে হয়ত একভাবে জীবন-দর্শনের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা বুঝতে পারতাম; অতিবিদগ্ধের মত সুমার্জিত দৃষ্টি নিয়ে দেখলেও হয়ত দেখতে পেতাম এ সবের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা। কিন্তু আমি শিশুও নই, অতি-মার্জিত মানুষও নই—এ দেশের এ কালের সাধারণ মানুষ। সেই সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে যামিনী রায়ের চিত্র-প্রদর্শনী দেখি—এবং সাধারণ মানুষের মত করেই আনন্দও তাতে পাই।

যামিনী রায়ের নিজের অঙ্কনরীতি আজ সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর সেই পুরানো ধরনের আঁকা চিত্রাবলী এবারও রয়েছে, যেন পুরানো চিত্রের নতুন সংস্করণ। যামিনী রায়ের ক্রেতারা নাকি তাতে দুঃখিত। তাঁদের কেনা জিনিস একমাত্র তাঁদেরই ঘরে থাকবে, এই তাঁদের প্রত্যাশা। যুগটা একচেটিয়া কারবারের যুগ—ধনিকতন্ত্রের ঝোঁক হল ব্যবসাপত্র থেকে সংস্কৃতিকে পর্যন্ত একচেটিয়া করে

ফেলা। কিন্তু যামিনী রায় তাঁদের নিরাশ করেন—তিনি আমাদের সেকেলে (প্রাক্-ধনিক যুগের) পটুয়া বা কুমোরের মত এক ধরনের চিত্রই বরাবর আঁকেন—সংস্করণ নতুন, কিন্তু তবু এক ধরনের যে। যাক, নতুন সংস্করণ হওয়াতে যাঁরা যে চিত্র ভালবাসেন তাঁরা অনেকে তা কিনতে পারেন। কোনো চিত্র শুধু কোনো ভাগ্যবানের প্রাচীরেই বন্দী থাকবে না। সে তার যশোদার-কৃষ্ণই হোক কি গোপিনীই হোক। এটা আমরা ভালোই মনে করি। তা ছাড়া, যামিনী রায়ের চিত্রের দামও তুলনায় কম—যদিও তাঁর ক্রেতাবা অনেকেই বিদেশী ও বিত্তবান। এদিকেও যামিনী রায়ের সুবিবেচনা সাধারণের শিল্পরুচি উন্নয়নের সহায়ক। এবারকার 'প্রদর্শনীতে' যামিনী রায়েব দেশী ধরনের চিত্র ছাড়াও বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য খৃষ্ট বিষয়ক চিত্রাবলী, আর তাঁর নানা ল্যাণ্ডস্কেপ। কিছুকাল ধরেই শিল্পী এ সব দিকে মন দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল তাঁর খৃষ্ট চিত্রমালায় গথিক্, বাইজেন-টাইন বা অনুরূপ পদ্ধতির ছাপ রয়েছে—এখন মনে হয় তা আমাদের দেশী পটের মত হয়ে উঠছে, আমাদের নিজস্ব হচ্ছে। ল্যাণ্ডস্কেপে কিন্তু এখনো ফরাসী শিল্পীদের ছাপ স্পষ্ট, সিজান, ভান গোগের কথা বিদগ্ধদের মনে পড়ছে। তবে যামিনী রায় তাতে কোথায় পৌঁছবেন তা ঠিক নেই।

শিল্পী যামিনী রায় কোথা থেকে যাত্রা শুরু করে কোথায় এসে পৌঁছেছেন—এ ইতিহাসে অবশ্য লাভ নেই। যখন প্রথম তিনি এই নতুন জগতে প্রবেশ করলেন তখন দুজন শিল্প রসিকেব থেকে সে বার্তা আমরা শুনেছিলাম—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শিল্পীর গৃহে তাঁব শিল্প নিদর্শন তখন দেখেছি, তাঁব নিজেব মুখেও শুনেছি—এ শুধু তাঁর নিজেব জগৎ নয়, আমাদের জাতির সহজ ও স্বাভাবিক জগৎ এটাই। আমাদেব সাধারণ দৃষ্টিতে তখন মনে হয়েছিল তিনি বাঙলাব পটের পদ্ধতিতে নিজের প্রকাশ পথ পরিষ্কার করেছেন। তারপর থেকে যামিনী রায় সে পথ ধরে চলেছেন—চলেছেন, থেমে থাকেননি। তিনি কেবলই বাহুল্য বর্জন করে সহজ থেকে সহজতর হতে চাইছেন, রূপকে বন্দী করতে চাইছেন সরলতর রূপেব নিয়মে, আপনাকে প্রকাশ করতে চাইছেন স্ব-ভাবগত নিয়মে, মানে জাতির স্বভাবগত পদ্ধতিতে। তিনি মনে করেন এই তাঁব স্বধর্ম, কেননা, এইটাই আমাদের জাতির পক্ষে স্বধর্ম। আমরা এইভাবেই নিজেদের প্রকাশ করেছি, এইভাবেই আমাদেব পক্ষে কথা বলা সম্ভব;—আমরা "ওদেব মত" নই, সে জীবন-যাত্রা আমাদের নয়, সে জীবন দৃষ্টিও আমাদেব নয়; সে জীবন-ধর্ম আমাদের পক্ষে পরধর্ম। এই দিক থেকে দেখলে—যামিনী রায়ের শিল্পকলা 'লোকগত' তো নিশ্চয়ই, তা একেবারে নির্ভাজ "জাতীয়" শিল্প। মানে, আমরা যদি সত্যই জাতি মানসকে চিনতাম তা হলে এ শিল্পকেই বলতাম "জাতীয় শিল্প।" কিন্তু দেখা যাচ্ছে—আমাদেব যারা জাতীয়তাবাদী, তাঁরা এ শিল্পে উৎসাহী নয়, এবং সাধারণ লোক আজ অন্তত আর এ শিল্প দেখে চিনতেও পারে না। তার কারণ বলা যেতে পারে এই—জাতীয় মন যদিও বদলাতে পারে না, বদলায়নি, তবে জাতীয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে সাময়িকভাবে আমরা এবং লোক-সাধারণও সেরূপ সাময়িকভাবে স্বধর্ম খুইয়েছি।

কিন্তু দেখা গেল—যারা এ জাতির কেউ নয়, তাঁরাই যামিনী রায়ের শিল্পকে সমাদর করছেন! বলা যেতে পারে তার কারণ—তাঁরা তাঁদের 'স্বধর্ম' হারাননি; তাই অন্যের ধর্মেরও মানে বুঝতে পারেন—যেমন, তাঁরা নিগ্রো আর্ট বুঝতে পারেন, চীন আর্ট বুঝতে পারেন। আমাদের আর্টও তাই বুঝতে পারেন। কিন্তু আরও কারণও থাকতে পারে। শিল্পের এমন কোনো একটা মৌলিক সত্য আছে কি, যার দরুন তা পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যে ঢাকা পড়ে না, বাহ্যবস্তুর বাহ্য সাক্ষ্যের উপরে তা অন্তত নির্ভর করে না? তা থাকলে যে কোনো জাতির ও যে-কোনো কালের মানুষ সেই মৌলিক মাপকাঠিতে যে কোনো শিল্পকে বুঝতে পারবে। তখন দেখা যাবে—শিল্পীর স্বধর্ম, তার জাতির স্বধর্ম এ সব গৌণ,—আসল হল 'শিল্পের ধর্ম।' এ কথা সত্য হলে—যামিনী রায় যাই বলুন—ইউরোপীয় শিল্প-রসিকরাও তাঁর শিল্পকে সহজে মানতে পারে—মূল সেই শিল্প-ধর্মের স্বাক্ষর যদি তাঁর চিত্রে পড়ে। ঠিক এই জন্যই এ দেশেরও যাঁরা পরিশীলন-কুশল রসিক—সর্বাপেক্ষা বিজাতীয় তাঁরাই হলেন যামিনী রায়ের শিল্পের সর্বাপেক্ষা বেশি সমজদার। তাঁরা অনেকেই জাতি-চিত্ত, জাতীয় ভাবধারা থেকে বিচ্যুত,—যামিনী রায়ের মতে তাঁদের উপরই পরধর্মের

প্রভাব পড়েছে বেশি। তাঁর এই সর্বাপেক্ষা বেশি "জাতীয় শিল্পের" এদেশে কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি গুণগ্রাহী তাঁরাই। কিন্তু তাঁদের এই উৎসাহ খাঁটি, না মেকি? হয়ত দুইই—কতকটা রোজার ফ্রাই, ক্লাইব্ বেল্ প্রমুখদের শিল্প-নজিরের ফলে তাঁদের এ দৃষ্টি জন্মেছে, কতকটা এদেশে পিকাসো, মাতিস্ আবিষ্কারের নেশায় তাঁরা উৎসাহী। আবার এও ঠিক, শিল্পীর মতবাদ যাইহোক, যামিনী রায়ের শিল্পে তাঁদের রসবোধ নিশ্চয়ই তৃপ্ত হয়।

আমাদের মত সাধারণ মানুষ কিন্তু পটকেই চরম সৃষ্টি বলে বোঝে না; এমন কি, আমাদের জাতীয় প্রাণ যে একমাত্র ওইভাবেই আপনাকে প্রকাশ করতে সক্ষম, তাও অনুভব করি না—হতে পারে, পরধর্মের ছাপ আমাদের মনে পড়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা অনন্যনির্ভর গুণ বা abstract qualities-কেই শিল্পের একমাত্র স্বীকার্য বলে বুঝি না। আমরা রূপ দেখি, কিন্তু অত সূক্ষ্ম করে ব্যঞ্জনাময় রূপ বা significant forms-এর তত্ত্ব বুঝি না। অনেকটাই আমরা বস্তু-রূপের দ্বারা প্রভাবান্বিত, তা দিয়েই শিল্পের রূপকে বিচার করি। আমাদের উপহাস করা যেতে পারে, আমরা ফটোগ্রাফ দেখলেই পারি। কিন্তু সে উপহাসও উপহাস্য। কারণ শিল্প যে ফটোগ্রাফ নয়, এটুকু আমরা বুঝি। দেশী হাটে, বাজারে, মেলায় লক্ষ্মীর সরা, কিংবা চালচিত্র, আলপনা এ সব দেখে এখনো সুখ পাই; তবু বস্তুরূপকে অগ্রাহ্য করলেই শিল্পের চরম হয় তা মানি না। কিন্তু তথাপি আমরা স্বীকার করব যামিনী রায়ের শিল্প প্রদর্শনীতে গিয়ে তাঁর চিত্রাবলী দেখে, এমন কি, তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপগুলি দেখেও পরম আনন্দলাভ করেছি। আমরাও বুঝি, যামিনী রায়ের শিল্প-বলে বাঙলাদেশ চিত্রকলা-জগতে এক নতুন স্বীকৃতির অধিকারী হয়েছে।

'শিল্পের ধর্ম', 'জাতীয় মানস' বা 'শিল্পীর স্বধর্ম'—প্রভৃতি কথা থেকে নানা রকমের রহস্যবাদ জন্ম লাভ করে। আমরা সাধারণ মানুষেরা তাতে বিভ্রান্ত হই। দরকার বরং এভাবে আমাদের বিভ্রান্ত না করে আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতিকে স্বচ্ছ করে তোলা—ধর্মাধর্ম আপনা থেকেই তারপরে একদিন স্থির হয়ে যাবে। অথবা ধর্মস্য তত্ত্বং চিরদিনই থাকবে নিহিতং গুহায়াং। [ফাল্গুন, ১৩৫১]

ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপ

এই সেদিন একটি ছোট প্রদর্শনীতে গিয়ে আমরা তৃপ্ত পেলাম। প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তা ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপ। এবার তাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন শিল্পী নীরদ মজুমদারের চিত্র প্রদর্শনীর। নীরদ মজুমদার ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রাক্তন ছাত্র—কেই বা সেই সোসাইটির ঋণ একেবারে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু পূর্বতন পদ্ধতির সুলভ পুনরাবৃত্তির ঝোঁক কাটিয়ে এই শিল্পী বেরিয়ে এসেছেন; শিল্পগুরু যামিনী রায়ের দৃষ্টান্তই তাঁকে এখন পথের নির্দেশ দিচ্ছে। রূপ ও রেখা নিয়ে তাঁর প্রয়াস সৃষ্টিতে সার্থক হয়ে উঠেছে কয়েকখানা চমৎকার চিত্রে। সেগুলোর প্রেরণা জীবন্ত, গতানুগতিক নয়। জীবন শিল্পীকে ছুঁয়েছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, মন্বন্তর, মহামারী, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দুর্দিনের কঠিন সত্য আজ সাহিত্যিকদের মতই শিল্পীদের মনকেও নাড়া দিয়েছে। তাঁরা কেউ কেউ সেই সত্যকে রূপের জালে ধরতে চাইছেন—রূপেরই সত্যে তাকে পরিণত করে,—শুধু হুবহু বাহ্য দৃশ্য হিসাবে পটে সেই বাস্তবকে চিত্রিত না করে। নীরদ মজুমদারের শিল্পেও এই কল্পনা ও রূপানুসন্ধানের রূপ পরিচয় রয়েছে। তা দেখি তাঁর "তিনটি নগ্নমূর্তি'রা' সংস্থিতিতে, "কিংবা অনাথ দুঃস্থের" চিত্রে (এ চিত্রখানা পূর্বেও আমরা দেখেছি), "একটি পরিবারের" চিত্রে এবং ওরূপ আরও খানকয় চিত্রে। নাম মনে পড়ে না, কিন্তু চোখে এখনো সেই চিত্রগুলো ভাসছে! ক্যালকাটা আর্টগ্রুপ এ সব চিত্রের খানকয় একরঙা প্রতিলিপি মুদ্রিত করে ভালো করেছেন। শিল্পী নীরদ মজুমদারের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যণীয়—নিশ্চয়ই সাহস ও সংযমের সঙ্গে তিনি এগিয়ে যাবেন।

গোপাল ঘোষের প্রদর্শনী

গত ১৮ই নভেম্বর সুভো ঠাকুরের ষ্টুডিও ৩-এ, এস্. আর. দাস রোডে, তরুণ শিল্পী গোপাল ঘোষের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। দুটি ঘরে সব শুদ্ধ ১০৮টি ব্রাশ ড্রইং এবং ১০ খানি রঙিন ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই ছবির মিছিলের মধ্যে এসে প্রথম দর্শনে অভিভূত হতে হয় শিল্পীর রচনা বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন আঙ্গিকের ওপর অনায়াস ও বলিষ্ঠ দখল দেখে। এই রচনা প্রাচুর্যের মূলে হয়ত আছে তাঁর সহজ শিল্পবুদ্ধি, যার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ তাঁর চিত্রগুলিকে আভামণ্ডিত করে তুলেছে। অথচ শিল্পের সাহজিক বিকাশ ও জাগ্রত সমাজ চেতনা, সুসমন্বিত হয়েছে গোপাল ঘোষের রচনা প্রতিভায়। তাঁর ব্রাশ ড্রইং-এ আঁকা ছবিগুলিই অবশ্য বেশি ভালো লাগলো। দেখলাম মানুষ এবং তার নানা ভঙ্গির মুহূর্তগুলি, নির্ভীক ও দ্বিধাহীন রেখার গতিবেগে শক্তিমান হয়ে উঠেছে। তিনি কতগুলি কলিকাতার রাস্তার দৃশ্য এঁকেছেন যার ভিতর নগরীর কর্ম-চাঞ্চল্য সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর আঁকা কয়েকটি জন্তুর ড্রইংও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে গত মন্বন্তরের কয়েকটি ছবি হৃদয়কে খুব গভীরভাবে নাড়া দেয়। সবদিক দিয়ে গোপাল ঘোষের আঙ্গিকের পরিচয় দিতে হলে বলতে হয় যে তাঁর চিত্রগুলি ছন্দমুখর, দ্বিধাহীন, নির্ভীক ও সংযত রেখার কতগুলি মুহূর্তের রূপায়ণ। তাঁর ছবি আঁকার ভঙ্গির মধ্যে হয়ত কোথাও কোথাও চৈনিক শিল্পীর প্রভাব দেখতে পাই, তা হলেও, একথা স্পষ্ট যে গোপাল বাবু একান্তভাবে ভারতীয়ও আধুনিক। সার্থক রূপ-কর্মী হিসাবে গোপাল ঘোষের ভিতর আমরা আরও বলিষ্ঠ সমাজ-চেতনা ও জাগ্রত শিল্প-প্রচেষ্টা দেখতে আশা করি। [পৌষ, ১৩৫১]

"কাশ্মীর চিত্রাবলী"

শীত আরম্ভ হতেই কলিকাতায় দু'একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। দিলীপ দাশগুপ্তের আঁকা কাশ্মীর চিত্রের প্রদর্শনী তার মধ্যে প্রধান। ২৫শে নভেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সে প্রদর্শনী চলে। আর্ট স্কুলের অভ্যন্তরস্থ সার্ভিস্ আর্টস্ ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাবের গৃহে প্রদর্শনী বসেছিল।

দিলীপ দাশগুপ্ত বয়সে তরুণ হলেও আমাদের শিল্পীসমাজে অপরিচিত নন। তাঁর একাধিক চিত্র পূর্ব পূর্ব প্রদর্শনীতে প্রশংসা পেয়েছে, পুরস্কার লাভও করেছে। বৎসর তিন আগে চৌরঙ্গীতে একটি শিল্প সমিতির উদ্যোগে তাঁর নিজস্ব একটি চিত্র প্রদর্শনীও হয়েছিল। তাতে তাঁর অঙ্কিত মালয়ের মানুষ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য, পোট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ, অয়েল ও ওয়াটারকলার, এবং জয়পুর রাজপুতানার দৃশ্যাবলী অনেকেরই মনে আশার সঞ্চার করে। তার পরে যুদ্ধের বাজারে শিল্পীদের পক্ষে শিল্পোপকরণও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে; দিলীপ দাশগুপ্ত সার্ভিস্ আর্টস্ ক্লাবে সম্পাদক ও শিক্ষকরূপে শিল্প-সেবায় সময় কাটাতে বাধ্য হন। এই সময়ে তাঁর অঙ্কিত নতুন চিত্র আর বেশি সাধারণে দেখতে পায়নি। এবার দিলীপবাবু তাঁর সঞ্চিত শক্তি ও বিকশিত দৃষ্টির প্রমাণ নিয়ে আবার উপস্থিত হওয়াতে স্বভাবতই শিল্পানুরাগীরা বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছেন।

তিন সপ্তাহের ছুটিতে কাশ্মীর গিয়ে শিল্পী খান ৬০ ছবি আঁকবার সুযোগ পান। তিন সপ্তাহের অনেকটা সময় চলে যায় বৃষ্টি বাদলে, তখন তিনি কাশ্মীর দেখবার ও ছবি আঁকবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তারপরে অল্প কয়দিনে তিনি এঁকে চলেন মোট খান ৬০ ছবি—তার ৪০ খানা

তিনি এই প্রদর্শনীতে দিয়েছেন। খান ১০ পোর্ট্রেট; বাকি বেশির ভাগ ওয়াটারকলারে আঁকা কাশ্মীরের দৃশ্য, শ্রীনগরের বাড়িঘর, পথঘাট, দোকানপাট; আর দু'খানা স্প্যাচুলা। বহুচিত্রের ভিড় নেই বলে দেখা যেমন সুখকর হয়েছে তেমনি এই প্রদর্শনীর চিত্রাবলী দেখে শিল্পরসিকেরা আনন্দলাভ করেছেন।

পোর্ট্রেটের মধ্যে ১নং চিত্র 'বৃদ্ধ মাঝি' সকলকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করে। আরও খান দুই তিন পোর্ট্রেট্‌কেও প্রথম শ্রেণীর বলা চলে। তা ছাড়া মোটামুটি সব কয়টি প্রতিকৃতিতেই শক্তির প্রমাণ রয়েছে। 'বৃদ্ধ মাঝি'ই শিল্পীর কাশ্মীরে আঁকা প্রথম ছবি! মনে হয় স্বভাবতই শিল্পীর মনের আশা ও আগ্রহ তাতে উৎসারিত হয়ে পড়েছিল। দর্শকও তাকে সহজভাবেই প্রথম স্থান দিতে অসুবিধা বোধ করেন না।

ওয়াটার কলারের আঁকা দৃশ্যগুলিও চমৎকার। যাঁরা শ্রীনগর-কাশ্মীর দেখেছেন তাঁরা এসব চিত্র দেখে বিশেষ উৎফুল্ল হন। কিন্তু সকলেরই প্রথমে চোখে পড়ে এ চিত্রাবলীর এক উজ্জ্বল স্বচ্ছতা। সাধারণত আমাদের শিল্পীদের এদিকে এতটা দৃষ্টি ও প্রকাশ-কুশলতা দেখা যায় না। অথচ আমাদের দেশের আকাশ রোদে ভরা, উজ্জ্বল; বিলাতের আকাশের মত তা মেঘে ঢাকা গোমড়া নয়। বিলাতী ল্যান্ডস্কেপ নিদর্শনের ছায়াবাহুল্য আমাদের শিল্পীদের মন ও মেজাজের উপর ছায়াপাত করে কিনা জানি না। নইলে স্বভাবত আমাদের শিল্পীদের মন এদেশের প্রাকৃতিক প্রভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার কথা, আর তাঁদের চিত্রাঙ্কনেও প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল স্বচ্ছতা। দিলীপ দাশগুপ্তের ছবিতে এই স্বাভাবিক সত্যেরই আবির্ভাব দেখতে পাই।

কিন্তু সবচেয়ে এ চিত্রাবলীতে যা দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করে তা শিল্পীর অঙ্কিত তুষারাবৃত পাহাড়ের দৃশ্যাবলী। এরূপ খান সাত-আট বরফঢাকা দৃশ্য প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে (১৫নং ও ৩৫নং থেকে ৪০নং পর্যন্ত চিত্রাবলী)। প্রত্যেকটিই অতি চমৎকার। খিলিনমার্গ থেকে দেখা তুষার দৃশ্য (৩৮নং) কিংবা গুলমার্গ (৩৭নং) কিংবা চন্দন-ওআড়ির তুষারসেতু (৩৯ নং)—এক-একটি এক একজনকে বিশেষভাবে বিমুগ্ধ করে। একজন বিলাতী শিল্পীর কথায় বোধ হয় এই বরফ ঢাকা দৃশ্য-চিত্রগুলির ভালো পরিচয় লাভ করা যায়। দেখতে দেখতে তিনি বলেন, "আমার যেন শীত করছে।" গরমের দেশের শিল্পী বরফের দেশের শিল্পরসিককেও যখন এভাবে নাড়া দিতে পারেন, তখন বুঝতে পারি তাঁর সৃষ্টি কতটা উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের কাজের জন্য দিলীপ দাশগুপ্ত আমাদের শিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত এখনো একক। তা তাঁর স্প্যাচুলার কাজ। সে-সব কাজের নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে ছিল; 'ঝিলম্‌ নদী' (১৩ নং চিত্র) এইটিই তাঁর এবারকার প্রদর্শনীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন; আর বোধ হয় তা সর্ববাদিসম্মত। আগেও শিল্পী এদিকে কাজ করেছেন; তাতেও তাঁর শক্তির পরিচয় ছিল। কিন্তু 'ঝিলম্‌ নদী'তে তিনি আরও উৎকর্ষ দেখিয়েছেন।

এই ছোট প্রদর্শনী দেখে সন্দেহমাত্র থাকে না দিলীপ দাশগুপ্ত শিল্পী হিসাবে একটা সুনির্ভর ক্ষেত্রে সমুত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর দৈহিক (কৈশোরে দুরন্ত ব্যাধির ফলে তার একটি হাত ও একটি পা ছেদন করতে হয়) বা আর্থিক কোনো বাধাই তাঁর শিল্পশক্তি ও শিল্পীমনকে ব্যাহত করতে পারবে না।

ভালো প্রতিলিপি মুদ্রিত করে না দিলে শুধু মাত্র লিখে কোনো চিত্রকলার স্বরূপ বুঝানো প্রায় দুঃসাধ্য। লেখার মধ্য দিয়ে আমরা গুণগ্রাহী দর্শকদের এদিকে আগ্রহ জাগাতে চেষ্টা করতে পারি। সে জন্যই শিল্পীদের কাছ থেকেও আমরা দাবি করি—আরও প্রদর্শনী ও যথাসম্ভব চিত্রের দাম কম করা, যাতে সাধারণ মধ্যবিত্তও চিত্রকলার আদর করতে উৎসাহ পান। কিন্তু দেশের সাময়িক-পত্রগুলোর কাছ থেকে আরও একটু সহানুভূতি নিশ্চয়ই সকলে প্রত্যাশা করেন। এই প্রদর্শনীর সংবাদটুকুও প্রায় কোনো দেশীয় সংবাদপত্রে ভালো করে প্রকাশিত হয়নি; প্রদর্শিত চিত্রের কোনো সমালোচনা বা প্রতিলিপি প্রকাশ তো এই সংবাদপত্র-জগতের চিত্রে বাক্যে প্রলাপ প্রশস্তির মধ্যে পাওয়াই যায়নি। তথাপি এ সময়েও অবশ্য আমাদের সংবাদপত্র শিল্প ও সংস্কৃতির সংবাদ ও চিত্র প্রকাশ করবেন—হয়ত তা করবেন বিলাতী ও দেশী কর্তাদের হাতে কোনো লেখা বা ছবি সার্টিফিকেট পেলে পর, তার।

[পৌষ, ১৩৫১]

ইতরতার বেসাতি

কবি গোলাম কুদ্দুস লেখক ও সাংবাদিক। গত বৎসরও তিনি ছিলেন বাঙলার প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক। ৯ই ডিসেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যায় তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক অফিস থেকে একজন মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে আসছিলেন। লোয়ার সার্কুলার রোড্ ও ক্রীক্ রো'র সংযোগস্থলে তাঁকে কয়েকজন যুবক-ধরনের গুণ্ডা মিলে আক্রমণ করে, মারপিট করে, কুদ্দুস আহত হন। আক্রমণকারীদের অজুহাত—কুদ্দুস কমিউনিস্ট পার্টি অফিস থেকে বেরুচ্ছেন এবং কমিউনিস্টরা পূর্বদিন (শনিবার, ৮ই ডিসেম্বর) দেশপ্রিয় পার্কের আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কিত সভার লাউড্ স্পীকারের তার কেটেছে।

অবশ্য কুদ্দুস একাই প্রহৃত হননি, সেদিন ঐ অফিস থেকে একা একা যাঁরা বেরুচ্ছিলেন তাঁরা অনেকেই ঐ সন্ধ্যায় প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হন। ঐ অঞ্চল ছাড়াও কলিকাতায় কালিঘাট ও হাওড়ার কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় অফিস আক্রান্ত হয়। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র পরিচালিত একটি শিশু-শিক্ষালয়ে তার একজন শিক্ষয়িত্রী আক্রান্ত হন। সোমবার, ১০ই বঙ্গবাসী কলেজেও শুনেছি কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন ছাত্ররা অন্যান্য ছাত্রদের হাত থেকে লাঞ্ছনা পেতে পেতে কোনোরূপে নিষ্কৃতি পায়। অন্যত্র সর্বক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা মারধর, ইটছোঁড়া ছাড়াও যে ইতর গালাগালি প্রয়োগ করে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের মুখে ছাড়া তা বাঙলাদেশে অন্যত্র শোনা যায় না। এই সব আক্রমণের ফলে যাঁরা আহত হন তাঁদের মধ্যে হিন্দু আছেন, মুসলমান আছেন, যুবক আছেন, তরুণী আছেন, হরতালী মজুর আছেন, আছেন আন্দামান-ফেরৎ সদ্য-কারামুক্ত রাজনৈতিক কর্মী,—আর আছেন কুদ্দুসের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বাঙালী লেখক ও সাংবাদিক। সর্বক্ষেত্রেই একই ওজুহাতে আক্রমণকারীরা ঘোষণা করে—'কমিউনিস্টরা দেশপ্রিয় পার্কের সভায় লাউড্ স্পীকারের তার কেটেছে'। রবিবার, ৯ই ডিসেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' এ-সংবাদ বিশদভাবে প্রকাশিত হয় যে, ৮ই ডিসেম্বরের সভায় সভার অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীমান অমিয়কুমার বসু সভাক্ষেত্রে ঐ কথা ঘোষণা করেছিলেন, এবং দু'জন লোককে সেরূপ অপরাধী কমিউনিস্ট বলে মঞ্চের উপর তুলে দেখিয়েছিলেনও। অতএব, যারা আক্রমণ করেছে তাদের যুক্তি বা প্ররোচনার অভাব ঘটেনি। অভাব ঘটেছিল শুধু একটি জিনিসের—সংযম ও সভ্যতার।

কিন্তু তারও পূর্বে অভাব ঘটেছে আর একটি জিনিসের—সত্যের। কারণ, ১১ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবারের 'যুগান্তর', 'বসুমতী' প্রভৃতি কংগ্রেসী কাগজে দেখা গেল কয়েকটি চিঠি : দু'জন অভিযুক্ত লোকই জানিয়েছেন তাঁরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। জোর করে, সেদিন মঞ্চের উপর তুলে নিয়ে তাঁদের এ-ভাবে লাঞ্ছনা করা হয়, মারধরও করা হয়। তাঁরা কেউ কমিউনিস্ট নন—একজন ভবানীপুর অঞ্চলের দোকানদার ; আর-একজন কংগ্রেস কর্মী, ১৯৩০ এ জেলভোগ করেন, '৪২-এ আগস্ট সংগ্রামেও' যোগদান করেন, লাঞ্ছনা ভোগ করেন (অমিয়বাবু তখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পাশের সংগ্রাম করছিলেন)। সেই সংবাদপত্রেই সেদিনকার সভায় দুজন ব্যাণ্ডপার্টি'র ভলাণ্টিয়ারেরও পত্র প্রকাশিত হয়। তাতে তাঁরাও প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে জানান, নিরীহ ও নির্দোষ মানুষদেরই এভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। অবশ্য এসব পত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়নি। আবার, সেদিনকার সংবাদপত্রেই দেখি পণ্ডিত জওহরলাল বড়বাজারের সভায় বলেছেন—(ক) ২১শে নভেম্বরের কলিকাতার ছাত্র বিক্ষোভও কারো উস্কানিতে হয়েছিল বলে তিনি বিশ্বাস করেন না (পূর্বে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তা উস্কানির ফল ও "জনযুদ্ধওয়ালাদের উস্কানির" ফল বলে পুনঃপুনঃ প্রচার করেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তা যথাশক্তি সাধারণের নিকট ছাপিয়ে ধরে ; মৌলানা আজাদ ১১ই তারিখের প্রেস প্রতিনিধিদের নিকট এই সত্যই আরও তীক্ষ্ণতর করে বলেছিলেন, এ প্রসঙ্গে তাও স্মরণীয়)। (খ) কমিউনিস্ট বা যে কোন দলের প্রতি আক্রমণ ও অত্যাচার করা কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ। (গ) দেশপ্রিয়

পার্কের সভায় তার কাটা হয়েছিল এ কথা জওহরলালজী বিশ্বাস করেন না। বলা বাহুল্য, এ-সব কোন কথার একটি বর্ণও 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়নি।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দেশে অভাব যা ঘটেছে সে হচ্ছে সত্যের, প্রাদুর্ভাব যা হচ্ছে তা ইতরতার। তাই ইতিমধ্যে শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা বিবৃতি দিয়েছেন, জানি না তা কোন্ কোন্ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। সংস্কৃতি অনুরাগী হিসাবে আমরা এ-দিকে বাঙালী সংস্কৃতিবানদের মনোভাব স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করবার দায়িত্ব বোধ করছি। কমিউনিস্টদের স্বপক্ষে এ বিষয়ে আমরা কিছু বলা নিষ্প্রোজন মনে করি। তাঁরা রাজনীতিক কর্মী। হিটলার মুসোলিনীর দাপটে যাঁরা তলিয়ে যাননি তাঁরা এ-দেশের নকল হিটলারী হীনতায় অভিভূত হবেন, তা সম্ভব নয়। বিশেষত যখন জানি—গত চার মাসের ইতরতার ঝড়েও তাঁদের ৪০ হাজার সভ্যের মধ্যে ৪ জনও পার্টি ছাড়েননি,—এমনি তাঁদের আত্মপ্রত্যয়; আর তাঁদের মেয়ে, তাঁদের মজুর, তাঁদের কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন এমনি বহু বহু সভ্য যাঁরা ফাঁসির হুকুম, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, সুদীর্ঘ কারাবাস,—সব অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করেছেন,—এমনি তাঁদের বিপ্লবী ঐতিহ্য। নিজেদের মতের ও পথের দাম তাঁরা এ-সময়েও পুরোপুরিই দেবেন। আর না দিতে পারলে মরবেন—সে জন্য দুঃখ করবারও কারণ দেখি না। নিজেদের নীতির হিসাব বুঝে বিপ্লবী দলের মতই তাঁরা চলবেন—রক্ষা করবেন সত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মর্যাদা।

সেই সত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দায়েই আমরা এদেশের শিক্ষিত সাধারণের কর্তব্যও এই ইতরতার উদ্বোধনকালে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন মনে করি। তিন বৎসর আগে ঢাকার রাস্তায় তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ঘাতকের ছুরিকায় নিহত হন। সেদিন বাঙলা দেশের লেখক সমাজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা নিয়ে তাঁরা অনেকে 'ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' সংগঠিত করেন। গোলাম কুদ্দুস ছিলেন তারই অন্যতম সম্পাদক, এখনও সেই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক। যে ইতরতার বেসাতি বাঙলা দেশের সামনে খুলে আজ তার নেতা-উপনেতার দল দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে সে ইতরতাকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবার দায়িত্ব আজ আমাদের—আমরা যারা কুদ্দুসের সতীর্থ বাঙলা লেখক, আমরা যারা রলাঁ রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বেই মানি, জানি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইতরতার অভিযান অন্য দেশে যখন রণক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এদেশেই তখন তা বাসা খুঁজছে সাম্রাজ্যবাদের বিকৃত পরিবেশে।

সংস্কৃতির সৈনিক হিসাবে আজ আমাদের আবার ডাক পড়ল; নতুন করে আমরা শপথ নিচ্ছি প্রত্যেকে—I WILL NOT REST.

সেই সৈনিক হিসাবেই আমাদের তাই লক্ষ্য রাখতে হবে কয়েকটি দিকে:

প্রথমত, যুদ্ধান্তে বিপ্লবী-চেতনাকে এদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী খাত থেকে সাম্যবাদ-বিরোধী খাতে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এতে এ-দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সমান স্বার্থ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই চক্রান্তে জেনে না-জেনে যোগ দিচ্ছে ইতরতার ব্যবসায়ীরা। সংস্কৃতির সৈনিক হিসাবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব—ভারতের বিপ্লব-মুখী জনতাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী খাতে রেখে তীব্রতর করে তোলা, বিপ্লবকে স্বাগত করা।

দ্বিতীয়ত, এই ইতরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের পথ হবে কি? এক, দেশের নেতাদের নিকট ঘটনা-সত্য বিবৃত করে তাঁদের শুভ চেতনা প্রবুদ্ধ করা। দুই, দেশের জনশক্তিকে,—মজুরকে, কৃষককে, শিক্ষিত দরিদ্রকে এই ইতরতার বিরুদ্ধে আরও সচেতন, আরও সংগঠিত, আরও সক্রিয় করে তোলা। তিন, জাতির শিক্ষা-দীক্ষা ও বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষক হিসাবে লেখক শিল্পী বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল সংস্কৃতি-কর্মীকে এই সংগ্রামের সৈনিকরূপে প্রস্তুত করা।

কাজটা সহজ বা বিপদশূন্য নয়। আততায়ীর ছুরিকা সোমেন চন্দকে খুন করেই থামেনি। গোলাম কুদ্দুসকে আঘাত করেও তা থামবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাই প্রমাণ করতে হবে—সোমেন চন্দের জাত শুধু লেখে না, মরতেও জানে।

"সম্পাদক" সম্মেলন

ভারতবর্ষের সংবাদপত্র সম্পাদকদের সম্মেলন হয়ে গেল এবার কলিকাতায় ২৭শে, ২৮শে জানুয়ারী (১৯৪৫) 'বোম্বাই ক্রনিকেলের' মিঃ ব্রেল্‌ভি ছিলেন সভাপতি ; 'বসুমতী'র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সংবাদপত্রের এখনো যে দুর্দিন যাচ্ছে, সম্মেলনের সম্পাদক তাঁর রিপোর্টে সে-সব কথা এবং সংবাদপত্রের উন্নতির অন্যান্য প্রশ্ন স্বাধীনতাবাদী সম্পাদকের মতই স্পষ্ট ও সহজভাবে আলোচনা করেছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ বাবু বলেছেন বাঙলার সংবাদপত্রের ইতিহাস ; বেশ সুন্দর ও তথ্যবহুল সেই আলোচনা।

সংবাদপত্রের যে-সব দুর্ভাগ্যের কথা আলোচিত হয়েছে আমাদের বিশ্বাস তার অনেকগুলোরই মূলে আছে জাতীয় দুর্ভাগ্য—মানে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন। যেখানে জাতিরই স্বাধীনতা নেই, সেখানে মুদ্রাযন্ত্রের বা সভা-সমিতির স্বাধীনতা থাকবে কতটুকু? অন্তত গণতান্ত্রিক অধিকার থাকলেও সংবাদপত্র কতকটা নির্ভয়ে চলতে পারে। এই যুদ্ধকালে নানা জরুরী আইনের ফলে সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ ও সম্পাদকরা একেবারে নাগপাশে বাঁধা পড়েছেন—কি সংবাদ সংগ্রহে, কি সংবাদ প্রকাশে, কিংবা সম্পাদকীয় মন্তব্যে, প্রবন্ধে, কিছুতেই তাঁরা একটা যুক্তিযুক্ত অবকাশও পাচ্ছেন না। এই রাষ্ট্রীয় দুর্ভাগ্যের অবসান না ঘটলে সংবাদপত্রের দুর্ভাগ্য একেবারে ঘুচবে না। আমাদের দেশের সংবাদপত্রসেবীরা অবশ্য এই সত্য ভালো করেই জানেন। কারণ, এ দেশের সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছিল এই প্রেরণায়—রাষ্ট্রীয় অধিকার আয়ত্ত করতে হবে। সম্পাদকরাও তখন সকলেই এই উদ্দেশ্যে নেমে-ছিলেন সংবাদসেবায়, দেশসেবার ইচ্ছায়। এ ঐতিহ্য পরম গৌরবের।

সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের প্রয়াস ও প্রস্তাবে তাই দেশের জনসাধারণের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে, তা তারা সর্বান্তঃকরণে জানাতে পারে। কিন্তু তারপর দেশের লোক দু'একটি কথা এই 'সম্পাদক-মণ্ডলীকে' নিবেদন করতে চায়। সংক্ষেপে তা এই ঃ এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেও ভারতীয় সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ যতটুকু তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারতেন তা করেছেন কি? কথাটা পরিষ্কার করে বলি। প্রথম, কাগজের অভাব পড়ল (অবশ্য তাতেও কেমনভাবে চোখে-না-দেখা দৈনিকের নামে কোটা পাওয়া যায়, তাও আমরা জানি), কাগজের আয়তন কমল, দাম বাড়ল। ফলে দেশের লোক অনেকে কাগজ কিনতে পায় না, কিনবার অবস্থাও হারায়। অন্যদিকে সরকার থেকে বিজ্ঞাপনের হার ও স্থান বাড়িয়ে দিয়ে সংবাদপত্রের আর্থিক উন্নতির 'রাজপথ' খুলে দিল। মানে, দেশের লোকের কাগজ পড়বার অধিকার খর্বিত করে কর্তারা কাগজওয়ালাদের মুনাফা বাড়িয়ে দিলে। নিশ্চয়ই, তাহলে আর্থিক দুর্ভাগ্য সংবাদপত্রের ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের কথা। সত্যই কি এদিকে সম্পাদকেরা দায়িত্ব পালন করেছেন? চোরা বাজারের ব্যাপারে গান্ধীজীও বিচলিত হয়েছেন ; কিন্তু বিড়লাদের চটের ও কাপড়ের কারবার, সিংঘানিয়াদের কয়লার ব্যাপার, কলিকাতায় ও বাঙলায় চালের, এমন কি নিউজপ্রিন্টের চোরাবাজারের যে সব সংবাদ দেশবাসীকে জানানো উচিত ছিল, তা কোন্ সংবাদপত্রে কতটুকু বেরিয়েছে? সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কি তার স্বত্বাধি-কারীর স্বাধীনতা—দেশের সামনে যে সংবাদ ইচ্ছা পরিবেশন করবার, বা না করবার?

এইখানেই তৃতীয় কথাটি এসে গেল ঃ সংবাদপত্রে সত্যই সম্পাদকের স্থান কোথায়? কথাটা বাঙলাদেশের সম্পাদকের পক্ষে অবশ্য বিশেষভাবেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। সংবাদপত্রের পুরনো যুগ এদেশে অস্ত গেছে, আজ এদেশে সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য সংবাদ সেবা নয়, উদ্দেশ্য সংবাদ ব্যবসা। অবশ্য অনেক ব্যবসায়ের অপেক্ষাই এটা বেশি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, গৌরবের কাজ। কিন্তু কথা এই—এ কাজে সম্পাদকের স্থানটা কোথায়? বাঙলাদেশে আসল সম্পাদক আজ হয় বেনামী থাকতে বাধ্য, নয় নাবালক থাকতে স্বীকৃত ; স্বাধীন সাংবাদিক-সম্পাদক আজ বড় নেই। অন্য প্রদেশেও অনেক

সম্পাদকই কর্তৃপক্ষের ভৃত্য, তবে হয়ত তাঁদের সম্পাদকত্ব ও সাবালকত্ব বরদাস্ত করা হয়। ধনিকতন্ত্রের আর একটু বিকাশ বাঙলাদেশে না ঘটলে জমিদারী মেজাজেই সংবাদপত্র-কর্তৃপক্ষও চলবেন, এবং মনে করবেন—সম্পাদক তাঁর নায়েব বা মুন্সি। ধনিকতন্ত্রের আরও একটু বিকাশ ঘটলে তিনি বুঝবেন যে, ব্যক্তিত্ববান্ সম্পাদককে কতকটা স্বাধীনতা দিলে লোকে সম্পাদকীয় মন্তব্যে গুরুত্ব আরোপ করে, সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীরই মুনাফা তাতে বাড়ে। কিন্তু সংবাদপত্রের সেই ধনিকতান্ত্রিক স্তরও অন্য প্রদেশে কি সত্যই আসছে? সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও কর্তৃপক্ষের হিসাব জানি না; নিশ্চয়ই তাঁরা আসলেও সম্পাদক, স্বত্বাধিকারী বা স্বত্বাধিকারীর ম্যানেজার মাত্র নন, এইরূপই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্পাদক সম্মেলন তাই সংবাদপত্রে সম্পাদকের স্থানটা কোথায়, তা চিহ্নিত করবার চেষ্টা করবেন, এইটাও আশা করা যায়। [ফাল্গুন, ১৩৫১]

ছাত্রসমাজ ও পরীক্ষা

পরীক্ষাগারে ছাত্রদের অসংযত ব্যবহার দেখে সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বি-কম্ ও ডাক্তারি পরীক্ষায় ছাত্ররা পরীক্ষাগৃহেই বিঘ্ন উৎপাদন করে, মফঃস্বলেও ইৎপূর্বেই কোথাও কোথাও পরীক্ষাগৃহের পরিদর্শক বা ইন্‌ভিজিলেটার নানাভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। ব্যাপারটা অবশ্য এখন চরমে উঠছে তা সবলেই অবহিত হয়েছেন। কিন্তু এবিষয়ে একটু গভীরভাবে ভাবা দরকার। পরীক্ষা ও পরীক্ষাপদ্ধতি বিষয়েই একটা সংশয় আছে। এভাবে সত্যই ছাত্রের পরীক্ষা সম্ভব হয় কিনা, তা অনেকেই সন্দেহ করেন। বিশেষতঃ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী সংখ্যা হয় হাজারে হাজারে, পাস করাতে হয় গণনানুসারে শুধু নয়, সংখ্যানুপাতে,—শতকরা ৬০ বা ৬৫ এমনি নানা অনুপাতে—পরীক্ষকও আর গুণানুসারে নিযুক্ত হন না, নানা ভাগ্য বৈগুণ্যে নিযুক্ত হন, তখন "পরীক্ষা" সত্যই অসম্ভব। তাতে সুবিচারও হয় না। আমরা ব্যক্তিগতভাবেই জানি—যে-পরীক্ষার্থীকে একজন পরীক্ষক ২৯ দিচ্ছেন, না জেনে আর একজনই তাকে ৫২ দিতে প্রস্তুত; একজনের বিচারে যে পাচ্ছে ৬২, অন্যজনের বিচারে সেই ৮৪ পাওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ ছোট, বড, মাঝারি, কারও প্রতি সত্যকারের সুবিচার এই পদ্ধতিতে হয় কিনা সন্দেহ। গড়ে একটা রাফ্ জাষ্টিস্ হলে মনে করতে হবে, তা'ই যথেষ্ট। কিন্তু তাতেও পারম্পরিক তফাৎ সুনিশ্চিত রূপে নির্ধারিত হয় না। তাই পরীক্ষার উপর অশ্রদ্ধা জন্মে। ভারতবর্ষের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও যে অবস্থা অন্যরূপ তা নয়। এই মৌলিক ত্রুটি মেনে নিয়েই তবু আমরা পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করি—দোষ তবু যথাসাধ্য তা যেন ন্যায়োচিত হয়। কিন্তু সেদিকেও যে অধোগতি ঘটেছে তা হঠাৎ ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ বিশেষ স্থলে পক্ষপাতিত্বের কথা অন্ততঃ আমরা পঁচিশ বছর ধরে শুনছি, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বাহ্নেই প্রকাশিত হবে পড়তে শুরু করে ১৯১৭ থেকে—একেবারে সেই যুটো বন্ধ করা গিয়েছে কি? 'এম এর' 'নাইন্‌থ্ পেপারের' কথা ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গ সকলেই সুবিদিত। এভাবেই ছাত্র ও অভিভাবক মহলে পরীক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা আরও কমে এসেছে। বছরের পর বছর যেমন এই অশ্রদ্ধার জন্য ছাত্রদের পরীক্ষাগৃহে ন্যায়বোধ কমেছে, অধ্যাপক ও কর্তৃপক্ষের তেমনি শিথিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অসাধুতা আজ শুধু পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কক্ষে তা ছড়িয়ে পড়েছে।

তাই বলে প্রতিবিধান করতে দেরি করা আর উচিত নয়। কারণ, হাজার হোক, যতই এই শিক্ষাপদ্ধতির নিন্দা করি—আমরা জানি এই শিক্ষায়ও আমরা অন্তত সত্যকারের শিক্ষার মর্যাদা বুঝতে পারি, আর জানতে পারি আমাদের জাতীয় অমর্যাদার স্বরূপ। [জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচালনার উপর বাঙলাদেশের বর্তমান ও ভাবী সংস্কৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে। এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা থেকে বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা

ও বাঙলার ভদ্র সংস্কৃতির অবস্থাও খানিকটা বুঝতে পারা যায়। তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী বৎসরের বাজেটে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখে সবাই চিন্তিত হয়েছেন। সরকারের থেকে ঐ ঘাটতির টাকা দেশবাসী দাবি করছেন। সন্দেহ মাত্র নেই যে, এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য যেরূপ আর্থিক সাহায্য সরকারের করা উচিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেরূপ সাহায্য পায় না। আর এই দরিদ্রের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য না হলে তার সুপরিচালনা সম্ভব নয়।

অবশ্য সুপরিচালনা জিনিসটি শুধু মাত্র টাকার দ্বারাও আয়ত্ত করা যায় না। বরং দুঃখের সঙ্গেই মানতে হবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাজে টাকার অভাব ঘটেনি, তবু ঘটছে পরিচালনা-শক্তির অভাব। তার কোনো কোনো দিকে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ সম্বন্ধে তাঁদের শিথিলতা ও অক্ষমতা এ দেশীয় আমলাতন্ত্রের শিথিলতা ও অক্ষমতার থেকে কোনো অংশে কম নয়। চোরাকারবারী ও চোরা-কর্মচারী দেশ দখল করে বসায় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র শেষ পর্যন্ত নিজেও বিপন্ন বোধ করছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যাপারে দুর্নীতি চরমে ওঠায় বিশ্ববিদ্যালয়েরও ছোট-বড় কর্তারা এখন বিব্রত বোধ করছেন। দেখছি, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যসংস্কারের কথা তাঁরা এ সম্পর্কে চিন্তা করছেন। হয়ত আরও অন্য দিকেও তাঁরা অবহিত হচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রশ্ন শুধুমাত্র দু'এক পাতায় আলোচনা করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। বড় করে আলোচনার যে সার্থকতা আছে, তা-ও আমরা ঠিক বুঝি না। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের সুবিখ্যাত রিপোর্ট অনুযায়ী সংস্কার পঁচিশ বৎসরেও কিছুই করা হয়নি। অথচ এই পঁচিশ বৎসরে এই পৃথিবী এত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে যে সেই পাণ্ডিত্যের পোকায়-কাটা বিধান দিয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই আর চলতে পারে না। আশ্চর্যতর তবু এই—আরও আগেকার কার্জনি আইনে বিশ্ববিদ্যালয় চলেছে সম্পূর্ণরূপে সরকারের মনোনীত কর্তাদের নিয়ে। বাঙলাদেশে অনেক জনপ্রিয় মন্ত্রী ও ভাইস্-চ্যান্সেলর এলেন, তাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষার নিষ্ফল বিলগুলি নিয়ে দেশের দূষিত আবহাওয়াকে যথাসম্ভব নিজেদের বিষে আরও বিষাক্ত করে গিয়েছেন, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই কার্জনি আইনের জোরে চলছে তেমনি —ভাবতে সাম্রাজ্যবাদের মত।

সাম্রাজ্যবাদের তাওতায়, আমরা দেখছি, সৃষ্টি হয় ছোট-বড় জমিদার, তালুকদার নকল সামন্ত-মালিক। কার্জনি আইনে বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমনি জমিদার তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে বাঙলাদেশে ইংরেজ শাসনের একটি চিত্র—সেই শাসনের আসল রূপ হল জমিদারতন্ত্র। তাতেই মুশকিল হয়েছে বেশি—এই কায়েমিস্বার্থবানরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জনি আইন পরিবর্তনের বা সত্যকার সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করেন না, যেমন বাঙলার জমিদারেরাও বোধ করেন না বাঙলার ভূমি-সংক্রান্ত আইন-কানুনের পরিবর্তন। দেশের সাধারণ লোকও প্রতারিত হয়। তারা মনে করে, আইন যাই থাক আপাতত দেখছি মালিকানা আমাদের দেশীয় জমিদারদের হাতে; এইটাই লাভ। নইলে তো খাশ মহলের প্রজা হয়ে আরও মার খেতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভুরা এই ভয়টার বেশি সুযোগ নিতে পারেন, নেনও। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সাধারণ লোকের সম্পর্ক নেই, ভদ্রসাধারণই হচ্ছে তার চক্ষে সাধারণ। এই ভদ্রসাধারণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, বহুলাংশে হিন্দু। তাদের মনে ভয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে জমিদারীতন্ত্র শেষ হলে হয়ত আসবে নবাবী আমল অথবা পাকিস্তান। তাই হিন্দুস্থানী জমিদারতন্ত্রকেও ভদ্রসাধারণ পুষ্ট করেন। অনেকের ব্যক্তিগত স্বার্থও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে—যেমন পড়ছে বাঙলার জমিদারী প্রথার সঙ্গে ভদ্রলোকের স্বার্থ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মূল সংস্কার না হতে কতটা শিক্ষা সংস্কার সম্ভব তা জানি না। অন্তত জমিদারী প্রথার "জড়" না ছাড়ালে বাঙলার সংস্কৃতি ঠিক সম্পূর্ণ হবে না, সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন হবে না; তা আমরা বেশ উপলব্ধি করি। বিশ্ববিদ্যালয়েও যতই এই প্রথা চেপে থাকবে, ততই শিক্ষা ও সংস্কৃতি দু'এরই সংকট দিনে দিন জ্যামিতিক নিয়মে তীব্রতর হয়ে উঠবে। তথাপি এ প্রথা উচ্ছেদ-সাপেক্ষেও কিছু কিছু সংস্কারে হাত দিতে হবে—নিতান্ত দায়ে পড়ে। সেদিক থেকেও বিশ্লেষণ করলে দেখি—সমস্যা সহজ নয়। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা-পদ্ধতি এবং সর্বশেষে বাঙলার সামাজিক

ভাঙন,—এ সব পরস্পরে মিলে আজকের এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ; আর সে অবস্থার মূলে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিদারীতন্ত্র ; এই অবস্থা ক্রমান্বয়ে কঠিনতর হয়েছে এই জমিদারদের গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের পরিচালনার ফলে।

বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আমলাতন্ত্রের মতই যেমনি নিজের কীর্তি দেখে আজ চমকিত হচ্ছেন, তেমনি আবার আমলাতন্ত্রের মত গতানুগতিকভাবে সে ইতিহাসের অনুবর্তন করছেন। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। অতি স্ফীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাথাভারী আমলাতন্ত্রের মত অচল। কোন্ সাহসে এমনি সময়ে তাঁরা আবার জর্নালিজমের বা বার্তাবিদ্যার ফ্যাকালটির ভার গ্রহণ করছেন ? সত্য বটে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এ বিদ্যার ভার নেয়। কিন্তু সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এ দশা ? না, সে সব দেশে জর্নালিজমেরই এ-দশা ?

কথাটা সংক্ষেপে বোঝা দরকার। বার্তাবিদ্যা এ-কালের এক বড় বিদ্যা। তার প্রসার সর্বত্র ঘটছে। এ যুদ্ধের পরে তার আরও বিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী। সংবাদসেবা আমাদের দেশে ছিল স্বদেশসেবার একটা দিক। ইতিহাসের নিয়মেই তা হয়েছে এখন সংবাদব্যবসা। বড় বড় ব্যবসায়ীরা সংবাদপত্রের অধিকারী হচ্ছেন, আবার বড় বড় সংবাদপত্রের মালিকেরা হচ্ছেন অন্য ব্যবসায়ীর সহযোগী। এইটাই নিয়ম। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অনিয়মই হয় নিয়ম, এদেশে সংবাদ-ব্যবসায়ীও সোজা পথে চলেন না। বাঙলাদেশে সংবাদসেবীর যে অধোগতি ঘটল তার কারণ—সংবাদপত্রের অধিকারী সস্তা বুদ্ধিজীবী যথেষ্ট পান, আর সস্তা বুদ্ধিজীবীও সংবাদপত্রকে তাঁর একমাত্র জীবিকা বলে গ্রহণ করেন না। তাঁরা অধ্যাপনা হতে বেতার বক্তৃতা, ইন্সিওরেন্সের দালালি বা ব্যবসায়ী সঙ্ঘের গুপ্তচরবৃত্তি কিছুই করতে কুণ্ঠিত নন, সংবাদপত্রের মালিকও নিজের মুনাফা, নাম, শাসন ও প্রভাব তাঁদের মারফতে বাড়াতে সুবিধা পান বেশি। সংবাদপত্রের মালিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে জমিদার ও বণিক দলের স্বার্থসম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আর সেই সম্পর্কের একটা বড় মিলনকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্নালিজমের শিক্ষার এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হচ্ছে, সাংবাদিকদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, আবার বুদ্ধিজীবী মহলের মুখবন্ধেরও আয়োজন করছেন এভাবে সংবাদপত্রের মালিকেরা।

বলা বাহুল্য সংবাদ বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন নিঃসন্দেহে করতে হবে। কিন্তু সে আয়োজন স্বতন্ত্র কোনো নতুন প্রতিষ্ঠানে হতে পারে। অনেক দেশেই তা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়েই হতে হবে এমন কারণ নেই। আমরা ড্রামা, ফিল্ম সায়েন্স ও ফিল্ম আর্টও শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত ; সেলসম্যানশিপ শিক্ষারও ব্যবস্থা দেশে থাকা চাই। তা, সবই কি বিশ্ববিদ্যালয় করবে ? বিশেষত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেদবৃদ্ধিতে যখন অচল তখন এ সাহস করবেন ? কিছু লোককে চাকরি দিয়ে এই জমিদার-তন্ত্রের পোষক করা, আর সংবাদপত্রগুলোকেও তাঁদের অধিকতর বন্ধুতে পরিণত করার জন্য ? বিশ্ববিদ্যালয় আত্মসংস্কার না করে আর যেন অন্য কাজে হস্তার্পণ না করেন।

[আষাঢ়, ১৩৫২]

"গৃহযুদ্ধের" পর্বারম্ভ

"বাইশে শ্রাবণ", ৭ই আগস্ট, রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দিন। এমন বাঙালী প্রতিষ্ঠান বোধ হয় নেই যেখানে সে-সপ্তাহে আমরা কবির দানকে স্মরণ করি নাই, সগৌরবে ভাবি নাই সে দানে আমাদের প্রত্যেকের মন, বুদ্ধি কতটা সুন্দর ও প্রসারিত হয়েছে, বাঙালী জাতির স্থান পৃথিবীর আসরে কতটা সুনিশ্চিত হয়েছে, আর মহামানবতার দিকে সকল মানুষেরই যাত্রাপথ কতটা সুপ্রশস্ত হয়েছে। সে-সব কথার প্রতিধ্বনি তখনো মিলিয়ে যায় নাই ; শ্রাবণ মাসও ফুরায় নাই, আগস্ট মাস তো শেষ হয়ই নাই ;—অমনি ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬, ৩২শে শ্রাবণ (১৩৫৩), আমরা কলিকাতা শহরের

বাঙালী সভ্যতার এক আত্মঘাতী অধ্যায় আরম্ভ হতে দেখলাম, অন্তত চারদিন ধরে দেখলাম ইতরতার অভিযান। আর আজ (২৩শে আগস্ট) সাত দিন পরেও দেখছি তারই ক্লেদাক্ত আশঙ্কা ও উত্তেজনা। সাধারণভাবে অনুশোচনা এখনো দেখি না, সুস্থ বাস্তব দৃষ্টির সাধারণ পরিচয় এখন পর্যন্ত পাই নাই। যা মনে মনে আশঙ্কা করা গেছল হয়ত এবার তাই আরম্ভ হল—আমাদের বিশ বৎসরের পুরানো 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা' এবার বুঝি 'গৃহযুদ্ধ' বা 'সিভিল ওয়ারের' পর্বে এসে ঠেকেছে। এ-আশঙ্কা মিথ্যা হলেই জাতির সৌভাগ্য, সংস্কৃতির স্বস্তি, তা না বললেও চলে। আর মিথ্যে না হলে—আগামী বিশ বৎসর কেন, হয়ত আরো দীর্ঘকাল চীনের মত এদেশেও আমরা সামনে দেখছি 'গৃহযুদ্ধ' :— 'পূর্ব-পাকিস্তান' বা 'অখণ্ড হিন্দুস্থান' তো দূরের কথা, 'অখণ্ড বাঙলা'ও নয় ;—খণ্ডিত বাঙলা, সাম্প্রদায়িক লোকাপসরণ ও কোটি কোটি লোকের বাস-পরিবর্তন এবং 'অখণ্ড ইংরেজ-স্থান'—'সবার উপরে ব্রিটেন সত্য, তাহার উপরে নাই।'

এ শুধু রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নয়। সে দিক থেকে এ নতুন পর্বের আলোচনা দু'চার কথায় অসম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক হিসাবে, এমন কি সুস্থ হিন্দু, মুসলমান হিসাবেও যা কর্তব্য, তা তবু অস্বীকাব করবার উপায় নেই। অন্তত সংস্কৃতিবোধ যাঁদের লোপ পায় নাই, তাঁরা এ-কর্তব্যকে অস্বীকারও কববেন না ; সুস্থ জীবনবোধের দায়েই তাঁরা স্থির করে নেবেন নিজেদের কঠিন, দুঃসাধ্য এই কর্তব্যের পথ।

সুস্থ পথে আজ পদক্ষেপ কত দুঃসাধ্য হযে উঠছে তা আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বশেই প্রত্যেকে জানি। দু'একটি সংবাদপত্রের বিশেষ করে উত্তেজনাই আজ জীবিকা। কেউ আমরা হিন্দু-পাড়ায় ছিলাম, দেখেছি তাই হিন্দুর দৌরাত্ম্য। কেউবা আমরা মুসলমান মহল্লায় ছিলাম, দেখেছি তাই মুসলমানের দৌরাত্ম্য। যাবা মিশ্রিত পল্লীতে ছিলাম তারা দেখেছি উভয় সম্প্রদায়ের উন্মত্ততা। কারা বেশি 'নৃশংস', কে 'জয়ী', কে 'পরাজিত', কে কত 'বীরত্ব' (মানে উন্মত্ততা) দেখিয়েছে, এসব আলোচনা এখন যখন শুনি তখন আমাদের সহজ, সুস্থ, সংস্কৃতির ও সত্যকাবের রাজনৈতিক বুদ্ধিরও যে পরীক্ষা দিতে হয়, তা অস্বীকার করা যায় না। তবু এ দায়িত্ব পালন করাই সংস্কৃতির ও জাতীয় চেতনার দায়। বিতৃষ্ণায় মন বিষিয়ে ওঠাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক, তাতে হয়ত কথাবার্তায় সত্যই সুবুদ্ধির পরিচয়ও সব সময় দেওয়া হয় না। কিন্তু নীববতাও সুস্থ জীবনের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সুবর্ণ পন্থা নয়।

'কে প্রথম ঢিল ছুঁড়েছিল'—স্বাভাবিক হলেও এ গবেষণা আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ, আমরা অন্তত জানি—বহুদিনেব ধূমায়মান সমস্যায় গত এক বৎসব ধরে বারুদ জোগাবার লোকের অভাব হয়নি। জাতীয় নেতৃত্বেব একাংশ অক্লান্তভাবে বুঝিয়ে এসেছেন—"মুসলমানের শত্রু কংগ্রেস, আর কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' মানেও 'গৃহযুদ্ধ'।" জাতীয় নেতৃত্বের বৃহত্তব অংশও এক বৎসর যাবৎ (গত বৎসরের 'সিমলা বৈঠকে'র শেষে বোম্বাই'র এ, আই, সি, সি'র অধিবেশন থেকে) তেমনি তীব্রকণ্ঠে বক্তৃতা করে এসেছেন, "ইংরেজ ভারত ছাড়তেই রাজী, ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বাধা এখন কেবল মুসলিম লীগ ও মুসলমান। 'গৃহযুদ্ধ'ই যদি আসে, আসুক তা তবে।" এভাবে 'গৃহযুদ্ধের' পথ ক্রমশই তৈরি হয়ে এসেছে। হয়ত খাতাপত্রের লীগ-প্রস্তাব বা কংগ্রেস-প্রস্তাব উদ্ধৃত করে অনেক ভালো ভালো কথা দেখানো যায়। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচয় শুধু তার খাতার প্রস্তাব নয়—বরং তা তার নেতৃমণ্ডলীর বক্তৃতার সুর ও তার কর্মীদের মন ও কাজের ধারা, ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ সে সবই দেখে, তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়। সেদিক থেকে ভুললে চলবে কেন, গত সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনের দিন ও তাব পরেও সারা দেশে,—বিশেষ করে কলিকাতায় ও তার শহরতলীতে—লীগ ও কংগ্রেস কি ধরনের প্রচারকে তাঁদের সম্বল করেছিলেন? ভুললে চলবে কেন, ইতরতার সে বেসাতি ও ইতরতার সে বিস্তৃতি কোথাও এই নেতৃমণ্ডলের দ্বারা অকুণ্ঠিতভাবে ধিক্কৃত হয়নি। এবং এ কথাই বা ভুললে চলবে কেন, জনমন আপনার প্রেরণায় যতবার শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পথে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যতবার সম্মিলিত অভিযানে পা বাড়িয়েছে, ততবারই এই উভয় নেতৃমণ্ডলী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোষের আশায়

জন-অভ্যুত্থানে বাধা দিয়েছেন, 'গুণ্ডামি' বলে তাঁদের সেই পথকে ধিক্কৃত করেছেন। বরং ইতরতার উত্তেজনাই তাঁদের নিকট প্রশ্রয় পেয়েছে, স্বাধীনতার সম্মিলিত চেষ্টা সংবর্ধনা পায়নি। সাম্রাজ্যবাদী চালে, লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃত্বের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত কথায়, কাজে, উদ্দীপনদানে, এবার সেই ব্যাহত বিক্ষোভই পরিণত হতে যাচ্ছে ইতরতার অভিযানে—গৃহযুদ্ধে। এই কঠিন সত্য অন্তত সুদৃঢ় ভাবেই রাজনৈতিক শুভবুদ্ধি ও সাংস্কৃতিক শুভচেতনা আজ ঘোষণা করবে—নেতৃত্বের এই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সহযোগিতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ না পেলে ভারতে ইতিহাসের এই বৃহত্তম জন-জাগরণকে আজ সাম্রাজ্যবাদীরা বিপথচালিত ও গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে পারে না। '২৯শে জুলাই'র পরে '১৬ই আগস্ট' এ কথারই ক্লেদাক্ত সাক্ষ্য। বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতি-বিপ্লবের, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইতরতার অস্ত্র আজ 'গৃহযুদ্ধ'।

এই সত্যের আর একটি আংশিক প্রমাণ তবু এই যে, '২৯শে জুলাই'র সব স্মৃতি এখনো ধুয়ে মুছে যায় নাই। এত বড় ইতরতার অভিযানের মধ্যেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদল মোটামুটি তাদের মিলন খুইয়ে ফেলেনি; গ্রামের কৃষক এখনো এই পঙ্কে নিমজ্জিত হয়নি; এমন কি বহু ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রসমাজও নিজেদের বুদ্ধি অনেকটা অটুট রাখতে পেরেছে। হয়ত তার ব্যতিক্রমও হয়েছে, তবু এটাই সাধারণ সত্য। এবং বহু বহু ক্ষেত্রে সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমান নর-নারী পরস্পরকে বহুভাবে রক্ষা করেছেন, হয়ত কেউ কেউ তাতে জীবনও দিয়েছেন—তাঁদেরকে রবীন্দ্রনাথের ও দেশবন্ধুর দেশ প্রণাম জানাবে। উত্তেজিত ও অনুত্তেজিত জনতা রাজনৈতিক শিক্ষাবশে আশ্চর্য সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু মুক্তিকামী মানুষ এখনো সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করবে এই সংগঠনশক্তির সচেতনতার অপেক্ষায়; এবং তাকিয়ে থাকবে এ-দুটি শিখার দিকেই—সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক-কৃষক আর সুস্থ ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী। এ শিখাও নিবে গেলে আশ্চর্য হবার কথা নয়—সামনেই কংগ্রেসী ওজারত, ঈদ ও পূজার উত্তেজনা এসে জুটবে।

কিন্তু এই দুটি শিখা থেকেই এখনো জনশক্তির আলোক-লাভের সম্ভাবনা। শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্বই আজ সচল জনতাকে আত্মঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে, নবলব্ধ সংগঠনশক্তিকে শুভ আদর্শে সংযুক্ত করতে পারে। এদেশের ইতিহাসেও সৃষ্টির শুভশক্তির উত্তরাধিকারী আজ আর সাম্রাজ্যবাদী ওয়াভেলের সহযোগী কংগ্রেস-নেতৃত্ব নয়, সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগলুব্ধ আর নিরাশায় ক্রুদ্ধ লীগ নেতৃত্বও নয়—আজ ভরসা শ্রমিকশক্তি ও তার সহযোগী কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী।

কিন্তু আগামী কয়েক মাসের উত্তেজনাময় ঘটনাবলীর মধ্যেই বোঝা যাবে এই আলোক নিবল কি নিবল না—সামনে কি শ্রমিক-নেতৃত্বে সৃষ্টির অভিযান, না, বিকৃত নেতৃত্বে ইতরতার অভিযান; বিপ্লব না প্রতিবিপ্লব, সংস্কৃতি না বিকৃতি।

বিবাদের সাংবাদিকতা

কলিকাতা ও বোম্বাই'র গৃহযুদ্ধের পরে এল নোয়াখালী, এল বিহার।

ভারতবর্ষের বিপ্লবী জাগরণ যে মন্ত্রীমিশনের চক্রান্তে ও নেতৃদলের নিষ্ফলতায় এক আত্মঘাতের উন্মাদনায় বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কা আমরা ১৬ই আগস্টের পরে প্রকাশ করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিলাম, সুস্থ-সবল জীবনযাত্রার যখন অভাব ঘটছে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রেও তখন আর সুপরিণত নতুন সম্পদ সহজলভ্য হবে না। গত তিন মাসে বাঙলাদেশে বর্বরতা ও বিকৃতির অভিযানই সদর্পে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রকাশ স্তিমিত হয়ে এসেছে—তবে নির্বাপিত হয়ে যায়নি, একথাও ঠিক। শক্তিমান শিল্পী ও লেখকের পক্ষে আবার এই আঘাতে জীবনের স্বপক্ষে, মানবতার স্বপক্ষে নতুন সংগ্রামে, নতুন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হওয়াও সম্ভব। ইতরতার ব্যাপ্তিতে অবসন্ন না হয়ে, বা বর্বরতার বিরোধে নিস্তব্ধ না হয়ে, সংস্কৃতির বাহকেরা আজও তাঁদের এই নতুন কর্তব্য সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অবস্থাকে বিচার করবেন আর

প্রাণময় সৃষ্টি দিয়ে এই আত্মঘাতকে প্রতিরোধ করবেন—শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল বুদ্ধিজীবীর নিকট নিশ্চয়ই বাঙলার অতীত ঐতিহ্য ও ভাবী সংস্কৃতি এই দাবি করবে।

এ জাতীয় অপঘাতে বিচলিত হবেন না এমন সংবেদনশীল চিত্ত হয়ত অল্পই আছে। কিন্তু যাঁরা এই অপঘাতকে শুধু একটা ওজর হিসাবে গ্রহণ করে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের যে কোনো নতুন সৃষ্টি, শুভ সাধনা ও সুস্থ প্রয়াসকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়, সুস্থ সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করবার জন্য সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করে, তারা যে সত্যই এই আঘাতে বেশি আহত হয়েছে এমনও নয়। বরং নিজেদের দৃষ্টির বক্রতা, সৃষ্টির দৈন্য, আত্মার ক্লীবত্ব ঢাকবার জন্যই তারা এরূপ সময়ে সুস্থ সংস্কৃতি-স্রষ্টাদের নানাভাবে অপদস্থ করতে চায়। নইলে কর্ম-ক্ষেত্রেও বিবাদ-জীবীরা আসলে এগিয়ে আসে না, সৃষ্টি-ক্ষেত্রেও তারা বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না—এ কথা তাদের ইতিহাস থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে।

এই বিকৃতি-জীবী ও বক্রোক্তি-জীবীদের কলঙ্কিত ইতিহাস আরও কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে ১৬ই আগস্টের পর থেকে এবং তাতে দেশের ইতিহাসই আজ হয়ে উঠেছে আরও রক্ত-কলঙ্কিত, আরও ভয়াবহ। বিবাদমান নেতৃমণ্ডলীর সঙ্গে তাল রেখে দেশের সংবাদপত্র অনেকদিন ধরেই বিবাদপত্র হয়ে উঠেছিল। নেতাদের মতই তারাও দেশের দুই প্রবল জন-গোষ্ঠীকে বিবাদের শেষে এখন ভ্রাতৃহত্যার যুদ্ধে এনে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু সেদিনের পরেও দেশের সংবাদপত্র এ-খেলায় নিবৃত্ত না হয়ে বরং —খানিকটা অন্ধ বিদ্বেষে, অনেকটা ব্যবসায়িক স্বার্থে—পাতা জুড়ে বিবাদের বেসাতি ও ভ্রাতৃহত্যার প্ররোচনাকে স্থান দিয়েছে। এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই—ভারতবর্ষের এই রক্তাক্ত দিনগুলির জন্য যারা দায়ী তাদের মধ্যে সংবাদপত্র অন্যতম প্রধান স্থান দাবি করতে পারে—তাদের সংবাদ বানানো, বাড়ানো, কমানো, সাজানো প্রভৃতির জন্য, তাদের বিদ্বেষ-প্রসূ মন্তব্যের জন্য ; এমন কি, দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের পুরাতন ক্রোধান্ধ দিনের বিস্মৃতপ্রায় লেখাকে এ-মুহূর্তে বিশেষ দুরভিসন্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে নতুন করে পরিবেশনের জন্য। আশ্চর্য এই যে, এই বিষ পরিপূর্ণরূপে দেশের শরীরে না পড়া পর্যন্ত মিস্টার সোহ্‌রাওয়ার্দীর সরকার তার বিরুদ্ধে কিছুমাত্র অবহিত হয়নি। তারপরে অবশ্য যথা নিয়মে আজ সংবাদপত্রের উপর কড়া অর্ডিন্যান্স চেপে বসছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার মত কথা এই যে, এ সব হুকুমনামায় ভ্রাতৃবিরোধী ও ভ্রাতৃহত্যার বিরুদ্ধে যতটা শাসনের চেষ্টা আছে, তারও চেয়ে বেশি চেষ্টা আছে সাধারণ সুস্থ গণ-আন্দোলন দমনের। যেমন বাঙলার "বিশেষ ক্ষমতার অর্ডিন্যান্সে" এখন ন্যায়সঙ্গত কারণেও শ্রমিক বা কর্মচারীদেরকে হরতাল করতে বলা, সে জন্য কাগজ ও ইস্তাহার ছাপা, পুলিস, ফৌজ বা সরকারী কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ প্রকাশ করা প্রভৃতি সব কিছুই দণ্ডনীয়। এ সব অভিযোগ প্রকাশে অবশ্য সংবাদপত্ররা উৎসাহীও ছিল না, কাজেই সংবাদপত্রগুলি এতে তাদের "স্বাধীনতা" খর্ব হয়েছে বলে বিশেষ মনেও করে না। আরও স্মরণীয় এই—বিপ্লবী জনতার বিরুদ্ধে সাহেবরা এ দাবিই করেছিল বরাবর। মুটে, মজুর, কর্মচারীরা হয়ত এ হুকুমে আরও দুর্দশা ভোগ করবে। তা করুক, বাঙলাদেশের দু'পক্ষীয় সংবাদপত্র উত্তেজিত হয়েছে সোহ্‌রাওয়ার্দীর অন্য হুকুমে। একদল ভাবছে নোয়াখালীর বর্বরতাকে কেন্দ্র করে মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রচারের যে "পবিত্র স্বাধীনতা" আছে, এভাবে সোহ্‌রাওয়ার্দী তা খর্ব করছেন। অন্য দল মনে করছে—বিহারের বর্বরতাকে আশ্রয় করে হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রচারে তাদের যে "পবিত্র স্বাধীনতা" আছে, তা এ হুকুমে বাধা পাচ্ছে। অবশ্য, কার্যত আক্ষরিকভাবেও যে এ হুকুম খুব পালিত হচ্ছে তা নয়। আর তার উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হচ্ছে তা তো স্পষ্ট। এ উদ্দেশ্যেই পটেল-চালিত কেন্দ্রীয় সরকারও কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছে। তারও কার্যত ফল হবে গরীবের কণ্ঠরোধ, কিন্তু ভ্রাতৃহত্যার প্ররোচনা দেবার "পবিত্র স্বাধীনতা" তাতেও সংযত হয়নি। হবে কি করে যখন নেতারাই ও বিষয়ে সম্পূর্ণ সংযত হননি ?

কিন্তু কথাটা এই যে, সংবাদপত্রই দেশের সংস্কৃতির সব চেয়ে সহজলভ্য বাহক। তার মধ্য দিয়ে যদি আমরা সত্যকে দেখতে ও বুঝতে না পারি তা হলে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের যে দুর্দিন ঘনিয়ে উঠবে। তাই সাংবাদিকসঙ্ঘকেও বলতে হয়—এই ভ্রাতৃ-রক্তে সত্য যেন ধুয়ে-মুছে না যায় তা কি

তাঁরা দেখবেন ?—সংবাদ-ব্যবসায়ী মালিকরা বা সাংবাদিক গদীয়ানরা অবশ্য সত্যের থেকেও বেশি দেখবেন স্বার্থ। কিন্তু পুলিসরাজই যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

কি কর্মক্ষেত্রে, কি সৃষ্টিক্ষেত্রে বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবতার সংগ্রামে দেশের বুদ্ধিজীবীরা,—শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক সকলে আজ সাহসের সঙ্গে সম্মিলিত হবেন—এ মুহূর্তে এই তো সংস্কৃতির দায়। [অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩]

১৩৫৩'র সালতামামি

১৩৫৩ শেষ হচ্ছে। তেপ্পান্ন'র নববর্ষের দিনে বাঙালী হিসাবে স্বদেশী ও প্রবাসী বাঙালীর নিকট প্রশ্ন ছিল, "আজ কি আমাদের স্বাধীনতার নববর্ষ? না, আমাদের গৃহযুদ্ধের নববর্ষ? জনসাধারণের অধীরতা ও প্রেরণার দিক থেকে দেখলে মনে হবে—স্বাধীনতার। আর সংগঠন ও নেতৃত্বের দিক থেকে দেখলে মনে হবে—গৃহযুদ্ধের।" সেদিন যা অনেকের কানে শুনিয়েছিল কাল্পনিক ভীতি বলে, ১৩৫৩ সাল তা'ই অক্ষরে অক্ষরে কঠিনতম সত্যরূপে প্রকাশিত করে দিয়ে গিয়েছে—বাঙালীর চলতি সংস্কৃতির হিসাব এ বিরোধের জের টেনে চলবে ১৩৫৪ ও ১৩৫৫-এর প্রথমার্ধ ("১৯৪৮-এর জুন") পর্যন্ত তো নিশ্চয়ই। এ্যাটলি-ঘোষণা তা সুনিশ্চিত করেছে।

অবশ্য, গত এক বৎসরের মধ্যে মন্ত্রীমিশন ও তার "অখণ্ড ভারতে স্বতন্ত্র পাকিস্তান-মণ্ডলের" পরিকল্পনা সমাধিস্থ হয়েছে। এখন আবার এ্যাটলি-মাউণ্টবেটেন রোয়েদাদের দিন এসেছে; রাজনীতিতে সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছে শুধু খণ্ড ভারত নয়;—খণ্ড বাঙলা, খণ্ড পাঞ্জাবের আন্দোলন—সেই কুপল্যাণ্ড প্রস্তাবিত "হিন্দুস্থান", "পাকিস্তান", খণ্ড-খণ্ড "প্রিন্সিস্তান", এবং সবার উপরে ব্রিটিশ নেতৃত্বে "ডিফেন্স সেণ্টার" বা "সামরিক কর্তৃমণ্ডলের" অধিষ্ঠান সম্ভাবনা।

অবশ্য ভারতের রাজনৈতিক সংকটের সঠিক পরিণতি এখনো সর্বাংশে বলা সম্ভব নয়, তবু তার সম্ভাব্য কাঠামো বলা যে সম্ভব, তা স্বীকার্য। এই সম্ভাব্য কাঠামো রূপ নেবে, এমন কি রূপান্তরিত হবে, ভাবীদিনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে। কাজেই এই কাঠামোকেই যারা স্বীকার করেছে লীগ ও কংগ্রেসের সেই দুই নেতৃত্বের পক্ষে আগামী কয়েক মাস হবে কঠিন পারস্পরিক দ্বন্দ্বের দিন। গৃহযুদ্ধই হবে, তাঁদের বিবেচনায়, এ সময়ে অনিবার্য, এমন কি ধর্মযুদ্ধও। ফলে, সমস্ত ভারতবর্ষেরই সংস্কৃতি আজ ইতরভাব আঘাতে বারে বারে রক্তাক্ত হবে। এ সময়ে সংস্কৃতির স্বপক্ষে জীবন্ত শক্তি আছে সংগঠিত শ্রমিক, সংগঠিত কৃষক, সংগঠিত গণ-আন্দোলন। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর থেকে বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, গোলাণ্ডন্ রক, কিংবা দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, মালদা, মেদিনীপুর প্রভৃতি অগণিত নতুন অভ্যুত্থানের দিকে তাকালেই এ সত্য বুঝতে পারি। বিপ্লব এখনো পরাহত হয়নি, যদিও প্রতিবিপ্লবও উৎকট হয়ে উঠছে—বিশেষ করে বাঙলার দিকে তাকালেই এ-কথা সুস্পষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, সমস্ত ভারতবর্ষেই প্রতিবিপ্লবের হাতে আজ দুই অস্ত্র—গৃহযুদ্ধ আর দমননীতি; সমস্ত ভারতবর্ষেও বিপ্লবের হাতে আজ দুই অস্ত্র—জনতার সম্মিলিত ফ্রন্ট আর বৈপ্লবিক সংগ্রামনীতি।

বিশেষ করে বাঙলাদেশই এই মহাসংকটের প্রধান দ্বন্দ্বক্ষেত্র। কারণ, বাঙলায় (প্রধানত কলিকাতায়, ও আসামের চা-বাগানেও) ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকেন্দ্রিত। গৃহযুদ্ধের নীতির মধ্য দিয়ে এখানে তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে, এ-কথা বেশ জানে ক্লাইব্ স্ট্রীটের মালিকতন্ত্র এবং লাল বাজারের আমলাতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, বাঙলাই নবজাত মুসলিম ধনিকদের (ইস্পাহানী, কাসেম দাদা, আদমজী সিদ্দিকী প্রভৃতি) ও ক্ষমতাপন্ন বাঙালী জমিদার-জোতদার, কণ্ট্রাক্টার, কর্মচারী ও মধ্যবিত্ত মুসলিমদের (নাজিমুদ্দীন, সাহাবুদ্দীন, সোহ্‌রাওয়ার্দী, মৌলানা আক্রাম খাঁ, বাকি প্রভৃতিদের) একমাত্র আশ্রয়কেন্দ্র। এখানে একচেটিয়া রাজত্ব পেলে মুসলিম বুর্জোয়া ক্রমে অন্যত্রও হিন্দু বুর্জোয়াদের (বিড়লা, গোয়েংকা, সিংঘানিয়া প্রভৃতিদের) সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা করতে

সক্ষম হবে। নইলে 'অখণ্ড ভারতে' সেই হিন্দু বুর্জোয়ার চাপে তারা খর্ব হয়ে থাকতে বাধ্য। তাই চাই পাকিস্তান। তৃতীয় দিকে, ব্রিটিশ শক্তি যখন দুর্বল হয়ে আসছে তখন বাঙলা-আসামের দ্বিতীয় বুর্জোয়া-শক্তি (বিড়লা, গোয়েংকা, হিম্মৎসিংকা প্রভৃতি) নিজেদেরই সেই ব্রিটিশ-ধনিক-সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতেও উদ্যোগী। তাদের তাই চাই 'অখণ্ড ভারত' অর্থাৎ কলিকাতা ও আসামের উপর আর্থিক ও রাষ্ট্রিক আধিপত্য। এ তিন প্রতিদ্বন্দ্বী ধনিক শক্তির ভাগ্য বাঙলাতেই অনেকটা স্থির হবে, এই তাদের ধারণা।

অন্যদিকে, বাঙলার পুরানো জমিদারী-তন্ত্রের সংকটও এবার প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু পুরোনো কাঠামোকে ভেঙে নতুন বাঙালী ভূমি-ব্যবস্থা গড়া মুসলিম মালিকতন্ত্রের, হিন্দু মালিক-তন্ত্রের কিংবা ব্রিটিশ মালিকতন্ত্রের কারো ঈপ্সিত নয়। তাই দমন-নীতির পক্ষে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ও সমস্ত জনআন্দোলনের বিরুদ্ধে এই তিন কায়েমি স্বার্থই একত্র দাঁড়াচ্ছে।—আর, সকল কায়েমি স্বার্থই শ্রমিকের ধর্মঘট, কৃষকের "তেভাগা" ও টংক-বিরোধ, ছাত্রদের স্বাধীনতা সংগ্রাম,—এককথায় সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রয়াসকে বিপথচালিত করেছে নিজেদেরই পরিপুষ্ট সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পথে।

ভারতবর্ষ ও বাঙলার এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত না বুঝলে এই তেপান্ন'র শেষে বাঙালী সংস্কৃতির হিসাবও ঠিক বোঝা যাবে না। কারণ রাষ্ট্র ও আর্থিক ক্ষেত্রের প্রশ্ন এই মুহূর্তে বাঙলায় দেখা দিয়েছে – 'বঙ্গভঙ্গের' আন্দোলনরূপে, আর "অখণ্ড বঙ্গ-আসামের" অভিযানরূপে। হিন্দুর মুখে জুগিয়েছে 'পাকিস্তানী নীতির' যুক্তি,—হিন্দু বাঙলা চাই, হিন্দু মুসলমানের অখণ্ড বাঙলা চাই না'; আবার মুসলমানকে করেছে "অখণ্ড" জাতীয়তাবাদী,—'অখণ্ড বাঙলা চাই, বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই।'

বঙ্গ-ভঙ্গের স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তির বিচার এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু তা না বিচার করলে, তার আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক অনিবার্য দুর্দশার কথা না বুঝলে, সম্পূর্ণরূপে এ প্রশ্নের বিচার হয় না, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের এখানে শুধু লক্ষণীয় এই—বাঙালী সংস্কৃতি তার যে অসঙ্গতির বোঝা নিয়ে আসছিল এবার সে তার চরম সংকট মুহূর্তে এসে ঠেকেছে। বলা বাহুল্য, এ অসঙ্গতি একদিক থেকে দেখলে অবশ্য সেই 'বাবু কালচার' ও 'মিঞা কালচারের' দ্বন্দ্ব: আমাদের আধুনিক বাঙালী কালচার হিন্দুর সৃষ্টি, আর বাঙালী মুসলমান উনিশ শতকের সেই রিনেইসেন্সে, রিফর্মেশনে, এমনকি সেই রাজনৈতিক প্রয়াসেও যোগদান করতে পারেননি। আজও বাঙালী মুসলমান যখন বাঙলায় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রধান তখনো তার রাজনৈতিক দৃষ্টি অস্বচ্ছ, তার রাজনৈতিক প্রয়াস অস্থির ও আত্মহারা। কারণ, তার রাজনৈতিক চেতনার পিছনে কোনোরূপ বাঙালী মুসলিম রিনেইসেন্স ও বাঙালী মুসলিম রিফর্মেশনের উজ্জ্বল আশীর্বাদ নেই। বাঙালী মুসলমান নজরুল, আবদুল ওদুদ বা ওয়াজেদ আলীকে গ্রহণ করে দাঁড়াতে বিমুখ এমন কি, মুসলিম সমাজের সংস্কারেও এখনো সে উদ্যোগী নয়। তাই সত্যই কোনো "মিঞা কালচার" গঠনেও এখনো সে অক্ষম। এই রিনেইসেন্স-রিফর্মেশন বঞ্চিত রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশও সম্ভব নয়; পরপীড়ন ও আত্মপীড়নই হয় তার পথ। বাঙালী সংস্কৃতির ভাগ্যে "মিঞা কালচারের" কোনো বড় সৃষ্টিও তাই মিলে না, মিলে তার আক্রোশ ও আক্রমণ।

কিন্তু "বাঙালী সংস্কৃতি" রক্ষার নামেই যে-হিন্দুরা বঙ্গ-ভঙ্গ চান তাঁরা বঙ্গ সংস্কৃতির এই অসঙ্গতিকেই, একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নেন। তাঁরা ভুলে যান—"বাবু কালচার", "মিঞা কালচারের" এই সংঘর্ষও অনেকটা বাইরের জিনিস, বাঙালীর আধুনিক কালচারের মূল সংকটটা হচ্ছে "ভদ্র সংস্কৃতি" ও "লোক-সংস্কৃতির" বিচ্ছেদ ও দ্বন্দ্ব। বাঙালী সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চাইলে তাকে করতে হবে সম্পূর্ণ, সমগ্র বাঙালীর সংস্কৃতি। তার জন্য দরকার হবে—রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙলার গণতান্ত্রিক বনিয়াদ—অর্থাৎ জমিদারীতন্ত্রের অবসান, শ্রমশিল্পের বিকাশ ও বিস্তার, বাঙালী জনতার রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক গণতন্ত্র লাভ। সেই বনিয়াদের উপরই সার্বজনীন শিক্ষার বেদি স্থাপন করে গড়তে হবে বাঙালীর সার্বজনীন সংস্কৃতি, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতি।

চতুর্দিকে যখন বাঙালী জীবন ও বাঙালী সংস্কৃতির "ভঙ্গতার" সম্ভাবনা, তারও মধ্যে এই তেরশ তেপ্পান্ন'র শেষ দিনেও আমরা লক্ষ্য করতে পারি—বাঙালীর সেই গণতান্ত্রিক জীবনের ভিত্তি আজ রচনা করছেন হিন্দু-মুসলমান বাঙালী কৃষক-মেয়ে, কৃষক-পুরুষ বুকের রক্ত ঢেলে ; বাঙালী মজুর আর বাঙালী কেরানী কর্মচারী দেশজোড়া ধর্মঘটের সূত্রে ; বাঙালী ছাত্র ও শিক্ষক, লক্ষ মেয়ে, লক্ষ ছেলে পথে পথে জনতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে। আর এরও মধ্য দিয়ে দেখছি—বাঙালী সাহিত্যিকের সৃষ্টি-প্রতিভা নতুন পথ তৈরি করছে মন্বন্তর, গণ-আন্দোলন, দাঙ্গা, 'তেভাগা', শ্রমিক আন্দোলনকে গ্রহণ করে গানে, গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে, নৃত্যে, বাক্‌চিত্রে, ছায়ানাট্যে। বাঙালী সাংবাদিক পর্যন্ত ('স্বাধীনতার' মত সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে) গণ-জাগরণের এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করছে। বাঙালী শিল্পী তার তুলিকা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন এই নতুন জীবনকে স্বীকার করবার জন্য। আর বাঙালী বৈজ্ঞানিকেরা নতুন বৈজ্ঞানিক কর্মী-পরিষদ গঠন করে চিন্তায় ও প্রয়াসে এক পরম শুভ সম্ভাবনার জন্য উদ্যোগী হচ্ছেন।

বিশদভাবে হিসাব নেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মন্বন্তরের বাঙলার পরে চলতি সংস্কৃতির দিকে তাকিয়ে কি বুঝতে কষ্ট হয়—কি সাহিত্যে কি শিল্পে, কি নৃত্য ও নাট্যকলায় কিংবা বৈজ্ঞানিক চিন্তায় ও প্রয়াসে বাঙলায় আজ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম লাভ করেছে? সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লবের সমস্ত বাধা ও উপহাস অগ্রাহ্য করে সাহিত্যে, চিন্তায়, কর্মে বাঙালী জীবনের—এবং ভারতীয় জীবনেরও—আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব আজ কারা অধিকার করছেন ?

তাই বিপ্লবী শক্তি যদি বাহ্যত ব্যাহত হয় আজও, তবু তার আগামীকালের জয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠছে। কারণ, বিপ্লবী সংস্কৃতি ইতিমধ্যেই বাঙালী জীবনে আপনার স্থান প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে—এই যুদ্ধকালে ও যুদ্ধান্তের আলোড়নের মধ্যে বাঙলার সংস্কৃতি মোড় ঘুরছে। বাঙালীর সংস্কৃতি আজ হতে চলেছে—culture for the people, of the people, অবশ্য সমাজের গণতান্ত্রিক সংগঠন সুসম্পূর্ণ হলে তবেই তা হতে পারবে culture by the people.

মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংস্কৃতি আপনার সীমা ও সংকট উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমেই হতে চাইবে জন-সংস্কৃতি বা culture of the people, for the people and by the people. [চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩৫৩]

নিবেদন

'বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' বর্তমান বাঙালীর প্রধান সমস্যাসমূহ আলোচিত হল। এ বাঙালী অবশ্য শুধু পশ্চিম বাঙলার বাঙালী নয়, পূর্ব বাঙলার বাঙালীও। বাঙালা সংস্কৃতি দুয়েরই সমান সম্পদ ও সমান দায়িত্ব। তবে দু' বাঙলার সমস্যা সম্পূর্ণ এক নয়। দেশ-বিভাগের পরে পশ্চিম বাঙলার বাঙালী যে সব সমস্যায় আলোড়িত সে সব সমস্যাই আমার বিশেষ আলোচ্য। সমস্যা-গুলি ছোট নয়, এবং এসব ভিন্ন আরও সমস্যা বাঙালীর আছে। তথাপি বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালী সমাজের প্রশ্নসমূহ দেশ ও বিদেশের প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে আমি দ্বিধা করিনি। ভাষা ও সমাজ বিষয়ে আমি মৌলিক সমাধানেরও যথাসাধ্য আভাস দিয়েছি। স্বভাবতই ভাষা-প্রসঙ্গে ও সমাজ-প্রসঙ্গে এরূপ বিচার যতটা তথ্যগত হওয়া সম্ভব শিল্প ও সাহিত্য বিচারে ততটা হওয়া সম্ভব নয়। তথাপি সে আলোচনা থেকেও পাঠক বাঙলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি ও সাময়িক লক্ষণ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে আভাস লাভ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এ গ্রন্থের অনেক আলোচনার সূত্রপাত হয় সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায়। দু' একটি আলোচনা আংশিকভাবে স্বতন্ত্র নামে ('বাঙলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ', 'বাঙলা লোক-সাহিত্যের ভূমিকা' নামে) প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের প্রয়োজনে কতকাংশে সে-সব প্রবন্ধ সংশোধন করতে হয়েছে। তাই এ গ্রন্থ শুধু প্রবন্ধ সমাবেশ নয়, ধারাবাহিক আলোচনা—যদিও তা চূড়ান্ত নয়, সর্বাঙ্গীন নয়,—দু'এক গ্রন্থে তা হতেও পারে না। বাঙলা সংস্কৃতির প্রধান কয়েকটি সমস্যা সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন করাই লেখকের উদ্দেশ্য। অজস্র ত্রুটীর জন্য লজ্জিত হলেও কামনা করব উদ্দেশ্য সফল হোক্।

১৫ই আগস্ট, ১৯৫৬ ইং

বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

বাঙালী সংস্কৃতির সাধক

শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদের

করকমলে

সংস্কৃতির সদর্থ

সংস্কৃতি শব্দটা হয়ত নতুন নয়; কিন্তু একালে আমরা সংস্কৃতি বলতে বুঝি 'কালচার'। কালচারের অন্য কোনো প্রতিশব্দ গ্রাহ্য হল না—'অনুশীলন', 'পরিশীলন' বা 'চিত্তপ্রকর্ষ' এখন পর্যন্ত বাঙালীর মনের মধ্যে শিকড় চালনা করতে পারে নি। 'কৃষ্টি' টিকে আছে এখনো তার মূলের জোরে,—আমাদের কৃষ্টি ও লাতিন গোষ্ঠীর 'কুলতুস্' একই ক্রিয়া। কিন্তু কৃষ্টি কথাটিতে আমাদের মনের আকাশে না ফোটে ফুল, না ফলে ফসল। সংস্কৃতি কথাটি সে হিসাবে সজীব, সতেজ; ঔজ্জ্বল্য থেকেও তার ঐশ্বর্য বেশি।

এই কথাটার সঙ্গে বড় বড় কথার আত্মীয়তা রয়ে গিয়েছে ছন্দে গন্ধে। এক অর্থে ওকে টানছে 'সংস্কার' ও 'সংস্কৃত' শব্দ দুটি, আর অর্থে ওকে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে 'কৃতি' আর তার সঙ্গে সংযুক্ত 'সংস্কৃত' শব্দ দুটি। প্রথম অর্থে ওর টানটা ঐতিহ্যের সঙ্গে। 'সংস্কার' সেখানে বোঝায় জন্মসূত্রে পাওয়া ধ্যান-ধারণা, আর 'সংস্কৃত' গুরু গম্ভীর এক ভাষা ও সাহিত্য এবং তারই সঙ্গে জড়িত একটা গুরু ও গম্ভীর মানসিকতা। কিন্তু সংস্কার ও সংস্কৃতি শব্দ দুটি বরাবর ও রকম রাশভারি ছিল না। সংস্কার এখনো তাই বোঝায় মাজা-ঘষা, কাটা ছাঁটা; যা আছে তা শুধু কমানো নয়, বাড়ানোও প্রয়োজন মত। শিক্ষা-সংস্কার, সমাজ সংস্কার, এসব শব্দে ও সংস্কারের সে-অর্থই সচল হয়ে আছে। সংস্কৃতিও সঙ্গে সঙ্গেই তাই বোঝায় মার্জিত ভাব, সাজানো-গোছানো নানা প্রকাশ। যা আছে তা পরিবর্তিত হয় এবং হয়ত পরিবর্ধিতও হয় কতকাংশে। কিন্তু এসব অর্থেও ওই কথাটির মধ্যে 'গতির' দিকটাই প্রকট। 'সংস্কৃতি' কথাটা তাই এখনো 'কালচার' কথাটার থেকে ভারি, তার চালও ভারিক্কি চাল।

কালচার কথাটা অনেক স্বচ্ছন্দ। তা 'প্রিমিটিব কালচার' বা মানুষের প্রাথমিক প্রয়াসও বোঝায়, 'ফোক্ কালচার' বা 'জনকৃতি'—লোক মানসের সাধারণ সম্পদও বোঝায়। মার্কিন 'ওয়ে অব্ লাইফ্' বা জীবন-যাত্রাও বোঝাবে, অরবিন্দ বা রামকৃষ্ণের যোগ সাধনাও বোঝাবে। 'সংস্কৃতি' এখনো অত সর্বত্রগামী নয়—অমার্জিত জীবনের ও মনের ছোঁয়াচে সে স্বচ্ছন্দ নয়। এখনো তাই পাহাড়ীয়া জাতিদের অমার্জিত জীবন ধারাকে অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত বলতে হয় 'কিরাত জনকৃতি'; তা 'সংস্কৃতি' নয়, 'কৃতি'। 'ফোক্ কালচারকে' আমরাও লোক কৃতি বা লোক-কৃষ্টি বলেই চালাই। কারণ, 'সংস্কৃতি' কথাটার মধ্যে পরিমার্জনার একটা আভাস আছে, তা শিষ্ট মানুষেরই আয়ত্ত করা সম্ভব। 'কালচার' কথাটার মধ্যেও সে আভাস তলিয়ে যায় নি। শিক্ষিত মানুষ অভদ্র হলে তার সম্বন্ধে বলি 'কালচার নেই'।

পূর্ণতার সাধনা

এই পরিমার্জনা হচ্ছে মনের পরিমার্জনা—ভাববাদী অর্থে perfecting of mind—এই হল তাই অনেকের মত। সংস্কৃতি বলতে বিশেষ করে বুঝায় 'মার্জিত মানসিকতা'—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কথাটির উপর বিশেষ করে জোর দিয়েছেন 'ভারত সোবিয়েত সংস্কৃতি সমিতির' উদ্বোধন ভাষণে (৩০শে আগষ্ট, ১৯৫৩)। মানুষের এই পরিমার্জিত মানস তার আধ্যাত্মিকতারই প্রকাশ। স্বভাবতই ভাববাদী দৃষ্টিতে একথাও তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর মতে বিশেষ করে মানুষের এই পরিমার্জিত মন বা আধ্যাত্মিক বোধই রূপলাভ করে শিল্পে সাহিত্যে,—মোটের উপর যাকে বলা যায় আর্টস তাতে। তাই সংস্কৃতি বলতে আমরা সাধারণ ভাবে বুঝি শিল্প সাহিত্য নৃত্য

নাট্য প্রভৃতি চারুকলা ; ওসবের বিচার ও ধ্যান-ধারণা। নানা দেশে নানা কালে মানুষের আত্মার এই সাধনা নানা বিশিষ্ট ও বিচিত্র রূপ গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী আমরাও কখনো সংস্কৃতির নামকরণ করি দেশ বা জাতির নামে, কখনো তার পরিচয় অন্বেষণ করি কালের হিসাবে। কিন্তু মূল কথাটা হল এই মানসিক পরিমার্জনা বা আধ্যাত্মিক প্রকাশ, 'পূর্ণতার সাধনা' perfecting of mind, 'আর যেখানেই তার যে বিশেষ প্রকাশ ঘটুক—নিগ্রো আর্টে বা গ্রীক মানবিকতায়, সেখানেই আমরা মাথা নত করব শ্রদ্ধায়।'

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন—তিনটি জিনিসকে এই মানসিক পরিমার্জনায় বা সংস্কৃতির প্রধান সত্য বলে মানতে হয়। প্রথম হল মনের স্বাধীনতা (ফ্রিডম অব মাইণ্ড), দ্বিতীয় হল বিশ্বমানবতা (ইউনিভার্সালিজম্), তৃতীয় হল শালীনতা (আর্বানিটি,—ওই বিশেষ শব্দটিকে বৈদগ্ধ্য বা নাগরিকতা বলে অনুবাদ করা যেতে পারে। কিন্তু সর্বশুদ্ধ যে গুণাবলী 'আর্বানিটি' শব্দটিতে বোঝায় তাতে হয়ত ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও শালীনতা, পরিশীলন প্রভৃতি শব্দেই তা সুপ্রকাশিত হয়)।

সাধারণ ভাবে এই হল সংস্কৃতির সদর্থ। এই বিচার গ্রহণ করলে বিশেষ বাধা কারো হয় না। অবশ্য এই তিন মূল সত্যের সঙ্গে কেউ আরও যোগ করতে পারেন ঐ অর্থের বা ঐ জাতের আরও দু' একটি গুণ—মনের স্বাধীনতাকে কেউ বলবেন (কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের মত) 'বুদ্ধির মুক্তি', 'ইউনিভার্সালিজম্' না বলে বিশ্বমানবতাকে বলবেন 'হিউম্যানিজম্', আর 'আরবানিটিকে' কেউ হয়ত বুঝবেন 'ডিসেন্‌সিস্ অব লাইফের' (decencies of life) স্বীকৃতি বলে। তা ছাড়াও চুল-চেরা বিচার চলতে পারে—'মনের স্বাধীনতা' বলতে আমরা কি বুঝব, 'বিশ্বমানবতা' বলতে আমরা কি-কি বুঝব, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সম্ভবতঃ আমরা এ সব কথায় যে সব 'ভ্যালুজ', জীবন মূল্য বা স্বীকার্য গুণ বুঝাই তা সকলেই বুঝি ; এবং স্বীকার করি সে সব গুণ কাম্য, তা না থাকলে 'সংস্কৃতি' ফাঁকা হয়ে যায়।

বিজ্ঞান ও পূর্ণতার সাধনা

সংস্কৃতির এই ভাববাদী বিচারকে তবু বলতে হবে পর্যাপ্ত নয়। এসব জীবন-মূল্য (ভ্যালুজ) নিশ্চয়ই যথার্থ, তা তবুও যথেষ্ট নয়। সহজ ভাবেই আমরা জানি, এখনো আমরা সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে শিল্প সাহিত্য প্রভৃতি আর্টসকেই প্রাধান্য দিই। কিন্তু এ কালে আমরা কি কালচারের এলেকা থেকে বিজ্ঞানকে আর বাইরে রাখতে পারি? কোনো কালেই অবশ্য সম্পূর্ণ-রূপে তা পারতাম না। কিন্তু একালে বিজ্ঞানকে আমরা গৌণও মনে করতে পারি না। মানুষের 'পূর্ণতার সাধনা', perfecting of mind, শুধু রসবোধেই ত সীমাবদ্ধ নয়। অবশ্য রসবোধের উৎকর্ষ না ঘটলে মানুষের মনের কোনো যথার্থ উৎকর্ষই ঘটে না। আর্টসের এলেকা প্রধানত এই রসবোধ ও অনুভূতির রাজ্য। তাতেও বুদ্ধি-বিচারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আর্টসের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিচার হচ্ছে গৌণ, অনুভূতিই মুখ্য। অথচ বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ না ঘটলে মানুষের 'মনের স্বাধীনতা' সত্যই কতটা আয়ত্ত হয়? আর বুদ্ধির, যুক্তির, জ্ঞানের প্রধান প্রকাশই হল বিজ্ঞানে। তাবৎ চরাচরের নীতি-নিয়ম যতই মানুষ কার্য-কারণ সূত্রে বুঝে ওঠে, ততই তার চেতনার রাজ্য প্রসারিত হয়, তা গভীর হয়। সঙ্গে সঙ্গে জীবন-বোধও ব্যাপক হয়, সেখানে গভীরতা আসে। অনুভূতির রাজ্যেও তার ঘাত-প্রতিঘাত নতুন আলোড়ন তোলে। মানুষের রসসৃষ্টি বিজ্ঞানের দানে বিনষ্ট হয় না। বরং অনুভূতিতে আসে নতুন তীক্ষ্ণতা, নতুন গভীরতা, সমৃদ্ধি।

সাধারণ দৃষ্টিতেও আজ তাই কালচার বলতে আমরা যেমন শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে বুঝি বিজ্ঞানকে, তেমনি জানি কালচার শুধু মানসিক সৃষ্টি-সম্পদ নয় ; বাস্তব সৃষ্টি-সম্পদও কালচারের অঙ্গ। কারুবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা, ও পুর-পরিকল্পনা, এসব শুদ্ধ সর্বদিকে জীবনযাত্রা স্ফূর্তির

অবকাশ না ঘটলে মনের মুক্তি ব্যাহত হতে বাধ্য। ভাববাদী বিচারক হয়ত বলবেন, এহ বাহ্য। কিংবা, মনের মুক্তি আগে তারপর এসব বাহ্য মুক্তি। কিন্তু একালে আমরা জানি, বাস্তবের বনিয়াদের উপরে ছাড়া জীবন দাঁড়াতে পারে না, ফুটতে বা ফসল দিতে পারে না। আর জীবনের সেই বনিয়াদ প্রশস্ত করে তুলছে আজ বিজ্ঞান। তাই বাস্তব-জীবন-যাত্রায় বৈজ্ঞানিক শক্তি ও পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রসার আজ কালচার বা সংস্কৃতির একটি মূল প্রতিজ্ঞা। পরিহাসের কথা নয়—যাদের সাবান ব্যবহারের রেওয়াজ নেই তাদের কালচার তুচ্ছ। যে-দেশে ইলেকট্রিসিটির যত ব্যবহার সে-দেশে কালচারের তত প্রসারের সুযোগ। 'প্লেন্ লিভিং' মানে 'সায়েন্টিফিক্ লিভিং'।

অবশ্য 'মনের মুক্তি' বলতে নিশ্চয়ই এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বা 'সায়েন্টিফিক্ এ্যাটিচ্যুডের' কথাও স্বীকৃত হয়। মুক্ত মনের ঈশ্বর-বিশ্বাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই 'পরমপুরুষের' মিরাকল্-বিন্যাসে হাসি পাবে, হিন্দী সিনেমায় জুগুপ্সা জাগবে। ভদ্রতায় বিশ্বাসী মুক্ত মনের কাছে ধর্মের ম্যাজিক-বাদ একালের সিনেমার সেক্স-এপীলের মতই স্থূল।

মনের মুক্তির অর্থ

কিন্তু তর্ক উঠবে এ কালের পৃথিবীতে চিন্তা নিয়ন্ত্রণ মনের মুক্তিকে অসম্ভব করছে। তা'হলেও মনের মুক্তি কথাটার অর্থ কী? কিসের মুক্তি বা স্বাধীনতা? নিশ্চয়ই মানুষের সৃষ্টিশক্তির স্বাধীনতা, সমাজবদ্ধ মানুষের সৃষ্টি-শক্তির উদ্বোধন। নইলে মনের স্বাধীনতার অর্থ কি কল্পনা-বিলাস?

সত্য কথা, যন্ত্রবিজ্ঞানের শক্তি সমাজের যে শ্রেণীর হাতে গিয়ে আজ পড়েছে সে-ই চাইছে মানুষের মনকে তার প্রয়োজন মত ঢেলে সাজাতে। এ যুক্তি আমরা জানি; এবং কে তা অস্বীকার করবে? এর মধ্যে মানুষের মনের স্বাধীনতা তাহলে সম্ভব একমাত্র সেখানে যেখানে এরূপ শাসক-শ্রেণী মানুষের মনকে চায় বিশ্ব-মানবতার সঙ্গে যুক্ত করতে, বৈজ্ঞানিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যুক্ত করতে, এবং প্রত্যেকটি মানুষকে দান করে 'মানুষের অধিকার—মানুষের সৃষ্টিশক্তি সেখানে অব্যাহত। তাই এ 'নিয়ন্ত্রণ' হচ্ছে আসলে 'সংযম'। এরূপ 'থট্ কনট্রোল'ও অবশ্য কারো কারো কাছে মনে হবে মনের দাসত্ব—যেমন, অলডাস হাক্সলি 'স্যাভেজ' হতে চাইবেন—শেক্সপীয়র-পড়া স্যাভেজ, অর্থাৎ, সভ্যতার সমস্ত সুযোগ নিয়ে চাইবেন আদিম দায়িত্বহীনতা, অসংযম। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

একালে তাই কালচার বা সংস্কৃতির মূল সত্য শুধু মনের মুক্তি, বিশ্বমানবতা ও শালীনতা বললেই শেষ হয়ে যায় না। নিশ্চয়ই ও সব চাই। কিন্তু ও সবেরও মূল যেই সত্যটি তা নির্দেশ না করলেও আর চলে না। এ সত্য হচ্ছে সৃষ্টির স্বাধীনতা।

সৃষ্টি-শক্তির সার্থকতা

সৃষ্টিশক্তি হচ্ছে মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য। অন্য জীবের জীবন শুধু পূর্ব-পূর্ব জীবনের অনুবৃত্তি। তারা প্রকৃতির রাজ্যে অসহায়। কিন্তু মানুষের স্তরে পেঁছে তাদের এই জীবলীলা অনেকটা নূতনতর শক্তিতে স্ফূর্ত হয়েছে। মানুষও অবশ্য জৈব নিয়মের বশ। জন্ম-মরণের মধ্য দিয়ে সেও অনুবৃত্তি করছে জীবন-ধারার। কিন্তু সে আপনার প্রয়াসে আপনার জীবনকে গঠন করবার অধিকারীও হয়েছে। প্রাণলীলা তার মধ্যে সম্ভাবনায় সুমহৎ। অবশ্য সে অধিকার নিশ্চয়ই নির্বিশেষ নয়। প্রকৃতির নিয়ম-নীতিকে অনুধাবন ও অনুসরণ করেই মানুষ নিজ পদ্ধতিতে জীবন-গঠনের অধিকারী হয়। কিন্তু এই অধিকার অর্জনেই মানুষের স্বাধীনতার বিকাশ। তার

জীবন-যাত্রা যত সে সুসংগঠিত করে ততই তার মনের প্রকাশ ও বিকাশ সুনিশ্চিত (অর্ডারড্) ও স্বচ্ছন্দ (ফ্রী) হয়।

ইতিহাস জুড়ে মানুষের এই সৃষ্টিশক্তি নানা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে চলেছে। অবশ্য সমাজের নানা শ্রেণীর দ্বন্দ্বে অধিকাংশ মানুষেরই শক্তি এতকাল রয়েছে অবজ্ঞাত বা অপব্যয়িত। জ্ঞানের চর্চায় ও রসবোধের বিকাশে অধিকারী হয়েছে শুধু মুষ্টিমেয় মানুষ। তাই সংস্কৃতিও এতদিন রয়েছে অসম্পূর্ণ—মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পদ। নিষ্কর্মা ক্ষমতাবান্ মানুষেরা তাকে চেয়েছে সৃষ্টির সহায় না করে আপনাদের সম্পত্তি করে রাখতে, শোষণের সহায় করে চালাতে। "আমাদের শোষণ-সুযোগ চাই, কারণ আমরা কালচারের কাণ্ডারী, বিজ্ঞতার ভাণ্ডারী।" অধিকাংশ মানুষের জীবন তাই হয়েছে 'পিলসুজের জীবন'—আলোক জ্বলছে মাথায়, গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গরম তেল।

আজকের এই যুগে এসে মানুষ দেখছে কতখানি সৃষ্টিশক্তির অপচয়ে জ্বলে এই আলো; আর বোঝে সৃষ্টিশক্তির সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ প্রকাশেই সংস্কৃতির সম্পূর্ণতা—মনের মুক্তি। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাই বলেন—রুশ বিপ্লবের পরে সকল মানুষই স্বীকার করবে—মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ অবাঞ্ছনীয়।

আমরা তাই এ যুগে সংস্কৃতির অঙ্গ বলি—শুধু 'মনের মুক্তি' নয়, সৃষ্টিশক্তির উদ্বোধন; 'ইউনিভার্সালাইজেশন্ অব্ কালচার,' সার্বজনীনতা ও সর্বাঙ্গীনতা সাধন; এবং 'সার্বানিটি' নিশ্চয়ই, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু সহযাত্রীর হৃদ্যতা—'ফেলোশিপ'।

কৃতির সম্পূর্ণতা

আজকের দিনে তাই মনে হয়—'কৃতি' কথাটাই সংস্কৃতি কথাটার প্রাণবস্তু। আসল জিনিস হল কৃতি বা কর্ম, অ্যাকশান্। In the begining there was deed. সম্-উপসর্গ দিয়ে আমরা বোঝাতে চাই সে কর্ম শুধু পুনরাবৃত্তি নয়, তার সম্পূর্ণতা। 'সংস্কৃতি' কথাটার মধ্যেই তাই রয়েছে মানুষের এই ইতিহাস-জোড়া সাধনার ইঙ্গিত—সে কিছু-না-কিছু করে। যা সে জন্মসূত্রে পায় তার সঙ্গে যোগ করতে পারে তার আপনার দান, অর্থাৎ সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতেই (ক্রিয়েটিবনেস্ এ) মানুষের পরিচয়, সৃষ্টি ভিন্ন পূর্ণতার সাধনা পূর্ণ হয় না। বিলিতী কালচার কথাটি যা বোঝায় তার থেকেও বেশি স্পষ্ট করেই 'সংস্কৃতি' কথাটা বোঝাতে পারে এই মূল সত্যটা—মানুষ সৃষ্টিশীল। শুধু জানলে আর বুঝলেই মানুষের জীবন-ধর্ম শেষ হয়ে যায় না। তাকে কিছু করতে হয়, কিছু গড়তে হয়, কিছু সৃষ্টি করতে হয়। জগৎকে interpret করলেই যথেষ্ট হবে না, জগৎকে change করতে হয়। এই হল সংস্কৃতির দাবি—আর তাতেই মনেরও মুক্তি।

আর একেই বলতে পারি সংস্কৃতির সদর্থ।

ভাঙা বাঙলার সাংস্কৃতিক সংগঠন

কয়েকটি প্রস্তাব

। ১। দুই বাঙলা ঃ এক ভাষা, এক সাহিত্য

প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া বাঙলা ভাষা বাঙালী জাতির মাতৃভাষারূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে এবং বাঙালী জাতিকে একটি রাষ্ট্রজাতিতে ("নেশন") পরিণত হইবার পক্ষে সহায়তা দান করিয়াছে। আজ সেই বাঙালী জাতি দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছেদে তাহার জাতীয় সত্তা আজ সংকটাপন্ন। এমন কি, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বাঙালীর বিভাগে বাঙালীর ভাষাও নানা বিপদ ও জটিলতায় নিপতিত। দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বাঙালীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ দুই রাষ্ট্রের নিজ নিজ জনসাধারণ স্বেচ্ছায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থির করিবেন, এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নাই। সেই কথা মানিয়া লইয়াও দৃঢ়কণ্ঠে বলা যায়—বাঙলা ভাষার ও বাঙলা সাহিত্যের সংযুক্ত ঐতিহ্য ও স্বচ্ছন্দ বিকাশধারা অব্যাহত রাখা দুই রাষ্ট্রের বাঙালী জনসাধারণের ও বাঙালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের আজ একটি পবিত্র কর্তব্য। উভয় বাঙলার মধ্যে তাই ভাষার, সাহিত্যের ও সংস্কৃতির সর্বরকমের সুস্থ আদানপ্রদান, যোগ ও বিনিময় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উভয় বাঙলার জনগণ ও বুদ্ধিজীবীরা উদ্যোগী থাকিবেন।

কারণ, দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইলেও বাঙালীর সংস্কৃতি এক, সাহিত্য এক এবং তাহার ভাষা এক বৈ দুই হইতেই পারে না। রাজনৈতিক, এমন কি সামাজিক পরিবর্তনেও ভাষার কোনো মূলগত পরিবর্তন সহজে সাধিত হয় না। প্রধানত ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়াই আবার জাতীয় সংস্কৃতি, জাতীয় মানসিকতা ও জাতীয় চরিত্র বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয় ও রূপায়িত হইয়া উঠে। যুগে যুগে ব্যক্তিপ্রতিভার নিজস্ব বিকাশে ও বিশিষ্ট পরিবেশের যোগাযোগে সেই সংস্কৃতি ও সাহিত্য আরও বিচিত্র ঐশ্বর্য লাভ করে। বাঙলা ভাষা পৃথিবীর প্রায় ছয় কোটি বাঙালীর মাতৃভাষা, বাঙলা সাহিত্য সকল বাঙালীর নিজস্ব সাহিত্য, সকলের সমবেত উত্তরাধিকার। বাঙলাভাষীর সংখ্যা হিসাবে ও সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষের হিসাবে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ভাষার মধ্যে বাঙলার স্থান—এই সত্যও অপরিবর্তনীয়।

। ২। মূল প্রশ্ন

১৯৪৭-এর পরে দুই রাষ্ট্রেই বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যকে তথাপি কয়েকটি বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতাপ্রসূত বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। প্রধানত দুই প্রশ্নকে আশ্রয় করিয়া এই বিভ্রান্তি ও বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। যথা, (১) ভারত-রাষ্ট্রের ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষার সহিত বাঙলা ভাষার সম্পর্ক কী? (২) পশ্চিম বাঙলা রাজ্য ও পূর্ব পাকিস্তান রাজ্যে সরকারী কার্যে ও শিক্ষাদীক্ষায় বাঙলা ভাষার স্থান কোথায়?

ভারতের ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক বিকাশ, ও জনগণের ভাষাগত অধিকারের দাবিকে মনে রাখিয়াই এই সব প্রশ্নের গণতান্ত্রিক বিচার ও উত্তর স্থির করিতে হইবে।

। ৩। ভারতবর্ষের ভাষাগত পরিস্থিতি

ভারতবর্ষ বহুজাতির দেশ। যাহাদের মাতৃভাষা বিভিন্ন এমন ছোটবড় বহু জাতি (নেশন), অধিজাতি (ন্যাশনালিটি), উপজাতি (ট্রাইব্) ও কোমের (ক্ল্যান্) মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। এই মহাভূমির দুই রাষ্ট্রের সম্বন্ধেই সাধারণভাবে বলা যায়—ভারত ও পাকিস্তান, দুই বহুজাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র।

এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতে বাঙালী, হিন্দুস্তানী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি কোনো কোনো ভারতীয় জাতির ভাষা, এবং পাকিস্তানে বাঙালী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী প্রভৃতি কোনো কোনো পাকিস্তানী জাতির ভাষা প্রায় 'জাতীয় ভাষায়' পরিণত হইয়াছে ; এবং এই সব ভাষা অন্যতম প্রধান ভাষারূপে রাষ্ট্রের স্বীকৃতিলাভও করিয়াছে। কিন্তু সাঁওতালি (মুণ্ডারি), গোণ্ড, ওরাঁও হইতে আরম্ভ করিয়া গোর্খালি, মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, মালবী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভারতের কয়েকটি অধিজাতি-উপজাতির ভাষা এখনো ততটা উন্নতিলাভ না করিলেও সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে, শিক্ষা প্রভৃতিতেও ইহাদের কতকটা ব্যবহার স্বীকৃত হইয়াছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও এইরূপ অপরিণত অধিজাতির বিকাশ ও ভাষার সংহতি না চলিতেছে তাহা নয়। যেমন, পশ্‌তু, বালোচী প্রভৃতি জাতির ভাষা সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। অবশ্য এইসব পরিচিত ভাষা ছাড়াও দুই রাষ্ট্রেই অনেক ছোটছোট উপজাতির ভাষা আছে যাহা নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, কিংবা যাহা বিকাশলাভের সুযোগ পায় নাই ; এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে যাহাদের বিকাশলাভ করার সম্ভাবনা। যেমন, ভারতের শবর (অস্ট্রিক), কন্ধ (দ্রাবিড়), কোদণ্ড (দ্রাবিড়), নেওয়ারী, লেপ্‌চা, গারো, টিপরাই, (ভোট চীনা) প্রভৃতি ভাষা। এবং পাকিস্তানের ব্রাহুই (দ্রাবিড়), শিণা, চিত্রলী, বাশগলী (ইরানী) ও আরাকানী, পার্বত্য চট্টগ্রামী (কুকি-চীনা) প্রভৃতি ভাষা। এইসব, এবং এইরূপ অনেক ভাষা এখনো বিচ্ছিন্ন কৌম-জীবনযাত্রার ভাষামাত্র। সভ্যতার আদান-প্রদানে ভাঙিয়া চুরিয়া ইহাদের কোন্ কোন্ ভাষা টিকিবে, টিকিলে কি ভাবে টিকিবে, তাহা এখনো বলা অসাধ্য।

এইসব কারণে ভারত ও পাকিস্তানের ভাষাগত বৈজ্ঞানিক জরিপ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এবং তৎপর বিশেষভাবে স্মরণীয় এই কথা যে, বিশেষ বিশেষ ভাষা-বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে শিক্ষিত মানুষেরা কি ভাষা বলেন বা শহরে কি ভাষা চলে, তাহার অপেক্ষাও বেশি গুরুত্ব দিতে হইবে গ্রামাঞ্চলের ভাষাকে, বিশেষ করিয়া কৃষক-সাধারণের ভাষাকে। ভাষা-সংশয়ে উহাই বিচারের প্রধান মানদণ্ড।

বর্তমান সময়ে ভারতের ও পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু ইহাই বলা চলে যে : (ক) এখনো পর্যন্ত এইসব বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশে কোনো একটি সর্বজাতি-স্বীকৃত আদানপ্রদানের ভাষা নাই।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার শাসন ও শোষণের দায়ে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালাইলেও শতকরা ২ জন লোকেও ইংরেজি জানে না—ভারতীয় বা পাকিস্তানী কোনো জাতিরই জনগণ ইংরেজি বুঝে না। এই সাম্রাজ্যবাদী ভাষার চাপের অবসান না হইলে কোনো রাষ্ট্রেরই মানসিক আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইবে না। কোনো জাতি, অধিজাতি বা উপজাতির ভাষাও আপনার বিকাশের পথ উন্মুক্ত দেখিবে না।

এই অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসরণে কোনো একটিমাত্র ভাষাকে ভারত বা পাকিস্তান রাষ্ট্রে রাষ্ট্রভাষা করার প্রয়াস ভ্রান্তিজনক ও অ-গণতান্ত্রিক প্রয়াস। ভারত-রাষ্ট্রে হিন্দীকে 'রাষ্ট্রভাষা'-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় ও পাকিস্তানে 'উর্দু'কে ঐরূপ প্রতিষ্ঠাদানের চেষ্টায় এই দুই বহু-জাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র আপনাদের সত্তার মূলোৎপাটন করিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে বিপন্ন করিতেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে জাতিতে জাতিতে, ভাষায় ভাষায় বিরোধ বাধাইতেছে।

এই কথা সত্য যে, ভারত-রাষ্ট্রে হিন্দীভাষাই অন্য ভাষার অপেক্ষা বহুল পরিমাণে পরিচিত এবং হিন্দী-উর্দু, হিন্দী-হিন্দুস্তানী, ও বাজার-হিন্দী, হিন্দীর আভ্যন্তরীণ এই ত্রিরূপের সমস্যার কোনো সুসমাধান হইলে হিন্দী-ভাষারই পক্ষে কেন্দ্রীয় 'রাষ্ট্রভাষা'র পদলাভ করা যথাকালে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে হিন্দী সেই পদ এখনকার মতো উদ্ধতভাবে রাজশক্তি ও ধনিকশক্তির সাহায্যে কবলিত করিতে গেলে ভারতীয় অন্যান্য জাতি ও ভাষা নিশ্চয়ই হিন্দী-বিরোধী হইয়া উঠিবে এবং হিন্দীরও ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক প্রসারের পথে বাধাই জমিতে থাকিবে।

বাঙালী জনসাধারণ হিন্দী ভাষার ভবিষ্যৎ প্রসারে আশাহীন নয় বলিয়াই হিন্দীভাষী জন-সাধারণ ও সাহিত্যিকদের নিকট এই দাবি করিতেছে যে, "আপনারা হিন্দীপ্রচার আন্দোলনকে সরকার ও ভারতীয় ধনিকতন্ত্রের কবল হইতে মুক্ত করিয়া সুস্থ গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং

হিন্দীকে অকালে রাষ্ট্রভাষারূপে চালাইবার লোভ ত্যাগ করিয়া ভারতের সকল ভাষার সঙ্গে তাহাকে সমান মর্যাদায় ভারতের প্রধানতম ভাষারূপে গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হউন। সঙ্গে সঙ্গে সহজ, জটিলতা-বর্জিত হিন্দুস্তানী যাহাতে ভারতের সকল জাতির আদানপ্রদানের ভাষা হইয়া উঠে এবং কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সর্বস্বীকৃত প্রধানতম ভাষা হইয়া উঠিতে পারে সেইজন্য অন্য ভাষীদের, বিশেষ করিয়া দ্রাবিড়-ভাষীদের সমর্থন সংগ্রহ করুন।"

(খ) ভারত-রাষ্ট্র বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতো বহুজাতিক রাষ্ট্রের পক্ষে আভ্যন্তরীণ কর্ম পরিচালনায় একটি রাষ্ট্রভাষা অপেক্ষা বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন প্রত্যেকটি প্রধান ভাষাকেই সমমর্যাদাশালী রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকার করা।

জাতির আত্মবিকাশের নীতিতে ভাষাশ্রয়ী জাতিরা স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হইলে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদের সৌকর্যের জন্য, একটি নিখিল ভারতীয় অনুবাদক সার্ভিস (ভারতীয় হিসাব পরীক্ষক সার্ভিস প্রভৃতির মতো) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের (ইউ. এন্.) অনুরূপে ভারতরাষ্ট্রের ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের কেন্দ্র ও প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভা, এবং সরকারী কমিটির অধিবেশনে, সভা-সমিতিতে তৎক্ষণাৎ অনুবাদের (সাইম্যালটেনাস্ ট্রান্স্লেশন্) ব্যবস্থা করা সম্ভব। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকটি ছাত্রের পক্ষে মাতৃভাষা ছাড়াও দ্বিতীয় কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষার সাধারণ জ্ঞান-লাভের আয়োজন করা চলে। এইরূপে নানাভাবে আদান-প্রদানের ও কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য পরিচালনা করা সুসাধ্য।

। ৪ । ভাষা-মীমাংসার মূল নীতি

ভারতীয় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশ ও ভারতের ভাষাবিষয়ক পরিস্থিতি স্মরণ করিয়া তাই বাঙালী জনসাধারণ মনে করে যে—ভারতীয় জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি কার্যে পরিণত করিবার জন্য অবিলম্বে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন :

(১) ভাষাভিত্তিতে রাজ্যগঠন ও রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা।

(২) আক্ষুদ্র প্রত্যেকটি অধিজাতি, উপজাতি, কোমকে 'ভারত-সঙ্ঘের' (ইউনিয়ন) ও বিভিন্ন রাজ্যের (স্টেটস্-এর) অধীনে নিজ নিজ এলাকায় 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' ও ভাষাগত স্বাধীনতা-ভোগের অধিকার দান করা—সঙ্গে সঙ্গে অনগ্রসর ও সংখ্যাল্প কোম, উপজাতি বা অধিজাতিদের দ্রুত অগ্রগতির জন্য সর্ববিধ সহায়তা দান করা।

(৩) ঐতিহাসিক বা স্বাভাবিক পথে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নের ফলে ভাষার যে পরিণতি ঘটিতেছে তাহার নামে যেমন বৃহৎ ভাষার গ্রাসেচ্ছাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না, তেমনি যেখানে উপভাষা (ডায়ালেক্ট) মিশিয়া 'জাতীয় ভাষার' রূপ পরিগ্রহ করিতেছে—স্বাভাবিক মিশ্রণে, যোগাযোগে ভাষা-সংহতি দেখা দিতেছে, —তাহারও পথরোধ করা চলিবে না।

। ৫ । বাঙলা রাজ্যে বাঙলার দাবি

বাঙলা ভাষার স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক বিকাশ সুসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত বাঙালীর দাবি এই যে :

(১) বাঙালীর জাতীয় রাষ্ট্রে বাঙলাই সরকারের শাসনের, বিচারের ও উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন, সর্ববিধ শিক্ষার মূল ভাষা রূপে গ্রাহ্য হউক—এই সব বিভাগে ইংরেজির অবসান হউক।

(২) পশ্চিম বাঙলার অধিবাসী প্রত্যেকটি অধিজাতির (যথা, সাঁওতাল, গোর্খা, প্রভৃতির) ও উপজাতির (যথা, টিপ্রাই, মণিপুরী, ওরাঁও, লেপ্চা প্রভৃতির) নিজ নিজ বাসক্ষেত্রে নিজ মাতৃভাষায় অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষার, ও যেখানে সম্ভব তদূর্ধ্ব শিক্ষার, এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

(৩) কার্যসূত্রে পশ্চিম বাঙলার অধিবাসী প্রত্যেকটি জাতির সংখ্যাল্প গোষ্ঠীকে (যেমন, শ্রমিক-অঞ্চলের হিন্দুস্থানী, ওড়িয়া প্রভৃতি) নিজ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদীক্ষা, ও যেখানে সম্ভব তদূর্ধ্ব শিক্ষার, এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিকাশের সুযোগ দেওয়া হউক।

বৈশাখ, ১৩৬০।

ভাষা-সমস্যার মূলসূত্র

ভাষা ও জাতি-সমস্যার বিচারে সোবিয়েত নায়ক স্তালিনের মতো গুরু আর নেই। সে-বিচার সার্থক প্রমাণিত হয়েছে সোবিয়েত ইউনিয়নে। ভারতবর্ষের ভাষা-সমস্যায় আজও (১৩৬০ বাং) অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর বিচারই বহুলাংশে সুচিন্তিত। তাতে অসম্পূর্ণতা যা থাকে তার কারণ, তিনি ঐতিহাসিক শক্তিতে আস্থাশীল নন। কিন্তু ভাষা-সমস্যা ও জাতি-সমস্যা আসলে পরস্পর বিজড়িত। আর এই জটিল প্রশ্নকে আবার ইতিহাসের বিকাশমান পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে তার স্বরূপ বোঝা যায় না, তার সক্রিয় সমাধান সম্ভবপর হয় না। তাই স্তালিনের বিচার ও স্তালিনের নীতিই হল ভাষা ও জাতি সমস্যার শ্রেষ্ঠ বিচার ও সঠিক সমাধান।

ভাষা-ব্যাপারে সোবিয়েত ইউনিয়নের সমস্যা অনেকাংশে ভারতবর্ষেরই অনুরূপ ছিল। প্রজাতন্ত্রী চীনের সমস্যা সে-তুলনায় আমাদের সমস্যার মতো নয়। অবশ্য মনে রাখা দরকার, সোবিয়েতের ও আমাদের সমস্যাতেও পার্থক্য অনেক। সোবিয়েতের (যুদ্ধের পরে) প্রায় ২১ কোটি লোকের মধ্যে ১১ কোটির অধিক লোক রুশ-ভাষী ; সেখানকার অন্যান্য ভাষার তুলনায় রুশ ভাষা সাহিত্যে ও সামর্থ্যে অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষে হিন্দী বা অন্য কোনো ভাষা সংখ্যাবলে এ প্রতিষ্ঠা দাবি করতে পারে না ; কোনো ভারতীয় ভাষা প্রকাশশক্তিতেও অতটা বিকাশ লাভ করেনি। সোবিয়েত ইউনিয়নের রুশ-ভাষার সঙ্গে ভারত-রাষ্ট্রের হিন্দী-ভাষার তুলনা তাই মোটেই খাটে না। তা ছাড়া লক্ষণীয় এই যে, সোবিয়েত বিধানে কোনো ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' বলে আইন করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। তার মূলে অবশ্য আরও একটা কথা আছে ঃ সোবিয়েত ইউনিয়ন ভাষা-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে বিপ্লবের পরে, বিপ্লবী নীতিতে। এই কারণেই রুশ-ভাষা অন্য ভাষাকে গ্রাস না করে তাদের বিকাশে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। আমরা ভাষা-সমস্যার সমাধান (?) খুঁজছি বিপ্লব বাদ দিয়ে। তাই, আমাদের একটিমাত্র প্রধান ভাষা যখন নেই, প্রত্যেক স্ব-স্ব প্রধান ভাষা প্রতিবেশী ভাষার উপর বিরূপ। এদিকে হিন্দী ইংরেজির মতো রাজতক্তে সমাসীন হতে চায়। বিপ্লবের যুগে বিপ্লবকে ঠেকাতে গিয়ে এরূপে যত রকমের সম্ভব জটিলতা আমরা সর্বত্রই সৃষ্টি করছি। ভাষা ও জাতীয়তার ক্ষেত্রেও দেখছি তারই প্রতিফলন—চিন্তার অরাজকতা, উগ্র অহংকার, মারাত্মক সংকীর্ণতা।

ভাষা-ক্ষেত্রের অরাজকতা

এ-সমস্যা যে ভারতবর্ষে আসবে তা অজানা ছিল না। স্তালিন বহুপূর্বেই বলেছিলেন—ভারতবর্ষে যেদিন বিপ্লব দেখা দেবে, সেদিন সেখানে নতুন নতুন কত জাতি যে মাথা তুলে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তথাপি আমাদের হিন্দুস্থানী বন্ধুরা ভাবছেন—পাঞ্জাব থেকে বাঙলা পর্যন্ত সমস্ত দেশ জুড়ে নাকি এক "হিন্দুস্থানী জাতি" শের শাহ্-এর আমল থেকেই জন্মলাভ করেছে, শুধু তার নামকরণই রয়েছে বাধা! পশ্চিম বাঙলা ও বিহারের শিক্ষিত (?) বর্গরা ভাবছেন—ছোটনাগপুর হয় বাঙালীর রাজ্য, নয় বিহারীর ;—যেন সাঁওতাল, ওরাঁও প্রভৃতি 'ঝাড়খণ্ড'-এর জাতিদের ভাষাও নেই, অস্তিত্বটাও গৌণ! ধলভূমের বাঙালীরা ভাষার ক্ষেত্রে বিহারী-শাসকবর্গের অত্যাচারে জর্জরিত ; আসামেও বাঙালীর সেই অভিযোগ। অভিযোগ হয়তো মিথ্যা নয়, কিন্তু বিচার হবে কি দিয়ে? পাটনায় সম্প্রতি কৌতুক ও বেদনার সঙ্গে দেখছিলাম দুই রাজ্যের বাঙালী-বিহারী শিক্ষিতদের (?)

লড়াই। মনে হচ্ছিল যেন দুই দলই মনে করেন, ভারতরাষ্ট্র বলে কোনো রাষ্ট্র নেই, এ যেন রাইন্-এর দু'পারের ফরাসী ও জার্মান দুই জাতির লড়াই। গত পুজোয় আসামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, বৈচিত্র্যে ও তার মানুষের সৌহার্দ্যে যখন উৎফুল্ল বোধ করেছি, তখনি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করতে বাধ্য হয়েছি আসামের ভাষা-সংকট ও জাতি-সংকট। আসাম রাজ্যের লোক-সংখ্যা মোট ৯০ লক্ষের মতো। তার মধ্যে অসমীয়া ভাষী হবেন ২৫ লক্ষের উপরে ৩০ লক্ষের নিচে, বাঙলা-ভাষী ২০ লক্ষের উপরে। (১৯৫১-এর আদম সুমারি মতে অবশ্য ১৯৫১ তে অসমীয়া ভাষীর মোট সংখ্যা আসাম রাজ্যে ৪৯.৭২ লক্ষ, ১৯৩১-এ তা ছিল মাত্র ১৯.৯৩ লক্ষ; আসাম রাজ্যে বাঙালী ভাষীর সংখ্যা ১৯৫.-তে ১৪.৪৭ লক্ষ, অথচ ১৯৩১-এ তা ছিল ১৬.৯৯ লক্ষ। যখন আসাম রাজ্যের মোট জন সংখ্যা ১৯৫১-তে ৮৭.৭১ লক্ষ,—১৯৩১-এ যা ছিল ৬৩.৪৪ লক্ষ, তখন অসমীয়ারা এ সময়ে সংখ্যায় আড়াই গুণ বেড়েছে, তা অনেকে বিশ্বাস করতে চায় না।) তাছাড়া, আসামে খাসিয়া লুসাই প্রভৃতি জাতিরা আছে কয়েক লক্ষ করে, ক্ষুদ্র উপজাতিরও অভাব নেই। এক কথায়, মনে হল ভারতবর্ষ যেমন পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ, আসাম তেমনি ভারতবর্ষেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। আর ভারতীয় রাষ্ট্রে হিন্দীরই মত আসামে অসমীয়া-ভাষারও প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যোগ। শুধু বাঙলা ভাষার প্রাধান্যমুক্ত হয়েও অসমীয়া-ভাষা আজ সন্তুষ্ট হতে পারছে না। সমগ্র আসাম রাজ্যের একমাত্র রাজ্যভাষা হতে অসমীয়া উদ্‌গ্রীব। ক্ষমতাচ্যুত বাঙালী অবশ্য আসামে নিরুপায় বোধ করছে, কিন্তু অসমীয়ার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে আসাম রাজ্যের সদ্য জাগ্রত খাসিয়া, লুসাই প্রভৃতি জাতিরা। (নাগাদের কথা উল্লেখ করছি না। কারণ, তারা ভারতীয় রাষ্ট্রেও যোগদান করতে অস্বীকৃত।) এলাহাবাদে গত পুজোয় অনুভব করেছিলাম হিন্দীর খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতির প্রধান দাবি হচ্ছে— উত্তর প্রদেশে উর্দু ভাষাকে রাজ্যভাষা বলে পরিগণিত করা না হয়। সরাসরি এ-দাবির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রগতিবাদী হিন্দী সাহিত্যিকরাও ভরসা পান না। 'উর্দু ওয়ালা' বিহার, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে বাঙালীর মতো আপনাদের কর্মস্থল ত্যাগ করছে। এবং তাদের সয়ে গেলেও ক্ষণে ক্ষণে সেই জ্বালার প্রতিবাদও করে। বাঙলা কিন্তু এখন তার ভার বইতেও সাহসী নয়। দিল্লীতে প্রগতি লেখকদের সম্মেলনে খাড়ি বোলির সম্মুখে পুরো হিন্দী হিন্দুস্থানের প্রতিধ্বনি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল প্রায় আর এক ভাষা। কিন্তু পরিচালক সমিতির সদস্য নির্বাচনের প্রশ্ন যেই উঠল অমনি হিন্দী সংসার' চারটি আসন নিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে উর্দু প্রতিনিধি জানালেন 'হিন্দী যদি চারটি আসন পায় তাহলে উর্দুরও চারটি না হলে চলবে না। আমরা অহিন্দীরা ভাবি—হিন্দী ও উর্দু যদি এতই স্বতন্ত্র ভাষা হয়, তাহলে সমগ্র ভারতে 'হিন্দী সংসার' থাকবে কিসে? আর সে-সংসারে হিন্দী উর্দু ছাড়াও হিন্দী-হিন্দুস্থান, প্রভৃতির দ্বন্দ্বই কি মিটেছে? বিহারের লেখকবন্ধুরা অসহায় বোধ করলেন—'হিন্দী সংসার'-এর গণনায় এ-সময়ে তাদের স্থান নেই। দক্ষিণের অহিন্দীভাষী বন্ধুরা সবিনয়ে, কিন্তু স্পষ্ট করে, জানালেন—'হিন্দীর ও হিন্দী উর্দুর এই সংযুক্ত সংখ্যাপ্রাবল্যে দক্ষিণের আপত্তি আছে। দক্ষিণ ভারতকে ক্রমে ক্রমে হিন্দী বিরোধী করে তোলা ১৯৪৭ এর পরেকার হিন্দী-প্রচারক ও ভারতীয় লোকসভার হিন্দী ওয়ালাদের অন্যতম কীর্তি।

অবজ্ঞাত কৃষক জনতা

কিন্তু আরও জটিল প্রশ্নও আছে। বিহারে, (মে, ১৯৫৩) মানভূমস্থ পদস্থ বাঙালী বলছেন— "ভাষাগত রাজ্যসীমা-নির্দেশের প্রশ্ন তুলে আমাদের বিপন্ন করবেন কেন পশ্চিম বাঙলার বাঙালীরা? এমনিই তো আমাদের নানা বিপদ বিহারে—অন্য যে-কোনো জাত হলে চাকরি পাব, বাঙালী হলে নয়।" তারপর—"মানভূমের লোকমত নিলে আমরা মানভূমের বাঙালীরা কি বাঙলায় যাব? না। বাঙলায় যে আরও চাকরি পাব না।" অর্থাৎ, চাকুরে বাঙালী মনে করে সে ই একমাত্র বাঙালী, যেন মানভূমের বাঙালী বলতে তারাই সব।

সেই শতকরা একটি বাঙালী তার চাকরির গরজে বাঙলাভাষা ছেড়েও হিন্দী নিতে অস্বীকৃত হবে না—হিন্দী যখন বিধানানুযায়ী রাষ্ট্রভাষা ; এবং তাতে যখন সমগ্র ভারতে চাকরিলাভের সুযোগ মিলবে। ঠিক এই কারণেই মণিপুরে বাঙলা-ভাষী শিক্ষিত মণিপুরী আজ আর বাঙলা না পড়ে হিন্দী পড়তে উৎসাহী। কারণ, মণিপুর কেন্দ্র-শাসিত, বাঙলার অন্তর্ভুক্ত তা আর হবে কিনা সন্দেহ ; এবং ভারতবর্ষে ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দীই আজ চাকরির চাবিকাঠি। অনেকটা এরূপ কারণেই মিথিলার (বিহারের) ভূমিহারেরা অনেকে মৈথিলীর পরিবর্তে হিন্দী গ্রহণে উদ্যোগী—চাকরির সুবিধা হবে। আর মৈথিল ব্রাহ্মণরা আবার মৈথিলী প্রচলনে উৎসাহী ; তাহলে মিথিলায় তারাই হবে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার প্রভাবে অগ্রগণ্য। (বিহারে অবশ্য রাজনৈতিক সামাজিক সব প্রশ্নেরই সঙ্গে জড়িত থাকে ভূমিহার, কায়স্থ, ছত্রি প্রভৃতি জন্মগত জাতি বা 'কাস্ট'-এর প্রশ্ন) দুই দলের কেউ ভাবে না—মিথিলার সাধারণ মানুষ কি ভাষায় কথা বলে, কি ভাষায় তাদের শিক্ষা-দীক্ষা সহজ, কি তারা চায়।

দেখা যাচ্ছে, ভাষা-সমস্যায় একটা বড় রকমের জটিলতা সৃষ্টি করেছে এই চাকরিজীবীরা এবং এরাই শিক্ষিত বলে মুখর। ভাষা নিয়ে যে এত তর্কবিতর্ক চলছে তা চালাচ্ছেন এই শিক্ষিতরা। এ তর্কবিতর্কের পিছনে বেশ একটা প্রেরণা হচ্ছে চাকরির বখরা। শিক্ষিতদের বিবেচনায় তাঁরাই হবেন এই বিচারে মানদণ্ড। বিহাররাজ্যে একমাত্র শহুরে মুসলমানরাই উর্দুভাষী বলে সেই ধরনের হিন্দী বা উর্দু জানেন, এবং মুসলমান-হিন্দু সবশুদ্ধ বিহারে বড় জোর শতকরা ১৬টি লোক সাক্ষর, অর্থাৎ ইস্কুলে গিয়ে এঁরাই হিন্দী শেখেন। শতকরা ৮৪ জন বিহারবাসী তাই হিন্দী বলেনও না, শেখেনও না। হিন্দীকে সেখানকার 'কুলটুস্প্রাখে' ভাষা হিসাবে তাই এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন বড় জোর মাত্র তার শহুরে ও শিক্ষিত শ্রেণীরাই। বাকি ৮৬ জন বিহার-বাসী কি করবেন না করবেন তার প্রশ্নও কেউ তোলে না। অর্থাৎ ভাষা-সমস্যার এই বিতর্কে আমরা মার্কসের কথাটা বিস্মৃত হচ্ছি—দেশটা কার ? শিক্ষিতদেরই শুধু, না, সাধারণ মানুষের ?

কোন্ অঞ্চলের ভাষা কি হবে তা স্থির করবার উপায় কী ? শাসক-গোষ্ঠীর মর্জি ? নিশ্চয়ই না। শিক্ষিত ও চাকরিজীবীদের কথা ? নিশ্চয়ই না। শহুরে শিল্প-শ্রমিকদের সাক্ষ্য ? তা-ও না। কারণ, তাহলে জামশেদপুরের ভাষা হিন্দী (?), কলকাতার শ্রমিক এলাকার ভাষা 'বাজার-হিন্দী' এবং বোম্বাইর ভাষাও হয়তো আর এক ধরনে 'বাজার-হিন্দী'। তাই আবার স্তালিনের কথাই স্মরণ করতে হয়। স্তালিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—বাকুর শ্রমিকের ভাষা দিয়ে জর্জিয়ার ভাষা-সমস্যার মীমাংসা করা চলবে না। তিনিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জাতি-সমস্যার জটিল প্রশ্নে প্রধান সাক্ষী হল কৃষক, যে জমিতে বাঁধা, দেশে বাবা, দেশের অধিবাসী। শ্রমিক এই কৃষকের সাক্ষ্যকেই গ্রাহ্য করে সর্বাগ্রে কৃষক-সাধারণকে প্রতিষ্ঠিত করবে তার সামাজিক অধিকারে ও সাংস্কৃতিক অধিকারে।

আলোচনার চতুঃসীমা

বাঙলা দেশের ভাষা-সমস্যার আলোচনা করতে আজ যখন আমরা বাধ্য হচ্ছি, তখন তাই গোড়াতেই কয়েকটা কথা পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে। কি চৌহদ্দির মধ্যে আমরা এই আলোচনা নিবদ্ধ করা সমীচীন মনে করি ? তা এই :

(ক) প্রথম নীতি হচ্ছে ভাষা ও জাতি-সমস্যায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নীতি। এই কথা বোঝা দরকার, 'নেশন' কি করে জন্মে। সমাজবিকাশের নিয়মেই এক-একটা স্থায়ী জন-সমষ্টি এক-একটি বিশেষ বাসভূমিতে নিজেদের আর্থিক জীবনযাত্রা, নিজেদের ভাষা এবং নিজেদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফলে বিশিষ্ট মানসিক-সাংস্কৃতিক ধারা অবলম্বন করে 'রাষ্ট্র-জাতি' (নেশন) হয়ে ওঠে। এরূপ বিকশিত জাতি ছাড়াও অনেক জন-সমষ্টি আছে বাইরের চাপে

বা সুযোগের অভাবে যারা এসব গুণের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারেনি। কিন্তু সে-পথেই অগ্রসর হয়ে তাদের মধ্যেও (খ) কেউ স্থায়ী জন-সমষ্টিরূপে জাতীয়তার (ন্যাশনালিটি) অধিকারী হয়েছে, তাদের ভাষা হয়তো এখনি সম্পূর্ণ 'ভাষা' (ল্যাঙ্গুয়েজ্) বা অধিভাষা (ডায়ালেক্ট)। (গ) অন্য কেউ কেউ সে স্তরে পৌঁছাবার পূর্বে স্থায়ী সমষ্টি হবার পথে এখনো মাত্র উপজাতি (ট্রাইব্) রয়েছে, তাদের ভাষাও হয়তো উপভাষা (বা ট্রাইব্যাল বুলি)। সমাজের যথেষ্ট বিকাশ হলে, বিশেষ করে আর্থিক লেনদেন ('মার্কেট') বিস্তারলাভ করলে এরূপ উপজাতি অন্য জাতি বা অধিজাতির সঙ্গে মিশে যায়। কিংবা কাছাকাছি কয়েকটি উপজাতি মিলে নিজেদেরই একটি উপভাষাকে অবলম্বন করে একটি অধিজাতিতে উন্নীত হতে পারে; তাদের উপভাষাও তা হলে এরূপ বিকাশের ফলে অধিভাষা (পূর্ণ ডায়ালেক্ট) বা ক্রমে ভাষায় ল্যাঙ্গুয়েজ) পরিণত হতে পারে। কদাচিৎ এরূপ 'উপজাতি' একা থেকে একটি স্বতন্ত্র অনুজাতিও (ন্যাশনাল গ্রুপ) গঠন করে। (ঘ) এদের ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অস্থায়ী জন-সমষ্টি থাকে যারা সমাজ-বিকাশে এখনো কোমের (ক্ল্যান্) পর্যায়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন গোত্রে বিভক্ত, ভাষাও যাদের 'বুলি' (ক্ল্যান-স্পীচ্) মাত্র। সমাজবিকাশের নিয়ম হল এই—আর্থিক প্রগতি ঘটলে কয়েকটি কোম মিলে তৈরি হয়ে ওঠে উপজাতি, তখন তাদের বিভিন্ন কোমভাষা ভেঙেচুরে গড়ে ওঠে এক 'উপভাষা'।

সাধারণভাবে কথাটা এই—জাতি বিকাশের একটা প্রক্রিয়া (প্রোসেস্) আছে। সমাজ-বিকাশের নিয়মে নিকটবর্তী কোমসমূহ মিলে 'উপজাতি' হয়। আবার 'উপজাতি' ক্রমশ অগ্রসর হয়ে একা, কিংবা বেশি-সময়েই নিকটবর্তী অন্য জন-সমষ্টির সঙ্গে মিশে, হয় 'অধিজাতি'। আবার অধিজাতি আর্থিক-রাষ্ট্রিক বিকাশ সম্পূর্ণ করে হয় রাষ্ট্র জাতি (নেশন)। এদের ভাষাও এরূপে বুলি থেকে হয় উপভাষা (ডায়ালেক্ট), ক্রমে হয় 'পূর্ণ ভাষা'।

কিন্তু এইটাই সাধারণ নিয়ম হলেও বাস্তববাদীদের পক্ষে জানা প্রয়োজন—(ক) জাতি-বিকাশের প্রক্রিয়ায় কোন্ জনসমষ্টি কখন বিশেষ কোন্ পর্যায়ে আছে, প্রত্যেকের যথার্থ (কংক্রিট) অবস্থা কী। যেমন, দার্জিলিং-এর গোর্খাদের অবস্থা কী? তারা কি 'অধিজাতি'? এবং (খ) জাতি-বিকাশের প্রক্রিয়া (প্রোসেস্ অব ন্যাশনাল ডেভ্‌লপমেন্ট) সেই বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ জাতির পক্ষে কি বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছে। যেমন, কোনো 'উপজাতি' একাই তখনকার মতো 'অনুজাতি' (ন্যাশনাল গ্রুপ) হয়ে থাকতে পারে। দার্জিলিঙ এর 'লেপচা', 'ভুটিয়া' কি গোর্খাদের (অধিজাতি) সঙ্গে মিশে যাবে, না কি? আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানের নানা-জাতির (কোম ও উপজাতি) মানুষ মিলে কি এক হচ্ছে, না, কয়েকটা নতুন জন-সমষ্টির সৃষ্টি করছে? বলা বাহুল্য, এসব বহু অনুসন্ধান সাপেক্ষ। এবং এই অনুসন্ধানকালে বাস্তববাদী যেমন জাতির উপর বাইরের চাপ, সুযোগের অভাব প্রভৃতি বিচার করবেন, তেমনি কিছুতেই এই সত্য বিস্মৃত হবেন না যে, বিশেষ জন-সমষ্টির মনোভাব, তার নিজস্ব স্বার্থ কী, কী তার নিজস্ব দাবি, অথবা তার কোন্ মনোভাব মূলত তার নয়—প্রভাবশালী অন্য জাতির প্রচারের দ্বারা সাময়িক ভাবে উদ্ভূত।

ভাষা ও জাতির ক্ষেত্রে এই হল বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রথম প্রতিজ্ঞা, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

দ্বিতীয় কথা। এই সমাজবিকাশের ধারা অনুযায়ী ভাষা ও জাতিসমস্যা সমাধান করতে হলেই আমরা দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা মানতে বাধ্য হই। তা হচ্ছে, ভাষা ও জাতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতির প্রয়োগ। তার ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছে, স্তালিনের ব্যাখ্যাত 'জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি'। প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অবশ্য নীতি হিসাবে লীগ্ অব্ নেশনস্-এর দৌলতে এখন সর্বগ্রাহ্য (উইলসন এই শীলমোহর তার গায়ে এঁকে দিয়ে গেছেন)। প্রত্যেক জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির স্বরাজও তাই অবশ্যগ্রাহ্য। তাহলেও লীগ অব্ নেশনস্-এর সময় থেকে এই ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দেখা গিয়েছে—এই গণতান্ত্রিক জাতীয় নীতি সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা যথার্থই কোথাও প্রয়োগ করেনি। সমাজবিকাশের ধারা বুঝলে এটাও বুঝব যে, আসলে ধনিক শাসকশ্রেণী এই নীতি কার্যত গ্রহণ করতে পারে না। সংক্ষেপে হলেও কথাটা তাই এ-দেশে এ-মুহূর্তেও বুঝবার মতো—এদেশেও ধনিক শ্রেণী 'হিন্দী সাম্রাজ্যবাদে'র প্রশ্রয় দিতে পারে কি না।

ধনিক-গোষ্ঠী চায় 'মার্কেট' বা পণ্য-উৎপাদন ও বিক্রয়ের সুযোগ। সামন্ততন্ত্রের বাধা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যসীমা ভেঙে এক রাষ্ট্রের আয়ত্তে এক মার্কেট স্থাপন ধনিকদের সাধারণ লক্ষ্য। এই মার্কেটের দায়েই তারা চায় আদানপ্রদানের সুবিধার জন্য এক ভাষার আধিপত্য; বিভিন্ন জাতি ও ভাষাকে যথাসম্ভব চেপে রাখাও তাদের তাই একটা স্বার্থ। ইংরেজ ভারতবর্ষে ভারতের বিকাশোন্মুখ সকল জাতিকে চেপে রেখে গড়েছিল তার এক-রাজ্য, সকল ভাষাকে চেপে চালিয়েছিল তার শাসনের এক-ভাষা। ইংরেজি ভাষার মারফত ইংরেজ এই লক্ষ্য সিদ্ধ করত, এখনো করছে। ইংরেজের পরেই ভারতের প্রধান ধনিক-গোষ্ঠী এখন মারোয়াড়ী ও গুজরাতী ধনিক-বণিকেরা। এরা কেউ মূলতঃ হিন্দীভাষী নয়। ভারতবর্ষের মার্কেট আয়ত্ত করবার জন্য এরা তবু চায় একটি ভাষা; এবং অনেকাংশেই হিন্দী উত্তরাপথে কাজ-কারবারে বহুল প্রচলিত। তাছাড়া, উত্তর প্রদেশের হিন্দুস্থানীভাষী শাসক-শ্রেণীও আজ ভারতবর্ষে বেশি ক্ষমতাপন্ন। তাই ভারতীয় ধনিক ও ভারতীয় শাসক-যূথ আজ একযোগে ইংরেজির স্থলে হিন্দীকে আশ্রয় করে আপনাদের শোষণ-রাজ্য ও শাসনরাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর। ভারতের সকল জাতির মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি ভাষার প্রয়োজন আছে, এ কথা স্বীকার করেও এই প্রসঙ্গে যা লক্ষ্য করা প্রয়োজন তা এই—ভারতীয় জাতিসমূহের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ভারতীয় ভাষাসমূহের বিকাশের সুযোগ—এই গণতান্ত্রিক নীতি এই নিখিল-ভারতীয় ধনিক-শাসক শ্রেণীর বিশেষ অভিপ্রেত নয়। অবশ্য বাঙালী, মারাঠী, অন্ধ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষী ক্ষুদ্রতর ধনিকশ্রেণী দাবি করবে নিজ নিজ ভাষায় ব্যবসা চালনা; তারা প্রত্যেকেই প্রবলতম ধনিক-শাসকগোষ্ঠীর গ্রাস-মুক্ত হতে চাইবে নিজেদের প্রাণের দায়ে। কিন্তু এই নানা জাতির নানা ভাষী এই সব ধনিক-স্বার্থে মিল সামান্য। সাম্রাজ্যবাদী নিয়মে তাই বর্তমান প্রবলতম (হিন্দীবাদী) শাসক-গোষ্ঠীও নানাভাবে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগাবে, এবং এই জাতীয় দাবিসমূহকে জাতির বিরোধ, ভাষার বিরোধ, প্রাদেশিকতার বিরোধে পরিণত করতে চাইবে—যেমন ইংরেজ করতে চাইত। বিহারে, বাঙলায়, আসামে আমরা ত স্পষ্টই দেখছি। কাজেই, এই 'জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণের' নীতি সম্বন্ধে যা বুঝবার তা এই যে, সর্বভারতীয় শাসক শক্তি তার বিরোধী হবে; অন্যদিকে প্রত্যেক জাতির ক্ষুদ্রতর ধনিক-গোষ্ঠীও নিজ দাবিকে বাড়িয়ে অন্য জাতির দাবিকে খর্ব করতে চাইতে পারে। (এই আলোচনা ১৯৫৩ সনে লিখিত; ১৯৫৬ সনে এর বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—লেখক) একমাত্র সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণী, হবে এই জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির পরিপোষক।

তৃতীয়ত, জাতি-সমস্যার বিচারে ও ভাষার বিতর্কে প্রধানতম এক মানদণ্ড হল কৃষক সাধারণ ও পল্লীগ্রামের মানুষ; অন্যেরা গৌণ। এবং এদিকে তাদের প্রধান সহায়ক ও নেতা হয় শ্রমিক শ্রেণী।

চতুর্থত, ভারত-রাষ্ট্র (বা পাকিস্তান রাষ্ট্র) বহুজাতিক ও বহুভাষিক রাষ্ট্র। ভারত 'নেশন' নয়; 'মহাজাতি'। জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ও ভাষাগত স্বরাজের উদ্দেশ্য সে-রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড করে বিচ্ছিন্ন করা নয়। বরং তার উদ্দেশ্য—প্রত্যেক জাতি, অধিজাতি, অনুজাতি, উপজাতিকে স্বেচ্ছায় ভারত-রাষ্ট্রের (বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের) সংগঠক করে তোলা, গণতান্ত্রিক ঐক্য ও সামাজিক বিকাশের পথে বহুভাষিক ও মহাজাতিক সংস্কৃতি সৃষ্টি করা—যে-সংস্কৃতি হবে গণতান্ত্রিক, মহাজাতীয় ও বিজ্ঞানসম্মত।

ভাষা-সমস্যার আলোচনা এই চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ না রাখলে এ আলোচনা বানচাল হবার সম্ভাবনা। তথাপি, ভাষার বিচারে আর দু'একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। যেমন ভাষা আর নৃ-গোষ্ঠী এক না হতেও পারে। নৃ-বিজ্ঞানমতে আমরা বাঙালীরা মোটেই আর্য নই। কিন্তু আমরা আর্যগোষ্ঠীর ভাষা গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ নানা কারণে কোনো জন-সমাজ ক্রমে ক্রমে নিজের ভাষা ছেড়ে দিয়ে অন্য এক ভাষা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কোনো জন-সমষ্টি নিতান্ত ক্ষুদ্র না হলে এবং নিজ ভাষা বিষয়ে অচেতন না হলে তাকে তার ভাষা ছাড়ানো ও ভোলানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমনকি, একবার নিজের ভাষা ভুলে গেলে কোনো জনসমাজের পক্ষে আবার সেই

গৃহীত নব-ভাষাকে ছেড়ে নিজের পূর্বতন ভাষা পুনর্গ্রহণও সহজ হয় না। তার দৃষ্টান্ত আয়র্লণ্ড। শত তিনেক বৎসরে আইরিশ ভাষার পরিবর্তে প্রবলতর ইংরেজি ভাষা আইরিশদের ভাষা হয়ে গিয়েছে। আয়র্লণ্ডের বর্তমান জাতীয়তাবাদী শাসকরা গত তিরিশ বৎসর ধরে প্রাণপণে তাদের সেই কেলটিক ভাষা পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করছে। কিন্তু ইংরেজি কিছুতেই বে-দখল হচ্ছে না। তার কারণ, প্রথমত, কালক্রমে আয়র্লণ্ডের তা নিজ ভাষা হয়ে গিয়েছে, এবং আয়র্লণ্ডের মানুষ আজ জীবিকার দায়ে ইংরেজি-ভাষীদের (ইংরেজ ও মার্কিন) মুখাপেক্ষী—ইংরেজি তাই কেউ ছাড়তে পারছে না।

দ্বিতীয় কথা, ভাষা আর লিপি এক কথা নয়। ভাষার প্রাণ ধ্বনি, উদ্দেশ্য সামাজিকভাবে ভাবের আদানপ্রদান। লিপির সাহায্যে এই উদ্দেশ্য আরও সুসাধ্য হয়। কিন্তু লিপি হচ্ছে ধ্বনির প্রতীক মাত্র। একই ধ্বনি আমরা বাঙলা অক্ষরেও লিখতে পারি—'বাঙালী', 'বাঙ্গালী', ; আবার নাগরী অক্ষরেও লিখতে পারি। ব'ঙালী, কিংবা রোমক অক্ষরেও লিখতে পারি bangali এবং 'ও' দুটি চিহ্ন যোগ করলে তা বিশুদ্ধও হয়, যেমন ba'n'ga'li অর্থাৎ বর্ণমালার প্রশ্ন ভাষার প্রশ্ন থেকে স্বতন্ত্র ; কিন্তু তাতে যে ভাষার ক্ষেত্রে গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে তা হিন্দী ও উর্দুর কথা মনে রাখলেই বুঝতে পারি।

ভারতবর্ষের ভাষাসমূহ যে অক্ষরে লেখা হয় মূলত তা প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি থেকে জন্মেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা এসব লিপিতে লিখিত হত। মগধে (ওড়িষ্যা ছাড়া) ও বাঙলায়-আসামে উদ্ভূত হয় আমাদের প্রাচ্য ধরনের লিপি। বাঙলা দেশে সংস্কৃত ও বাঙলা লেখা হত এই বাঙলা লিপিতে, এখনো সংস্কৃত সে লিপিতেই লেখা হয়। মিথিলার নিজস্ব লিপিও বাঙলার অনুরূপ, আসামের নিজ লিপিও বাঙলার মতোই। বিহারে নাগরী লিপি গৃহীত হয়েছে মাত্র ১৮৮০-এর কাছাকাছি—ইস্কুলে হিন্দী গ্রাহ্য হবার পর থেকে। তার আগেও কায়েতী লিপিতে দলিলপত্র লেখা হত, এখনো কায়েতী অচল হয় নি। বিশেষ সূক্ষ্ম বিচারে না গিয়ে তবু বলতে পারি—কোনো কোনো লিপি লেখার পক্ষে বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত ও কার্যকরী। যেমন, রোমক বর্ণমালায় একটু চিহ্ন সংযোগ করে আমরা ভারতবর্ষের প্রায় সকল ভাষাই লিখতে পারি। নাগরী বর্ণমালার ত্রুটি আছে। কিন্তু বাঙলা বর্ণমালার ত্রুটি নাগরীর থেকেও বেশি।

ভাষা ও জাতি-সমস্যার আলোচনায় সমাজবিকাশের ধারা, গণতান্ত্রিক নীতি, কৃষক ও গ্রাম্য-জনতার গুরুত্ব যাঁরা না মানেন, এমনকি ভারত-রাষ্ট্রের (বা পাকিস্তান রাষ্ট্রের) ভাবী সুস্থ বিকাশের মূল সূত্রগুলো যাঁরা সমর্থন করেন না, তাঁদের সঙ্গে মৌলিক বিচারই প্রয়োজন তা এক-আধটুকু আলোচনায় সম্ভব নয়। এই চৌহদ্দির মধ্যে আলোচনা করতে গেলেও এই পরিমিত স্থানের মধ্যে আলোচনা শেষ করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কারণ, ভারতবর্ষ কি ছোট দেশ? সে যে রুশিয়া-ছাড়া ইউরোপের মতো, প্রায় একটি মহাদেশ। এই ইউরোপ খণ্ডে কত রাষ্ট্র, কত জাতি, কত ভাষা, তা কি আমরা ভেবে দেখি? বরং ইউরোপীয় জাতিদের তুলনায় আমরা একদিকে অনেকটা বেশি পরস্পরের নিকটতর। আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় জীবন সম্ভব হয়। আমরা 'মহাজাতি' গঠন করছি। ভারতভূমি অবশ্য দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। কিন্তু ভারত রাষ্ট্রের (ও পাকিস্তানের) জাতিদের পরস্পরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মীয়তাবোধ সুস্থির, এক ভাষার অভাবেও তা ব্যাহত হয়নি। তবে নিশ্চয়ই শাসনের ও সামাজিক আদানপ্রদানের জন্য কোন একটি ভাষা ভারতরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতি গ্রহণ করতে পারলে এই রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ আরও সুদৃঢ় হয়। কিন্তু সেরূপ কোনো ভাষা এখন স্বীকৃত হবে কিনা তা নির্ভর করে ভারতীয় (বা পাকিস্তানী) জাতিদের বিকাশের উপর, দুই রাষ্ট্রের ভাষাগত বাস্তব অবস্থার যথাযথ উপলব্ধির উপর, ও অবস্থানুরূপ ব্যবস্থাপনার উপর।

সাম্রাজ্যবাদী পথ বনাম গণতান্ত্রিক পথ

জাতি বিকাশের এই স্তরটা যথার্থ বুঝলে আমরা বুঝতে পারি সৌভাগ্য হোক বা দুর্ভাগ্য হোক, কোনো স্থায়ী সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রভাবে ভারতবর্ষে সর্বজাতির গ্রাহ্য কোনো এক-ভাষা ও সর্বজাতি মিশিয়ে এক 'রাষ্ট্র জাতি' (নেশন) গড়ে ওঠেনি। ভারতভূমির আধুনিক প্রধান-প্রধান জাতিদের বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল (৬ষ্ঠ থেকে ১২শ শতকের মধ্যে) বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল (আরও অনেক প্রাচীন), তেলেগু প্রভৃতি আধুনিক ভাষার জন্মের সঙ্গেই। এসব জাতি পূর্ণাঙ্গ নেশন হতে পারেনি নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে। কিন্তু তাই বলে এসব জাতি ও ভাষা যতদূর পর্যন্ত বিকাশলাভ করেছে তাতে এখন তাদের চাপা দিয়ে সমস্ত ভারত জুড়ে (বা পাকিস্তান জুড়ে) এক রাষ্ট্র-জাতি গড়া, এক ভাষা চালানো শুধু অসম্ভব নয়, অভাবনীয়। সম্ভবত পাঠান-রাজত্বেও (১৩শ—১৬শ শতকে) তা সম্ভব হত না, মুঘল-রাজত্বের পরে (১৮শ শতকে) আর তা অসম্ভব। বরং ইতিমধ্যে (১৯শ-২০শ শতকে) ওসব প্রধান-প্রধান ভাষা ছাড়াও সামাজিক বিকাশের ফলে আরও ছোট ছোট ভাষাও জন্মলাভ করেছে। তাদের আশ্রয় করে সে-সব ভাষা-ভাষীরাও জাতিত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং (স্তালিন যেমন বলেছেন) জাতীয় বিপ্লবের নিয়মেই এসব ছোট ছোট জাতি, অধিজাতি, অনুজাতি, উপজাতিও ক্রমে ক্রমে দাবি করবে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার। সভ্যতার এ-যুগে, ভারতীয় জাতিসমূহের বিকাশের এই স্তরে, **উপর থেকে চাপ দিয়ে** তেমন এক 'রাষ্ট্রভাষা' গঠন বা তেমন এক 'রাষ্ট্রজাতি' গঠন আর সম্ভব নয়। অথচ সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি জাতিগঠনের ও রাষ্ট্রচালনার এই পথই চেনে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টান্ত দেখে আমরাও ভাবি তাই বুঝি জাতিগঠনের একমাত্র পথ। ভারতবর্ষের বিকাশের ধারা যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এবং ভারতবাসী যে তাই ইউরোপের ছাঁচে ঢালা 'নেশান' নয়, আপনার নিজস্ব ধারায় বিকাশমান 'মহাজাতি', এই সত্য আমাদের অনেকের মাথায় ঢোকে না। বুঝতে হবে সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে ভারতের (বা পাকিস্তানের) ভাষা ও জাতি সমস্যার সমাধান কখনো হত বিনা সন্দেহ। এখন ত গণতান্ত্রিক পথে ছাড়া তার সমাধান নেই-ই। সেই গণতান্ত্রিক পথে নিচে থেকে ঐক্য গড়ে না তুললে সারা ভারতীয় রাষ্ট্রে (বা পাকিস্তানী রাষ্ট্রে) রাষ্ট্রে ঐক্য, কারও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশও সম্ভব নয়।

বলা বাহুল্য এরূপ রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শক্তি গড়ে উঠলেই এই ভাষা ও জাতি-সমস্যার আসল সমাধান সম্ভব। এবং তা ঘটলে দুই রাষ্ট্রের পারস্পরিক বন্ধনও তখন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে পরিণত হবে। অবশ্য, তার পূর্বে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবার কারণ নেই। গণতান্ত্রিক চেতনাও তো এরূপ প্রয়াসের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে, আকাশ থেকে পড়ে না। অতএব, এখন যতদূর সম্ভব আমরা এই ভাষা ও জাতি-সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকব, কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ; মনে রেখে কৃষক ও গ্রাম্যজনতার দাবি এবং ভারতের (বা পাকিস্তানের) ঐক্যেরও দাবি। তা না হলে সুবিধা বাদিতা ও সাময়িক অপকৌশলের দ্বারা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলব।

বাঙলার ভাষা-সমস্যা

ভারতের ভাষাগত অবস্থা

ভারত-ভূখণ্ডের ভাষা-গত অবস্থা যে কি, এ বিষয়ে চিন্তার অরাজকতায় তা অনেকেই ভেবে দেখতে চান না। সেই অরাজকতার ফলেই কেউ কেউ মনে করেন গ্রিয়ার্সনের পরিচালিত 'ভারতীয় ভাষার জরিপ' (লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া) হচ্ছে নিছক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। কথাটা অর্ধ-সত্যও নয়, সিকি সত্য। ভারত-ভূখণ্ডে ১৭৯টি ভাষা, ৫৪৪টি উপভাষা আছে, 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে'র এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি। কিন্তু দুই রাষ্ট্রে (ভারত ও পাকিস্তান) মিলে অন্যূন ১৫।১৬টি প্রধান ভাষা আছে তা মানতে হবে, তাছাড়া অপ্রধান ভাষাও যে আরও অনেক আছে তা-ও স্বীকার্য। প্রধান ভাষা বলতে গণ্য: (১) হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষা (উর্দুকেও এ-গণনায় 'হিন্দীর' অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যাক); (২) বাঙলা; (৩) ওড়িয়া, (৪) মরাঠী; (৫) গুজরাতী; (৬) সিন্ধী (পাক); (৭) হিন্দকী বা লহন্দা (পশ্চিম পঞ্জাবী, পাক); (৮) পশতু (পাক); (৯) পঞ্জাবী; (১০) অসমীয়া; (১১) নেপালী (হিন্দীর নিকট আত্মীয়); (১২) কাশ্মীরী; (১৩) তেলেগু; (১৪) তামিল, (১৫) কন্নড়; (১৬) মালয়ালম্। ভারতীয় রাষ্ট্রের বিধানতন্ত্রে গৃহীত হয়েছে ১৫টি 'আঞ্চলিক' ভাষা: (১) হিন্দী, (২) উর্দু, (৩) বাঙলা, (৪) অসমীয়া, (৫) ওড়িয়া, (৬) মরাঠী (৭) গুজরাতী, (৮) পঞ্জাবী, (৯) তামিল, (১০) তেলেগু, (১১) মালয়ালম্, (১২) কন্নড়, (১৩) সংস্কৃত, (১৪) ইংরেজি ও (১৫) কাশ্মীরী। (বলা বাহুল্য ইংরেজি বহুজনেরও মাতৃভাষা, আঞ্চলিক ভাষা নয়, সংস্কৃতও 'আঞ্চলিক' ভাষা নয়। হিন্দী-উর্দুকে স্বতন্ত্র বলা চলে কিনা? আধুনিক ভারতে প্রধান ভাষা বলতে তা হলে মাত্র ১২টি।) এর মধ্যে নাগরী অক্ষরে লেখা হিন্দীই ভারতের 'রাষ্ট্রভাষা'। কিন্তু অ-প্রধান ভাষাগুলি কী কী? কী হিসাবে তারা অ-প্রধান? লোকবলে ক্ষুদ্র বলে কি? সাঁওতালী প্রভৃতি কোনো কোনো ভাষা তো তা নয়। তাতে সাহিত্য রচিত হয়নি বলে? মৈথিলীতে কাব্য আছে; ভোজপুরিয়া, রাজস্থানীরও লোক সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। তবু তারা অ-প্রধান কেন? না, এসব ভাষা-ভাষীরা 'ভাষার স্বরাজ' চায় না বলে? কে বললে সে কথা? শাসকেরা বণিকেরা, চাকুরেরা, না গ্রাম্যজনতা?

এই বিতর্ক ছেড়ে দিই। আমরা ভাষাতাত্ত্বিকদের (গ্রিয়ার্সন ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য মিলিয়ে) বিচার থেকে কয়েকটি অবিসংবাদিত সত্য বুঝতে পারি। জাতি ও ভাষার বিকাশ ভারতবর্ষেও অসমানভাবেই হয়েছে। কেউ এগিয়ে গিয়েছে, কেউ পিছিয়ে আছে। অবস্থাটা তাই এখন এরূপ: বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মরাঠী, গুজরাতী, তেলেগু, তামিল প্রভৃতি কোনো কোনো জাতি প্রায় রাষ্ট্র-জাতির (নেশন) পর্যায়ে উঠে গিয়েছে, তাদের ভাষাও 'জাতীয় ভাষা'র স্তরে গণ্য। কিন্তু কোনো কোনো ভাষী সে-সব গুণের অধিকারী হলেও এখনো রাষ্ট্র জাতির (নেশন) পর্যায়ে পৌঁছয়নি—এদের বলতে পারি অধিজাতি (ন্যাশনালিটি); এদের ভাষা হয়তো উপভাষার (ডায়ালেক্ট) স্তর ছাড়িয়ে উঠছে। বলতে পারি, অধিভাষা (সাব-ল্যাঙ্গুয়েজ)। তৃতীয় স্তরে আছে আর কোনো কোনো জাতি ও তাদের ভাষা, বলতে পারি তারা উপজাতি (ট্রাইব্) ও তাদের ভাষা 'উপভাষা'। এ-ছাড়াও শেষে থাকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও ভাষা। যেমন, কোম (ক্ল্যান) ও তাদের 'বুলি', অনুজাতি ও অনুভাষা, কিংবা বিচ্ছিন্ন কোনো জনসমষ্টি ও তাদের ভাষা।

১৯৩১-এর হিসাব

ভারতের ও পাকিস্তানের ভাষার ও জাতির এই অসমান বিকাশের কথা মনে রেখে আপাতত একটা ভাষা-বিকাশের হিসাব দাঁড় করানো যায়।

ভাষা-গোষ্ঠীর দিক থেকে ভাষা-বিচার ভাষা-তাত্ত্বিকদের পক্ষে যত প্রয়োজন আমাদের ততটা নয়, একথা এইসঙ্গে মনে রাখতে হবে। সে-বিচার অধ্যাপক সুনীতিকুমার সুন্দর ভাবে করে রেখেছেন। প্রয়োজন মত এখানেও বন্ধনী মধ্যে তা উল্লেখ করা হল। ভারতের ভাষাগোষ্ঠী প্রধানত ৪টি। ১৯৩১ সালের হিসাব মতো সমগ্র ভারতে তাদের শতকরা অনুপাত ছিল এরূপ: অস্ট্রিকভাষী (কোল বা সাঁওতাল, গোণ্ড প্রভৃতি) ১৩%; দ্রাবিড়ভাষী (তেলেগু, তামিল প্রভৃতি) ২৩%; মঙ্গোলোয়াদ বা ভোট চীনাভাষী (মণিপুরী, গারো, লুসাই প্রভৃতি) ১% জনেরও কম; এবং হিন্দ-আর্যভাষী (পঞ্জাবী, সিন্ধী থেকে বাঙলা, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষা। এ-সব ভাষা ৬টি প্রধান আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত) মোট প্রায় ৭১% জন এ গোষ্ঠীর ভাষা বলত। ১৯৩১ সালে এ-গোষ্ঠীর পূর্বীয় শাখার বাঙলা বলত ৫৩৫ লক্ষ, ওড়িয়া ১১০ লক্ষ, অসমীয়া ২০ লক্ষ, মৈথিলী ১০০ লক্ষ, মগধী ৬৫ লক্ষ, ভোজপুরিয়া ২০৫ লক্ষ। ১৯৪১ সালের ভারতীয় আদমসুমারিতে ভাষার হিসাব নেই। আর ১৯৫১ সালের হিসাব নিয়ে গোলমাল অশেষ; পাদটীকায় তা উদ্ধৃত হল।* তাই ভাষাতাত্ত্বিকরা ১৯৩১ সালের হিসাবের অনুপাতেই এখনকার ভাষার হিসাবও করে থাকেন।

* দ্রঃ ১৯৫১ সালের লোক-গণনায় ভারত রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ভাষাসমূহ যাদের মাতৃভাষা তাদের সংখ্যা নিম্নরূপ দেওয়া হয়েছে: ভারত-রাষ্ট্রের মোট ৩৫ [illegible] কোটি লোক [illegible] টি "মাতৃ [illegible] ভাষা" বলত। তার মধ্যে

১। হিন্দী ভাষী—মোট ১৪ কোটি ৯১ লক্ষ (উর্দু ভাষীর সংখ্যা [illegible] হিন্দুস্তানী, পাঞ্জাবী ও পাহাড়ীকেও 'হিন্দীর' মধ্যেই এক হিসাবে ধরা হয়েছে)।

২। তেলেগু ভাষী—মোট ৩ কোটি ২৯ লক্ষ

৩। মরাঠা " " ২ কোটি ৭০ লক্ষ

৪। তামিল " " ২ কোটি ৬৫ লক্ষ

৫। বাঙলা " " ২ কোটি ৫ লক্ষ

[পূর্ব পাকিস্তানে বাঙলাভাষীর সংখ্যা—প্রায় ৪ কোটি। [illegible] বাঙলাভাষী [illegible] গণনায় ধরা হয়নি।]

৬। গুজরাতী ভাষী—মোট ১ কোটি ৬২ লক্ষ

৭। কন্নড় " ১ কোটি ৪৪ লক্ষ

৮। মালয়ালম " " ১ কোটি ৩৩ লক্ষ

৯। ওড়িয়া " " ১ কোটি ৩১ লক্ষ

১০। অসমীয়া " " ৪৯ লক্ষ

এ ছাড়া লক্ষণীয়—৪৭টি উপভাষা আছে, তার প্রত্যেকটি লক্ষাধিক লোকের যা নিজ ভাষা। যেমন,

১১। সাঁওতালী ভাষীর সংখ্যা মোট ২৮ লক্ষ

১২। গণ্ড " " " ১২ লক্ষ

১৩। ভিল " " " ১১·৬০ লক্ষ

৭২০টি উপভাষা বা অনুভাষা আছে যার ভাষীরা সংখ্যায় প্রত্যেকে এক লক্ষের কম।

৬৩টি অ-ভারতীয় ভাষার মধ্যে ইংরেজীভাষীর মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৩ হাজার।

১৯৫১-তে অবশ্য বিহারী ভাষাগুলি আর স্বতন্ত্র উল্লেখিত হয়নি, হিন্দী বলেই গণ্য হয়েছে, কিন্তু ১৯৩১-এর লোক-গণনায় দেখা যায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ বিহারী ভাষা তিনটি তখন বলত। যথা:

(১) ভোজপুরী (ইউ. পী. বাদ দিয়ে বিহারে) ভাষীর সংখ্যা ছিল ৮৭ লক্ষ।

(২) মৈথিলী ভাষীর সংখ্যা ছিল মোট ১ কোটি

(৩) মগধী ভাষীর সংখ্যা ছিল মোট ৬২ লক্ষ

১৯৫১-এর লোক গণনা মতে আগে যারা "বাঙলা"কে মাতৃভাষা বলত তারা এখন অনেকেই 'হিন্দীকে' মাতৃভাষা বলছে।

১৯৫১-তে বিহারে মোট বাঙলাভাষীর সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার—এর মধ্যে ৮ লক্ষ মানভূমের ও ২·১ লক্ষ সিংভূমের।

১৯৫১-এর লোক-গণনায় পশ্চিম বাঙলায় হিন্দীভাষীর (উর্দু ৪·৫ লক্ষ নিয়ে) সংখ্যা মোট ২০ লক্ষ (বিহারী লোকসংখ্যা ১১ লক্ষের উপর), সাঁওতালী ভাষীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬০ হাজার, নেপালীভাষীর সংখ্যা ২ লক্ষ ১২ হাজার।

(ক) বর্তমানে 'জাতীয় ভাষার' পর্যায়ে উঠেছে প্রধান প্রধান ভাষাসমূহ। ভারতরাষ্ট্রে 'আঞ্চলিক' ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে নেপালী ছাড়া প্রায় সব কয়টি ভারতীয় প্রধান ভাষা, 'আঞ্চলিক' কথাটার যাই অর্থ হোক। (খ) 'অধিভাষা': অস্ট্রিক—২৫ লক্ষের উপর, গোর্খালি, নেওয়ারি, খাসিয়া, লুসাই গারো, বড়ো, মণিপুরী, মৈথিলী, ভোজপুরিয়া, মালবী ও রাজস্থানী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা। এ পর্যায়ে উন্নত হচ্ছে—সাঁওতালী (অস্ট্রিক—২৫ লক্ষ), ওরাওঁ (দ্রাবিড় —১০ লক্ষ) প্রভৃতি কোন কোন উপজাতির ভাষা। এ সবের কোনো কোনো ভাষা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু স্বীকৃত; অর্থাৎ তাতে 'সাহিত্য'ও লিখিত হয়। এ 'অধিভাষা'র পর্যায়েই হয়তো পড়বে পাকিস্তানের লহন্দী ভাষা। এ সব ভাষার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। (গ) উপজাতির উপভাষা: যেমন গোণ্ড (দ্রাবিড়—১১ লক্ষ), মুণ্ডারি (অস্ট্রিক—৬৷৷০ লক্ষ), শবর (অস্ট্রিক), কন্ধ (দ্রাবিড়), কোড়গু (দ্রাবিড়), লেপ্চা (ভোট-চীনা), টিপরাই (ভোট চীনা) প্রভৃতি (এবং পাকিস্তানের ব্রাহুই, শিণা, চিত্রলী, বাশ্গলী, চট্টগ্রামী প্রভৃতি) যেসব উপভাষা অনেকদিন চাপা পড়ে আছে, কিংবা এতদিন বিকাশের সুযোগ পায়নি। গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে এদেরও বিকাশলাভ করার সম্ভাবনা। সব কয়টি না হোক কোনো কোনোটি নিশ্চিত হবে। (ঘ) এর পরেও থাকবে অবশ্য নানা বিচ্ছিন্ন অনুন্নতের জনভাষা। এর মধ্যে আসামের চা বাগানের নানা ভাষী জন-সমষ্টিকে ধরতে পারি।

আজকের দিনে নতুন করে ভাষাগত বৈজ্ঞানিক জরিপ না হলে বলা অসম্ভব যে কোন জনভাষা টিকবে, কিংবা কোন্ ভাষা অধিভাষা, কোন্ ভাষা উপভাষা।

জাতি-সমস্যার ছাত্র হিসাবে আমরা জানি—এর সব থেকে আর এক স্তরে এদের উন্নতি ঘটছে ঐতিহাসিক সূত্রে, সামাজিক বিকাশের নিয়মে।

বাঙলার বর্তমান ভাষা-সমস্যা

একদিক থেকে মনে হয় ভারতের ভাষা-সমস্যার চেয়েও জটিল বাঙলার ভাষা-সমস্যা। পাকিস্তান ও ভারতরাষ্ট্রে অন্যতম প্রধান ভাষা হিসাবে বাঙলা স্বীকৃত। জাতি হিসাবেও বাঙালীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার সমস্যাও তাই বলে কম নয়। যথা: প্রথম দফা সমস্যা হল—পশ্চিম বাঙলার নিজস্ব সমস্যা (পূর্ব-বাঙলার সমস্যা আমরা এক্ষেত্রে আলোচনা করব না), দ্বিতীয়, পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলার ভাষাগত সম্পর্কের সমস্যা, তৃতীয়, পশ্চিম বাঙলা ও ভারতের সমস্যা (বাঙলা ও রাষ্ট্রভাষার সমস্যা এবং পশ্চিম বাঙলা ও তার প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কের সমস্যা), চতুর্থ সমস্যা, বাঙলা ও বিশ্ব সাংস্কৃতিক সংযোগের সমস্যা।

পশ্চিম বাঙলার ভাষাগত অবস্থা

পশ্চিম বাঙলার অবস্থাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য। কারণ, বাঙালী জাতি দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত; সেই দুই খণ্ডের সমস্যার কথা না আলোচনা করে উপায় নেই। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, সাধারণভাবে পাকিস্তানের সমস্যার কথা বলবার অধিকারী ভারতীয়রা নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীর নিজস্ব সমস্যার কথাও পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালীই আলোচনা করবার অধিকারী।

পশ্চিম বাঙলার অবস্থা সাধারণভাবে বোঝা যায় ১৯৫১ সালের আদম-সুমারি থেকে। তা থেকে দেখি: প্রথমত, ভারতরাষ্ট্রের ৯টি 'ক' শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে আয়তনে পশ্চিম বাঙলা ক্ষুদ্রতম। (প্রসঙ্গত বলা যায়, আয়তনে পূর্ব বাঙলা ও পশ্চিম বাঙলার অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৫ : ৩,

অথবা দশ আনা—ছয় আনা)। পশ্চিম বাঙলার মোট আয়তন ৩০,৭৭৫৩ বর্গ মাইল। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও কিন্তু পশ্চিম বাঙলার বসতির ঘনতা সর্বাধিক—প্রতি বর্গ-মাইলে ৮০৬ জন। অতএব, এখানে চাষের জমি আর বিশেষ নেই, বাসযোগ্য জমিও প্রায় নেই। পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি ঘনবসতি আছে একমাত্র জাপানে। ইংলণ্ড-ওয়েলস-এর প্রতি বর্গমাইলে বসতি যথেষ্ট, কিন্তু এর চেয়ে ১২৫ জন কম। জন-সমাজের গঠনের দিক থেকে পশ্চিম বাঙলার মোট জনসংখ্যা আড়াই কোটির কম (২ কোটি ৪৮ লক্ষ)। এর মধ্যে পশ্চিম বাঙলার খাঁটি বাসিন্দা ২ কোটির উপর। বহিরাগত প্রায় ৪৬ লক্ষ (বাইরে গিয়েছে মাত্র ৩ লক্ষ)। ভারত-ভূখণ্ডে বাঙলাভাষীর মোট সংখ্যা ৬ কোটির বেশি—মাতৃভাষা হিসাবে ভারতবর্ষীয় ভাষার মধ্যে বাঙলার স্থান তাই সর্বাগ্রে, যদিও হিন্দীকে ঘরের বাইরেকার কাজকর্মের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে প্রায় ১৫।১৬ কোটি লোক। পশ্চিম বাঙলার আড়াই কোটি বাসিন্দার মধ্যে সকলেই অবশ্য বাঙলাভাষী নয় ; হিন্দুস্থানী, নেপালী, ইংরেজি, সাঁওতালী প্রভৃতি নানা ভাষার অনেক মানুষও বাঙলার 'নাগরিক' বা বাসিন্দা। পশ্চিম বাঙলার জনসংখ্যার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি তাই লক্ষণীয় ঃ

পশ্চিম বাঙলায় বহিরাগত ভারতীয়দের মোট সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। বহিরাগত 'উদ্বাস্তু' বাঙালী ২১ লক্ষ (১৯৫৬-তে তার চেয়ে অনেক বেশি)। বহিরাগত অ-ভারতীয় প্রায় ৩ লক্ষ। এই অ-ভারতীয়দের মধ্যে পাকিস্তানী (অধিকাংশই অবশ্য বাঙালী) ২ লক্ষ ৬৭ হাজার। অতএব বিভিন্ন ভাষী বহিরাগতদের অপেক্ষা বাঙলাভাষী বহিরাগতদের সংখ্যা দুই পর্যায়েই বেশি।

ভারতীয় বহিরাগতদের মধ্যে দেখি বিহার থেকে এসেছে মোট ১১ লক্ষের বেশি মানুষ, উত্তর প্রদেশ থেকে ৩ লক্ষের কম, রাজস্থান থেকে প্রায় ৫৬ হাজার, মধ্যপ্রদেশ থেকে ৩৮ হাজার। এ-ছাড়া অন্য ভারতীয়দের মধ্যে গণনীয় ২ লক্ষ ওড়িয়া, মাদ্রাজের দ্রাবিড়ভাষী ৫২ হাজার, পাঞ্জাবী ৩৮ হাজারের উপরে। ভাষা হিসাবে দেখলে এই দেখা যায়—বাঙলা ছাড়া পশ্চিম বাঙলার অন্যভাষীদের মধ্যে আছে প্রায় ১৬ লক্ষ (১৫'৭৫) হিন্দুস্থানী (অবশ্য 'বিহারীদের' নিয়ে। বলা বাহুল্য, এরা অধিকাংশেই শিল্পাঞ্চলের 'বাজার হিন্দী' বলে) ; ওড়িয়াভাষী ২ লক্ষের কম, পঞ্জাবী গুরুমুখী)-ভাষী ৩২ হাজার ও পঞ্জাবী (পশ্চিম পাঞ্জাবী ;) ভাষী ৫ হাজার, তেলেগুভাষী ৫০ হাজার, তামিলভাষী ১৫ হাজার, অসমীয়াভাষী প্রায় ১০ হাজার। ভাষার হিসাবে এই অ-বাঙালী ভারতীয়-দের সংখ্যা দাঁড়ায় সবশুদ্ধ ২০ লক্ষ। উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ১৯২১-এ যা ছিল ১৯৫১-তে তার দ্বিগুণ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ-সংখ্যার মধ্যে, বিশেষ করে বিহার থেকে আগতদের মধ্যে, মাত্র ৩ লক্ষ লোক পরিবার নিয়ে বাঙলায় থাকে, বাকি ৭ লক্ষেরও বেশি বিহারী তাই মুখ্যত এখানকার অধিবাসী নয়। তারা অধিকাংশই অবশ্য শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক। কিন্তু শ্রমিক-ধর্ম তারা সম্পূর্ণ লাভ করেনি—অর্থাৎ 'নির্বিত্ত' বা প্রোলিটেরিয়েট নয়,—দেশে বাড়ি আছে, ঘর আছে, গোরু আছে, জমি আছে এবং ফিরে গিয়ে সেখানেই আবার কৃষক ও মহাজন হয়ে বসে। শ্রমিক-শ্রেণীর এরূপ অংশ তাই বাঙালীর ভাষা-সমস্যায় বা জাতি সমস্যায় যথার্থ নেতৃত্ব দান করতে পারে না, তা মনে রাখা উচিত।

তৃতীয় একটি কথা স্মরণীয়—পশ্চিম বাঙলার বাইরে ভারতরাষ্ট্রে বাঙলাভাষীর সংখ্যা কত? ১৯৫১ সালের বিহারের সরকারী হিসাবে বিহার রাজ্যে বাঙলা মাতৃভাষা ছিল ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার লোকের ; ৪৫ হাজার 'দ্বিভাষিক' ;—কিন্তু ৬ লক্ষ ২৫ হাজার 'দ্বিভাষিক' অন্যভাষীরাও বাঙলা বলত। (সরকারী মতে মোট ৩ লক্ষ ২০ হাজারের বাঙলা 'গৌণভাষা'—'মাতৃভাষা' নয়, কিন্তু তা ঘরে-বাইরে সচরাচর ব্যবহার্য ভাষা)। আসামে বাঙলাভাষী মোট ১৮ লক্ষের মত ; এ সংখ্যা কতটা গ্রাহ্য, এবং অসমীয়া ভাষার সংখ্যাই বা কত, তা বলা যায় না। তথাপি ত্রিপুরাকে মেলালে বাঙলাভাষীর সংখ্যা আরও ৩.৭৪ লক্ষ বাড়বে। ওড়িষ্যায় বাঙলাভাষীর সংখ্যা ৮৬ হাজার। তারপর উত্তরপ্রদেশে ৭৩ হাজার বাঙলাভাষী বরাবর বাস করে। এইসব কথা মনে রাখলে বুঝব—ভারতরাষ্ট্রে মোট বাঙলাভাষী আড়াই কোটির উপরে।

পশ্চিম বাঙলায় বাঙলার স্থান

ভারতবর্ষের মধ্যে জাতি হিসাবেও বাঙালী বোধ হয় সর্বাধিক বিকশিত। ভাষা হিসাবেও বাঙলা সর্বাধিক উন্নত। কাজেই ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি ভাষার চাপে না পড়লে ইতিপূর্বেই এ-ভাষা বাঙালীর জীবনযাত্রায় সকল কাজের ভাষায় পরিণত হতে পারত। ১৯৪৭ এর পরে আশা করা গিয়েছিল যে, অন্তত পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় বাঙলা ভাষা রাজ্যভাষায় পরিণত হবে, তার স্বাভাবিক বিকাশে বাধা থাকবে না। কিন্তু ইংরেজির স্থান ভারত রাষ্ট্রে হিন্দীকে দেবার সিদ্ধান্ত হল, পাকিস্তানে তা উর্দু গ্রহণ করতে গেল। (১৯৫৫ তে বাঙলাও পাকিস্তানের অন্যতম ভাবী রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃত হয়েছে)।

ইংরেজীর স্থান হিন্দী দিয়ে পূরণ কতটা সম্ভব তা বিচার এখন না করেও বলা যায়, প্রথমত, পশ্চিম বাঙলায় শাসন-কার্যে বাঙলাকে রাজ্যভাষা না করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। পূর্ব বাঙলায়ও বাঙলা রাজ্যভাষা হওয়া পূর্বেই উচিৎ ছিল। এমনকি, জনসংখ্যার দিক থেকে দেখলে বাঙলা সমগ্র পাকিস্তানেরই প্রধান ভাষা। তাই পাকিস্তানের 'রাষ্ট্রভাষা' যদি কোনো ভাষাকে করা সম্ভব হয়, তাহলে তা বলা যায় বাঙলাকে (বিশেষ প্রচলিত অর্থে বহুজাতিক রাষ্ট্রে কোনো 'রাষ্ট্রভাষা' হতে পারে না, তা পরে আমরা আলোচনা করছি)। পশ্চিম বাঙলার বর্তমান শাসকরা সরকারীভাবে বরং হিন্দী প্রচারে উৎসাহ দেন, পূর্ব পাকিস্তানের শাসকবর্গও উর্দু প্রচারে ও বাঙলা-লিপির পরিবর্তে আরবী লিপির প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। উভয় রাজ্যেই বাঙলা কার্যত অবজ্ঞাত। কাজেই প্রথম সমস্যা হল—বাঙলা ভাষাকে শাসন বিভাগে ও বিচার বিভাগে প্রতিষ্ঠিত করা।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষার কথা। একথা সর্বস্বীকৃত যে, অন্তত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চাই এবং সেই প্রাথমিক শিক্ষা সকল রাজ্যেই হবে সকল জন সমষ্টির মাতৃভাষায়। একথা স্বীকার করে বলতে হবে বাঙলার সমস্যা হল—বাঙলা ভাষাকে রাজ্যের শিক্ষাবিভাগে মধ্যশিক্ষা থেকে উচ্চতম শিক্ষায়ও প্রধানতম মাধ্যমরূপে প্রবর্তিত করা। বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন বাঙালী নেই যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ঘোষণা করেননি। বাঙলা ভাষার এদিকে দাবি খর্ব করা আরম্ভ হয়েছে বর্তমান কংগ্রেস শাসকদের হাতে। বিশেষ করে ভারতের ও পশ্চিম বাঙলার শাসক গোষ্ঠী হিন্দী ধনিক গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত, তারা বাঙলার দাবিতে কর্ণপাত করেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান (১৯৫১) পরিচালকবর্গ শাসক গোষ্ঠীর অনুগামী—বাঙলা তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা পায় না। ইংরেজিতে এঁদের বিদ্যা কতখানি তা নিয়ে আমাদের কোনো দুর্ভাবনা নেই, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা বিমাতার সেবায় যতটা উৎসাহী, স্বমাতার সংবন্ধে তেমনি নিরুৎসাহ,—সে তুলনায় মারাঠী (হিন্দী ভাষার) প্রতি অধিক মমতাশীল। ভারতবর্ষের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীকে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই বাঙলা ভাষা অপেক্ষা এদিকে হিন্দী বেশী উপযোগী ছিল না। তবে এখন প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দী নিশ্চয়ই এদিকে উন্নত হবে—উদ্যোগের অভাবে বাঙলাও এদিকে খর্ব হয়ে থাকবে। শিক্ষার ব্যাপারে গোঁড়ামি না করেও আমরা বলতে পারি—পাঁচ সাত বছরের মধ্যে উচ্চতম জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রধান শিক্ষায় বাঙলাকে সাধারণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। বিশেষ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিদেশীয় অধ্যাপকদের অবশ্য এখনকার মতো ইংরেজিতে শিক্ষাদানের অধিকার থাকবে। মধ্যশিক্ষার শেষ দুই ক্লাসে বেসিক (বুনিয়াদী) হিন্দী ও বেসিক ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাই যথেষ্ট। এই মূল হিন্দী ও মূল ইংরেজির একটি শিক্ষকগোষ্ঠী তৈরি করা মোটেই দুঃসাধ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য হবে ইংরেজির ও হিন্দীর মূল শব্দ ও ব্যাকরণ শিক্ষাদান—শুধু ততটুকু শিক্ষা দেওয়া (অনেকটা যেমন এখন আমরা সংস্কৃত শিখি), যতটুকু ভাষার মূল ব্যাকরণ ও শব্দ-সম্পদের সঙ্গে পরিচয় থাকলে পরে জীবনযাত্রায় কেউ নিজ প্রয়োজন অনুসারে হিন্দী ও ইংরেজি বোধকে গভীর ও ব্যাপক করে নিতে পারবে। ইংরেজি (ও

হিন্দী) শুদ্ধ না লিখতে পারলে কোনো বাঙালী ছাত্র কলেজে উচ্চশিক্ষার অধিকার পাবে না—এমন বর্বর ও দাস-সুলভ শিক্ষার প্রথা পৃথিবীর আর কোনো সভ্যদেশে আছে কিনা জানি না।

শিক্ষার ভাষার প্রশ্ন নিয়ে এখানে নিঃশেষে আলোচনা করছি না। কিন্তু সাধারণ কয়েকটি ভুল নিরসনের জন্য বলতে পারি—(ক) আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে অ-বাঙালী জন-সমষ্টির জন্য প্রয়োজনানুরূপ মাতৃভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষপাতী, (খ) সকলের জন্য অবিলম্বে মাতৃভাষায় সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ প্রাথমিক শিক্ষা চাই, (গ) মাতৃভাষা ছাড়াও প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় একটি ভাষার মূল কথা শিক্ষার আমরা পক্ষপাতী (প্রায়ই সে-ভাষা ভারতে হবে হিন্দী, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উত্তর ভারতের ছাত্রো একটি দ্রাবিড়গোষ্ঠীর ভাষাই বা শিখবেন না কেন ? অন্তত সর্বভারতীয় চাকুরেদের পক্ষে তা অবশ্য-শিক্ষণীয় হওয়া উচিত)। (ঘ) সাহিত্য-শিক্ষায় যাঁরা উৎসাহী তাঁদের কলেজ-ক্লাশে অন্তত একটি উন্নত অ-ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য নিশ্চয়ই বিশেষভাবে পাঠ্য হবে (আপাতত সে-ভাষা ও সাহিত্য নিশ্চয়ই হবে ইংরেজি। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কারো কারো পক্ষে তার স্থলে রুশ বা চীনা পাঠ্য হয়ে ওঠে, তাহলে আশ্চর্য হবার কারণ নেই)।

তৃতীয় সমস্যা : বাঙলার অধিবাসী ও বহিরাগত অ-বাংলা-ভাষীদের শিক্ষাদীক্ষার সমস্যা। মোটের উপর, উপরের নীতি থেকেই তা বোধগম্য হয়। এ-সব জাতির মধ্যে নানা পর্যায়ের জনসমষ্টি আছে। যেমন, (১) দার্জিলিঙ্ অঞ্চলের গোর্খারা জাতি হিসাবে এতটা অগ্রসর যে পশ্চিম বাঙলা রাজ্যে 'আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন' নিশ্চয়ই তারা এখনই লাভ করবে ; তাদের শাসক, বিচারক প্রভৃতি তারা নির্বাচিত করবে এবং কলেজী শিক্ষাদীক্ষাও নেপালী ভাষা উন্নত হলে তাতে তারা লাভ করবে —অবশ্য, রাজ্যভাষা বলে বাঙলাও তারা শিক্ষা করবে। (২) পশ্চিম বাঙলায় 'উপজাতিদের' জনসংখ্যা ১২ লক্ষের কম—সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, লেপচা, মেচ, ভুটিয়া ইত্যাদি। এদের মধ্যে সাঁওতালরাই প্রধান, তাদের মোট জন-সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার। কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন যূথ হিসাবে নানা জেলায় বাস করে। তথাপি যেখানেই ছাত্র-সংখ্যা অন্যূন ৫০টি হবে সেখানেই তারা নিজ মাতৃভাষা সাঁওতালীতে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে। এভাবে এ-সব অনুন্নত জাতিকে বিশেষ সাহায্যদান করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সমস্ত পশ্চিম বাঙলা রাজ্যের দায়িত্ব। ওরাওঁ, লেপচা, ভুটিয়া প্রভৃতি অন্যান্য উপজাতিরাও যেখানেই (যেমন দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতে), ওরকম যথেষ্ট সংখ্যায় বাস করছে, সেখানেই তাদের এরকম সুযোগ দান করা আবশ্যক। (৩) অনুন্নত ছাড়াও যে-সব অ-বাঙালী বাসিন্দা বাঙলায় আছে, যেমন হিন্দুস্থানীভাষী, ওড়িয়াভাষী, পঞ্জাবীভাষী, ইংরেজিভাষী— তারাও নিশ্চয়ই নিজেদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করবে, এবং যেখানে ছাত্র-সংখ্যা যথেষ্ট সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষাও স্ব-স্ব ভাষায় তারা যাতে লাভ করতে পারে তার সুযোগও দিতে হবে।

পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সাংস্কৃতিক সাযুজ্য

এ-বিষয়ে প্রশ্নমাত্র নেই যে, পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থির করবেন তার জনসাধারণ (শাসকগোষ্ঠী মাত্র নয়) স্বেচ্ছায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ; এবং পূর্ব-পাকিস্তানেরও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন নির্ণীত করবেন তার জনসাধারণ, (শুধু শাসকগোষ্ঠী নয়) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তথাপি দৃঢ়কণ্ঠে বলা যায়—দুই বাঙলার বাঙালীরই ভাষা এবং সাহিত্য এক, শিল্প এক, সংস্কৃতি এক। বিশেষ করে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই জাতীয় মানসিকতা ও জাতীয়-চরিত্র প্রতিফলিত ও রূপায়িত হয়ে ওঠে। কোনো বাঙালী জন-সমষ্টিই এই মাতৃভাষা ছেড়ে অন্য ভাষার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে সহজে পারবে না। সে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই অন্তত এক শ বছরের মতো তারা সে-সংগ্রামেই নিজেদের শক্তির অপব্যয় করবে, ততক্ষণে অন্য ভাষীরা আরও অগ্রসর হয়ে যাবে। পূর্ব বাঙলার বাঙালী এই সত্য বুঝেই বুকের রক্ত দিয়ে নিজেদের ভাষাকে রক্ষা করছেন। পৃথিবীতে এমন বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বেশি হয়নি ?

বাঙলা পৃথিবীর ছ-কোটি বাঙালীর মাতৃভাষা—শুধু পশ্চিম বাঙলার দুই কোটির নয়, বা পূর্ব-পাকিস্তানের চার কোটির নয়। বাঙালী শাসকগোষ্ঠী যতটা আত্মবিস্মৃত হোক, দিল্লী বা করাচীর যতটাই মুখাপেক্ষী হোক রাজনীতির প্রসাদজীবীরা, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বাঙালী সাহিত্যিক যেন বাঙালী-সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান আমরা যে-ই যা লিখি, যা সৃষ্টি করি, মনে রাখব তা কোনো সম্প্রদায়ের জিনিস নয়, বাঙালীর ও মানুষের সম্পদ। আমাদের প্রত্যেকটি সৃষ্টির অধিকারী সমস্ত বাঙালী, দুই রাষ্ট্রের বাঙালী—ভাবী দিনের সন্তানেরা। বাঙলা ভাষার ছাড়পত্র তারা জন্মসূত্রে লাভ করেছে, তাদের মাঝখানে দিল্লী-করাচীর আর্থিক-সাংস্কৃতিক দেয়াল কিছুতেই দুর্লঙ্ঘ্য হতে পারে না।

বাঙলা ও ভারত

বাঙলার নিজস্ব সমস্যা ও দুই বাঙলার যোগাযোগের সমস্যা ব্যতীত তৃতীয় প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে বাঙলা ও ভারতের সম্পর্কের প্রশ্ন। এই প্রশ্নেরও দুটি দিক আছে—একটি হল পশ্চিম বাঙলার সঙ্গে ভারতরাষ্ট্রের সম্পর্ক (এবং পূর্ব-পাকিস্তান ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পর্ক); দ্বিতীয়টি হল পশ্চিম বাঙলার ও ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক (এবং পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাজ্যের সম্পর্ক)—যাকে বলতে পারি আন্তঃপ্রাদেশিক বা আন্তঃরাজ্যিক প্রশ্ন। নানা কারণে এখানে আমরা শুধু ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম বাঙলার দিক থেকেই প্রশ্ন দুটির আলোচনা করছি। এ-আলোচনা হয়তো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরাও সাধারণভাবে নিজেদের সমস্যা সমাধানে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তা সর্বাংশে পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রযোজ্য কিনা, সে-বিচারের অধিকারী পাকিস্তানের জনসাধারণ।

বাঙলা ও 'রাষ্ট্রভাষা'

প্রথম প্রশ্ন পশ্চিম বাঙলা ও ভারতরাষ্ট্রের প্রশ্ন। অথবা প্রশ্নটা যাকে সচরাচর বলা হয় রাষ্ট্রভাষা'—তার সঙ্গে বাঙলা ভাষার সম্পর্কের কথা।

'হিন্দী' ও 'রাষ্ট্রভাষা'

পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, পশ্চিম বাঙলায় যথার্থ হিন্দীভাষী যে খুব বেশি তা নয়—পাঁচ লক্ষও নয়। এমনকি বিহার প্রদেশ থেকে পশ্চিম বাংলায় আগত মানুষকে হিন্দীভাষী বলে গণ্য করলেও হিন্দীভাষীর মোট সংখ্যা মাত্র ২০ লক্ষে দাঁড়ায়। অবশ্য টুটি-ফুটি হিন্দী' বা 'বাজারীয়া হিন্দী'ই হল এই প্রবাসী ও বাঙলা বাসী হিন্দুস্থানীদের অধিকাংশের ভাষা—সাহিত্যের হিন্দীও নয়, সাহিত্যের উর্দুও নয়, এমনকি 'খড়ী বোলি' বা 'হিন্দুস্থানী'ও নয়। এই 'বাজারীয়া হিন্দী'কে আশ্রয় করেই কিন্তু বাঙলাদেশে হিন্দী 'রাষ্ট্রভাষা' রূপে দাঁড়াতে চায়। কোন্ হিন্দী 'রাষ্ট্রভাষা'? হিন্দী-উর্দু, না, বাজারীয়া হিন্দী? এটা তাই একটা সমস্যা।

'হিন্দী', 'হিন্দী' বলে আমরা যে চিৎকার শুনি তার মধ্যে কতটা বিভ্রান্তি জড়িয়ে থাকে, তা একটু বিবেচনা করা যাক। উত্তর-প্রদেশই প্রধানত এই ভাষার প্রাণক্ষেত্র। কিন্তু উত্তর প্রদেশে উপ-

ভাষাগুলি ছাপিয়ে একটি সর্বগ্রাহ্য ভাষার রূপ এখনো স্থির হয়নি। তবে স্থির হয়ে যাচ্ছে, তা বলা যায়। 'ব্রজভাষা' (পশ্চিমী হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত) ও আওধি (পূর্বী হিন্দীর প্রধানরূপ)—এই দুইটি ছিল পূর্বতন সাহিত্য-গ্রাহ্য প্রধান উপভাষা। কিন্তু এখন হিন্দীর যে দুটি সাহিত্যিক রূপ দাঁড়িয়েছে তার সাহিত্যিক নাম হিন্দী ও উর্দু। এদের বনিয়াদ ভাষার যেই চলিত-মৌখিক রূপ তাকে বলতে পারি 'হিন্দুস্থানী' বা 'হিন্দুস্তানী', পূর্বতন নাম 'খড়ী বোলি'—দণ্ডায়মান ভাষা। (এই মৌখিক রূপ উত্তর প্রদেশের 'পশ্চিমী হিন্দী'র উপর প্রতিষ্ঠিত, লিখিত হিন্দীর তুলনায় তাতে প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ অধিক, সেরূপ ফারসী শব্দ 'খড়ী বোলি'তেও গ্রাহ্য।) এই হিন্দুস্থানী এলেকার বাইরে রাজস্থান থেকে শুরু করে বিহার পর্যন্ত যে এলাকা লিখিত হিন্দী ভাষা শিখে 'বৃহত্তর হিন্দীস্থান' হতে সচেষ্ট, তারা মুখে 'খড়ী বোলি' বা 'হিন্দুস্থানী' বলে না। তারা অনেকেই 'হিন্দুস্থানী', লিখিত 'হিন্দী' ও আঞ্চলিক ভাষা (রাজস্থানী, ভোজপুরী প্রভৃতি) মিশিয়ে একটা 'মিশাল হিন্দুস্থানী' বলে। এই হল হিন্দীর দ্বিতীয় (বৃহৎ) রূপ। আবার তারও বাইরে উত্তর ভারতের সর্বত্র শহরে-বাজারে শ্রমিক-এলাকায় (কলকাতা, বোম্বাইতে) আরও একটা 'বাজারীয়া হিন্দীভাষা' চলে—তা'ই হিন্দীর তৃতীয় ও ব্যাপ্ত রূপ—হিন্দী বলতে গোলেমালে এই তিনটি কথিত রূপ বোঝায়—শুধু লিখিত হিন্দী নয়।

লিখিত হিন্দীর রূপও দ্বিবিধ। নাগরী অক্ষরে লিখিত সাহিত্যিক হিন্দী আরবী-ফারসী শব্দ যথাসাধ্য বাদ দিয়ে বেশি করে সংস্কৃত শব্দ ইদানীং গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে গান্ধীজী ও ওয়ার্ধাপন্থীরা অতটা সংস্কৃতগন্ধী হিন্দী চান না। তাঁরা চান চলিত-মৌখিক 'হিন্দুস্থানী'র কাছাকাছি একরূপ হিন্দী; নাগরী বা ফারসী লিপিতে লেখা 'হিন্দুস্থানী'ই ছিল তাঁদের কাম্য 'রাষ্ট্রভাষা'। অন্যদিকে ট্যাণ্ডনজী ও হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন চান বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও সংস্কৃতজাত শব্দবহুল 'হিন্দী'। (কার্যত এখন এই হিন্দীই তথাকথিত 'রাষ্ট্রভাষা'। লেঃ, ১৯৫৬)। এই 'হিন্দী' অবশ্য বাঙালীর পক্ষে সহজবোধ্য, কিন্তু তা হিন্দুস্থানের হিন্দুস্থানী-ভাষী সারারণ মানুষেরই নিকট দুর্বোধ্য—অন্য রাজ্যের কথা না বললেও চলে। অবশ্য দিল্লী-অঞ্চলের 'খড়ী বোলি'র বুনিয়াদের উপর আর একটি আরবী-ফারসী অক্ষরে লেখা সাহিত্যিক রূপও বহুপূর্বেই দেখা দেয়—১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত তারই নাম ছিল 'হিন্দী', 'হিন্দবী'। পরে তারই নাম হয় 'জবান-এ-উর্দু'। তাতে আরবী-ফারসী শব্দের বাহুল্য গত একশ বছরে এত বেড়েছে যে, তা ফারসী না-জানা হিন্দুস্থানীদের নিকটেও দুর্বোধ্য। এখন উর্দু ও হিন্দীতে তাই এত তফাৎ। উর্দুর রাজনৈতিক দাপট আজ উত্তর প্রদেশে নেই; কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠা এখনো সুদৃঢ়। সাধারণত, দিল্লীবাসীরা, অধিকাংশ পঞ্জাবী এবং বাঙলা-ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের শহুরে মুসলমানগণ এই উর্দু বলেন। উর্দু নিজাম রাজ্যের মাত্র শতকরা ১১·৬ জন (১৯৫১) লোকের ভাষা হলেও এই উর্দুই ছিল সে-রাজ্যের রাজ্যভাষা, এবং এখন সেই সুযোগ গ্রহণ করে হায়দরাবাদ রাজ্যে হিন্দী (নাগরী অক্ষরে লেখা, সংস্কৃতগন্ধী) উর্দুর রাজাসন দখল করছে—যদিও এরূপ হিন্দী হায়দরাবাদে সেই ১০।১২ জন উর্দুভাষীও জানে না,—জানে মাত্র শতকরা ·৭ জন লোক, বাকি তেলেগু-মরাঠী-কন্নড়ভাষীরাও তা বোঝে না। এ-কথা তথাপি সত্য যে, সাহিত্যের ভাষা হিন্দী (সংস্কৃতগন্ধী) ও উর্দু (আরবী-ফারসী-মণ্ডিত) ভাষা-তত্ত্বের বিচারে মূলত এক ভাষা। তাই মূলের 'হিন্দুস্থানী' ভাষা মীরাট আগ্রা অঞ্চল (পশ্চিম-উঃ-প্রঃ) থেকে ক্রমশ সমস্ত উত্তর প্রদেশের জনসাধারণের কথিত ভাষায় পরিণত হতে পারে। তা হলেও উত্তর ভারতের মানুষ এখনো তাদের ভাষার মৌখিক ও লিখিত বহু রূপের সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। যথা—কথ্যভাষা হিন্দুস্থানী, মিশাল হিন্দুস্থানী ও 'বাজারীয়া হিন্দী' এবং লিখিত ভাষা হিন্দী ও উর্দু। 'বাজারীয়া হিন্দুস্থানী' ও 'মিশাল হিন্দুস্থানী'কে বাদ দিলেও হিন্দীর অন্তত তিনটি রূপ এখনো সুস্পষ্ট—হিন্দী—>হিন্দুস্থানী—< উর্দু (১৯১১ ও ১৯৩১ এর সেন্সস রিপোর্টে এ বিষয়ে যে আলোচনা আছে, তা দ্রষ্টব্য)। এদের মধ্যে কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? 'রাষ্ট্রভাষা' বলতে আমরা তবে কোন্‌টি বুঝব? বলব কোন্‌টি? লিখব কোন্‌টি?

অথচ, এ-ভাষা এই তিন আকারের কোনো আকারেই উত্তর প্রদেশে, দিল্লী এলাকায়, মধ্যপ্রদেশের একটি অঞ্চলের বাইরে, যাকে আমরা 'বৃহৎ হিন্দী-স্থান' বলি, প্রচলিত নয়। যে 'হিন্দী' আসলে উঃ-প্রঃ

ছাড়া উত্তর ভারতের বহু লোকে বোঝে, বলে, 'রাষ্ট্রভাষা' হবার দাবি করে তা হিন্দুস্থানী'ও নয়, 'হিন্দী'ও নয় (উর্দু তো নয়ই), সে হচ্ছে 'বাজারীয়া হিন্দী'—যার ব্যাকরণ হিন্দুস্থানীর ব্যাকরণ থেকে অনেক সরল, যার শব্দ-সম্পদ হিন্দুস্থানীর কাছাকাছি হলেও উর্দুর থেকে স্বতন্ত্র, হিন্দীর থেকেও স্বতন্ত্র। কোনো গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রভাষা হতে হলে বেশি লোকে বোঝে, এই গুণ একটি ভাষার পক্ষে হবে প্রধান গুণ। কিন্তু এই দাবিতে যদি কোনো ভাষাকে ভারতরাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রভাষা' করতে হয়, তাহলে সে-ভাষা 'হিন্দী'ও নয়, 'হিন্দুস্থানী'ও নয়, উর্দু'ও নয়—তা হবে 'বাজারীয়া হিন্দী'—এখনো যা হাটেবাজারে, স্টেশনে, তীর্থে উত্তর ভারতে চলে (দক্ষিণ ভারতে সে-তুলনায় প্রায় চলে না বলা উচিত); যা সাহিত্যে লেখা হয় না, উচ্চ সভাসমিতিতে বলাও হয় না, যার ব্যাকরণ হুবহু হিন্দী বা উর্দুর ব্যাকরণ নয়। এ-ভাষা তাই এখনো তৈরি হয়নি, কিন্তু হয়তো বদলে বদলে তৈরি হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য (মার্কেট) যত বাড়বে জনসাধারণ তা তত ব্যবহার করবে এবং জনসাধারণ তত সচেতন হবে। কারণ, এটিই জনসাধারণের ভাষা, বিশেষ করে তা ভাষা শ্রমিক এলাকার, শ্রমিক-শ্রেণীর। বৈজ্ঞানিক ভাষাতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তসমূহ মনে রেখে 'হিন্দী'—'হিন্দুস্থানী'—উর্দু'—'বাজারীয়া হিন্দী'র বিচার এখনো করা হয়নি।' হিন্দী'—এই অতি-প্রচলিত কথাটার মধ্যে কতখানি বিভ্রান্তি লুক্কায়িত আছে, আমরা এখানে তাই নির্দেশ করেছি মাত্র।

রাষ্ট্রভাষা'র অর্থ

এইরূপ বিভ্রান্তিকর 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটিও। 'রাষ্ট্রভাষা' বলতে কী বুঝব? সম্ভবত 'রাষ্ট্র-কার্যের ভাষা' বা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। সরকারী কাজ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে বা সওদাগরী অফিসের হিসাবপত্র এ-ভাষায় রাখতে হবে, এমন কথা নেই। কিন্তু এই 'রাষ্ট্রকার্যের ভাষা'রই বা অর্থ কী? (ক) যে-ভাষা ভারতরাষ্ট্রে সর্বত্র প্রচলিত না হোক, সকল রাজ্যে শাসন-বিভাগে গ্রাহ্য? না, তা নয়। এ-বিষয়ে শাসকগোষ্ঠীও সকলে একমত—প্রত্যেক রাজ্য তার রাজ্যের সুপ্রচলিত ভাষা শাসনকার্যে প্রয়োগ করতে পারবে। (খ) যে-ভাষা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কাজকর্মে গ্রাহ্য। ১৪টি প্রধান ভাষার মধ্যে একটিকে সরকার এই মর্যাদা দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু অপর ১৩টিকে এরূপ ক্ষেত্রে সর্বাংশে অগ্রাহ্য করা হয়নি তা স্মরণীয়। (গ) দূত বা প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলোচনায় যে-ভাষা প্রয়োগ করবেন। এ-ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রভাষা' অবশ্যই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে, শাসকবর্গের তা অভিমত। (ঘ) যে-ভাষা ভারতের নানা রাজ্য পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় প্রয়োগ করবে এবং কেন্দ্রের সঙ্গে যার সাহায্যে সংযোগ রাখবে। পরিষ্কার করে না বললেও মনে হয়, এ-সব কাজে 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রচলন আবশ্যিক না হলেও অবশ্যম্ভাবী বলে শাসকবর্গ মনে করেন।

এই শেষ দুই (গ) ও (ঘ) ক্ষেত্র নিয়েই প্রশ্ন—ইংরেজির স্থলে কী চলবে, কোন্ রূপের হিন্দী চলবে, তা এখনো কোনো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শাসক বলেননি। তার কারণ, একটা অবাস্তব কল্পনাই এই সব প্রশ্নের মূল। তা এই: ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদী পথে এক নিগড়ে বেঁধে রেখেছিল। এই এক নিগড়ে বাঁধাটাই তাদের সৃষ্ট 'ঐক্য'। কিন্তু আমরাও বলি—দ্বিখণ্ডিত ভারতরাষ্ট্রকে (বা পাকিস্তান-রাষ্ট্রকে) এক নিগড়ে বেঁধে রাখব। তাই আমরা ভাবি ইংরেজির জায়গায় একটা ভারতীয় (পাকিস্তানে পাকিস্তানী) ভাষা চাপিয়ে দিলেই ভাষার 'ঐক্য' সুস্থির হল। কায়দাটা সাম্রাজ্যবাদী কায়দা। গণতান্ত্রিক পথে সকল ভাষার বিকাশে 'ঐক্য' গড়ার কষ্ট স্বীকার কে করে?

এই প্রলোভনের বশেই, একদিকে ভারতরাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী ও অন্যদিকে তার মাড়োয়ারী-গুজরাতী ধনিক-বণিকগোষ্ঠীর সাহায্যে 'হিন্দী' নামক একটি নাগরী অক্ষরে লেখা ভাষাকে 'রাষ্ট্র-ভাষা' বলে সমস্ত দেশের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এই সাম্রাজ্যবাদী চেষ্টার ফলে দক্ষিণে দেখা দিয়েছে হিন্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, উত্তর ভারতেও দেখা দিয়েছে হিন্দীর প্রতি সন্দেহ।

'এক-ভাষা'র প্রশ্ন

এ-কথা বলা বাহুল্য, ভারতরাষ্ট্রে একটি ভাষা সকলের সহজবোধ্য রূপে গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়। এ-কথাও সত্য 'হিন্দুস্থানী'র কোনো একটি রূপই সেইরূপে বিবাশলাভ করতে পারে। বাঙলা, তেলেগু প্রভৃতি অন্য প্রধান ভাষার তদনুরূপ সম্ভাবনা বেশি নেই। বাঙলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় ভারত রাষ্ট্রে বাঙলা ভাষার সে সুযোগ আদৌ নাই, পাকিস্তানেও তা দুর্লভ হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে উপরের কথাগুলিও স্মরণীয়—জোর করে 'রাষ্ট্রভাষা' চাপাতে গেলে ভারতের ঐক্য বিনষ্ট হবে, যেমন তা হতে যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতে। হিন্দীর কোনো রূপ এখনো সুস্থির হয়নি। হিন্দীর যে রূপ তার সাহিত্যে চলে তা নয়, বরং 'বাজারীয়া হিন্দী'ই উত্তর ভারতে বহুল গ্রাহ্য। 'রাষ্ট্র' যদি গণতন্ত্র হয়, 'রাষ্ট্রভাষা' যদি জনসাধারণের হয়, তাহলে 'রাষ্ট্রভাষা' কেতাবী-ভাষা হলে চলবে না, হতে হবে সাধারণের ভাষা। শাসক-ধনিকের চাপে কোনো ভাষাকে চালানো অত্যাচার। ভাষার ক্ষেত্রেও হয়তো শ্রমিক-শ্রেণীই কালক্রমে হবে সেই সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষার স্রষ্টা!

কার্যত, ভারতের শ্রমিক শ্রেণী এখনি এই 'বাজারীয়া হিন্দী' ভাষা গ্রহণ করেছে। কলকাতা থেকে বোম্বাই-আহ্‌মদাবাদ পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক-এলাকায়, ট্রেড ইউনিয়নের সভায় আমরা এ-ভাষা বলছি। সাধারণ কংগ্রেসী সভায়ও এই ভাষাই বলা হত, যতক্ষণ কংগ্রেসে জনতার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়নি। এখন অবশ্য কংগ্রেস উচ্চবর্গের পার্টি, তাই তা সাহিত্যিক হিন্দী বা 'খড়ী বোলি'রই আসর। 'বাজারীয়া হিন্দী' শুধু জারগন বা জগাখিচুড়ি থাকবে, না, ক্রমশ তা পরিপুষ্ট হবে, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব নয়। এখনো তা একটা অনিশ্চিত জারগন মাত্র। তবে দুটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখলে এর ভবিষ্যৎ বিস্তার অপ্রতিরোধ্য হবে। প্রথমত, এ-ভাষা তার বর্তমান পপুলার বা জনসম্মত প্রকৃতি যদি বজায় রাখে। মোটের উপর, 'হিন্দুস্থানী' ভাষা থেকেই এই 'বাজারীয়া হিন্দী' উদ্ভূত। জনসাধারণ নিজেদের প্রয়োজনে 'হিন্দুস্থানী'র জটিল ব্যাকরণকে সরল করেছে, তার নিত্য ব্যবহার্য শব্দ সম্পদকে গ্রহণ করেছে এবং হিন্দু-আর্য ভাষার বাক্যবিন্যাসকে অক্ষুন্ন রেখেছে। প্রয়োজন মতো তারপরে এই 'হিন্দুস্থানী'র সঙ্গে যোগ করেছে ইংরেজি ও আঞ্চলিক ভাষার (বাঙলার, মরাঠীর) শব্দ। এই জনসম্মত রূপ বজায় রাখলে এই ভাষা দক্ষিণেও গ্রাহ্য হতে পারে। লিখিত ভাষায় পরিণত হতে হলে যথানিয়মে এ-ভাষা নিশ্চয়ই সংগত ও পরিপুষ্ট হবে—অর্থাৎ ব্যাকরণের সরল রূপ সুনির্ধারিত করবে ও নতুন শব্দ গ্রহণ করবে। এই নতুন শব্দ গ্রহণকালে তার লক্ষ্য হবে যে-শব্দ সর্বভারতে গ্রাহ্য হবে বা হতে পারে এমন শব্দ বেশি গ্রহণ করা, যেমন—'ডাকঘর', 'শ্রেষ্ঠগৃহ' নয়। বলা বাহুল্য, উচ্চভাব-প্রকাশক অনেক শব্দ ক্রমশ আসবে, কিন্তু তা আসবে স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃত শব্দের ভাণ্ডার থেকে বেশি। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার জন্যও তেমনি আন্তর্জাতিক শব্দসমূহ গ্রাহ্য হবে। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি হল কঠিনতর সমস্যা। তা এই—'হিন্দুস্থানী'র মূল ব্যাকরণ-গত বুনিয়াদ একেবারে ছাড়তে গেলেও 'বাজারীয়া হিন্দী'র চলবে না। অর্থাৎ, 'বাজারীয়া হিন্দী'র নামে একটা 'এস্‌পারেন্টো'র মতো আজগুবি ভাষা তৈরি করলে তা ভাষা হবে না, হবে শূন্য-লতা।

এক-লিপির প্রশ্ন

স্বভাবতই এই এক-ভাষার প্রয়োজন যতই থাকে তা জোর করে রাতারাতি সমাধান করা যাবে না। এবং নিশ্চয়ই হিন্দীভাষা (উর্দু ভাষাও) বরাবরই সাহিত্যে প্রচলিত থাকবে। বরং এক-ভাষা প্রচলনে আপাতত কতকটা সহায়তা হয় আমরা যদি ভারতীয় ভাষাগুলিতে এক-লিপি প্রচলন করতে পারি। তাহলে বাঙালী, মরাঠী, তেলেগু, তামিল, পাঞ্জাবী প্রভৃতি জাতিরা পরস্পরের ভাষা

অধিকতর সংখ্যায় শিখতে পারবে। তাতে এসব বিভিন্ন ভাষার নৈকট্য ধীরে ধীরে সাধিত হবে। লিপির সমস্যা মূলে সমস্যা নয়। তথাপি, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এদিকে (ক) বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বলবে রোমক-লিপিকে প্রয়োজনানুরূপ চিহ্নিত করে ভারতের সর্বভাষার লিপি বলে প্রথম দিকে প্রচলিত করা উচিত; (খ) ভারতীয় আত্মাভিমান তাতে ক্ষুন্ন হলে অবশ্য নাগরী লিপিকে (যথাসম্ভব সরল করে) সে-কাজে প্রয়োগ করা যায়—যদি দক্ষিণের দ্রাবিড়ভাষী বন্ধুরা তাতে স্বীকৃত হন। (গ) তা না হলে অবশ্য যে-ভাষার যে-লিপি তাতেই তা এখনকার মতো লিখিত হবে। তবে নতুন আঞ্চলিক ভাষার নতুন লিপি উদ্ভাবনা করতে হলে (যেমন, ভবিষ্যতে ঝাড়খণ্ডে হতে পারে, আসামের কোথাও কোথাও হতে পারে) রোমক-লিপিকেই গ্রহণ করা কর্তব্য। (বলা প্রয়োজন, ভারতরাষ্ট্রে নাগরী ও রোমক-লিপিতে উর্দু লেখাই সমীচীন)। কিন্তু প্রধান কথা—জোর করে কোনো লিপিকে কারো ঘাড়ে চাপানো চলবে না।

ভাদ্র, ১৩৬০ বাং

লেখা ও লিপি

ভাষা আর লিপি যে এক নয়, তা আমরা জানি—যদিও সাধারণতঃ আমরা তা সব সময়ে স্মরণ রাখি না। একই হিন্দুস্থানী ভাষা নাগরী লিপিতে লেখা চলে, ফারসী-আরবীয় লিপিতেও লেখা চলে। শুনে আশ্চর্য হবার কারণ নেই, বাঙলাও শিলেট অঞ্চলে এক সময়ে কিছু কিছু লিখিত হয়েছিল নাগরীতে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে আরবী ফারসী লিপিতে (উর্দুর মত) ; অবশ্য তার পরিমাণ এত সামান্য যে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। মোটের উপর ভাষা মানুষের সমাজের এক আদিমতম অবলম্বন —অবশ্য সে সব আদিম ভাষা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। লিপি জন্মেছে সে তুলনায় এই সেদিন, হাজার তিন বছর পূর্বে—মুখের কথাকে যখন স্মৃতিতে গেঁথে রাখবার প্রয়োজন সমাজে বেড়ে গেল তখন। লিপির গুরুত্ব কিন্তু কম নয়। এই লিখন পদ্ধতির জন্মের সঙ্গেই ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক কাল শেষ হয়, ইতিহাস আরম্ভ হয়।

ছবি থেকে বর্ণমালা

লিপির জন্মকথাও কম কৌতূহলপ্রদ নয়। সে কৌতূহল পূর্ণ করতে হলে তা পূর্ণ করা যাবে লিপিতত্ত্বের কোনো গ্রন্থ থেকে (সাধারণভাবে, এ, পি, মুরহাউস রচিত ইংরেজি পাস্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট গ্রন্থ মালার 'রাইটিং এণ্ড আলফ্যাবেট' নামক ৮৮ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সে কৌতূহল তৃপ্ত করতে পারে)। বিষয়বস্তু চিত্রে লেখা হত হয়ত প্রথম ; যেমন মিশরের পেলেটে তার নারমের চিত্রে রাজা শত্রুকে হত্যা করছেন। ভারতে এরূপ চিত্রের অভাব নেই। এই চিত্রভাষা সরলীকৃত হয়ে দাঁড়াল চিত্র-লিপিতে (পিক্‌টোগ্রামে), যেমন দুটি নির্দিষ্ট আঁক জুড়ে স্থির হল বোঝাবে 'মাছ'। অবশ্য এতে শুধু বস্তুই প্রকাশ করা চলে, ঘটনার ইঙ্গিতও কিছু দেওয়া যায়। কিন্তু মনের ধারণা লেখা যায় কি করে ? এই বস্তু-নির্ধারক চিত্রলিপি থেকেই এল ভাব-ধারক লিপি বা ধারণা-লিপি (আইডিওগ্রাম)। যেমন, মেসোপোটামিয়ার সুমের-আক্কাদ জাতির (খৃঃ পূঃ ১৯০০ শতকের পূর্বে) ফলকাকৃতি (ক্যুনিফর্ম) রেখায় এরূপ ভাব-ধারক লিপিতে একটা চৌকো (বা বৃত্ত) আঁকলে তার দ্বারা বুঝাত 'সূর্য'। তারপর সেই চৌকোর (বা বৃত্তের) মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র ছোট রেখা-কোণ (এ্যাঙ্গেল) বসিয়ে বোঝাত তিন দশ বা ত্রিশ। এভাবে সূর্যের মধ্যে তিন-দশে প্রকাশ করত তারা মাসের ধারণা।

এধরনের অজস্র ফলকলিপি সুমের আক্কাদরা রেখে গিয়েছে,—এটাও চিত্রলিপিরই যুগ, তবে তার দ্বিতীয় পর্ব। চীনা হরফ এই চিত্রলিপির পরিণতি। প্রাচীন চীনারা ফলকাকৃতি রেখা ব্যবহার করত না, কিন্তু ধারণা-লিপিতে তারাই ওস্তাদ। প্রাচীনকালে দ্বিভঙ্গ এক ধরণের বাঙলা দু'এর মত (২) এক রেখায় তারা বুঝাত 'মা', আর এক রেখার মোড় ফিরানো দ'তে—'পুত্র'। আর এই দুই দ্বিভঙ্গ রেখা সংযুক্ত করে (মায়ের কোলে ছেলে বসিয়ে) বোঝাত—কিন্তু মাতাপুত্র নয়, 'সুখ'— একটা ভাব। দুটি চারিটি নির্দিষ্ট ধরনের রেখায় চীনারা বুঝাত কুকুর। চৌকো একটা বাক্‌স ('মুখ') আর তার উপরে চারটি সমান্তরাল ছোট বড় টান ('হাওয়া') দিয়ে একত্রে বোঝাত ('মুখের হাওয়া') কথা। কিন্তু দুদিকে দুটি কুকুরবাচক রেখা আর মাঝখানে ওরকম 'কথার' ছবি বসালে চীনে ভাষায় তখন বোঝাবে মামলা, কুকুরের মত যেখানে দু'পক্ষ বসে ঘেউ ঘেউ করছে! গল্প শুনেছি—একটা বৃত্তের নীচে দুটান জুড়ে নাকি চীনারা বোঝাত মেয়ে। আর ওরকম দুটি স্ত্রী-

বাচক রেখা-চিত্র একত্র করলে—দুটি মেয়ে একত্র হলে—কার্যত যা হয় তাই নাকি বোঝাত চীনে ভাষায় —অর্থাৎ 'ঝগড়া'। সত্য মিথ্যা জানি না, জাতিটার তা হলে রসবোধ আছে।

এই ধারণা-লিপির পরে আসে ধন্যাত্মক (ফোনেটিক) লিপি—অর্থাৎ সে সব চিহ্ন বস্তু বা ধারণার 'ছবি' নয়, বোঝাত সেই বস্তু-নির্দেশক শ্রুত ধ্বনিকে। পটল-চেরা চোখের মত করে দুটি বৃত্তাংশের রেখা একত্র জুড়ে মিশরে বোঝাত 'মুখ' (মুখবিবর)। 'মুখ' কথাটির মিশরে উচ্চারণ ছিল 'র্'। অতএব ও-রেখাদ্বয় বোঝাল ক্রমে 'র্' ধ্বনিকে। একজোড়া কানের মত ধারণা-লিপিতে বোঝাত 'শ্রবণ', তার উচ্চারণ ছিল 'শাম'। অতএব কানজোড়া হল 'শাম' ধ্বনির চিহ্ন। এইরূপ ধন্যাত্মক লেখার প্রারম্ভ হল। চোখে দেখা বস্তু বা মনের চিত্র-কল্প আর নয়, এখন লিপি হল-শ্রুত-ধ্বনির চিহ্ন বা সংকেত। চলল এদিকে লিপির পরিণতি।

ধ্বনি-ত একস্বরবাহিত (মনোসিলেবিক) শব্দ মাত্র নয়, (এক একটি সিলেবল্ বা স্বরবাহিত ধ্বনিকে আমাদের ভাষায় বলা চলে 'অক্ষর'। 'অক্ষর' অর্থ হরফ নয়। যা শব্দের ইউনিট্, বা অবিভাজ্য ধ্বনিরূপ, তা'ই অক্ষর)। এক বা একাধিক এই রকম সিলেবল্ বা অক্ষর দিয়ে প্রায় ভাষাতে হয় এক একটা শব্দ বা ওয়ার্ড। অতএব ধন্যাত্মক লিপি ক্রমশ এই সিলেবল্ বা অক্ষর সূচক চিহ্ন হল (সিলেবেটিক)। কোনো শব্দে দুই সিলেবল্ থাকলে তার প্রথমটিকে নিয়ে একটা চিহ্ন দিয়েই কাজ সারত কোনো কোনো জাতি। যেমন 'জাতি' শব্দটির চিহ্ন যেন 'জা'। আবার কোনো কোনো জাতি দুই সিলেবলের জন্য নির্দিষ্ট করলে দুই স্বতন্ত্র চিহ্ন—'জাতি' লিখতে 'জা'-এর জন্য এক চিহ্ন, 'তি'র জন্য দ্বিতীয় এক চিহ্ন। এর পরে সিলেবল্ থেকে ব্যঞ্জন ও স্বরধ্বনিকে পার্থক্য করা আরম্ভ হল। যেমন, জাতিতে দেখা গেল আছে ব্যঞ্জনবর্ণ জ্ + স্বর আ এবং ব্যঞ্জন ত্ + স্বর ই। আরম্ভ হল অক্ষরের বর্ণ-বিশ্লেষণ। প্রত্যেক স্বর ও প্রত্যেক ব্যঞ্জনের জন্য তখন লাভ করা গেল এক একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন। যেমন জ্-এর জন্য, আ-এর জন্য, ত্-এর জন্য, ই-এর জন্য। লিপি-বিদ্যা এল তার শেষ স্তরে—অ্যাল্ফ্যাবিটের পর্যায়ে—বর্ণমালার আবিষ্কারে।

চীনা হরফ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক প্রধান লিপিই এখন অ্যালফ্যাবিটিক জাতের। যেমন রোমকলিপি (যাতে ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা, বর্তমানে তুর্ক, এবং আমাদের দেশেরও খাশিয়া, লুসাই, কতকাংশে সাঁওতালী প্রভৃতি ভাষা লেখা হয়), গথিক-লিপি (জার্মান ভাষা লেখা হয়), রুশীলিপি (গ্রীকো বাইজেনটাইন্ লিপির পরিণতি। রুশ, উক্রেনীয় ও সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অনেক নতুন ভাষা এ লিপিতে লেখা হয়) ইত্যাদি। ভারতীয় লিপিসমূহ (বাঙলা, নাগরী প্রভৃতি) এবং আরবী লিপি (যা ফারসী, উর্দুতে গৃহীত হয়েছে), তাও এ জাতের। তবে তাতে অত শৃঙ্খলা রক্ষা হয়নি।

লিপির বিচার

ভারতীয় লিপিসমূহের বর্ণমালার ক্রম ('অ, আ, ক, খ') ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক থেকে পরম গৌরবের আবিষ্কার। কিন্তু লিপি হিসাবে লিখতে গিয়ে আমরা কোনো শৃঙ্খলা মানি নি। ভারতে একলিপি প্রবর্তন করতে আমরা যখন আজ যত্ন করছি তখন বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের বাঙলা, নাগরী সব লিপিই লেখা ও মুদ্রণের দিক থেকে রোমক লিপির মত অত সুশৃঙ্খল বা বৈজ্ঞানিক নয়। আমাদের লিপি অ্যালফ্যাবিটিক জাতের হলেও, জাতের নিয়ম ঠিক মত রক্ষা করে না।

কেন, তা বলতে পারি। প্রত্যেক স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির জন্য এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণলিপি পাওয়া গেলে—আর সে লিপি ধ্বনি অনুযায়ী ক্রম রক্ষা করলে—সেই লিপিই শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ মুখে যখন বলছি 'মা' তখন বলব ম্ + আ (m+a) কিন্তু লিখি 'ম+া'। আবার যখন বলি 'কে' তখন উচ্চারণ করি ক্+এ (k+e); কিন্তু লিখি 'কে' (অর্থাৎ ে+ক্—এ+ক্), বাঙলা লেখার এ এক সৃষ্টিছাড়া ধরন। তাছাড়া আছে আরও সৃষ্টিছাড়া সংযুক্ত ব্যঞ্জন।

বাঙলা, নাগরী প্রভৃতি ভারতীয় লিপিতে এই বিশৃঙ্খলা এত বেশি যে আমরা তা মনেও রাখি না। অবশ্য বাঙলার থেকে নাগরীতে তা কম। বাঙলায় 'ক্ক' বা 'ক্ক' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত তালগোল পাকিয়ে যে কি আমরা করি তার ঠিকানা নেই। বলা বাহুল্য, ইংরেজিতেও আমরা উচ্চারণ অনুযায়ী ঠিক ঠিক লিপি পাই না। রোমক লিপিতে স্বরবর্ণ অল্প বলে তাদের বিভ্রাট অনেক। 'পি ইউ টি' (put) হয় 'পুট্', এবং 'বি উ টি' (but) হয় 'বাট্', এই নিয়মহীনতার জন্যে অন্তত একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের কথা শুনেছি তিনি আর ইংরেজি শিখলেন না। তিনি হয়তো আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাষায় উচ্চারণ ও লিখিত রূপের বৈষম্য দেখে মনে করতেন 'বাঙলা ভাষা হচ্ছে দেবভাষার পতিত রূপ —তাই ওরূপ অনাচার।' কিন্তু ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা বলবেন, শব্দের লিখিত রূপ লিপি দ্বারা চিরকালের মত স্থির হয়ে থাকলেও শব্দের উচ্চারণ, মুখের ধ্বনি, চিরদিনই বদলায়, ভাষা বদলায় লিপিরও পূর্বে। তাই উচ্চারণ হয় একরূপ লেখায় থাকে অন্যরূপ।

আসল কথা, কোনো ভাষার সব ধ্বনি শুদ্ধরূপে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা তার লিপিতে প্রায় অসাধ্য। অন্তত ভাষা বদলে যাবে, লিপি তাকে এঁটে উঠতে পারবে না। ধ্বনি-বিজ্ঞান সে জন্য বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ধ্বন্যাত্মক লিপিমালা উদ্ভাবন করেছে ; দরকার মত তাতে নতুন আরও চিহ্ন যোগ করছে। কিন্তু সে লিপি হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের জন্য। সাধারণত কোনো ভাষার পক্ষে যা দ্রষ্টব্য তা হচ্ছে—তার ধ্বনিসমূহ যেন যথাসম্ভব যথার্থ ও সহজবোধ্য রূপে লিপিদ্বারা চিহ্নিত হয়। দ্বিতীয়ত, এক চিহ্নে বা হরফে একটি ধ্বনিই চিহ্নিত হবে। কিন্তু চিহ্নসংখ্যা অকারণে বাড়ালেও চিহ্ন-সমূহ শিক্ষা করা অসাধ্য হবে, আবার একেবারে কমালেও ভাষার ধ্বনিগত রূপ যথার্থ ধরা পড়বে না। তাই দেখা দরকার, সেই চিহ্নমালা যেন লেখনের, একালে মুদ্রণের ও 'টাইপ-রাইটিং'-এর, পক্ষেও সহজ গ্রাহ্য হয়। চতুর্থত, কাগজের অপচয় না করেও যেন এরূপ চিহ্ন চোখের তৃপ্তিসাধন করতে পারে। এদিক থেকে রোমক লিপিই এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ।

চীনালিপির বৈশিষ্ট্য

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি চীনা ভাষার ও চীনা লিপির বৈশিষ্ট্য। আশ্চর্য এই যে, চীনা ভাষা একাক্ষর (মনোসিলেবিক) শব্দের ভাষা। চুং চাং প্রভৃতি এক-একটি অক্ষরের শব্দ নিয়ে বিচিত্র রূপে এই ভাষা বর্ধিত হয়েছে। এক শব্দেও দুই অক্ষর নেই। আরও আশ্চর্য এই যে, তার লিপি-পদ্ধতি এখনো সেই ধারণা লিপির (আইডিওগ্রাম) পদ্ধতি। অর্থাৎ চিত্রলিপির সেই বিশিষ্ট স্তর ছাড়িয়ে ধ্বনিসূচক স্তরেও চীনালিপি উত্তীর্ণ হয় নি। হয়ত একাক্ষর ভাষা বলে সেই তাগিদও তেমন অনুভূত হয় নি। তাই, চীনাভাষার লিপিকে বর্ণমালা বা অ্যালফ্যাবিট বলা হয় না, বলা হয় 'ক্যারেকটার' বা বর্ণ-চিত্র। আর প্রত্যেকটি বর্ণের নয়, প্রত্যেকটি শব্দের (সব শব্দই একাক্ষর) জন্য চীনাদের এক একটি চাই বিশিষ্ট ক্যারেকটার। যত শব্দ তত ক্যারেকটার। এ জন্যই চীনা ভাষার টাইপরাইটার নেই। শর্টহ্যাণ্ডও হয় কিনা সন্দেহ। চীনা মুদ্রণ একটা অদ্ভুত কাণ্ড। দু-চার শ টাইপ নয়, হাজার কয় টাইপ ; ছুটে ছুটে তা এনে 'কম্পোজ' করতে হয়। সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রা নাকি চলে শত তিনেক এরূপ শব্দ নিয়ে। শিক্ষিত মানুষ হাজারখানেক শব্দ জানে ও বর্ণচিত্র চেনে। সে তত পণ্ডিত যার যত বেশি বর্ণচিত্র পরিচিত ও শব্দ জানা। এই অদ্ভুত বর্ণচিত্র চীনারা এখনো পরিত্যাগ করেন নি। কারণ, চীনের অঞ্চলে অঞ্চলে উপভাষা স্বতন্ত্র। কিন্তু একই চীনা অক্ষর পড়ে চীনজাতি সকলে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ রীতিতে। একই বর্ণচিত্র পিকিং-এ উচ্চারণ করে 'চা-এ,' আর ক্যাণ্টনের লোকে 'Tea' ; কিন্তু সেই বর্ণচিত্র বা হরফটি চীনের সর্বত্রই বোঝাবে সেই পানীয়—The cup that cheers but not inebriates. চীনের এই বর্ণচিত্রের মধ্য দিয়ে এভাবে তাদের জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হয়েছে বলেই জাতি এখনো এ পদ্ধতির পরিবর্তন ততটা চিন্তা করে না। এই অদ্ভুত লিপিপদ্ধতির জন্যই তারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই হোক বা অন্য যে নামই হোক তাকে নিজেদের ভাষায় লিপ্যন্তরিত করে না, অর্থানুযায়ী ভাষান্তরিত করে।

চীনা ভাষা ও চীনা লিপির পক্ষে যে কারণে পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয়, আমাদের ভাষা ও লিপিতে সেই কারণে পরিবর্তন কাম্য। অর্থাৎ আমরা চাই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংহতি। চীনে উপভাষা সত্ত্বেও মোটের উপর এক ভাষা ও এক লিপি; আর আমাদের উপভাষা ছেড়ে দিলেও বহু ভাষা বহু লিপি। যদি আমাদের লিপি চীনের মত এক হত, তাহলেও এই বহুজাতির বহুভাষিক দেশের মানুষের পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে আদান প্রদান অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হত। আজকের দিনে আমরা বাঙালীরা তেলেগু ভাষা শিখবার কথা প্রায় ভাবতেই পারি না (তেলেগুরা কিন্তু অনেকে বাঙলা শিখে আমাদের বহু গ্রন্থ তেলেগুতে অনুবাদ করেছেন)। কারণ, তেলেগু কেন, ওড়িয়া হরফও আমাদের কাছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। অথচ তেলেগু দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর ভাষা হলেও সংস্কৃতশব্দবহুল ভাষা —বাঙালীর পক্ষে তার শব্দসম্পদ দুর্বোধ্য নয়। একবার লিপির আড়াল ভাঙলে দেখতাম তা দুঃসাধ্যও নয়। এরূপ কারণেই উর্দু বা পাঞ্জাবী (গুরুমুখী বা আরবী ফারসী যে হরফেই পাঞ্জাবী লেখা হোক) ভাষা ও সাহিত্যও বাঙালীর নিকট দুর্গম। ভাষার বাধা দীর্ঘতর হয়েছে এই লিপির পার্থক্যে। ভাষার সঙ্গে লিপির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য নয়, তা ঠিক। দেখেছি কিছু বাঙলাও এক সময়ে শ্রীহট্টে লিখিত হয়েছে শিলেট নাগরীতে, চট্টগ্রামেও সামান্যাংশে বাঙলা লিখিত হয়েছে আরবী ফারসী লিপিতে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার পরিচয়ের পক্ষে, ভারতের (ও পাকিস্তানের) এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের আদান প্রদানের জন্য, লিপির এই প্রাচীর সেই ভাষার বাধাকে আরও দুস্তর করে তুলেছে। একই লিপিতে সমস্ত উত্তর ভারতের ভাষাসমূহ লেখা হলে বাঙলা, হিন্দী, গুজরাতী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষীরা যে পরস্পরের আরও কতকটা নিকটতর হতে পারেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কার্তিক, ১৩৬০ বাং

ভারতবর্ষে একলিপির প্রশ্ন

ভারতবর্ষ বহুজাতির ও বহুভাষার দেশ। এই বিরাট দেশের নবগঠিত রাষ্ট্রসংঘ দুটির সম্বন্ধেও এ-কথা সত্য। ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন ঐক্য তাই স্থায়িভাবে গঠন করা সম্ভব একমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে—প্রত্যেক জাতির ও ভাষার আত্মবিকাশের পূর্ণতম অধিকার হবে তার ভিত্তি। এ-কথা স্বীকার করেও আমরা মানি—এই সব জাতিদের ও ভাষীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদানপ্রদানের জন্য ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কোনো একটি ভাষা বহুল-পরিচিত ও বহুল-গ্রাহ্য ভাষা হিসাবে গড়ে ওঠা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য পাকিস্তানের জন্যও তাই কাম্য। সেদিকে মূল প্রয়োজন অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক-রীতিতে-খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন সমাজজীবনের অবসান; কলকারখানা, যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির ('মার্কেটের') পূর্ণতর প্রসার, এক কথায়, ভারত রাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে দ্রুত শিল্প-বিপ্লব। ভাষা-সমস্যার সমাধানেও তাই শিল্পবিপ্লবের উপযোগিতা বিস্মৃত হবার উপায় নেই। এই কথা বলে ভাষা-ক্ষেত্রের বাস্তব সমস্যা ও বাস্তব কর্তব্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সেদিক থেকে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বা স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধেয় হচ্ছে—কোনো একটি ভাষা এইসব জাতিরা বা ভাষীরা নিজেদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদান প্রদানের সুবিধার জন্য স্বেচ্ছায় প্রচলিত করে নিতে পারেন কিনা। কি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে কি পাকিস্তানে, কোনো বহুল পরিচিত বহুল গ্রাহ্য একভাষার ও একলিপির প্রসার তাই বাঞ্ছনীয়।

ভাষার দিক থেকে মনে হয়, হিন্দী নামের আড়ালে সে-ভাষার (হিন্দুস্থানী ভাষার) যে-সব রূপ প্রচলিত (যেমন লিখিত রূপে হিন্দী ও উর্দু; মৌখিক রূপে হিন্দুস্থানী ও বাজারীয়া হিন্দী), তারই কোনো-একটি ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে এ প্রয়োজন মেটাতে পারে। কিন্তু লিপির দিক থেকে কি ভারতে তেমন একলিপির প্রচলন বাঞ্ছনীয়? কিংবা সম্ভব?

ভারতে প্রচলিত লিপিগোষ্ঠী

বর্তমানে ভারতের ভাষাসমূহ প্রধানত চার গোষ্ঠীর—অস্ট্রিক বা পূর্বী গোষ্ঠীর, ভোট চীনা গোষ্ঠীর, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর, হিন্দ-আর্য গোষ্ঠীর। ভারতের লিপিসমূহ কিন্তু এ-সব কোন গোষ্ঠীর নয়। তা মূলত তিন গোষ্ঠীর, ব্রাহ্মী গোষ্ঠীর, আরবী-ফারসী গোষ্ঠীর এবং রোমক গোষ্ঠীর (রোমক লিপিতে ইংরেজী ভাষা লিখিত হয় বলে আমরা এই রোমক বা 'রোমান্' লিপিকে ভুল করে বলি 'ইংরেজী অক্ষর')।

আরবী-ফারসী লিপিতে প্রধানত লেখা হয় উর্দু ও সিন্ধী (পাক)। ভারতীয় ভাষা-সমূহে আরবী-ফারসী ভাষার প্রয়োগ বেশ কষ্টসাধ্য—আরবীতে স্বরবর্ণের শোচনীয় অভাব, ব্যঞ্জনবর্ণের রূপ অনিশ্চিত, বিন্দুই ভরসা। আমরা জানি এই লিপিতে পাঠকালে কত দুর্দৈব ঘটে: পিতা 'আজমীঢ় গিয়েছেন,' কি, 'আজ মরে গিয়েছেন'—কেউ পিতার অবস্থা না জানলে বুঝতে পারবেন না। আরবী-গোষ্ঠীর জন্যই এ বর্ণমালা প্রশস্ত এবং আরবী শব্দেই তার প্রয়োগ সুসম্ভব। এই হরফের স্বপক্ষে বলবার একমাত্র এই যে, এই হরফে অল্প স্থানে যথেষ্ট শব্দ লেখা যায়। কিন্তু বহু প্রাচীন-লিপির সন্তান হলেও এ-লিপি তেমন সুশ্রী নয়। তা ছাড়া, এ-লিপিতে লেখা ভাষা যখন সহজ-পাঠ্য নয়, তাতে যখন পাঠকের বিভ্রান্তি বাড়ে বৈ কমে না, তখন এ-লিপি আরবী বা আরবীজাতীয় কোনো ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় প্রয়োগ বাধা স্বরূপ। শুনে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয় যে, উর্দুতেও এ-লিপির প্রয়োগ খুব সমীচীন নয়। কারণ আরবী-ফারসী শব্দ বহু থাকলেও উর্দু ভাষা মূলত হিন্দুস্থানী,—ধ্বনিতে, রূপে উর্দু ভারতীয় ভাষা।

খ্রীষ্টান পাদ্রীরা রোমক লিপির সঙ্গে সুপরিচিত; তাই তাঁরা প্রথম থেকেই ভারতীয় ভাষা-সমূহ রোমক লিপিতে লিখতে চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে যে-সব ভাষায় মিশনারীদের উদ্যোগে বই লিখিত, মুদ্রিত ও প্রণীত হয়েছে সে-সব পশ্চাৎপদ জাতিদের ভাষা রোমক লিপিকেই আপন লিপিরূপে গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সাঁওতালী (বাঙলা অক্ষরেও তা লেখা হত), ওরাওঁ প্রভৃতি ভাষা, এবং আসামের খাসী, লুসাই, গারো প্রভৃতি ভাষা আমাদের সুপরিচিত। তা ছাড়া আমরা মনে রাখতে পারি, মানোয়েল দ্য আসুসুম্পসাওঁ-র "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" (১৭৪৩ এ লিসবন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত) রোমান অক্ষরে লেখা বাঙলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। বাঙলা অক্ষরের অবশ্য তৎপূর্বকালীন মুদ্রিত প্রতিলিপি আছে—খ্রীঃ ১৬৯২ এ। কিন্তু বাঙলা হরফে প্রথম মুদ্রিত বই হালহেডকৃত বাঙলা ব্যাকরণ খ্রীঃ ১৭৭৮এ প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রণ করেন ১৮০৪এ। এখনো গোয়ার কোঙ্কণী পর্তুগীজদের প্রভাবে রোমান অক্ষরে লেখা হয়। এ ছাড়া রোমান অক্ষরে নানা ভাষার বাইবেল আছে। ইংরেজ আমলে ভারত সরকার সাহেবদের এবং ফৌজের সিপাহীদের জন্য "ফৌজী হিন্দুস্থানী"-তে যে-বই ছাপাতেন তাও রোমক লিপিতেই লেখা হত। এই রোমক লিপিই সামান্য টান ও ফুটকি যোগ করে এখন পালি মুদ্রণে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃত ভাষার মুদ্রণেও তার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংস্কৃতও এ-লিপিতে কিছু কিছু মুদ্রিত না হয় এমন নয়। যা'ই হোক, বিরাট ভারতবর্ষে রোমক লিপির আসল প্রভাব ইংরেজি ভাষার জন্য—নইলে ভারতীয় ভাষায় তার প্রচলন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ভারতীয় ভাষাসমূহ সাধারণত লেখা হয় নিজ নিজ ভারতীয় লিপিতেই।

ভারতীয় লিপি: ব্রাহ্মীর বংশধারা

ভারতীয় ভাষাসমূহ যে-কোনো ভারতীয় লিপিতে লেখাই স্বাভাবিক ও সমুচিত, এ-কথা নিশ্চয়ই মনে হবে। কারণ, ভারতীয় ভাষার প্রকাশের প্রয়োজনে ভারতীয় লিপির প্রবর্তন ও বিবর্তন। ভারতের প্রধান প্রধান আধুনিক ভাষা সমূহে প্রায় হাজার বছর ধরে বাঙলা, নাগরী, তেলেগু প্রভৃতি এক-একটা বিশিষ্ট রূপও লেখার জন্য বিশিষ্ট লিপি আয়ত্ত করেছে। এ সব বিভিন্ন লিপি এতই বিভিন্ন যে, তা দেখে আমরা মনে করতে পারি কি যে মূলত তারা একই ভারতীয় প্রাচীন লিপির বংশধর? এমন কি, যে-সব ভাষা এক গোষ্ঠীর নয় সে সবও লিখিত হচ্ছে এক গোষ্ঠীর লিপিতে। যেমন, তামিল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা, বাঙলা ও হিন্দী হিন্দ-ইরানীয় গোষ্ঠীর ভাষা, মণিপুরী বা মেইতেই ভোটচীনাগোষ্ঠীর ভাষা। অথচ, এদের লিপি এক ভারতীয় গোষ্ঠীর। অর্থাৎ, তামিল লিপি, বাঙলা লিপি, নাগরী লিপি এবং মেইতেই-র জন্য ব্যবহৃত বাঙলা লিপি—একই ভারতীয় আদি লিপির বংশধর। সে-লিপি কী, কী করে এই বিভেদ ও বিবর্তন ঘটল?

এ অবশ্য ভারতীয় লিপির জন্ম ও বিকাশের কথা, ঠিক বর্তমান লিপি-সমস্যার কথা নয়; কিন্তু সংক্ষেপে হলেও এ ইতিহাস জানা থাকলে আমরা অনেক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারি। যেমন, বর্তমানে চলিত কোনো ভারতীয় লিপিকে প্রাচীনতম মনে করব না; 'নাগরী' লিপিকে বলব না সংস্কৃত ভাষার লিপি; তামিল-তেলেগু প্রভৃতি লিপিকে মনে করব না পর, এমন কি, সিংহলীদের লিপিকেও চিনব আমাদের জ্ঞাতি বলে।

ভারতীয় লিপির উদ্ভব কোথায়? এ কথার উত্তর আমরা জানি না। মোহেন-জো দড়ো-হরপ্পায় যে-লিপি পাওয়া গিয়েছে বিশেষজ্ঞরা কেউ তা এখনো পড়ে উঠতে পারেন নি (তা বলে বাঙলাদেশেও এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা তা জলের মতো পড়ে যাচ্ছেন। অন্যেরা যাই বলুন, তাঁদের মনে সন্দেহের অবকাশ নেই!)। ভারতের যে প্রাচীন লিপি এ-পর্যন্ত পাঠিত হয়েছে (জেমস্ প্রিনসেপ প্রথম তা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঠ করেন) তা অনেক পরেকার; তা হচ্ছে অশোক-অনুশাসনের লিপি—অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৬৯ থেকে ২৩২-এর মধ্যে তা লিখিত। অশোকের অনুশাসনসমূহ

প্রধানত উৎকীর্ণ হচ্ছিল যে-লিপিতে তাকে বলে "প্রাচীন ব্রাহ্মী" লিপি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শাহ্‌বাজগড়ী ও মনসেরা অনুশাসন লিখিত অন্য লিপিতে,—"খরোষ্ঠী" হয়তো তা সেই প্রান্তের লিপি। ব্রাহ্মী লেখা চলে বাম থেকে দক্ষিণে, খরোষ্ঠী (অনেক সেমিটিক লিপির মতো) দক্ষিণ থেকে বামে। আর দক্ষিণ ভারতের মৈশূরের অন্তর্গত য়েব্‌রাগুড়ি (মাত্র ১৯২৯এ এটি আবিষ্কৃত) অনুশাসনের লেখার এক পংক্তি বাম থেকে দক্ষিণে শেষ হয়েছে, পরের পংক্তি দক্ষিণ থেকে বামে এসে শেষ হয়েছে, তৃতীয় পংক্তি আবার বাম থেকে চলেছে দক্ষিণে ; এইরূপ বরাবর। (পণ্ডিতেরা কেউ কেউ অনুমান করেন—মোহেন-জো-দড়ো বা সিন্ধু-উপত্যকার লিপিও এইভাবেই চলত—গ্রীকরা যাকে বলেছে "বৌস্ট্রোফেদন" অর্থাৎ 'লাঙলটানা' রীতি, এ তা'ই। (দ্রষ্টব্য : "অশোক-লিপি", অমূল্যচন্দ্র সেন, পৃঃ ১৭)। খরোষ্ঠী লিপির উদ্ভব প্রাচীন সেমিটিক লিপির আরমাইক ধারা থেকে,—অনুমান হলেও এ কথা প্রায় সকলেই মানেন। ব্রাহ্মী লিপি বাম থেকে দক্ষিণে গেলেও আসলে তা ফিনিসিয়ার (সেমিটিক) কোনো লিপিরই বংশধর,—এই অনুমানে কিন্তু মতভেদ আছে। জন্ম যে-ঘরেই হোক, অশোকের সময়ে ব্রাহ্মীলিপি যে ভারতীয় জনসমাজের নিকট পূর্বে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে পরিচিত লিপি হয়ে গিয়েছে, অশোকের উৎকীর্ণ অনুশাসনই তার প্রমাণ।

অশোকের ব্রাহ্মী হল "প্রাচীন ব্রাহ্মী"—ভারতীয় লিপির তা প্রথম রূপ। এরই বিবর্তনে জন্মেছে বর্তমান ভারতীয় ভাষাসমূহের অধিকাংশের লিপি। এই "প্রাচীন ব্রাহ্মী" মোটের উপর দু-শাখায় বিভক্ত হয়—উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে। উত্তর ভারতে "কুশান" ও "গুপ্ত ব্রাহ্মী"তে তা রূপ লাভ করল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সেই "গুপ্ত ব্রাহ্মী"র শাখায় তারপর জন্মে (১) উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'শারদা' লিপি,—কাশ্মীরী, গুরুমুখী তারই বংশধর ; (২) মধ্যদেশে, রাজস্থানে নাগরী,—যার বংশধর (দেব) নাগরী, গুজরাতী, কৈথী ; (৩) পূর্ব ভারতে 'কুটিলা',—যার বংশধর বাঙলা, মৈথিলী, অসমীয়া, নেওয়ারী, ওড়িয়া প্রভৃতি লিপি।

নাগরী লিপির স্থান

এ-সব বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় লিপির মধ্যে নাগরীই সর্বাধিক বিস্তারলাভ করেছে। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের তা বরাবরই ছিল নিজস্ব লিপি ; গুজরাতেও তা'ই, তবে গুজরাতী নাগরী লেখায় 'মাত্রা' দেওয়া হয় না। কিন্তু এই প্রকাণ্ড অঞ্চলের বাইরে দক্ষিণ বিহারে (মৈথিল অঞ্চলেও মৈথিলী লিপির একচ্ছত্র প্রভাব নেই), পাঞ্জাবে (ভারত), এবং মহারাষ্ট্রে ও হিমালয় প্রদেশে, এবং নেপালে তা বিস্তারলাভ করেছে। এই লিপিই সংস্কৃত গ্রন্থাদি মুদ্রণে বেশি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য ভারতের বিভিন্ন ভাষীরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা নিজ নিজ অঞ্চলের লিপিতেই লিখতেন, যেমন, বাঙলায় আমরা সংস্কৃত লিখতাম বঙ্গলিপিতে, ওড়িষ্যাতে ওড়িয়ায়, তেমনি উত্তর প্রদেশে (কাশী তার অন্তর্ভুক্ত) লেখা হত নাগরীতে। নাগরীর জন্মক্ষণ থেকেই একটা প্রতিষ্ঠা ছিল ; কারণ তখন (৮ম—১১শ শতক) উত্তর ভারত জুড়ে রাজপুত রাজাদের প্রতিষ্ঠা। সাধারণত শৌরসেনী অপভ্রংশ (অবহট্‌ঠ) ছিল তাঁদের রাজভাষা আর নাগরী তাঁদের নিজ লিপি। এই প্রভাব সত্ত্বেও সংস্কৃত লেখা হত আঞ্চলিক লিপিতে। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ভারতবিদ্যাবিশারদ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা রোমক অক্ষরের সঙ্গে বিন্দু ও দাগ যোগ করে নিজেদের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তা প্রয়োগ করতেন। এখনো সেরূপ রোমক অক্ষরে সংস্কৃত লেখা সচল আছে, কিন্তু ভারতে অন্তত নাগরী অক্ষরে মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থই সুপ্রচলিত। তার একটা প্রধান কারণ—আচার্য ম্যাক্‌সমূলর যখন ঋগবেদসংহিতা প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন অনেক বিচার করে তিনি কাশীর লিপি হিসাবে নাগরীলিপিতেই তা প্রকাশ করলেন (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ)। অল্প পরে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় তিনটিও (১৮৫৭-৫৮) নাগরীকেই সংস্কৃতের প্রধানতম লিপি বলে স্বীকৃতি দিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত শিক্ষায় এই লিপি প্রচলনে যথেষ্ট সাহায্যদান করলেন। ফলে, নাগরী ক্রমেই

সংস্কৃতের প্রধানতম লিপি বলে সর্ব-ভারতের গ্রাহ্য হয়ে উঠল, দেবভাষার লিপি হিসাবে তার নাম তাই হয়ে দাঁড়াল 'দেবনাগরী'। 'সংস্কৃতের অক্ষর' বা 'দেবনাগরী' বলে অবশ্য অলীক ভক্তিতে গদ্‌গদ হবার কারণ নেই। কিন্তু আধুনিক ভারতের সর্বপ্রধান লিপি হিসাবে এবং ভারতীয় বিদ্যা-চর্চায় অপরিহার্য মুদ্রিত লিপি হিসাবে এখন নাগরীকেই ব্রাহ্মী লিপির প্রধান উত্তরাধিকারী বলতে হবে। একলিপি প্রসারের চেষ্টা করতে হলে তাই নাগরী লিপিবেই ভারতের সকল ভাষার লিপি করা যায় কিনা তা দেখতে হয়।

নাগরী ও বাঙলা লিপির তুলনা করলে আমরা দেখি, প্রথমত, নাগরী লিপি অনেক বেশি লোকের পরিচিত। দ্বিতীয়ত, দুই লিপিরই ত্রুটিসমূহ প্রায় সমান (এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করব); কিন্তু তারও মধ্যে মুদ্রিত নাগরী লিপি মুদ্রিত বাঙলা লিপির চেয়ে কম জটিল। তৃতীয়ত, মুদ্রিত নাগরী অক্ষরের বলিষ্ঠ শ্রী বাঙলা অক্ষরের চেয়ে বেশি। ভারতের অন্যান্য লিপির সঙ্গে তুলনায়ও নাগরী লিপির এরূপ উৎকর্ষ দেখা যাবে। অন্য সকল লিপিও ব্রাহ্মীর বংশধর, কিন্তু নাগরী তার যোগ্য বংশধর। এই কারণেই একলিপি প্রচারের প্রয়োজন বুঝে স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি মনস্বী বাঙালীরা নাগরী প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন, সেরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন।

কিন্তু রোমক লিপির মতো অ-ভারতীয় একটি লিপির সঙ্গে তুলনায় নাগরীর ত্রুটি অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় লিপির মতোই সুস্পষ্ট। (দ্রষ্টব্য: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, "এ রোমান অ্যালফ্যাবিট্ ফর ইণ্ডিয়া", জর্নাল অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব লেটার্স, ২৮৯ খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫)।

নাগরীর দোষত্রুটি

প্রথমত, রোমক লিপির অপেক্ষা নাগরী লিপি জটিল, এতে বিজ্ঞান-সম্মত সরলতা নেই। প্রাচীন ব্রাহ্মীও সরল ছিল, হয়তো উৎকীর্ণ লিপি বলেই তার ঋজুতাও দেখবার মতো, তার একটা ভাস্কর্যসুলভ দৃঢ়তা আছে। অশোকের অনুশাসনের আলোকচিত্র বা প্রতিলিপি থেকে পাঠক তা মিলিয়ে দেখবেন। বর্তমান প্রেসের অসুবিধা না ঘটিয়ে বলতে পারি, প্রাচীন ব্রাহ্মী + এর বংশধর 'क' বা ক থেকে নিশ্চয়ই সরল ও সুন্দর। O তেমনি তার পরিণতি ঠ বা ठ থেকে অনেক বেশি সহজ ও শোভন। অবশ্য রোমক লিপিও এ-সব দিকে অনেক বেশি বাহাদুরী।

দ্বিতীয়ত, লিপি-বিকাশের শ্রেষ্ঠ পরিণতি বর্ণলিপি বা অ্যালফ্যাবিটিক লিপি। কিন্তু ভারতীয় লিপি সম্পূর্ণরূপে সে-স্তরে এসে পৌঁছয়নি; তা এখনো স্বরবাহিত (সিলেবিক) লিপি বা অক্ষরমূলক লিপি হয়ে আছে। যেমন, ধর্ম আমরা উচ্চারণ করি—ধ্ + অ + র্ + ম্ + অ, কিন্তু লিখি—'ধর্ম'। অথচ রোমক লিপিতে বর্ণসমূহ যথাক্রমে ঠিকভাবে লিখতে হয়—d+h+a+r+m+a = dharma। রোমক লিপিতে স্বর ও ব্যঞ্জন প্রত্যেকটি বর্ণ নির্দিষ্ট হচ্ছে, যথাক্রমে লিখিত হচ্ছে, কিন্তু ভারতীয় লিপিতে 'অক্ষরই' মূল। যেমন, 'ধ' অক্ষর = 'ধ' বর্ণ + 'অ' বর্ণ, তা আমরা মনেও রাখি না। অন্যদিকে, যা 'ধর্মের' মূল ধারণা ('ধর' ক্রিয়া) তাও দ্বিভক্ত লিপিতে প্রচ্ছন্ন হয়—আমরা ভুলে যাই যে কথাটা √ ধর + ম; অক্ষর-লিপির নিয়মে ধারণা করি ধ + র্ম। লিপির এই বিভ্রাটে আসলে কথাটার রূপও আমাদের মনে বিকৃত হয়ে যায়। ভারতীয় অক্ষরের মধ্যে স্বরবর্ণের স্থানটা অত্যন্ত গৌণ; অ শব্দের আগে ছাড়া লিখিত হয় না, ব্যঞ্জনের মধ্যে মিলিয়ে যায়। অন্যান্য স্বরও ব্যঞ্জনের পিছনে পড়লে আপনার গুরুত্ব রক্ষা করতে পারে না, যেমন ই হয় ি; ঈ হয় ী; উ হয়ে কখনো নিচে (কু) কখনো মাঝে (রু) কখনো শূন্যে (শু) কখনো হুমকি দিয়ে মাথায় চড়ে (হু)—কী অবস্থা কখন করে তার ঠিকানা নেই।

তৃতীয়ত, প্রধানত অক্ষরমূলক (সিলেবিক) লিপি বলেই ব্রাহ্মীরও একটি ত্রুটি ছিল—তার ব্যঞ্জনবর্ণ সংযুক্ত হলে মিলেমিশে আরও একটি নতুন চিহ্নের সৃষ্টি করত। যেমন, বাঙলার স্ত ঞ্জ, ক্ষ,

ঙ্ক, ঙ্ক, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঙ্গ প্রভৃতি। এরূপে স্বরবর্ণ (অ ছাড়া) ব্যঞ্জনের পরে থাকলে নতুন আর-এক চিহ্ন দিয়ে সূচিত করতে হবে। সে-চিহ্ন কখনো বাঙলার সামনে ি, ে; কখনো পিছনে া, ী কখনো দু-ধারে ো; আর মাথায়, পায়ে, মধ্যখানে যেখানে যেমন পারে আশ্রয় করছে। লিপি-পণ্ডিতেরা বলেন, এ-ত্রুটি ব্রাহ্মী থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙলার লব্ধ। টেনে লেখার দায়ে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অশেষ দুর্গতি ঘটেছে প্রত্যেক ভাষার লেখায়। অথচ সেই টেনে লেখা কি ব্যাহত হয়নি যখন 'এক' লিখেছি উচ্চারণ অনুযায়ী, আর 'কে' লিখতে গিয়ে উচ্চারণ তুচ্ছ করে আগে লিখেছি পরের এ-কার, তারপরে লিখেছি ক কার। এখানে তাই অরাজকতা কায়েম হয়েছে। আশৈশব অনেক বেত খেয়ে, অনেক সময় ও শক্তির অপব্যয় করে, তবেই এই অনিয়মের রীতি আমরা মানতে পেরেছি। আমাদের ভাবী বংশধরদের এই অরাজকতা থেকে নিষ্কৃতি দান করাও আমাদের দায়িত্ব। তা ছাড়া এরূপ সংযুক্ত বর্ণমালা ও স্বরকণ্টকিত ব্যঞ্জন সমূহ দেখতেও কিম্ভূতকিমাকার; কোনো মুদ্রাকর তাদের কেটে-কুটে আর শোভন করতেও বিশেষ পারেন না। এবং উপযোগিতার দিক থেকে তারা পংক্তিতে একটু আয় বাড়ালেও উপরে-নিচে নেমে অনেক বেশি স্থানের অপব্যয় করে। ছোটো অথচ সুপাঠ্য হরফ সৃষ্টি এ-সব লিপিতে প্রায় অসম্ভব। আসল কথা, লেখায় যেমন হোক, সংযুক্ত বর্ণের এই প্রাবল্যে মুদ্রণ একটা কঠিন ব্যাপার হয়, আর টাইপ-করা একটা আজব কাণ্ড থেকে যায়। সাধারণত, রোমক ছাপায় দাঁড়িকমা ও সংখ্যা-চিহ্ন 1 থেকে 9—এই সমস্ত মিলিয়ে প্রেসের মুদ্রণের জন্য প্রয়োজন হয় ১৫২টি চিহ্নের (লাইনোটাইপে মাত্র ৯২টির)। ২৬টি আবার ক্যাপিটাল বা বড়ো হাতের হরফ। সেই ক্ষেত্রে বাঙলা হরফে দরকার হত: হ্যান্ড-কম্পোজ ৫৬৩টি চিহ্নের (৪৫৫টি খোপের)। এখনো লাইনোতে দরকার হয় ১২৯টি। নাগরী মুদ্রণেও প্রায় ৭০০ থেকে ৪৫০টি চিহ্নের প্রয়োজন। রোমক ও নাগরীর তুলনাটা সুনীতিবাবুর ভাষায় তাই "১৫২ মুদ্রাচিহ্ন বনাম ৪৫০ মুদ্রাচিহ্নের মামলা"। এ মামলায় প্রেস ও পাঠক, বিশেষত শিক্ষার্থী পাঠক কোন পক্ষে যোগ দেবেন তা কারো বুঝতে দেরি হয় না। কাজ কারবারে টাইপ-রাইটার, টেলি-প্রিণ্টার, শর্টহ্যাণ্ড প্রভৃতি যাঁরা চান তাঁদের বক্তব্যও সুবিদিত। যাঁর শ্রী ও শৃঙ্খলাবোধ আছে তিনিও আবার সে-পক্ষেই সায় দেবেন, তাও স্মরণীয়।

ভারতীয় বর্ণমালার বৈজ্ঞানিক বিভাগ

ভারতীয় লিপির স্বপক্ষে একটা বড়ো কথা বলবার আছে। তা এই যে, ভারতীয় বৈয়াকরণরা এই বর্ণমালাকে যেভাবে সাজিয়েছেন এবং আমরা যেভাবে এখনো তা মুখস্থ করি, শিখি—তা ধ্বনি বিজ্ঞান-সম্মত এক আশ্চর্য ব্যবস্থা। প্রথম স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ভাগ করে, ধ্বনির নিয়ম অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ বিভেদ তাঁরা করেছেন (আমরাও বলি হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ প্রভৃতি)। ব্যঞ্জনকে তাঁরা প্রথম কণ্ঠ্য (ক-বর্গ), তালব্য (চ-বর্গ), মূর্ধন্য (ট-বর্গ), দন্ত্য (ত-বর্গ), ওষ্ঠ্য (প-বর্গ), এই পাঁচ 'স্পর্শ'-বর্গে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক বর্গের মধ্যে আবার অঘোষ (আনভয়েস্‌ড, অল্পপ্রাণ ১ম বর্ণ, মহাপ্রাণ ২য় বর্ণ), ঘোষ (ভয়েস্‌ড, অল্পপ্রাণ ৩য় ও মহাপ্রাণ ৪র্থ বর্ণ) এবং অনুনাসিক (৫ম বর্ণ) ক্রমবিভাগ করেছেন। এরূপ ২৫টি স্পর্শ-বর্ণের পরে এল ৪টি অন্তঃস্থ বর্ণ (লিকুইড্‌স অ্যাণ্ড সেমিভাওয়েল্‌স) য, র, ল, ব, তারপরে ৪টি উষ্মবর্ণ শ, ষ, স, হ—স্পাইর‍্যাণ্ট। এরূপ বিজ্ঞানসম্মত বিভাগ পৃথিবীর অন্য কোনো বর্ণমালায় দেখা যায় না। রোমক বর্ণমালায় এ. বি. সি. ডি. প্রভৃতিতে এই বোধের চিহ্নও মিলে না।

অবশ্য অন্য কোনো লিপি গ্রহণ করলেও ভারতীয় লিপির এই শৃঙ্খলা (অ, আ, ক, খ প্রভৃতি) বা প্রচলিত বৈজ্ঞানিক বিভাগ, এবং তা উচ্চারণ করে শিক্ষার পদ্ধতি ('ক' এ হ্রস্ব ই 'কি') ভারত-বাসীর পক্ষে রক্ষা করা কষ্টসাধ্য নয়, আর তা করা আবশ্যক। এ-কথা সুনীতিবাবু বেশ জোর দিয়েই বারবার উল্লেখ করেছেন। তাই ভারতীয় ভাষা লেখার জন্য যদি আমরা রোমক লিপি গ্রহণ করি তাহলে আমাদের ছেলেরা ইংরেজির মতো এ. বি. সি.—এইক্রমে তা পড়বে না। লিখবে—a a',

k (a) kh (a) এবং পড়বে অ আ, ক খ। যখন ki লিখবে, তখন আমাদের নিয়মে বানান করবে ক-এ হ্রস্ব ই = কি ('কে-আই = কি' নয়); ব-এ 'আ'কার বা, তাতে অনুস্বার বাং, ল-এ 'আ'কার লা = বাঙলা (বলবে না বি-এ-এন-জি-এল-এ)। অর্থাৎ, রোমক বর্ণমালাকে ভারতীয় ধ্বনি-জ্ঞান ও ধ্বনিবিন্যাসের রীতিতে গ্রহণ করতে হবে।

রোমক লিপির বিরুদ্ধে আপত্তি

কিন্তু প্রশ্ন হবে তাতেই কি আমাদের কার্য সাধিত হবে? এই 'বাঙলা' লিখতে যে *a* ব্যবহার করলেন সেই রোমক *a* = বাংলা অ এবং আ, যখন যা খুশি। এবং *n* = ন, ঙ, যেমন খুশি। অর্থাৎ bangla = বংল, বাংল, বাংলা; এবং বন্‌ল, বন্‌ল, বন্‌লা, বান্‌লা—এই আটটি উচ্চারণের যে-কোনোটি। বলা বাহুল্য, এ-আপত্তি, সুপরিচিত। রোমক বর্ণের উচ্চারণও ইউরোপের একই ভাষায় এক-এক স্থলে এক-এক রূপ (তুলনীয়ঃ put but ছাড়াও c, g, th প্রভৃতির এক ইংরেজিতেও বিভিন্ন উচ্চারণ) এবং ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় কোনো কোনো বর্ণের উচ্চারণ একেবারে স্বতন্ত্র (বিশেষ করে 'j' বহু ভাষাতেই 'জ' নয়, 'য়'-জাতীয়)। তাই, ভারতে রোমক লিপি গ্রহণ করলে আমরা যথাসম্ভব সেই বিভ্রান্তি পরিহার করব। যেমন g আমাদের গ-ই বোঝাবে, জ নয়। বড়ো হাতের রোমক বর্ণগুলি (A B প্রভৃতি) একেবারে বর্জন করতেও আমাদের কিছুমাত্র বাধা নেই। আর 'a'-র সঙ্গে প্রয়োজনমতো বিন্দু বা দণ্ড বা মাত্রা বা উর্ধ্বকমা প্রভৃতি যোগ করে এবং রোমক লিপির লিখন-পদ্ধতি জটিল না করে তার উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট করতে পারব (যেমন, a = অ, a' — আ—যেভাবে পালি লেখা হয়, অথবা 'দীর্ঘ'-স্বরের জন্য মাত্রা রেখা, কিম্বা পার্শ্বে ঃ ডবল ফুট্‌কি। বিস্তৃত বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্ন হবে, রোমক লিপিকেও যদি এত পরিবর্তিত করতে হয় তা হলে নাগরী বা বাঙলা লিপিকে পরিবর্তিত করে কি সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না? এ-প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট। রোমক লিপির প্রকৃতি এক-ধ্বনিগত, আমাদের ভারতীয় লিপির প্রকৃতি স্বরবাহিত (সিলেবিক)। তারপরে, আ া, ি ই এবং সংযুক্ত বর্ণের বিলোপ বাঙলায় সুসম্ভব নয় (ধ্ অ র্ ম্ অ লেখা কি সম্ভব—ধর্‌ম পর্যন্ত যদি-বা এগোই?), আর তার বিলোপ করলেও সে-লিপি সুদৃশ্য বা সুপাঠ্য হবে না। ভারতীয় লিপি-নীতির ঘাড়ের উপর রোমক নীতি চাপানোর থেকে ধ্বনিসম্মত ভারতীয় চিহ্নযোগে রোমক লিপির 'শুদ্ধি' অনেক সুবিধাজনক।

অবশ্য রোমক লিপি গ্রহণের পক্ষে আরও আপত্তি আছে। যথা, তা বিদেশী। আমরা বিদেশী দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন-ড্যাশ গ্রহণের পক্ষে এখন আর আপত্তি করি না। তবে সমূল লিপিপরিবর্তনে গুরুতর আপত্তি থাকবে তা অনুমান করতে পারি, বিশেষত আমরা যখন মনে করি ওটা ইংরেজি লিপি। সে-ভুল ভাঙলেও ভাবি—ওটা ইউরোপীয় আধিপত্যের লক্ষণ। এটা ভুল না হোক, মিথ্যা ভয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ হুকুমতের সমস্ত কাজের জন্য এই রোমক লিপিই গ্রহণ করেছিলেন তা স্মরণীয়। তিনি ইউরোপীয় প্রীতিতে তা করেননি।

দু-এক জন অবশ্য ওঁ হ্রীং ক্লীং প্রভৃতিতে বীজমন্ত্র দেখেন, এখনো তাঁরা তা দেখবেন। তাঁদের কাছে ওগুলি লিপি নয়—প্রতীক। রোমক লিপি গ্রহণ করলে তাঁরা না হয় এখনকার মতো সেই প্রতীকই আঁকবেন, যেমন আঁকেন পটের মূর্তি।

কেউ হয়তো বলবেন, রোমক লিপি প্রবর্তন করলে আমরা পরে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থমালা আর রোমকে মুদ্রিত নাহলে পড়তে পারব না, আমাদের ঐতিহ্য ব্যাহত হবে। বলা বাহুল্য, বর্তমান বাঙলা মুদ্রিত লিপি জানলেও পাণ্ডুলিপির বাঙলা পড়া সহজসাধ্য নয়, প্রাচীন লিপি পড়া দুঃসাধ্য। প্রিন্‌সেপ সাহেব ব্রাহ্মীর চাবি কাঠি আবিষ্কার করার পূর্ব পর্যন্ত ভারতবাসী কি ঐতিহ্যভ্রষ্ট হয়ে ছিল? প্রাচীন লিপি গবেষক বা কৌতূহলী লোকরা বরাবর শিখবেন।

এক দল বলবেন, সোবিয়েত ইউনিয়ন তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নতুন ভাষায় যখন লিপি সৃষ্টি করলেন তখন তাঁরা রোমক-লিপিই গ্রহণ করেছিলেন, পরে তা ত্যাগ করে রুশ লিপিতে ফিরে গিয়েছেন। এঁদের মনে করতে বলি—চীন, সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে বিশেষ কারণে রোমক লিপি গ্রহণে বাধা ছিল ; সে-বাধা আমাদের নেই। সোবিয়েত দেশে রুশ, উক্রাইন, বায়লোরুশ প্রভৃতি জাতিরা ১৮ কোটির মধ্যে ১২ কোটির মতো, তারা রুশ লিপির সঙ্গে সুপরিচিত। রুশভাষীর সংখ্যাধিক্য, তাদের উদ্যোগ ও ব্যাপ্তি এবং রুশ ভাষার ঐশ্বর্য প্রভৃতির জন্য সোবিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অন্য শ-দেড়েক ভিন্নভাষীর পক্ষে রুশ ভাষা সহজেই আদান-প্রদানের ভাষা হয়ে উঠেছিল, রুশ-লিপিও সহজেই চেনা হয়ে যায়। তাই, কোনো ছোটো জাতি রোমক লিপিতে তাদের ভাষা নতুন করে লিখতে শুরু করলেও নিজের গরজেই তাদের আবার রুশ-লিপিও শিখতে হয়। একমাত্র পণ্ডিত বা গবেষক ছাড়া আর কারো রোমক লিপি শিখে কোনো লাভ হয় না। সেখানে তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে রুশ-লিপিতে নিজের ভাষা শেখা বাঞ্ছনীয়, বিশেষ করে রুশ-লিপি যখন রোমক লিপির মতোই ধ্বনিসম্মত লিপি।

রোমক গ্রহণের নীতি ও পদ্ধতি

আসল কথাটা তাহলে এই ঃ—একলিপি গ্রহণ যদি বাঞ্ছনীয় হয়, তাহলে ভারতীয় লিপির মধ্যে নাগরী লিপিই গ্রহণযোগ্য। বলা বাহুল্য, বর্তমান অবস্থায় অন্তত বাঙলা ভাষায় বাঙলা লিপির পরিবর্তে নাগরী লিপি প্রবর্তিত করা বিষম দুর্বুদ্ধি হবে। কারণ, তা করলে পূর্ববঙ্গের বাঙালীরাও উর্দু (আরবী-ফারসী) লিপির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন। দুই বাঙলায় বাঙলা দুই লিপিতে লিখিত হলে বাঙালীর দুর্ভাগ্য ষোলকলায় পূর্ণ হবে। কাজেই বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সংস্কৃতির প্রতি যাঁদের মমতা আছে, তাঁরা বাঙলায় নাগরী লিপি গ্রহণে নিশ্চয়ই সম্মত হবেন না। বাঙলা লিপির পরিবর্তে রোমক লিপি গ্রহণ করলে পূর্ব বাঙলার বাঙালীরাও ক্রমশঃ তা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হবেন, আশা করা যায়। অন্তত রোমক লিপির স্বীকৃতিতে আরবী-ফারসী লিপির বিরুদ্ধে পূর্ববাঙলার বাঙালীর বিরোধিতা দুর্বলীকৃত হবে না। কিন্তু একলিপি গ্রহণের অর্থ যদি হয় লিপি-সারল্য, বৈজ্ঞানিক ও বৈষয়িক ব্যাপারের উপযোগী লিপি গ্রহণ,—তাহলে রোমক লিপিই গ্রাহ্য। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত হলেও আপাতত বহুলস্বীকৃত নয়। দেশের শিক্ষিত সমাজেও এখনো এই বোধ বিস্তারলাভ করেনি বলেই আমাদেরও এখনো এত বাগ্‌বিস্তার করতে হয়। (বাঙলা দেশে "ভারত-রোমক সমিতি" এ-প্রস্তাব দেশের সম্মুখে উত্থাপন করেছেন ; সে-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র নাথ শেঠ মহাশয়।)

রোমক লিপির দাবি যদি স্বীকৃত হয় তাহলেও তা প্রচলিত করা অবশ্য একটা সমস্যা হবে—তা হবে শাসক ও শিক্ষিত সাধারণের বুদ্ধি ও উদ্যোগের বিষয়। আর, তারও পূর্বে তার সর্বসম্মত ভারতীয়-রূপায়ণও হবে পণ্ডিত ও মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞদের আলোচনা ও নির্ধারণের বিষয়। সে বিষয়েও তাঁরা দু পক্ষই সাহায্য পাবেন ভারত-রোমক সমিতির থেকে, এবং এখনো বিচারবিবেচনার উপযোগী প্রস্তাব পেতে পারেন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত এ-বিষয়ের প্রবন্ধাদি থেকে। সে বিশদ আলোচনার বিস্তৃত উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়, তবু প্রধান কথাটি না জানলে পাঠকের সংশয় যাবে না, ধারণা সম্পূর্ণ হবে না।

রোমক লিপি অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে চলছে। এখন তা পালি লিপিতে, প্রাকৃতে, কতকাংশ সংস্কৃত লিপ্যন্তরে এবং 'রোমান উর্দু' নামের হিন্দুস্থানী লেখায় সচল। পূর্বেই বলেছি, আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রোমক লিপি নিয়ম বেঁধে প্রবর্তন করতে হলে আমরা গ্রহণ করব ঃ (ক) সহজ ও সরল রোমক বর্ণসমূহকে (খ) ভারতীয় ভাষার প্রয়োজনে যথা-সম্ভব স্পষ্ট চিহ্নযোগে তা পরিবর্তিত করে, এবং (গ) ভারতীয় ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক বর্ণক্রম অনুযায়ী এই নতুন রোমক বর্ণাবলীর ক্রম ও বিন্যাস সাধন করে।

এই মূলনীতি স্বীকার করে বুঝতে হবে তা প্রবর্তনের সর্বাধিক সুষ্ঠু পথ কী? তা সংক্ষেপে —লোকমত গঠন করা, লোকসম্মতি গ্রহণ করা এবং তারপর যথাসম্ভব কম বিরক্তি উৎপাদন করে তা ধীরে ধীরে প্রবর্তন করা। সুনীতিবাবু (১৯৩৪-এ) মনে করতেন তা সম্পূর্ণ হবে ৫০ বৎসরে। কিন্তু পৃথিবীতে পরিবর্তন আজ আসে বৈপ্লবিক ত্বরায়; কাজেই অবস্থান্তর ঘটলে এই লিপ্যন্তরও অনেক ত্বরিত গতিতে জনসাধারণও মেনে নিতে পারে। জনতার বৈপ্লবিক চেতনার উপরই তা নির্ভর করবে। আপাততঃ 'নাগরীর জন্য নাগরী' লেখকদের তাড়া আছে, রোমকের বিরুদ্ধে এ আপত্তিই প্রবল। এ কথা মনে রেখে বলা যায়, এখনকার কাজ প্রচার; এবং প্রথমে শিশু-শিক্ষার্থীদের উপর রোমক লিপি গ্রহণের চাপ না দিয়ে বরং প্রথমে যারা এই লিপি জানে সেই উচ্চশিক্ষিতদেরই তা কোনো বিশেষ ব্যাপারে ভারতীয় ভাষায় প্রয়োগ করতে রাজী করানো। বিশ্ববিদ্যালয়ে, সার্ভিস পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষার প্রশ্নোত্তর রোমক লিপিতে দাবি করা চলতে পারে; সাময়িক পত্রে অন্য ভাষার উদ্ধৃতি এই লিপিতে দেওয়া চলে; ক্রমে উচ্চশিক্ষার দেশীয় ভাষায় রচিত সমস্ত পুস্তকই এভাবে মুদ্রিত করা সম্ভব। এ-সব প্রচলিত হলে তারপরে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা বিকল্পে রোমক শিখবে—তার পূর্বে নয়।

ভারতীয় রোমকের রূপ

পরিবর্তিত রোমকলিপি কিরূপ হবে এখন সেই প্রশ্ন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সর্ব-শেষ ("ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা", পরিশিষ্ট খ) প্রস্তাব এই দিকে বিচার্য। আমরা তার নমুনা এখানে দিচ্ছি।

স্বরবর্ণ

a	a´	i	i´	u	˜u´	e	a-i	o	o-u
স্বরে অ	স্বরে আ	হ্রস্ব ই	দীর্ঘ ঈ	হ্রস্ব উ	দীর্ঘ ঊ	এ	ঐ	ও	ঔ

ব্যঞ্জন বর্ণ

k	kh	g	gh	n
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
c	ch	j	jh	n´
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
t'	t'h	d'	d'h	n'
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
t	th	d	dh	n
ত	থ	দ	ধ	ন
p	ph	b	bh	m
প	ফ	ব	ভ	ম
y	r	l	w	s´
য	র	ল	অন্তঃস্থ ব	শ
s'	s	r'	r'h	h
ষ	স	ড়	ঢ়	হ

আর বেশী বিরক্ত না করে এই আলোচনার গোড়ার কয়েক লাইন নতুন হরফে দেওয়া হল, পড়তে নিশ্চয়ই বেগ পেতে হবে,

Bha´ratbars'a bahuja´tır o bahubha´s'a´. des´. ei bira´t' des´er naba-gat'hita ra´s't'ra o pa´kista´ner a´bhyantari´n' a-ikya ta´i stha´y-bha´be gat'han kara´ sambhab ekma´tra gan'ata´ntrik paddhatite—pratyek ja´tır o bha´s'a´r a´tmabika´s´er pu´rn'atama adhika´r-i habe ta´r bhitti.

কার্তিক, ১৩৬০ বাং

রাষ্ট্রভাষা-বিভ্রাট

আধুনিক ভারতে বাঙালীর মত অদৃষ্টের পরিহাস বোধ হয় আর কাউকে সইতে হয় না। ঊনবিংশ শতকে আমরা বাঙালীরা একটা মহান্ আদর্শকে ভারতবর্ষের সামনে স্থাপিত করেছিলাম, সে আদর্শ—স্বাধীনতা। সেই আদর্শেরই দায়ে আমরা আরও দুটি জিনিসকেও প্রয়োজন হিসাবে অনেকাংশে মেনে নিয়েছিলাম। একটি ভারতের জাতীয় সংহতি (নেশন-গঠন), অন্যটি সেই জাতীয় ঐক্যের সহায়করূপে হিন্দী ভাষার প্রসার। ভূদেব, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র এই জন্য হিন্দীকে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ভারতীয় ভাষা মনে করেছেন। এ এক অদ্ভুত নিয়তি যে, স্বাধীনতা এল বাঙালী জাতিকে প্রথম দ্বিখণ্ডিত করে, তারপর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। আর আজ ভারতের জাতীয় সংহতি ও হিন্দীর প্রতিষ্ঠাও ঘটেছে সেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাঙালী জাতিকে আরও ব্যাহত, হয়ত বা বিলুপ্ত করে। বাঙালীর জাতীয় সত্তাকে বিলুপ্ত করে যে ভারতীয় জাতীয় সংহতি গঠিত হবে, এ কথা অবশ্য আমরা পূর্বেও কোনদিন মনে করিনি। অস্পষ্টভাবে হলেও তখনো আমরা জানতাম বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হল ভারত-জীবনের বৈশিষ্ট্য; এবং ভারতবাসী অর্থে ঠিক এক 'নেশন' নয়, বহু জাতি নিয়ে এক 'মহাজাতি'। ভারতবর্ষ 'নেশন-স্টেট'-রূপে গঠিত হবে না, 'মহাজাতীয় রাষ্ট্র' বা মাল্‌টি-ন্যাশানাল স্টেটরূপে বিকশিত হবে। আমাদের ভারত রাষ্ট্রের কর্তারা কিন্তু ভারতকে এক-নেশন রূপে রূপায়িত না করতে পারলে অস্বস্তি বোধ করছেন—ভারতীয় মহাজাতি ও মহাজাতীয় রাষ্ট্রের স্বরূপ তাঁরা বুঝতে অক্ষম বা অস্বীকৃত। ক্ষোভের বশে আমরাও তাই এখন ভারতীয় ঐক্য ও মহাজাতীয় সংহতির কথা ভুলতে বসি, তার প্রমাণ এ মুহূর্তে অনেক পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে, হিন্দীর ও হিন্দীবাদীদের উগ্রতা ও আস্ফালন দেখে মনে করি—রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দীর পরিবর্তে ইংরেজিকেই অব্যাহত রাখা শ্রেয়ঃ। সম্প্রতি (১৯৫৫) 'সরকারী-ভাষা কমিশন' কলিকাতায় এসে দেখে বিস্মিত হলেন যে, বাঙালী মনস্বীরা একবাক্যে (?) চাইছেন শিক্ষায়-দীক্ষায়, সরকারী কাজকর্মে ইংরেজির চিরস্থায়িত্ব।

নতুন ইংরেজি-মোহ

হিন্দী সম্পর্কে ভূদেব, কেশব প্রভৃতির যে আস্থা ছিল আমাদের আজ আর তা নেই। হিন্দীর প্রতি আমাদের এই বিরূপতার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমত, হিন্দী ভাষা এখনো একটা সুস্থির ভাষা-রূপ গ্রহণ করেনি। হিন্দী-হিন্দুস্থানী-উর্দু এই ত্রিরূপের মধ্য থেকে কোন্ বিশেষ রূপকে আশ্রয় করে 'হিন্দী' বিকশিত হবে, কি করে ভারতের অন্যান্য ভাষার থেকে শব্দ আহরণ করে তা আবার (সংবিধান অনুযায়ী) 'রাষ্ট্রভাষা' হবে, তা অনিশ্চিত। অন্যদিকে, বর্তমান হিন্দী ভাষার শক্তি ও সামর্থ্য এখনো বহু পরিমাণে অপরিণত। দ্বিতীয়ত, বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দীবাদীরা নিজেরাই বাধাস্বরূপ। কারণ, তাঁরা সকলে হিন্দীভাষী নন, যথা,—বিহার, রাজস্থান, পঞ্জাব ও পাহাড়ীয়া অঞ্চলে হিন্দী শুধু শিক্ষিতরাই শিখেন, হিন্দী তাঁদের মুখের ভাষা নয়, 'কুলট্-স্প্রাখে' বা পড়ে শেখা ভাষা। অথচ বৃহত্তম গোষ্ঠী হিসাবে এই নানা ভাষী হিন্দীবাদীরা সব সময়ে ভাষার প্রশ্নে সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেননি। এমন কি, নিজেদের 'হিন্দী' গোঁড়ামির সঙ্গে তাঁরা 'স্বাজাত্যের' নামে এক মধ্যযুগ-সুলভ সাংস্কৃতিক গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাই আমরা বাঙালীরা অনেকেই মনে করি—ইংরেজি ভাষার সহায়তায় আমরা আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে যে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছি, হিন্দী ভাষা ইংরেজির স্থান নিলে এই হিন্দীবাদীদের সংকীর্ণতা আমাদের মধ্যযুগের দিকে আবার টেনে নিয়ে যাবে, কূপমণ্ডূক করে তুলবে।

এ বিষয়ে আমরা যা ভুলে যাই তা হচ্ছে এই—আধুনিক চিন্তাজগতের চাবিকাঠি ইংরেজের একচেটিয়া নয়। ফরাসী ও জার্মান ভাষা কেন, রুশ ও জাপানী ভাষারও হাতে তা আছে। আর কাল চীনা ভাষা যে তা আয়ত্ত করবে, তাও নিশ্চয়। বাঙলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, মরাঠী প্রভৃতি আধুনিক ভারতের প্রধান ভাষাগুলিই বা তা ক্রমশঃ আয়ত্ত করতে পারবে না কেন? তবে যতক্ষণ আমাদের ভাষায় এরূপ চাবি আয়ত্ত না হয় ততক্ষণ একদিকে তা আয়ত্ত করবার জন্য আমাদের ভাষার উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যদিকে ইংরেজি দিয়েই তার প্রয়োজন সিদ্ধি করতে হবে,—এইটিই হল স্বাজাত্যের খাঁটি পথ। এই দু'দিকের কাজ এক সঙ্গেই হতে পারে, এবং এক সঙ্গে না হলে মূলপ্রয়াস সার্থক হবে না, তাও আমাদের বোঝা উচিত। কারণ, ইংরেজির কৃপায় আধুনিক চিন্তার জগতে প্রবেশ করতে পেরেছে ও পারবে মাত্র দেশের শতকরা দু'দশ জন,—এখনো শতকরা ২জনও তা করে নি। কিন্তু আধুনিক মনোভাব সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হতে পারে একমাত্র জনসাধারণের নিজেদের ভাষার মারফতে। অর্থাৎ বাঙালীর মধ্যে বাঙলায়, হিন্দীভাষীদের মধ্যে হিন্দীতে, মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে মরাঠীতে, এরূপে। আধুনিক মনোভাব সমাজে ব্যাপ্ত না হলে একালে কোনো সমাজ উন্নত হয় না। আমরা ভুলে যাই জনসমাজে আধুনিক মনোভাব তাযা ততটা দ্রুত প্রচলিত হবে না যত দ্রুত ও যত ব্যাপকভাবে তা প্রবর্তিত করে আধুনিক জীবন যাত্রা,—কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যান-বাহন, এক কথায় শিল্পায়ন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন ও ডিমোক্রাটিক রাষ্ট্র-পদ্ধতিতে। যে মধ্যযুগীয় মনোভাব ইংরেজি দূর করতে পারেনি দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সত্যই প্রচলিত হলে তা নিঃসন্দেহে বিলুপ্ত হতে থাকবে। হিন্দী ভাষাও তখন মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছেড়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করবে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রয়াসে নিশ্চয়ই এ পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা যায়। কিন্তু ভাষা সেপক্ষেও একমাত্র বাহন নয়; অন্তত বিদেশী ভাষা দিয়ে জনগণের চেতনা প্রভাবিত করা যায় না।

আসলে আমাদের ইংরেজির প্রতি যে নতুন করে মোহ দেখা দিচ্ছে তার একমাত্র কারণ ইংরেজির অতুলনীয় প্রভাব ও শক্তি নয়; বরং সাম্রাজ্যবাদী আমলের অভ্যস্ত ইংরেজি-ভক্তি ও বর্তমান হিন্দী-বাদীদের সেই সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতিতে হিন্দীকে ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত করার উগ্র চেষ্টা। কিন্তু হিন্দী প্রতিক্রিয়াবাদীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমরা যদি ইংরেজির অতিভক্ত হয়ে উঠি, তা হলে আমরা পরোক্ষে হিন্দী-প্রতিক্রিয়াবাদীদেরই শক্তিবৃদ্ধি করব।

হিন্দীর চলতি হিসাব

হিন্দী-প্রতিক্রিয়াবাদীরা যা বুঝতে চান না তা এই যে, হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হবার মত কতকগুলো দাবী থাকলেও হিন্দী ইংরেজির মত উন্নত ভাষা নয়। ইংরেজির মত সাংস্কৃতিক ও বিশ্বজনীন প্রতিপত্তি সঞ্চয় করতে হিন্দী (বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা) যতক্ষণ না পারে, ততক্ষণ বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ইংরেজিকে ভারতীয় জীবনে স্থানদান করতে হবে। এবং শেষ পর্যন্তও হিন্দী বহুদিকেই ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় কথা যা হিন্দী-প্রতিক্রিয়াবাদীরা বিস্মৃত হন তা এই যে, যে-যে ক্ষেত্রে ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয় সেই সব ক্ষেত্রেও হিন্দীর প্রবর্তন ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদীদের পদ্ধতিতে করা যায় না। ভারতবর্ষ ইংরেজের বিজিত সাম্রাজ্য ছিল, হিন্দীবাদীদের তা 'সাম্রাজ্য' নয়। এই সত্য না বুঝলে ভারতের অন্যভাষীদের তাঁরা হিন্দী-প্রসারের বিরোধী করে তুলবেন এবং হিন্দীর যতখানি প্রসারের স্বাভাবিক সম্ভাবনা আছে তাও বিপন্ন করবেন। স্বাভাবিক-ভাবে হিন্দীর প্রসারের কি কি কারণ আছে তা আমরা পরে উল্লেখ করছি। হিন্দীবাসীদের পক্ষে বর্তমানে প্রধানতম উদ্যোগ হওয়া উচিত—ভারতের অন্যভাষীদের মন থেকে 'হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদ' বা উপর থেকে চাপানো ভাষা বলে হিন্দীর সম্বন্ধে যে বিরূপতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার নিরাকরণ করা। এই

জন্য সংবিধানে ১৯৫৬ থেকে হিন্দী প্রচলনের যে সব ধারা প্রণীত হয়েছে তার পুনর্বিবেচনা ও যথারীতি সংশোধন প্রয়োজন।

তাই তৃতীয় কথা যা হিন্দীবাদীদের এবং ভারতীয় শাসক শ্রেণীর বোঝা দরকার তা এই যে, (১) 'রাষ্ট্রভাষা' ও 'জাতীয় ভাষা' এক কথা নয়; (২) হিন্দীই শুধু 'জাতীয় ভাষা' নয়, ভারতরাষ্ট্রে আরও ১১।১২টি 'জাতীয় ভাষা' আছে; (৩) হিন্দীকে যে 'রাষ্ট্রভাষা' বলা হয় সেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবেও ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে হিন্দীর প্রয়োজন সীমিত। প্রথমত, ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট বা কেন্দ্রীয় সরকারেরই (১৯৫৬ থেকে) তা রাষ্ট্রভাষা; কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য-সরকারেরও হিন্দী সর্ববিষয়ে একমাত্র ভাষা নয়, প্রধানতম গ্রাহ্য ভাষামাত্র। বাঙলা, মরাঠী, তামিল প্রভৃতি 'রিজিওনাল' ভাষাও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অগ্রাহ্য নয়, তবে দপ্তরের কাজেকর্মে সে সব অব্যবহার্য মাত্র। সরকারী কোনো কোনো বিভাগে অবশ্য ইংরেজি এখনো বর্জিত হতে পারে, কিন্তু আইন-কানুন প্রভৃতি কোনো কোনো বিষয়ে ইংরেজির পরিবর্তে কোনো ভারতীয় ভাষার ব্যবহার বেশ বিলম্বিত হবে। তার কারণ দুর্বোধ্য নয়। যেমন, শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে ভারতীয় ভাষাব ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানেও হিন্দীর নেতৃত্ব সকলে স্বীকার করছে না। যেভাবে বর্তমানে হিন্দী-ধুরন্ধররা পরিভাষা প্রণয়নে বা কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় হিন্দী-গ্রন্থ প্রণয়নে ও প্রকাশে অগ্রসর হচ্ছেন, তা অন্য-ভাষীদের নিকট প্রায়ই হাস্যকর ও আপত্তিজনক। অর্থাৎ যে-সব ক্ষেত্রে ইংরেজি পরিত্যাগ করা সম্ভব সে-সব ক্ষেত্রেও ভারতীয় প্রধান ভাষাসমূহেরই প্রতিষ্ঠা ঘটছে এবং ঘটবে, হিন্দীর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হচ্ছে না এবং হওয়া বর্তমান অবস্থায় বাঞ্ছনীয়ও নয়। কার্যত (এবং আইনত?) হিন্দী ভারতের প্রধানতম রাষ্ট্রভাষা, কিন্তু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা নয়, একথা তাই পরিষ্কার করে বোঝা উচিত।

প্রাথমিক সমাধান

এ অবস্থায় ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রেও এখন যা প্রধান প্রয়োজন তা হচ্ছে ভাষা-বিরোধের স্বাভাবিক সমাধান। যেমন, প্রথমত ভারতের সকল ভাষাভাষীকে তাঁদের 'আঞ্চলিক ভাষায়' আত্মপ্রকাশের সুবিধা দান। আসলে এই ভাষাগুলিই ভারতের জাতীয় ভাষা—তেলেগু, মরাঠী, বাঙলা, প্রভৃতি,—যা মহাজাতির অন্তর্গত প্রধান জাতিদের ভাষা। ভারতীয় লোকসভায় বা রাষ্ট্রসভায়ও সেই প্রত্যেকটি প্রধান ভাষার স্বীকৃতি দান প্রয়োজন। মন্ত্রীদের কারও বক্তৃতা হিন্দীতে (বা ইংরেজিতে) প্রদত্ত হলে (সভ্যরা দাবী করলে) 'আঞ্চলিক ভাষায়' তার অনুবাদ অবিলম্বে সরবরাহ করা উচিত (ইউ, এন-এর মত লিখিত বিবৃতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদের ব্যবস্থা মোটেই অসাধ্য কর্ম নয়)।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় দপ্তরে হিন্দী, বাঙলা, তামিল প্রভৃতি লেখায় ও অনুবাদে 'আরবী' (ইংরাজিতে প্রচলিত) সংখ্যা চিহ্ন (1, 2 প্রভৃতি) ও রোমক লিপির ব্যবহার, এবং ক্রমে ভারতের সর্ব-ভাষায় সেইরূপ সংখ্যা চিহ্ন ও রোমক লিপির প্রচলন। লিপির বৈষম্য এরূপে ঘুচে গেলে ভাষার বৈষম্য একদিক দিয়ে এত দুস্তর ঠেকবে না।

সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন—এটি তৃতীয় কথা—একটি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ট্রানস্লেশন সার্ভিস বা অনুবাদ বিভাগের প্রবর্তন—যারা ভারতের একটি ভাষা থেকে আর একটি ভাষায় অনুবাদ অগোণে সাধিত করবে এবং ইংরেজি প্রভৃতি ভাষা থেকে দেশীয় ভাষায় ও দেশীয় ভাষা থেকে ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষায়ও অনুবাদ করবে। এ বিভাগের এক শাখার কাজ হবে শাসন-সংক্রান্ত চিঠিপত্র, বিবৃতি, বক্তৃতা প্রভৃতির অনুবাদ দেশীয় নানা ভাষায় সাধন করা; অন্য শাখার কাজ হবে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আদান-প্রদান সহজ-সাধ্য করা। প্রয়োজন মত ব্যবসায়ীরাও এরূপ অনুবাদক আপিসের সাহায্য নেবেন, তা বোঝা যায়। অবশ্য এ বিভাগের আপিস দিল্লী কেন, বর্তমানের প্রচার বিভাগের মত দেশের প্রত্যেকটি জিলা কেন্দ্রেই তা

বিস্তৃত হওয়া উচিত। সে সবের বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, এরূপ অনুবাদবিভাগ স্থাপন স্থির হলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আই-এতে, বি-এ'তে ভাষা-পাঠীদের জন্য বিশেষ কোর্স প্রণয়ন করতে পারে—যাদের ইতিহাস, পৌরবিদ্যা প্রভৃতির পরিবর্তে মাতৃভাষা ইংরেজি, হিন্দী ছাড়াও এক-একটি স্বতন্ত্র ভাষা পাঠ ও আয়ত্ত করা প্রয়োজন হবে। অনুবাদ বিভাগে চাকরির সম্ভাবনা থাকলে এরূপ ভাষা শিক্ষার্থী ছাত্রের অভাব হবে না।

হিন্দীর ভবিষ্যৎ

শেষ কথা, আমরা বাঙালীরা যেন বিস্মৃত না হই যে, ভারতবর্ষে হিন্দী শুধু শাসকের বিধানেই প্রসারিত হচ্ছে না, স্বাভাবিকভাবেই নানা সূত্রে প্রসারিত হচ্ছে। যেমন, ভারতের গুজরাতী মাড়োয়ারী প্রভৃতি ধনিক ও বণিকশ্রেণী তাদের ব্যবসায়-গত স্বার্থেই একটি সর্বভারতীয় ভাষা চায়, এবং সেই কারণে হিন্দী-প্রচারে উদ্যোগী। ভারতের শ্রমশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীও ক্রমশই এক ধরণের হিন্দুস্থানী ভাষা আশ্রয় করে 'বাজারীয়া হিন্দী' বলছে এবং সেই সূত্রে হিন্দী ভাষার বাহক হচ্ছে। তাই ভারতের শিল্পায়ন যতই অগ্রসর হবে ততই ভারতীয় জনগণের যোগাযোগ নিবিড়তর হবে, বিভিন্ন-ভাষী ভারতীয় জনগণের একত্র বসবাস বৃদ্ধি পাবে, এবং এই বিভিন্ন ভাষীদের মধ্যে হিন্দী উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করবে। তা ছাড়া, আমরা নিজেরাও জানি—আমাদের মহাজাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্যও একটি ভারতীয় ভাষার সহায়তা লাভ করা সুবিধাজনক, এবং একটি বা দু'টি ভারতীয় ভাষার পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই সেরূপ বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। হিন্দী ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার পক্ষে এই সৌভাগ্য লাভ সম্ভব হবে না, তাও আমরা জানি। কিন্তু সেই সুস্থির পরিণামে পৌঁছবার জন্য শাসকগোষ্ঠী জোর করে হিন্দীকে প্রসারিত করতে গেলে হিন্দীর প্রসারের পথে বাধা জুটবে বেশি, তার শক্তির অপব্যয় হবে অধিকতর, এবং ভারতীয় সামাজিক ও সংস্কৃতিক জীবনের বিকাশও ব্যাহত হবে।

মহাদেশের মত বিরাট এই দেশে একটি 'রাষ্ট্রভাষা' গড়ে উঠতে যদি বিশ পঞ্চাশ কেন, একশত বৎসরও লাগে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ফাল্গুন, ১৩৬০ বাং

বাঙলা সাহিত্যের পটভূমি

জাতি ও সংস্কৃতির প্রধান এক আশ্রয় ভাষা। ভাষার প্রথম সার্থকতা সামাজিক যোগাযোগে, কিন্তু ভাষার চরম সার্থকতা সাহিত্য-সৃষ্টিতে। আধুনিক ভারতবর্ষে বাঙলা ভাষার এবং বাঙালী জাতিরও প্রধান গৌরব বাঙলা সাহিত্য। বিশ্ব সাহিত্যের মানদণ্ডে তার বিচার করা চলে; তাতেও বাঙলা সাহিত্য একেবারে অগ্রাহ্য হবে না। অথচ ভারতবর্ষের অন্য কোনো ভাষার সাহিত্যের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলবে কিনা সন্দেহ।

এই বাঙলা ভাষাকে অবলম্বন করে প্রায় হাজার বৎসরের ঊর্ধ্বকাল ধরে বাঙালী জাতি গড়ে উঠছে। হয়ত তার সূচনা হয়েছিল পাল সম্রাটদের কালেই (আনুমানিক খ্রীঃ ৭৫০—খ্রীঃ ১,১০০)। সেন রাজাদের কালে (আনুমানিক খ্রীঃ ১১০০—খ্রীঃ ১২০২) বাঙালী জাতির সে বৈশিষ্ট্য আরও বিকশিত হয়। অবশ্য মৈথিলী থেকে বাঙলার পার্থক্য স্থির হয়ে আরও শত দুই বৎসর পরে; ওড়িয়া থেকে তার কিছু পরে, অসমীয়ার থেকে বাঙলার পার্থক্য আরম্ভ হল আরও পরে—আনুমানিক তিনশত সাড়ে তিনশত বৎসর আগে। হাজার বৎসর আগে যে বাঙালী জাতি গড়ে উঠতে যাচ্ছিল তার নিজের ভাষায় যে সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় সে হচ্ছে সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের 'চর্যাপদ'—তা সাধনতন্ত্রের গুহ্য-গীতি। প্রায় খ্রীঃ ৯০০—খ্রীঃ ১২০০ এর মধ্যে তা লেখা; ওড়িয়া-মৈথিলী অসমীয়া তখনো স্বতন্ত্র হয় নি। অত পুরনো জিনিস অন্য কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষারও আর নেই।

বাঙলা সাহিত্যের এই প্রাচীন যুগ বা প্রথম যুগ (আঃ খ্রীঃ ৯০০—খ্রীঃ ১,২০০) শেষ হয় তুর্ক-আক্রমণে। তারপরে আসে একটা যুগসন্ধিকাল—খ্রীষ্টাব্দ প্রায় ১ ২০০ থেকে খ্রীষ্টাব্দ ১,৩৫০ অব্দ কিংবা খ্রীষ্টীয় ১,৪৫০ অব্দ পর্যন্ত। এ সময়ে আমরা বাঙলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন পাই না। তার পূর্বে আমরা পাই 'চর্যাপদ'; আর বাঙলায় না হলেও সংস্কৃতে ও অপভ্রংশে লেখা তখনকার বাঙালী কবিদের সাহিত্য রচনারও প্রচুর পরিচয় সুরক্ষিত রয়েছে। তারপরে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ থেকে আমরা চৈতন্য পূর্ব বাঙলা সাহিত্যের প্রকাশ লক্ষ্য করতে পারি। সে পর্বের প্রধান কবি হচ্ছেন বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিপ্রদাস পিপলাই, হয়ত বা বিজয় গুপ্তও। কিন্তু খ্রীঃ ১,২০০ থেকে খ্রীঃ ১,৩৫০ কেন, প্রায় খ্রীঃ ১,৪৫০ পর্যন্ত আমরা বাঙলা দেশে না পাই কোনো বাঙলা রচনার প্রমাণ, না পাই কোনো অন্যবিধ রচনার নিদর্শন। এজন্য একালকে বলা যায় 'অন্ধকার কাল'।

রাজনৈতিক হিসাবে এই কালটা হল তুর্ক-আক্রমণের ও তুর্ক বিজয়ের কাল—আর এটা সামাজিক 'আপৎকাল'। এই দেড়শ' বা আড়াই শ' বৎসর বাঙলা সাহিত্যের অন্ধকার কাল হলেও একটা যুগসন্ধি-কাল। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য এ সময়ের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে যখন আবার পঞ্চদশ শতকে দেখা দেয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, শ্রীরাম পাঁচালীতে, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে, চণ্ডীমঙ্গলে ও পদ্মাপুরাণে তখন বুঝতে পারি আমরা মধ্যযুগে পদার্পণ করেছি। এদিকে এই দেড়শ'-দু'শ বৎসরের মধ্যে বাঙলা দেশের জীবন কি ভাবে আবর্তিত-বিবর্তিত হচ্ছিল তা অনুমান করা যায় পরবর্তী সাহিত্য থেকে। অবশ্য বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাস—অনেকটাই রাজবংশের ও রাজাদের সিংহাসন লাভ, সিংহাসন হারানোর ইতিহাস। সে ইতিহাস মোটের উপর সুস্থির হয়েছে (দ্রষ্টব্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ইংরেজিতে লেখা "বাঙলার ইতিহাস," ২য় খণ্ড)। কিন্তু বাঙালীর সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস অনেকটাই অনিশ্চিত। বলা বাহুল্য, সামাজিক ও বাস্তব জীবনের ছাপ সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে পড়ে পরোক্ষে। সাহিত্য বা শিল্প-বস্তু থেকে তা আক্ষরিক হিসাবে গ্রহণ করলে ভুল হয়। তথাপি এই সামাজিক হিসাব না জানলে সে সাহিত্যের যথার্থ মূল্যও নিরূপণ করা যায় না।

তুর্ক-বিজয়ের হিসাব

যে কারণে বাঙালী জীবনে বিপর্যয় এল সে কারণটা সুবিদিত। তা প্রধানত রাজনৈতিক— বিদেশীর আক্রমণ ও বিজয়, নতুন শাসক-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও নতুন শাসক-ধর্মের ও শাসক-সংস্কৃতির চ্যালেঞ্জ। তাতে করে যে-বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতি ইতিপূর্বে (পাল ও সেন রাজত্বে) গড়ে উঠছিল তার গড়ার পথে বাধা পড়ল।

খ্রীষ্টীয় ১,২০০ অব্দ শেষ হতে না-হতেই বাঙলার উপরে তুর্ক-আক্রমণের সে ঝড় ভেঙে পড়ে। দিল্লীতে তখন তুর্ক-সুলতানী প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিহার জয় ও বিধ্বস্ত করে পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করতেও মুসলমান তুর্কদের বিলম্ব হল না। সম্ভবত নদীয়া খ্রীঃ ১,২০১ বা ১,২০২-তে বিজিত হয়। লক্ষ্মণ সেন অবশ্য পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। তাঁর সঙ্গে গৌড় ও পশ্চিমবঙ্গের (রাঢ়ের) বহু রাজপুরুষ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বিদ্বজ্জন তখন পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গ থেকে কামরূপে চলে যান, তা অনুমান করা যেতে পারে। আরও প্রায় একশত বৎসর ধরে নদীনালা পরিবৃত পূর্ববঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে সেন, বর্মন, দেব প্রভৃতি রাজারা স্বাধীন ছিলেন। তখন [illegible] বিজিত হয়নি। অন্যদিকে বিহার ও গৌড় দেশ আক্রান্ত হলে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত পুঁথিপত্র, মূর্তি, পট প্রভৃতি নিয়ে নেপালে পলায়ন করেছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে। কাজেই এই তুর্ক আক্রমণে গৃহচ্যুত বাঙলার শিল্প ও সংস্কৃতি একদিক দিয়ে নেপালের গিরিপথে অগ্রসর হয় তিব্বত চীনের দিকে, অন্যদিক দিয়ে পূর্ব বাংলার থেকে আরও কিছু কাল সম্পর্ক অব্যাহত রাখে ব্রহ্ম-আরাকানের সঙ্গে।

কিন্তু তুর্ক-আক্রমণের ফলে বিহারে, গৌড়ে, পশ্চিম বাঙলায় প্রথম দিকে চলল এক ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা, মুসলমান ঐতিহাসিকরা তা সগর্বে উল্লেখ করেছেন। তুর্করা নিজেরাও ছিল দুর্ধর্ষ ও ভয়ংকর জাতি, তার পরে ইসলাম গ্রহণ করে নব ধর্মোন্মাদনায় তাদের নৃশংসতা ও ধ্বংস প্রবৃত্তি বেড়ে গেল। যা মুসলমান ধর্ম নয় তাই তাদের বিবেচনায় ভ্রষ্ট, বিশেষ করে আবার হিন্দু বা বৌদ্ধ দেবদেবী, শাস্ত্র, শিল্পকলা সংস্কৃতি। কাজেই, যেখানে তারা বিজয়ী হল সেখানে তারা রক্তে ও আগুনে পৌত্তলিক বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির চিহ্ন বিলুপ্ত করতে কোনো দ্বিধা বোধ করেনি, এ তাদেরই কথা।

মনে রাখতে পারি—তুর্করা মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিল তাই শুধু নয়, মধ্যযুগের কোনো জাতি ও কোনো বিজয়ী ধর্মই এরূপ সার্বিক ধ্বংসে [illegible] করত না। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের পরেও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা বিজিতদের জাতি ও [illegible] ধ্বংস [illegible] থেকে কম নৃশংসতার বা কম বর্বরতার পরিচয় দেয়নি। পেরু ও মেক্সিকোতে স্পেনীয়দের, আমেরিকায় ব্রিটিশদের, আফ্রিকায় ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের ধ্বংসলীলার কথা আমরা মনে রাখতে পারি। (তবে এ বর্বরতা কি একেবারেই লোপ পেয়েছে?) সে তুলনায় বিজয়ী তুর্করা বা বিজয়ী মুসলমান ধর্ম তো বরং ভালোই মনে হবে।

প্রায় পাঁচশত বৎসর মুসলমান রাজা ও সম্রাট ভারতবর্ষে রাজত্ব করে। তথাপি ভারতবর্ষে "হিন্দু" নাম লোপ করা তো দূরের কথা, মুসলমানরা ভারতবর্ষে সংখ্যায় এক তৃতীয়াংশও হতে পারেনি (যেসব বিশেষ কারণে পশ্চিমপাঞ্জাবে ও পূর্ব বাঙলাতে তারা সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠে, তা আমরা জানি)। অথচ, সামন্ত যুগে রাজার ও রাজপুরুষদের ধর্মই প্রজা সাধারণের ধর্মে পরিণত হত। তাই মুসলমান বিজেতারা মরক্কো থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত যেখানেই অগ্রসর হয়ে গিয়েছে সেখানেই অচিরকাল মধ্যে দেশবাসীও ইসলাম ধর্ম স্বীকার করে নিয়েছে। অথচ পাঁচশত বৎসরেও ভারতবর্ষে তা সম্ভব হল না। এর কারণ, প্রথমত, ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড, জনবহুল এবং সহন-ও-গ্রহণপটু বিচিত্র সভ্যতার দেশ, দু-এক শতাব্দীতে তার পারাপার পাওয়া সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, বিজিত ভারতবাসীও নিজেদের সভ্যতার সংস্কৃতির প্রতিরোধ রচনা করতে পেরেছিল, বাঙালীর এই

প্রতিরোধেরই প্রধান হাতিয়ার হল মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য। আর তৃতীয়ত, বিধর্মী বিজয়ীরা তাড়াতাড়ি প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি মুছে ফেলে দিতে না পারাতে এ-দেশে বসবাস করতে গিয়ে ক্রমে নিজেদের সেই সর্বধ্বংসী মূঢ়তা ও ধর্মান্ধতা, জাতিবিদ্বেষ অনেকটা খুইয়ে ফেলল ; এমন কি, পরস্পরের জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতিকেও ক্রমে কতকটা মেনে নিলে। তাই মুসলমান সুলতানরাও ক্রমে বাঙলা রচনায় উৎসাহ দিতে থাকেন। প্রধানত প্রতিরোধমূলক হলেও বাঙলা সাহিত্য তাই তাদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সময়ে সময়ে বঞ্চিত হয়নি।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে এই তুর্ক-আক্রমণের ধ্বংসচ্ছায়া ও তারপর হিন্দু-বাঙালীর প্রতিরোধ-রচনা এবং মুসলমান বিজয়ীদের ক্রমিক রূপান্তরের ও বাঙালীত্ব লাভের পরিচয় লাভ করা যায়।

তুর্ক-বিজয়ের প্রাথমিক রূপটি ছিল ধ্বংসের রূপ। উচ্চবর্গের বহু জ্ঞানী ও মানী যাঁরা পলায়ন করেননি তাঁরা অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দান করেন, অনেকে আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারান—অর্থাৎ সংস্কৃতির শীর্ষস্থানীয়রা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেতে বসলেন। মন্দির ভগ্ন হল, বিগ্রহ চূর্ণ হল, মঠ-বিহার ভস্মসাৎ হল। পুঁথিপত্র, শাস্ত্র, শিল্প আগুনে সব ছারখার হয়ে গেল। দেব-মূর্তি, পূজার বিগ্রহ গৃহস্বামী ও পুরোহিতেরা ভয়ে জলে বিসর্জন দিলে। এই হচ্ছে তখনকার আক্রান্ত নগরের সাধারণ চিত্র। মগধের বৌদ্ধ বিহার (নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর, প্রভৃতি) ধ্বংসের কথা জানা যায়। বাঙলায় যা ঘটল তার সাক্ষ্য বেশি নেই। পরবর্তী বাঙলা পুঁথি 'শূন্য-পুরাণের' (১৮শ শতকের রচনা) অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুখা' থেকে আমরা ওড়িষ্যার ধ্বংসলীলার কথা জানতে পারি। সম্ভবত সে চিত্রটি ফিরুজ্‌শাহ তুঘ্‌লকের ওড়িষ্যার সমুদ্রতীরস্থিত নগর কোনারক-ধ্বংসের চিত্র। কিন্তু শুধু এক কোনারক নয়, ছোট বড় অনেক কোনারকের ধ্বংস-স্মৃতি তাতে সুরক্ষিত।

বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে এই আক্রমণের প্রাথমিক ধ্বংসকাণ্ডের শেষেও শান্তি অনেকদিন এল না। প্রায় দেড়শত বৎসর, খৃষ্টীয় ১,৩৫০ পর্যন্ত গেল দুর্যোগের দিন। তারপরে (১৩৫০এর পরে) সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ গৌড়ে একটি স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন—সে রাজবংশও বেশি দিন স্থায়ী হল না। গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে সুলতানদের হাব্‌সী রক্ষী-দলের নেতারা, নব নব তুর্ক ও পাঠান ভাগ্যান্বেষীরা, আর আমীর ওম্‌রাহ্‌ সেনাপতিরা জুয়া খেলতে লাগল। কে কখন তা পায় ও হারায় তার ঠিকানা নেই। দৃঢ় রাজশক্তির অভাবে এ অবস্থায় দেশ জুড়ে অরাজকতা বিস্তার লাভ করল। কিন্তু দুর্যোগ আপনার নিয়মেই কেটে আসছিল,—আর তা কেটে গেল যখন খৃীঃ ১৪৯৩ সালে হোসেন শা গৌড়-সিংহাসন লাভ করলেন। যথার্থই তিনি হয়েছিলেন 'বাঙালীর সুলতান।' রাজনৈতিক বিরোধের কারণ তাতে চলে যায়। তৎক্ষণে বাঙালীরও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের নতুন বনিয়াদ প্রায় রচিত হয়েছে।

সামাজিক বিবর্তন

বিদেশীয়, বিধর্মীর রাজ্যমধ্যে বসবাস করে সেদিনের (খৃীঃ ১,২০০—খৃীঃ ১৪৫০) হিন্দু জনসাধারণ যে সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে তা একদিকে যেমন কঠিন, অনমনীয়, বহি-বির্মুখ, অদ্ভুত কথা এই যে, অন্যদিক থেকে তা তেমনি আঘাতে নির্বিকার, সহনপটুত্বে অসাধারণ। ধর্মই মধ্যযুগের সংস্কৃতির প্রধান কথা ; শুধু ভারতবর্ষ নয়, ইউরোপের মধ্যযুগ সম্বন্ধেও একথা সত্য। ধর্মের কোন না কোন একটা তত্ত্ব ও বিধানের সঙ্গে জীবন-যাত্রার প্রত্যেকটি প্রধান ক্ষেত্রই সে যুগে জড়িত থাকত। তখন পর্যন্ত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular state) ছিল অজ্ঞাত, ধর্ম-নিরপেক্ষ সমাজও ছিল প্রায় অসম্ভব। ইসলাম ছিল মধ্যযুগের তুর্ক মুসলিম রাষ্ট্রের রাজধর্ম। সে হিসাবে ইসলাম ধর্মের ও (তুর্ক-আরবী-ফারসী) ইসলামী সংস্কৃতির জয় ছিল দুর্নিবার। তা ছাড়া নানা সুফী, ফকির, দরবেশ এবং গোঁড়া পীর ও প্রচারক ইসলামের বাণীকে বহন করে এনে সমাজের বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। রাজশক্তির ও ধর্মপ্রচারকের এই দুই দিককার আক্রমণের থেকে শাসিত-সমাজ ও শাসিত

সংস্কৃতিও আপনাকে রক্ষা করতে চাইল দুই ক্ষেত্র থেকেই সামাজিক শক্তিকে পুনর্গঠন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক আয়োজনকেও সংগঠিত করে ; না হলে তা শাসক-সংস্কৃতির মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ

তুর্ক-আক্রমণে যা প্রথমত ঘটল তা হচ্ছে হিন্দু বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায়ের পূর্ণ সংযোগ। অবশ্য এর ফলে প্রকাশ্যত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিলোপই ঘটল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম বিলোপের পথে এগিয়ে আসছিল অনেকদিন থেকেই। যে বাঙলার ৭ম ৮ম শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের প্রসার ছিল, তার স্মৃতি থেকেও এর পূর্বেই জৈনধর্ম মুছে যাচ্ছিল। বৌদ্ধধর্মও তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরিণত হয়ে তান্ত্রিক শৈবধর্মের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে,—'চর্যাপদে' তা দেখছি। তুর্ক-আক্রমণ তার এই বিলোপ আরো দ্রুত ও সুনিশ্চিত করে দিলে। পশ্চিম বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম আত্মগোপন করলে জনসমাজের নানা লৌকিক পূজা-আচারের মধ্যে—অবশ্য সে সব কোনো কোনো পূজা-আচারের মূলেও ছিল প্রাক্-আর্য জীবন-যাত্রায় ও ধর্ম-আচরণে। পূর্ববঙ্গে সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম এরূপভাবে হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশে গেল না। সেখানে বৌদ্ধ জনগণ স্বতন্ত্র ছিল, হয়ত হিন্দুসমাজে অপাংক্তেয় ও নিপীড়িতও হয়েছে। তাই পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেও তারা দ্বিধা করেনি—যেজন্য পূর্ববঙ্গ মুসলমানপ্রধান দেশ হয়ে উঠল সকলের দৃষ্টির অগোচরে পরবর্তী দুতিন শতাব্দীতে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বৌদ্ধধর্ম মগ বর্মীদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছে।

উচ্চবর্ণের বিপর্যয়

কিন্তু সর্বপ্রধান কথা—তুর্ক-বিজয়ে পূর্বেকার হিন্দু অভিজাত ও উচ্চবর্ণের শাসকশ্রেণী আর শাসক পর্যায়ে রইল না—তারা রাষ্ট্রমধ্যে শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হ'ল। একথা ঠিক যে, অভিজাতদের অনেকেই আপনাদের সম্পত্তি ও মর্যাদা একেবারে হারাল না, এবং কালক্রমে তারা বিজেতাদের সহকারী, মন্ত্রী, সেনাপতি, বৈদ্য, হিসাবরক্ষক প্রভৃতি রূপে খেলাত-খেতাবও পেল। কিন্তু প্রথম দিকে যা ঘটল তা হচ্ছে পূর্বতন এই হিন্দু শাসক শ্রেণীর অধোগতি, নিজেদেরই শাসিত ও শোষিত শ্রেণীর পাশ্বে গিয়ে তারা দাঁড়াতে বাধ্য হল।

আপস রক্ষার দিক

এই শাসক শ্রেণী ছিল প্রধানত উচ্চবর্ণের হিন্দু। নিজেদের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, শাস্ত্র-পুরাণ ও আচার-নিয়মের দর্পে তারা নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের জনসাধারণের জীবনযাত্রা, ধর্মকর্ম, ধ্যান-ধারণা, আচার নিয়মকে এতদিন ঘৃণাই করে এসেছিল। কিন্তু তুর্ক-বিজয়ে উচ্চবর্গ থেকে অধোগতি ঘটতেই তাদের পক্ষে এই 'ছোট জাতদের' লৌকিক দেবদেবী ও কথা-কাহিনীকে আর অবজ্ঞা করে তত দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব হল না। সর্প-দেবী মনসা ও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী, কচ্ছপরূপী (?) ধর্মঠাকুর ও লাউসেনের কীর্তিকথা, ভয়ঙ্করী বনদেবী ও তার ভক্ত কালকেতু-ব্যাধের কথা, শ্রীকৃষ্ণ নামের আড়ালে গ্রাম্য প্রণয়ীর গোপ-বধূদের সঙ্গে লীলাবিলাস, ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের যে কথা সিন্ধু, পাঞ্জাব, গুজরাত পর্যন্ত বিস্তারিত হয়ে আছে—এ সকলের উদ্ভব-ক্ষেত্র ছিল মূলত এই নিম্নবর্গের ও নিম্নবর্ণের লোক-জীবন। এইগুলিই বাঙলার নিজস্ব জিনিস, বাঙলা সাহিত্যের লব্ধ Matter of Bengal.

ইতিপূর্বেই হিন্দু সভ্যতার অনেক কিছু এই নিম্ন শ্রেণীও গ্রহণ করে এসব পূজা ও কাহিনীর ক্রম-পরিশোধন করছিল। তবু উচ্চবর্গের হিন্দু তা শাস্ত্রে, পুরাণে তখনো গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু এখন সেই রাষ্ট্র-শাসন হারাবার পরে ক্রমশই এইসব কাহিনীকে এই উচ্চবর্ণদেরও গ্রাহ্য করতে হল, হিন্দুর সেই অদ্ভুত গ্রহণশক্তির বলে তারা তা মানিয়েও নিলে। এইরূপে চাষী, গাঁজাখোর সেই লৌকিক দেবতা শাস্ত্রোক্ত রুদ্র শিবের সঙ্গে মিশে গেল; ভয়ংকরী বনদেবী ক্রমে রণচণ্ডী হয়ে উঠল; গ্রাম্য প্রণয়ী ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে কৃষ্ণমঙ্গলের বিষয় হয়ে গেল। হিন্দু শাসক শ্রেণীর ও হিন্দু শাসিত শ্রেণীর একটা সাংস্কৃতিক আপস-রফা এরূপে ধীরে ধীরে সংঘটিত হল। অবশ্য বিনা সংঘর্ষে তা হয়নি, আর তা দু'এক শত বৎসরেও শেষ হয় নি,—সমস্ত মধ্যযুগ ধরে তা চলেছে। কিন্তু লৌকিক কৃতির ও উচ্চবর্গের সংস্কৃতির এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও এই আপস-রফা দুই বর্গের সামাজিক নৈকট্যের ও আপস-রফার জন্যই সম্ভব হল,—আর তুর্ক-বিজয় হিন্দু উচ্চবর্গকে ঠেলে নীচে নামিয়ে দেওয়াতে এই আপস রফা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

অপরদিকে বাঙলার এই লোক-সাধারণ মূলতও আর্যভাষী ছিল না, আর আর্যভাষা গ্রহণ করলেও ততদিন পর্যন্ত তারাও হিন্দু-আর্য সংস্কৃতির উচ্চতর বস্তু থেকে বঞ্চিতই ছিল। শাস্ত্র চর্চা, জ্ঞানাহরণ, তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল; সংস্কৃত কাব্যের রসাস্বাদন ছিল অসম্ভব (যদিও কবি ধোয়ী সম্ভবত তন্তুবায় বা রজক ছিলেন)। কাজেই সামাজিক হিসাবে এই সব অনু-আর্য কোম বা উপজাতি-গুলি (পুণ্ড্র, পোঁড়, বাগদী, শবর, ব্যাধ, হাড়ি, ডোম) তাদের কৌম (tribal) জীবনযাত্রা খুইয়ে হিন্দু সমাজের প্রান্তে শুধুমাত্র এক-একটা স্বতন্ত্র জাতিতে (caste) পরিণতি লাভ করছিল। হিন্দু উচ্চবর্গের দ্বারা অবহেলিত হয়ে চলিত বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু তারা গ্রহণ করে এক ধরণের 'লৌকিক বৌদ্ধধর্ম' নিজেদের মধ্যে প্রচলিত করছিল। কিন্তু এখন উচ্চবর্ণের বর্গচ্যুতিতে এইসব জাতি হিন্দু পুরাণ-কাহিনীর আখ্যায়িকা প্রভৃতি গ্রহণ করবার অধিকতর সুযোগ লাভ করলে। ইসলামের জনপ্রিয়তা ও প্রচারের থেকে তাদের রক্ষা করার প্রয়োজনেই হিন্দুর পুরাণ প্রভৃতিরও বহুল প্রচার পাঁচালী, নাট ও কথকতার মারফত আরম্ভ হয়। সেই শাস্ত্র-বাঁধা হিন্দু ধর্মকে তারা আবার নিজেদের মত করে ক্রমে ক্রমে একটা লৌকিক হিন্দু ধর্মেও পরিণত করে নিলে। বৌদ্ধ প্রভাব বিলুপ্ত হতে হতে যা ছিল 'লৌকিক বৌদ্ধধর্ম'—তার স্থান গ্রহণ করলে 'লৌকিক হিন্দুধর্ম'।

সংরক্ষণ কৌশল

ভাগ্যবিপর্যয়ে শাসন ও প্রতিষ্ঠা হারালেও সমাজ ও সভ্যতার খাতিরেও হিন্দু উচ্চবর্ণ কিন্তু দেশের নিম্নবর্ণের সঙ্গে একেবারে হাতে হাত ধরে একত্র দাঁড়াতে পারল না; সম্ভবত সেরূপে দাঁড়াতে তারা প্রস্তুতও ছিল না! অথচ দুর্ধর্ষ বিদেশী শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ রচনা করতে হলে শাসিতদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল এইরূপ সর্বশ্রেণীর ব্যাপক ঐক্য গঠন। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদে সে ঐক্য বরাবরই সুদূর ছিল। হিন্দু-সমাজের বর্ণভেদের মূল উদ্দেশ্য ও কাজ ছিল শাসকশ্রেণীর অধিকার, তাদের শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতিকে সনাতন ধর্ম ও ঐতিহ্যের নামে একেবারে পাকা করে রাখা। রাজশক্তি হারালেও রাজ্যচ্যুত উচ্চবর্ণ এ সব সামাজিক অধিকার এখন ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন কেন? বরং সামাজিক পদ-প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ-সুবিধাই তখন তাঁরা আরও আঁকড়ে ধরলেন। সমাজ-শাসনে তাঁদের কর্তৃত্ব তাঁরা অব্যাহত রাখতে আরও সচেষ্ট হলেন। রাজশক্তি যখন হাতে নেই, তখন আত্মরক্ষার অর্থ হল সমাজ-রক্ষা, এবং সমাজের ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, অর্থাৎ হিন্দু সংস্কৃতিকে ম্লেচ্ছধর্ম ও আচার-নিয়ম থেকে রক্ষা।

সেদিন রাষ্ট্র অপেক্ষাও সমাজ ছিল বেশি সচল জীবন্ত জিনিস। রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিরোধ রচনার চেষ্টা ঐক্যবদ্ধ সমাজ ছাড়া সম্ভব নয়। বিজিত হিন্দু সমাজের এই প্রতিরোধ তাই রাজনৈতিক প্রতিরোধরূপে ততটা প্রকট হয়নি। বরং রাজনৈতিক পরাজয় মেনে নিয়েই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

প্রতিরোধ রচনায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা অধিকতর মনোযোগী হলেন। এইদিকে তাঁরা অদ্ভুতরূপে সার্থকও হলেন।

হিন্দুর প্রচলিত বর্ণভেদের নীতি অনুসরণ করেই এই উচ্চবর্ণের সমাজ-শাসকেরা সমাজের প্রতিরোধ-কেন্দ্র রচনা করতে আরম্ভ করলেন। 'ম্লেচ্ছ' ও 'যবনের' সমস্ত সম্পর্ক থেকে সযত্নে তাঁরা দূরে রাখতে লাগলেন নিজেদের। যে-কেউ ম্লেচ্ছাচারে দুষ্ট হলে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কারও যবন-সংসর্গ ঘটলে, তার আর মার্জনা নেই। হিন্দু সমাজ তাকে তৎক্ষণাৎ নির্মমভাবে বর্জন করবে। প্রচলিত আচার-ধর্মও তাই এ সময়ে আরও শক্ত, আরও অনড়, আরও কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। প্রচলিত বর্ণভেদে তখনো পর্যন্ত যেটুকু অবকাশ ছিল—যেটুকু নমনীয়তা ছিল বিবাহে, ক্রিয়া-কর্মে তখন পর্যন্ত,—তাও এবার বন্ধ হল। আহারে, বিবাহে, ক্রিয়াকর্মে প্রত্যেক জাতি এখন থেকে গণ্ডীবন্ধ ও পৃথক হয়ে রইল। যারা মিলেমিশে এক জাত হয়ে উঠতে পারত তেমনিতর নিম্নবর্ণের ছোট ছোট কোম বা জাতগুলো পর্যন্ত এর ফলে এক-একটা স্বতন্ত্র জাত হয়ে উঠল। অংশতই উচ্চবর্ণ রইল উচ্চ, নিম্নবর্ণেরা রইল নিম্ন, অনাচরণীয়, আর 'নবশাখরা' মধ্যখানে সুনির্দিষ্ট স্থান দখল করে রইল পৃথক। এই জাতের প্রাচীর ভেঙে মুসলমান ধর্মের সামাজিক সাম্য বা আচার-নিয়মে সাধ্য কি প্রবেশ করে, আর সমাজের উচ্চ-নীচ ভেদ ঘুচিয়ে দেয়?

সাংস্কৃতিক সংগঠন

এই সামাজিক প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই চলল সাংস্কৃতিক সংগঠনও—তার একটা স্থূল অংশমাত্র সেই উচ্চ নীচ সংস্কৃতির বা লৌকিক ও পৌরাণিক দেবতাদের আপস রফা। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আপস-রফা করলেন বাধ্য হয়ে, কিন্তু নিজেদের শাসক-সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা করতে লাগলেন নিজেদেরই উদ্যোগে—সমস্ত শক্তি দিয়ে। রাজশক্তি অবশ্য তাদের হাতে নেই; কিন্তু ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি ছিল পল্লী-কেন্দ্রিক। দূরবর্তী ছোট ছোট পল্লীতে অনেকখানেই হিন্দু সামন্তরা তুর্কদের রাজনৈতিক বশ্যতা মেনে নিয়ে আপনার ধন-সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন পল্লীর জীবন-যাত্রা রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। উচ্চবর্ণের সামাজিক কর্তৃত্ব সেখানে অব্যাহতই ছিল। এই সমাজ নেতৃত্ব ও সামন্ত-শক্তিকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণরা খ্রীঃ ১২০৪ এর পরে এক দেড় শতাব্দীর মধ্যেই আবার নতুন করে সাংস্কৃতিক সংগঠনে উদ্যোগী হলেন। মিথিলার শাস্ত্রচর্চা শেষ হল না। দেখতে দেখতে নবদ্বীপের অভ্যুদয় ঘটল। চৈতন্যদেবের জন্মকালে (খ্রীঃ ১৪৮৫) তাই দেখি নবদ্বীপ শ্রীখণ্ড, রামকেলি প্রভৃতি এক-একটি বিদ্যাকেন্দ্র শাস্ত্রচর্চায় মুখরিত, দেশ বিদেশে নব্যন্যায়ের খ্যাতি, আর কী অসাধারণ পাণ্ডিত্য সেই বাঙালী উচ্চবর্ণের! চৈতন্যের পরিকরদের দিকে তাকালেই তা বুঝতে পারি। এর পিছনে যে অন্তত এক-আধ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক আয়োজন ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

এই সাংস্কৃতিক উদ্যোগেরই একটা দিক হল পৌরাণিক কাহিনীর বাঙলায় পরিবেশন। তুর্ক-আক্রমণে সব কিছু বিপন্ন হলে সমাজের সাধারণ মানুষদেরও সনাতন ধর্মের সাধারণ সত্যগুলো জানানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নইলে সুফী, দরবেশ প্রভৃতি প্রচারকদের সামনে সেই জনসমাজ ভেসে যেত। এ উদ্দেশ্যে পুরাণের অনুবাদ—বিশেষ করে ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের লোকচিত্ত-চমৎকারিণী অমর উপাখ্যানগুলির লোক-বোধ্য ভাষায় পরিবেশন—কর্তব্য হয়ে ওঠে। সম্ভবত, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিদের পূর্বেও গ্রাম্য পাঁচালীতে এই সব আখ্যায়িকার রসাস্বাদন করছিলেন বাঙালী জনসাধারণ, উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবর্ণ সকলেই,—এমন কি, মুসলমান শাসনকর্তারা পর্যন্ত। তাই হোসেন শাহ্ ও তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ হয়ে ওঠেন এই বাঙালী কবিদের পৃষ্ঠপোষক। ব্যাপারটা বুঝবার মত—হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি কোনো আধুনিক ভাষায় কৃত্তিবাসের পূর্বে রামায়ণ কাহিনী রচিত হয়নি (তুলসীদাসী রামায়ণ শতখানেক বৎসর পরে রচিত হয়); সঞ্জয়ের (বা কাশীরাম

দাসের) মহাভারতের মত মহাভারত অন্যান্য দেশে আর নেই ; মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের মত ভাগবতও সেখানে পরিবেশিত হয় নি। বাঙলা সাহিত্যে যাকে বলে Matter of Sanskrit এগুলি তার প্রধান অবলম্বন। অন্য ভাষার তুলনায় বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য তাই অনেক বেশি সংস্কৃত-আশ্রয়ী হয়েছে, এটিও প্রতিরোধ-প্রয়াসেরই ফল।

বিজেতার স্বাজাত্য-লাভ

আসলে ততদিনে (খ্রীঃ ১,৪৫০ এর পরে) আর একটি বড় সামাজিক বিবর্তনও প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এই মুসলমান সুলতান ও তাঁর সেনাপতিদের বাঙলা-পরিপোষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এঁরা অনেকাংশেই বাঙালী হয়ে গিয়েছেন। কাজেই মুসলমান শাসক-শ্রেণীও আর বাঙলা সাহিত্য কিংবা এই সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রয়াসের বিরোধী নন। এমন কি, শাসক-শ্রেণীর এই স্তরে শুধু মালাধর বসু বা রূপ-সনাতন নন, ভাগ্যবান হিন্দুরাও অনেকেই স্থান লাভ করেছেন (দ্রষ্টব্য ঃ সুকুমার সেন, 'মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালী')। তখনো সময়ে-অসময়ে ইসলামের নাম করে অবশ্য কাজী বা কোনো মুসলমান শাসনকর্তা হিন্দুর উপর অত্যাচার করত, সমস্ত মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সে অত্যাচার হচ্ছে অনেকাংশেই মধ্যযুগের সামন্ত শাসকের অত্যাচার ; হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইসলামের কোনো নিয়মিত জেহাদ নয়। আসলে, মুসলমান শাসক-শ্রেণীর মধ্যেও এ পরিবর্তন ক্রমেই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কারণ ধ্বংসের যুগেও তুর্করা এদেশে বসবাস করে। এদেশেই স্ত্রী গ্রহণ করে। তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা নিশ্চয়ই বাঙলা জানতেন। আবার, তাঁরাও বিবাহ করেন এদেশেরই কন্যা। এঁদের বংশ-ধরদের রক্তে সিকি ভাগ কিংবা দু'এক-আনি যদি বা তুর্ক রক্ত থাকে, কয় পুরুষের মধ্যে তা দু'এক পাইতে গিয়ে ঠেকে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য তা হলেও তাঁরা নিশ্চয়ই ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপারে চর্চা করতেন আরবী, আর দরবারী ব্যাপারে চর্চা করতেন ফারসী, এবং হয়ত তখনকার মুসলমান অভিজাতরা (ইংরেজ আমলের এ দেশের খৃষ্টান বা ফিরিঙ্গীদের মতই) শাসকধর্ম ও শাসক-সংস্কৃতিকেই মনে করতেন নিজধর্ম, নিজসংস্কৃতি। তথাপি সাধারণ লোকের সঙ্গে বাঙলা কথা না বলে তাঁদের উপায় কি ? তাছাড়া সাধারণ মুসলমান,—সে এ দেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানই হোক, কিংবা হোক সাধারণ তুর্ক-সৈনিকের সন্তান—বরাবরই বাঙলা বলত, শুনত বাঙলা পাঁচালী, গান। বেহুলা-লখিন্দর প্রভৃতির "বাঙালী উপাখ্যানের" সঙ্গে জন্ম থেকেই তার পরিচয় ঘটত। শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যেও এই বাঙালী-স্বাজাত্য ক্রমশ সহজ হয়ে উঠছিল। তা'ই আমরা দরাফ খাঁর (জাফর খাঁ গাজীর, ১৩শ শতক) নামেও পাই সংস্কৃতে লেখা 'গঙ্গা-স্তোত্র' ; আর হোসেন শাহ্-পরাগল খাঁকে দেখি হিন্দু রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর রসিক। অথচ গোঁড়া না হলেও তাঁরাও খাঁটি মুসলমান ছিলেন। অবশ্য এই মুসলমান উচ্চবর্গেরা প্রধানত যেমন ভক্ত ছিলেন উচ্চবর্গের বিষয়বস্তুর (রামায়ণ-মহাভারতের), নিম্নবর্গের মুসলমানরা আবার তেমনি মত্ত ছিল মনসামঙ্গল, গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতিতে, তাও বুঝতে পারি।

চৈতন্য-যুগের স্বরূপ

যুগসন্ধিকালের এই অনালোকিত সামাজিক বিবর্তনের পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক রূপ প্রকাশ লাভ করে এই হোসেন শাহ-এর কাল থেকে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ও বাঙলা সাহিত্যের চৈতন্য পর্বে (খ্রীঃ প্রায় ১,৫০০—খ্রীঃ ১,৭০০)। তখনই মধ্যযুগের বাঙালীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ

তার ধর্মে ও সাহিত্যে শাস্তসন্দের সার্থকতা লাভ করে। বাঙালী সমাজের উচ্চস্তরে তখন যে স্লেচ্ছাচার দেখা দিয়েছে—বৃন্দাবন দাস যার উল্লেখ করেছেন—চৈতন্যদেবের প্রচারের একটা উদ্দেশ্য ছিল তা রুদ্ধ করা, হোসেন শাহ্ প্রভৃতি সুলতানদের উদার ধর্ম-সহিষ্ণুতার বিরুদ্ধাচরণ না করে, শুধু নবদ্বীপের কাজীর মত ধর্মান্ধদেরই বাধা দেওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল আপামার সাধারণ উচ্চ-নীচ সকলকে ভক্তিধর্মে ও নাম-ধর্মে একত্রিত করা। এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফল সুস্পষ্ট। উচ্চবর্ণের ও নিম্ন-বর্ণের মধ্যে হিন্দু সংযম, সদাচার প্রভৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল; বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষা, দর্শন, কাব্য প্রভৃতির চর্চা সুপ্রসারিত হল; আর এই ভাবলোকের (স্থূলত ও মূলত যা হিন্দু) উপর স্থাপিত হল বাঙালা সাহিত্য ও বাঙলা সংস্কৃতির বনিয়াদ। সাধ্য নেই বাঙলা সাহিত্য পরবর্তী কালেও আর তার এই ভাবলোককে একেবারে ত্যাগ করে যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেক্ষাপট এই ভারতীয় হিন্দুত্বের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট।

অবশ্য এ কথা অত্যন্ত সত্য যে, বৈষ্ণব ভাবাদর্শের মধ্যে, সেই ভক্তিবাদের মধ্যে, ইসলামের বিরুদ্ধেও বিরোধিতা নেই—সমস্ত হিন্দু প্রতিবোধের মূলে লক্ষ্যটা পূর্বাপর ছিল ঘর-সামলানো,—পর-আক্রমণ নয়। বড় জোর যা সে চেষ্টা করেছে তা হচ্ছে অসহযোগ, অপর ধর্মের অস্তিত্ব বিষয়েও নীরবতা। সমস্ত মধ্যযুগের বাঙলাসাহিত্যে কোথাও তাই মুসলমান ধর্ম, মুসলমান জীবনযাত্রার চিত্র প্রায় পাওয়া যায় না। অথচ মুসলমানদের শক্তি, ধর্ম, সংস্কৃতির মর্যাদা তখন কম ছিল না, বরং বেশিই ছিল। চৈতন্যদেব দুই সম্প্রদায়ের সমন্বয় করার অপেক্ষা মূলত হয়ে শান্ত প্রতিরোধ ধারাকেই রূপদান করেছেন; হিন্দু সংস্কৃতি সদাচার, নিয়ম সংযম প্রভৃতিই দৃঢ়তর করেছেন। সত্য বটে চৈতন্যদেব যবন হরিদাসকেও আপনার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু যবন হরিদাস আর কতটুকু তখন 'যবন' ছিলেন ধর্মে ও আচারে? চৈতন্যদেব ইসলামের একটা বড় গণতান্ত্রিক প্রথাকে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নিজের প্রচার-পদ্ধতিতে—সংকীর্তনে। তাঁর গণতান্ত্রিক ঝোঁকও অবশ্য হিন্দু সমাজের ভেদ-নীতিকে দূর করতে পারেনি।

অথচ যে-সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সে সময় প্রতিরোধের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। বাঙলার শাসকগোষ্ঠী মুসলমান হলেও বাঙালী হয়ে যাচ্ছেন। এমন কি, বাঙলা কবিতার হিন্দু ভাবলোকেও তাঁদের আপত্তি নেই। অবশ্য এই কারণেই এই প্রতিরোধকামী বাঙলা সাহিত্যও মুসলমান-বিরোধী হয় নি। তার প্রতিরোধ প্রেরণা ধর্ম ও সংস্কৃতিগত, রাজনৈতিক নয়, আক্রমণমূলকও নয়।

বাঙালী জীবনে তারপরে দেখা দিতে থাকে 'নবাবী আমলের' (খৃষ্টীঃ ১৭০০—খৃষ্টীঃ ১৮০০) ভাবধারা। ফারসী বিষয়ও এবার এল বাঙলা সাহিত্যে, তাতে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক জীবন অনেকটা এক হয়ে উঠেছে,—বিজয়ী ও বিজিতের বিরোধ, কিম্বা তার ধর্মগত বা সংস্কৃতিগত ব্যবধানের স্মৃতিও তাতে বিশেষ নেই। এদিকে বিশেষ করে দৌলতকাজী ও আলাওলের কীর্তি স্মরণীয়। এঁরা মুসলমান হয়েও খাঁটি বাঙালী সাহিত্য ঐতিহ্যের ধারার কবি। এই নবাবী আমলের ভাব ও ভাষার সহায়তায় একটা হিন্দু মুসলমানের সমবেত বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠতে যাচ্ছিল। একটা মিলিত জাতীয় সংস্কৃতির জন্ম হতে পারত তখন। কিন্তু তা ব্যাহত হল দু'কারণে। প্রথমত, নবাবী আমল সামন্ততন্ত্রের পতনের যুগ, তাতে সৃষ্টির বীজ বেশি রস পেতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সামন্ত যুগের পরে স্বদেশীয় বণিকবিপ্লব না ঘটতেই এল ইংরেজ আমল—ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করলেও রাজ্যচ্যুত বাঙালী মুসলমান রাগ করে তার থেকে দূরে থাকে। বরং তখনি আরম্ভ হয় ওহাবি আন্দোলন ও মুসলমান গোঁড়ামি। আর তাতে বাঙালী হিন্দুর তুলনায় বাঙালী মুসলমান সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে লাগলেন; আলাওল দৌলত কাজীর পথও পরিত্যক্ত ছিল 'কেচ্ছা' লেখকদের নিকটে। আর সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শ্রেণীও নবাবী আমলের হিন্দু ও মুসলমানের ক্ষীয়মাণ এই সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যবধানকে আপনার ভেদনীতিতে নতুন করে ফাঁপিয়ে বড় করে তুলতে লাগল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই নতুন প্রতিরোধের বাঙলা সাহিত্যে এবারও (খৃষ্টীঃ ১৮০০-১৯৪৭?) ঠিক সমস্ত বাঙালীর ঐক্যবদ্ধ

প্রতিরোধের সৃষ্টি হল না। বরং মুসলমানের অচেতনতার ফলে হিন্দু ঐতিহ্যের প্রভাবই তাতে প্রবল হয়। তা না হলে বাঙলাবিভাগ হত দুঃসাধ্য। অথচ সত্যই এ সাহিত্য সমস্ত বাঙালীর জাতীয় সম্পদ, তাতে ভুল নেই ;—যদিও তার পটভূমি ভারতীয় হিন্দু জীবনের ও সংস্কৃতির, তাতে জাতীয় আত্মপ্রকাশ পরিস্ফুট।

এই হাজার বৎসরের জাতীয় উৎস থেকেই এখনো পূর্ব বাঙালার বাঙালীর ও পশ্চিম বাঙলার বাঙালীর নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা ও উপাকরণ সংগ্রহ করতে হবে। দু' বাঙলার অন্য অখণ্ড সম্পদ বাঙলা লোক-সাহিত্য। শিষ্ট সাহিত্যের সব যুগ এদিকে সমভাবে ফলদায়ক হবে না। মধ্য-যুগের পদ ও মঙ্গল-কাব্যের আর বিকাশ সম্ভব নয়। উনিশ শতকেরও কিছু কিছু জিনিস আজ মনে হবে অবান্তর, তবু অনেক জিনিসই গ্রহণযোগ্য। কারণ, তা আধুনিক সাহিত্যাদর্শে গ্রাহ্য ;—সাহিত্য তখন ধর্ম ও আচার-নিয়মের বশ্যতা কাটিয়ে এই মর্ত্য জীবন ও মর্ত্য মানুষের মহিমার সন্ধান পেয়েছে। এই হচ্ছে এ যুগের সাহিত্যের ভিত্তি-ভূমি। আজ দুই বাঙলার লেখকই পুরানো বাঙলা ঐতিহ্য গ্রহণ করবেন তাকে নিজের নিজের মত করে বিকশিত করবার জন্য। এবং এইখানে দাঁড়িয়েই তাঁরা আবার এই জীবন্ত কালের সত্যকে—জীবন-সত্যকে, মানব-সত্যকে—গ্রহণ করবেন একই সাহিত্যিক প্রক্রিয়ায় তাকে রূপদান করবার জন্য। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই পূর্ব বাঙলার বাঙলা সাহিত্য শুধুমাত্র পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যের প্রতিলিপি হবে না। তাতে পূর্ব-বাঙলার মাটির ও মানুষের আত্মপরিচয় থাকবে—যেমন থেকেছে এতদিন প্রধানত পশ্চিম বাঙলার মানুষের পরিচয় বাঙলা সাহিত্যে। সেই মাটির পরিচয় ফুটে উঠলে এই বাঙলা বিভাগের ট্রাজিডিও একটা সার্থকতায় বিমণ্ডিত হবে ; এবং বাঙলা সাহিত্য অখণ্ড না হলেও সমগ্র ও সম্পূর্ণ বাঙলার পরিচয় বহন করবে।

ইং ১৯৪৯

সাহিত্যের ভূমি-সংস্কার

সোবিয়েত সাহিত্যিক সংঘের সভাপতি মঁসিয়ে টিখোনভ্‌কে অকস্মাৎ স্বাগত করতে গিয়ে বিব্রত বোধ করছিলাম ঃ—আমাদের সাহিত্য-জগতের মূল তথ্যগুলি তাঁকে প্রথম বিজ্ঞাপিত করা প্রয়োজন। সেই পটভূমিকাতেই তারপর আমাদের গণ সাহিত্যের সমস্যা এবং সোবিয়েত সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কের কথা মঁসিয়ে টিখোনভ্‌-এর পক্ষে আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু বাঙলা সাহিত্য-জগতের মূল তথ্য কী?

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাহিত্য নিয়েই আমাদের আধুনিক সাহিত্যের ঐতিহ্য। তার মধ্যে প্রাচীনতর ভারতীয় সাহিত্যের বহুধারার বহু উত্তরাধিকার সঞ্চিত আছে; আবার সেই সঙ্গে অর্জিত হয়েছে আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও বিশ্ব সাহিত্যের বহুল বিকাশমান ধারার বহুতর দানে আমাদের অধিকার। এই সবই আমাদের আজকের সাহিত্য-জগতের ভিত্তি, এ তথ্য সর্বস্বীকৃত। হয়ত—হয়ত কেন নিশ্চয়ই—মঁসিয়ে টিখোনভ্‌-এরও তা সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় যে-কোনো সাহিত্যের পক্ষে মূল তথ্য শুধু এইটুকু নয়। সেই মূল তথ্য এই যে, আমাদের সাহিত্যের এই ভিত্তি-ভূমি যথেষ্ট প্রশস্ত রূপে প্রস্তুত হয় নি, দেশের মাটি থেকে সে কতকাংশে বিচ্ছিন্ন; বিভিন্ন দেশের তরুলতাও সে মাটিকে এখন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে আপনার করে নিতে পারেনি। এ-রূঢ় সত্য রবীন্দ্রনাথও আপনার কীর্তি সম্বন্ধে উপলব্ধি করেছিলেন, অন্যের কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ ছাড়া দ্বিতীয় মূল তথ্য আছে, বাঙলা সাহিত্যেরই সম্বন্ধেই তা বিশেষ করে সত্য—বঙ্গ-বিভাগ। এ আঘাত এখনো বাঙলা সাহিত্যকে বিভক্ত করতে পারে নি; কিন্তু তাতে আত্মতৃপ্তির কারণ নেই। কারণ, এই আঘাতে বাঙলা সাহিত্যের ও বিশেষ করে বাঙালী সংস্কৃতিরই বিশেষ পরীক্ষা চলেছে। 'দুই রাষ্ট্র এক জাতি, এক সংস্কৃতি' ঃ—বাঙালীর এই অদ্ভুত নিয়তিকে সত্য-সত্যই কি ভাবে কোনো ঐক্যময় মহৎ পরিণতিতে আমরা উত্তীর্ণ করব?—পরীক্ষা তা'ই। সেই পথে আমাদের প্রধানতম আশ্রয় বাঙলা সাহিত্য, তা বলাই বাহুল্য।

পতিত জমি

অবশ্য এরও পিছনে সে-ই প্রথম কথাটিই রয়েছে। আমাদের সাহিত্য যদি সত্যই যতটা কীর্তিতে সমুজ্জ্বল ততটা সর্বত্রগামী হতে পারত তা হ'লে হয়ত হিন্দু বাঙালী ও মুসলমান বাঙালী এত সহজে এই সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক খেলার ঘুঁটি হয়ে পক্ষ-প্রতিপক্ষ হ'ত না। রবীন্দ্র সাহিত্যের মতই এই বাঙলা সাহিত্যও যে সর্বত্রগামী হয়নি তার একটা কারণ এই যে, এ সাহিত্যে জনতার প্রাণস্পন্দন, তার আশা-আনন্দ-বেদনা-পীড়িত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত নিবিড় হয় নি। এক কথায় যাকে বলা যায় গণ-সাহিত্য, তা হতে পারে নি, অনেকটা জনতার প্রতিনিধি স্থানীয় বিপ্লবী মধ্যবিত্তের সাহিত্য হয়েছে; সে হিসাবে জাতীয় সাহিত্যও হয়েছে, কিন্তু তথাপি তা গণ-সাহিত্য হয় নি। এইটি এ সাহিত্যের চরিত্রের এক দিক। অবশ্য চরিত্রের এই সীমাবদ্ধতার কারণ বাঙালী সাহিত্য-জগতের বাস্তব সীমাবদ্ধতা,—এবং সেইটাই অন্যদিক। অর্থাৎ এ সাহিত্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

শিক্ষিত না হলে অবশ্য সাহিত্যের পাঠক হওয়াই সম্ভবপর নয়। সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা, নাট্যকলা, প্রভৃতি সংস্কৃতির অন্য দুই একটি বিভাগের সমঝদার বা কৃতী তথাকথিত অশিক্ষিতরাও হতে পারেন। সে দিকে সাহিত্য মন্দ-ভাগ্য;—সে সর্বত্রগামী নয়। আরও দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের

দেশে শিক্ষা এখনো অত্যন্ত সংকুচিত। শতকরা ত্রিশজন লোকও এদেশে অক্ষরজ্ঞান লাভ করেন নি। আর যাঁরা তথাকথিত 'সাক্ষর' তাঁদের মধ্যেও ক'জন সত্যই 'শিক্ষিত', অর্থাৎ সাহিত্যের পাঠক হবার মত শিক্ষা লাভ করেছেন, আর ক'জনেরই বা তারপরে জোটে সাহিত্য পাঠের সুযোগ, সাহিত্য-ক্রয়ের মত উপার্জন? এভাবে হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে—শতকরা ২ থেকে ৩ জন মাত্র বাঙালী বাঙলা সাহিত্যের পাঠক শ্রেণী বলে গণ্য হতে পারেন, ক্রেতারা নগণ্য। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এই পাঠক শ্রেণীকেই মনে রেখে সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেন; এবং যাঁরা জন-সাহিত্যের স্রষ্টা, তাঁরাও এই ক্ষুদ্র বালুস্তরের মাধ্যমেই আশা করেন জনতার নিকটে আপনাদের বক্তব্যকে পৌঁছতে। বাঙলা সাহিত্যের বাস্তব পরিধি এই শতকরা ৩।৪ জন। তাদেরই আশ্রয় করে বাঙলার সাহিত্যিক জগৎ। কাজেই এ সাহিত্যের ভিত্তি এখনো এতটা সাধারণের জীবন থেকে আলগা মনে হয়। কারণ, সাধারণ বলতে শতকরা পঁচানব্বইজন, তাদের অবজ্ঞা করা চলে না। এমন কি, এ কালের ভারতীয় সংবিধান আইনেও তাদের এ অধিকার স্বীকৃত। এই সাধারণের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জন সেখানে নিরক্ষর—অর্থাৎ পতিত জমি। যতক্ষণ এ ভূমি সংস্কার না হয়, ততক্ষণ কি করে আশা করা সম্ভব শস্যের প্রাচুর্য, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, সাহিত্যের সহজ বিস্তার, সৃষ্টির বিকাশ?

এ জন্যই বাঙলা সাহিত্যের দিক থেকে আজ আমাদের প্রধান দাবি—চাই সাহিত্যের এই ভূমি-সংস্কার,—পতিত জমির উদ্ধার; আর সাহিত্য ভূমির প্রস্তুতি,—নিরক্ষরতার অবসান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার।

কিন্তু প্রশ্ন হবে—নিরক্ষরতার অবসান ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা—এ দাবি তো দেশেরই একটি মৌলিক দাবি। তাহলে তা আবার বিশেষ করে সাহিত্যিকদের দাবি, এবং গণ-সাহিত্যবাদীদের দাবি বলে ঘোষণা করায় বিশেষত্ব কোথায়?

নাল্পে সুখমস্তি

বিশেষত্ব না থাক, সাহিত্যের দিক থেকে এ স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে। যা জনসাধারণের মৌলিক দাবি, তা যে সাহিত্যেরও মৌলিক দাবি, এই সত্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। জন-জীবনের স্বার্থ ও সাহিত্যের বিকাশ একই সূত্রে গ্রথিত। চীনের জনায়ত্ত প্রজাতন্ত্র তাঁদের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান সূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে—নিরক্ষরতার অবসান; এ নিরর্থক নয়। একথা তাঁরাও জানেন যে, দেশের মানুষের মামুলী প্রাথমিক শিক্ষালাভ হলেই যে, সাহিত্য ফুলে ফলে অমনি বিকশিত হয়ে উঠবে তা নয়। এমন কি পাশ্চাত্য বহু দেশের দিকে তাকালে একথাও বুঝতে পারি, সেই মামুলী শিক্ষার ফলে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনাও অনেক সময়ে স্বচ্ছ হয় না, বরং কুশিক্ষায় তা আরও মলিন হতে পারে। কারণ শিক্ষাও শাসক শ্রেণীর হাতে তাদের স্বার্থ উদ্ধারের নতুন কৌশল হয়। জনতার মূল শিক্ষালয় জনতার সংগ্রাম, আর্থিক-সামাজিক স্বরাজের প্রয়াস। সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনতাকে গ্রহণ করতে হয় তার রাজনৈতিক শিক্ষা, জীবনের শিক্ষা। কিন্তু অক্ষরজ্ঞান ও লেখাপড়ার প্রাথমিক অধিকার আয়ত্ত থাকলে মানুষের পক্ষে এই সংগ্রামের শিক্ষাকে আরও সহজে আয়ত্ত করা সম্ভবপর হয়; স্পষ্ট করে মানুষ বুঝতে পারে জীবনের এই রূপ ও নির্দেশ—সাহিত্যের মধ্য থেকেও। তাই সর্বদেশের শাসকশ্রেণী বরাবরই তাদের শাসিত জনসাধারণকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখতে চেয়েছে। যখন তা অসম্ভব হয়েছে তখন পেতেছে কতকটা শিক্ষার সঙ্গে অনেকটা অ-শিক্ষা ও কু-শিক্ষার জাল। সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত ভারতবাসীর পক্ষে এ সত্যটা বোঝা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। তাই জনতা যেখানে শাসন ক্ষমতা লাভ করে সেখানে সে প্রথমেই চালিত করে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান—তার প্রমাণ দেখেছি সোবিয়েত ভূমিতে; এখন দেখছি তা নতুন চীনে। আর, কেন ভারতবর্ষে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান আজও প্রায় অবহেলিত, তা-ও তাই আমাদের পক্ষে বুঝা দুঃসাধ্য নয়। স্বাধীন ভারতের শাসন জনায়ত্ত হয়নি।

কথা হবে, সাহিত্যের নামে এ 'রাজনৈতিক প্রপ্যাগান্ডা' কেন? সংক্ষেপে তার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ শতকরা দু'জনের বা তিন জনের জন্য যে সাহিত্য আমরা রচনা করেছি, তাতে সাহিত্যের সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয়ে আছে, এবং বৃহৎ জনসমাজের সঙ্গে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ স্বচ্ছন্দ না হলে কোনো সাহিত্যের বিস্তার ও বিকাশ সম্ভব নয়। শতকরা আশী জন যদি আমার লেখা পড়তেই না পারে তা হলে আমার লেখার প্রধান একটা পরীক্ষাই অনারব্ধ থেকে যায়। সাহিত্য-বিচারে কে নির্ভুল পরীক্ষক, সে তর্ক এখানে অবান্তর। কিন্তু সকলেই মানবেন যে, জনতার নিকট যে লেখা আপন মর্যাদা লাভ করেছে তাকে অবজ্ঞা করবার উপায় নেই। কালের পরীক্ষায় সে টিকবে কি টিকবে না, তা হয়ত স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু সমসাময়িক জনসমাজের প্রশংসা যে লেখকের অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, এ কথা যে-কোনো লেখকই মানবেন! এমন লেখক হয়ত আছেন যিনি আপন প্রেরণাকেই মনে করেন 'একমেবাদ্বিতীয়ং', পাঠকের মতামতে যিনি উদাসীন। তিনি তা হলে লেখা প্রকাশ করেন কেন? লেখক মাত্রই প্রকাশ চায়। এবং নাল্পে সুখমস্তি। কি বেদনা তা হলে সে-দেশের লেখকের যে-দেশের লেখক জানে—শত মাথা খুঁড়লেও আসলে তার লেখা শতকরা আশীজনের নিকটে সে পরিবেশন করতে পারবে না, নিরক্ষরতার হিমালয় দাঁড়িয়ে থাকবে বিশাল নিষেধের মত তার আশা ও প্রয়াসের বিরুদ্ধে? এই শতকরা আশী জনের মনোভূমিকে আপনার বাণীবিস্তারের উপযোগী করে না তুলতে পারলে সে লেখক শুধু সংকীর্ণ শিক্ষিত সমাজের সংকীর্ণ আবর্তের পরিধির মধ্যেই পাক খেতে থাকবে; তার সাহিত্য-জগৎ থাকবে গণ্ডীবদ্ধ—শিক্ষিত শ্রেণীর দেখা ও শিক্ষিত শ্রেণীর কথা।

লেখার মজুরী

শুধু এই আধ্যাত্মিক দৈন্য নয়, যতক্ষণ বাঙলার শতকরা আশী জন নিরক্ষর ততক্ষণ বাঙালী সাহিত্যিকের আর্থিক দৈন্যও অনিবার্য। ইতিহাসের সাক্ষ্য দেখলেই আমরা বুঝি—এক কালে সাহিত্যিক ছিলেন জনতার চারণ, তার মুখপাত্র। সে যুগের শেষে এল সামন্তযুগ—সাহিত্যিক তখন হলেন রাজপ্রসাদজীবি, হোন তিনি নবরত্নের পারিষদ কালিদাস, কিংবা হোন কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ভারতচন্দ্র। এ যুগ শেষ হলো গণতন্ত্রের যুগ যখন আসে—আসে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে সাহিত্য-প্রচারের সুযোগও,—তখন সাহিত্যিক লাভ করেন আংশিক স্বাতন্ত্র্য—যতটুকু স্বাতন্ত্র্য তার প্রকাশক ও পাঠকেরা তাঁকে দেয়। তাঁর পাঠক বা পে-মাস্টার তখন আর শুধু দু'চার জন মুনিব বা মুনিব-গোষ্ঠী নয়, তারা জনসাধারণ—অবশ্য যে জনসাধারণ ক্রয়ক্ষম। সাহিত্যে শেষ হয় পেট্রনের যুগ, আসে 'রিপাব্লিক্ অব লেটার্সে'র' যুগ—কিন্তু আসে যেখানে সাহিত্যের সে অবস্থা। আমাদের সাহিত্য-রাজ্যে শতকরা আশী জনই অধিকার বঞ্চিত, সাহিত্যিকেরই বা তা হলে ভরসা কতটুকু? শতকরা যে তিনজন তাঁর পাঠক ও সিকি জন সম্ভাব্য ক্রেতা তাদের দৃষ্টিক্ষেত্রতেই,—তাদের চাহিদার হিসাবেই,—সাহিত্যিকের আধ্যাত্মিক অভিযানও সীমাবদ্ধ। অথচ শতকরা এই সিকি জনের বেতনে তার বাস্তব জীবন যাত্রা প্রায় দুর্বহ। তাই, তাঁকে অন্য জীবিকা খুজতে হয়—শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা প্রভৃতি বিষয়কর্ম, আর সিনেমা, রেডিওর প্রসাদ-ভিক্ষু হিসাবে শাসক-গোষ্ঠীর তাঁবেদারী না করে উপায় কি? এমন সাহিত্যিক কে আছেন যে, আজ এই শতকরা তিন জনে-গঠিত পাঠক সমাজের উপর স্বচ্ছন্দে নির্ভর করে তৃপ্ত থাকতে পারেন—আপনার সৃষ্টির আনন্দে? চান না তাঁর লেখাকে শতকরা আরও সাতানব্বুই জনের নিকট পরিবেশনের বিস্ময় করতে এবং লেখার মজুরী বাড়াতে? অন্ততঃ সাহিত্যিকরা যদিবা কেউ তা চান, তাঁদের প্রকাশকদের কিন্তু এইটাই আকাঙ্ক্ষা, তাদের স্বপ্ন—দুর্ভাগ্যক্রমে নিরক্ষরের দেশে তা ব্যর্থ আশা ও ব্যর্থ স্বপ্নও।

শুধু আর একটি কথা পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন—যতক্ষণ দেশের সাধারণ মানুষ পাঠক হিসাবে লেখকের সহযোগী হয়ে না উঠছেন, সার্বজনীন শিক্ষার প্রভাবে সেরূপে তাদের মনোভূমি

সংস্কৃত না হচ্ছে—ততক্ষণ গণ-সাহিত্যের বিকাশও স্বচ্ছন্দ হতে পারে না। সে শুভদিন যখন আসবে তখন সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসতে পারবেন সেই লেখকরা—কৃষকের শ্রমিকের শরিক যে জন, যার জন্য রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কান পেতে—পিপ্‌ল্‌স্‌ রাইটার বা জন-সাহিত্যিক।

শেষ কথা: বলা নিষ্প্রয়োজন, বাঙলা সাহিত্যের ভূমি-সংস্কার আসলে বাঙলার ভূমি-সংস্কারের সঙ্গেই অনেকাংশে জড়িত। অর্থাৎ যতক্ষণ বাঙলার চাষী ভূমির মালিক না হবে, ততক্ষণ সে মালিক ও শাসক শ্রেণীর হাত থেকে আপনার প্রকৃত শিক্ষার দাবিও আদায় করতে পারবে কিনা সন্দেহ। আবার যদি বাঙলার চাষী শিক্ষার অধিকার আয়ত্ত করতে পারে, তা হলে তার ভূমির অধিকারই বা ঠেকিয়ে রাখা যাবে কতক্ষণ?—আর্থিক-সামাজিক ভূমি-সংস্কার যদি আরম্ভ হয় তা হলে সাহিত্যের এই ভূমি-সংস্কারও নিকটতর হবে।

ইং ১৯৫৩

লেখকের ক্লাশ

কিছু দিন পূর্বে আমরা একটি সংবাদ পড়ি—যুদ্ধের শেষে সোবিয়েত ভূমির লেখক ও শিল্পীদের এখন ক্লাশ হচ্ছে, সেখানে সোবিয়েত সঙ্ঘের নানা দেশের নতুন নতুন লেখকেরা 'বিপ্লবী বাস্তববাদ' (ডায়েলেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম্) সম্বন্ধে পাঠ নিচ্ছেন। সংবাদটি পড়ে আমরা সকলেই বেশ কৌতুক বোধ করেছি। 'লেখকের ক্লাশ' শুনলে কার হাসি না পায়?

সম্ভবত আমাদেরই মতই কোনো সংবাদ-সাহিত্যিক ষ্টেট্স্ম্যানে এ নিয়ে ইংরেজিতে একটি সরস সম্পাদকীয় লেখেন। ক্লাশ করে লেখক তৈরী করা হচ্ছে আর "বিপ্লবী বাস্তববাদের" সূত্র অনুসারে লেখকরা লিখছেন—এ সংবাদে সোবিয়েত-ভূমির লেখকদের জন্য অবশ্য অনেকের দুঃখ হয়েছে। রাষ্ট্রের অনুগত হতে গিয়ে শিল্পের ও সাহিত্যের যে কি দশা ঘটে তা আমরা অনেকে অনুমান করতে পারি। ইংরেজ লেখক জন্ লে'ম্যানও সোবিয়েত রাষ্ট্রের ও সোবিয়েত সাহিত্যের এই অবস্থার উল্লেখ করেই কিছু দিন আগে বেশ বিলাপ ও বিদ্রূপ করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। (The Penguin New Writing, No. 24., 'State Art and Scepticism')

যুদ্ধকালীন সোবিয়েত সাহিত্য

লেম্যান লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, বিশেষ করে তিনি আবার ইংরেজ নতুন লেখকদের মুরুব্বি; সাহিত্যে ও জীবনে তিনি নাকি প্রগতিপন্থী ছিলেন। লেম্যানের তিরস্কারের উপলক্ষ প্রসিদ্ধ রুশ সাহিত্যিক নিকোলাই টিখোনোভ্ এর একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি ১৯৪৪-এর লেখা, তখনো সোবিয়েত দেশে যুদ্ধ চলেছে। টিখোনোভ্ লেনিনগ্রাদের কবি; সোবিয়েত লেখক সমিতির তিনি সভাপতি, যুদ্ধ নিয়ে তাঁর নিজের লেখা ছোটগল্প (ইংরেজি নাম Tales of Leningrad) বেশ আদর লাভ করেছে। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত সোবিয়েত লেখকরা কি সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের নেতা হিসাবে টিখোনোভ তাঁর প্রবন্ধে এই যুদ্ধকালীন সাহিত্যের একটি হিসাব দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য—Soviet Short Stories, 1944, Pilot Press, 'The Soviet Writer'. Nikolas Tikhonov.)। তাতে লেখকের প্রশংসা ও কৃতিত্বের কথা প্রচুর আছে; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন সোবিয়েত সাহিত্যের অভাব ও ত্রুটির কথাও আছে। স্বভাবতই সোবিয়েত লেখকের এই আত্ম-সমালোচনা সমালোচক লেম্যানেরও চোখে পড়েছে; নিজের সমালোচনার জন্য টিখোনোভের সে সব উক্তিকে লে'ম্যান কবুল জবাব হিসেবেও ব্যবহার করেছেন। যেমন, টিখোনোভ্ বলছেন, কবিরা অনেকে এখনো তুচ্ছ, বাজে বাগ্‌বাহুল্য ও লেখার শিথিলতা ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি; অধিকাংশ লেখকই যুদ্ধের একটা ধরা-বাঁধা দিক, শুধু বীরত্বের কাহিনী, লিখতেই মশগুল ইত্যাদি। এ সব মন্তব্য থেকে লে'ম্যান প্রমাণ পাচ্ছেন—সোবিয়েতের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, সোবিয়েত লেখকদিগের গৃহীত শিল্প-সূত্র 'সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতা', এবং শিল্পীদের উপর সোবিয়েত কর্তৃপক্ষের প্রভাব। এইরূপ কারণেই রুশ শিল্প ও সাহিত্যে আজ আগেকার যুগের মত সুমহৎ কিছু সৃষ্টি হতে পারছে না—এমন কি, তাতে ফরষ্টার (ইংরেজ), হেমিঙ্গোয়ে (মার্কিন), জয়েস্ (আইরিশ) ও প্রুস্তের (ফরাসী) মত লেখকও একালে জন্মে নি। তাই লিও টলষ্টয়ের 'কসাক' এবং তার সঙ্গে ভান্দা ভাসিলেভ্‌স্কার 'রামধনুর' তুলনা করলে হতাশ হতে হয়।

শিল্পী ও রাষ্ট্র

টিখোনোভ্-এর প্রবন্ধের মূল কথাটি ছিল এই—সোবিয়েত লেখক নিছক লেখক বলে নিজেকে মনে করে না ; এই যুদ্ধকালে সে 'লেখনিক' মাত্র নেই, সেও হয়েছে সৈনিক। লেখক হিসাবেই স্বদেশ-রক্ষার জন্য সে তুলে নিয়েছে তার অস্ত্র ; সে অস্ত্র লেখনী। আবার লেখক হিসাবেই সে দায়িত্ব নিয়েছে সোবিয়েত ইতিহাসের এই বীরত্বময় মহাযুগকে চিত্রিত করবার ভার। "আমাদের লেখকদের কর্তব্য হল সোবিয়েতের অন্যান্য নর নারীর মত, সকল সোবিয়েত 'বুদ্ধিজীবীর মত', মহোদ্যমে বিজয়-লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া। জনগণ, পার্টি ও সরকারের প্রতি যে দায়িত্ব তাঁদের আছে লেখকদের তা উপলব্ধি করা অবশ্য কর্তব্য—তারাও তো এক মহৎযুগের রাষ্ট্রগুরু। লেখকের অস্ত্র লেখনীকেও লাল ফৌজের অস্ত্র শস্ত্রের মত হতে হবে বিজয়ী, সার্থক।"

রাষ্ট্রের নিকটে শিল্পীর এই আত্মসমর্পণ লে'ম্যান বরদাশ্‌ত করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'অবশ্য কর্তব্য' এই কথা শুনলেই ইংরেজ শিল্পীর মন বিদ্রোহ করে (ইংরেজি-পড়া বাঙলা সাহিত্যিকেরও তা করে)। তাঁরা চিরদিন স্বাধীনতা চান ; লেখকের স্বরাজ তাঁদের প্রধান কথা, ন্যূনতম প্রয়োজন। হ্যামলেট্, ডেনমার্কের রাষ্ট্রানুচর রোজেন্‌ক্রান্‌ত্‌জ্ ও গুয়েলডেন্‌স্টের্ণকে যা বলেছিলেন, ইংরেজ লেখকও রাষ্ট্রের নির্দেশ শুনলেই তা বলবে, "হ্যা, দ্যাখো, তোমরা আমাকে কি মনে করেছ? তোমাদের খুশি মত তোমরা আমাকে চালাবে? এই ছোট বাজনাটা থেকে খাশা সুর, চমৎকার সঙ্গীত সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তোমরা কেউ তার থেকে আওয়াজ বের করতে পার না। জাহান্নামে যাও! তোমরা ভাব—এর থেকে সহজেও তোমরা পারবে আমাকে বাজাতে তোমাদের ইচ্ছা মত সুরে?'

সোবিয়েত সাহিত্যের রূপ

জন লেম্যানের এ তর্ক অবশ্য নতুন নয়। আর তাতে যতটা ধার আছে ততটা ভার নেই। কারণ, ইংরেজ সাহিত্যিক তাঁদের ইংরেজি ঢঙের গণতান্ত্রিক স্বরাজের ভক্ত ; কিন্তু মার্কিন সাহিত্যিক ইংরেজদেরও উপরে যায় আমেরিকার গণতান্ত্রিক স্বরাজের বড়াই-আড়ম্বরে। এমন কি, বাংলা সাহিত্যিকও বড়াই করেন 'সৃষ্টির স্বাধীনতার'। অথচ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সকলেই দেখা যায় মনে মনে সেই নিজ-নিজ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ব্যবস্থার বশ, যে-বশ্যতার জন্য লেম্যান টিখোনোভ্ ও রুশ সাহিত্যিক-দের অত ব্যঙ্গ করতে উৎসাহী। 'লেখকের স্বরাজের' অর্থ তা হলে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' নয়। তা ছাড়াও ধনিক-তন্ত্র-চালিত গণতন্ত্রে লেখকের স্বরাজ কতটা মিলে আর 'শ্রমিকতন্ত্রের একাধিপত্যে' লেখকের স্বরাজ কতটা মিলছে, এ তর্কও আছে। তবে এ তর্ক পুরানো, তার মীমাংসাও এক রকম হয়ে গিয়েছে। অবশ্য তাই বলে তর্ক ফুরোয় নি। কারণ যতক্ষণ পৃথিবীতে এই দুই সমাজ ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব চলছে ততক্ষণ দুই সমাজের সাহিত্যেরও এ তর্ক শেষ হবে না। তবে লেম্যান যদি বর্তমান রুশ সাহিত্যের "অধোগতি" হয়েছে প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তাঁর স্বপক্ষে একটা বড় প্রমাণ দাঁড় করানো যায়। সেদিক থেকে লেম্যানের প্রমাণ কিন্তু টেকসই নয়। যেমন, এ যুদ্ধকালে পৃথিবীর বিবিধ ভাষায় সাহিত্য যতটা সৃষ্টি হয়েছে, যতদূর জানা যায়, সোবিয়েত দেশেই সৃষ্টি হয়েছে সব চেয়ে বেশি সাহিত্য। বিশেষ করে, এমন আশার, উদ্দীপনার, মহত্তর জীবন বোধের সাহিত্য এ সময়ে আর কোথায় কতটা জন্মেছে? দ্বিতীয়ত, এ সময়কার রুশ সাহিত্যিকরা যদি টলস্টয় প্রভৃতির থেকে ছোট হন লেম্যান প্রভৃতিরাও তো শেক্‌স্‌পীয়র, থ্যাকারে, ফিল্‌ডিং প্রভৃতির তুলনায় নগণ্য। তা

রবীন্দ্রনাথও বহুস্থলে সৃষ্টির রহস্যকে এরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের এই মর্মের উক্তিও তাই আমরা সহজেই বুঝি; এবং অভ্যাস বশে সহজেই আমরা তা মেনেও নিই। কিন্তু অনেক সাধারণীকৃত সত্যের মতই এই যুক্তি যেমন সত্য তেমনি মিথ্যাও। স্থূল চক্ষেও আমরা সকলেই দেখি—সাহিত্য ও শিল্প দল বেঁধে লেখা হয় না, একা বসে এক-একটি বিশেষ মানুষ এসব সৃষ্টি করেন। বারোয়ারি উপন্যাস হয়ত লেখা চলে, কিন্তু বারোয়ারি কবিতা তো কল্পনাতীত। তবু আমরা দেখি কোনো কোনো শিল্প দল বেঁধেও একত্র হয়ে সৃষ্টি করা হত, এখনো সৃষ্টি করা চলে। যেমন গণনৃত্য, জনসঙ্গীত। আবার, বিশেষ কোনো কোনো শিল্প তো সমবেত সৃষ্টিই, একার সৃষ্টি নয়। যেমন, নাটক, ফিল্‌ম্, সঙ্গতযুক্ত সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, স্থাপত্য। এ সব শিল্প প্রয়োজনানুরূপ সম্মিলিত শক্তির রচনা। নানামাত্রার যৌথ সৃষ্টিই।

আসলে কিন্তু এসব যৌথ সৃষ্টির মধ্য দিয়েও সৃষ্টির মূল রহস্যই প্রমাণিত হয়। সৃষ্টির মধ্যে আমরা দেখি নতুনের আবির্ভাব, সে নতুন জন্মে বিরোধী-শক্তির সংঘাতে সমন্বয়ে। বস্তু ও ভাবের জটিল সম্বন্ধের মধ্যে সৃষ্টিকুশল মন সমন্বয় স্থাপন করে, সঙ্গতি এনে ফুটিয়ে তোলে যে কোনো শিল্প। যে কোনো সম্মিলিত শিল্পেও এই নিয়মই দেখি। তাতে দেখি শিল্পেও বহু রকমের সৃষ্টিশক্তির মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয়েছে। যেমন নাট্যশিল্প। নাট্যকারের সৃষ্টিশক্তি, অভিনেতার সৃষ্টিশক্তি ও রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষের শক্তি—প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটিকে সমন্বয় করে প্রযোজক নাট্যকলা ফুটিয়ে তোলেন। বহুমনের বৈচিত্র্য এরূপ সম্মিলিত কলায়—নাটকে, নৃত্যে, সঙ্গীতে—আবার নতুন ঐক্য লাভ করে, এক বিচিত্রতর সৃষ্টির নিদর্শন হয়ে ওঠে। যে শিল্পকলা শুধু একার সৃষ্টি, তার থেকে এরূপ সম্মিলিত কলা জটিলতর ও বিচিত্রতর। শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তই নেওয়া যাক,—শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক। একক রচনার রস কম গভীর নয়, কিন্তু যৌথসৃষ্টির ঐশ্বর্য আরও বেশি। এরূপ শিল্প তাই সভ্যতার আরও অভিনব আবিষ্কার, মানুষের নিত্য নবায়মান সৃষ্টি-প্রতিভার প্রমাণ।

কাজেই, এইরূপ স্থূল অর্থে 'শিল্পমাত্রই শুধু নির্জনতার সৃষ্টি', এ কথা বলা চলে না। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণও নিশ্চয়ই সেরূপ অর্থে কথাটা বলেন নি। তাঁর কথার অর্থ বোধ হয় এই যে, শিল্প ব্যক্তিমনের দান, ব্যক্তি-সত্তারই বাণী। এ কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেও আমরা বারে বারে শুনেছি। কিন্তু এ কথাও এক অর্থে যেমন সত্য অন্য অর্থে তেমনি মিথ্যা।

ব্যক্তির "ব্যক্তিত্ব"

আসলে কথাটার সঙ্গে একটা পুরানো তর্ক জড়িত হয়েছে – মানুষের ব্যক্তিত্ব একান্ত কিনা, তা অন্য-নিরপেক্ষ কি না, তা সমাজ নিরপেক্ষ কি না। কিন্তু এ পুরানো তর্কের ঘূর্ণাবর্ত ও চোরাবালিতে আজ স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের আটকে যাবার কথা নয়। কারণ, "ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের (ইন্‌ডিভিজুয়েলিজম্) যুগের" ধোঁয়া আজ অনেক কেটে আসছে। আবার সমষ্টিতন্ত্রের (কলেক্‌টিভিজম্) ভুয়া বিভীষিকাও অনেকটা দূর হয়ে যাচ্ছে। তাতেই সহজ চোখেও আজ ব্যক্তির ও সমাজের সম্বন্ধ, তার দেনা-পাওনার রূপ, অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

মোটামুটি এদিকে আজ যা বোঝা যাচ্ছে সংক্ষেপে তা এই:—প্রথমত, ব্যক্তির এই "ব্যক্তিত্ব" গড়ে ওঠে ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের সংযোগে, সংঘাতে। এই ব্যক্তিত্ব গঠনের ইতিহাসে ব্যক্তিও তাই একমাত্র সত্য নয়, পরিবেশও একমাত্র সত্য নয়। দুইই কতকটা সত্য, আর আসল সত্য যা 'ব্যক্তি-স্বরূপ' বা "ব্যক্তিত্ব" বা "ব্যক্তিসত্তা", যা'ই তাকে বলি,—তা এই দুয়ের মিলনে গঠিত নতুন, স্বতন্ত্র এক তৃতীয় সত্য।

দ্বিতীয়ত, ভেতরের বাইরের নানা টানা পোড়েন, বাস্তব ঘটনার ও মানসিক ভাব-কল্পনার নানা ঘাত-প্রতিঘাতে রচিত হয় এই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিস্বরূপ। সেই ব্যক্তিস্বরূপ তাই এক বিচিত্র "প্যাটার্ন।" কিন্তু ভেতরে বাইরে প্রতিনিমিষে ঘটনা ও চেতনা বদলে যাচ্ছে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নতুন

হচ্ছে। তাই ব্যক্তিত্বও একটা মূল ভিত্তির উপরে প্রতিনিমিষে একটা নবায়মান প্যাটার্ণ, একটা বিকাশশীল 'প্রোসেস্‌ও'।

তৃতীয়ত, এই ব্যক্তিত্বের বলেই প্রত্যেক মানুষ যেমন unique, অপূর্ব, অদ্বিতীয়, তেমনি সেই ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও প্রত্যেক মানুষই আবার মানুষ, এমন কি বিশেষ বর্গ-সম্মত (class) মানুষ;— আজকের সমাজে, অনেকাংশে 'প্রমাণ-সই' (standardised) মানুষও সে। তাই একই কালে সে ব্যক্তিও (individual) বটে আবার 'টাইপ'ও বটে, কেউ এটা বেশি, কেউ ওটা বেশি।

চতুর্থত, ব্যক্তি ও পরিবেশের সংঘাতে যে ব্যক্তিত্ব রূপায়িত হয়, মোটেই তা হলে তা একরঙা সরল সত্তা নয়; সেও যথেষ্ট বিচিত্র এবং বর্ধনশীল। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই বৈচিত্র্য বিকশিত হয়, ব্যক্তিত্বেরই তাতে বিকাশের অবকাশ ঘটে। যুগে যুগে দিনে দিনে মানুষকে বাড়তে হয় একটা সমন্বয় করে, একটা সমাহিতি (integration) সাধন ক'রে। যখন সভ্যতা জটিল হয়ে পড়ে, সংঘাতসংকুল হয় তখন ভেতরের বাইরের দ্বন্দ্বও বেড়ে যায়, ব্যক্তিত্বে সরলতা অপেক্ষা জটিলতা বেশি দেখা দেয়, অখণ্ডতা অপেক্ষা খণ্ডতাই নিয়ম হয়ে পড়ে। সাধারণত ব্যক্তিত্ব তখন ভেতরের বাইরের দ্বন্দ্বে, নিরাশায়, ব্যর্থতায় খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। আজকের যুগে সভ্যতার সংকট যেখানে যত গভীর সেখানেই তাই দেখতে পাব ব্যক্তিত্ব তত খণ্ডিত, অসুস্থ, অস্বস্থ, অস্বচ্ছ।

কাজেই, সাহিত্য যদি ব্যক্তিত্বের বাণী হয় তা হলেও সাহিত্য নির্জনতার সৃষ্টি নয়, 'একান্ত মানুষের' বাণী নয়। কারণ, ব্যক্তিত্ব এক বিকাশশীল বিচিত্র প্যাটার্ণ, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের সংযোগে সংঘাতে তা রূপায়িত। তাই এই দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে সাহিত্য পরিবেশেরও বাণী। কোথাও বা সাহিত্যে এ সত্য প্রত্যক্ষ হয়, কোথাও বা তা পরোক্ষ থাকে। ব্যক্তির সৃষ্টিও আসলে এই অর্থে যৌথসৃষ্টি, একক মানুষের নিছক ধ্যান-কল্পনা তা নয়। অবশ্য সাহিত্য যে শুধু পরিবেশের প্রতিলিপিও নয়, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, সাহিত্য বা শিল্প প্রতিলিপি মাত্র নয়, সৃষ্টি। শিল্পী ও সাহিত্যিক যা আছে তাই শুধু গ্রহণ ও প্রত্যর্পণ করে না; যা গ্রহণ করে নিজের চেতনার দান তার সঙ্গে মিশিয়ে তাকে নতুন করে; পরিবেশকে নতুন কিছু তারা যোগায়।

কিন্তু কথা হবে, এই গ্রহণ ও সৃষ্টির কাজে সাহিত্যিক কি কোনো ইস্কুল থেকে কিছু সহায়তা লাভ করতে পারেন?— এই প্রশ্নটিই সোবিয়েত রাষ্ট্রের লেখকের ক্লাশ আমাদের কাছে উত্থাপন করেছে। আশা প্রশ্নটির সঠিক উত্তরের জন্য কয়েকটি কথার অর্থ পরিষ্কার বোঝা দরকার।

ইস্কুলের অর্থ কি?

প্রথম কথা, ইস্কুল বলতেই আমরা একটা গুরুমশায়ি ব্যাপার ভেবে নিই। তার কারণ ইস্কুল সম্বন্ধে শুধু রবীন্দ্রনাথের কেন, আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতাও ভাল নয়। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে এটা আমরা বড় করেই জানি ইস্কুল মানেই একটা খোঁয়াড়—মামুলি নিয়ম কানুন, ধরাবাঁধা পাঠ ও রুটিন। এ সব মিথ্যা নয়। তবু আমরা জানি, একেবারে না পড়ার থেকে ইস্কুলে পড়া ভাল। এমন কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘরে একা-একা বসে পড়ার থেকেও ইস্কুলের দশজনের সঙ্গে বসে একত্র শিক্ষালাভে ব্যক্তিত্ব ঘাতে প্রতিঘাতে বিকাশ লাভ করে। তা ছাড়া, ইস্কুলের মামুলিপনা, গৎ বাঁধা শিক্ষা প্রভৃতি যা ত্রুটি সে সব ছেঁটে ফেলা যায়,—নইলে রবীন্দ্রনাথই বা ইস্কুল গড়লেন কেন? —আর সভ্যতা ক্রমেই তা দূর করে ইস্কুলকে আরো উন্নত করে তুলেছে। সভ্যতা ও সমাজগতির সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষার ধারণা এবং ইস্কুলের রূপ ও রীতি ক্রমেই বিকশিত হয়, এ তো দেখছিই। আর ভুললে চলবে কেন, ইস্কুল সভ্যতারই একটা প্রধান আবিষ্কার। যতই মানুষ বুঝেছে এক পুরুষের অভিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতা আর এক পুরুষকে দান করতে পারলেই সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার সম্ভব, ততই মানুষ চেয়েছে সেই শিক্ষাদানের পথকে সুস্থির ও পরিচ্ছন্ন করতে। পরিবার-পাঠ, গুরুগৃহ থেকে পাঠশালা, তারপর চতুষ্পাঠী, মঠ, বিহার, বিশ্ববিদ্যালয়, এসব এভাবে ক্রমে এসেছে। অন্যদিকে

সে যুগের দক্ষ শিল্পী ও কারিগরের শিক্ষানবীশী থেকে একালের টেক্নিকাল কলেজ, টেকনোলজির বিশ্ববিদ্যালয় এসব সভ্যতার ক্রমাবিষ্কার, তার প্রসারিত চেতনার ও সংগঠন-শক্তির প্রমাণ।

সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা

মোট কথা, ইস্কুল একভাবে না একভাবে আগেও থাকত, কিন্তু তখন থাকত অ-সংগঠিত অবস্থায়। নতুন ছাত্রদের শিক্ষানবীশী করতে হত বাপ-দাদার কাছে বা বড় বড় শিল্পীদের কাছে। সেগুলোই তখনকার ইস্কুল। সে শিল্পী দা-ভিঞ্চিই হোন, কিংবা হোন মিকালএঞ্জিলো। ব্যক্তির বা দলের প্রভাবে এরূপ ইস্কুল এখনও চলে। এখনো আমরা বলি অমুক শিল্পীর ইস্কুল। সেকালের গুরুগৃহে বা শিল্পী বা কারিগরের ঘরে বাধ্যবাধকতা কম ছিল না; বোধ হয় একালের ইস্কুল থেকেও তখনকার সে সব ইস্কুলের আদর্শ ও আবহাওয়া আরও সংকীর্ণ ছিল। যতই সভ্যতা জ্ঞানে কর্মে অগ্রসর হয়েছে ততই এই শিক্ষা ব্যবস্থারও সুব্যবস্থা করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছে। যতই মানুষের সামাজিক দায়িত্ব-বোধ বেড়েছে ততই সমাজকে এই শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করতে হয়েছে, ব্যক্তির বা দলের উদ্যোগের বা শুভবুদ্ধির উপরে আর তা ফেলে রাখা যায়নি।

আবার, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে প্রত্যেক শিল্পই কতকাংশে তার স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে, নতুন নতুন শিল্প-ধারাও আবিষ্কৃত হচ্ছে। যেমন, বিংশ শতকের বাক্‌চিত্র। তাই সভ্য সমাজও বিভিন্ন শিল্পধারা শিক্ষার ব্যবস্থা করবার তাগিদ বোধ করেছে। এ জন্যেই ধরাবাঁধা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আজ অগ্রগামী দেশে ইস্কুল গড়তে হয় কারুবিদ্যার, ইস্কুল গড়তে হয় নাট্যকলার, অভিনয়কলার, এমন কি বাক্‌চিত্রাভিনয়েরও। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজে এরূপ ইস্কুল এখনো কম বেশি ব্যক্তির বা শ্রেণী বিশেষের হাতেই রয়েছে। তারা এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও ব্যবসা হিসেবে চালায়। কিন্তু এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলা উচিত সমাজের ও সৃষ্টির স্বার্থে, তা আজ কেউ অস্বীকার করবে না। সভ্যতার পরীক্ষাই তো এখানে—মানুষের সৃষ্টিশক্তিকে আগেকার যুগের অভিজ্ঞতা-বলে পুষ্ট করে আরও সবল, আরও সুপটু করতে সমাজ উদ্যোগী হয়েছে কিনা, সমাজের সৃষ্টিশক্তিকে সে পুরোপুরি সার্থক করতে পারছে কিনা।

যদি আজ লেখকদের এই আত্ম গঠনের সুযোগ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র যথোচিত ভাবে তৈরী করে দিতে চায় তাহলে তাকে লেখকদের ইস্কুলও তৈরী করতেই হবে। হয়ত প্রথম দিকে অন্যান্য ইস্কুলে যেমন হয়, এখানেও তেমনি ভুলত্রুটি জুটবে। অথবা যেমন ইস্কুল মাত্রেই একটা মামুলিপনা, টুলো মনোভাব (academicism) ও নিয়মপূজা (routine worship) দেখা দেয়, তেমনি এই লেখকের ইস্কুলেও ত্রুটি থাকবার সম্ভাবনা। কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে এরূপ ইস্কুল যে একটা অগ্রবর্তী চেষ্টা তা' বলে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার যুক্তি কোথায়?

লেখা ও শিক্ষাসাপেক্ষ

সঙ্গীতের ইস্কুল, আর্টের ইস্কুল, এ সব না থাকলে আমরা কোনো সভ্য দেশকে সভ্য বলি না। আর লেখকের ইস্কুল শুনলে আমরা হাসি কেন? তার কারণ—লেখা কী, এ সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। লেখা জিনিসটাকে আমরা এখনো দেখি একটা যাদুবিদ্যার মত—যা-কিছু অসামান্য তাকেই "অলৌকিক" বলে আমরা মনে করি। পুরোহিততন্ত্রের আমলের সেই মনোভাব এখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। অবশ্য লেখা একটা আর্ট ব'লে, ক্রাফ্‌ট্‌ ব'লে, বিদ্যা ব'লে তথাপি আমরা মানি। জানি যে, ও-বিদ্যাও কিছুটা শিখতে হয়, অভ্যাস করতে হয়। তাই জুটি

গিয়ে নানা সাহিত্যপত্রের সম্পাদকের আড্ডায়, সংবাদপত্রের কর্তাদের আপিসে, প্রকাশকের দোকানে। সেগুলোও শুধু ব্যক্তির 'কোটারি' নয়, লেখকের ইস্কুলও। তবে আমাদের এসব সাহিত্যের আড্ডা সংগঠিত ইস্কুল নয়, এদেশের ঢিলে ঢালা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক সমাজে কোনো সংগঠন সহজে স্থিররূপ লাভ করে না। মুরুব্বির কাছে বা দল গড়ে সাহিত্য সৃষ্টি যে চলে না, এ কথা আমরা এ দেশে অন্তত কিছুতেই বলতে পারি না। বরং 'দল' না পেলেই আমাদের নতুন সাহিত্যিক মাঁইয়ে যায়; দলের মধ্য দিয়ে সে খানিকটা শিক্ষা, খানিকটা ভাবের আদান-প্রদান, রুচি ও রীতি বুঝবার সুযোগ পায়। নিয়মিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে লেখকের ইস্কুল থাকলে এ সব জ্ঞান, চেতনা ও কলা-কৌশল তার আয়ত্ত হত আরও সহজে, সচ্ছন্দে, ধারাবাহিক ভাবে, আরও পরিচ্ছন্ন রূপে। বলা বাহুল্য, শুধু তাতেই কোনো লেখক আগেকার যুগের স্রষ্টাদের থেকে বড় স্রষ্টা হয়ে উঠবেন তা নয়। তবে নিশ্চয়ই পূর্বগামীদের তুল্য প্রতিভা থাকলে সে প্রতিভা পরিচ্ছন্ন ও পরিপুষ্ট হত এই শিক্ষার সহায়তায় আরো সহজে ও স্বচ্ছন্দে। অন্তত সাধারণশক্তি-সম্পন্ন বহু লোক যে এরূপ সুযোগ পেলে সহজে পরিণত শক্তি আয়ত্ত করতে পারেন তাতে সন্দেহ নেই।

সাহিত্যে মতবাদ

ইস্কুল ও লেখা—এ দুটি বিষয়ে ধারণা একটু পরিষ্কার হলে লেখকের ক্লাশে তত হাসি পায় না। কিন্তু আপত্তির তৃতীয় কারণটি তখনও থেকে যায়। সংশয় জাগে---এ ইস্কুল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের হাতে গেলে বুঝি লেখকের স্বরাজ আর থাকল না। কিন্তু সরকারী আর্ট স্কুলে আপত্তি হবে না কেন? তা ছাড়া, যদিও সে বিষয়ে নতুন করে তর্ক করে লাভ নেই,—আমরা সবাই জানি ব্যক্তির স্বাধীনতার মতই লেখকের স্বাধীনতাও আসলে ধনিক সমাজে নেই, তা বরং থাকতে পারে সমাজতন্ত্রী সভ্যতায়। এ কথার উত্তরে লেম্যানের মত কেউ সে রাষ্ট্রের ১৯১৭—১৯৮৫ পর্যন্ত শিল্পদৃষ্টির ও শিল্পনীতির ভুল ভ্রান্তির কথা তুলতে পারেন, বলতে পারেন---তাদের এখনকার গৃহীত শিল্পনীতি, "সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা" (সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম্), একটা বাজে গোঁড়ামি! যেন ইউরোপের ধনতন্ত্রী দেশের এই কয় বৎসরের এক্সপ্রেশনিজম্, সুররিয়েলিজম্, কিউবিজম্, ভোরটিসিজম্, ডাডাইজম্, প্রভৃতি শিল্পমতবাদ একেবারে নির্ভুল চিন্তার বা সার্থক সৃষ্টির সাক্ষ্য। অবশ্য অন্য কেউ আবার আমাদের স্টেটস্‌ম্যানের রসিক সংবাদিকের মত লেম্যানের কথাই ঘুরিয়ে বলতে পারেন,—বিপ্লবী বাস্তববাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা হবে না। কিন্তু দুজনারই আপত্তি মূলত এক। ডায়েলেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ বা বিপ্লবী বাস্তববাদ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে "সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা" রূপে দেখা দিয়েছে। ধনিকতন্ত্রী দেশে এই সংবাদের বাদে যেমন তার রূপ একটু স্বতন্ত্র হবে, তার নাম হতে পারে 'বিপ্লবপন্থী বাস্তবতা'। সে যাই হোক, এঁদের আপত্তি মূলত এক—সাহিত্য ক্ষেত্রে বিপ্লবী বাস্তববাদ বা ডায়েলেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ খাটবে না।

আপত্তি অনেকেরই। কারণ, অনেকেরই প্রথমত ধারণা নেই- ডায়েলেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ কি, আর সাহিত্য ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কি ভাবে হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেকেরই আবার ধারণা সাহিত্য ক্ষেত্র বুঝি জীবন ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন একটা রহস্যলোক। সাহিত্য বা শিল্প যেন কোনো যাদুবিদ্যা। এই দ্বিতীয় কথাটা নিয়েও আবার আলোচনা নিরর্থক। শিল্পে ও সাহিত্যে বিশেষ করে মানুষের মানস-সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় বেশি। তাই মানুষ তা নিয়ে অনেক বেশি কুয়াসা রচনা করার অবসর পায়। করেছেও তাই। কিন্তু শিল্পও বাস্তব জীবনেরই আর এক দিক, জীবনেরই অচ্ছেদ্য অংশ, এ কথা আজ কোনো সাহিত্য-জিজ্ঞাসুই আর অস্বীকার করবেন না। সাহিত্য মানেই সেই জীবন জিজ্ঞাসা, জীবনরস স্বীকৃতি—বিপ্লবী বাস্তববাদ এ সত্যই জিজ্ঞাসুর চোখে আরও পরিষ্কার করে তোলে। লেম্যান হয়ত তাই বুঝেও বুঝে উঠতে পারেন না টিখোনোভ্-এর এই কথার মানে কী—"In the days of war, as formerly in the days of peaceful construction, the

hero of our literature is Truth."—এ কোনো বিশেষ মতবাদ ঘোষণা নয়, চিরন্তন সাহিত্যাদর্শ।

কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতদের বিপ্লবী বাস্তববাদ সম্বন্ধে এত আপত্তি যে তাঁরা তা বুঝতেও চেষ্টা করেন না। নিজেদের মন-গড়া এক একটা কথাকেই তাঁরা বিপ্লবী বাস্তববাদের প্রতিপাদ্য বলে ঠিক করে নেন। কখনো সে সব কথা একেবারেই ভুয়ো, কখনো আংশিক সত্য,—এবং তাই যথার্থ জিজ্ঞাসুর পক্ষে বিপজ্জনক মিথ্যাও। সে সব অদ্ভুত কথার ফিরিস্তি নিয়ে এখানে আলোচনা অসম্ভব। তবে সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গে যা আমরা মনে রাখতে পারি তা এই:—এসব পণ্ডিতদের ডায়েলেকটিক্যাল আইডিয়ালিজম্-এ আপত্তি নেই, যেমন, হেগেলে। আপত্তি কাণ্টে নেই, প্লেটোতে নেই, বেদান্তে নেই, ন্যায়ে নেই, জীনস্-এ নেই, এডিংটনে নেই,—যত রকমের স্পষ্ট বা বর্ণচোরা ভাববাদ আছে তার কোনোটাতে তাদের আপত্তি নেই। অথচ জগৎ ও জীবনকে সব ভাববাদই কম বেশি মায়া বা গৌণ বলে। ভাববাদ কম বেশি জীবন-বিমুখী। আর যে জীবন-বিমুখী সে জীবনরসের রসিক নয়। তথাপি এদের মতে সাহিত্যিকের জীবন-বোধ ও সৃষ্টিশক্তি সেই জীবন-বিমুখী ভাববাদেই পূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সাহিত্যিকের দৃষ্টি অন্ধ হবে যদি সাহিত্যিক অলৌকিকতায় বিশ্বাস হারান, অতীন্দ্রিয়তায় আস্থা না রাখেন; জগৎ ও জীবনকে বাস্তব বলে জানেন, সত্য বলে মানেন; যদি জীবনসত্যকে তিনি গ্রহণ করেন, জীবন-রসের রসিক হন, মানুষের সৃষ্টিশক্তিতে শ্রদ্ধা রাখেন, মানুষকে মর্যাদা দেন মহা-সম্ভবনাময় ইতিহাসের বিচিত্র-চরিত্র নায়ক হিসাবে।

অথচ আমরা জানি—সাহিত্য হচ্ছে জীবনের স্বীকৃতি—জীবনরসের পরিবেশন। বিশেষ করে, মানুষের স্বীকৃতি—মানব রসের আস্বাদন। 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এ বুঝে মানুস দার্শনিক হতে পারে, মরমী সাধক হতে পারে; কিন্তু রূপস্রষ্টা বা শিল্পী হবার পক্ষে নিশ্চয়ই এ জ্ঞান বাধা। অপর পক্ষে, জগৎ সত্য, জীবন সত্য, এ না জানলে, না উপলব্ধি করলে কোনো শিল্পী কি সৃষ্টি করতে পারেন কোনো শিল্প, কোনো সাহিত্য, কোনো গান, কোনো রূপ? "To be an engineer of the human soul means to stand with both feet planted in the realities of life."

বিপ্লবী বাস্তববাদ অবশ্য মানুষকে কর্মী করে তোলে। কারণ, তা শুধু একটা পুঁথিগত 'তত্ত্ব' মাত্র নয়। তা এক বিশ্ববীক্ষা, আর জীবন-শিল্পেই তার চরম সার্থকতা হয়। এ সম্বন্ধে শিল্পীর সত্যকারের ধারণা জন্মালে তিনি শুধু এই বিশ্ববীক্ষার অধিকারী হবেন, তা নয়, জীবন-শিল্পেরও শিল্পী হবেন। কিন্তু তা হবেন জীবনরসের রসিক রূপে, হবেন নব নব রূপের স্রষ্টা হিসাবে। কারণ সৃষ্টি হচ্ছে বিপ্লবের মূল শক্তি, আর বিপ্লব অর্থ সৃষ্টিশক্তির বন্ধন মুক্তি। অন্তত আর কিছু না হোক, বিপ্লবী বাস্তববাদের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকলে কোনো দেশের লেখকেরই বুঝতে দেরি হয় না—কেন লেখকের ক্লাশ ও 'বিপ্লবী বাস্তববাদের' কথা শুনলে নানা দেশের পণ্ডিত ও মানী লোকেরা বিরোধে উগ্র ও ব্যঙ্গে মুখর হয়ে ওঠেন।

আর, বাঙালী সাহিত্যের অবস্থা জানলে নিশ্চয়ই আমরা মানব—আমাদের লেখকদের লিখতে শেখার কত প্রয়োজন, কত প্রয়োজন লেখকদের পক্ষে ধারাবাহিক শিক্ষার—অর্থাৎ 'লেখকের ক্লাশের।' শুধু 'লেখকের আড্ডাই' যথেষ্ট নয়, চাই নিয়মিত পড়াশোনা, লেখার অভ্যাস, ও-বিদ্যায় দক্ষ মানুষের থেকে পাঠ নেওয়া, আলোচনা-সমালোচনা, এক কথায় 'লেখকের ক্লাশ।' নইলে প্রতিভা জন্মাবে,—কারণ প্রতিভার জন্ম এখনো নিয়ম-রহিত; কিন্তু সুলেখক যথেষ্ট সংখ্যায় তৈরী হবে না, এবং প্রতিভাবানের জন্যও আসর তৈরী থাকবে না।

জাতি গঠনের নতুন পথ

একটি ছোট অঞ্চলের কথা দিয়ে বাঙালী সমাজের প্রস্তাবনা করব—ত্রিপুরার কথা।

ত্রিপুরার কথা ভাবতে গেলে আজ যা মনে পড়ে তা হচ্ছে এই—এই ত্রিপুর রাজ্য বা ত্রিপুর জাতির দেশ ভারতের সীমান্তের একটি দেশ। পর্বত আর বনে মিলে অনেকাংশে তা আমাদের নিকট পূর্বেই অপরিচিত ছিল, এখন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে তা আবার সাধারণের নিকট আরও দুর্গম হয়ে উঠেছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার মধ্যেই যখন যাতায়াত এমন কষ্টসাধ্য, তখন এই সীমান্তের দেশটিতে গমনাগমন সহজ হবে কি করে? তাই একই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দেশ হলেও আজ ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আকাশ পথে হয়, আর নইলে হয় অনেক ঘুরে আসাম ও মণিপুর রাজ্যের মধ্য দিয়ে।

ত্রিপুরা ও বাঙলা

অথচ ত্রিপুরার সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার মানুষের যোগ নাড়ীর যোগ। ত্রিপুরাই ছিল একমাত্র রাজ্য যেখানে মাউণ্টব্যাটন যুগের পূর্ব পর্যন্ত শাসন কার্য বাঙলায় চলত। ত্রিপুরার রাজবংশ ও প্রধানগণ বাঙলা ভাষার ভক্ত ছিলেন। সঙ্গীতে শিল্পচর্চায় বাঙালী সংস্কৃতিতে তাদের দান স্মরণীয়। অবশ্য বর্তমান স্বাধীন ভারতে ত্রিপুরার রাজা নেই, কিন্তু ত্রিপুর জাতিরও যথার্থ স্বাধীনতা লাভ হয় নি। তাদের শাসন চলে নয়াদিল্লীর হুকুমে। তাই ত্রিপুরা ও মণিপুরে যদি বাঙলা ভাষার বদলে 'হিন্দী' নামীয় রাষ্ট্রভাষার বাড়াবাড়ি শুরু হয় তাতে আশ্চর্য হবনা। অবশ্য ত্রিপুরারাজ্যের নিজ ভাষা কি হবে তা ঠিক করবার অধিকারী ত্রিপুরদেশের জনসাধারণ—যেমন তাঁরাই অধিকারী তাদের দেশ শাসনেও।

ত্রিপুরার অধিকাংশ অধিবাসীরই (পৌনে চার লক্ষ) মাতৃভাষা আজ বাঙলা। তবু সাড়ে ছয় লক্ষ ত্রিপুরার অধিবাসীর মধ্যে এখনো তিপরাইভাষীর সংখ্যা সোয়া লক্ষের অধিক। সে ভাষায় তারা নিশ্চয়ই শিক্ষা-দীক্ষা লাভের অধিকারী এবং তাদের সম্মতি হলেই বাঙলা বা হিন্দী ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র রাজভাষা বলে গণ্য হতে পারে, নইলে নয়। এটুকু জানি—সাধারণ ভাবে তিপরাইভাষী মানুষেরা বাঙলা ভাষাকে ক্রমেই স্বীকার করে নিচ্ছিলেন। মাঝখানকার বিপুল দূরত্ব দূর করে নয়া দিল্লীর সাহায্যেও হিন্দী তাদের মনে সে স্থান স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। অসমীয়া (মাত্র ৩ শত জন তা বলে) সে স্থান গ্রহণ করতে আরও বেশি বাধা পাবে। যদি ত্রিপুরার বাঙালী সাধারণ ত্রিপুরার তিপরাই জনসাধারণের সঙ্গে সমস্বার্থে জড়িত হয়ে গণতান্ত্রিক জীবন গঠন করতে উদ্যোগী হন, তাহলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরার নিজস্ব বিকাশের পথ সুস্থির হবে। বাঙালীর মনে রাখা দরকার—ত্রিপুরা রাজ্য আসলে তিপরাই জাতির স্বদেশ, তাকে বাঙালীরও স্বদেশ করতে হচ্ছে তিপরাই জাতির সঙ্গে মিলে মিশে, একাত্ম হয়ে, তাদের দানকে গ্রহণ করে;—তিন শতাব্দী ধরে এইদিকেই ত্রিপুরাও এগিয়ে চলেছে।

এসব দিকে এখন যেসব বাধা আসতে পারে তা আমরা জানি,—মূলতঃ সে বাধা হচ্ছে শাসক-শোষক শক্তির সৃষ্ট বাধা। ত্রিপুরার জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতাতেই তা চিনতে পারছেন। আমার বক্তব্য শুধু এই—বাঙালী বুদ্ধিজীবী, দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালী উদ্বাস্তু ও জীবিকান্বেষী যেন শোষকদের সঙ্গে সাময়িক স্বার্থের চাপে একত্রিত না হন; হলে স্বাভাবিক ভাবেই তিপরাই জাতির নিকট তাঁরা বাঙলা ভাষা, সাহিত্য, বাঙালী সংস্কৃতি প্রভৃতিকে ঘৃণ্য করে তুলবেন।

অবশ্য এই জাতি ও ভাষা বিকাশের সমস্যা ছাড়াও ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যা আছে,—তাও এই সঙ্গে সমাধান করতে হবে। ত্রিপুরা ছোট রাজ্য, তা সীমান্তের অঞ্চল, জনসংখ্যাও মোটামুটি অল্প; দেশ বনাকীর্ণ ও পার্বত্য, পথঘাট, যানবাহন প্রায় নেই। এমন রাজ্যের আধুনিক কালের উপযোগী বিকাশ সহজ নয়, আমরা সবাই তা জানি। কি করে এ বিকাশ ঘটবে, সে সম্বন্ধেও কোন স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। কী ধারায় অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন জাতির বিকাশ ঘটেছে, আমরা তার বিবরণ জানলে একটা দৃষ্টান্ত পাই। এরটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করছি। (মূল বিবরণটি রুশ ভাষায় সোবিয়েত সাময়িক পত্র 'বোপ্রোসি ইস্তোরাই' এর দ্বিতীয় সংখ্যায়, তা সংক্ষিপ্ত করেছে ইংরেজী 'এ্যাংলো সোবিয়েত জর্নাল' ১৯৫৩ এর দ্বিতীয় সংখ্যায়—তারও সংক্ষিপ্ততর সার এখানে উল্লেখ করছি।

সুমেরু প্রান্তের দৃষ্টান্ত

রুশ দেশের সুদূর উত্তরের দুটি জাতি—চাইমির ও এভেংকি জাতি। আমরা বলব তারা সুমেরুর মানুষ। রুশরা বলে 'সুদূর উত্তরের সীমান্তবাসী'। এরূপ ছাব্বিশটি জাতি ছিল সেই অঞ্চলে জারদের আমলে। ২০টি জাতি মিলে লোকসংখ্যা তখন ছিল মাত্র ৬ লক্ষ। আর অঞ্চলটা?—এক একটা এলাকা দুচারখানা অখণ্ড [illegible] থেকে বড়। জাতিগুলি আসলে তখনো যাযাবর, ছোট ছোট পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী [illegible]। ভাষাও তাদের বিভিন্ন। [illegible] সেই কৌম সমাজ তখনো অত্যন্ত প্রাথমিক পদ্ধতিতে জীবিকা নির্বাহ করে। বল্গা হরিণ পালন ও মাছ ধরা—এই ছিল প্রধান জীবিকার অবলম্বন। শুধু তাদের [illegible] দামী চামড়ার বিলাস-দ্রব্য [illegible] ও 'ফার' এর চাহিদা ছিল সারা দেশে সর্বত্র। তাই তার একটা ব্যবসা ঐ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। সেই ব্যবসা সূত্রে শোষক বণিক, জার রাষ্ট্র [illegible] তাদের উপর বসিয়েছে থাবা। তার ফলে কৌম সমাজের মধ্যেও শুরু হয়েছে ছোট ও বড় ধনীর নানা রকম শ্রেণী বিভাগ। ১৯১৫তে দেখা যায় একটি অঞ্চলে ১৭ জন বিদেশী ব্যবসায়ী সমস্ত ব্যবসা হাত করে বসে আছে। অর্থাৎ [illegible] হচ্ছে তখন এই ব্যবসায়ের চাপে কৌম সমাজে ভাঙন ধরেছে, [illegible] ছেড়ে দিয়ে প্রতিবেশী কৌমরা আদান প্রদানের সূত্রে একত্র হতে শুরু করেছে [illegible] হয়ত এরা তারা পরিণত হবে উপজাতিতে (ট্রাইব)। এসবের কৌমের মধ্যেও মালিক ও দরিদ্র নানা শ্রেণী ভাগ হচ্ছে। [illegible] সবার উপরে তাদের বিদেশীর বণিক ও জারের শোষণ।

এল অক্টোবর বিপ্লব ১৯১৭তে। তার পরে কোন দিকে কি পদ্ধতিতে শুরু হল এই কৌম সমাজের শেষ প্রান্তস্থিত জাতিদের বিকাশ, তাই আমাদের প্রথম দেখবার।

'কৌম-সমাজ' থেকে 'জাতীয় অঞ্চল'

বিকাশের প্রথম পর্ব আরম্ভ হল ১৯২০ এ। ১৯১৭-১৯২০ পর্যন্ত বিপ্লবের বিপর্যয়ে এসব জাতের কেউ খোঁজ রাখতে পারে নি। এগিয়ে এল তারপর কমিউনিষ্ট পার্টি। তুরুক্হান্সক এর স্থানীয় পার্টিই কেন্দ্র স্থাপন করলে ক্রাস্নোইয়ারস্ক্-এ। ১৯২১-এ তাদের মাত্র ২৪ জন সদস্য, ১৫ জন শিক্ষানবীশ সদস্য ছিল। কিন্তু তারাই গরীবের মুখপাত্র—শোষক প্রধান ও ওঝাদের বিরুদ্ধে। তাদের উপর অত্যাচারের একশেষ করত সেই প্রধানেরা। এদিকে লেনিনের অনুপ্রেরণায় প্রায় ১১৫ জন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক নানা দলে গেলেন সে অঞ্চলে—জাতিতত্ত্ব গবেষণা করবেন, আর্থিক অবস্থার গবেষণা করবেন, ইত্যাদি। ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব থেকে বৈজ্ঞানিক সংগঠনের সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যই তাঁরা সংগ্রহ করে আনবেন। এই প্রথম পর্বে তবু কৌম সমাজকেই সাময়িক ব্যবস্থারূপে মেনে

নিয়ে জাতিদের সংগঠন শুরু হল। সঙ্গে ছিল যাযাবরদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা—৮টি চলন্ত ইস্কুল। ১৯৩০ পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই চলে কিন্তু আর্থিক জীবনে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল ১৯২৬এ। তার পূর্বেই শোষণের পর্ব শেষ হয়েছে। উত্তর রুশিয়ার শ্রমিক এল কৌমদের শ্রমশিল্পে দীক্ষিত করতে। অন্যদিকে 'যাযাবর ইস্কুল' বাড়ল, তার 'চলন্ত ছাত্রাবাস' চলল যাযাবরের সঙ্গে সঙ্গে। কৌম অর্থনীতিতে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তিত হল। কৌমগুলি সে পদ্ধতিতে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় সরাসরি করতে লাগল। মৎস্য চর্ম, চর্বি শিকারের প্রাণী, বাদাম, বল্গা হরিণের নানা জিনিস কৌম সমবায় সংস্থা বিক্রয় করত। তদতিরিক্ত নানা নতুন বাস্তুশিল্পও সমবায় সংস্থাই শিক্ষা দিতে লাগল। স্কুল এখন বাড়ছে হুহু করে। সমবায় কেন্দ্রগুলি এরূপে সমাজের কেন্দ্র হয়ে উঠে। এভাবে কৌম (ক্ল্যান) সমূহ উপজাতিতে (ট্রাইব) পরিণত হতে উঠছিল তাড়াতাড়ি—যে ধাপে এখন আছে আমাদের মিশ্‌মাই, গারো, সাওতালরা।

এরপর ১৯৩৫-৩৬ এ দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। [illegible] সোভিয়েত [illegible] 'নেপ' বা নয়া অর্থনৈতিক নীতিতে সুস্থির হতে পেরেছে।—বাঙলা দেশে আমরা যে এপর্ব থেকেই যাত্রা আরম্ভ করছি এখনো।

এবার এসব অঞ্চলের অর্থনীতিতেও [illegible] তখন কর্তব্য। ১৯২৯ থেকে সমগ্র সোভিয়েত ভূমি প্রথম [illegible] থেকে। উত্তর অঞ্চলেও দেখি ১৯২৬এ সেখানে শ্রমিক ছিল মাত্র ৮২০ [illegible] ১২০৭ (কৌম সমাজের শ্রমিক) সেখানে শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন লক্ষে। উপরে [illegible] শ্রমিকের সংখ্যা ১৭ হাজার। অবশ্য ১৯৩০এ এই কৌম সংগঠন ভেঙে সাজানো হয় নতুন [illegible] ৮টি জাতীয় এলাকা (ন্যাশনাল এরিয়া)। কিন্তু [illegible] কোন তখন ভেঙে যায় নাই। সেই অংশে উপজাতির (ট্রাইব) মতো গড়ে উঠেছিল। তাদের আর [illegible] অবস্থা নেই। [illegible] প্রধান যেখানে যে উপজাতি আছে তার সঙ্গে অপ্রধান কৌমদের মিলে [illegible] একত্রিত হয়। যেমন [illegible] ১০ [illegible] গোষ্ঠীর। কিন্তু 'তাইমীর' [illegible] অঞ্চলে ছিল দোলগান, নেনেৎস প্রভৃতি পাঁচটি গোষ্ঠীর মানুষ। [illegible] ছাড়া লক্ষ্য রাখা হয়েছিল যে এদের [illegible] আর্থিক ও সাংস্কৃতিক [illegible] এলাকাগুলির পরিমাণেও যথেষ্ট হয়। যেমন [illegible] জার্মানী [illegible] মোট আয়তনের থেকেও বড়। [illegible] অঞ্চল হবে ফ্রান্স ও নরওয়ে একত্র [illegible] তার থেকেও বৃহৎ।—আমাদের উপজাতি এলাকাগুলি কিন্তু বড় নয়, ত্রিপুরা, দার্জিলিং এ [illegible] কঠিন, তা স্মরণীয়।

যাযাবর হল গৃহস্থ

এই সংগঠনের ভিত্তিতেই শুরু হল পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের [illegible]। তার [illegible] এই 'জাতীয় এলাকায়' বিন্যস্ত সংগঠন আরও সুদৃঢ় ও প্রশস্ত হয়ে উঠল—[illegible] ভাগগুলি তাতে মিলেমিশে কাছাকাছি এল। কৃষিক্ষেত্রেও যৌথ উদ্যোগ (কালেক্টিভাইজেশন) প্রবর্তিত হয়েছে। যাযাবর মানুষকে প্রধানতঃ এই যৌথ কৃষি ব্যবস্থা গৃহস্থ করে ফেলল। ১৯৩৬এর পরে তার প্রসার সর্বত্র দেখা গেল। তাই সে সময়কে তৃতীয় পর্ব বলতে পারি। বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেও এখন পরস্পরের আত্মীয় হয়ে পড়ছে। যেমন, 'তাইমীর অঞ্চলের [illegible] যৌথ কৃষিক্ষেত্রে ১৯৪৮এ সভ্যেরা ৪৫ জন ছিল সেনেৎস, ৪২ জন এনেৎস, ১০ জন এলগান ইত্যাদি। একদিকে নৌকা জাল প্রভৃতি পুরাতন জীবিকোপকরণ বাড়ছে, অন্য দিকে এসেছে বিদ্যুৎ, এসেছে কৃষি, সঙ্গে গো-পালন পশুপালন প্রভৃতি। আর এসবের সঙ্গেই চলেছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার। পূর্বের 'যাযাবর বিদ্যালয়' এখন গৃহস্থের স্থায়ী বিদ্যালয় হয়েছে, তার শিক্ষা বিষয়ও হয়েছে প্রধানতঃ বাস্তব জীবনানুসারী, অথচ তার

শিক্ষা পদ্ধতি প্রস্তুত হয়েছে জাতিদের নিজ নিজ ঐতিহ্য অবলম্বন করে। এই বিদ্যালয়গুলিই হয়ে উঠল রাজনৈতিক চেতনার জন্মক্ষেত্র—এখানেই পিতৃশাসিত কোম-ঐতিহ্য ক্রমে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

আরও একটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এই দিকে। তা হল 'সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি' (কাল্‌চারাল বেজ্)। দূরে দূরে এক একটা কেন্দ্রে এসব স্থাপিত হল—বহু যোজন জুড়ে এক একটি এলেকা। সমস্ত জেলার যেন তা' সদর—বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, স্কুল ও ছাত্রাবাস, শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশু-সদন (ক্রেচ), পশুচিকিৎসা কেন্দ্র, হাসপাতাল, সমবায় প্রতিষ্ঠান, স্নানাগার, হাওয়া আপিস, বিদ্যুৎ কারখানা ইত্যাদি থাকত এই সদরে বা 'সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমিতে।' সমাজতান্ত্রিক জীবন গঠনে জনগণকে আকৃষ্ট করাই হল এই 'সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমি'র প্রধান উদ্দেশ্য। পরে ক্রমে এই সব পৃষ্ঠভূমিই হয়ে উঠেছে শহর। যেমন তুরা, সাতাংগা প্রভৃতি শহর;—কারখানা, ক্লাব লাইব্রেরী সব আছে সেখানে।

সংস্কৃতির রূপান্তর

বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র কোমগুলি এভাবে এই সব ব্যবস্থায়—এবং শোষকদের চক্রান্ত ও বাধা না থাকাতে,—১৯২০ থেকে ১৯৪৫ বা ১৯৫০, এই পঁচিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে অতিক্রম করে গিয়েছে দু'তিন হাজার বছরের পথ। বলা বাহুল্য, এই সব জাতিরা সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ভাষার বৈষম্যও আপনা থেকে সহজেই সমাধান করে নিয়েছে। ছোটবড় এসব কোনো কোমের ভাষা ১৯২০ এর আগে লেখা হত না! ভাষাতাত্ত্বিকদের কমিশন ১৯২২এ প্রশ্নটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে। হরফ তৈরী করা ১৯৩২এ সমাপ্ত হয়। মূলত তারা নিলে রুশ হরফ, তবে ওসব ভাষার প্রয়োজনানুরূপ সেই হরফে পরিবর্তনও সাধিত হল। এদিকে কোম ভাষা উপভাষা হতে-হতেই অনেক জিনিস গ্রহণ করেছিল। আধুনিক নতুন জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ভাষী আরও পরস্পরের নিকটতর হয়েছে; ভাষার সঙ্গে ভাষার তফাৎ তা'ই কমেছে। অন্য দিকে স্বভাবতই বহু নতুন শব্দ তারা রুশভাষা থেকে গ্রহণ করেছে। প্রকাশনের হিসেবে ১৯৩৪-এর পূর্বেই এসব ভাষায় মোট ২ লক্ষ পাঠ্য বই ও ১ লক্ষ রাজনৈতিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; আরও ৪ হাজার ছিল বৈজ্ঞানিক এবং ২ হাজার চিকিৎসা শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ক বই। প্রথম থেকেই একটা লক্ষ্য ছিল এই সব জাতির মধ্য থেকে বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করে সাংস্কৃতিক বিকাশের গোড়াপত্তন করা। জন বিদ্যালয়ে তাই উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ১২ শ' ছাত্র তাতে এখন পড়ছে। লেলিনগ্রাদ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সব জাতির ভাষা ও অর্থনীতি পঠনের আরও উচ্চতর ব্যবস্থাও রয়েছে। শিক্ষকদের উচ্চ-শিক্ষণ বিদ্যালয়ও গুটি তিনেক আছে। তাই, এসব জাতির মধ্য থেকেই বেরিয়েছে আজ ডাক্তার, শিক্ষক, কর্মকর্তা (ম্যানেজার), বায়ুবিদ্, পশু-চিকিৎসক প্রভৃতি। সাহিত্যে শিল্পেও তাদের মানদণ্ড বোঝা যায় নিম্নোক্ত তথ্য থেকে—পুশকিন থেকে আধুনিক রুশ লেখক, সকলের গ্রন্থই তাদের ভাষায় অনূদিত হয়েছে; অন্য দিকে সমস্ত রুশিয়া পড়ছে রুশ অনুবাদে এসব নতুন জাতির লেখকদের নিজ নিজ ভাষায় লেখা বই। রুশদের কাছে সুপরিচিত নাম—এভেংকি লেখক এলেক্সি সালকিন, এলেক্সি প্রাস্তাজোব, গ্রিগরি চিন্‌কোব্, নিকোলাই তারাবুকিন, চেরকানব্, নানাই লেখক অকিম চশমার; খান্ত লেখক গ্রিগরি লাজাবোভ্, চুক্‌চি লেখক এর মাগিগিন; নেনেৎ লেখক নিকোলাই ভিল্‌কো—ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপই অগ্রসর হচ্ছে তারা শিল্প-কলায়, মূর্তি-শিল্পে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাট্যে। কোরিয়েফ কিচিগিজের গড়া 'হরিণশিশু' কলকাতায়ও প্রদর্শিত হয়েছিল। প্যারিসের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতেও এসব চিত্রশিল্পীরা সুবর্ণ পদক লাভ করেছেন অনেকে।

হয়তো অনেক কথাই এখনো আমাদের পক্ষে অজ্ঞাত রয়ে গেল; এবং নিশ্চয়ই ওরকম সুমেরু প্রদেশের যাযাবর জাতিদের বিকাশের উদাহরণ থেকে ভারতীয় সীমান্ত জাতিদের বিকাশ সমস্যা বা

ত্রিপুরা রাজ্যের, গারোদের কিংবা গোর্খা, লেপচা, ভুটিয়া বা সাঁওতাল প্রভৃতি বাঙলার ক্ষুদ্র জাতিদের সমস্যার সমাধান আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করা নিবুদ্ধিতা হবে। কিন্তু আমরা বোধ হয় তার থেকে কিছু ইঙ্গিত পাই। যদি কোনো রাষ্ট্র যথার্থ বৈজ্ঞানিক শুভবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে কোন্ মূলনীতি ও মূল পদ্ধতি অনুসরণ করে তার অন্তর্ভুক্ত পশ্চাৎপদ ও সুদূর এলেকার নানা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীদের আত্মীয় করে আপনার করতে পারে, এবং সমাজ বিকাশের ধারায় বহু-ভাষিক জাতিদের ঐক্য কিরূপে দ্রুত অগ্রসর করে নিয়ে যেতে পারে। নীতিটা হচ্ছে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি, গণতান্ত্রিক জাতি সংগঠনের নীতি। আর পদ্ধতিটা সমবেত আর্থিক উদ্যোগের পদ্ধতি ইকোনমিক ও কাল্চারল প্ল্যানিংএর পথ।

বাঙালীরও চাই তাই 'বৈজ্ঞানিক শুভবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র', আর এরূপ প্ল্যানিং। বিশেষ, করে অবশ্য এ দায়িত্ব বাঙালী মধ্যবিত্তের, তারাই বাঙলার বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতি-কর্মী।

১৩৬১ বাং

বাঙালী জীবনে মধ্যবিত্তের সার্থকতা

বাঙালীর যেন আজ কপাল ফিরেছে। যে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" এত কাল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা-আন্দোলনের মাথা হিসাবে বাঙালীর, বিশেষ করে বাঙালী মধ্যবিত্তের, মুণ্ডপাত না করে জলগ্রহণ করত না, ব্রিটিশ পুঁজির সেই মুখপাত্র আজ মধ্যবিত্তের, বিশেষ করে আবার বাঙালী মধ্যবিত্তেরই দুঃখ-দুর্দশায় গলদশ্রুলোচন। পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থসচিব প্রভৃতি রাজ্য পরিচালকেরা এই মধ্যবিত্তের জন্য গণ্ডায়-গণ্ডায় স্বর্গলোক গঠনে উদ্যোগী—মার্কিন 'পয়েন্ট ফোর' কর্মসূত্রানুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে মার্কিন ঋণ হস্তগত হলেই হয়। কীর্তিমান রাজপুরুষেরা ও ভাগ্যবান্ ঠিকাদারেরা তখন জেলায় জেলায় মধ্যবিত্তের স্বর্গ গড়ে ফেলবেন। এসব আশ্বাসে বিশ্বাস করেও সুখ! অবশ্য তাঁদের আশ্বাসটি খতিয়ে দেখলে আর তাতে বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সেই সুখ শান্তির 'পল্লীর নীড়ই' যদি 'মধ্যবিত্ত সমস্যার' সমাধান হয়, তা হলে ভারতের এই অনাদি কালের স্বয়ং-নির্ভর 'ভিলেজ কম্যুনিটি' গত দেড়-শ দু'শ বৎসরে ভাঙল কেন? এবং এখন সেকালের পল্লী-শিল্পের সঙ্গে এ কালের প্রস্তাবিত সাইকেল, টর্চ-লাইট, রেডিওর মেরামতির বিদ্যা জুড়ে দিলেই তা আবার জুড়ে যাবে কিরূপে? আর, সেই কৃষি-নির্ভর সমাজের ওসব মামুলি জোগান জুগিয়ে এ কালের মধ্যবিত্তের জীবিকা-সমস্যা ও জীবন-সমস্যাই বা মিটবে কি করে? আসল কথাটা এড়িয়ে যাবার উপায় নেই—কৃষি-বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লব এই দুই পরস্পর নির্ভরশীল বিপ্লব সম্পূর্ণ না হলে ভারতবর্ষের কোন সমস্যারই সমাধান হবে না; আর ও-দুই বিপ্লবের অর্থ—একই কালে কৃষকের আত্ম-প্রতিষ্ঠা শ্রমিকের আত্ম-প্রতিষ্ঠা; এই বৃহৎ জন-সমষ্টির আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় না করলে মধ্যবিত্তেরও সমস্যার সমাধান নেই, এ মূলতত্ত্বটা মনে রাখা বুদ্ধিজীবীদের সর্ব সময়েই দরকার।

কারা এদেশের মধ্যবিত্ত?

কারণ, কারা এই মধ্যবিত্ত? অতি-পুরাতন ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে লাভ নেই। আধুনিক কালের বাঙালী মধ্যবিত্ত প্রধানতঃ দু'-পর্যায়ের। এক, যাঁরা জমির উপস্বত্ব ভোগ করতেন, প্রধানত মধ্যস্বত্বভোগী; তাঁরাই বরাবরকার মধ্যবিত্ত, অনেকেই তাঁরা ছিলেন উচ্চবর্ণের ও শিক্ষিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যবিত্ত হল প্রধানত এ কালের সৃষ্টি—প্রথম পর্যায়ের থেকেই তাঁরাও উদ্ভূত। গত দেড়-শ বৎসরে এ দেশে যে বৃত্তিজীবী শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে এঁরা তাঁরা। এঁরাও জমির উপস্বত্বভোগী হতে পারেন, কিন্তু এঁদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন শিক্ষিত বৃত্তি, প্রায়ই তা মাথার কাজ (প্রাচীন গ্রীসের মতই এ দেশের 'অধ্যাত্ম-বিলাসী' সভ্যতার মানদণ্ডে বরাবরই হাতের কাজ বহু পরিমাণে হেয় ছিল। অবশ্য ইদানীং শিল্প-সভ্যতার আঘাতে ইংরেজী-শিক্ষিত কারুবিদের প্রতিষ্ঠা দিনে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে)। বিলাতে মধ্যবিত্ত বলতে বুঝায় শোষক-শ্রেণীর ছোট বড় 'বুর্জোয়াকে'! এদেশে আমরা মধ্যবিত্ত বলতে বুঝি প্রায়ই 'শোষিত চাকুরে ও 'পেটি বুর্জোয়াকে', এবং কতকাংশে আধা সামন্তধর্মী শোষক-শ্রেণীর ক্ষুদে জমিদার, তালুকদার, জোতদারদের—দু'দেশের 'মিড্‌ল ক্লাসের' এই প্রধান পার্থক্যটা সমাজ-তাত্ত্বিকদের বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আমাদের মধ্যবিত্তের এই শোষক 'আধা-ফিউডাল' ভাগটি ক্ষয়িষ্ণু। অবিভক্ত বাঙলার একটা হিসাবে দেখা গিয়েছিল দু'চারশ স্বচ্ছল পরিবার থাকলেও এই লক্ষ লক্ষ মধ্যস্বত্ববান্ পরিবারের ভূমি থেকে গড়ে আয় হয় মাসিক ১২্ টাকা মাত্র। অর্থাৎ সাধারণ ভাবে জমির উপর নির্ভর করে এই সব মধ্যবিত্ত পরিবারের ১ জনেরও জীবিকা নির্বাহ সম্ভব নয়। তবু যে এঁরা জমি আঁকড়ে পড়ে

থাকেন তার কারণ—অভ্যাস ও ঐতিহ্য মাত্র নয়, জীবিকার্জনের অন্য কোনো পথ এঁরা দেখতে পান না। আসলে এঁরা বেকার বা অর্ধ-বেকার পর্যায়েরই মানুষ। মধ্যবিত্তের অন্য অংশটি অবশ্য কেরানি, উকিল, ডাক্তার, মাস্টার থেকে দোকানী ও দালাল প্রভৃতি নানা বৃত্তিজীবী। এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ জন আজ বেকার, আরও শতকরা ৩০ জন কিছু না-পেয়েই 'স্বাধীন জীবিকা' গ্রহণ করে (হয় দোকানী নয় দালাল হয়, মাস্টার হয়)—অর্থাৎ তারা আসলে অর্ধ-বেকার, বাকী ৩০ জন বেতনজীবী বা 'ওয়েজ আর্ণার'—মাত্র ৫ জন তাদের মধ্যে 'স্বচ্ছল' অবস্থায়, বাকী ২৫ জনের অবস্থা সংকটজনক। বেতন সামান্য, তার উপরে যেখানে এতবড় প্রকাণ্ড বেকার দলের মানুষ কর্মপ্রার্থী, সেখানে মালিক-শ্রেণী যখন তখন যেভাবে খুশি শ্রমিক ও কর্মচারীদের জবাব দিতে পারে, বেতন কাটতে পারে। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর জীবিকার কোনো স্থিরত্ব নেই। সরকারী কাজেও অনেকেই 'অস্থায়ী'।

মধ্যবিত্তের আয়-ব্যয়

এই মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের অবস্থা কি তার একটা ধারণা পাওয়া গিয়েছিল সরকারী 'ইকোনোমিক এডভাইসারের' একটি রিপোর্ট থেকে*—যে রিপোর্ট ১৯৪৫-৪৬ সালের, অর্থাৎ ১৲ টাকার জিনিসের দাম, যখন যুদ্ধপূর্ব কালের তুলনায় ৩৲ টাকার কম, এবং ৪৲ টাকার দিকে চলেনি। আর সে রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয় সরকারী কর্মচারী ও রেলওয়ে কর্মচারীদের জীবন যাত্রার হিসাব থেকে। অর্থাৎ এ হিসাব অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল বেতনের রোজগারিদেরই অবস্থার সূচক, সাধারণ কেরানি কর্মচারীর নয়। এ রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল—কলিকাতার ও রূপ মধ্যবিত্ত পরিবারের (পরিবারের পোষ্য ৭ জন ধরে) গড়পড়তা মাসিক আয় ২২১ টাকা চোদ্দ আনা, মাসিক ব্যয় ২৭৬ টাকা তিন আনা, বাঙলা ও আসামের মধ্যবিত্ত (পরিবারে পোষ্য ৭ জনের একটু কম) মাসিক আয় ১১৮ টাকা পাঁচ আনা মাসিক ব্যয় ২৭৯ টাকা পাঁচ আনা।

কলিকাতার সাধারণ শ্রমিকের জীবনযাত্রার উপযোগী আয় ও রূপ সময়ে যে সরকারী হিসাবে হওয়া উচিত ছিল প্রায় ১০০৲ টাকা। কেউ কেউ বলেন তা ১৫০৲ টাকা হলেই শ্রমিক 'মানুষের মত' বাঁচতে পারে। অবশ্য বেঁচে মরে-থাকা শ্রমিকেরা যেখানে যা পেত তাই গ্রহণ করতে বাধ্য হত—সে ৩০৲ টাকাই হোক কি বড়োর ৭৫ টাকা।

মধ্যবিত্তের আত্মদ্রোহ

বঙ্গ-বিভাগের পূর্বক্ষণের এই হিসাব থেকে আমরা মনে করতে পারি যে ১) মধ্যবিত্ত হচ্ছে তারা যারা 'আয়ের অঙ্কে' অন্তত পরিবার পিছু ১৫০৲ থেকে ৩০০৲ টাকা মাসিক রোজগার করে। ৫০০৲ টাকার এরূপ রোজগারীকে স্বচ্ছলও হয়ত বলা যেতে পারে। কিন্তু ১৫০৲—৩০০৲ আয়-গণ্ডির মানুষই মধ্যবিত্তের প্রধান অংশ—নিম্ন ও মধ্যস্থিত মধ্যবিত্ত। (২) সাধারণ ভাবে আজ তারা শোষক পর্যায়ের নয়, বরং শোষিত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আজ তাদের স্বার্থ কৃষি-বিপ্লব, শিল্প-বিপ্লব। (৩) ঐতিহ্য হিসাবে আজও তারা শিক্ষিত শ্রেণী, প্রধানত ভদ্রলোক (অনেকাংশে উচ্চ-বর্ণেরও—যাদের বলা যায় 'হোয়াইট কলার লেবার' বা ধোপায় কাচা কাপড়পরা কর্মচারী), চায় ভদ্র জীবিকা, অর্থাৎ প্রধানত কলম পেশার কাজ এবং শিক্ষিত কারুবিদের বৃত্তি—'হাতের কাজে' তারা

* ১৯৫১ সালের পশ্চিম বাংলার লোক-গণনার রিপোর্টের বিশ্লেষণ এই আলোচনার শেষে উদ্ধৃত হল। মূলত পরিবর্তন কতখানি ঘটেছে কিনা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে বুঝা যাবে। বলা বাহুল্য, তাতেও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থা হয় নি।

সাধারণত বিমুখ। এদেশের মজুরদের জীবন, তার দৈন্য-গ্লানি-কুশ্রীতার পীড়িত পরিবেশ, শ্রম-কার্যের জন্য অমর্যাদা-বোধ, আচার আচরণ, এসব এই মধ্যবিত্তের নিকট বিভীষিকা। কারণ, একথা সে মর্মে মর্মে বোঝে যে, সে নিজেও "বেতনের বান্দা" মাত্র (ওয়েজ শ্লেভ), এবং আজকের সমাজে আয় যথেষ্ট না থাকলে কেউ 'ভদ্রলোক' থাকতে পাবে না। শিক্ষায় দীক্ষায় আচারে ব্যবহারে যতই সে বুঝেছে সেই ভদ্র শ্রেণী থেকে আসলে সে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে ও গিয়েছে, ততই এই 'ক্ষুদে মধ্যবিত্তের' চেষ্টা হচ্ছে বেতনজীবী শ্রমিকের জীবনকে দূরে ঠেলে দিয়ে কোনরূপে "ভদ্রলোক" নাম বজায় রাখবার; যে-কোনরূপে নিজের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত স্বার্থকে সর্বস্ব করে চাকরির বাজারে আয়ের হিসাবে একধাপ উপরে উঠে আবার একটু নিঃশ্বাস ফেলবার।

এ ধরণের মধ্যবিত্ত শুধু দৈহিক শ্রম-বিমুখ বা শ্রমিক-বিরোধী নয়, আত্মদ্রোহীও। কারণ তাদের দু'একজন যদিবা একটু উচ্চ আয় লাভের সৌভাগ্য লাভ করে, বর্তমান আর্থিক অবস্থায় শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্তের পক্ষে এভাবে স্বচ্ছল পরিবারে পরিণত হওয়া সম্ভবপর নয়। বরং বর্তমান সমাজে মধ্যবিত্তের অধিকাংশের পক্ষে নিম্ন থেকে নিম্নতর মধ্যবিত্তের পর্যায়ে নামতে নামতে আসলে শ্রমজীবী পর্যায়েই গিয়ে পৌঁছান অনিবার্য। অর্থাৎ আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই শোষিত মধ্যবিত্তের স্থান শ্রমিক-শ্রেণীরই সঙ্গে। বলা বাহুল্য, পৃথিবী জুড়ে মধ্যবিত্তের সংকট মূলত এই: সে শোষিত হয়ে ক্রমশ শ্রমিকশ্রেণীতে পরিণত হতে বাধ্য। কিন্তু পৃথিবী জুড়েই মধ্যবিত্ত তবু এই মানসিক রোগে ভোগে, আত্মদ্রোহে পর্যুদস্ত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিও তার বিরূপতা জন্মে নিজের এই সমাগত ভাগ্যলিপি বুঝে, শ্রমিক জীবনের কঠিন দৈন্যের বিভীষিকা দেখে:—এই হ'ল সাধারণ কথা। যারা কার্যত শ্রমজীবী হয়েও সমাজে শ্রমিক হিসাবে পরিচিত হতে চায়না, এই হল এদেশে সাধারণ মধ্যবিত্ত, অন্যত্র "হোয়া'ট কলার লেবার"।

সমস্বার্থের নতুন চেতনা?

কিন্তু এরই মধ্যে তবু আরও একটি বোধ তার চেতনায় এসেছে—মালিক শ্রেণীর যদৃচ্ছা ছাঁটাই ও বেতন-কাটায়। শোষণে ও পেষণে মধ্যবিত্ত কর্মচারী বুঝেছে সংঘবদ্ধ না হলে তার উপায় নেই। এবং সংঘবদ্ধ হতে হলে একত্রিত হয়ে দাঁড়াতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর পার্শ্বে, শ্রমিকদের সঙ্গে। আবার, পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশে সমাজতন্ত্র ও বিরাট শিল্প-সমাবেশ দেখে বাঙালী শিক্ষিত কর্মচারী বুঝেছে যে, মাথার কাজের কর্মী হিসাবে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা-লাভ সম্ভব তখনি যখন শোষণহীন ব্যবস্থায় ও শ্রেণীহীন সমাজের পত্তন হবে—তখন শ্রমিকশ্রেণী পাবে নেতৃত্ব, একাধিপত্য; আর 'মাথার কাজের মজুর' হিসাবে শিক্ষিত শ্রেণীও পাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সম্মানিত স্থান। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বিপ্লবের সহকারিতা করে, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে স্বার্থবিলোপ করে, তবেই শিক্ষিত সাধারণের ভদ্রচেতনা ও ভদ্র ঐতিহ্যের উদ্ধার লাভ সম্ভব—শ্রেণীহীন সমাজেই সম্ভব 'বুদ্ধিজীবী শ্রমিক' রূপে এই 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর' মানুষের আর্থিক ও নৈতিক সিদ্ধি-লাভ—তা ছাড়া মধ্যবিত্তের কোথাও উদ্ধারের উপায় নেই।

গণতন্ত্রী ঐক্যের সংগঠক

এই দুই অভিজ্ঞতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণ আজ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একত্র দাঁড়াতে উদ্যোগী হ'চ্ছে। ইস্কুল-কলেজ, রেল, ডাক, তার, ব্যাঙ্ক, সওদাগরী আপিসের কর্মচারী সংগঠন দেখলে আর সে বিষয়ে সংশয় থাকে না। বিশেষ করে, এ উদ্যোগ বাঙলা দেশে সম্ভবপর। কারণ এ দেশের

মধ্যবিত্ত আসলে শোষিতেরও মধ্যে অতি দুর্দশাগ্রস্ত—তাদের স্বার্থ আজ এদেশের সমাজ বিপ্লবের এ পর্যায়ে—শ্রমিকের কৃষকের সঙ্গে মূলত দেখা প্রয়োজন কৃষকের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও দেশের শিল্পোন্নয়ন। এদেশের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীও বিশেষকরে এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তকে আপনাদের সহযোগী হিসাবে অভিনন্দন করবে—যদি মধ্যবিত্ত সেই 'ভদ্র' অহমিকার বশে দূরে সরে না থাবেন। কারণ, আমাদের শ্রমিক আন্দোলনের একটা প্রধান প্রয়োজন—শিক্ষিত মানুষের সহায়তা। আমাদের অধিকাংশ শ্রমিক ও কৃষক নিরক্ষর। নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন চালাতে তাঁরা যে 'মাথার কাজের মজুরদের' স্বাভাবিক ভাবে সাহায্য চাইবে তাতে সন্দেহ কি? আর, সেই 'মাথার কাজের মজুর' যদি তার মাথা এই সংগঠনকর্মে খাটাতে না চায় তা হলে তার মত মূর্খ আর কে? তেমনি, নিজেদের কৃষকসভা চালাতে, গ্রামের সমবায় সংস্থা চালাতে, পল্লী-সংগঠনে গ্রামের কৃষকও যে প্রথমেই ধরবে তার গ্রামের শিক্ষককে, গ্রামের ডাক্তারকে, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই।

আজকের গণতান্ত্রিক বিন্যাসে তাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-গঠনে প্রধান সংগঠক হতে পারেন, তাতেই তার সার্থকতা। কাজের ক্ষেত্রে একবার এগিয়ে গেলে দেখা যাবে—শুধু রেলে ডাকে-তারে নয়, প্রত্যেকটি বড় শিল্পেরই শ্রমিক সংঘে আজ কেরানি ও কর্মচারীরা আপনার স্বার্থে যেমন যোগ না দিয়ে পারবেন না, তেমনি তাতে যোগদান করলে, শ্রমিক সাধারণের সহযোগে, নৈকট্যে, বাস্তব স্পর্শে আপনার আর্থিক মানসিক চেতনাকে তাঁরা সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ় করতে পারবেন।

বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত যখন শূন্যবিত্ত, তখন তাদের প্রধান সার্থকতার পথ হল, নিজেদের জন্মগত 'শ্রেণী'-মার্কা ত্যাগ করে বুদ্ধিজীবীরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। আর্থিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় মধ্যবিত্তের বিলোপ যেমন নিশ্চিত, বুদ্ধিজীবীর বিকাশও তেমনি ভাবী সমাজে আরও সুনিশ্চিত।

বাঙলার বাস্তব রূপ

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী"—

দেশ অর্থ যে মাটি ও মানুষ, তা আমরা সহজে বুঝতে চাই না।

একালের এই দেশপূজার গোড়াপত্তন করে গিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' এ তার সূচনা, 'আনন্দমঠ' এর মাতৃমূর্তি কল্পনায় ও 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে তার বিকাশ। বঙ্কিমের মাতৃমূর্তি ছিল বঙ্গমাতার মূর্তি, ভারতমাতার মূর্তি নয়। কমলাকান্তের 'দুর্গোৎসব' ও 'বন্দে মাতরম্' গানে তা সুস্পষ্ট। বাঙলার রূপ বঙ্কিম যে চক্ষে দেখেছিলেন তা প্রধানত ভাব তান্ত্রিক মানুষের চক্ষু, ভাবুক ও দেশ প্রেমিকের চক্ষু। অনেকাংশে এই দৃষ্টিতেই বাঙালী স্বদেশকে দেখে এসেছে, সে দৃষ্টিতে স্ট্যাটিসটিক্স্, গেজেটিয়ার তুচ্ছ, ভাবময় পরিকল্পনাই প্রধান।

পরিসংখ্যানের বাঙলা

অথচ বঙ্কিমের সমকালেই বাঙলা দেশের খড় মাটিতে তৈরি একটা তথ্যগত রূপ শাদা চোখে ধরা যেত। ইংরাজ প্রমুখ সাম্রাজ্য-ভক্তরা তৎপূর্বেই পরিসংখ্যান সংকলন করছিলেন। এবং যত ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হোক, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের আদমশুমারিও প্রথম আরম্ভ হয়। তাতে সমসাময়িক বাঙলার রূপ বিচ্ছিন্ন বিস্রস্ত তথ্যাবলীর মধ্য দিয়েও প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমও তখনকার ইংরেজ-শাসনের নামাঙ্কিত প্রদেশকেই বাঙলা দেশ বলে ধরে নিয়েছিলেন। ১৮৭২ এর আদমশুমারিতে বাঙলা প্রদেশ বলতে বোঝাত এখনকার পশ্চিম বাঙলা, পূর্বপাকিস্তান এবং তদন্তর্ভুক্ত এখনকার বিহার, ওড়িশা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি (তৎকালীন ১১টি) সরকারী বিভাগ। তার আয়তন ছিল ২,৪৮,২৩১ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ছিল ৬,৬৮,৯৬ ৮৫৯। 'সাতকোটি বাঙালী' বললে তখন বাঙালীর মধ্যে শুধু এ ভূভাগের গোর্খা, সাঁওতাল প্রভৃতিদেরই ধরা হত না, নির্বিচারে আমরা ওড়িয়া, বিহারী ও অসমীয়াদেরও বাঙালী নামের টিকিট মেরে দিতাম। তখনকার দিনে বঙ্কিমের বাঙলাও ছিল সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকল-নিনাদ করালে দ্বিসপ্তকোটি ভুজৈধৃত খরকরবালে'র বাঙলা। সে বাঙলা তার বাহুবিস্তার সংবৃত করে ১৯১১ সালের আদমশুমারিতে দেখা দিয়েছিল ৮৪,০৯২ বর্গ মাইলের ৪,৬৩,০৫,৬৪২ জন অধিবাসীর বঙ্গদেশ হিসাবে। ১৯৪১ সালে এর আয়তন দেখি—৮২,৮৭৬ বর্গ মাইল, আর জনসংখ্যা ৬,১৪,৬০,৩৭৭। এই হয়তো অখণ্ড বাঙলার (মানভূম পূর্ণিয়া ও ধুবড়ি শ্রীহট্ট কাছাড় বিহীন, দার্জিলিং সিকিম সমেত) শেষ রূপ।

১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে এসে প্রথমেই বলতে হয়—বাঙালীর সেই বাঙলা আর নেই, এখন আছে 'পশ্চিম বাঙলা' ও 'পূর্ব পাকিস্তান'। ইতিহাসে বাঙালী ছিল চিরদিনই বাঙালী, সে চট্টগ্রামের হলেও 'বাঙালী,' মেদিনীপুরের হলেও 'বাঙালী', তার ভৌগোলিক ও জাতিগত একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল—এখনো তা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রগত বিচ্ছেদে তার অখণ্ড রূপকে এখন আর সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায় ছাড়া পরিসংখ্যানের হিসাবে ধরা যাবে না। ১৯৫১ সালের আদম-শুমারির বিবরণে পাব 'পশ্চিম বঙ্গের' হিসাবটুকুই মাত্র—অখণ্ড বাঙলার ছ-আনির তথ্য। বাকি দশ-আনির তথ্য করাচীর দপ্তরখানায় ঘষা-মাজা হয়ে উঠবে। সেই দশ-আনির তথ্য এই ছ'আনির তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে ষোলো-আনা বাঙলার রূপ ফুটিয়ে তোলা যাবে কিনা সন্দেহ। এই দুর্ভাগ্য ও দুর্দৈবের দানকে মেনে নিয়ে ৩১,৫২৪ বর্গ মাইলের ২,৪৯,৯৭,৯৪২ জন অধিবাসীর এই পশ্চিম বাঙলার ১৯৫১ সালের আদম-শুমারির বিবরণী আমাদের সামনে বাঙলার বাস্তব রূপ তুলে ধরেছে (পুরুলিয়া

সদরের খণ্ডিত অংশ ও পূর্ণিয়ার পূর্বাংশ ১৯৫৬ এর প্রস্তাব মত পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলে এই ভূমি পরিমাণ আরও ৩ হাজার বর্গ মাইল ও জনসংখ্যা ১৪ লক্ষর মত বৃদ্ধি হবে। শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র আই-সি-এস্ মহাশয়ের প্রণীত এবারকার এই রিপোর্ট (ভারতীয় আদম-শুমারির ৬ষ্ঠ ভল্যুম, 'পার্ট ওয়ান-এ') ও 'আমার দেশ' প্রকাশিত হবার পর পশ্চিম বাঙলার তথ্যগত পরিচয় গ্রহণে আর কোনো অসুবিধা নেই।

সর্বাঙ্গীণ চিত্র

আদম-শুমারি একটা বৈজ্ঞানিক কর্ম হিসাবে একালে গণ্য হয়েছে। শুধু লোকগণনা নয়, লোক জীবনের আর্থিক-সামাজিক বা তথ্যগত পরিচয়রূপে এখন তা পরিণত হচ্ছে। অবশ্য সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সুনিশ্চয়তা ভারতীয় আদম-শুমারির হিসাবে এখনো আশা করা যায় না; কারণ, তদনুরূপ ব্যবস্থাপনা এখনো দুঃসাধ্য রয়েছে। একথাও সবাই জানি, ১৯৪১ এর বাঙলার আদম-শুমারি হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা বাড়াবার দ্বন্দ্বে অনেক বিষয়ে প্রায় অগ্রাহ্য করবার মতো—১৯৫১ সালের বিহার ও আসাম রাজ্যের আদম-শুমারি যেমন বাঙালী-কমানোর তাড়নায় অংশবিশেষে পরিত্যাজ্য। ভাগ্যক্রমে পশ্চিম বাঙলায় সাধারণভাবে এই ১৯৫১ সালের আদম শুমারিতে এমন ত্রুটি ঘটবার কারণ ছিল না। শুমারের কর্তৃপক্ষও নিজেদের তথ্যনিষ্ঠায় তাই যেখানে প্রয়োজন বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন, এবং জনসাধারণের সহযোগিতা লাভেও তাঁদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটে নি। এবারের পশ্চিমবঙ্গের আদম-শুমারি তাই শুধুমাত্র দপ্তরখানার চোখে দেখা 'বাঙলার রূপ' হয় নি, হয়েছে বৈজ্ঞানিকের চোখে দেখা 'বাঙলার রূপ' এবং সাধারণ বাঙালীর চোখে দেখা 'বাঙলার রূপ'। আদম-শুমারির ইতিহাসে এ জিনিস শুধু অভিনব নয়, ভারত-রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যের আদম শুমারির বিবরণের তুলনায়ও পশ্চিম বাঙলার আদম শুমারির বিবরণ একটি ব্যতিক্রম—শুধু তা আদম-শুমারিও নয়, পশ্চিম বাঙলার একটি সর্বাঙ্গীণ চিত্র।

তার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য দেখলেও চমৎকৃত হতে হয়। প্রকাণ্ড ডেমি কোয়ার্টো আকারের (ভারতীয় আদম-শুমারির ৬ষ্ঠ ভল্যুমের অন্তর্গত) খণ্ডগুলি ও তৎসম্পর্কিত গ্রন্থগুলি তার সাক্ষ্য। সাধারণ ভাবে ১ ৫১ এর বাঙলার এই আদম শুমারি-সাহিত্যের হিসাব নিলে পঃ বাঙলার রূপ আজ দেখা যাবে।

বর্তমান বিবরণ

মূল বিবরণ ("রিপোর্ট") 'পার্ট ওয়ান-এ' ৫৮৭ পৃষ্ঠার বিবরণী। 'ভূমিকা' ছাড়া এই বিবরণীতে আছে বড় বড় পাঁচটি পরিচ্ছেদ, এবং পরিশেষে (নির্ঘণ্ট ছাড়া) পাকা আঠারো পৃষ্ঠার একটি মূল্যবান গ্রন্থপঞ্জী। 'ভূমিকার' প্রথম ভাগে আছে পশ্চিম বাঙলার গেজেটিয়ার বা ভৌগোলিক কোষ, অর্থাৎ ফল, জল, মাটি ও মানুষের খবর, যা সাধারণতই শুষ্ক, কিন্তু জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে নিরর্থক নয়, এমন কি কৌতূহলোদ্দীপকও হতে পারে। যেমন, বাঙলার নদ-নদী ও জলসেচ বাঁধের কথা (অনুচ্ছেদ ১০৬-১১৩) পড়তে কি কারও শ্রান্তি আসবে? কিংবা (১৯৩ অনুচ্ছেদের) যন্ত্র-শিল্পের বিন্যাস বিষয়ে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য কি কম উল্লেখযোগ্য? কারণ, মূল-শিল্পের বিচারে কলিকাতা-হুগলি এলেকা অপেক্ষা আসানসোলই যন্ত্র-শিল্পের পক্ষে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এলেকা। অথচ আসানসোলে বাঙালী সে তুলনায় কোথায়? মাটি ও মানুষের এই বর্ণনার পরে ১৯৫১-র জীবনযাত্রার পশ্চাৎপট হিসাবে দেখা যেতে পারে ১৯৩০ থেকে ১৯৫০, এই বিশ বৎসরের বাঙলার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মেদিনীপুরের বান-তুফান, দামোদরের বন্যা, পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে ১৯৪৭-এর বঙ্গ-বিভাগ, এবং ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার আর্থিক দুরবস্থার কথা এখানে পাই।

উপজীবিকার শ্রেণী

আর্থিক হিসাবের দিক থেকে আটটি শ্রেণী বা জীবিকা-সম্পর্কিত বর্গে ভারতীয় সমাজকে 'আন্তর্জাতিক শ্রেণী-বিভাগ রীতি' অনুসরণ করে এবার আদমশুমারিতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি এরূপ বর্গ বা শ্রেণীর ১৯৩০—১৯৫০ পর্যন্ত আর্থিক অবস্থা পশ্চিম বাঙলার বিবরণীতে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে বিবেচিত হয়েছে। এ বর্গ-বিভাগ পদ্ধতি সর্ব-ভারতীয়, শুধু পশ্চিম বাঙলার নয়। পঃ বঙ্গে বর্গগুলির অবস্থা নিম্নোক্ত ধরণের ঃ

কৃষিজীবী বর্গ চারিটি ঃ (মোট জন সংখ্যার অনুপাতে ৫৭.২ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল)

॥ ক ॥ প্রথম বর্গ—মালিক চাষ, নিজের জমি নিজেই চাষ করে (মোট ৩২.৩৪ শতাংশ)।

দ্বিতীয় বর্গ—ভাগচাষী, যে-জমি চাস করে তার মালিক সে নয়। (মোট ১২.০১ শতাংশ)।

তৃতীয় বর্গ—ক্ষেত-মজুর বা কৃষি-মজুর (মোট ১২.২৬ শতাংশ)।

চতুর্থ বর্গ—খাজনা ভোগী জমির মালিক, জমিদার, জোতদার প্রভৃতি (মোট ০.৬০ শতাংশ)।

॥ খ ॥ অ-কৃষিজীবী চারটি বর্গ (মোট জনসংখ্যা অনুপাতে ৪২.৮ শতাংশ অ কৃষিজীবী)। যথা ঃ

পঞ্চম বর্গ—শিল্পাশ্রয়ী উৎপাদক (মাছধরা, পশুপালন, কল-কারখানার মিস্ত্রির কাজ প্রভৃতি নানা কারুবিদ্ ; মোট ১৫.৩৬ শতাংশ)।

ষষ্ঠ বর্গ—ব্যবসায়ী (দোকানী, পশারী, বণিক ; মোট ৯.৩২ শতাংশ)

সপ্তম বর্গ—পরিবহণ কর্মী (মোট ৩.০৫ শতাংশ)।

অষ্টম বর্গ—বিবিধ বৃত্তিজীবী (এই বর্গেই প্রধানত বাঙালী 'ভদ্রলোক' বা শিক্ষিত 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণী গণ্য হয়। মোট ১৫.০৬ শতাংশ)।

১৯৩০ থেকে ১৯৫০, এই বিশ বৎসরে পশ্চিমবাঙলায় প্রধানত মহাযুদ্ধ ও মন্বন্তরে এবং শেষে দেশ বিভাগের ঘাত-প্রতিঘাতে যে গুরুতর বিপর্যয় ঘটেছে এখনকার বাঙালীর জীবনযাত্রা তাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। পশ্চিমবাঙলার বিবরণীতে বর্গানুক্রমে সেই বিপর্যয়ের ফলাফল উপস্থিত না করলে কিন্তু সে-কাহিনী অনেকাংশে অবাস্তব থেকে যেত। শুমারি থেকে দেখি তীব্র মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণত কল কারখানার শ্রমিকদের বেতন যুদ্ধকালে খানিকটা বেড়েছিল, কিন্তু কৃষিজীবীদের (প্রথম থেকে চতুর্থ বর্গের) আয় তত বাড়েনি এবং মধ্যবিত্তদের (অষ্টম বর্গের) আয়ও বাড়েনি। ব্যবসায়ী ও পরিবহন-জীবীদের আয়বৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি যে অনুপাতে হয়েছে সে অনুপাতে শ্রমিকেরও আয় বাড়েনি—টাকার বেতন বেড়েছে, আসল বেতন বাড়েনি। জীবনযাত্রার মান সমগ্রভাবে উচ্চতর হয়নি, 'বিবরণীর' সাক্ষ্য সে সম্বন্ধে পরিষ্কার।

এই মূল কথা মনে রেখে দেখি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পঃ বঙ্গ শিল্পে একটু উন্নত। কিন্তু, সেই সঙ্গে আরও দু'একটি তথ্য লক্ষণীয়। যেমন, কৃষিজীবীদের মধ্যে যারা সত্যই চাষ করে তারাই অনেকে দুর্দশাপন্ন, আর তাদের মধ্যেও আবার অনেকে হচ্ছে তফসিলী সম্প্রদায়ের ও খণ্ডজাতের (সাঁওতাল, গারো ইত্যাদি উপজাতির) লোক। ৪৭ লক্ষ তফসিলী হিন্দুর মধ্যে ৩২.৭৫ লক্ষ কৃষিজীবী, আর ১১.৭৫ লক্ষ খণ্ডজাতির মধ্যে ৯.২৫ লক্ষ কৃষিজীবী। তাদের জীবনে উচ্চতর আশা নেই ; কৃষিতেও তাই উৎপাদন ব্যাহত। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় নিজের জমি নিজে চাষ করে বা নিজের তত্ত্বাবধানে চাষ করে—এমন কৃষিজীবীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গেই সর্বাপেক্ষা কম। এরূপ দেশে জমির ও উৎপাদনের অবনতি অনিবার্য। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে, কৃষক জমির মালিক না হলে কৃষিসংকট দূর হবে না।

অন্যদিকে দেখা যায় লোকের অনুপাতে জমির মালিক বা খাজনা ভোগীদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ও কায়স্থের অনুপাতই বেশি। এরাই শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পায়, 'ভদ্রলোক' শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলতে তাদেরই প্রায় একচেটিয়া।

'উপার্জকের' হিসাব দেখলে দেখা যায় শতকরা ৫৭'৪ জন কর্মক্ষম ব্যক্তির মধ্যে মাত্র ৩১'৫ জন 'উপার্জক'। গত ৫০ বৎসর ধরে কৃষিতে উপার্জকের সংখ্যা কমেছে। (১৯৫১তে ১৪'৯ শতাংশে তা দাঁড়িয়েছে)। কিন্তু অকৃষি-উপজীবিকায়ও তাদের স্থান হয় নি। কারণ, ৫০ বৎসরেও সে উপজীবিকার হার বাড়েনি।

বেকার বা শিক্ষিত বেকারের (প্রবেশিকোত্তীর্ণ) হিসাব নেই। কিন্তু ১৯৫২তে 'ক্যাপিটেলের' হিসাবে দেখা গিয়েছিল কলিকাতায় প্রতি ৪ জন কর্মক্ষমে ১ জন বেকার। সরকারী চাকরির জন্য (ভারতে) প্রতিমাসে ২৫০০ শিক্ষিত লোক দরকার, (বৎসরে গড়ে ৩০,০০০); ভারতের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে ডিগ্রিই পায় বৎসরে ৪৫ হাজার। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লীর তুলনায় কলিকাতায় বেকার ডিগ্রিধারীর সংখ্যা আবার সর্বাধিক। অর্থাৎ একটা নিঃস্ব শিক্ষিত বৃত্তিজীবী অংশ আমাদের সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লোকবৃদ্ধি

১৯৫১-র বিবরণী এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান পশ্চিম বাঙলার তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। স্বভাবতই প্রথম পরিচ্ছেদ হচ্ছে জনসংখ্যার বিবরণ। তার প্রথম পর্বে (সেক্‌শন) লোকসংখ্যার বণ্টন, বিভাগ, বৃদ্ধি, জন্ম, মৃত্যু আর জীবিকা-বিন্যাসের কথা, ২৫০ পৃষ্ঠা জুড়ে এই তথ্য-বিশ্লেষণ। এ-পরিচ্ছেদের শেষাংশে ৭ম ৮ম পর্বে (পৃ ৩৬৩ থেকে) যে-সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে তা এই যে, আমাদের লোকবৃদ্ধি ১৯২০ পর্যন্ত অস্বাভাবিকরূপে ব্যাহত হয়ে এখন স্বাভাবিক গতিতে বাড়ছে; আরো কিছুকাল এই হারেই বাড়বে; এই লোকবৃদ্ধি মোটেই ব্রিটেন প্রভৃতি অন্যদেশের তুলনায় অত্যধিক গতিতে হয়নি। কাজেই নিছক লোকবৃদ্ধির জন্য সমাজতাত্ত্বিকদের দুর্ভাবনা নিরর্থক। এবং আমাদের আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতির জন্য এই লোকবৃদ্ধিকে দায়ী করাও অহেতুক। সর্বভারতীয় আদম-শুমারির কর্তারা অবশ্য এই অভিমতের বিপরীত সিদ্ধান্ত করেছেন। ভারতের লোকবৃদ্ধি ভারতবাসীর শুধু নয়, পৃথিবীর পক্ষেও আশঙ্কাজনক, এ-ধুয়াটা কয়েক বৎসর ধরে মার্কিন-ব্রিটিশ মহলের দ্বারা সুপ্রচারিত হচ্ছে। তাদের প্রভাবিত ভারতীয় অধ্যাপক-গবেষক মহলেও তাই এই কথার পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হয়; এবং ভারত-সরকারের পরিচালক পণ্ডিত নেহরু ও স্বাস্থ্য-মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকাউরও জন্মহ্রাসের উপদেশ দেন। কিন্তু মনে হয় অতি-সম্প্রতি তাঁদের এ-বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে পারে। কারণ, চীন ফেরত ভারতীয় এঞ্জিনিয়াররা আবিষ্কার করেছেন যে, চীনের সরকার বহু উন্নতির কাজে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের যন্ত্রবলের অভাব লোকবল দিয়ে পূরণ করে; এ দেশের লোকবলও নানা উন্নয়নের কাজে সেভাবে সার্থক করা যেতে পারে। অর্থাৎ লোকবলটা যে একটা পরমাশ্চর্য বল—এ-খাটা হয়তো এখন ভারতীয় পণ্ডিত ও শাসকেরা পুনরাবিষ্কার করতে পারেন। তা হলে এ-বিষয়ে ভারতীয় আদমশুমারির সিদ্ধান্ত অপেক্ষা কে এম পানিকর (রিপোর্টে উদ্ধৃত) ও অশোক মিত্রের সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তই তাঁদের নিকট বেশি গ্রাহ্য হয়ে উঠবে। একদিকে কৃষি-বিপ্লব সম্পন্ন করে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং জমির উপর বৃত্তিহারা জনতার চাপ কমানো, আর অন্যদিকে কলকারখানা, পরিবহণ, ব্যবসা প্রভৃতি জীবিকা পথকে প্রশস্ত করে তোলা—এই হবে আমাদের জনসমস্যা সমাধানেরও এ-সময়ের প্রথম ব্যবস্থা।

"পল্লীবাসী"দের বিষয়ে আলোচনাকালে বিবরণী অধিবাসীর ঘনতা, বর্গাদার ও ক্ষেত-মজুর জাতীয় ভূমিদাসের সংখ্যাবৃদ্ধি, অন্যদিকে জমির ক্রমাগত অনুর্বরতাবৃদ্ধি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিয়েছে যে, বর্তমানে যে-গতিতে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার চলেছে, কিংবা যেভাবে কৃষি-জীবন ও কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাতে বিশেষ উন্নতি হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে "শহরবাসী"দের বিষয়েও ওরূপ বিশদ তথ্য-বিশ্লেষণ করে এই কথাই রিপোর্ট সিদ্ধান্ত করেছে যে, বিদেশী পুঁজির রাজত্বে গ্রাম গিয়েছে জঙ্গলেপুড়ে; পূর্বেকার শহরগুলিও

প্রায়ই গিয়েছে ম্লান হয়ে ; আর এ কালের শহরে স্থাপিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের 'বাজার'—এদেশের কাঁচামাল রপ্তানির কেন্দ্র ও বিলাতের শিল্পজাতদ্রব্য আমদানির কেন্দ্র। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, পশ্চিম বাঙলার যন্ত্রশিল্পে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে সাধারণভাবেও শ্রমিক সংখ্যা বাড়েনি—কৃষিকর্ম ও গ্রামের উপরই চাপ পড়েছে জনতার। অপরদিকে এই সিদ্ধান্তটিও স্মরণীয়—বাঙালী শ্রমিক যে কারখানার মজুর বেশি হয়নি তার কারণ এ নয় যে বাঙালী কর্মকুণ্ঠ, বরং কারণটা এই—অ-কুশল শ্রমিকই বাঙলার এ সব কারখানায় বেশি প্রয়োজন ; কিন্তু বাঙালী শ্রমিক মাথা ও হাত খাটিয়ে কুশলী-শ্রমিক হয়ে উঠতে পারে, বাঙলার যন্ত্রশিল্পে তাই তার চাহিদা নেই। শিল্পবিপ্লব এলে কারিগর (টেক্‌নিশিয়ন) ও কারুবিদ্‌ বুদ্ধিজীবী রূপে বাঙালী শ্রমিক অগ্রসর হতে পারেন, এরূপ সম্ভাবনা আছে।

বিবরণীয় চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে কৃষিজীবী বর্গসমূহের কথা এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে অ কৃষিজীবী বর্গসমূহের কথা। এক হিসাবে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদই এই খণ্ডের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছেদ। কৃষিজীবীদের কথা আলোচনাকালে ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৩, এবং তারপর ১৭৯৩ থেকে ১৮৭২, ১৮৭২ থেকে ১৯২১ এবং ১৯২১ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার সুতীক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়েছে। সকলেই জানেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রায়তোয়াড়ী অঞ্চলের রায়ত-লুণ্ঠনের প্রতিবাদে সেকালের জাতীয় অর্থনীতিজ্ঞ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙলার জমিদারী-প্রথার স্বপক্ষে ওকালতি করেন, এ কালের হিন্দু-জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিজ্ঞ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ও ভূমি ব্যবস্থার আলোচনায় অনেকাংশে এ চেষ্টা করেছেন। বাঙলার জমিদারী প্রথা ততদিনে বাঙলাদেশের কৃষি-সংকটকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে, তা পূর্বেই দেখেছি। বর্তমান রিপোর্টও তা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে, এখানে তা বিশদ করে পুনরুল্লেখ করতে চাই না। পঞ্চম অধ্যায়ের অ কৃষিজীবী-বর্গদের বিশ্লেষণে রিপোর্ট এরূপেই স্পষ্ট করে তোলে শিল্পক্ষেত্রে বাঙলার ভয়ানক রূপ। যথা, খনি, তাঁত, চামড়া প্রভৃতি অনেক প্রধান শিল্পে এইসব বৃত্তিজীবীদের দিনের পর দিন সংখ্যা কমেছে ও দুর্দশা বেড়েছে, এবং রাসায়নিক, ধাতব-শিল্প, পরিবহণ-কর্ম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শাসন প্রভৃতি অল্প কয়েকটি বিভাগে জীবিকাজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই, ছোট পুঁজির কারবারে ও স্বয়ং-চালিত যন্ত্র বা ব্যবসায়ের যথা-প্রয়োজন প্রসার হতে পারে না।

শেষ অবধি তাই পশ্চিম বাঙলার যে-চিত্র ফুটে উঠল (পৃ. ৫৩৫), সত্যই তা শোচনীয়। ১৯১১-র পর থেকে জীবনযাত্রার অধিকাংশ দিকেই দেখা দিয়েছে অধোগতি। ১৯৫১ আদম-শুমারির বৎসর বলেই হয়তো উল্লেখিত হয়েছে ; না হলে হয়তো বলা যেত—এ অধোগতি সমস্যারূপে বাঙলা দেশেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯১৭ ১৮য়, আর বাঙালীর জীবনে ভাঙন পরিস্ফুট হয়েছে (১৯২৮-এর মন্দার পরে না হোক) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে।

এই হল দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্বেকার পশ্চিম বাঙলার মৌলিক-জীবনের চিত্র যা তথ্য দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে।

সামাজিক সংস্কৃতির অবলম্বন

পশ্চিম বাঙলার আদম-শুমারির 'পার্টওয়ান-সি' শেষ হয়েছে আর একটি ৫১৭ পৃষ্ঠার বিপুল খণ্ডে। সেখানে বিবরণীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ধর্ম, বাড়িঘর, বাস্তুভিটা, স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা, সাক্ষরতা ও মাতৃভাষা প্রভৃতিবিষয়ের তথ্য, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ উপস্থিত করা হয়েছে। তাছাড়া, এই খণ্ডেই সংক্ষিপ্তাকারে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে আইন-ই-আকবরীর, বের্‌নিয়ের এর ভ্রমণ কাহিনীর সারাংশ, কোল্‌ব্রুক এর বাঙলার কৃষক ও অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিবরণ, বুকানন হ্যামিল্‌টন-এর ব-দ্বীপীয় পরিবর্তনের সংকলন। তার সঙ্গে আছে একালের বিশেষজ্ঞদেরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় লেখা,—যেমন, লিখেছেন বাঙলার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিষয়ে এম. দত্ত ; গত ত্রিশ বৎসরের জমির ব্যবহার বিষয়ে

বিমলচন্দ্র সিংহ। ৪০টি আধুনিক শিল্প সম্বন্ধে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এবং পশ্চিম বাঙলার ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে কমল মজুমদারের নিবন্ধও আছে।

আদম-শুমারির ৭ খানা গ্রন্থ ও ৪ খানা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের সঙ্গে ১৩ খণ্ডে ছাপা পশ্চিম বাঙলার ১৩টি জেলার 'জেলা বিবরণী' ('হ্যান্ডবুক') রচিত হয়েছে। এ সব মিলিয়ে দেখলে পশ্চিম বাঙলার চিত্র পূর্ণাঙ্গ হবে। সাধারণভাবে এসব হ্যান্ডবুকের প্রত্যেক খণ্ডেই আছে এক-একটি জেলার প্রাকৃতিক বিবরণ, ভূমির গড়ন, জমির প্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, বনবাদাড়, গাছপালা, পশুপক্ষী প্রভৃতির হিসাব। তারপরে অধিবাসীদের সংবাদ, তাদের ভাষার, ধর্মের, শিক্ষার, সংস্কৃতির, স্বাস্থ্যের, কৃষির, শিল্পের, ব্যবসা বাণিজ্যের যানবাহনের, সেচের, ভূমিব্যবস্থার, রাজস্বের এবং শেষে পূর্বোল্লেখিত ৮টি জীবিকা জীবী বর্গের অবস্থার হিসাব। জেলা, মহকুমা ও এলেকা হিসাবে এসব বিষয়ের তথ্য ও পরিসংখ্যান সাজানো হয়েছে। প্রত্যেক জেলার বিখ্যাত প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন ও বস্তুর তালিকাও জেলার বিবরণে আছে। কোনো জেলার এরূপ বিবরণী শেষ হয়েছে ২৫০ পৃষ্ঠায়, আর কোনো জেলার বিবরণীতে প্রায় ৬৫০ পৃষ্ঠা লেগেছে। এ ছাড়া প্রত্যেকটি জেলার বিবরণীর শেষে সে জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথাও পরিশিষ্টাকারে সংযোজিত হয়েছে, আর দেখলেই বোঝা যায় সে বৈশিষ্ট্য কত মূল্যবান। দু একটি জেলার যা প্রথমেই চোখে পড়ে তার উল্লেখ করছি।

যেমন, হুগলি জেলার বিবরণের তিনটি পরিশিষ্টে আছে (ক) দামোদর নদের পুরাতন খাতের কথা, (খ) 'বর্ধমানী জ্বর' ও বাঁধের কথা এবং (গ) জেলার দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের কথা। বর্ধমান জেলার বিবরণের পরিশিষ্টে আছে, (ক) জেলার কয়লা খনিগুলির কথা, (খ) ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই 'বর্ধমানী জ্বর' এর কথা, এবং (গ) বর্তমান সময়কার দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা ও চিত্র। বীরভূমের জেলা বিবরণীর পরিশিষ্ট সমূহে আছে—(ক) ফারমিঙ্গার এর পদ্ধতি অনুযায়ী জেলার দলিল দস্তাবেজের কথা (১৭৭৮ থেকে ১৭৯৭), (খ) অ্যাডাম সাহেবের লেখা জেলার ১৮৩৭ সালের শিক্ষা বিবরণ (গ) ওলডহ্যাম এর লেখা জেলার লৌহসম্পদের কথা (ঘ) ১৮৭২ এর 'বর্ধমানী জ্বরে'র কথা, (ঙ) ১৮৮৫ এর সাঁওতাল বিদ্রোহের বিবরণ, এবং একজন সাঁওতালের কথিত সেই সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী। এর থেকে অনুমান করা অসাধ্য নয় যে, এইসব জেলা বিবরণীতে প্রায় নতুন করে বাঙলার প্রত্যেকটি জেলার বৈশিষ্ট্য ও তার কথা কি রূপে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তা ছাড়া, প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার একখানি বিরাট ও মূল্যবান গ্রন্থের এখনো মুদ্রণ শেষ হয়নি—তাতে পাওয়া যাবে পশ্চিম বাঙলার বিখ্যাত প্রাচীন কীর্তিচিহ্নসমূহের কথা। প্রত্যেক জেলার ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি কীর্তিচিহ্নের বর্ণনা, অবস্থান, বর্তমান অবস্থা প্রভৃতি ছাড়াও এ-গ্রন্থে থাকবে প্রত্যেকটি উৎকীর্ণ লিপির ইংরেজি অনুবাদ এবং লিপিতে—উল্লিখিত প্রত্যেকটি বহিরাক্রমণের কথাও। আলোকচিত্র মুদ্রণ সম্ভব হবে কিনা জানি না, তা হলে অন্তত চার পাঁচ শত জিনিসের আলোকচিত্রও এ সঙ্গে যা স্বতন্ত্র খণ্ডে সংযোজিত হতে পারে, শুনেছি।

এসব তথ্যের পরিমাণগত হিসাব ছেড়ে গুণগত হিসাবে অগ্রসর হবার মতো সুযোগ ও সামর্থ্য সাধারণ বাঙালীর জুটবে না, তা ঠিক। তথাপি বলা যায়—এতকাল পরে বাঙালী জাতি, সত্যসত্যই বাঙলার রূপ দেখবার মতো বাস্তব দৃষ্টি লাভ করছে, লাভ করছে সত্যকারের বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন গবেষক। পশ্চিম বাঙলার প্রত্যেকটি জেলার সাধারণ পাঠাগারের এই সম্পূর্ণ গ্রন্থসমূহ সংগ্রহে সচেষ্ট হওয়া উচিত। কোনো শিক্ষিত মানুষ এর প্রধান খণ্ডগুলি পাঠ না করলে নিজেকে শিক্ষিত বিবেচনা করতে পারবেন না। বিশেষ করে বাঙলার রূপ, বাঙলার কথা যাঁদের আলোচ্য—বঙ্গমাতা মাতৃমূর্তি যাঁদের ধ্যান—তাঁরা এই তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণী লাভ করে তাঁদের ধ্যান, তাঁদের জ্ঞান, তাঁদের প্রেমকে এবার সত্য করতে পারবেন—মাটিতে মানুষে জড়িয়ে মা যা হয়েছেন, তা উপলব্ধি করবেন। মা যা হবেন, তার নির্মাণে আত্মনিয়োগ করবার মত প্রেরণা তখনি বাস্তব হয়ে উঠবে।

১৩৬১ বাং।

বাঙলার বিবর্তন-পথ

পরিবর্তন ও পরিকল্পনা

আমাদের যুগ পরিবর্তনের যুগ, হয়ত বা বিংশ শতক আসলে বিশ্ববিপ্লবের যুগ। সমাজের নব-রূপায়ণ ও সংস্কৃতির রূপান্তর তাই আজ আর কে না চায়? এমন কথাও শুনি—বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা দ্বারা অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধন করাই সমাজের লক্ষ্য। ১৯৫০ থেকে ভারতেও আর্থিক পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।

কালের খরস্রোতে অনেক কথাই তলিয়ে যায়। নইলে মনে থাকত—বিংশ শতকের প্রথম পাদে 'দি ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস'-এর লেখক চার্চিল প্রভৃতি শাসকেরা লেনিনের বৈজ্ঞানিক স্পর্ধাকে চূর্ণ করবার জন্য বলতেন, 'বিজ্ঞান অবাস্তব অপচয়ে ও দিগ্‌ভ্রষ্ট গতিতে ছাড়া চলতে পারে না।' তথাপি বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে—মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্বে—মস্কো ঘোষণা করেছিল 'প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা'। মানুষের আর্থিক জীবনকে বৈজ্ঞানিক রীতিতে পরিবর্তিত করবে, এই তাদের সংকল্প ছিল। সনাতনী সমাজ-তাত্ত্বিকেরা মস্কোর স্পর্ধা দেখে তখন হেসেই খুন: "মুখ্যখুরা বলে কি? পরিকল্পনা করে গঠন করবে আর্থিক জীবন?—বিধাতার লীলাখেলার মতই দুজ্ঞের্য় যে অর্থনীতির রূপ ও পদ্ধতি।" সে হাসি অবশ্য অনতিবিলম্বেই শুকিয়ে গেল। ১৯২৯-এই এল পৃথিবী জুড়ে আর্থিক সংকট—মস্কো যখন নব-নব উদ্যোগে কর্ম-মুখর। দিশাহারা মুনাফাবাদীদের তাই সঙ্গে সঙ্গে দরকার হল অর্থহারা 'পরিকল্পনার'—মুনাফার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে মুনাফার মৃগয়া অব্যাহত থাকবে। 'নিউ ডীলের' পর থেকে তাই সনাতন সমাজতাত্ত্বিকেরাও "প্ল্যান" বা আর্থিক-সামাজিক পরিকল্পনার কথা বলেন। অবশ্য সমাজের সৃষ্টি শক্তিকে মুক্ত করবার পরিকল্পনা তাতে নেই। তা হচ্ছে ধনিক সমাজের অন্তর্ঘাতী অপঘাতকে ঠেকিয়ে রাখবার পরিকল্পনা, আর অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে অতি মুনাফার (সুপারপ্রোফিট্‌স্‌-এর) মৃগয়া-ক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ রাখবার সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা। অর্থাৎ মুনাফাবাদের এসব "পরিকল্পনা" হচ্ছে Planning for planlessness.

তবু এই সব কারণে এই বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কারো আর না মানলে চলে না—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমাজ সংগঠন সম্ভব, এবং শুধু সম্ভব নয়, প্রয়োজন। এ কথাও এখন প্রায় স্বীকৃত—সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য; সমাজ দিয়েই সংস্কৃতিরও পরিচয়। সমাজ-সৌধের বনিয়াদ যদি হয় আর্থিক জীবন তার উপরতলা তাহলে সাংস্কৃতিক জীবন; সমাজের জীবন প্রতিফলিত হয় সাংস্কৃতিক সৃষ্টিতে, আর সাংস্কৃতিক প্রয়াসও আবার সমাজের সৃষ্টিশক্তিকে নূতনতর সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সামাজিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনও শুধু সম্ভব নয়, প্রয়োজনীয়। সমাজের নবজন্ম কিংবা নব-সংস্কৃতির জন্ম, কোনটাই তাই আর নতুন কথা বলে শোনায় না। কারণ, বিংশ শতক শুধু সমাজ-বিপ্লবের যুগ নয়, সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরও যুগ। পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে আজ সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতি গঠনেরও সাধনা চলেছে।

কথাটা নতুন না হোক, কাজটা কিন্তু এখনো দুঃসাহসিক। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবন এখনো মুনাফার সারথ্যেই পরিচালিত। সে রথে এখনো সমাসীন সাম্রাজ্যবাদ। তার নাম হয়ত এখন আর হিজ্‌ মেজিস্টি দি পাউণ্ড স্টার্লিং নয়; এখন তার নাম হয়ত প্রেসিডেন্ট ডলার অব্‌ "ফ্রি" ডিমক্র্যাসি। কিন্তু তার রথতলে এশিয়ার, আফ্রিকার, আমেরিকার, এমন কি ইউরোপেরও, নানা দেশের সমাজ এখনো নিষ্পিষ্ট, সংস্কৃতি এখনো সংরুদ্ধ। নব-সমাজের জন্ম ও সংস্কৃতির নবজন্ম তাই অত সুসাধ্য সাধনা নয়। আমাদের বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায়ও আমরা তা অনুভব করতে পারি। কেন কেবলি মনে হয়—বাঙালী সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি যেন কোন

বালুচরে আটকে গিয়েছে। তাই ভারতে 'ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'-এর পরিকল্পনার নীতি, যখন সরকারী নীতি তখনো আমরা কিছুতেই আমাদের বাঙালী জীবন এবং বাঙালী সংস্কৃতি পুনর্গঠিত করতে পারছি না। ভারতবর্ষের ১৯৫১ সনের আদমশুমারির রিপোর্ট থেকে পশ্চিম বাঙলার অবস্থা অনুধাবন করি ; দেখব ভারতবর্ষের মধ্যে আজ সব চেয়ে মন্দভাগ্য জাতি বাঙালী। অথচ আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস নিতান্ত সামান্য নয়, অত্যন্ত অর্বাচীনও নয়।

ঘাটতি ইতিহাস

প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙলা ভাষা ও বাঙালী জনসমাজকে নিয়ে ভারতবর্ষের এই প্রাচ্য-মন্ডলে ভারতীয় সভ্যতা বিশিষ্ট একটা রূপ লাভ করে। তারই নাম বাঙালী সমাজ, তার পরিচয় বাঙালী সংস্কৃতিতে। রাজা-রাজবংশের গণনায় তখন পাল রাজবংশ ও সেন রাজবংশের কাল। ভারতবর্ষের ও বাঙলার জনসমাজের ইতিহাসে সেটা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রথম পর্বের (৪র্থ শতাব্দী—৯ম শতাব্দী) অবসান-কাল, তার মধ্য পর্বের (১০ম থেকে ১৫শ শতক) সূচনা-কাল। সকলেই আমরা জানি—ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মূল বনিয়াদের উপরেই এই বাঙালী জাতি ও বাঙালী সমাজও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের নিজ বৈশিষ্ট্য, আমার মতে, তিনটি ; অন্য সামন্ত সমাজে তা এ ভাবে দেখা যায় না। যথা, প্রথমত—**অর্থনীতির দিক থেকে** ভারতীয় সামন্ত সমাজের মূল আশ্রয় ছিল বিচ্ছিন্ন পল্লীসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বিন্যাস। দ্বিতীয়ত, **সামাজিক গঠনের দিক থেকে** তার সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 'কাস্ট' বা জন্মগত জাতি-ভেদ। আর তৃতীয়ত, **ভাবাদর্শের দিক থেকে** ভারতীয় সমাজের বিশিষ্ট ভাবাদর্শ হলো কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ। আমরা দেখেছি—আধুনিক যুগেও (খৃী ১৮০০- -খৃী ১৯৪৭ পর্যন্ত) ভারতবর্ষের কোন জাতি বা সংস্কৃতি এই তিনটি মূল বস্তুর সব কয়টিকে অস্বীকার করতে পারে নি। তার অর্থ, এখনো তারা সামন্ততন্ত্রের বাঁধন কাটিয়ে উঠতে পারে নি। যাই হোক, বাঙালীজাতি ও বাঙালী সংস্কৃতিও এই ভারতীয় বনিয়াদের উপরেই গড়ে উঠেছে। মূলের ভারতীয় উত্তরাধিকারের সঙ্গে বাঙালীর লোক-জীবনের পুঁজি মিশিয়েছে ; পরে তার গায়ে— মাত্র অষ্টাদশ শতকে—ফারসী আরবীর কিছু পালিশ লাগিয়েছে। সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই চলেছে বাঙালী সমাজেরও এসব গৌণ পরিবর্তন।

বাঙলার এই মধ্যযুগের সংস্কৃতির গৌরবের কাল,—ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী। সে গৌরবের কারণ শুধু তখনকার বাঙলা সাহিত্য নয়। বাঙালীর রচিত সংস্কৃত কাব্য অলঙ্কার ছাড়াও বাঙালী সমাজের নিজস্ব পরিচয় রয়েছে মধ্য যুগের এই মধ্য ও অন্তিম পর্বের স্মৃতিশাস্ত্রে, তন্ত্রে, নব্যন্যায়ে। কিন্তু স্মরণ রাখতে পারি, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও বাঙালী মধ্যযুগের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। অথচ তার পূর্বেই ইউরোপে রেনেসাঁসের বান ডেকেছে। পৃথিবীতে তখন জন্ম নিচ্ছে বণিক সভ্যতা। বাঙলার বাজারে তখন প্রাধান্য অর্জন করেছে ফিরিঙ্গি বণিক। অর্থনীতিতে তাদের রৌপ্য-প্রচলনে সূচনা হচ্ছে মুদ্রা-মাধ্যমিক যুগ—অর্থাৎ মানি ইকোনমি। আর ফিরিঙ্গির পদাঘাতে ভেঙে পড়েছে নিম্নবঙ্গের মুঘল শাসনের পশ্চাদ্দ্বার ; রাজ-নীতিতেও তাই সূচিত হচ্ছে বণিক-সভ্যতার অপরাজেয়তা। এরূপ অবস্থায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিচারে বা পদাবলীর কীর্তন-মাধুর্যে, তন্ত্রের শক্তি-সাধনায় বা স্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে সেই নবজাগ্রত বণিক সভ্যতাকে ঠেকানো সাধ্য কি ? সত্যসত্যই, পৃথিবীব্যাপী সামাজিক উন্নয়নের ও সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে দেখলে মনে হয় না কি—তন্ত্র, স্মৃতি, নব্যন্যায়, এ সব বাঙালী-সৃষ্টি—অনেকাংশেই 'বাঙালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার' ? তাই হাজার দুই-তিন বৎসরের ভার বহন করে মন্দগতি বাঙালী সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি অষ্টাদশ শতকে আপনারই ভারে আপনি তলিয়ে যেতে বসল। যতটুকু প্রাণ তখনো তার ছিল তা রইলো লোকজীবনে ও লোকসংস্কৃতিতে। লোক-

গীতিকায়, লোক-সঙ্গীতে, লোক-শিল্পে ও কারুকর্মে পল্লী সভ্যতার প্রাণের পরিচয় তখনো লুপ্ত হল না—এখনো তা একেবারে বিলুপ্ত হয় নি, তবে তার ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। কিন্তু ঘাটতি ইতিহাসের প্রতিশোধ এল ঘনিয়ে।

উপনিবেশিকতার অভিশাপ

তারপর পোহাল শর্বরী, বণিকের মানদণ্ড দেখাদিল রাজদণ্ড রূপে—অর্থাৎ পল্লীসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভিত্তি বিলাতী শিল্প বিপ্লবের আঘাতে নড়ে গেল। পল্লীর কারিগর বৃত্তি হারাল, জমিদারী-প্রথা দেখা দিল। দেখা দিল ঔপনিবেশিকের সমাজের যুগ আর আধা-ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির যুগ (? খ্রীঃ ১৮০০ থেকে খ্রীঃ ১৯৪৭)। বাঙালী মধ্যবিত্তের বা ভদ্রলোকের যুগও একে বলতে পারি। অন্তত একশত বৎসর (১৮১৭তে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯১৮ এর মধ্যে) তারাই বাঙালীর সংস্কৃতিকে গঠন ও পরিচালনা করেছে। কিন্তু বহু বিলম্বিত সামাজিক বিপ্লব বা সাংস্কৃতিক বিকাশ তারা তখনো সম্ভব করতে পারেনি। কারণ, এ ভদ্রশ্রেণীর আর্থিক বুনিয়াদ ছিল আধা-সামন্ততন্ত্রী জমিদারী ব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চাকুরী। সামাজিক ক্ষেত্রে তারা ছিল বাঙালী লোক-জীবন থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন। তারা না নিয়েছে কৃষিতে, না নিয়েছে শিল্পে উৎপাদনের ভার অথচ মানসিক জীবনে ইংরেজের মারফত পাওয়া বণিক্‌সভ্যতার নতুন বাণী—ব্যক্তি স্বাধীনতা, জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের মন্ত্রে তারা চমৎকৃত হয়ে উঠেছিল, তাও ঠিক। বাস্তবে ব্যাহত ও কল্পনায় মুক্তিকামী—এইরূপ অন্তর্দ্বন্দ্বে স্বভাবতই বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী উত্তরোত্তর আশ্রয় করেছে উদ্যোগ-হীন, বাস্তব-বিমুখ, ভাববাদী পথ। ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর নব সংস্কৃতির কীর্তিমালা আমাদের সুপরিচিত—তা নয়া দিল্লীতে যে ভাবে অবজ্ঞাত তাতে তার প্রচারও প্রয়োজন। সত্য সত্যই যে কোন পরাধীন জাতি এরূপ প্রয়াসে আশ্বাস লাভ করতে পারে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান্ হতে পারে। ভারতবর্ষকে আমরা স্বাধীনতার মন্ত্র প্রথম শুনিয়েছি, ভারতবর্ষে আমরা শিল্প সাহিত্যের আলোক-শিখা প্রথম প্রজ্জ্বলিত করেছি এবং এই দুর্ভাগ্যের দিনেও জানি শিল্প-সাহিত্যে ললিতকলার চর্চায়, বিজ্ঞানের ও ইতিহাসের গবেষণায়, এমন কি, বিপ্লবী জীবন-স্বপ্নে, এখনো ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা পুরোধা। কিন্তু একথাও বিস্মৃত হবার নয়, সমাজবিপ্লব বাঙালী ঊনিশ শতকে সূচনা করে নি। বরং জীবনের বাস্তব সত্যে সে কুণ্ঠিত বলে বৈষয়িক উদ্যোগে-আয়োজনে তার সাহস ছিল না। এমন কি, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের মত দু'একজন মনস্বী ব্যতীত বিজ্ঞান-চর্চায় ও বৈজ্ঞানিক প্রয়াসেও তখন শিক্ষিত বাঙালী বিশেষ আগ্রহ বোধ করে নি। জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হলেও সেই নবযুগের বাঙালী সংস্কৃতি হিন্দু জাতীয়তার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। স্বাধীনতার বাণীতে প্রবুদ্ধ হলেও শিক্ষিত বাঙালী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা খাড়া করে মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় নি। মানুষের অধিকারের নামে উদ্দীপ্ত হলেও সামন্ততন্ত্রের মূল বন্ধন ছেদন করে নি। তারা জাতিভেদ মেনে নিয়েছে, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নি এবং জমিদারীর বিলোপ-সাধনে প্রস্তুত হয় নি। গণতন্ত্রের মহিমা যতই জানা থাক, গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতিতে তাদের আস্থার বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। এ সবে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই ; সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এ দশাই ঘটে পরাধীন দেশের ও পরাধীন সংস্কৃতির।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে—জমিদারী ব্যবস্থায় ক্রমবর্দ্ধিত কৃষি-সংকটের ফলে আর এই বাঙালী শ্রেণীর মাটি থেকে রসগ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। কৃষি-নির্ভর মানুষ জীবিকার আশায় তখন শহরে ছুটল। চাকরির বাজারে শিক্ষিতের ভীড় দেখা দিল। সেখানেও তাই বেধে গেল খাওয়া-খাওয়ি,—প্রধানত তারই নাম 'সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব'। অপেক্ষা ছিল একটি ঝড়ের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এলো সেই ঝড় নিয়ে। এলো পঞ্চাশের মন্বন্তর, একান্নর মহামারী, এলো কালোবাজারী রাজত্ব—বাঙলা দেশে মুনাফার মৃগয়া হয়ে উঠলো মানুষের মৃগয়া। বাঙালী সমাজের ভিত্তি ধসে

যেতে লাগলো, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন উন্মূলিত হয়ে গেল। ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা, তার মূল্যবোধ, তার চরিত্রবল, শোভনতা-শালীনতা—সব ভেসে গেল। যা বাকী ছিল—১৯৪৭ এ তা সম্পূর্ণ হলো, বাঙলা দেশ দু'রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেল,—আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তর্ঘাতী পীড়ার তা'ই হ'ল চরম দশা। আর তার ফলে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল বাঙালী জাতির জীবন-পথে আজ শুধু দেশ হারিয়ে বসে নি, পথ হারিয়ে ফেলে নি, আপনাদের ঠিকানাও ভুলে গিয়েছে। আজকের বাঙলা দেশের এই বিপর্যয়ের তথ্যগত রূপ ১৯৫১-এর আদমশুমারির রিপোর্ট তুলে ধরেছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য)। বাস্তব জীবনের জমা-খরচের খাতায় বাঙালী সমাজ এসে যাচ্ছে খরচের দিকে, আর বাঙালী সংস্কৃতি যেন এই ফেল-পড়া ব্যাংকের অনাদায়ী হুণ্ডি।

পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-সমস্যা

ঔপনিবেশিকতার এই অভিশাপ ঘাড়ে নিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিও অবশ্য আমাদেরই পিছন পিছন এসে ঠেকেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘাটায়। আমাদের মত বিপন্ন না হলেও তারাও এখন এ সত্য আজ উপলব্ধি করছে—সমাজবিপ্লবকে বিলম্বিত করলে সমাজ-বিপর্যয়ই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পৃথিবীর একালের অন্য একটি স্বীকৃত সত্যও তারা ও আমরা সকলেই বুঝছি—শুধু ভাবলোকের আকাশ থেকে রৌদ্র-বায়ু সংগ্রহ করতে পারলেই সংস্কৃতি বাঁচে না; সমাজের উৎপাদন শক্তিই জোগায় সংস্কৃতির প্রাণ-রস, তার মানসিক কুসুম, তার ফল-পাতার শাখার স্বচ্ছন্দ বিস্তার। সমস্ত ভারতবর্ষ-ব্যাপী আজ তাই অনুভূত হচ্ছে ১৯৪৭-এর সেই রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন। ভারতবর্ষের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তারই প্রাথমিক আয়োজন,—এই চক্ষে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে দেখলে সম্ভবত তাকে ছোট করে দেখা হবে না। বরং একটু বড় করেই দেখা হবে।

পরিকল্পনাকারেরা বলেছিলেন এর ফলে আমরা কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে পারব; আমাদের সামাজিক আয় ও জীবনযাত্রা ১৯৩৯ এর স্তরে পুনরুন্নীত হবে। কথাটা শুনে পুলকিত হবার মত কারণ কোথায়? ইং ১৯৩৯ সনের জন্য কে হা-হুতাশ করছে—যুদ্ধের মুনাফাদারেরা ও যুদ্ধবাজেরা বাদে? হয়ত কথাটা এই—প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কিন্তু এইটিই শেষ পরিকল্পনা নয়।। আমাদের জাতীয় আয় দ্বিগুণিত হবে। শুধু তাই নয়, আমরা সমাজ বিপ্লব কেন, সমাজতান্ত্রিক বিন্যাসই সম্পূর্ণ করতে চাই;—পণ্ডিত জহরলাল ইং ১৯৫৪-তে চীন থেকে প্রত্যাবর্তন করে এই কথা পুনর্ঘোষণা করেছেন। (পরে কংগ্রেস সরকার তা লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে)। আমরা তা সম্ভব করব ক্রমিক পরিকল্পনায় ও ধারাবাহিক দ্রুত পরিবর্তনে। আমি অবশ্য অত বিরাট ও সুদূর লক্ষ্যের কথা বলছি না—আপাতত আমরা চাই ভারতীয় সমাজের ততখানি মৌলিক পরিবর্তন যা না হলে ভারতবর্ষ আধুনিক যুগের জীবন্ত ও শিল্পোন্নত জাতির সাথে দাঁড়াতে পারবে না। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দেরি সইতে পারে,—তা সইতেও হবে যখন শিল্প-বিপ্লবই হয়নি; প্রথম এখন আধা-সামন্ততন্ত্রী ঔপনিবেশিক সমাজেরই অবসান হোক। কারণ শিল্প-বিপ্লব এবং গণতান্ত্রিক নব-সমাজ সংগঠিত না করলে ভারতবর্ষের আর একদিনও চলবে না।—আমাদের আশু লক্ষ্য তাই 'নব্য গণতান্ত্রিক সমাজ' বললে হয়ত চীন-প্রত্যাবৃত্ত পণ্ডিতজীও আপত্তি করবেন না। তা হলে, কয়টি পরিকল্পনায় এই নব্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া নিশ্চয় প্রয়োজন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬) সেরূপ নব্য-গণতান্ত্রিক সমাজের গোড়াপত্তন না হোক, গোড়াপত্তনের চেষ্টা হচ্ছে কিনা, তা' হলে তা-ই হবে বিচার্য। এবং সে উদ্দেশ্যে নব্যগণতান্ত্রিক সংস্কৃতিরই বা কতটুকু গোড়াপত্তনের চেষ্টা হচ্ছে, তাও হবে লক্ষণীয়। (দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রায় ৪ হাজার ৮ শত কোটি টাকার পরিকল্পনা। তাতে মূলশিল্পের ও ভারিশিল্পের পত্তন ও প্রসার স্থিরীকৃত হয়েছে, এটি খুবই সুবুদ্ধির কথা।

কিন্তু যেভাবে তার অর্থ-সংগ্রহ, তার ধনিক-তোষণ প্রভৃতি নীতি স্থির হচ্ছে, তাতে আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে।)

অস্বস্তিকর তর্ক ও তথ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না। কিন্তু পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিত দেখলে অত্যন্ত সহজ ভাবেই কয়েকটি সহজ সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে :—প্রথমত, আমরা এখনো আমাদের অন্তত তিনশত বৎসরের বস্তাপচা সামন্ত-তন্ত্রের জের মেটাতে পারছি না; অথচ তা না মেটালে নব্য সমাজের আবির্ভাব সম্ভব হবে না। আমরা সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার অবসান কল্পে যে সব আইন-কানুন প্রণয়ন করেছি—তা সে পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর, যা প্রণয়ন করেছি তা এখনো দৃঢ়চিত্তে প্রবর্তন করতে আমরা উদ্‌গ্রীব নই। রাজ্যসরকারগুলি এদিকে পরিকল্পনাকারদের প্রস্তাব-সমূহও বাতিল করে দিয়েছে। আমরা কৃষককে সত্যই জমির মালিকানা দিতে পারছি না। বরং মনে করি, প্রত্যেকটি শোষক শ্রেণী যে ক্ষতি করেছে তার জন্যই তাদের প্রাপ্য হয়েছে ক্ষতিপূরণ। আর সে ক্ষতিপূরণ যোগাবার দায়িত্ব পড়ছে কৃষক ভিন্ন আর কার উপরে? ভারতীয় সমাজে ধনোৎপাদক ও রাজস্বের মূল-উৎস এখন পর্যন্ত কৃষক ছাড়া আর কে?

দ্বিতীয়ত, আমরা অর্থনৈতিক স্বরাজ লাভ করতে চাই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উপর হাত না দিয়ে। আমরা যখন বৈদেশিক পুঁজির, বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের প্রদত্ত ঋণ ও লগ্নির সহায়তায় আমাদের অর্থনৈতিক স্বরাজ লাভ করতে উদ্‌গ্রীব, তখন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে হাত তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ব্রিটিশ পুঁজি ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষের প্রধানতম উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি কবলিত করে বসেছে, এবং সেখানে এখন দেশীয় পুঁজির অনুপ্রবেশ দুঃসাধ্য,—হয়ত বা এ ভাবে অসাধ্য। শিল্পে বাণিজ্যে ব্রিটেনের শোষণ-সাম্রাজ্য ১৯৪৭-এর পরে ভারতে আরও নিরাপদ হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাবেও বৎসরে অন্তত ৪০ কোটি টাকা ব্রিটিশ পুঁজির মুনাফা বাবদ ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে এখনো চালান যাচ্ছে—অন্য হিসাবে হয়ত সংখ্যাটা দ্বিগুণ।—এটাও দেখা গিয়েছে ব্রিটিশ ধনিকস্বার্থ ভারতবর্ষে শোষণ-পথ উন্মুক্ত করলেও এদেশে শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করে নি, ব্রিটিশ উদ্যোগে যে শিল্প গঠিত হয়েছে প্রধানত তা আহরক শিল্প, extracting industries, ভারি শিল্প বা heavy industries নয়।

অবশ্য এই ব্রিটিশ শোষণের ছিটে-ফোঁটা ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা আজ দেশের দালাল-মালিক ও শাসক-গোষ্ঠীর মধ্যেও বিতরণ করছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ মালিকরা এখন দেশী সাইনবোর্ড ব্যবহার করছে। বলা বাহুল্য, সুপার প্রোফিটের এই ছিটে ফোঁটা লাভে 'অর্থনৈতিক স্বরাজ' আরব্ধ হয় না; বরং তাতে সাম্রাজ্যবাদের দেশী দালালই সৃষ্টি করা হয়। আর আমরা বাঙালীরা অন্তত জানি, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দালাল এই দেশীয় শোষকেরা না করে দেশে সুষ্ঠু শিল্পায়নের সূচনা, না করে সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহায়তা। অতি-মুনাফার লোভে তারা বরং উৎপাদন কমিয়ে বাড়ায় কালোবাজার, ইতর রুচির বশে তারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চালায় দুর্নীতির দাপট। আমরা বাঙলা দেশের বাঙালীরা মেদ-মজ্জায় চিনি এই সাম্রাজ্যবাদী ও তার সহযোগী দেশীয় শোষণের রূপ। পশ্চিম বাঙলা দুর্ভাগ্য-ক্রমে প্রধানত ব্রিটিশ শোষণের মৃগয়া ক্ষেত্র; তাই দেশের জঘন্যতম ফাটকাবাজ পুঁজিরও লুণ্ঠনক্ষেত্র। তাইত আজ বাঙলার খাদ্যে, বস্ত্রে, ঔষধে, এমন কি, রুচিতেও ভেজালের রাজত্ব, ও ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে দুর্নীতির জয়-জয়কার। যে পরিকল্পনায় এরূপ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানের সম্ভাবনা নেই এবং মানুষ-মারা দেশীয় পুঁজিরও মুনাফা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই—অন্তত বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে তা মোটেই নতুন দিনের ভূমিকা-রচনা বলে গ্রাহ্য নয়।

সামাজিক পরিকল্পনার মূলসূত্র

কারণ, সংক্ষেপে মূল কথাটা এই, আজ আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভারতবর্ষের বহু-বিলম্বিত **গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা**। এ কথাটার অর্থ ভারতীয় কৃষককে জমির মালিক করা ও

কৃষির বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করা, বিদ্যুৎশক্তির যোগে নতুন পল্লীশিল্প স্থাপন করা, শিল্পায়নে মূল ও ভারি শিল্পের কারখানা পত্তন করা, শুধু দেশের মালিক শ্রেণীকে নয়, জনশক্তিকে উদ্যোগে-উৎপাদনে সার্থক করা ;—এক কথায়, সমাজের চাপা-পড়া সৃষ্টিশক্তিকে মুক্ত করা।

এ কথা কিন্তু মিথ্যা নয়—সীমাবদ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নানা আয়োজনে এবং তার আনুষঙ্গিক নানা প্রয়াসে—যেমন, সেচ ও বিদ্যুতের নানা উদ্যোগ, কমিউনিটি প্রোজেক্ট, চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন উৎপাদনের কারখানা, সিন্দ্রির সারোৎপাদনের কারখানা, আলওয়ের দুর্লভ মৃত্তিকার কারখানা, বাঙ্গালোরের টেলিফোনযন্ত্রের কারখানা, অন্য দিকে দেশীয় ও বিদেশীয় পুঁজির নানা প্রচেষ্টা, জাহাজী-শিল্প, মোটর কারখানা, তৈল-শোধন-শিল্প, লৌহ-ইস্পাতের কারখানার ব্যবস্থা ;—এসবে মিলে ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতি শেষ না হলেও ভারতীয় অর্থনীতির স্থবিরত্ব ভাঙছে, সবশুদ্ধ সমাজেও তাতে কিছুটা পরিবর্তন আসছে। কিন্তু আমাদের এই আর্থিক-সামাজিক পরিকল্পনার মধ্যে আসলে দুটি স্ববিরোধী দিক আছে : একদিকে আছে বিদেশী শোষণের স্বীকৃতি, অন্যদিকে অর্থ-নৈতিক স্বরাজেরও দ্বিধাগ্রস্ত সংকল্প। আর সেই স্ববিরোধী ধারা বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে, তাও লক্ষ্য করা যায়।

পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতির-সমস্যা

বাঙলার সংস্কৃতি জগতেও আমরা তাই এই মুহূর্তে দেখতে পাই দুই বিপরীত স্রোতের দ্বন্দ্ব। যেমন, আমরা সাম্রাজ্যবাদ-প্রবর্তিত পুরাতন শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি কোনোটাই এখনো পরিত্যাগ করি নি। এমন কি, যে বাঙলায় জাতীয় শিক্ষার প্রচেষ্টা প্রথম হয়েছিল সেখানে আমরা এখনো জানি না 'জাতীয় শিক্ষার' অর্থ কি। বাঙালীর শিক্ষার বাহন কি বাঙলা হবে, না অন্য ভাষা? ইংরেজি ভাষার স্থলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করব, না হিন্দীকে? হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার নামে ইংরেজিকে কি একেবারে বর্জন করব? 'জাতীয় শিক্ষা' বলতে কি বোঝায় শুধু বুনিয়াদী শিক্ষা? না শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদেরই প্রতিষ্ঠা? জাতীয়তা মানে কি বিজ্ঞানের বিরোধিতা, মানবীয়তা ও আন্তর্জাতিকতায় অনাস্থা? কূপমণ্ডুকতা? এখানে ওখানে সর্বভারতীয় ঐক্যের নামে হিন্দীর চুনকাম করলেই এখন তা 'জাতীয়' হয়। 'একাডেমি' গড়তে গিয়ে আমরা শিব গড়ছি না বাঁদর গড়ছি? অথচ সেই সঙ্গেই দেখছি নতুন শাসকদের সন্তান-গোষ্ঠী ফিরিঙ্গী স্কুলে ও সম্ভব হলে বিলাতেই, দেশীয় ভাষায় শিক্ষা বর্জন করে 'ইংরেজি কৌলিন্য' অর্জন করছে। এবং আমাদের উন্নাসিক সংস্কৃতিবাদীদের মুখে ফুটছে ক্ষয়িষ্ণু ধনিক সভ্যতার মুখপাত্র এলিয়ট-এজরা পাউণ্ড-ফোক্‌নার-সার্ত্রে প্রভৃতি আহেলি লেখকদের উচ্চ প্রশংসা—তাদের চক্ষে শেক্‌সপীয়র-ডিকেন্স-শেলি-কীট্‌সও 'সেকেলে।' তাই ফ্লেকারের কবিতা আমরা পাঠ্য করি স্কুল ফাইন্যালের বালকদের জন্য! যার যত পাণ্ডিত্য তা উজাড় করি স্কুল বা কলেজের ছাত্রের পাঠ্য নির্বাচনে ও প্রশ্ন প্রণয়নে।

অন্য দিকও অবশ্য আছে,—এবং তার ভিতরেও আছে আবার এই অন্তর্বিরোধিতার চিহ্ন। এত কাল পরে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপোষক রূপে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি এগিয়ে এসেছে। সঙ্গীত নাট্য সাহিত্য চলচ্চিত্র ও বেতারের স্রষ্টাদের নিয়ে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে সংগঠন গঠিত হচ্ছে, শিল্পীদের প্রতি-যোগিতা ও পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থাও হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাধা জুটছে অন্যরূপে :—অনেক ক্ষেত্রে আপাতত গুণের পুরস্কার অপেক্ষা বেশি হবে দলানুগত্যের পুরস্কার। এবং সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ভার পড়ছে যোগ্য অপেক্ষা চতুর দলীয় দালালদের হাতে। বিশেষ করে, পশ্চিম বাঙলার অভিজ্ঞতা থেকে এই আশঙ্কাও মনে জাগে যে, এগুলি তাঁবেদারির পুরস্কার। দ্বিতীয়ত, হিন্দী প্রচারের যতটা চেষ্টা রেডিও, একাডেমি ও সরকারী প্রকাশনে দেখা যায় বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির ততটা সহায়তা হচ্ছে না। তথাপি ভোলা উচিত নয়, নীতি হিসাবে একটা প্রশংসনীয় নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন, সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও সরকারী নিশ্চলতা ভাঙছে। তবু লক্ষ্য করা উচিত যে,

প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যে ক্ষেত্রসমূহে এখন পর্যন্ত উদ্যোগ সর্বাপেক্ষা সামান্য, তার মধ্যে একটি হচ্ছে শিক্ষা, অন্যটি পুনর্বাসন।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আমরা 'সভ্যতার সংকটের' নতুন নতুন বিকার-লক্ষণ দেখতে পাই। মার্কিন অর্থনৈতিক সহায়তার জুড়ি রূপেই এ ক্ষেত্রেও আসছে মার্কিন বস্তাপচা মাল ও বস্তাপচা মার্কিনী ওস্তাদ। কোথায় আজ সেই গণতন্ত্রের বাণী আমেরিকার? 'মানবাধিকারের' ঘোষণা যে করেছিল, লিনকন্-জেফারসনের সেই আমেরিকা গেল কোথায়? কোথায় গেল এমার্সন, মার্ক টোয়েনের সুস্থ উদার মানবীয় ঐতিহ্য? যৌন-উত্তেজনা, বর্বরসুলভ নির্মমতা, অমানুষিক নৃশংসতার গুণকীর্তন, খুনখারাবি রাহাজানির প্রশংসা, যুদ্ধবাদ ও বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, নৈরাশ্যবাদ ও শিল্পে উদ্দেশ্য-হীনতার প্রচার, ছ্যাবলামি বা কমিক স্ক্রিপ্টের প্রসার, ম্যাজিক, বিজ্ঞান-বিরোধী রহস্যবাদ, ধর্ম ও ভাববাদের নামে মেকি অধ্যাত্মবাদের প্রচার—এসব এ কালের মার্কিন-বিকৃতির অবলম্বন। মানুষের জাগ্রত চেতনাকে আচ্ছন্ন করাই তার লক্ষ্য, এশিয়ার জাতিতে জাতিতে বিরোধ বাধানোই তার উদ্দেশ্য। হলিউডের হত্যা, গুণ্ডামী, যৌন-বিকৃতি-মূলক ফিল্ম, সে ধরনের সস্তা পকেট বই, 'লাইফ'-জাতীয় চিত্র-বহুল বিভ্রান্তিজীবী পত্রিকা,—এসব ত আছেই। তার সঙ্গে বাঙালী লেখক ও বাঙালী প্রকাশনের বেনামীতেও এ জাতীয় মার্কিনী মাল বাঙলা ভাষায় পরিবেশিত হচ্ছে। নামজাদা বাঙলা সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রকাশকেরা কাঞ্চন মূল্যে এসব মার্কিন-পুষ্ট প্রচার-যন্ত্রের লেখক ও বাহক। ক্ষমতাবান্ বাঙালী ছাপাখানার মালিকেরা মুদ্রণ-মুনাফার সূত্রে মার্কিন মুনিবদের তাঁবেদার। সরকার পরি-পোষিত এসব ব্যবসায়ীও নেহরু চৌ-এন-লাই মৈত্রীর বিরোধি-সমালোচক। দেশ-ভ্রমণ ও বিদেশী বৃত্তির লোভে শুধু বার্তাজীবী নন, অধ্যাপক ও ছাত্রেরা মার্কিন কর্তৃপক্ষের দুয়ারে ধরনা দেন। সাংবাদিকেরা, কেউ মালিক হিসাবে বিজ্ঞাপনের জন্য মার্কিন ধনিকদের কৃপাপ্রার্থী, কেউ চাকরে হিসাবে দক্ষিণার বশে মার্কিন তথ্যাদি ভাজিয়ে-গুছিয়ে গোপনে ও প্রকাশ্যে বাজারে ছাড়তে উৎসাহী। স্কুল-কলেজগুলি মার্কিন কাগজ-পত্রে ও 'শিক্ষা-ফিল্মে' ছেয়ে গিয়েছে, মার্কিন 'বিশেষজ্ঞ' ও 'বক্তৃতা-কারীদের' সুনজরে তারা প্রায় অস্থির। দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানে নানা গোপন পদ্ধতিতে মার্কিন বক্তাদের জন্য বক্তৃতার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। ক্যাথোলিক মিশনের শিক্ষালয়াদি মারফৎ, কমিউনিটি প্রোজেক্ট্ ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের 'সমাজ-সেবী'দের উদ্যোগে, আমেরিকা-ফেরত ভারতীয় সাংবাদিক, অধ্যাপক ও ছাত্রদের মাধ্যমে, 'নৈতিক পুনরস্ত্রীকরণের' পাণ্ডাদের প্ররোচনায়, 'ফ্রীডম অব কালচারের' সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায়—অন্তত বাঙলা দেশে আমাদের জানতে বাকী নেই মার্কিন প্রভাব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কি আকার ধারণ করছে।

এ সব সত্ত্বেও আমরা জানি—বাঙলা দেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে মার্কিন অর্থবৃষ্টিতে যত ছত্রক গজাক, সুস্থচিত্ত বাঙালী সংস্কৃতি-কর্মীরা আত্মবিক্রয়ে স্বীকৃত নয়—লিনকন্ এমার্সনের আমেরিকাকেও তারা ভুলবে না। শত হতাশার মধ্যেও তারা ত্যাগ করে নি স্বাধীনতায় বিশ্বাস, মানব-চরিত্রে সুগভীর আস্থা, সামাজিক পরিবর্তনের ও সাংস্কৃতিক পরিবর্ধনের সুদৃঢ় সংকল্প। সেখানে যুদ্ধ-বাদিতা স্থান পায় নি, বিশ্বশান্তির জন্য আগ্রহ কমে নি, এবং বিশ্বের শোষিত ও নির্যাতিত জাতি ও শ্রেণীসমূহের মুক্তির প্রতি বুকভরা সহানুভূতি বিন্দুমাত্র ক্ষয় হয় নি। সেই সঙ্গেই আরও দেখি রবীন্দ্র-জয়ন্তী, নজরুল-জয়ন্তী, সুকান্ত-জয়ন্তী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিজয়া ও সরস্বতী পূজার মত বাঙালীর জাতীয় অনুষ্ঠান হতে আরম্ভ করেছে। পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ, ফিল্ম, নাটক, চিত্রকলা সঙ্গীতের জলসা—এসবের একটা সাধারণ বিশ্লেষণ করলেও দেখব কাব্যে সাহিত্যে আমরাই ভারতবর্ষে এখনো পুরোধা। যথা, ফিল্মে 'পথের পাঁচালী' (১৯৫৫) পথপ্রদর্শক, অভিনয়ে 'রক্ত করবী' (১৯৫৪-৫৫) অদ্ভুত কীর্তি। চিত্রকলার প্রদর্শনী ও সঙ্গীতের জলসা কলকাতায় আর শেষ হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে দেখি বাঙালী সংস্কৃতিক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চেতনা স্থায়ী হয়েছে। বিষয়-বস্তু লক্ষ্য করলে দেখব—সাধারণ মানুষের জীবন শিল্পে-সাহিত্যে ক্রমশ অধিকতর প্রকাশ-মর্যাদা লাভ করেছে। মুমূর্ষু লোক-সংস্কৃতির মমতায় কলকাতার শহুরে মানুষ দিনের পর দিন ভিড় করে আসে

সংস্কৃতি সম্মেলনে, ফিরে পেতে চায় লোক-চেতনার প্রাণ-স্রোত। সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যেও সামাজিক দায়িত্ববোধ গভীরতর হচ্ছে। সংস্কৃতির সমাদর আজ আর দু'চারজন গুণী ও জ্ঞানীর বৈঠকখানায় বা সাহিত্য-পত্রের আপিসে সীমাবদ্ধ নেই ;—আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালী সমাজের স্তরে স্তরে— প্রত্যেকটি স্কুলে, কলেজে, যুব প্রতিষ্ঠানে, প্রত্যেকটি কেরানি কর্মচারীর ক্লাবে ইউনিয়নে গ্রন্থাগারে ; এমন কি, বাঙলার শ্রমিক ইউনিয়নে, শ্রমিক বস্তিতে পর্যন্ত।

বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে এমন ব্যাপক প্রয়াস বোধ হয় আর কোনো দিন আসে নি। সত্য-সত্যই যদি সামাজিক ক্ষেত্রে আজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, দেশের ব্যাহত কর্মশক্তি আপনাকে বাস্তব উদ্যোগে সার্থক করতে পারে,—তা হলে এই সাংস্কৃতিক শুভ-প্রচেষ্টা যথার্থরূপে আপনার প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড়াতে পারবে। তাই, সামাজিক উন্নয়নের (দ্বিতীয়) পরিকল্পনা যেমন 'নব্য গণতন্ত্র' গঠনের অনুরূপ করে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন, তেমনি তারই অনুষঙ্গরূপে নব্য গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল-কার্যধারাও আমরা কিছুটা পরিমাণে এখনি পরিকল্পনা করতে পারি—সচেতন ভাবে গ্রহণ করতে পারি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের দায়িত্ব।

নব্য-সংস্কৃতি-পরিকল্পনার মূল সূত্র

সাংস্কৃতিক জীবনের সেরূপ সুস্থ সংগঠনের জন্য এ যুগে যা প্রারম্ভিক কাজ তা হচ্ছে— **দেশের পরিচয় গ্রহণ**। আজ পর্যন্ত আমরা বাঙলার প্রথম অর্থনীতিজ্ঞ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের মত বৈজ্ঞানিক বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে নিজের দেশকে দেখতে চাই নি, তার ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করি নি, সমাজকে বিচার করিনি, সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহও পরীক্ষা করি নি।—১৯৫১এর বাঙলার আদমশুমারিতে সেই চেষ্টা আবার দেখা দিয়েছে। আমরা আর্থিক পরিকল্পনায়ও যা করেছি সে হচ্ছে নকল—তা অচল মনেরই চিহ্ন। রাণাড়ে ও রমেশ দত্ত একই কালে ভারতে অর্থনীতি চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। পশ্চিম উপকূলে সেই ঐতিহ্য সেখানকার দেশীয় বণিক ও ধনিকশ্রেণীর তাগিদে বলবন্ত হয়ে আজ একটা বোম্বে স্কুল অব্ ইকনমিক্স্' গড়ে উঠেছে। নয়া দিল্লীতেও শাসকতাগিদে নব প্রতিষ্ঠিত 'দিল্লী স্কুল অব্ ইকনমিক্স্' সক্রিয়। আর জমিদার-প্রভাবিত বাঙলায় রমেশচন্দ্রের প্রেরণা বাধা হয়ে রয়েছে, কৃষি-অর্থবিদ্যা পঠন-পাঠনও প্রয়োজন হয় না। কলিকাতার সাম্রাজ্যবাদী বণিকের দাবী মিটিয়েছে 'ক্যাপিটেল', কিন্তু জাতীয় ধনিক গোষ্ঠীর অভাবে বাঙলার অর্থনীতিক আলোচনা এখনো প্রায় জন্মে নি।

এই প্রস্তুতি শেষ করে আমাদের বোঝা প্রয়োজন নব্য সংস্কৃতির কী কী চাই। প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, সংস্কৃতি শুধু বিশিষ্ট কোন শ্রেণীর সম্পত্তি নয়। মানুষের ইতিহাসে এক কালে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে থাকত ; সেকলে মুষ্টিমেয় লোকই সংস্কৃতির নেতৃত্বও করতে পারতেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, মুষ্টিমেয়ের সে সংস্কৃতি লোকসমাজকে বঞ্চিত রেখে নিজেরই বিলুপ্তি ডেকে আনে। এ কালে তাই সংস্কৃতির পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হবে ; **সংস্কৃতির সার্বজনীনতা সাধন** (Universalisation of Culture) সংস্কৃতিবানরা নিশ্চয়ই লোকজীবনের সঙ্গে আন্তরিক ও ব্যবহারিক যোগ স্থাপন করবেন, কিন্তু তাতেই সংস্কৃতি সার্বজনীন হয় না। কৃষক, শ্রমিক, মুটে মজুর, এক কথায় লোক সমাজকে সংস্কৃতির দায়ভাগে অধিকারী করতে হয় ; তবেই সংস্কৃতি সার্বজনীন হয়।

কার্যত এ বিরাট চেষ্টার সূচনা হয় **সার্বজনীন শিক্ষায়**। বলাবাহুল্য, এ শিক্ষা শুধু তথাকথিত 'বুনিয়াদী শিক্ষা' বুঝায় না। বরং আর্থিক উন্নয়নে ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে সমাজের যে নতুন বুনিয়াদ গড়ে উঠছে তদনুযায়ী শিক্ষাই বোঝানো উচিত। অর্থাৎ বিজ্ঞান এই সার্বজনীন শিক্ষার প্রাণ, কর্মোদ্যম তার দেহ এবং তার আত্মা মানবতা-বোধ,—প্রত্যেকটি মানুষের মানবীয় অধিকারের চেতনা, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই অনুভূতি। বলাই বাহুল্য,

শিক্ষা বলতে এরূপ স্থলে বোঝায় দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত, চারুকলা, নৃত্যকলা ও নাট্যকলার অনুশীলন, এবং প্রাথমিক বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জ্ঞানও। আর, এ শিক্ষার প্রধান আশ্রয় বিদ্যালয় হলেও গ্রন্থাগার, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি কেন যে বিদ্যালয়ের সমতুল্য ফলদায়ক হতে পারে না, তা অন্তত বুদ্ধির অগোচর।

শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে যে শিল্পায়ন ও আর্থিক উদ্যোগ আমরা চাই তার জন্যও দরকার হবে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। বিশেষ করে তাই বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার দিকে আমাদের সমস্ত সংস্কৃতির মুখ ফেরানো প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতকে আমরা যে পরিমাণে সাহিত্য ও দর্শন মূলক ভাবনার বা Liberal Education-এর ভক্ত হয়েছিলাম, তার সিকিভাগ ভক্তিও আমাদের ছিল না বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় Scientific Education-এ, বৈজ্ঞানিক উদ্যোগে ও কারুবিদ্যায়। বিংশ শতকের সর্বাপেক্ষা বড় আবিষ্কার এই যে, জীবন বৈজ্ঞানিক রীতি ও পদ্ধতিতে গঠন না করলেই নয়। বিংশ শতাব্দীতে তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ সত্য উপলব্ধ হচ্ছে—সংস্কৃতির পরিচয় শুধু সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যকলা, নৃত্যকলায় নয়; **সংস্কৃতির প্রধান বাহন আজ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি** – যা সৃষ্টিশক্তিকে বাস্তব সার্থকতা দান করে। অন্য ভাষায় একে বলতে পারি—আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য **সংস্কৃতির সার্বাঙ্গীণতা-সাধন** (making culture all-embracing)। কারণ, সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টিশক্তির ব্যবহার বাস্তব ও মানসিক সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ করা, মানুষের সৃষ্টিশক্তির উদ্বোধন, প্রকাশ ও প্রয়োগ।

বাঙালী সমাজের বিশেষ সংকটের কথা বিবেচনা করে আমরা যদি বলি—আগামী পঁচিশ বৎসরের মত বাঙালী জাতি সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও নাট্যকলার অপেক্ষা যেন বিজ্ঞানের ও কারু-বিদ্যার সাধনা অধিক করে, আশা করি তা'হলে কেউ ভুল বুঝবেন না। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর 'কেরানির কালচার' এখন 'মিস্ত্রী-মজুরের কালচারে' পরিণত হোক, এইমাত্র আমরা চাই না;—সে আশঙ্কাও আমরা করি না। কারণ, আমাদের মেদেমজ্জায় সাহিত্য ও সুকুমার কলার অনুরাগ—তা আমরা ছাড়ব কি করে? কিন্তু যে সাহিত্যবোধ, যে শিল্পানুরাগ, এমন কি, যে রসানুভূতি জীবনের বাস্তব উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত নয়,—বৈজ্ঞানিক চিন্তায় যার শোধন হয় না, বিশ্বকর্মার কারখানায় যার যাচাই হয় না,– সে সাহিত্যবোধ ও শিল্পানুরাগ বিশেষ অবজেকটিব্ ও জীবনধর্মী নয়। বিস্রস্ত মানসলোকের সেই সৃষ্টি যে অগভীর ও ক্ষীণায়ু হয়, তা কি আমরা মর্মে মর্মে জানি না? তার চেয়ে 'বাবু কালচার' বা 'কেরানি কালচার' না হয়ে আগামী দিনের বাঙলার সংস্কৃতি মিস্ত্রী-মজুরের কালচার হোক,—তাও বরং কাম্য। কারণ জীবনের সঙ্গে কেরানির অপেক্ষা মিস্ত্রী-মজুরের যোগ গভীরতর।

হয়ত কথাটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে—বিংশ শতকের বাঙালী সমাজের ও সংস্কৃতির যা প্রয়োজন তা হচ্ছে মৌলিক পরিবর্তন। এতদিন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতি ছিল বহুলাংশে পরাহত জাতির জীবন-কুণ্ঠা, তার মূলনীতিটা ছিল তথাকথিত ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদ। আত্মকেন্দ্রিকতায় ও কল্পনা-বিস্তারে—শিল্পে, সাহিত্যে আমরা অভিনব সাফল্য অর্জন করেছি। কিন্তু সুস্থ, বীর্যবান্ জীবন-নিষ্ঠা ছাড়া কোনো সমাজ বাঁচে না কোনো সংস্কৃতি যথার্থ বিকশিত হয় না। ইতিহাসের সেই ঘাটতি আমাদের সংস্কৃতিতে পূরণ করবার দিন আগেই এসেছে। তাই আজ আমাদের সংস্কৃতির **মূল মন্ত্র হোক,—জীবন নিষ্ঠা, অর্থাৎ বাস্তববোধ ও বাস্তব জীবন দর্শন।**

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে এই দাবীই করব, আমাদের চাপা-পড়া সৃষ্টিশক্তি এবার যেন মুক্তির পথ পায়।

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক,
হে ভগবান্।*

* নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের (১লা জানুয়ারী, ১৯৫৫) সমাজ ও সংস্কৃতিশাখার সভাপতির অভিভাষণের সারাংশ।

মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্র

আমেরিকা ফেরৎ একজন অধ্যাপক-সুহৃৎ মার্কিন জীবনেরগল্প বলতে বলতে বলছিলেন : "দৈনিক কাগজগুলি ১২ থেকে ২৪ পৃষ্ঠা, কখনো বা তা ৬৩ পৃষ্ঠার কাগজ। তারও আবার দিনে ৪টা করে সংস্করণ। কেনে লক্ষ লক্ষ লোক ; কারণ কেনাই দস্তুর। কিন্তু পড়বে কখন অত লেখা ? বাসে ট্রেনে দেখবেন সবাই রেখে দিয়ে যাচ্ছে সেই কেনা কাগজ—স্তূপাকৃতি। সে কাগজ পথে ঘাটে উড়ে বেড়ায়—নোংরা জঞ্জাল। জিজ্ঞাসা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বলেন, 'খবরের কাগজ পড়ে কে ? সপ্তাহে একদিন 'টাইম্' বা 'নিউজ' প্রভৃতি কোন কাগজ দেখে নিলেই যথেষ্ট।"

গণতন্ত্র বনাম মুদ্রাযন্ত্র

গণতন্ত্রের প্রথম বাহন ছিল মুদ্রাযন্ত্র। অনেকের মতে, আধুনিক কালের প্রথম সূচনাই মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনে। তার পরে সংবাদপত্র যখন দেখা দিল তখন গণতন্ত্র অনিবার্য হয়ে গেল। ফরাসী বিপ্লবের যুগে সংবাদপত্রের নাম হয়েছিল "চতুর্থ প্রতিষ্ঠান"—অর্থাৎ পার্লামেন্টের মতই জনশক্তির আর একটি ঘাঁটি। আজ অবশ্য রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিও তার জুড়ীদার—পশ্চিম জগতে রেডিও ঘরে ঘরে, টেলিভিশনও এখন বাড়িতে বাড়িতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নও শেষ হয়ে গিয়েছে। যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা একদিন জনসাধারণের মৌলিক অধিকারের একটা প্রধান কথা ছিল, আজও তা মৌলিক অধিকার বলেই গণ্য হয়, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের উপর জনসাধারণের আর অধিকার নেই। মুদ্রাযন্ত্রের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে অসীম, কিন্তু সেই ক্ষমতার মূল সেই অনুপাতেই শুকিয়ে গিয়েছে। তাই, মার্কিন কাগজের কাটতি লাখে লাখে। কিন্তু তা আর কেউ তেমন-ভাবে পড়ে না। সাধারণ মানুষের তা পড়বার সময় নেই, শিক্ষিত মানুষের তা পড়বার প্রয়োজন নেই ; তবু তা কাটছে লাখে লাখে। ব্রিটেনের প্রধান দৈনিকগুলির কাটতিও কম নয়, ২৫ লাখ ছাড়িয়ে ৩০ লাখ উঠতে যাচ্ছে 'ডেলি এক্সপ্রেস,' 'ডেলি মেল', 'ডেলি মিরর' প্রভৃতি ইংরেজি দৈনিকের কাটতি। অবশ্য শিক্ষিত ইংরেজের এসব দৈনিকের প্রতি অত ঘৃণা নেই ; কিন্তু তবু তার প্রতি শ্রদ্ধাও নেই। নিজ নিজ রুচিমত ইংরেজ তবু দৈনিকপত্র কেনে, পড়ে এবং আপনার জ্ঞানে ও অজ্ঞানে তার আওতায় নিজের রুচিও গঠন করে। একেবারে 'খবরের কাগজ কে পড়ে ?' এমন কথা তারা বলে না।

এইসব মার্কিন ও ব্রিটিশ কাগজের কাটতির অঙ্ক দেখে বিস্মিত হবার কারণ নেই। জাপানেও ঐরূপ। ব্রিটেনের ৫ কোটি মানুষ প্রায় সকলেই লিখতে পড়তে জানে,—জাপ নেও তাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৫২ কোটি বাসিন্দার মধ্যে সামান্য দু-দশ লক্ষ হয়ত নিরক্ষর থাকতে পারে, কিন্তু ১৪।১৫ কোটি নিশ্চয়ই মার্কিন রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি লিখতে পড়তে জানে। তা ছাড়া, কোনো মানুষই সে সব দেশে এত গরীব নয় যে, দৈনিক কাগজ কিনতে পারে না। কেনার অভ্যাসও তাদের আছে ; কারণ কাগজ কেনাই নিয়ম। ইউ-এন পরিসংখ্যান থেকে দেখি—১৯50এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে হাজারে ৩৫৭ জন সংবাদপত্র পড়ত ; ব্রিটেনে পড়ত গড়ে ৫৯৯ (প্রায় ৬০০) জন। ভারতবর্ষের কথাও এই প্রসঙ্গে বলতে পারি—গড়ে হাজারে আমাদের সংবাদপত্র পড়ত মাত্র ৬ জন (চীনে পড়ত ১০ জন)।

মহাকায়ের স্বরূপ

এই সব সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা দেখে চমকিত হবার কারণ নেই। কারণ, কি জাতীয় সংবাদপত্র পড়ে আমেরিকার বা ইংলণ্ডের মানুষ ? ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ কাগজের দিকে তাকালে বিস্মিত

হতে হয়—সকল বিষয়েই কত কথা! সত্যিই, কত জ্ঞাতব্যই না আছে তাতে—ঘটনা, খেলা, নাচ-গান-থিয়েটার। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কাগজের দিকে তাকালে বিভ্রান্ত হতে হয়—আশ্চর্য! খেলা নাচ গান ছাড়া ব্যবসাপত্র এবং কী যে আছে কী যে নেই, তাই বুঝা যায় না। এত জ্ঞাতব্য দিয়ে কি হবে মানুষের! কিন্তু ওসব 'শ্রেষ্ঠ' কাগজ যে বেশি লোকে পড়ে তা নয়। বরং বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ যা পড়ে আমাদের সংবাদপত্র পাঠকেরা এখনো তা সংবাদপত্রে আশা করে না (সে বিষয়ে আমাদের প্রেস কমিশনের রিপোর্ট যে তুলনা ও মন্তব্য করেছেন, তা যথার্থ ও দ্রষ্টব্য)। খেলা, নাচ-গান থিয়েটারও হয়ত আছে, কিন্তু ওদেশে প্রাধান্য যে খবরের তা হচ্ছে 'ক্রাইম', 'সেনসেশন', খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, যত বীভৎস, ভয়ংকর, নিষ্ঠুর আর যৌন বিকৃতির ও অপরাধের ফাঁপানো ফোলানো খবর। আমাদের দেশের মত রাজনীতির খবরের প্রাধান্য তাদের সাধারণ কাগজে নেই। অবশ্য যে সব কাগজ রাজনীতিক পাঠকের জন্য, তার মানদণ্ড অত্যন্ত উচ্চ। কিন্তু সাধারণ মানুষ ওসব দেশে রাজনীতিক খবরকে তত লোভনীয় মনে করে না।

এ কথার থেকে যেন মনে না করি—ওসব দেশের সাধারণ মানুষ আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের থেকে বেশি অপরাধ-প্রবণ, বা রাজনীতিতে কাঁচা। সব দেশের সাধারণ মানুষ মোটামুটি এক ধরণের—খেয়ে পরে বাঁচতে চায়—এবং একটু ফুর্তি চায়।

এই খেয়ে-পরে বাঁচার দাবিটা তার মনে ঠিক মত জাগবার সুযোগ পাবে, এবং 'ফুর্তিটাতে' তার মনের সানন্দ স্ফূর্তি সম্ভব হবে, আদি যুগে 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার' এইটাই ছিল উদ্দেশ্য। লক্ষ্য করবার জিনিস এই যে, এসব 'সভ্যতম' দেশগুলিতে গণতন্ত্রের সেই আশা মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। কারণ সংবাদপত্র ব্যবসায়ে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রধান চেষ্টা হয়েছে যে করে হোক মুনাফা বাড়াতে হবে, এবং সে উদ্দেশ্যে যে করে হোক তার ক্রেতা বাড়ানো চাই। এই মুনাফা বাড়াবার নিয়মে একদিকে সংবাদপত্র হয়ে উঠেছে ব্যবসায়ি-চক্রের বিজ্ঞাপন বাধ্য মুখপত্র, বিজ্ঞাপন-বশ। অন্যদিকে সংবাদপত্র পাঠককে তুষ্ট করার প্রয়োজনে নিয়েছে দুষ্ট পথ—সংবাদপত্রের কাজ আজ সংবাদ যোগান নয়, সংবাদের নামে সেনসেশন যোগান। ফুর্তির নামে তা করছে বিকৃতি বৃদ্ধি। তার লক্ষ্য শুধু সাধারণ লাভ লোকসান নয়, তার লক্ষ্য মুনাফার পাহাড় তৈরী করা এবং সংবাদ-পত্রের মারফৎ সমস্ত সমাজ-যন্ত্রের উপর 'বৃহৎ ব্যবসায়ের' আধিপত্য বিস্তার, সামাজিক সৃষ্টিশক্তিকে চাপা দেবার জন্য থট্ কনট্রোল।

মালিকানার বেড়াজাল

এই মহাকায় সংবাদপত্রের মালিকানা আজ যাদের হাতে তারা আর তাই সাধারণ ব্যবসায়ী নয়, তারা 'মহা-ধনিক গোষ্ঠী'—ইংলণ্ডে হার্মাস্‌ওয়ার্থ গ্রুপ প্রভৃতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হার্স্ট, স্ক্রিপস্-হাওয়ার্ড, ম্যাককোর্মিক-প্যাটারসন্ প্রভৃতি। শুধু তাই নয়—আমেরিকায় এরাই 'নিউজপ্রিণ্ট' বা ছাপার কাগজ কোম্পানিগুলিরও মালিক। আর তাদের মর্জি না হলে অন্য কোন সংবাদপত্র পয়সা দিলেও ছাপার কাগজ পাবে না। আমাদের দেশও অবশ্য নিউজ প্রিণ্টের জন্য তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। অন্যদিকে এই সব মহামালিকেরই আবার সম্পত্তি হল সংবাদ-সরবরাহ সংস্থা রয়টার কোম্পানি (গত ১৯৫২তে তার একশ বৎসর পূর্ণ হল), যার সঙ্গে আমাদের ভারতের সংবাদপত্রের বড় বড় মালিকেরা সন্ধি করে ১৯৪৬এ 'রয়টার পি, টি, আই' গঠিত করেছেন—বিলাতী মহামালিকের সঙ্গে এদেশের নয়া মালিকদের মিতালিতে ভারতীয় সংবাদপত্রের ছোটদের স্থান হয়নি। মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি আছে বিশ্বগ্রাসী দানব, "এ, পি," "ইউ-পি," ও "আই-এন-এস্" (তার শতবার্ষিকী হচ্ছে ১৯৫৬তে); মার্কিন নরমপন্থী মজুর প্রতিষ্ঠানরা গড়েছিল "এফ, পি," অন্যদের তুলনায় তা নগণ্য। 'এ, পি, ই' হচ্ছে মহাসুর, 'ইউ-পি'

এখন তার জুড়ী। এই সব বৃহৎ সংবাদ প্রতিষ্ঠানদের ছাটাই-কলে ঘটনা ছাটকাট হয়, দরকার মত একেবারে বর্জিত হয়, আবার দরকার মত রচিতও হয়।

শুধু তাই নয়, এরাই আবার ২৩৫টি, 'নিউজ ফিচার' বা সংবাদ পত্রের প্রবন্ধ বিলির সিণ্ডিকেটের বা সংঘের মালিক—তারা প্রবন্ধ বিক্রির ব্যবসা চালায় পৃথিবী জুড়ে (ভারতবর্ষেও)। অর্থাৎ এক প্রবন্ধই জোগায় রাশি রাশি কাগজে। তাই সংবাদ পত্রের প্রবন্ধেও আর বৈশিষ্ট্যের নামগন্ধ নেই, স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতার প্রশ্ন নেই।

তা ছাড়া, এই সব প্রতিষ্ঠানের মতই সংবাদ-সাম্রাজ্যের কবলেই আমেরিকার বইএর ব্যবসা, এবং রেডিও-কোম্পানী সমূহও আবার সন্ধিসূত্রে তাদের সহযোগী। সংবাদ-সম্রাটরা সংস্কৃতিরও তাই কর্ণধার।

কিন্তু এই সংবাদ-সাম্রাজ্য কাদের হাতে?—বিজ্ঞাপন দাতাদের অর্থাৎ বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর। আমরা এখানে 'লাইফ', 'টাইম', 'স্যাটারডে-ইভিনিং পোষ্ট' প্রভৃতি বিজ্ঞাপন-চর্চিত কাগজ দেখি। হয়ত জানিনা, এসব কাগজের এক এক কপির যা মোট খরচ, দাম তার থেকে কম; কিন্তু মুনাফা তবু আকাশচুম্বী, কারণ বিজ্ঞাপনের আয় মহাকাশ-স্পর্শী। এভাবে ব্যবসায়ি-চক্রের হাতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ক্রমশ পরিণত হয়েছে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রে এবং কার্যত সংস্কৃতির রাহুগ্রাসে।

ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের "মালিক-যুগ"

বিদেশের কথা এত বেশি করে বললাম এজন্য যে, আমরা দৈনিক আমাদের যে কাগজ পড়ি, তার স্বরূপ এখন বোঝা দরকার, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কারণ, আমাদের বাঙলা দেশের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এতদিন পর্যন্ত দৈনিক, এবং কতকাংশে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের উপর নির্ভর করত। ফিল্‌ম্‌, রেডিও প্রভৃতি আমাদের তত সহায়ক নয়।

আমাদের দেশে সংবাদপত্রের একদিন প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় ভাবধারায় জনমত গঠন। এই কারণেই সাংবাদিক হয়েছিলেন রামমোহন রায় থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত সকলেই। বিশেষ করে বাঙালী সংবাদপত্র সেবীর সে একটা অমর ঐতিহ্য। কিন্তু ইতিমধ্যেই (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুনাফা-লুণ্ঠনের দিনে) সেই যুগ অতীত হয়ে গিয়েছে। পুরাতন যুগের নাম-মাত্র সাক্ষী হল 'হিন্দু' (মাদ্রাজের), 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'—যারা নতুন যুগের কৌশল গ্রহণে দেরি করেনি। নতুন যুগের প্রতিনিধিই হল বিড়লা, ডালমিয়া, গোয়েঙ্কা প্রভৃতি মালিকেরা যারা গত ১৯৩০-৩৫এর কালে এই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছেন। দেশী ও বিলাতী মালিকের দুদলে একটা বোঝাপড়া হয়ে এখন 'ষ্টেট্‌সম্যান' প্রভৃতি ইংরেজ মালিককে নিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের মালিক-মণ্ডলী তৈরি হয়েছে। তারা এর নাম দিয়েছে—নিউজ পেপারস্‌ এডিটারস্‌ কন্‌ফারেন্‌স। হাসবার কারণ নেই—বকলমী মালিকই সম্পাদক।

অবশ্য মার্কিন বা বৃটিশ সংবাদপত্রের তুলনায় আমাদের দেশের সংবাদপত্রের মালিক-যুগের এখনো মোটে শৈশবকাল। কিন্তু তাই বলে আমাদের সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ কি আর অন্যরূপ হতে পারে না?

"ডলারের ছত্রচ্ছায়া"

এদেশের সংবাদপত্র আপন ধারণায় প্রসার লাভ করবার সুযোগ পেলে কি হত, তা বলা হয়ত অসম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশের সংবাদপত্রের ভাগ্যে সে সুযোগ জুটবে কিনা তা সন্দেহ। ইতিমধ্যেই

আমরা জানি আমাদের মালিক-চক্রের অধিকৃত প্রধান-প্রধান সংবাদপত্রসমূহ ১৯৪৭এর পর থেকে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচারপত্রে পরিণত হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই মার্কিন সংবাদ-সাম্রাজ্যের আওতায় গিয়ে পড়েছে। প্ল্যানের ঋণ, কমিউনিটি প্রেজেক্ট্ প্রভৃতি বহুসূত্রে মার্কিন প্রভাব যে ভাবে ভারতীয় জীবনে শিকড় গাড়তে চাইছে, সংবাদপত্র ও সাহিত্য মারফৎ আমাদের মানসক্ষেত্রেও তার জন্য জমি তৈরি করা হচ্ছে।

ভারতে মার্কিন সংবাদ-সম্রাটদের দু'টি প্রধান কৌশল আছে। একটা সরাসরি মার্কিন সংবাদ-সাম্রাজ্যের ঘাঁটি এদেশে বাঁধা। লাইফ্, টাইম, রিডার্স ডিজেস্ট প্রভৃতি চটকদার কাগজ যে আমাদের মনের উপরে কেমন করে রাজ্য বিস্তার করছে তা আমরা জানি না। কিন্তু তাদের এই কুটনৈতিক চাল যে শুধু কাগজের কাটতিতে তা নয়, ঘাঁটি বাঁধার কৌশলেও তা লক্ষণীয়। দেশীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের অফিসেই তাদের ঘাঁটি বাঁধা হয়েছে। প্রত্যেক পত্রিকার স্তম্ভ খুঁজলে দেখা যাবে তার প্রমাণ। যেমন, কোন সিণ্ডিকেড্ ফিচার ছাপা হয়, কি তার বক্তব্য। হয়ত গোপন অনুসন্ধান করলে জানা যাবে, মালিকেরা ছাড়াও কোন্ কোন্ সংবাদপত্রের বাঙালী সাংবাদিক ব্যক্তিগত ভাবে মার্কিন পবিচালিত কাগজের বা প্রচার অপিসের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত, প্রকাশকদের মধ্যে কে কে হঠাৎ বেনামীতে কেন মার্কিন-প্রচারক গোষ্ঠীব সাহিত্য ছাপছেন, অনুবাদ ছাপছেন, কেন তাতে ভূমিকা লেখবার জন্য কেউ কেউ উদ্যোগী হচ্ছেন। ডলারের এই কেরামতী একটু সতর্ক হলেই সাধারণ মানুষের চোখেও পড়ে। আব, বাঙলা মাসিকপত্রগুলির মধ্যেও তাব অনুপ্রবেশ অস্পষ্ট নয়।

ভারতের ভিতরে ঘাঁটি বাঁধবার অন্য মার্কিন কৌশল হল বেনামী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা। যেমন, 'এশিয়ার বন্ধুগোষ্ঠী' তাদের মার্কিন ফিফ্থ কলাম দেশী সংবাদপত্রেব মধ্যেই তৈরি করছে। কাজটা অবশ্য এখন অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে—কোরিয়াব যুদ্ধাবসানের পর থেকে ভারতীয় পরবাষ্ট্রনীতি মোড় ঘুরছে। অন্য দিকে মার্কিন রাষ্ট্রনীতি পাকিস্তানকে তার ঘাঁটি কবে ভারত সবকাবকে বিরূপ করে তুলেছে। তাই বলে সাংবাদিক মহলের গোপন মার্কিন যোগাযোগ বিনষ্ট হয়নি এবং মার্কিন লাইফ্, টাইম্ প্রভৃতির কাট্তি, বা ফিল্ম্ ও বিকৃত রুচিব বই প্রভৃতির ব্যবসা অব্যাহত আছে। 'সাংস্কৃতিক' প্রচারের পরোক্ষ প্রভাব বরং শিক্ষক, সাংবাদিক, অধ্যাপক মহলে আরও প্রসারিত হয়েছে।

দুঃখের কথা, বাঙলা সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন হতে না হতেই তার গোড়া-কাটা সুরু হল। শুনেছি ফরাসী সংবাদপত্রও এমনি করেই ফ্রান্সের পরাজয়েব অনেক পূর্বেই হিটলারের করতলগত হয়ে গিয়েছিল। অবস্থাটা নিশ্চয়ই এ দেশে তদনুরূপ ভয়াবহ নয়।

"তাঁবেদারি প্রেস"

আমাদের মুদ্রাযন্ত্রের প্রধান বিপদ এখনো বাইরের বিপদ নয়। আমাদের প্রধান বিপদ ঘরের ভেতরেই। সংবাদপত্রের ব্যবসায়ের দিকটা প্রচণ্ডরূপে ফেঁপে ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার তখন সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে তিনগুণ-চারগুণ মুনাফার সুযোগ করে দিয়ে মালিকদের নিজেদের যুদ্ধায়োজনের সহকারী কবে নেন। তাই সংবাদপত্রের আকার অর্ধেক হয়, দাম দ্বিগুণ হয় (পাঠকের উপর ট্যাক্স্ দ্বিগুণ হয়); বিজ্ঞাপনের দামও দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়। তাতে মালিকদের যে সৌভাগ্য লাভ হল পরে আর সংবাদপত্র-মালিকদের পক্ষে সে লোভ সামলানো সম্ভব হ'ল না। বিশেষ করে, অতি-মুনাফাদারি মালিকেরা এর পরে রাজনৈতিক পরিবর্তনে স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক মহলেও প্রবেশ করলেন। ১৯৪৭ এর পরে শাসক-শোষক মণ্ডলীর কাছে তাঁদের আত্মবিক্রয় করতে বাধা রইল না—বিশেষ করে যখন শাসক-যন্ত্র আসলে দেশীয় ধনিকমণ্ডলীরই করায়ত্ত হল। অর্থাৎ সরকারী আত্মপ্রচার মূলত মৌলিকী-প্রাধান্যেরই প্রসার; তাই সে প্রচারে সংবাদপত্রের মালিক শ্রেণীরই স্বার্থসিদ্ধি হয়—একথা সকল ধনিকতন্ত্রী দেশ সম্বন্ধেই অল্পাধিক সত্য। তথাপি যেখানে ধনিকতন্ত্রের মধ্যেও গণতান্ত্রিক চেতনা আছে, এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য

একেবারে বিনষ্ট হয় নি,—যেমন, ব্রিটেনে,—সেখানে এই মূল সত্য মেনেও সংবাদপত্র (নিজের সম্মান ও কাটতির স্বার্থেও) কতকটা সরকারের সমালোচক ও জনমতের বাহক হয়। আমাদের দেশেও সংবাদপত্রের সেই সুস্থ ঐতিহ্য সৃষ্টি হতে পারত—রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত তার বাহক হয়েছিলেন। কিন্তু, প্রথমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুনাফার তলায় তা চাপা পড়ল, তারপর ১৯৪৭এ বর্তমান কংগ্রেস সরকারের আত্মপ্রচারের নির্বোধ আতিশয্যে তা আর মাথা তুলবে এমন সম্ভাবনা রইল না। তাই প্রেস কমিশনও আমাদের সংবাদপত্রের এই অবস্থা লক্ষ্য করে বিরূপ মন্তব্য না করে পারেন নি।

কিন্তু সংবাদপত্রের সম্মান ও প্রভাবও যে দিনে দিনে কিভাবে এই মালিক-পক্ষের অন্তর্ঘাতী নীতিতে নিঃশেষিত হচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল—পশ্চিম বাঙলার ১৯৫৬ সনে বিহার-বঙ্গ সংস্কৃতি প্রস্তাবের আন্দোলনের কালে। দেখা গেল সংবাদপত্র নিতান্তই আজ সরকারের 'রক্ষিত' প্রচারপত্র মাত্র। আরও দেখা গেল—সংবাদপত্রের বাধায় জনমত অনেক সময়ে ব্যাহত হয় বটে, কিন্তু জনমত প্রবল ও সুদৃঢ় হলে সংবাদপত্রের বাধা সত্ত্বেও আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সংবাদপত্রের সাধুতায়, মতামতে, উদ্দেশ্যে লোকের শ্রদ্ধা তাই আজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। কারণ, সংবাদপত্র শুধু মালিক-পত্র হয়নি, মুদ্রাযন্ত্র হয়ে উঠছে জন-জীবনের যন্ত্রণাস্বরূপ।

কথাটা এই যে, সংবাদপত্রের পাতায় সত্য পাওয়া সম্প্রতি সহজ হয় না, দেশীয় ও বিজাতীয় মুদ্রাযন্ত্রের এই ষড়যন্ত্রে ক্রমেই কি তা অসম্ভব হবে? সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কি এদেশেও একটা 'ভারতীয় সংস্করণ' মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রেই পরিণত হবে? সংবাদপত্র যদি শুধুমাত্র ব্যবসা বা মুনাফার যন্ত্র হয় তাহলে হয়ত এরূপই তার বিধিলিপি।

গণতন্ত্রের আত্মরক্ষা

অবশ্য অন্য একটা কথাও আমাদের গণতন্ত্রী জনকর্মীদের বোঝা দরকার। নিশ্চয়ই শতকরা, ৭৫ জন নিরক্ষরের দেশে জনতাকে গঠন করার শ্রেষ্ঠ পথ সংবাদপত্র পরিচালনা নয়,—সে পথে ছবি গান, কথকতা, মুক্তক্ষেত্রে অভিনয়ই বেশি সফল। তার অর্থ এ নয় যে, মুদ্রাযন্ত্র বর্জনীয়, মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্র উপেক্ষণীয়, কিম্বা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অবাঞ্ছনীয়। কারণ মুদ্রাযন্ত্রের ষড়যন্ত্র আসলে হচ্ছে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মালিকতন্ত্রের চক্রান্ত এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শাসক-গোষ্ঠীর অভিযান।

তা ছাড়া বর্তমান মালিকতন্ত্রী সমাজের মধ্যেও সাধারণের সত্য ঘটনা জানবার ও যথার্থ মতামত জানাবার কিছু কিছু উপায় হতে পারে। যেমন, প্রথম পথ—পাঠক সাধারণের সমবায় মূলক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা,—বিলাতের ডেলি ওয়ার্কার এভাবেই পরিচালিত হয়। দ্বিতীয়ত, ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের (টি, ইউ, সি) বা সেরূপ জন-সংগঠনের (পার্টিদের) নিজের আওতায় নিজ নিজ সংবাদপত্র গঠন করা। তৃতীয়তঃ, জেলায় জেলায় জন-সমাজের সংবাদপত্র গড়া। চতুর্থত, এই নিরক্ষর দেশের জনসাধারণের জন্য পথে ঘাটে হাটে-বাজারে ফিল্ম্ রেডিও ও প্রাচীর-পত্র পরিচালনা করা। অবশ্য প্রধান কথা—সংবাদপত্রের মালিকদের মুনাফা-নিয়ন্ত্রণ। এবং সমাজতন্ত্রই হোক বা লোকায়ত্ত রাষ্ট্রই হোক, কিম্বা হোক ওয়েলফেয়ার ষ্টেট, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা করা। কারণ, মতের স্বাধীনতা ও মনের স্বাধীন জিজ্ঞাসা ব্যাহত হলে মালিকতন্ত্রের মতই সমাজতন্ত্রেও কোনো সৃষ্টি সম্ভব হবে না, কোন সংস্কৃতিই বাঁচবে না।

এই আলোচনা মুদ্রণকালে (১৯৫৬) পণ্ডিত জওহরলাল প্রকাশ্যেই দিল্লী ও পাঞ্জাবের সংবাদপত্র সমূহের সম্বন্ধে বৈদেশিক যোগাযোগের অভিযোগ করেছেন। বলা বাহুল্য, অন্য প্রদেশেও অনুরূপ যোগাযোগ নেই, এমন নয়।

স্বাধীনতার সাহিত্য

১৯৫০এর একটি সাহিত্য সভায় আলোচনা উঠেছিল—স্বাধীনতা লাভের পরে বাঙলা সাহিত্যে কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ গাঙ্গুলী পরিচ্ছন্ন আলোচনায় বলেছিলেন, 'চার-পাঁচ বৎসর পূর্বেও বাঙলা সাহিত্যে একটা চাঞ্চল্য ও গতিময়তা দেখেছিলাম। আজ তা, নেই।'

সাহিত্য এভাবে বিচার করা একটু বিপজ্জনক—অত স্বল্প সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফল সাহিত্য লাভ করে উঠতে পারে না। তাছাড়া, সকল সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা কে অনুসন্ধান করেছে? সকল সদ্য-প্রকাশিত গ্রন্থের খোঁজ কে রাখে? বিশেষত, সকল যুগেই যা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় সে সব লেখার শতকরা ৯৫ টি ব্যর্থ, হয়ত জন্ম-মৃত। আর যা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তারও শতকরা ৭৫টি আসলে ব্যর্থ ও বাঁচবার অযোগ্য। পুষ্টির অভাবে মৃত্যু ঘটে হয়ত এরূপ শতকরা ৫টি পুস্তকের। কাজেই ১৯৪৭এর পরবর্তী সাহিত্যের বিচার করতে বসে এই অজাত-মৃতদের সংখ্যা দেখে আঁৎকে উঠবার কারণ নেই। সর্বকালে সর্বদেশেই সাময়িক সাহিত্য এবং সমসাময়িক সাহিত্যের সম্বন্ধে এ কথা সত্য। এমন কি, সর্বকালেই প্রেমের কবিতাও শতকরা ৯৫টি অপাঠ্য; অথচ সর্বাপেক্ষা বেশি লেখা হয় প্রেমের কবিতা। যা যত বেশি জন্মে তা তত বেশি ছাঁটাই হয়। তবে সাধারণের রুচি ও প্রবৃত্তির সাময়িক সুযোগ নিয়ে দু' একদিনের মতও কোনো অযোগ্য লেখা আসর জমাতে পারে না, তা নয়। সর্বদাই তা জমায়। তাব থেকে আমরা পাঠক সমাজের মন ও মতের একটা দিক বুঝতে পারি। কারণ, পাঠক-সমাজ আসলে বিরাট জনসমাজেরই এক প্রত্যক্ষ প্রতিভূ। তাই পাঠকের মন ও মত সামাজিক মন ও মতের প্রতিলিপি; আর সমাজের মন ও মত আবার প্রধানত সমাজের আর্থিক-রাষ্ট্রীয় অবস্থা ও ব্যবস্থাব একটি যোগ বিয়োগেব ফল। এই 'প্রধানত' অর্থ 'একমাত্র' নয়, তাও স্মরণীয়। এ পদ্ধতিতেই আমরা এ সময়কার সাহিত্যকে দেখব —এটা স্থায়ী কলাকীর্তির বিচার নয়, সাময়িক লক্ষণের হিসাব।

বিশেষ একজন লেখকের বিশেষ একটি লেখাও এই সামাজিক দৃষ্টি দিয়ে সর্বাংশে সঠিক বিচার করে ওঠা কঠিন। কিন্তু প্রধান একজন লেখকের সকল লেখা নিয়ে এ দৃষ্টিতে তাঁর প্রধান লক্ষণটা মোটামুটি পরিমাপ করা সম্ভব। তার অপেক্ষাও অধিক সম্ভব এই সামাজিক মাপকাঠিতে এক-একটা ছোট বা বড় পর্বের সাহিত্যের বা শিল্পের পরিমাপ—যদি মনে রাখি সাহিত্যে সমাজের ছায়া প্রায়ই সরাসরি পড়ে না, তা পড়ে সূক্ষ্ম-স্থূল নানা বিচিত্র পথে; এবং যে সাহিত্য যত সার্থক তাতে এই ছাপ তত প্রচ্ছন্ন। দ্বিতীয়ত, শুধু সামাজিক ছায়া-বা-প্রতিচ্ছায়া দিয়েও সাহিত্য সাহিত্য হয় না, তাকে সাহিত্যের নিয়মে সাহিত্য হতে হয় সর্বাগ্রে। প্রতিচ্ছায়া সরাসরি পড়লেই যদি সাহিত্য হত তা হলে সাময়িক পত্রের সম্পাদকীয় ও নেতাদের ভাষণই হত সাহিত্য। সামাজিক সত্যের যান্ত্রিক প্রতিলিপি যদি সাহিত্যে কেউ প্রত্যাশা করেন, তা হলে সরকারী বে-সরকারী ইস্তাহার ও 'রিপোর্ট'ই যেন তিনি পাঠ করেন—অবশ্য তাতে প্রসাদগুণ থাকলে তাও সাহিত্য হিসাবে অপাঠ্য হবে না।

এখন প্রশ্ন হবে—বর্তমানে বাঙালী সমাজের কি তফাৎ ঘটেছে যে, বর্তমান বাঙলা সাহিত্য তখনকার তুলনায় এখন অন্যরূপ হয়ে পড়ল?

রূপান্তর ও বিরূপতা

১৯৪৭এর 'পনেরই আগষ্ট' ভারত স্বাধীন হয়েছে। ১৯৫০ এর ২৬শে জানুয়ারি 'প্রজাতন্ত্র ভারত' স্থাপিত হয়েছে। রাজনৈতিক রূপান্তর ঘটছে, কিন্তু অর্থনীতিতে স্বরাজ এখনো অনায়ত্ত।

তা ছাড়া, আমি জন্মেছিলাম পূর্ব-বাঙলায়, মানুষ হয়েছি পশ্চিমবাঙলায়। কাজেই, আমার পক্ষে আর বিস্মৃত হবার পথ কোথায় যে, বাঙালী সমাজে বিপর্যয় ঘটেছে;—যখন জানি শিয়ালদহ ষ্টেশনের কথা, উদ্বাস্তু কোলোনির ব্যাপার।

তবে বাঙালী সমাজের এ সাম্প্রদায়িক বিপর্যয়ও একেবারে আকস্মিক নয়। কারণ, মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যের পটভূমি লক্ষ্য করলেও আমরা দেখি—আমাদের জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সাহিত্য সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। তারপর উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমান পশ্চাতে পড়ে থেকে নিজেও পিছনে পড়েছে, জাতিরও অগ্রগতিকে উপেক্ষিত করেছে। তখনও বাঙলার ও ভারতের রাজনৈতিক জীবন অখণ্ড সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। শেষে, অন্ততঃ গত ত্রিশ বৎসর ধরে, ভারতের ও বাঙলার সামাজিক-রাজনৈতিক নেতৃত্ব এই আত্মঘাতের পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। প্রথম-মহাযুদ্ধের শেষেই মধ্যবিত্ত-অগ্রগামিতার দিন ফুরায়; আর গত মহাযুদ্ধের কালে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের শেষ বনিয়াদ ধসে যায়। তথাপি মুদ্রাস্ফীতি, যুদ্ধের ঠিকাদারি ও কালোবাজারী লাভকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষে জন্মে এক বিকৃত পুঁজিবাদী গোষ্ঠী—এরা ফেঁপে উঠল দেশে কল-কারখানা বাড়িয়ে নয়, শিল্পোন্নয়ন করে নয়, এমন কি দেশের উৎপাদন বাড়িয়েও নয়। কারণ, তা যুদ্ধকালে প্রায় বাড়েই নি, যুদ্ধের পরে ১৯৫২ পর্যন্ত আরও কমেছে। তারপর উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি হয় নি। এরা ফেঁপে উঠল সাম্রাজ্যবাদীদের বেনিয়ান-মুৎসুদ্দির মত যুদ্ধের মুনাফাদারির সুযোগ নিয়ে, বিশেষ করে কালোবাজারী কৌশল গ্রহণ করে।

পনেরই আগস্টের ভারত বিভাগ, বঙ্গ-বিভাগ, ক্ষমতাবানদের মুখপাত্র হিসাবে কংগ্রেসের 'রাজ্য লাভ', লীগেরও পাকিস্তান লাভ—এই পরিবর্তনে ব্রিটিশ শোষক স্বার্থ পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়েছে এবং ভারতের কালোবাজারী পুঁজিদার গোষ্ঠীও যথার্থ অভীষ্ট লাভ করেছে। কারণ, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা কেন্দ্রে ও প্রদেশে যে ভাবে কালোবাজারী স্বার্থে এ কয় বৎসর দেশ শাসন করেছে, তাতে অবশ্য পরিচালকদের আত্মীয়, জ্ঞাতি কুটুম্বরা কোটপতি হতে পেরেছে, কিন্তু জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতায় সাধারণ মানুষ যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে তাদের মুখে শুধু একটি কথা শোনা যায়—'এর চেয়ে ইংরেজই ভালো ছিল।' সম্পূর্ণ রূপান্তরের অভাবে রূপান্তর সম্বন্ধেও দেশে এই বিরূপতা জেগেছে।

এই নিরাশাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে বাঙলা ও বাঙালী জীবনের হারিকিরি। দুই বাঙলার সেই আর্তনাদ ও সিংহনাদে বাঁচবার মত শুভবুদ্ধি বিশেষ দেখা যায় না; তাতে দেখছি মরণবুদ্ধিরই আরও ভয়ঙ্কর পরিচয়।

আপাতত বাঙলা সাহিত্য হচ্ছে তাই ব্যাহত বিপ্লবের সাহিত্য, আপৎকালীন বাঙালীর সাহিত্য;—নতুন নির্মাণের সংকল্প এখনো তাকে স্পর্শ করেনি।

গত কালের দান

অবশ্য যুদ্ধকালের বাঙলা সাহিত্যে যেটুকু শুভচিহ্ন আমরা দেখেছিলাম তা এখনও একেবারে লুপ্ত হয়নি। কারণ, সাহিত্য কালের সেরূপ সরাসরি প্রতিচ্ছায়া বহন করে না; তার মধ্যে বিশেষ ঐতিহ্য সঞ্চিত হয়, যতটুকু তার টিকবার টিকে থাকে অনেক রূপে। কিন্তু বর্তমানের বিপর্যয় এত বিষম যে, সেই শুভচিহ্নগুলিতেও আর তেমন শক্তির চিহ্ন নেই, তাও ম্রিয়মাণ; তার সঙ্গেও জড়িয়ে যাচ্ছে হয়ত নানা ফাঁকি, মিথ্যাচার, ফয়িফক্কা। চার-পাঁচ বৎসর পূর্বেকার তেমন দু'একটি শুভ-চিহ্নের উল্লেখমাত্র করলেই আমরা তা বুঝতে পারি।

প্রথমত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বাঙলা সাহিত্যে একটা রাজনৈতিক বোধ দেখা দেয়। তা শুধু কমিউনিষ্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

দ্বিতীয় শুভচিহ্ন যা তখন দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে—বাঙলা সাহিত্যের দৃষ্টি মধ্যবিত্তদের গণ্ডী ছাড়িয়ে দরিদ্র নিম্নবিত্ত ও কৃষক মজুরদের জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অবশ্য এ লক্ষণ

প্রবেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল—যখন রবীন্দ্রনাথ জানালেন তিনিও অপেক্ষায় আছেন সে কবির জন্য যিনি কৃষকের শ্রমিকের জীবনের শরিক। এবার বোঝা যায়—সাহিত্য আর ড্রয়িং রুমে বা বৈঠকখানায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা নিশ্চয়।

সেদিনের সাহিত্যে তৃতীয় একটা সুলক্ষণ ছিল—তাতে তখন "আঞ্চলিক" সত্য-নিষ্ঠা দেখা দিয়েছিল; আর লেখকের দৃষ্টি শুধু কলকাতায় আবদ্ধ থাকেনি। আজও তা থাকে না। তবে তার ভাবগত লক্ষ্য একটু পরিবর্তিত হয়েছে।

সাহিত্যের এই ভাব-বস্তুতে দু' একটি পরিবর্তন আজ বিশেষ লক্ষণীয়! যেমন, এক, সেদিনের লেখক যে সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে নতুনভাবে সচেতন হয়েছিলেন আজ কালোবাজারী-যুগে তাঁর সে দায়িত্বপালনে তেমন অকুণ্ঠ আগ্রহ নেই। দুর্নীতির বিরোধিতা আজ যেন স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরোধিতা! দুই, সেদিনে একটা বুদ্ধি ও যুগ-জিজ্ঞাসা প্রখর হয়েছিল; বলা বাহুল্য আজ তা' আর প্রশ্রয় না দিয়ে বুদ্ধি-বিরোধিতা ও সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা বিলাসই (শোভিনিজম্) প্রসারিত করা হচ্ছে।

সেই বাঙলা সাহিত্যের প্রস্তুত-করা পূর্ব পথ একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি, হবে না, তা তথাপি সত্য।

এই কয় বৎসরে বাঙলা সাহিত্যে আমরা প্রধানত কি নতুন লক্ষণ দেখছি? সংক্ষেপে তা উল্লেখ করছি—যদিও সংক্ষেপে উল্লেখ করলে তর্কের ও ভুল বুঝবার অবকাশ থাকে।

মৌতাতের ঝোঁক

বর্তমান বাঙালী পাঠক সর্বাপেক্ষা কোন্ ধরণের সাহিত্য বেশি পাঠ করেন? "এর চেয়ে ইংরেজই ছিল ভালো" যে সময়ের সামাজিক মনোভাব, সে সময়ে পাঠকমনের বৃহত্তর অংশ স্বভাবতই চায় মৌতাত।

এ নেশার একটা উপকরণ—'মোহন সিরিজ' বা অমনিতর আরও কোনও সিরিজ। পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্র রায় প্রভৃতিরও যথেষ্ট পাঠক ছিল; কিন্তু এমন নির্বোধ পাঠক শ্রেণী তাঁরাও কামনা করতে পারতেন না। সর্বদেশেই এ জাতীয় উপন্যাস একটা সামাজিক-ব্যাধির খোরাক (ঔষধ নয়, বোঝা উচিত)। কিন্তু এদেশে এ খোরাক যেমন হাস্যকর তেমনই অখাদ্য,—এইমাত্র দুঃখ।

আধুনিক বাঙালীর দ্বিতীয় নেশা—'রম্য-রচনা'। 'দৃষ্টিপাত' থেকে তার সূচনা, কিন্তু সৈয়দ মুজতবা আলীর সাংবাদিক-নিপুণতায় তার বিস্তার। একটু বুঝিয়ে কথাটা বলছি। 'দৃষ্টিপাত' যুদ্ধের শেষ পর্বে প্রকাশিত হয়, ঠিক এ পর্বে নয়। তা একখানি সুখপাঠ্য বই, সুলিখিতও। অবশ্য তা 'বেল লেতর্স' নয়,—বাঙলায় বহু 'বেল লেতর্স' পূর্বেও ছিল। ওটা লেখকের এক নম্বরের চাল। দুই নম্বরের চাল—লেখকের মৃত্যু ঘোষণা করে পূর্বাহ্নেই পাঠকের মনকে আর্দ্র করা। লেখকের তৃতীয় নম্বরের চাল হচ্ছে প্রত্ন-তত্ত্বের বা পানীয়-তত্ত্বের বই টুকে পাঠককে চমৎকৃত করার চেষ্টা। কিন্তু সব চেয়ে বড় চাল হচ্ছে নোকরশাহীর মুরুব্বিগোষ্ঠীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার চেষ্টা—একটু আঁচড়ালেই লেখকের 'টক-আঙুরী' মনোভাব পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। এই হল 'দৃষ্টিপাতের' মূল চরিত্র—তা 'আদিখ্যেতার' সাহিত্য, Snobberyর সাহিত্য। 'দৃষ্টিপাত' সুপাঠ্য, সুলিখিত,—কিন্তু, 'সোণারূপা নহে বাপা, এ বাংগা পিতল।'

কিন্তু পাঠক-সাধারণকে তা এত তৃপ্ত করল কেন?—প্রথমত তা দিল্লীর নোকরশাহীকে ব্যঙ্গ করায় 'এর চেয়ে ইংরেজই ছিল ভালো' এ ভাবনায় উত্যক্ত পাঠক পরিতৃপ্ত। দ্বিতীয়ত, লেখকের মতই বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত পাঠকও ওই স্নব চক্রকে উপহাস করলেও স্নব-চক্রেরই ঘনিষ্ঠতা-প্রার্থী;—তা পেলে খুশি, কৃতার্থ, না পেলে ব্যঙ্গ-মুখর। একটা সুস্থ মর্যাদাবোধ অপেক্ষা স্নবারির বর্ণচোরা-লোভই হল এ গ্রন্থের আদরের একটা প্রধান কারণ। তৃতীয় কারণ,—সেই 'শেষের কবিতার' দিন থেকে বাঙালী পাঠক চটুল কথার সাহিত্যে আসক্ত হয়ে উঠছেন—'কাল্ট্' হন 'আমিয়ানে'।—'দৃষ্টিপাত' তবু

সাহিত্য, সরস সাহিত্য—বড় কিছু নয়, স্থায়ী কিছু নয়, চটুল কথা-সর্বস্ব লেখা। কিন্তু বর্তমান-যুগে সমাজে যে আশাভঙ্গ দেখা দিল—তাতে 'দৃষ্টিপাত'ও আর বই নেই, পরিণত হয়েছে একটা 'সিরিজে'। আদিখ্যেতেপণা ও snobbery সম্বল করে তার অক্ষম অনুকরণও বেরিয়েছে বাজারে। 'রঞ্জন' ইংরেজি-মার্কিন বুকনি ও নীরদ চৌধুরীর বিদ্যার প্রবারিকে বাঙলায় ঢেলে সেজে পরিতৃপ্ত। আর, সৈয়দ মুজতবা আলী বাগ্-বৈদগ্ধ্য ও হাল্কা ঢঙের মারফৎ ইয়ার্কিকেই প্রায় কাল্ট্ করে তুলেছেন একালে।'

এই রম্য-রচনারই এক পার্শ্বে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' নিয়ে প্রবেশ করেন। তাঁর উপন্যাসের মতই তা উপাদেয়, এবং যুগ-বর্ণনা অপেক্ষা কথা-সাহিত্য হিসাবেই তা সমাদৃত হওয়া উচিত। কিন্তু আদৃত হয়েছে বিশেষ করে কথার জন্য, 'রম্য রচনা' বলে। বক্তব্যের সত্যাসত্যের প্রশ্ন আর কেউ দেখে না।

এই কথার কারুকর্ম নিয়ে তারপর অচিন্ত্যকুমার বাঙালী মনের একটি দুর্বলতর ক্ষেত্রে তাঁর আসন পাতছেন। সেটি ভক্তি বিহ্বলতার ক্ষেত্র। 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' একই কালে রম্য-রচনা, উপন্যাস ও ঠাকুরের লীলা-কাহিনী। কিন্তু সব শুদ্ধ তাতে পরিচয় পাওয়া যায় বর্তমান শিক্ষিত বাঙালী সমাজের অদীক্ষিত মনোভাবের, চিন্তা ও চারিত্রিক দেউলেপনার। অবশ্য বৃন্দাবন দাসের আমল থেকেই বাঙলা দেশে গ্রামে গ্রামে অবতার জন্মায়। কিন্তু রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের পরে, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মত হিন্দুত্ববাদীদের বলিষ্ঠ ধর্মজিজ্ঞাসা ছেড়ে যে এভাবে বাঙালী শিক্ষিতরা যে কোনো গুরুঠাকুর বা মাতাজীর নামে লুটিয়ে পড়তে পারলেন, এটা শ্রেণীগত অধঃপতনের প্রমাণ ও সমস্ত সমাজের আশাভঙ্গ ও বিমূঢ়তারও প্রমাণ।

এ কালের এই বিমূঢ়তার অন্যতম লক্ষণ আত্মকাহিনীর প্রাবল্য। এ কথা ঠিক, বিপ্লবী রাজনীতির কোনো কোনো পাতা লোক-সমাজে এখন প্রকাশ করতে বাধা নেই। সে হিসাবে বিপ্লবীদের বা রাজনীতিক কর্মীদের আত্মকাহিনী লেখার মূল্য আছে—যদি তা যথার্থ হয়। কিন্তু সাহিত্যিকদের সেরূপ বাধা পূর্বেও ছিল না। তথাপি এ সময়ে তাঁরা অনেকেই নিজ আত্মকথা রোমন্থনে ব্যস্ত হলেন কেন? দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শিবনাথ শাস্ত্রীর মত সকলের জীবন বাঙলার সামাজিক-আধ্যাত্মিক বিকাশের একটা প্রতিলিপি বলেও গ্রাহ্য হতে পারে না। ব্যক্তিমাত্রেরই জীবন অবশ্য unique, কিন্তু নিজের সেই অপূর্ব রহস্যকে আত্মকথায় প্রকাশ করা সুসাধ্য কর্ম নয়, এ কথা সাহিত্যিকরা অন্তত জানেন। এই 'আত্মচরিত সাহিত্যের' কাজে যে অনেকে অগ্রসর হলেন তার কারণ হয়ত, প্রথমত, সাহিত্যে তাঁদের আত্মপরিচয় দান সম্পন্ন হয়নি, এই বিজ্ঞাপনের যুগে তাই আত্ম-বিজ্ঞাপনে তাঁরা নামলেন। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিকরা অনেকেই নিজের অতীত রোমন্থনে তৃপ্ত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে গ্রহণ করতে তত উদ্যোগী নন। অথচ স্বাধীনতা লাভের পরে অতীত অপেক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হওয়া উচিত মহত্তর প্রেরণা।

এ কথাও বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন যে, এ সবেরই প্রতিক্রিয়ায় সুস্থ সামাজিক আদর্শকে ক্ষত-বিক্ষত করে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের নামে একটা 'মার মার সাহিত্য' বা 'কাট্-কাট্ সাহিত্য' যা দেখা দিয়েছিল তাও সাহিত্য নয়। তাও সামাজিক অসুস্থতারই একটা চোরাগোপ্তা আক্রমণ। সে কিন্তু সাহিত্যের বিষয়বস্তু বাড়িয়েছে, তবু চেঁচামেচিই তার প্রধান গুণ। যা সাহিত্য নয় শত চেঁচামেচি করলেও তা সাহিত্য হয় না।

এ সময়কার সাহিত্যে কি তা হলে সৃষ্টি-ধর্মের কোন লক্ষণ নেই? স্নবারি, সফিষ্টিকেশন, সেক্স্ ও 'ধর্ম'—এই কি সব?

নতুন বাণী

এমন কথা বললে নিশ্চয়ই পাপ হবে। একথা বলতে হবে যে নতুন বাণী এখনো পথ আবিষ্কার করে স্থির হয়নি। তার গুণ ও পরিমাণ দু-ই এখনও স্বল্প; কিন্তু সম্ভাবনা তারই বেশি।

আগেকার যুগের তারাশঙ্কর, বনফুল, সুবোধ ঘোষ প্রভৃতি 'পঞ্চাশোর্ধ্ব' সাহিত্যিকরা কেউ 'বানপ্রস্থ' অবলম্বন করেন নি,—করলে ক্ষতি হত, পাঠকের না হোক, লেখকের ও দর্শকের। কারণ, বাঙলা সাহিত্যিকের হলিউড যুগ এসেছে—বোম্বাইর ফিল্মের তাগিদে জন্ম হতেই সাহিত্যেও এখন বোম্বেটে গুণ জন্মাচ্ছে। তাই বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকরা লেখনী ত্যাগ করতে পারবেন না। তবে তাঁদের কাছে আর নতুন সৃষ্টির স্বাক্ষর এ সময়ে দাবি করা বৃথা। 'বনফুলের' উদ্ভাবনী শক্তি অবশ্য নিস্তেজ হয় নি, কিন্তু কারও অভিজ্ঞতার পুঁজি অফুরন্ত নয়। তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত; অর্থাৎ স্থাবর। তাঁদের অনুজদের মধ্যে নারায়ণ গাঙ্গুলী এখনও সজীব, সৃষ্টিশীল; তাঁর পক্ষে প্রয়োজন গভীরতর সমাহিতির (integration)—ঠিক নতুন পথে পুরানো মহারথী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও যা আয়ত্ত করেও করতে পারছেন না। নতুনদের মধ্যেও সুশীল জানা, নরেন্দ্র ঘোষ, ননী ভৌমিক সেই সাহিত্য ও জীবনের সুসঙ্গত সংহতি খুঁজছেন; তাই তাঁদের নিকটে নতুন কিছু প্রত্যাশা করা যায়। দুই একজন নবাগত লেখকের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—'উত্তরঙ্গের' লেখক সমরেশ বসু, 'রঙরুটের' লেখক বরেন বসু, 'লখীন্দর দিগরের' লেখক গুণময় মান্না। এখনো এদের আঙ্গিক ও প্রকাশকলায় ত্রুটির অভাব নেই; তবু তাঁরা বাঙলা-সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃত করছেন। আর সত্যই তা সাহিত্য।

এমনি নতুন সৃষ্টির আভাস নিশ্চয়ই আরও আছে; এখনও তা হয়ত মাসিক পত্রের পাতায় রয়েছে গুপ্ত—হয়ত অসাবধানতায় আমাদের এ মুহূর্তে চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। হয়ত বা আগামী কাল তা অঙ্কুরিত হবে। (অনুমান সত্য, বিমল মিত্র, জরাসন্ধ, শঙ্কর, অবধূত প্রভৃতি লেখকেরা ১৯৫০-এ উদিত হন নি; উদিত হলেও ততটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। ১৯৫৬তে এখন তাঁরা সুপরিচিত)। সার্থক কবিতা ও সৃষ্টিশীল কবিও নিশ্চয় আছেন। সুধীন্দ্রনাথ মৌনব্রত নিলেও বুদ্ধদেব বসু কবি হিসাবে অকৃপণ; নরেশ গুহ তাঁর পশ্চাতে অক্লান্ত। জীবনানন্দ দাশ স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে সমরূপে কাব্যধর্ম-নিষ্ঠ। বিষ্ণু দে স্বকীয় সাধনায় অনলস—যদিও তিনি কখনও সাধারণ পাঠকের নিকট সহজ-বোধ্য হবেন না; 'অন্বিষ্ট'ও তা হয়নি। তা ছাড়া হঠাৎ যখন একটি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা থেকে দেখি প্রায়-অপরিচিত কবি বলেন,

রাত্রি এল মৃত্যুর মতো গাঢ় পা ফেলে ফেলে,—

কিংবা হাতে এসে পড়ে প্রায়-অপরিচিত রাম বসুর প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'তোমাকে'— পড়ি তাঁর 'ভাবণ'—

রবীন্দ্রনাথ! আমরা তীব্র ঘৃণায় পবিত্র হয়েছি—
আমরা তীক্ষ্ম হিংসায় আগ্নেয়গিরি—
আমাদের ভালবাসায় উজ্জ্বল পৃথিবী,

পড়ি, 'পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে'—এবং পড়ি বারে বারে তাঁর মুখ্য-কবিতা 'তোমাকে'—

কামনার রাত কবে পাব?
কথার রূপালি এ হ্রদে ছোট ছোট ঢেউ তুলে তুলে
তোমাকে ভাসিয়ে দেবো,
আবার বাহুতে নেবো,
তোমার শরীরে নামে অরণ্যের উদ্ভিদের গন্ধমোহ গান
হারিয়ে যাওয়া সুর,
আমি যেন রোমাঞ্চ আকাশ
সাড়া পাব ফসলের সজীব আঁধারে
নদীর চঞ্চল স্রোত শান্ত হবে সমুদ্রের বুকে,
শুধু সেই রাত পাব কবে?
শুধু সেই রাত পাব বলে
বিদ্যুতের কশাতে ক্রুদ্ধ মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে—
সঙ্কুচিত কামনার মোহনার নীল সাড়া এনে

ভিখারী ছেলের চোখের কোনে দেখা আশা মেলে
সামনে এগিয়ে যাব রহস্যের বাঁধ ভেঙে ভেঙে
হৃদয়ে শরীরে শান্তি, গোলায় গোয়ালে শান্তি
শান্তি এনে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে—
কামনার রাত পাব তবে।

আমরাও তখন জানি—শত দুর্দিনেও এই নতুন দৃষ্টির কবিদের মধ্যেও সৃষ্টির আভাস আছে,—বিষ্ণু দে, বিমল ঘোষ, সুকান্ত, সুভাষ, মঙ্গলাচরণ, মণীন্দ্র রায়েই তা শেষ হয় নি ;—আছে ব্যক্তিপ্রেমকে বৃহত্তর কর্মচেতনার মধ্যে সম্পূর্ণ ও সংহত করবার মত প্রয়াস। কবিতা মরেনি। ছোট গল্প উন্নতির দিকে।

কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে—এখনও নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত আছে। তেমনি 'রম্য-রচনা' সত্ত্বেও প্রবন্ধ-সাহিত্যে চিন্তার প্রসার দেখা যায়। অতি-প্রশংসিত হলেও 'বাঙালী জাতির ইতিহাস' নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। রাজশেখর বসু, অতুল গুপ্ত, কাজী আবদুল ওদুদ, নির্মলকুমার বসু, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকেরা ছাড়াও বিনয় ঘোষ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 'প্রাবন্ধিক'রা এখন সাহিত্যে সম্মানিত হন। 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ' বা 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্' যে বুদ্ধিশুভ্র সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাও ভুলবার নয়।

সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক ও সার্বজনীন ব্যাপ্তি, সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ—এই হল বাঙালী সংস্কৃতির এখন প্রথম প্রয়োজন। আসলে কালোবাজারী কালচার বড় কথা নয়, বড় কথা এই নাতিপরিচিত, নাতিপ্রশংসিত সৃষ্টি-প্রয়াস ; এবং রসসাহিত্য অপেক্ষাও এই জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রসারী সাহিত্য-রচনার চেষ্টা। তা'ই আগামীকালের প্রতিশ্রুতি।

হয়ত শুধু কান্তা-সম্মত সাহিত্যের অপেক্ষাও এই রাষ্ট্রগঠন, সমাজ গঠন ও জীবন-গঠনের জন্য প্রয়োজন বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল প্রবন্ধ-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা। সাহিত্যের বহুমুখী সাধনা ছেড়ে বাঙলা সাহিত্য এতকাল বড় বেশি কৃত্রিমভাবে কান্তা-সম্মত সাহিত্যের চর্চা করেছে। এবার আসুক বুদ্ধি-প্রদীপ্ত সাহিত্যের পর্ব।

———

বাঙলা লোক-সাহিত্যের সম্ভাব্যতা

মধ্যযুগের শিক্ষিতদের সাহিত্য ও এ যুগের ইংরেজি শিক্ষিতদের সাহিত্যই একমাত্র বাঙলা সাহিত্য নয়। বাঙলার লোক-সাধারণের নিজেদের যে সাহিত্য আছে তাও অপূর্ব সম্পদ। এমন কি, তাতেই বাঙালী মনের সহজতর রূপ অবিকৃত রয়েছে, এমনও বলা যায়। অনেকে তাই মনে করেন বাঙলার জাতীয় সংস্কৃতির অর্থ এই লোক-সংস্কৃতি, আর জাতীয় সাহিত্যের অর্থ এই লোক-সাহিত্য। আগামী দিনে কি তা'ই হবে আমাদের সৃষ্টি চেতনার আশ্রয় ?

প্রাচীন বাঙলায় সাহিত্য বলতেই কাব্য, গদ্যের সন্ধান বড় নেই। কিন্তু লোক-কাব্য ছাড়াও লোক-সাহিত্য আছে। সেরূপ লোক-সাহিত্য ব্রতকথা রূপকথা, উপকথা উপাখ্যান ইত্যাদি। তার কাল ও ভাষা অনির্দিষ্ট। কারণ, তা মুখে মুখে চলত। কথাকারের গুণে হয়ত তা কখনো কখনো সাহিত্য হয়ে উঠতে পারত, না হলে হয়ে থাকত শুধু আনুষ্ঠানিক বা প্রচলিত কথা মাত্র। লোক-কাব্যও সব দেশেই মুখে মুখে চলে, এদেশেও তা লেখা হয় নি। কিন্তু ছন্দে বাঁধা কবিতার রূপ কতকটা স্থির থাকে। মুখে চলা গদ্যের রূপে সে স্থিরতা আসে না।

একটা কথা, ইংরেজি ঊনবিংশ শতকের পূর্বে লিখিত বাঙলা কবিতাও পড়ার জিনিস ছিল না, ছিল শোনার জিনিস। (বেতারের প্রসাদে সেই দিন নতুন ভাবে আসবে কি ?)। প্রাচীন ও মধ্য যুগের পুঁথিও সুর করে পড়া হত (chanted), আর অনেক সময়ে পদ হলে তা একেবারে তালে-মানে গাইবারও নির্দেশ থাকত। সুর করে কবিতা পড়ার দিন আমাদের দেশে শেষ করে দেন মাইকেল অমিত্রাক্ষর লিখে। লোক-কাব্যের বেলায় তা ঘটেনি। কাজেই লোক-কাব্যের প্রধান এক অংশ লোক গীতি। অনেক পদকে কবিতা না বলে গীতও বলা যায়।

কিন্তু কবিতা যখন সুর করে পড়া হত তখনো কবিতার প্রায়ই একজন হতেন প্রণেতা। তিনি লিখতেন, নিজে বা অন্য কেউ হতেন কথক বা গায়ক, আর বহু লোক হতেন শ্রোতা। লিখিত সাহিত্য লোক-বিশেষের লেখা। কিন্তু লোক-কাব্য কি সেরূপ লোক-বিশেষের রচনা ? না। একা-একা যে কেউ সুর করে কবিতা না পড়তেন তা নয়, একা-একা হয়ত গানও গাইতেন এবং বিশিষ্ট একজনে গীতও রচনা করতেন। কিন্তু যে-ই রচনা করুক, দশজনকে নিয়েই কাব্য-সঙ্গীত উপভোগ করা ছিল পূর্বকালের নিয়ম।

কবিতা ও ব্যক্তিসত্তা

দশ জনকে ছেড়ে কবিতা পড়া ও কবিতা লেখার দিন আসে সভ্যতা যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে পৌঁছায়, তখন। আধুনিক যুগ তাই কাব্যে গানে প্রধানত হয়ে উঠেছে খণ্ড কবিতার যুগ, ব্যক্তি-বাসনা-প্রকাশের যুগ। এপর্বে এসে কাব্য সাহিত্য ক্রমশই ব্যক্তি-সত্তার কথা হয়ে ওঠে। কিন্তু তাই বলে কি দশজনের সঙ্গে কাব্য তখনো তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে পারে ? তা নয়। আসলে আধুনিক যুগের কবিসত্তাও সেই আধুনিক কালের দশ জনের অভিজ্ঞতা-চেতনারই প্রতিনিধি-স্থানীয়। এ কালের কবি বা সাহিত্যিকও সেই সমাজ-মনেরই অন্তর্দ্রষ্টা আর অন্তর্বাণীর বাহক। এ সত্য না মানলে আধুনিক ব্যক্তি-চেতনা ক্রমেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। মোট কথাটা তাই এই—সাহিত্য বা কাব্য সমাজেরই সৃষ্টিশক্তির একটা বিশেষ উদ্বোধন। ব্যক্তিসত্তার বিকাশের যুগে না পৌঁছান পর্যন্ত কাব্যের সঙ্গে সমাজের এই নাড়ীর যোগটা যথেষ্ট প্রত্যক্ষ থাকে। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের যুগে পৌঁছলে সে যোগটা প্রচ্ছন্ন হয়। তা বলে সে যোগ ছিন্ন করা চলে না ; তা ছিন্ন হলে সাহিত্যেরই

মরণ হয়। বরং ব্যক্তিসত্তা সমাজ-সত্তার সঙ্গে আপনার যোগ-বিয়োগের এই অচ্ছেদ্য বন্ধন যত উপলব্ধি করে ততই আপনার সত্তার বৈশিষ্ট্য ও সমগ্রতার সন্ধান লাভ করে। এই সচেতনতা ও সমাহিতিতেই সত্তার মহত্তর বিকাশ হয়, আর তাতেই সাহিত্যও আবার নতুন করে সামাজিক জন্মাধিকার লাভ করে, সমাজের দশ-জনের সৃষ্টি-সম্পদ হয়ে ওঠে। সভ্যতার এই নতুন স্তরটা আসবে পরে socialist দেশে, যেখানে সাহিত্যিক তাঁর Socialist Personality-তে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারবে। তার নাম 'সোবিয়েত' দিই, 'জনায়ত্ত গণতন্ত্র' দিই, কিংবা 'সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ণ' দিই তাতে যায় আসে না। সে আর্থিক গণতন্ত্রে তা হলে সাহিত্য আর ব্যক্তির একান্ত ভাষণ থাকবে না; সাহিত্য আবার নতুন করে হবে দশ জনার জিনিস—জনসাধারণের জিনিস, অথচ সচেতন ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি।

ভাবী সাহিত্য ও ভাবী সমাজ

প্রশ্ন হবে,—জনসাধারণের জিনিস হলেই কি তা 'লোক-সাহিত্য' হবে? যে সাহিত্য জনগণের জন্য লেখা আর যা জনগণের জীবন-কথা, তা'ই কি লোক-সাহিত্য?—নিশ্চয়ই ভাবী সাহিত্য হবে **জনগণের কথা, কিন্তু** personalityর **প্রকাশ**। যাঁরা কারখানা থেকে, ক্ষেত থেকে বেরিয়ে আসবেন কারখানার গান, ক্ষেতের গান মুখে নিয়ে, তাঁরাই আজকের নবজাত সাহিত্যকে তার আকাঙ্ক্ষিত এই পরিণতি দান করবেন। কিন্তু সেখানেই কি শেষ হবে তার বিকাশ? তাও নয়। কারণ, ততক্ষণে কারখানার আর ক্ষেতের মানুষ প্রত্যেকে শিল্পচেতনায় অনেক গুণ এগিয়ে যাবে। তখন দেখব—তারা যেমন কল চালায় তেমনি চালায় কলম; আবার যেমন চালায় কলম তেমনি চালায় কল—এ পরিণতিও সম্ভব হতে পারে। এক কথায়, সভ্যতার সেই নতুন স্তরে শ্রম-বিভাগের সেই বিভেদ অনেকটা আবার মুছে যাবে। 'কবি', 'মিস্ত্রী', 'সৈনিক', 'কৃষক' বলতে আর এমন স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বৃত্তির গণ্ডিতে বাঁধা বিভিন্ন ধরণের মানুষ বোঝাবে না। অনেক ডাক্তার যদি আজ কবিতা লেখেন অনেক মিস্ত্রীও ভবিষ্যতে লিখবেন কবিতা; আর অনেক 'কবিও' হবেন তখন 'মিস্ত্রী'। অবশ্য এ হল ভবিষ্যতের কথা,—হয়ত ভবিষ্যতের স্বপ্ন; সে যুগটা এখনো অনেক দূরে। কিন্তু কথা হল—সে যুগে সাহিত্য আবার পুরোপুরি 'লোক-সাহিত্য' হবে কিনা। তাই বোঝা দরকার আমরা লোক সাহিত্য বলতে বুঝি কি? 'শিষ্ট সাহিত্যে'র সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়?

লোক-সাহিত্য ও শাসক-সাহিত্য

'লোক সাহিত্য' বলতে আমরা বুঝি folk literature, অর্থাৎ **যা লোকসাধারণের জন্য রচিত, আর মূলত যার জন্ম উৎস লৌকিক জীবন—কার্যত যা অলিখিত এবং প্রায়ই যা নিরক্ষর মানুষের সৃষ্টি।***

শাসক সাহিত্যের কথা বুঝতে হলে কয়েকটা মৌলিক কথাও বোঝা প্রয়োজন।—সেই আদিম সমাজ ভেঙে শ্রম-বিভাগ প্রচলিত হবার পর থেকে সমাজ শ্রেণীদ্বন্দ্বের পথেই এগিয়ে চলেছে। তখন থেকে সমাজ শাসিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় শাসকদের দ্বারা, লোকসাধারণ এই সেদিন পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবজ্ঞাত ছিল। আর সে সাহিত্যই এ বিরাটকাল জুড়ে 'সাহিত্য' আখ্যা পেয়েছে যে-সাহিত্য শাসক-শ্রেণীর মনোরঞ্জন করেছে। তা হলে এই শাসকশ্রেণীর সাহিত্যকে অন্তত 'লোক-সাহিত্য' বলা চলে না। তাকে 'শিষ্ট সাহিত্য' বলতে পারি।

---

* এ আলোচনার পরে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে।

এ কথাও কিন্তু সত্য, শাসকশ্রেণী মোটের ওপর সমাজবিকাশের পুরোধা রূপেই শাসকশ্রেণী হয়ে ওঠে; এবং সমাজবিকাশের পরিপন্থী হয়ে গেলে কোনো শাসকশ্রেণী বেশি দিন টিকতে পারে না। সামন্ত শাসকেরা তাই হেরে গেলেন ধনিক শাসকদের কাছে। ধনিকদের দিন ফুরিয়ে শ্রমিক-কৃষকরাজের দিন এখন আসছে। কিন্তু উচ্চদের এই অবক্ষয়ের ও যুগ-সন্ধির সময়কার শাসক-সাহিত্যকে বাদ দিলে দেখব—সমাজের সুস্থ অবস্থায় সাহিত্য শাসক-আয়ত্ত হলেও সৃষ্টির সাহিত্য, যেমন আধুনিক অবক্ষয়ের সাহিত্য হচ্ছে অপসৃষ্টির সাহিত্য। সাধারণভাবে যখনকার যা সৃষ্টি-প্রেরণা, সাধারণত তা সে যুগের শিল্পসৃষ্টিতে ও সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। সর্বযুগেই সৃষ্টির মূলশক্তি হল সমাজের জনশক্তি—যদিও প্রকাশ্যে সৃষ্টির উদ্বোধক ও পরিচালক বিভিন্ন যুগের শাসক-শ্রেণী। অতএব, সাধারণভাবে উৎকৃষ্ট শাসকসাহিত্যেও এই সমাজ-সত্যের ছাপ থাকবে;—হয়ত তা থাকবে পরোক্ষ, নানাভাবে লোকজীবনের সঙ্গে 'শিষ্ট-সাহিত্যের' এই সম্পর্ক স্বীকৃত থাকে। সেকালের অনেক সাহিত্যই লেখা হত লোক-শিক্ষার উদ্দেশ্যে; তা বলে লোক-স্বার্থে নয়, বরং শাসক স্বার্থে। তাই সেই লোক-শিক্ষাও ছিল শাসকানুমোদিত লোক শিক্ষা। তথাপি, যুগের উৎকৃষ্ট বাণী বলে লোক-সমাজ তার সে সাহিত্যের বাণী গ্রহণও করত—যেমন, তারা করেছে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির কথা। অতএব এই রামায়ণ মহাভারতের মত Epic বা মহাকাব্যগুলো, জাতক ও হিতোপদেশের আখ্যানসমূহ শুধু শাসকসাহিত্য নয়, অনেকাংশে সমাজ-সাহিত্যও। অন্তত সেই-সেই যুগের তা সভ্যতার পাথেয়—'যুগসাহিত্য'।

আরও একটা কথা আছে। আসলে এই রামায়ণ, মহাভারতের শত শত গল্প আখ্যায়িকা গ্রন্থকাররা গ্রথিত করবার পূর্ব পর্যন্ত লোক-সমাজের জিনিস ছিল। লোকসাধারণ তা রচনা না করুক, তার সৃষ্টিতে একটা বৃহৎ অংশ গ্রহণ করেছে। অবশ্য তখনো সে সব লোক-কাহিনী অলিখিত ছিল। লোকের মুখে মুখে সহজেই তা ভেঙে ভেঙে বরাবর গড়ে উঠেছে। যখন লিখিত বা গ্রথিত হল তখন সেই লোক-রচনা মার্জিতও হয়েছে। এবং একবার লেখা হয়ে গেলে তার ভাঙা-গড়ারও আর অবাধ উপায় থাকে নি। এ কথা ঠিক, এই সব কাব্যের বিষয় বাহ্যত লোক-জীবন নয়,—রাজা-রাজড়া, রথী-মহারথীর কথা, শাসক-সমাজের তা উৎকৃষ্ট সাহিত্য। কিন্তু এরূপ লোক-কথার উপরই অনেক প্রাচীন 'শিষ্ট' সাহিত্য গড়া। শ্রেষ্ঠ শাসক-সাহিত্যের অতলেও লোক মানসের একটা পরিচয় প্রচ্ছন্ন আছে; আর আছে সমগ্রভাবে সমাজের সমসাময়িক সৃষ্টিশক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

শাসক-সাহিত্য এই কারণেই 'সাহিত্য' নামের অধিকারী। সাধারণত লোক-সাহিত্যের তুলনায় শাসক-সাহিত্যের উৎকর্ষ তাই স্বতঃসিদ্ধ। কারণ, শাসক-সাহিত্য শুধু শিল্পগত রূপ-কলায় উন্নত নয়, তা সমাজের উন্নত রুচির ও উন্নত চিন্তার সাক্ষী; এবং উৎকৃষ্ট শাসক-সাহিত্য তার শ্রেণীগত ত্রুটিসত্ত্বেও সমসাময়িক সামাজিক সৃষ্টিশক্তির প্রধান প্রকাশ। তাই তাকে বলি 'শিষ্ট সাহিত্য'।

এ সব সমুদায় কথা সাধারণত লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে বলা চলবে না। তবে উৎকৃষ্ট লোক-সাহিত্য তার শত ত্রুটিসত্ত্বেও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য, তাও সত্য কথা। কিন্তু অনেক সময়েই জানি শতকরা ৯৫টি লোক-কবিতা বা লোক-গীতি সাহিত্য হিসাবে আসলে শুধু 'গ্রাম্যই' নয়, অচল। অবশ্য শতকরা ৯৫টি বর্তমান মাসিক পত্রের লেখাই কি (শাসক-সাহিত্য) খুব 'সচল'? প্রকৃতির নিয়মই এই—অনেক সে ছেঁটে ফেলে, গুটি কয়েক পায় তার ছাড়পত্র। তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে লোক-সাহিত্য সমাজের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের স্তরে প্রায়ই কম পেঁছে। এবং অন্য দিকে দেখেছি, যা উৎকৃষ্ট সাহিত্য তাকে সংকীর্ণ অর্থে শ্রেণীগত সাহিত্য বলাও যথার্থ নয়। তা আমাদের এ কালের সমাজআদর্শের তুলনায় হয়ত প্রতিক্রিয়াশীল; কিন্তু সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় হয়ত তা'ই ছিল অগ্রগামী; অন্তত তার ফলে সমাজ তখন এগিয়ে গিয়েছে। যে শাসক-সাহিত্য তা নয়, তা উৎকৃষ্ট সাহিত্যও নয়, সৃষ্টিও নয়; শুধুই সাহিত্যের সাময়িক নিদর্শন এবং অনেকাংশে অপসৃষ্টি।

কিন্তু 'শিষ্ট সাহিত্যে' আর 'লোক-সাহিত্যে' পার্থক্যটা কি দুস্তর? এ প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার করে দেওয়া হয় নি, কিন্তু দেওয়া দরকার। সে উত্তর এই ঃ—পার্থক্যটা মৌলিক। কারণ সমাজে শাসক ও শাসিতের পার্থক্য মৌলিক—যদিও শাসক তার অভ্যুত্থানের যুগে আসলে শাসিতেরই শক্তির

ধারক ও পরিচালক। তার অভ্যুত্থানের যুগের সাহিত্যও তাই বহুলাংশে লোক-জীবনের প্রতিলিপি, তার পরিপোষক; কিন্তু তা বলে তাও লোক-সাহিত্য নয়। কারণ, লোক-সাহিত্যের মত তা স্বাভাবিক বা 'অচেতন' সৃষ্টি নয়, তা ব্যক্তির সচেতন রচনা। অবশ্য সচেতন অর্থ কৃত্রিম নয়।

আরও একটা কথা আছে ঃ—সমাজ সম্পর্ক অত কাটা-ছাঁটা নয়; তা প্রায়ই জটিল। যেমন, ব্রিটেনও সামন্ত শাসক-গোষ্ঠীর ব্যাপার ও অনেক কিছুকে ধনিকতন্ত্রের আড়ালে জীয়েই রেখেছে। আমাদের দেশে বিশেষ করে শ্রেণীদ্বন্দ্ব সমাজে নানা আপোষ-রফার মধ্য দিয়েই এতকাল পর্যন্ত জটিলতর ও দুর্নিরীক্ষ্য পথে চলেছে। সেই আপোষ-রফারই ফলে মনসা, বনচণ্ডী প্রভৃতি অন্ত্যজ দেবতা উচ্চবর্ণের পূজিতা দেবী হয়েছেন, আর বেহুলা-লখিন্দর, কিংবা ব্যাধবীর কালকেতু (যাকে এখনকার ভাষায় বলা যায় সেকালের (People's hero), কিম্বা লাউসেন (Peoples ideal prince), আর শ্রীবৎস-চিন্তা প্রভৃতি লোক-কথার মানুষেরা ক্রমশ মঙ্গল-কাব্যের নায়ক হয়েছেন। অন্য দিকে বাঙলা রামায়ণে, বাঙলা কৃষ্ণযাত্রায়, কৃষ্ণকথার (Krishna cult-এর) রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে বাঙলার লোক-জীবনের কথা ও ধারণা। এসব কাব্যে, বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যে, বাঙলা লোক-সাহিত্যের লক্ষণ দেখা যেতে পারে—তা সমাজের আপামরসাধারণ শুনত, গাইত, কবিও যেন সব সময়ে 'সচেতন স্রষ্টা' নন। সে কাহিনী মূলত (যদিও কিছুটা সংশোধিত) লোক-কাহিনী। লেখকেরাও কেহ কেহ খুব গুণী মানী নয়। এমন কি, নানা অজ্ঞাত লোকের রচনা অজানাভাবে এসে তার মধ্যে মিশে গিয়েছে—যেমনটি ঘটে লোক-সাহিত্যে। লোকসাধারণ এ সব কাব্যকে নিজের বলে জানত বলেই তাকে পরিবর্তন করতেও দ্বিধা করে নি। বিশেষ একজনের লেখা হলেও তা দশজনেরই কথা—যদিও সচেতন লেখা।

'লৌকিক' প্রকৃতি

কিন্তু মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে লোক-কাব্যের এসব লক্ষণ থাকলেও মঙ্গলকাব্যকে ঠিক লোক-কাব্য বলা চলবে না। কারণ, কথাটা বোঝা দরকার। লোক-কাব্যের প্রধান একটা লক্ষণ এই যে, তা লৌকিক জীবন ও কামনা কল্পনা নিয়ে রচিত হয়, তা অধ্যাত্ম-সাধনার বা ধর্ম প্রচারের কাব্য নয়। অবশ্য পুরানো দিনে লৌকিক কথাতে দেব-দেবী, রাক্ষস, পরী প্রভৃতি থাকত। কিন্তু লোক-কল্পনা তাদের উপর লৌকিক স্বভাবই আরোপ করত—দেবদেবীর অলৌকিক রূপের মধ্য থেকে ফুটে বেরুত লৌকিক চরিত্র। এই **লৌকিক বা ঐহিক গুণ লোক কাব্যের একটা প্রধান লক্ষণ**; secularity কমিয়ে তাতে যত religion-এর রঙ্ চড়ানো হয় ততই লোক-কাব্য আর লোক-কাব্য থাকে না। আমাদের মঙ্গল-কাব্যে ধর্মের দোহাই বড় বেশি।

মঙ্গল-কাব্যে খানিকটা লোক-কাব্যের লৌকিক গুণ তথাপি টিকে আছে। তার বিশেষ কারণ বোঝা যায়। তা এই ঃ—ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সাহিত্য প্রধানত ছিল পল্লী-সভ্যতার সাহিত্য, পল্লীতে তার জন্ম। প্রাচীন ভারতে বারাণসী, উজ্জয়িনী প্রভৃতি পৌর সভ্যতার কেন্দ্রও ছিল, কিন্তু আমাদের সমাজের গঠনটা ছিল প্রধানত পল্লী সমাজের (village community) গঠন। সেই আত্মনির্ভর পল্লী সমাজের জীবনযাত্রায় আমাদের শাসকশ্রেণী ও শাসিত শ্রেণী অনেকটা বাধ্য হয়েই পরস্পরের কাছাকাছি থাকত। পশ্চিম অঞ্চলের মত অন্তত বাঙলায় কোনো দরবারী বা আমীর ওমরাহের সভ্যতা, এমন কি, বড় 'শহুরে সভ্যতাও' গড়ে উঠতে পারে নি। পাল ও সেনদের রাজসভায় ও অষ্টাদশ শতকে নবাবী আমলে তার কিছু কিছু ছায়াপাত হয়েছিল মাত্র। বাঙলা কাব্যের পক্ষে সে শতাব্দী একটা সন্ধিক্ষণ। তার পূর্বে গৌড়ের রাজসভায় যে বাঙলা সাহিত্য রচিত হয়েছে—সে বাঙলা সাহিত্য অতি সামান্য। তা বাদ দিলে অধিকাংশ বাঙলা সাহিত্যই পল্লী সমাজে রচিত, তার পরিমার্জনা দরবারী নয়, সংস্কৃত ঐতিহ্যের। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা সেই পল্লীসমাজেরই অঙ্গ। তাদের সঙ্গে লোক-সমাজের পরিচয়টা শুধু স্বার্থের সংঘাতের নয়, 'আপস-রফার'। এই

বোধেব যে, তারা একই পরিবারের মানুষ, কেউ ছোট কেউ বড়। এই যে শ্রেণী-বৈষম্য ও বিপ্লবহীন স্বার্থ-মীমাংসা এটা যেমন আমাদের সমাজের একটা বড় লক্ষণ, তেমনি এই গ্রাম্য লক্ষণাক্রান্ত শিষ্ট-সাহিত্যেও তাব একটা বড় লক্ষণ। তাই এ সাহিত্যে সত্যকাবের শ্রেণী সংঘর্ষ অনেক খুঁজে খুঁজে পেতে হয়, আবাব এ সমাজের উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যেও লোক-কাব্যের কোনো কোনো গুণ না খুঁজেই সহজে পাওয়া যায়। মঙ্গল কাব্যের মধ্যে কবিকঙ্কণই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তার চণ্ডীকাব্য মোটেই লোক-কাব্য নয়। তা কাব্য-সচেতন কবিব সচেতন লেখা; লোক-কাব্যের মত 'অচেতন' (ও অনেক ক্ষেত্রেই অনামা) কবিব স্বাভাবিক ও অলিখিত রচনা নয়। এরূপ কাবণেই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকেব কবি, যাত্রা, কীর্তনমাত্রকে আব যথার্থ লোক-কাব্য বলা চলবে না—কারণ, অষ্টাদশ শতক থেকে তা বাঙলা সমাজেব ভদ্র শ্রেণীবই চাহিদায় প্রধানত সচেতন ভাবে রচিত হতে লাগল।

লোক-সাহিত্যের জন্মনক্ষত্র

লোক-সাহিত্য বলতে আমবা তা হলে প্রধানত বুঝি সেই সাহিত্য যা লোক সমাজের কথা—তার লৌকিক জীবনের, ঐহিক সুখ দুঃখের, কামনা-বাসনাব, কথা; এবং লোক সমাজেব জন্যই রচিত; আব একজনাবই রচিত হোক বা দশজনাবই রচিত হোক, যা লোক-সমাজের মুখে মুখেই ভেঙে গড়ে প্রচলিত—মূলত যা লিখিত হয় নি। এ হচ্ছে তেমন রচনা যাতে রচয়িতা সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন নয়, নিজেব ব্যক্তি-কীর্তির কথা ভেবেও রচনা করে নি। অতএব, বুঝতে পারি এরূপ সাহিত্য প্রধানত রচিত হয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যেব যুগেব পূর্বে, অর্থাৎ মধ্যযুগে ও প্রাচীন যুগে। এবং রচিত হয় সমষ্টি-বদ্ধ সমাজে; বিশেষ করে পল্লীসমাজের পরিবেশে যেখানে ব্যষ্টিজীবন তত বিশিষ্ট হয় নি। এরূপ পরিবেশে, বিশেষ করে মধ্যযুগে, অবশ্য নিছক ঐহিকতা কম পাওয়া যায়। কথায় গীতে লৌকিক ও অলৌকিক, ঐহিক ও পারত্রিক মিশ্রিত হয়ে থাকে। অলৌকিক ভাব আড়ালেও প্রচ্ছন্ন থাকে সহজ সুস্থ লোক-জীবনেব কামনা-বাসনাব ছাপ। অতএব সেখানে তা আধ্যাত্মিকতায় বা পারত্রিক ভাবনায় আচ্ছন্ন নয়,—সমাজেব সামগ্রিক বোধের সৃষ্টি, তেমন লোক সমাজেব কথাকে, বাউলদের সে রূপ গান-গীতিকেও আমবা গৌণভাবে লোকসাহিত্যের পর্যায়ে ধরতে পারি। তাব রূপটি সেখানে শাস্ত্রগত নয়, লৌকিক না হয়েও লোক চিত্তেব তা আপনাব।

বাঙলা লোক-সাহিত্যেব নিদর্শন প্রবাদ-প্রবচনের মত বাক্য-মাত্রও হতে পারে, উপকথা পুরাণ-কাহিনীর মত আখ্যান-ধর্মী গদ্য কথাও হতে পারে, 'গীতিকা' বা ব্যালাড-এব মত পদ্য-কাহিনীও হতে পারে, আবাব গীতিকা ছাড়াও ছড়া, ধাঁধাব মত পদ্যও হতে পারে। তা ছাড়া 'গীত' বা গান যে লোক সাহিত্যেব একটা প্রধান অংশ তা তো জানা কথা। বাঙলা-লোক-সাহিত্যেব সংগ্রহ এখন পর্যন্ত সামান্যই হয়েছে। তাব অজস্রতা ও অকৃত্রিমতা সর্বগ্রাহ্য, তাব কাব্য-গুণ অবিসংবাদিত।

লোক সাহিত্যের মূল্য

লোক-সাহিত্যের এসব নিদর্শনেবও মূল্য প্রধানত দু' কারণে। প্রথমত, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বা Cultural Anthropology'র দিক থেকে তা মূল্যবান্। দ্বিতীয়ত, জাতীয় রস-চেতনাব বিশিষ্ট রূপ ও ভঙ্গিব, স্বাভাবিক প্রকাশ-পদ্ধতির পরিচায়ক বলে তার দাবি। আমবা অবশ্য এই শেষ দাবিব কথা মনে রেখেই লোক-সাহিত্যের আলোচনা করছি। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লোক-সাহিত্যের বিচারও কম ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে না। যেমন, ধরা যাক এই ছড়াটি—

আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে।
ঢাল মিরগেল ঘাগর বাজে॥ ইত্যাদি

আমরা সবাই জানি স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম এটিকে ডোম জাতীয় যোদ্ধাদের রণসজ্জার বর্ণনা বলে ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ইতিহাসের একটি অনালোকিত পর্ব ও বিস্মৃত কাহিনী উন্মোচিত হয়ে পড়ে। এরূপই ঘুম-পাড়ানি ছড়া-গানের 'বর্গী এল দেশে'ও দু'শ বৎসর আগেকার একটা বিভীষিকার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু ছড়াতে সাধারণত অর্থ-সঙ্গতি থাকে না, সুর ও চিত্রই প্রধান ; এবং তার মূল্য বিশেষ করে ছড়ার ছন্দের জন্যও। নৃবিজ্ঞানের চোখে তাই ব্রতের ছড়ার, সাপের ছড়ার মূল্য আরও বেশি। আবার, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' এই ছড়ার দ্বিতীয় চরণে 'শিবঠাকুরের' উল্লেখে 'শিবু' বা শিবা বা শেয়ালের বিয়ের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়ে নৃবৈজ্ঞানিক পুলকিত হন। কারণ, বাঙলার লোক-মানসে শেয়াল শুধু পণ্ডিত নয়, 'শেয়ালের বিয়েও' একটা বহুসিদ্ধ বিষয় ; এবং তার মূল হয়ত সাঁওতাল কল্পনায়। 'তাই তাই তাই মামা বাড়ি যাই'—এ ছড়ার মধ্যেও নৃবৈজ্ঞানিক প্রাচীন বাঙালী জীবনে মাতৃ প্রাধান্য দেখবেন। 'মামাবাড়ি' এ জন্যই সমস্ত বাঙালী চিত্তে এখনো পরম স্বচ্ছন্দ স্থান,—এবং ঠিক এই কারণে 'মামী আসে ঠেঙ্গা নিয়ে।' অবশ্য, নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত গীতি, যেমন, গাজন, ভাঁজো, ভাদু, টুসু গান, কিম্বা বিশেষ এক-একটি জাতি বা মণ্ডলীর বিশেষ গান, যেমন, পটুয়া গান, মুণ্ডাজাতীয়দের ঝুমুর, করম্ প্রভৃতি গান ও উৎসব, এবং বাঙলার মেয়েদের ব্রতকথার, ছড়া, কথা, গান ; ও প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, ধাঁধার ও 'প্রস্তাবের' মূল খুঁজতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা দেখছেন—পশ্চিম বাঙলার এসব জিনিস মূলত সাঁওতাল ওরাওঁদের সম্পত্তি, আর পূর্ব বাঙলার এসব জিনিসে আছে বড়ো, কোচ, হাজং গারো প্রভৃতি মঙ্গোল বংশীয়দের দান। অর্থাৎ বাঙালীর লোক জীবন ও লোক মানস সংস্কৃত-ঐতিহ্যে বা 'আর্য-সদাচারে' ধোয়া নয়। তা মূলত অনার্যদের কল্পনায় ও কথায় পরিপুষ্ট। বাঙালী সংস্কৃতির নৃবিজ্ঞান স্বীকৃত এই মূলরূপ বিস্মৃত হ'লে বাঙলা সাহিত্যেরও চলে না।

কিন্তু সাহিত্য-মূল্যের দিক থেকে লোক-কাব্যের আরও একটু বিচার করতে হয়। যা একদিন স্বাভাবিক ভাবে চলেছে তা অবস্থার পরিবর্তনে—বিশেষ করে মধ্যযুগের শেষে ব্যক্তি চেতনার উদ্বোধনে —আর কি করে স্বাভাবিক থাকবে ? অনেক ছড়া, কথা, গীতের উদ্ভাবনা হয়েছে এমন সব অবস্থায় যা চিরদিন থাকবে না। অবশ্য কতকগুলো এমন জিনিস আছে যা চিরদিন থাকবে। যেমন, 'ছেলে ভুলানো ছড়া'—রবীন্দ্রনাথ যার কথা অত বলেছেন। 'আয় চাঁদ আয়,' কিংবা 'ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি', 'পুঁটু আমার কেঁদেছে কত মুক্তো পড়েছে', ইত্যাদি। কিম্বা প্রেম গীতি। যেমন, ভাটিয়ালী গান, কিংবা 'ভাওয়াইয়ার' (উত্তর বঙ্গের) বিরহ গীতি,—

> 'পর্থম যৌবন কালে না হৈল মোর বিয়া,
> আর কতকাল রহিমু ঘরে একাকিনী হয়া,
> হে বিধি নিদয়া ॥' ইত্যাদি।

অথবা, 'মৈমনসিংহ গীতিকার' সেই প্রশ্নোত্তরে রচিত গীতি—

> 'কোথায় পাইবাম কলসী, কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ী।
> তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুব্যা মরি ॥'

কিংবা রাধাকৃষ্ণের নাম বা ইঙ্গিতে জড়ানো অজস্র মানবীয় প্রেম সঙ্গীত। কিংবা প্রকৃতিবিষয়ক গীতি। এমন কি ধর্মবিষয়ক গীতি ও জারি গান, বাউল গান প্রভৃতিও জীবন্ত জিনিস। ধর্মপ্রধান গীতিও একভাবে না একভাবে টিকতে পারে। সাধারণত অধিকাংশ লোক-সাহিত্যই ব্রত, পার্বন প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। অনেকখানে সে সব ব্রত আজ লুপ্ত হতে বসেছে। অনেক-খানে সে সব ব্রতের অত্যন্ত বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ অর্থহীন। যেমন,

> 'অশথ তলায় বসত করি।
> সতীন কেটে আলতা পরি।'

অন্ততঃ যতই পতিপুত্র ধনজন কামনা করুন, অনেক মেয়ের নিকট হিন্দু অ্যাক্টের পরে এসব অর্থহীন হবে। যাদের কাছে তুষ-তুষলি, ভাদু বা ওরূপ মাঘমণ্ডল প্রভৃতি ব্রতের মূল্য নেই, তারা এসব আর ধরে রাখবেন কেন ? তেমনি অনেক জিনিস আছে যা একান্ত 'আঞ্চলিক,'—তখন গ্রাম্য-

জীবন অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং অঞ্চল নিয়েই সমাজ গঠিত হত। কিন্তু সেই 'আঞ্চলিক' চরিত্র আর নেই। আঞ্চলিক গীতিরও পরিবর্তন হচ্ছে—যেমন মালদহের গম্ভীরা, মানভূমের তুষু 'আধুনিক' হচ্ছে। কিন্তু পরিবর্তনে সে রসাবেদন টিকতে চায় না। 'মৈমনসিংহ গীতিকার' কথা তুলে লাভ নেই, তেমন সাহিত্য যে কোনো কালের সাহিত্যের গৌরব। এরূপই রূপকথা উপকথার রাজ্যও ব্রতের রাজ্যের মত। কিন্তু সেখানে কল্পনাকে আমরা মেনে নিই, তা রোমান্সের দেশ। রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাক্ষস, দৈত্য কিম্বা ব্রাহ্মণ বা চাষা, চতুর চোর থেকে পশুপক্ষী, বিশেষ করে শেয়াল বাঘ, টুনটুনি—এ সবের মধ্য দিয়ে লোকমন তার কামনা পূরণ করছে, বীরকে জয়ী করছে, অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, মন্দভাগ্যকে পুরস্কৃত করেছে, সুবুদ্ধিকে কৃতিত্ব দিয়েছে, ক্ষুদ্র টুনটুনিকে দর্পিত রাজার উপর জয়ী করেছে, ঘুটেকুড়োনির ছেলেকে করেছে ভাগ্যবান। এ হল অসম্ভবের রাজ্য, অবাস্তবের রাজ্য কিন্তু তাতে কৃত্রিম কিছু নেই, সব সবল স্বাভাবিক—আমাদের 'শিষ্ট সাহিত্যের' মত সচেতন প্রয়াস তা নয়। আর রস সেই স্বাভাবিকতার সঙ্গে এমন ভাবে মিশে জমে আছে যে, বোঝাই যায় না—লোক-সাহিত্যের আসল মাধুর্য কোথায়? সে কি রসের জন্য, না অকৃত্রিমতার জন্য?

আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের অসঙ্গতি

বাঙলা দেশের ইংরেজ আমলের 'শিষ্টসাহিত্যের' দিকে তাকালে দেখব লোক সাহিত্যের তুলনায় তা বড় কৃত্রিম। তার মূল দেশের মাটির মধ্যে ভালো করে প্রোথিত হয় নি; এবং মাটির মানুষের কথাও সে সাহিত্যে স্পষ্ট হয় নি। অবশ্য তার একটা কারণ, সে সাহিত্য সেই বাঙালী হিন্দু ভদ্র-লোকের সৃষ্টি যাদের বলা যায় 'কলোনির কেরানি'; জমিদারী প্রথার মধ্যস্বত্বভোগী, কিম্বা সরকারী চাকুরে, বা কেরানিরই সগোত্র উকিল, ডাক্তার, মাষ্টার প্রভৃতি বৃত্তিজীবী।

'আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের' প্রস্তুতি ইং ১৮০০ এর থেকে আরম্ভ হয়, ইং ১৮৫৯-৬০ এ তার উদ্বোধন, আর রবীন্দ্র সাহিত্যে তার পরিণতি দেখি। 'আধুনিক বাঙলা সংস্কৃতি' উনবিংশ শতকে সাহিত্যে শিক্ষাদীক্ষায়, ঐতিহাসিক গবেষণায়, বিংশ শতকের নব্যচিত্রকলায়, নৃত্য-নাট্য ও সঙ্গীত কলায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা গবেষণায়, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট চেতনায়, জন-সেবায় ও মুক্তি-সাধনায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্কৃতিও সেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদেরই সৃষ্টি এবং মোটের উপর তা জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রধান বাহন। সে হিসাবে এর জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বলে পরিচিত হবার দাবি মিথ্যা নয়। তা সত্ত্বেও যা আমাদের ভুলবার উপায় নেই তা এই যে, এ ভদ্রলোক শ্রেণী আসলে 'কলোনির কেরানি।' তাঁরা যতটা স্বাধীনতা চাইলেন ততটা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করলেন না। যতটা রাজনৈতিক অধিকার চাইলেন ততটা গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার করলেন না। যতটা কাব্যে দর্শনে রসানুভূতির ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির চর্চা করলেন ততটা বিজ্ঞানে বা বাস্তব কর্মে সমাজ-জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন না। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে তাই সাধারণ মানুষ বরাবর নেপথ্যে থেকে গিয়েছে—জাতীয় সাহিত্য হলেও তা গণতান্ত্রিক জীবনের সাহিত্য হয় নি।

এর একটা কারণ—আধুনিক সভ্যতার দ্বারা ভদ্রলোকেরা উদ্বুদ্ধ হলেন প্রধানত ইংরেজি শিক্ষার মারফতে; কিন্তু তাঁরা সে শিক্ষার ফল অশিক্ষিত জনগণকে বিতরণ করতে পারেন নি। অশিক্ষিতরাও তাই জীবন-যাত্রায় ও জীবন-দৃষ্টিতে পুরানো মরণোন্মুখ আধা-সামন্ত জগতেই আবদ্ধ রইল। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দু'টো যেন স্বতন্ত্র জাতি হয়ে পড়ল। দোষটা এ নয় যে, শিক্ষিতরা শিক্ষা পেল এবং নতুন জীবনাদর্শের বলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি রচনা করতে গেল। দোষটা এই যে, অশিক্ষিতরা শিক্ষা পেল না, আধুনিক জীবন-দর্শনের সঙ্গে তাদের পরিচয় করানো হল না, এবং আধুনিক বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমাজের এই বৃহত্তম অংশকে পিছনে ফেলেই এগিয়ে যেতে চাইল। ফলে, মাটির সঙ্গে এ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের যোগটা ক্ষীণ হয়ে আছে। না পেরেছে ইংরেজি-

অভ্যাসের বসে বাঙলার মধ্যযুগের শিষ্ট সাহিত্যের ঐতিহ্যকে নবায়িত করতে, না পেরেছে বাঙলার লোক-সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে সম্ভব মত আপনার প্রেরণা গ্রহণ করতে। আধুনিক বাঙলা সংস্কৃতি ও সাহিত্য তা করতে পারলে আরও প্রাণবান্ ও আরও দৃঢ়মূল হতে পারত। অন্তত, যদি 'কলোনির কেরানি'-দৌর্বল্য কাটিয়ে তা গণতান্ত্রিক চেতনাকে পরিপুষ্ট করতে পারত তা হলে সেই সূত্রেই আধুনিক বাঙলা সাহিত্য এগিয়ে যেত অশিক্ষিতের কাছে, হিন্দু মুসলমান চাষী ও দরিদ্র জনতার নিকটে। তা হলে উনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের প্রাবল্য দেখা দিত না। এবং বিংশ শতকে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ও মুসলমান মধ্যবিত্তের বিরোধ, বাবু ও মিঞার চাকরির কড়াকড়ি, জাতীয় হাবিকিরিতে পরিণত হবার বিপক্ষে আর একটি বাধা জুটত—বাঙালীর জাতীয় সাহিত্য ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য।

গণ-সাহিত্যের পথ

এখন প্রশ্ন হবে—বাঙলা সাহিত্য সেই হারানো সুযোগ ফিরে না পাক, কি করে তার ভবিষ্যৎকে সেই ক্ষতিপূরণের কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক জীবনের সাহিত্য গড়া যেতে পারে। তার দুয়েকটি প্রধান দিক নির্ণয় করা যেতে পারে।

প্রথমত, বাঙলার নিজ ঐতিহ্যকে আরও গভীরভাবে চিনে তা নবায়িত করা প্রয়োজন। তার অর্থ মধ্যযুগের পদ ও পাঁচালীর পুনরাবৃত্তি নয়, কিংবা উনিশ শতকের নবার্জিত ঐতিহ্যের অস্বীকৃতিও নয়। এ ঐতিহ্য হচ্ছে বাঙলার লোক মনের সৃষ্টি, অর্থাৎ লোক-সাহিত্যের ভাণ্ডার। কিন্তু লোক-সাহিত্যের বাহ্য রূপ বা কথার খোলস নিয়ে টানাটানি করলেই তা ভাবী সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠবে, এমন নয়। এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, লোক-সাহিত্যও সেই বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি যাতে ব্যক্তি সত্তার বিশিষ্ট স্বাক্ষর অনাবশ্যক; লোক-সাহিত্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ববর্তী যুগের সমাজ-মনের ভাষণ; তা গড়ে গড়ে ভেঙে ভেঙে ওঠে, আর প্রায়ই তা মুখে থেকে মুখে বদলে বদলে চলে আসে। এ 'প্রোসেস্' অনেকাংশেই অচেতন ও সমষ্টিবদ্ধ সৃষ্টির প্রোসেস্। এ প্রোসেস্ ও এ পরিবেশ অর্থাৎ মধ্যযুগ বা প্রাচীন যুগ ফিরে আসবে না—এবং আসা আমরা চাই-ও না। সে হিসাবে লোক সাহিত্যের কাল গিয়েছে—যেমন শিষ্ট সাহিত্যেও গিয়েছে মহাকাব্যের যুগ, পদ ও পাঁচালীর যুগ। তবু যেমন শিষ্ট কাব্যে এসেছে পদের স্থলে খণ্ড কবিতা, পাঁচালীর স্থলে গদ্যে পদ্যে কথা কাব্য, তেমনি লোক-সাহিত্যের সেই রূপকথা, উপকথা, উপাখ্যান, কিংবা ছড়া, কলিকা, গীতিকাব্যও নতুন আকারে বেঁচে উঠতে পারে—রোমান্সে, ফ্যাণ্টাসিতে, কবিতায়, ছড়ায়। নতুন ছড়া আমরা এখনো লিখি। 'কঙ্কাবতী' 'সাত ভাই চম্পা,' 'কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল,' আর চিরদিনের 'মন পবনের নাও' প্রভৃতি বস্তু এ কালের পরিশীলিত কবিদের কাছেও রসলোকের চাবিকাঠি জোগায়। কিন্তু বোঝা উচিত—এদিকে লোক-সঙ্গীত ও লোক শিল্প যতটা সহজে নতুন কালের বাহন হতে পারে লোক-সাহিত্য তা হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, কি ভাবে কাব্যের কোন্ দুয়ার খুলতে লোক-সাহিত্যের কোন্ চাবিটি প্রয়োগ করা যাবে—তা নিতান্তই কবি প্রতিভার ব্যাপার, অন্যের তা সাধ্য নয়। লোক সাহিত্যের পুনরাবৃত্তি না করে পুনঃসৃষ্টিও দুঃসাধ্য তপস্যা, 'বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে' তা বৎসরের পর বৎসর বুঝতে পারি।

তৃতীয়ত, ভুললে চলবে না—বাঙলা সাহিত্যের কাজটা শুধু ঐতিহ্য উদ্ধার নয়, নতুন জীবন-দর্শনকে নিজস্ব পদ্ধতিতে রূপায়ণ। তাই আধুনিক সকল সাহিত্যের উপাদানই সম্ভব মত গ্রহণ করতে বাধা নেই। শেক্‌সপীয়র গ্যয়েটে থেকে গ্রীক-পুরাণ ও ভারতীয় পুরাণ কোনো কিছুই অপাংক্তেয় করা চলে না। তবে আমাদের মাটিতে কোন্‌টি কি ভাবে কি মাত্রায় আসবে তা প্রতিভাবান্ স্রষ্টাই জানেন,—এবং তা নির্ভর করবে অনেকাংশে জনচিত্তের গ্রহণ শক্তির উপরে আর আমাদের ভাষা

ও সাহিত্যের স্থিতিস্থাপকতার উপরে। কিন্তু আসল কাজ এরূপ দেশীয় উর্বশী বা গ্রীক আর্টেমিসের প্রদর্শনী স্থাপন নয়। আসল কাজ জীবনের কথাকে বাণীরূপ দান, মানুষের মূর্তিকে গড়ে তোলা, জীবন-রসকে ভাষার পাত্রে ধরা। আসল কাজ সৃষ্টি।

শেষ কথা, দেখা যাচ্ছে যে জন্য আধুনিক যুগের বাঙলা সাহিত্য দৃঢ়মূল নয় তার কারণ যেমন ইংরেজির ভাষা-প্রাচীর, তেমনি বাঙলার (বা যে কোনো ভাষার) মধ্য দিয়ে আমাদের জন-সমাজকে আধুনিক জীবন-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত করবার অক্ষমতা। অর্থাৎ বাঙলা সাহিত্য বুর্জোয়া যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর্শে রচিত হতে লাগল, অথচ বাঙালী জন-সমাজ আধা-সামন্ত যুগের সমাজে ও ভাবনা-গণ্ডিতে আবদ্ধ রয়েছে। এ যুগের বাঙলা সাহিত্যের সুস্থ বিকাশের জন্য তাই প্রয়োজন জন সমাজকে এই নতুন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে নেওয়া। তার অর্থ—একদিকে প্রয়োজন সার্বজনীন আধুনিক শিক্ষা, অন্যদিকে কৃষিবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লব, গণতান্ত্রিক সমাজ-গঠন। নতুন জীবনবোধ তখন স্বাভাবিক হবে, সাহিত্যেও নতুন সৃষ্টি দেখা দেবে।

গোপাল হালদার ঃ জীবন ও সাধনা

বর্তমান প্রজন্মের কাছে গোপাল হালদার পিতামহ-প্রতিম শ্রদ্ধেয় একটি নাম। রেনেসাঁযুগে যুক্তিবাদী জীবন-জিজ্ঞাসা, মানবধর্মী বিদ্যাচর্চা আর সমাজমনস্ক কর্মসাধনার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তার ইতিবাচক দান আত্মস্থ করে, যে সব মনীষী সাম্যবাদের মানবতন্ত্রী-বিশ্ববাণীর সুর বাঙালীর সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনায় সঞ্চারিত করেছেন,—তাঁদের মধ্যে অন্যতম গোপাল হালদার স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান।

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ জন্ম, ১৯০২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি (বাং ১৩০৮, ২৮শে মাঘ), ঢাকা-বিক্রমপুরের বিদগাঁও-এর পৈত্রিক ভদ্রাসনে। হালদারেরা ভরদ্বাজ গোত্রের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। পিতা সীতাকান্ত হালদার নোয়াখালি শহরে আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। মা বিধুমুখী দেবী। গোপাল হালদার বিয়ে করেন আড়িয়াদহ নিবাসী ইন্দুভূষণ সিংহের বিদুষী কন্যা অরুণা দেবীকে।

শিক্ষা ঃ স্কুলের শিক্ষা নোয়াখালিতে, উচ্চ শিক্ষা কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে। ১৯২৪, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ এবং বি. এল. পাস করেন।

পেশা ও নেশা ; ১৯২৫-২৬, নোয়াখালি শহরে ওকালতি ; ১৯২৬, 'প্রবাসী'-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ওয়েলফেয়ারে' সহসম্পাদকের চাকরী ; ১৯২৬-২৮, আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা ; ১৯২৯-৩০, ফেণী কলেজে অধ্যাপনা ; ১৯৩০-৩২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগের রিসার্চ-এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ; ১৯৩৮-৪০, 'প্রবাসী' 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে কর্মগ্রহণ ; ১৯৪০ ৪২, 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'—ইংরেজী দৈনিকের সহ সম্পাদক। নানা বিষয়ে ঝোঁক, বিচিত্র তাঁর কর্মক্ষেত্র। তবে, আবাল্য স্বপ্ন দেশের স্বাধীনতা আর প্রাণের টান সাহিত্যে এবং দু-দিক ছুঁয়ে চলবার মত জীবিকা পথ হিসাবে গ্রহণ করেছেন-সাংবাদিকতা।

রাজনৈতিক জীবন ও কারাবাস ঃ স্কুল জীবনেই বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের কর্মী। কলেজ-জীবনে অ-সহযোগ আন্দোলনের পথে গণ-জাগরণের রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত কংগ্রেস কর্মী—তবে গান্ধীজীর 'অহিংসা ও চরকায়'—ধর্মীয় পবিত্রতা আরোপের তত্ত্বে বিশ্বাসী নন। বরং 'আত্মশক্তি'তে উদ্বুদ্ধ হ'য় 'স্বদেশীসমাজ' গঠনের রাবীন্দ্রিক পরিকল্পনায় আস্থাবান। ১৯২১—৪০, কংগ্রেসের সদস্য। ১৯২৬, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সদস্য। ১৯৩৯-৪০, সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন বি. পি সি. সি.-র অন্যতম সহ-সম্পাদক। ১৯৩২-৩৮, প্রেসিডেন্সি জেলে, বক্সায় রাজবন্দী এবং কিছু দিন গৃহে অন্তরীন। বন্দীজীবনে, অধ্যয়ন, গবেষণা, সাহিত্যসৃষ্টি এবং মার্কসীয় মতাদর্শের চর্চায় মন-প্রাণ সঁপে দেন। ১৯৩৩, অসুস্থ অবস্থায় প্রেসিডেন্সি জেলে রচনা করেন বিখ্যাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'একদা' (মুদ্রিত হয় ১৯৩৯)। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের সাগা 'ভদ্রাসন'-এর অধিকাংশ খণ্ড এবং 'বাজে লেখা'-র স্বগতনিবন্ধ গুলো ১৯৩৪—৩৬-এর মধ্যে বন্দীজীবনে রচনা করেন। গুরু সুনীতিকুমারের স্নেহানুকুল্যে গবেষণা নিবন্ধ 'ইস্টবেঙ্গল ডায়লেক্‌ট্‌স্‌'-এর কাজ-ও শেষ করেন প্রেসিডেন্সি জেলে।

কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারী হিসাবে সম্পাদনা করেন ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফরোয়ার্ডব্লক'। ১৯৩৮ থেকে সারাভারত কৃষক সভার অন্যতম সংগঠক। ১৯৪১, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪১-৪২ কলকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। কৃষকসভা ও কর্মচারী আন্দোলনে নেতৃত্বদানের সঙ্গে-সঙ্গে ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিতে বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁর দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৪১-এ প্রকাশিত হয় 'সংস্কৃতির রূপান্তর'—তাঁর মার্কসীয় প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ ফসল। 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনায়

(১৯৪৪-৪৮, ১৯৫২), 'স্বাধীনতা'র সাংবাদিকতায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে (১৯৫২-৫৮), পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে (১৯৫২) এবং নানা অনুষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে তিনি সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন হয়েছেন। ১৯৪৯ (মার্চ-জুন), কিছু দিনের জন্য রাজবন্দী ; আইনঅমান্য আন্দোলনে আবার কারাবরণ। আজও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্মানিত সদস্য।

সাহিত্যসাধনা : মানুষের সামগ্রিক আত্মবিকাশের স্বার্থেই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে গোপাল হালদার প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়েছেন, আর আত্মপ্রকাশের অন্যতম পথ হিসাবে আ-কৈশোর গ্রহণ করেছেন সাহিত্যকে। রাজনীতি, গবেষণা, জ্ঞানার্জন, সাহিত্য সাধনা সবক্ষেত্রেই স্বদেশের স্বাধীনতা ও "জাতীয় চেতনার আত্মবিকাশের" গুরুত্বকে মেনে নিয়েও সর্বজাতির স্বার্থ ও মানুষের সামগ্রিক আত্মবিকাশের সাধনার কথাই তুলে ধরেছেন, কারণ তাঁর কাছে, "সবার উপরে মানুষ সত্য"— এই মানুষ স্বদেশে-স্বকালে পরিচ্ছিন্ন বাঙালী হলেও মনুষ্যত্বের সাধনায়, বিশ্বজনীন সামগ্রিক সত্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত। এই বোধ এই বিশ্বাস ই গোপাল হালদারের রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার, তাঁর সামগ্রিক জীবন বাসনার মৌল প্রেরণা।

লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ ১৯২১ এ, 'সবুজপত্র' 'ভারতবর্ষে' —গল্প প্রবন্ধ লেখার সূত্রে। ইংরেজী-বাঙলা লেখার জোরেই কিছু দিনের মধ্যে 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ', পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন ; সাদরে গৃহীত হন 'শনিবারের চিঠি'-র সাবস্বত চক্রে। বহু পত্র পত্রিকায় লিখেছেন, আজও লিখছেন ;— ইংরেজী বাংলা অনেক রচনাই ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে, তার সিকি ভাগও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় নি। সাংবাদিক রচনা সম্পাদিত গ্রন্থ, পাঠ্য পুস্তক ইত্যাদি বাদ দিলেও তাঁর প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা—৩২। প্রথম প্রকাশের কালানুক্রম রক্ষা করে, শ্রেণী বিন্যস্ত গ্রন্থ তালিকাটি নিচে দেওয়া হোল, তা থেকেই পাঠক বুঝতে পারবেন, গোপাল হালদার শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতির মননশীল বিশ্লেষক মাত্র নন —তিনি একজন সৃষ্টিশীল লেখকও।

উপন্যাস ছোটগল্প : একদা (১৯৩৯), পঞ্চাশের পথ ১৯৪৪), তেরশ পঞ্চাশ (১৯৪৫), উনপঞ্চাশী (১৯৪৬), ভাঙন (১৯৪৭), উজানগঙ্গা (১৯৫০), অন্যদিন (১৯৫০), স্রোতের দীপ (১৯৫০), আর একদিন (১৯৫১), ভূমিকা (১৯৫২), নাগঙ্গা (১৯৫৩), জোয়ারের বেলা (১৯৫৪) এবং 'ভাঙন' এর রূপান্তরিত সংস্করণ ভাঙনীকুল (১৯৫৬)। এছাড়া রয়েছে ধূলিকণা (১৯৪২) নামে একখানি গল্পগ্রন্থ।

রসনিবন্ধ : বাজে লেখা (১৯৪৩) বা স্বপ্ন ও সত্য (১৯৫১), আড্ডা (১৯৫৩), বনচাঁড়ালের কড়চা (১৯৬০)। 'বাজেলেখা' রসনিবন্ধ সংকলনের 'বাজেলেখা' নামাঙ্কিত রচনাটি বর্জিত হয়ে এবং 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি,' 'সাধনা ও সৌখিনতা' নামে দুটি রচনা সংযোজিত হয়ে নামান্তরিত নতুন সংস্করণ 'স্বপ্ন ও সত্য'।

প্রবন্ধ : সংস্কৃতির রূপান্তর (১৯৪১), বাঙালী সংস্কৃতির রূপ (১৯৪৭), এ কালের যুদ্ধ (১৯৪৭), বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ (১৯৫৬), বাঙলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি (১৯৫৬), ভারতের ভাষা, বাঙালীর আশা বাঙালীর ভাষা , সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা , শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থটি একাধিক বার পরিমার্জিত হয়ে ওরিয়েন্ট সংস্করণে প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যের ইতিহাস : বাঙলাসাহিত্যের রূপরেখা প্রথম খণ্ড (১৯৫৪) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৮), ইংরেজী সাহিত্যের রূপ রেখা , রুশ সাহিত্যের রূপ রেখা।

আত্মজীবনী : রূপনারানের কূলে প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড

বিদেশ ভ্রমণ, সম্মান ও স্বীকৃতি : একজন অগ্রগণ্য বাঙালী বুদ্ধিজীবী হিসাবে গোপাল হালদার দেশ-বিদেশের বহু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, পূর্ব-জার্মানী, চেকোশ্লাভাকিয়া প্রভৃতি দেশে করেছেন ভ্রমণ; কলকাতা, বোম্বাই, এলাহাবাদ, গৌহাটি, রাজশাহী, যাদবপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে দিয়েছেন ভাষণ। 'রুশ সাহিত্যের রূপ রেখা' গ্রন্থের জন্য পেয়েছেন সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার। ঐ বছরই শ্রেষ্ঠ গবেষকের স্বীকৃতি হিসাবে লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী স্মৃতি স্বর্ণ পদক। শরৎ স্মৃতি পুরস্কার আর 'রূপনারানের কূলে' ২য় খণ্ডের জন্য পান রবীন্দ্র পুরস্কার। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর সামগ্রিক দানের জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "সাম্মানিক ডক্টরেট" উপাধিতে হয়েছেন ভূষিত।

জীবন সাধনা : গোপাল হালদার সুভদ্র-ঋজু-বিনীত প্রজ্ঞার অধিকারী নির্লোভ নিরহঙ্কারী কৃতী পুরুষ। সহৃদয়-সামাজিকতা আর সদাপ্রসন্ন-চিত্তের অকপট সরলতাই তাঁর স্বভাব-সৌন্দর্য।

আমাদের এই শতাব্দীর প্রায় সমানবয়সী বিচিত্রকর্মা মানুষটির জীবন পরিক্রমা শুরু স্বদেশী যুগের বোধন কালে। বিবেকানন্দের অভীঃ মন্ত্রে আর ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরমে' কৈশোরেই নিয়েছিলেন স্বদেশীতে দীক্ষা,—তার পর রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' আর "আনন্দের আশীর্বাদ" গ্রহণ করে, আঁকা-বাঁকা নানা পথ বেয়ে, 'একা'—অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হয়ে, শুধু স্বদেশের নয় সমগ্র মানুষের মুক্তির কালোপযোগী যাত্রাপথ খুঁজে পেয়েছিলেন 'লেনিনে' —কমিউনিজমের মধ্যে। সেই যাত্রাপথে, 'সংস্কৃতির রূপান্তরের' সাধনায় সৃষ্টি থেকে, মানুষের মুক্তি তীর্থে 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপের' বাসনায় আজও তিনি সমুৎসুক। অশীতি-উত্তর আবেগেও দীপ্ত তাঁর জীবন রসের তৃষ্ণা, অক্ষুণ্ণ তাঁর জিজ্ঞাসু মনের সক্রিয়তা। তাঁর সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায়, "আপনাকে বিদ্যাভিলাষী বলেই মনে করি, কারণ বহু কামনাবস্তু ও আপনাকে প্রলুব্ধ না বিচলিত করে শ্রেয়ঃ পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে নি।"— নচিকেতার প্রতি যম, কঠোপনিষদ্—'বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত॥')।

—অমিয় ধর

নির্ঘণ্ট

অ

আ

খ

গ

ঘ

চ

ভ

য য়

র

শ

ষ

স